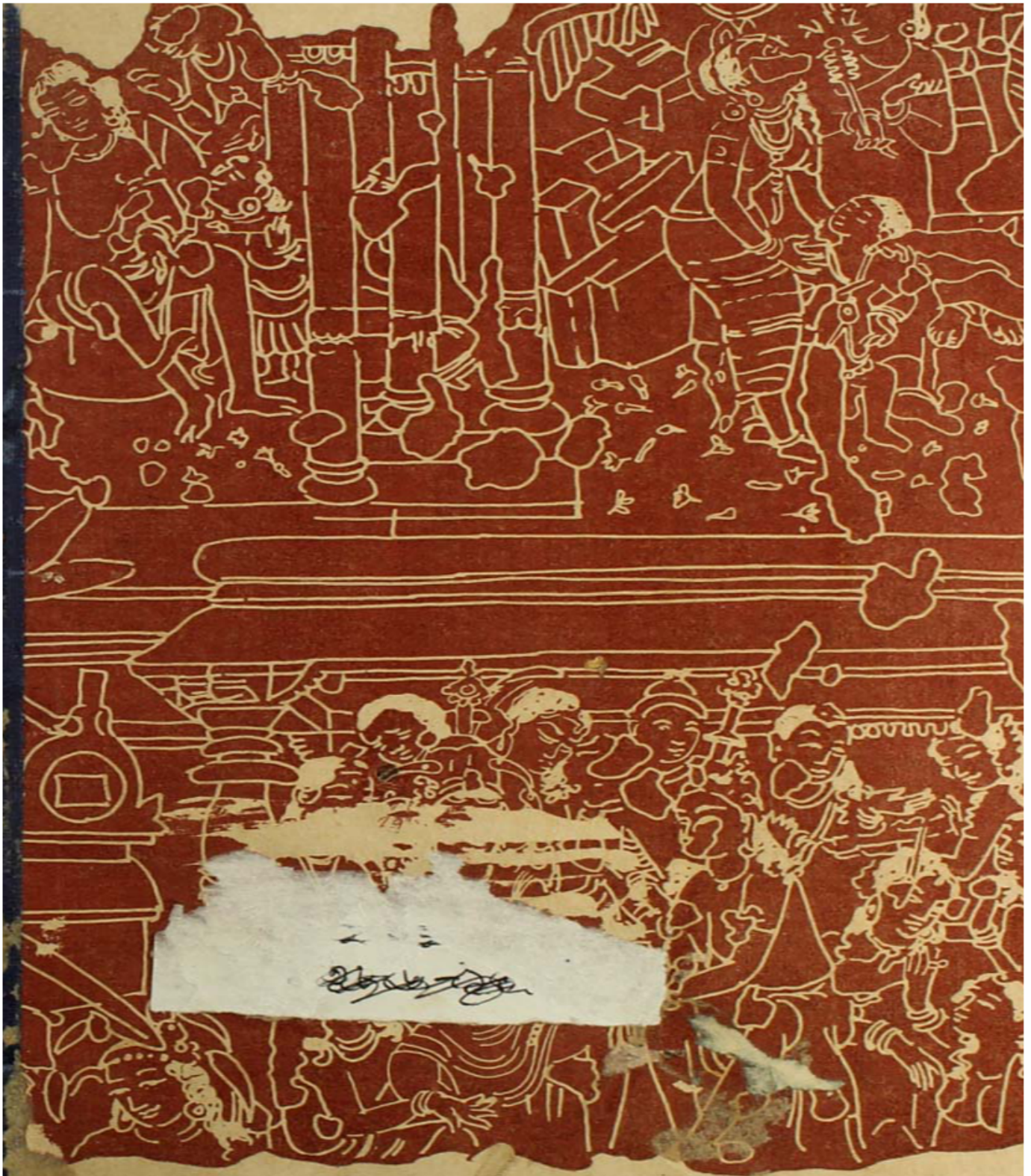

ভদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

ক ঃ
ামী সদাত্মানন্দ
ামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক ঃ
আশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন
১৩৮৬

WHAT MAKES BANK DIFFERENT ?

Frinedliness

Prompt attention

and efficient service

It is the friendly personal attention given to your problems that will convince you why banking with us is worthwhile. However small may be your deposit, Our full range of prompt and different services is available to you.

A welcome awaits you at -

THE CHARTERED BANK

(A member of Standard Chartered Bank Group)

Where service is taken into account

Interest of Saving Account—5% p.a.

Interest on Term Deposits - Please enquire at any of our offices

Income from investments up to Rs. 3000/- In aggregate— Income Tax Free

Interest Receipts up to any amount

No deduction of Tax at source

4, Netaji Subhas Road, Calcutta-1
14, Netaji Subhas Road, Calcutta-1
31, Chowringhee Road, Calcutta-16
208, Rashbehari Avenue, Calcutta-29
(With safe deposit Locker facilities)
6, Vivekananda Road, Jorasanko, Calcutta-7
10, Nirmal Chunder Street, Bowbazar, Calcutta-12
21-A, R.G.Kar Road, Shymbazar Calcutta-4
67, Cossipore Road Calcutta-36
(With safe deposit Locker facilities)

With the compliments of

BATLIBOI & COMPANY LIMITED

Regd. Office : P.O. Box 190A V. B. Gandhi Marg, Fort, Bombay--400 023

Machinery Division :

26, R. N. MUKHERJEE ROAD,
CALCUTTA-700 001.

Tel : 23-8831/4
Telex : 021-7289
Cables : BATLIBOICO

॥ সংবাদ সংগ্রহে ॥

— পর্য্যবেক্ষক।

কলকাতার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সি. এম. ডি. এ-তে অনেক সাংবাদিককেই আসতে হয়েছে। কারণ অনেকগুলি তবে একটা বড় কারণ হল, কলকাতা সম্বন্ধে দুর্বলতা। কলকাতা নিয়ে খবর করতে সবলেই চান—এবং যখন সি. এম. ডি এ-র কাজকর্ম সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা হয়, তখন কিন্তু আমরা সমালোচনাটা সেই ভাবেই নিই। অর্থাৎ ভালবাসার শহরে কাজে বিলম্ব হবে কেন? ত্রুটি থাকবে কেন? সমস্যার সমাধান হবে না কেন? লোকের দুর্দশা লাঘব হবে না কেন? এসব প্রশ্ন করবার অধিকার তো প্রত্যেক নাগরিকদেরই আছে—সাংবাদিকদের তো আরও বেশী।

জবাব দিতে গিয়ে সন্তোষজনক জবাব প্রায় সময়ই দিতে পারিনি। তবে চেষ্টা করেছি।

নতুন সরকার আসার পর সি. এম. ডি. এ. এবং কলকাতা সম্বন্ধে আগ্রহটা অনেক বেড়ে গেছে। কারণ এখনকার নীতি অনুযায়ী, জনগণের সঙ্গে এই সংস্থার সম্পর্কটি আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। যেমন বস্তীবাসীর লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করে বস্তী উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হয়েছে। যেমন হাওড়া শিয়ালদার রূপান্তর এবং পুনর্বিন্যাস করার ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। এবং আপনারা জানেন যে, এই সহযোগিতা পাওয়াও যাচ্ছে।

এখন যে জিনিষটা দরকার সেটা শুধু সমালোচনা নয় বা শুধু প্রশস্তি নয়। দরকার শহর সচেতনতা বা নাগরিক সচেতনতা। বহুদিন পরে এই প্রথম এই শহরের খেটে-খাওয়া মানুষের কিছু কল্যাণ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সময় যদি আমরা শহরটা সম্বন্ধে আরেকটু সচেতন হই, তাহলে খুব উপকার হয়।

যেমন ধরুন রাস্তায় দিবারাত্র জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। জঞ্জাল ফেলার জায়গার অভাব তো আছেই, কিন্তু আবর্জনাটা সকাল ৮ টার আগে রাস্তাতেই ফেলা কি অসম্ভব? শুধু যদি আমাদের এই অভ্যাসটুকুও হয়, তাহলেও দেখবেন কলকাতা কত পরিচ্ছন্ন। কারণ কর্পোরেশনের পক্ষে একবার ময়লা সরানো অসম্ভব নয়—কিন্তু দিবারাত্র ১০।১৫ বার তো সাফ করা যায় না।

তাই বলছিলাম। সাংবাদিকরা অনেক কিছু খবর যোগাড় করেন। অনেকের মাথায় অনেক "আইডিয়া" থেন। কলকাতার লোকের মধ্যে এই শহর-সচেতনতাটা আনতে পারেন না?

"বিশ্ববাণী নিয়মাবলী"

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৭·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডার যোগে অগ্রিম বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক গ্রাহক.গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্ত্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে 'বিশ্ববাণী' অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারনে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০·০০ টাকা (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedant Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges-বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মিঃ থেকে ১১-৩০মিঃ এবং
বিকাল ৩-৩০মিঃ থেকে ৬-৩০মিঃ

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ফাল্গুন, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ

শ্রীদেবাশীষ হোড়

শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :

স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :

ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥

শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :

শ্রীসুবের দত্ত

দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস

৬ নং ডাক ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• ডক্টর কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে শ্রীকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিভূভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির এ্যাণ্ড জয়পুর

রাজস্থানের বৃহত্তম ব্যাঙ্কের উপহার

বিভিন্ন লাভজনক সঞ্চয় প্রকল্প ।

এই প্রকল্পগুলি থেকে আপনি আপনার মনেরমতটি বেছে নিন,
দেখুন আপনার সঞ্চয় কেমন বেড়ে যায় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ও সুরক্ষিত হয় ।

★ বিশেষ মেয়াদী জমা (স্পেশাল টার্ম ডিপোজিট)
★ মেয়াদী জমা (টার্ম ডিপোজিট)
★ সঞ্চয় জমা (সেভিংস ডিপোজিট)
★ পৌনঃপুনিক জমা (কিমুলেটিভ ডিপোজিট)

পুনর্বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ১০ বছরে ৫০০০·০০ টাকার বিনিময়ে ১৩৪২৭৫০ টাকা এমনকি মাত্র ১০০০·০০ টাকার বিনিময়ে ২৬৮৫·৫০ টাকা পাবেন ।

পূর্ণ বিবরণের জন্য কলিকাতায় নিম্নের যে কোনও একটি শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করুন :—

১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা
ফোন : ২২-১১৮০, ২২-১১৮১, ২২-৩১৭৭,
২২-৩৮১০ ও ২২-১০৫৮ ।

৪, সিনাগগ্ স্ট্রীট, ব্রাবোর্ণ রোড,
কলিকাতা
ফোন : ২৬-৬৭০১, ২৬-৬৭০২ ও ২৬-১৮৭৭

এবং

২০৪ বাসবিহারী এভিনিউ,
বালীগঞ্জ, কলিকাতা
ফোন : ৪৬-০৬২৬

৬৬/১, অরবিন্দ রোড,
সালকিয়া, হাওড়া

৪৭৯টি শাখার মাধ্যমে আমরা জাতির সেবায় রত।
আরও শাখা শীঘ্রই খুলছে।

বিশ্ববাণী

ফাল্গুন, ১৩৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	নববর্ষ	১	
২।	বাণী ও নিচার	৩	
৩।	বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজবিকাশের ধারা	৯	স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
৪।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক'	১২	ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৫।	মীরার কৃষ্ণভাবনা	১৫	ডঃ শ্রীকল্যাণ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৬।	অবক্ষয় ও পুনরুজ্জীবন	১৯	শ্রীরণজিত কান্তি সরকার
৭।	এলো দোল (গান)	২৪	শ্রীঅজিত কান্তি সরকার
৮।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	২৫	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

With best Compliments from :—

THE PEERLESS GENERAL FINANCE & INVESTMENT Co. Ltd.,

ESTD : 1932

Registered Office : **"PEERLESS BHAVAN"**

3, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-69

MORE THAN 100% OF THE COMPANY'S LIABILITY TO ITS CERTIFICATE-HOLDERS ARE KEPT INVESTED IN GOVERNMENT SECURITIES & IN FIXED DEPOSITS WITH NATIONALISED BANKS.

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক পরিবার সুরক্ষা প্রকল্প

ঘরে বসেই টাকা জমান

সেন্ট্রাল মিনি ডিপোজিট স্কীম

সামান্য ১ টাকা দিয়ে এ্যাকাউন্ট খুলুন। পরে ৩৬ মাস অথবা ৬০ মাসের জন্য ৫০ পয়সা অথবা ৫০ পয়সার গুনিতক অর্থ সঞ্চয় করুন। ব্যাঙ্কের নিযুক্ত প্রতিনিধিই আপনার সুবিধেমত আপনার বাড়ী গিয়ে জমার টাকা সংগ্রহ করবে। বার্ষিক সুদ শতকরা ৬ টাকা থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত।

সামান্য সঞ্চয় অসামান্য হয়

রেকারিং ডিপোজিট স্কীম

চাকুরীজিবীদের জন্য অনবদ্য প্রকল্প। প্রতি মাসে পাঁচ টাকা অথবা পাঁচ টাকার গুনিতক অর্থ ১২ থেকে ১২০ মাসের জন্য সঞ্চয় করুন এবং দেখুন প্রতি তিন মাস অন্তর দেয় বার্ষিক শতকরা ৭ টাকা থেকে ১০ টাকা চক্রবৃদ্ধি হার সুদে আপনার সামান্য সঞ্চয় কেমন বর্ধিত হয়।

এই শেষ নয়

আপনার অতিরিক্ত ব্যয়ভার বহনের জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের ত্রৈমাসিক সুদ জমা প্রকল্প আছে। এ ছাড়া আছে হোম সেভিং সেফ এ্যাকাউন্ট। আপনি যখন খুশি টাকা জমা দিতে পারেন।

আজই নিকটস্থ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলুন। আপনার পরিকল্পনা সার্থক রূপায়নের জন্য প্রকল্প বেছে নিন।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

ভারত সরকারের স্বশাসিত সংস্থা

জনগণের স্বার্থে বিভিন্ন প্রান্তে আমাদের ব্যাঙ্ক

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
৯।	কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য	৩২	স্বামী প্রভানন্দ
১০।	শ্রীরামকৃষ্ণগীতি	৩৭	শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস
১১।	হিমালয়ের পথে পথে—কেদারনাথ	৩৮	শ্রীবিশ্বজিত দাস
১২।	বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও ইতিহাসের যোগসূত্র	৪৫	শ্রীরঞ্জন গাঙ্গুলী
১৩।	গ্রীসের শিল্পকলায় মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র	৫১	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৪।	কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত	৫৮	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
১৫।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ	৬২	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
১৬।	মনের উৎস ও তার বিকাশ	৬৪	স্বামী পরমাত্মানন্দ

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET, CALCUTTA-700 006

এই প্রতীক কী এবং কেন?

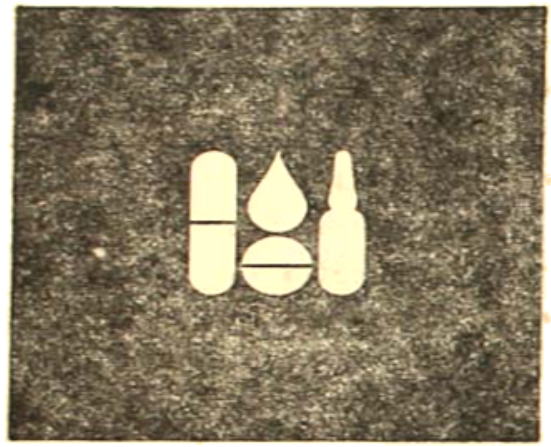

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যালস্— সেই ১৯৩৬ থেকে দেশ ও দশের জন্যে উৎকৃষ্ট ওষুধের গবেষণা, উদ্ভাবন ও সরবরাহ করে চলেছে।

এই প্রতীক আধুনিক ও প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তৈরির কাজে ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্-এর কারুনৈপুণ্যকে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার চিহ্ন। এমন এমন ওষুধ যা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর অর্থসামর্থ্যের দিক থেকে সাধ্যায়ত্ত।

ই-আই-পি-ডব্লু বলতে এই। সেই ১৯৩৬ সালে মুষ্টিমেয় একদল আদর্শবান চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ্ এবং ভেষজতত্ত্বজ্ঞ এর গোড়াপত্তন করেছিলেন। তাঁরা কী চেয়েছিলেন? চেয়েছিলেন দেশীয়ভাবে বিস্তর ধরনের ওষুধের গবেষণা আর উদ্ভাবন করতে। আর সেইসঙ্গে গড়তে সারা দেশে তার যোগান দিতে।

এই চাওয়া ইতিমধ্যে সার্থক হয়েছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড
আপনাদের সেবায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল্ ওয়ার্কস্ লিমিটেড, কলিকাতা-৭০০০৭১

EIPICAMR-48N

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

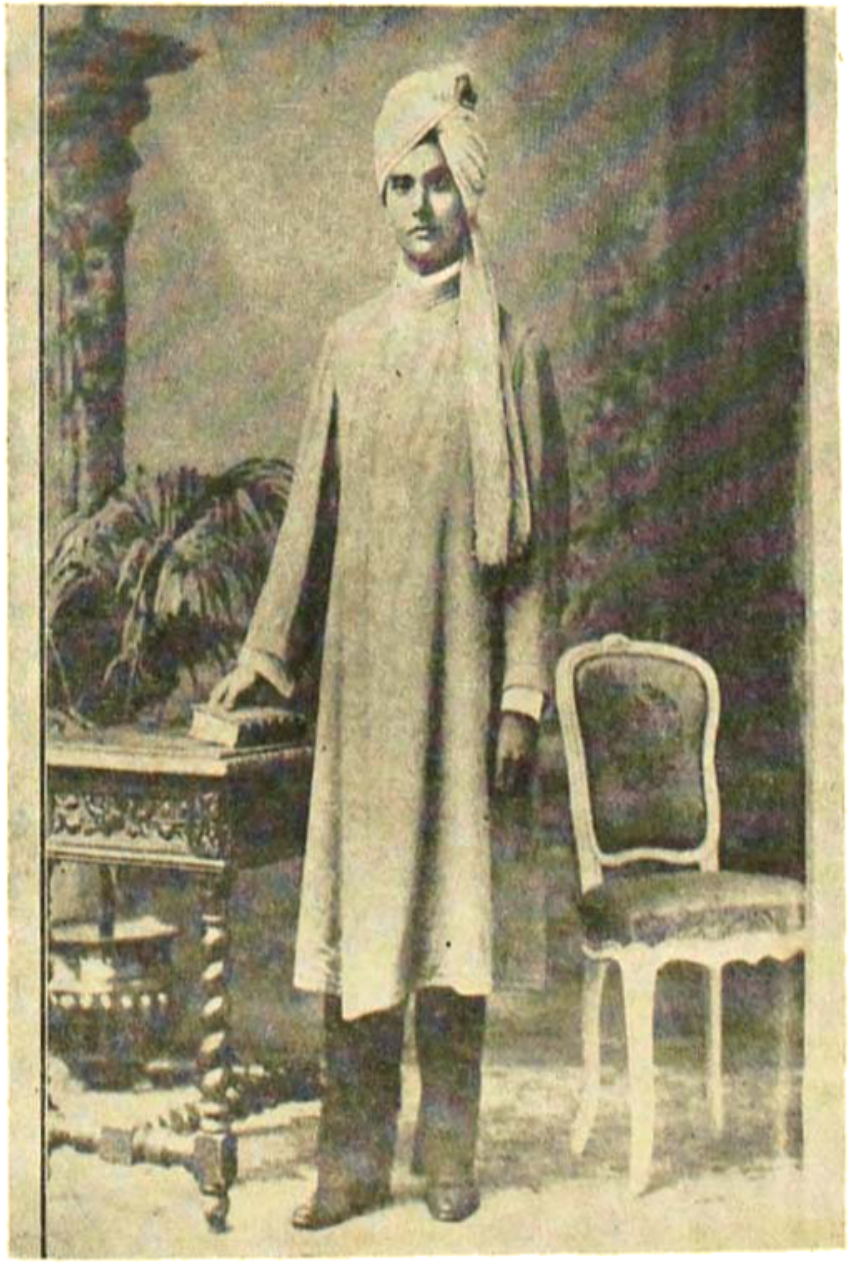

লণ্ডনে স্বামী অভেদানন্দ

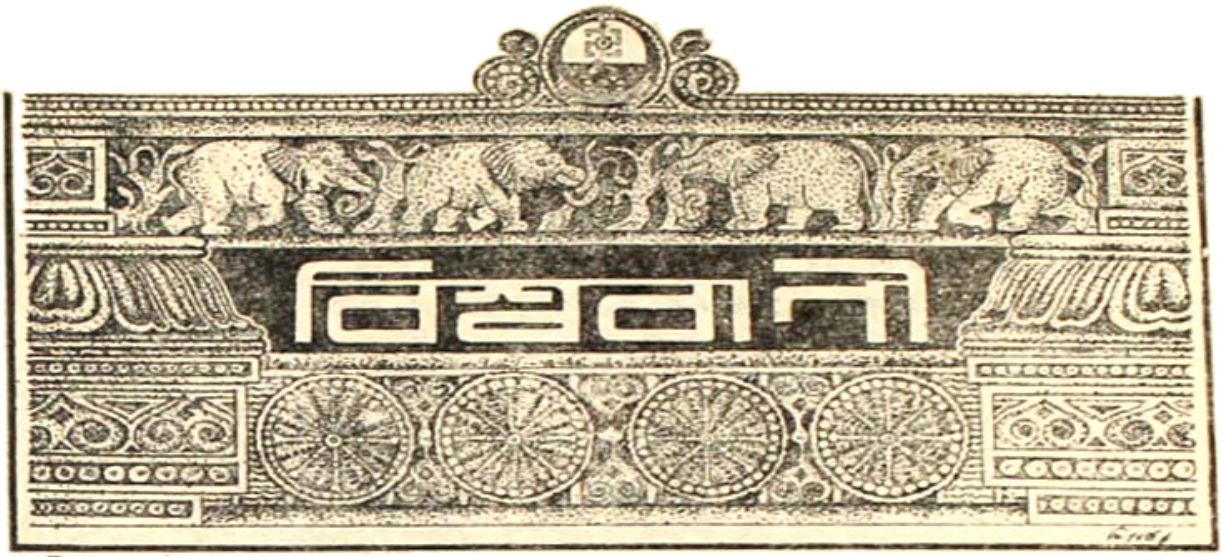

বিয়াল্লিশ বর্ষ	প্রথম সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩৮৬

।। নববর্ষ ।।

আরও একটি বৎসর অতিক্রান্ত হ'ল এবং ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পত্রিকা 'বিশ্ববাণী' পদার্পণ করলো ৪২-তম বর্ষে। বিশ্ববাণীর উদ্দেশ্য ও ব্রত জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে বিশ্বের সকল ধর্ম, সাধনা, সাহিত্য, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির উপাদান বা উপকরণ পরিবেশন করা রুচীবান এবং শিক্ষা-সংস্কৃতিবান মানুষের কাছে। 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ'-সংকল্প নিয়ে বিবিধ বাধাবিপত্তির পথ অতিক্রম ক'রে 'বিশ্ববাণী' তার চলার পথে আজও এগিয়েই চলেছে। কত বাধা-ব্যতিক্রমের ঝড়া, তবু সে পাঠকমনের খোরাক কম জোগায় নি, বরং তা বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর। সীমিত কলেবরের মধ্যে থেকেও সে জুগিয়েছে নব নব চিন্তা ও প্রেরণার অপর্য্যাপ্ত বিষয়—যা থাকবে অটুট—আমরা আশা করি, অনাগত আগামী বর্ষগুলিতেও। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পুণ্য-স্মৃতিবহনকারী এই পত্রিকা অনির্দিষ্ট অনাদিকালেও সূচনা করে চলবে নিত্য-নূতনযুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, আর সেকারণেই সে জয় করবে পাঠকসমাজের হৃদয়।

এই আশার দীপশিখাটি দীপ্তিমান করার দায়িত্ব যাঁদের ওপর সেই অনাসক্ত, নিরহঙ্কারী, নীরবে মানবকল্যাণে রত গুণী, জ্ঞানী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও উদার বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং সর্বোপরি সুরুচিসম্পন্ন সুধীপাঠকবর্গকে শুধু ধন্যবাদ দেওয়াটা অকিঞ্চিৎকর বলেই মনে করি। তাঁদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং অপরিসীম সহযোগীতাই এনে দিয়েছে বিশ্ববাণীর বর্তমান সাফল্য এবং তাই হবে তার ভবিষ্যৎ জীবনপথের একমাত্র সহায় ও সম্বল।

সীমার রাজ্যে চলার পথে ত্রুটীবিচ্যুতি ঘটেই থাকে যথাবিহিত সতর্কদৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও। ধৈর্যশীল পাঠকপাঠিকাবর্গ, শুভানুধ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতাগণ এবং বিশ্ববাণীর নবনব রূপদাতা শিল্পীবৃন্দ ও নিরলস জনসেবী প্রবন্ধলেখকগণ নিজ নিজ গুণে সমস্ত ত্রুটী মার্জনা ক'রে বিশ্ববাণীর অগ্রগতিকে অক্ষুণ্ণ রাখবেন এই আশা, ভরসা এবং বিশ্বাস নিয়ে আমাই সাদর আহ্বান আগামী বর্ষকে। আমাদের সকলের সমবেত এবং আন্তরিক চেষ্টা সফল হোক, সার্থক হোক—প্রার্থনা জানাই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট।

পরিশেষে বর্তমান বর্ষের 'বিশ্ববাণী'-পত্রিকার প্রচ্ছদপটটির কিছু পরিচয় দিয়ে বক্তব্য আমাদের শেষ করবো। প্রচ্ছদপটে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী এখানে অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায় তাঁর সুনিপুণ তুলিকায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এটি।

অঙ্গ ও মগধ-রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত চম্পানদী ও চম্পানদীর তীরেই চম্পেয়্যরাজ্য অবস্থিত। নাগরাজ্যের অধিশ্বর চম্পেয়্য। বোধিসত্ত্বের অন্তরের কামনা ছিল চম্পেয়্যরাজ্যের অধিশ্বররূপে জন্মগ্রহণ করেন ও সেভাবেই বিশ্বের দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত আর্ত-মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি সেই ইচ্ছানুসারে চম্পেয়্যরাজ্যের অধিশ্বররূপে জন্মগ্রহণ করেন চম্পানদীর অতলজলের গভীরে ও নাগকন্যা সুমনাকে বিবাহ করেন। কিন্তু মর্ত্যবাসীর দুঃখ-দর্শনে চম্পেয়্যরাজ বোধিসত্ত্বের হৃদয় ব্যথিত হয়।—প্রভৃতি।

নীচের চিত্রটির সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য। তিনি উদাসীন···। কাহিনীটি সুদীর্ঘ, কিন্তু কাহিনীতে ও চিত্রে চম্পেয়্যরাজার অতিকোমল হৃদয় বিগলিত বিশ্বমানবের জন্য।···কাহিনীর বিষয়বস্তুর সমাপ্তি এখানেই।

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

(শেষাংশ)

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ঈশ্বরকোটি মহাকারণে গিয়ে ফিরে আসতে পারে। অবতারাদি ঈশ্বরকোটি। তারা উপরে (সমাধিতে) ওঠে, আবার নিচেও (জগতেও) ফিরে আসতে পারে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৩)।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে (পৃঃ ১১৮-১১৯) জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন : "শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গ তুলিয়া আলোচনা করিতেন, কিন্তু তখন আমি বা আমরা কেহই তাঁহার আলোচনার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। আমরা বুঝিতাম—সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম সকলের মধ্যেই বিরাজমান, সুতরাং কেহ ছোট বা বড় এই চিন্তার কোন অর্থ নাই।

"একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি তাঁহাকে একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন : 'ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছে সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই মানুষ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান, কিন্তু অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করিতে পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধারলাভ করিয়াও অপরকেও উদ্ধার করিতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : 'জীবকোটি কি তাহলে ঐ শক্তি পায় না? জীবকোটি কি ঈশ্বরকোটির স্তরে ক'খনো উঠিতে পারে না?'

"শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন : 'হ্যাঁ পারেন। জীবকোটি যদি শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করেন তবে মা তাঁকে তা দেন'। এই উপলক্ষ্যে তিনি একটি দৃষ্টান্তও দিলেন। তিনি বলিলেন : 'বনের মধ্যে চারিদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটা জায়গা ছিল, কিন্তু কোন লোক হয়তো ভিতরের দিকে লক্ষ্য ক'রে আনন্দে 'হা হা' শব্দ ক'রে হেসে পড়ে যায়। এঁরা হলেন জীবকোটি। কিন্তু যাঁর বিশেষশক্তি আছে তিনি দেওয়ালে উঠে ভিতরের জিনিস দেখে ফিরে আসেন এবং আর আর সঙ্গীদের খবর দিয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। এঁরা হলেন ঈশ্বরকোটি'।[১] শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অপূর্ব দৃষ্টান্ত শুনিয়া সেইদিন জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে যে ভেদ তাহা বুঝিতে পারিলাম"।

১। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যে, 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছিলেন তার Fair Copy করার সময়ে পূর্বে লেখায় কিছু কিছু পরিবর্তনসাধন করেছিলেন।

সুতরাং বোঝা যায় যে, জীবকোটির সাধক নিজে সাধন ক'রে সিদ্ধিলাভ করেন, অপরকে সিদ্ধিদান করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে থাকে না, কিন্তু ঈশ্বরকোটির দিব্যমানুষ অবতার-পুরুষগণ এবং তাঁর সঙ্গেসঙ্গে যুগেযুগে যাঁরা অবতারপুরুষের লীলাপুষ্টি করার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব 'নিত্যসিদ্ধ'-পুরুষ বা মহামানবদেরও ঈশ্বরকোটির পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—

"একটি আছে—**নিত্যসিদ্ধের** থাক্। তাঁরা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাল লাগে না।..."

পুনরায় তিনি বলেছেন—

"অবতারের সঙ্গে যারা আসে তারা নিত্যসিদ্ধ। **কারু বা শেষজন্ম**"।

প্রথম—জন্মাবধি যারা ঈশ্বরকে চায়, তারা নিত্যসিদ্ধ, 'দ্বিতীয়—অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ। **কারু বা শেষজন্ম**" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৪)।

"**নিত্যসিদ্ধের** থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, * * বেদে আছে হোমাপাখির কথা ..."। সুতরাং দেখা যায় যে, অবতারের সঙ্গে আসেন যাঁরা—তাঁদের দুটি থাক্: একটি—যাদের যুগে যুগে আসা, আর অপরটি—'অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষজন্ম'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা বা এই স্বীকৃতির মধ্যে অবগুণ্ঠিত রহস্যজাল লুকানো আছে—যে অবগুণ্ঠনের মোচন সম্ভব একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের নিজেরই পক্ষে।

এখানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের নিজের প্রসঙ্গই তুলি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদর্শনে স্বামী অভেদানন্দ (তখন কালীপ্রসাদ) যখন প্রথম যান তখন তাঁর মধ্যে যোগশিক্ষা করার প্রবল আকুলতা ছিল। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর (কালীপ্রসাদের) মধ্যে এই ইচ্ছা প্রবল ছিল: "আমি যোগীর মতো টাকরায় জিহ্বা লাগিয়ে জড়সমাধিতে বসে থাকবো" ('আমার জীবনকথা', পৃঃ ২০)। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কালীপ্রসাদের দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দেখা হ'লে শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করলেন,: 'তুমি কে? বাড়ী কোথায়? কি চাও? ইত্যাদি কত-কিছু। কালীপ্রসাদ ভক্তিগদগদকণ্ঠে উত্তর দিলেন: 'আমার যোগশিক্ষা করার

যেমন, প্রথম পাণ্ডুলিপিতে এ'ঘটনাটি এ'ভাবে লিপিবদ্ধ করেছিলেন তিনি: "কিন্তু কোন কোন মহাপুরুষের এমন শক্তি আছে যে, প্রাচীরে উঠিয়া ভিতরে যাহা আছে তাহা দেখিয়া মহানন্দে মাতোয়ারা হইয়াও আবরণ কাটাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারে এবং অন্যান্য সঙ্গীদিগকে সেই অপূর্বস্থানের সংবাদ দিয়া সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দেয়। তাহারাই ঈশ্বরকোটির থাকের বলি।

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম: 'জীবকোটি কি সেই শক্তি পায় না? এবং কখনও ঈশ্বরকোটিতে উঠিতে পারে না?' শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন: 'হ্যাঁ তা পারে। জীব যদি জগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করিবার জন্য শক্তি প্রার্থনা করে তাহলে মা তাকে সেইরূপ শক্তি দান করেন"।

এ'ভাবে মুদ্রিত 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে পূর্বে লিখিত rough (অপরিচ্ছন্ন) খাতা থেকে সরে ছাপানোর সময়ে corrected (পরিচ্ছন্ন) খাতায় লিখিত কোন কোন ঘটনার (লেখার) পরিবর্তন দেখা যায় এবং 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থের প্রথমে (গোড়ায়) ও শেষে সংযোজিত নূতন ছাপানো অংশগুলি দেখলে তা বোঝা যায়।

ইচ্ছা। আপনি কি যোগসাধনা শিক্ষা দেবেন?' পরমহংসদেব সে'কথা শুনে কিছুক্ষণ নীরব থেকে বল্লেন: 'তোমার এই অল্পবয়সে যোগসাধন করার ইচ্ছা হয়েছে—এ' খুব-ভাল লক্ষণ। **তুমি পূর্বজন্মে এক বড় যোগী ছিলে। একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষজন্ম।** হাঁ, আমি তোমায় যোগশিক্ষা দেব'।[২] শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীপ্রসাদকে "জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। আমি জিহ্বা বাহির করিলে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) তাঁহার দক্ষিণহস্তের মধ্যমাঙ্গুলির দ্বারা জিহ্বায় একটি বীজমন্ত্র লিখিয়া শক্তি সঞ্চার করিলেন ও তাঁহার দক্ষিণহস্ত দ্বারা বক্ষঃস্থলে **ঊর্ধ্বদিকে শক্তি আকর্ষণ করিয়া মা কালীর ধ্যান করিতে বলিলেন।** • • • কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব আমার বক্ষঃস্থলে হস্ত দিয়া **কুণ্ডলিনীশক্তি নিম্নদিকে নামাইয়া আনিলেন"।** শক্তিসঞ্চার বলতে কুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগ্রত করা। কুণ্ডলিনীকে ঊর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করার সময়ে কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ ও কাষ্ঠবৎ অবস্থান করেছিলেন, কিন্তু কুণ্ডলিনীশক্তিকে পুনরায় নিম্নদিকে নামিয়ে নিয়ে আসলে তিনি বাহ্যচৈতন্য ফিরিয়ে পেয়েছিলেন। আশ্চর্যময় গুরুর আশ্চর্যপূর্ণ দীক্ষাকৌশলে কালীপ্রসাদের নাভি-কুণ্ডলে সুপ্তা কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হয়েছিল এবং যোগশিক্ষায় সিদ্ধিলাভের এটিই একমাত্র লক্ষণ। আশ্চর্য এই সাধন, আশ্চর্য এই সাধনার সিদ্ধি ও আশ্চর্য এই যোগসাধনাদানের গুরু। গীতায় আত্মতত্ত্বের মহিমা বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণ গীতার ২।২৯ শ্লোকে এ'কথাই শুনিয়েছেন সমগ্র অধ্যাত্ম জ্ঞানবিলাসী বিশ্ববাসীকে—

'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
　　মাশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
　　শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥'

টীকাকার শ্রীধর-স্বামী ও 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে মধুসূদন-সরস্বতী এই আশ্চর্য আত্মতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বদর্শনকে দুর্বিজ্ঞেয় বলেছেন: 'অতঃ দুর্বিজ্ঞেয়ঃ এব আত্মা'। আমরা বলি যে, দুর্বিজ্ঞেয় ও পরমরহস্যময় এই কুণ্ডলিনীযোগতত্ত্ব—যার সাধনায় ও জ্ঞানে সাধারণ মানুষ অসাধারণ জীবন্মুক্ত মহামানবে রূপান্তরিত হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১১৪) শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীর নিদর্শন দিয়ে বলেছেন: "অবতারের সঙ্গে যারা আসে, তারা নিত্যসিদ্ধ, কারু বা শেষজন্ম"। স্বামী অভেদানন্দ যখন যোগশিক্ষা করার জন্য দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রথম উপস্থিত হয়ে তাঁর আশ্চর্যময় অলৌকিক আচার্যদেবের কাছে যোগশিক্ষা করার কথা বল্লেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভেদানন্দকে বলেছিলেন: 'তুমি পূর্বজন্মে এক বড় যোগী ছিলে। একটু বাকী ছিল। এই তোমার শেষজন্ম"।

এই প্রসঙ্গের কথা উত্থাপন ক'রে বহুপরে (যখন তিনি শেষবয়সে কলকাতায় রামকৃষ্ণ-বেদান্ত-মঠের বাসভবনে ছিলেন) একদিন আমরা জিজ্ঞাসা করলে, মনে আছে, তিনি

২। স্বামী অভেদানন্দ: 'আমার জীবনকথা' ৪র্থ প্রকাশ, (সেপ্টেম্বর ১৯৭০), পৃঃ ২৭

বলেছিলেন : "কি জানি বাপু, শ্রীশ্রীঠাকুর তো ঐ'কথাই বলেছিলেন প্রথমে আমায় দেখে, কিন্তু আমি তো জানি যে, যুগে যুগে যাদের আসা অবতারদের সঙ্গে, তাদের জন্ম রহস্যময়ই, এবং অপূর্বও।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন তাঁর যুগে যুগে আসা অন্তরঙ্গপার্ষদদের আশ্চর্যময় আচার্য, তেমনি আশ্চর্যময় তাঁর অন্তরঙ্গপার্ষদদের জীবন !

এখানে পূর্ব-আলোচনার অনুবর্তন ক'রে পুনরায় লিখি যে, শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১১৪) লিখেছেন : "একটি আছে—**নিত্যসিদ্ধের** থাক্। তাঁরা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভাললাগে না। বেদে আছে হোমাপাখির কথা"। আমরা জানি, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদরা সকলেই ছিলেন নিত্যসিদ্ধ ও হোমাপাখীর দল। হোমাপাখীরা চিরমুক্ত ও পৃথিবীর সকল মালিন্য ও বন্ধনের অতীত। হোমাপাখীসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "এই পাখি খুব উঁচু-আকাশে থাকে। ঐ আকাশেই ডিম পাড়ে। এত উঁচুতে থাকে যে, ডিম অনেকদিন ধরে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে ডিম ফুটে যায়। তখন ছানাটি পড়তে থাকে। অনেকদিন ধরে পড়ে। পড়তে পড়তে চোখ ফুটে যায়। যখন মাটির কাছে এসে পড়ে, তখন তার চৈতন্য হয়। তখন বুঝতে পারে যে, মাটি গায়ে ঠেকলেই মৃত্যু। পাখি চীৎকার ক'রে মার দিকে চোঁচাদৌড়। মাটিতে মৃত্যু, মাটি দেখে ভয় হ'য়েছে। এখন মাকে চায়। মা সেই উঁচু-আকাশে আছে। সেইদিকে চোঁচাদৌড়। আর কোনদিকে দৃষ্টি নাই" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১৪)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "একটি আছে **নিত্যসিদ্ধের** থাক্। তাঁরা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভালোলাগে না"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিটি অন্তরঙ্গশিষ্যদের দিব্যজীবনের কথাই তাই। তাঁদেরও জীবনে যেমন ঈশ্বরলাভের জন্য আকুলতা ও প্রচেষ্টা ছিল তাঁদের আশ্চর্যময় আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের কথা শুনে, তেমনি তাঁর জীবনব্রতের পুষ্টিসাধনকারী লীলাসহায়ক ও লীলাসহচর অন্তরঙ্গশিষ্যদের অনন্যসাধারণ জীবন-কর্মের কথাও ছিল আশ্চর্যরকমের। এখানে এই প্রসঙ্গে শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীকথামৃতে পরমাশ্চর্যময় আচার্যের ও পরমাশ্চর্য অন্তরঙ্গশিষ্যদের জীবনমহিমার ও জীবনাদর্শের রহস্যময় গোপনকথারই পরিচয় দিয়েছেন আলোছায়ামেশানো কথায় ও বর্ণনায়।

এরপর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে ব্রাহ্মভক্তগণ, জনকরাজা, নারদ ও চিরমুক্ত শুকদেবের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলেছেন যোগ ও ভোগের কথা। যোগ ও তার পাশাপাশি নিরাসক্তভাবে ভোগ সাধারণ মানুষের জীবনে পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় রাজর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদের জীবনেই। রাজর্ষি জনক একাধারে ছিলেন রাজ্যশাসনকারী রাজা ও নিবৃত্তিকামী সন্ন্যাসী-ঋষি—

'জনকরাজা মহাতেজা (তার) ছিল
কিসে ত্রুটি,
সে, এদিক ওদিক দু'দিক রেখে
খেয়েছিল দুধের বাটী।'

৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ : 'মন ও মানুষ', ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ।

'দুধের বাটি' বলতে আত্মজ্ঞান বা জীবন্মুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য যথার্থজ্ঞানী যিনি—তিনি যোগী ও নিরাসক্ত ভোগী। যোগ ও ভোগ দুইই একসঙ্গে তিনি করতে পারেন। এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জ্ঞান ও জ্ঞানী—শব্দদুটির উপর নূতন আলোকসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন: "শুকদেব জ্ঞানী নন, জ্ঞানের ঘনমূর্তি। জ্ঞানী কাকে বলে? জ্ঞান (আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানোপলব্ধি) হয়েছে যার (তিনি জ্ঞানী)। সাধ্যসাধনা ক'রে জ্ঞানলাভ নয়, সহজাত ও জন্মগত সেই লাভ। শুকদেব জন্মগ্রহণ করেই নগ্নশরীরে সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন, আর তাই দেখে পিতা ব্যাস (বেদব্যাস) তাঁর (শুকদেবের) পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটে যাচ্ছিলেন। পরমজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত শুকদেবকে দেখে পথচারী মহিলারা কোন লজ্জাবোধ করে নি, কিন্তু ব্যাসদেব যখন তাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে দেখে তারা লজ্জা অনুভব ক'রে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করেছিল। কিন্তু সে'কথা যাইহোক, রাজর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিদের উদাহরণ দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব (এবং শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়) কি সর্ববন্ধনমুক্ত জ্ঞানঘনমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদদের নিরাসক্ত ও চিরমুক্ত জীবনকে লক্ষ্য বা নির্দেশ ক'রেছেন? শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদদের সকলের জীবনেই দেখি যোগ ও ভোগের সমন্বয়সাধনের এক জলন্ত আদর্শ। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তাই একদিনের এক কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ সংসারীদের জীবনচর্যাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'যারা জীবনে যথার্থ যোগী, তারাই সংসারে সত্যকারভাবে ভোগী'।[৪] যোগী সংসারে সকল-কিছু ত্যাগ ক'রে সংসারের সারাৎসার ভগবানকেই চায়, অন্য আর-কিছু চায় না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলেছেন: "একটি আছে নিত্যসিদ্ধের থাক্। তারা জন্মাবধি ঈশ্বরকে চায়, সংসারে কোন জিনিস তাদের ভালো লাগে না"।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তিনটি গান গেয়েছেন—

(১) মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।
　　ধরণী নইলে প্রাণ বাঁচে না॥
　　মনের মানুষ হয় যে-জনা
　　ও তার নয়নেতে যায় গো চেনা,
　　　　সে দুই এক জনা।
　　ভাবে ভাসে রসে ডোবে,
　　ও সে উজানপথে করে আনাগোনা॥

(২) গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।
　　তায় হিল্লোলে পাষণ্ডদলন
　　　　এ' ব্রহ্মাণ্ড তলিয়ে যায়।...

(৩) যে জন প্রেমে খাঁটি চেনে না।

—প্রভৃতি।

৪। 'সত্যকারভাবে ভোগী' বলতে নিরাসক্ত হয়ে ও কর্মের ফলভোগ ত্যাগ ক'রে সংসারের সকল বিষয়বস্তু ভোগ করে। 'ফলসন্ধিবাহিত্যেন ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা' কর্ম করলে কর্মের ফলে আসক্তি সৃষ্টি হয় না। ফলে মন বা চিত্ত শুদ্ধ হয়। 'চিত্তশুদ্ধিদ্বারেণ জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ'।

এ'গুলি বাঙলার বাউলগান ও কীর্তনগানেরই প্রতিচ্ছবি। বাউলরা ভগবানপাগল (বাওয়া) এবং তাদের ভগবানের নাম 'সহজ'। 'সহজ' বলতে যিনি সর্বমালিন্যমুক্ত চিরশুদ্ধ চিরনির্মল ঈশ্বর এবং মনের মানুষ। বাউলরা প্রেমের সাধক এবং সেই প্রেমের নাম প্রেমাভক্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : 'মনের কথা কইব কি সই—কইতে মানা, দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না' প্রভৃতি। জীবনরহস্যের নিগূঢ়তত্ত্বের কথা সকল মানুষকেই বলা যায় না, বলা যায় একমাত্র দরদী ও প্রাণের মানুষ যারা—তাদের। শ্রীরামকৃষ্ণ যে নিজে ও নিজের অন্তরঙ্গপার্ষদের জীবনের রহস্যময় তত্ত্বকথারূপ গোপনকথার পরিচয় দিয়েছেন ইঙ্গিতে—যে ইঙ্গিত সকল মানুষের কাছে এবং অতিসাধারণের কাছে বলার জিনিস নয়, কেননা বলেও তারা তার সত্যকারের অর্থ ও মর্ম গ্রহণ করতে পারে না—'শ্রদ্ধাপ্যেন বেদ ন চৈব কশ্চিৎ' (গীতা ২।২৯)। এজন্য প্রয়োজন মনের মানুষদের, রহস্যবেত্তাদের ও অধিকারী পুরুষদের :—'দরদী নইলে প্রাণ বাঁচে না', 'মনের মানুষ হয় যে জনা' প্রভৃতি। শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতারের লীলা 'ছদ্মবেশে রাজার রাজ্যপরিভ্রমণ', সুতরাং কিছুটা গোপন ও রহস্যময়। তাই তার যথার্থরহস্য বোঝা ও জানা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। মনের মানুষ ও ভাবের মানুষ যারা—তারাই এ'সবের মর্ম বুঝতে ও জানতে পারে।

●

।। বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ।।

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

আদিম যুগে সমাজের ক্রমবিকাশ আলোচনা করার সময়[১] আমরা দেখেছিলাম—সব সমাজ যে একইভাবে বিকশিত হয়েছিল তা নয়, বরং ঘটনাপ্রবাহ সমাজগুলিতে নানান ধরনের স্রোত ও ঝাঁকের সৃষ্টি করেছিল। আগের আলোচনায় আমরা সমাজ-বিকাশের একটি সাধারণ ধারার পরিচয় পেয়েছি। সেখানে আমরা আরও দেখেছিলাম যে কয়েকটি জাতি অসভ্য ও বর্বর স্তর পার হয়ে নতুন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল সিন্ধু, ইউফ্রেটিস, ইয়াংসিকিয়াং ও নীল নদীর পারে। বাস্তুদ্রব্যে স্বাবলম্বী হয়ে এইসব জাতির সমাজে যে পরিবর্তন দেখা দিল তার ফলে নতুন নতুন চিন্তাভাবনার জনক হয়ে উঠল এরা। এদের এই নতুন চিন্তাভাবনা পরবর্তীকালে অন্যান্য জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে ব্যাপক মিলনের যুগে। কিন্তু এটি শুধু একতরফা অবদান ছিল না, বরং বলা যায় সভ্য ও অসভ্য জাতিগুলির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানেই এ-যুগে সমাজ বিকশিত হয়েছিল।

॥ বিভিন্ন ধরনের সমাজ ॥

প্রথম দিকে প্রাকৃতিক পরিবেশই মানুষকে নানান ধরনের সমাজ গঠনে প্রবৃত্ত করেছিল। স্বামীজীর ভাষায়: "দেশভেদে সমাজের সৃষ্টি। সমুদ্রের ধারে যারা বাস ক'রত, তারা অধিকাংশই মাছ ধ'রে জীবিকা নির্বাহ ক'রত; যারা সমতল জমিতে, তাদের—চাষবাস; যারা পার্বত্য দেশে, তারা ভেড়া চরাত; যারা মরুময় দেশে, তারা ছাগল উট চরাতে লাগলো; কতকদল জঙ্গলের মধ্যে বাস করে, শিকার করে খেতে লাগলো।"[২] কার্ল মার্কস বলেছিলেন অর্থনৈতিক বিষয়ই সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান কারণ, আর ম্যাক্স্ ওবরের মতে সমাজের সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিই অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৩] স্বামীজীর মত বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে প্রথমাবস্থায় প্রাকৃতিক পরিস্থিতি এবং পরে বিভিন্ন সমাজের পারস্পরিক মেলামেশা সমাজের ক্রমবিকাশে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই যে পারস্পরিক মেলামেশা, এটি যুদ্ধের মাধ্যমেও হতে পারে, ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে শান্তির সময়ও হতে পারে। স্বামীজী লিখেছেন—"ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগলো,···মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজেতি চলতে লাগলো। এ সব রকমের মানুষ মিলেমিশে বর্তমান সমাজ, বর্তমান প্রথাসকলের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা রকমে নূতন ভাবের সৃষ্টি হতে লাগলো, নানা বিদ্যার আলোচনা চললো।"[৪] আমাদের পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টির ব্যাখ্যা করা হবে।

১। এই আলোচনা আমরা করেছি 'বিশ্ববাণী' পত্রিকার বৈশাখ—ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ১৩৮০, এই সাতটি সংখ্যায়। সমাজ-বিকাশের তত্ত্ব আলোচনা করে আদিমযুগে কিভাবে অসভ্য ও বর্বর পর্ব পার হয়ে মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করেছে সে-কথা আমরা ঐ সংখ্যাগুলিতে দেখেছি। বর্তমান আলোচনা শুরু হচ্ছে ঐ সময়ের সভ্যতার পরবর্তীকাল থেকে।

২। বাণী ও রচনা, ৬ : ২০২।

৩। Max Weber: *The Protest Ethic and the Sprit of Capitalism*. Allen and Unwin, 1930.

৪। বাণী ও রচনা, ৬ : ২০৩।

আদিম মানুষের সামনে প্রধান সমস্যা ছিল দু'টি—খাদ্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর, সমস্যার সমাধানে তার মূল হাতিয়ার ছিল বুদ্ধি ও সমবেত প্রচেষ্টা। বুদ্ধি দিয়ে পথ আবিষ্কার করে প্রাগৈতিহাসিক মানুষ সমবেত প্রয়াসে তার সকল সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে খাদ্যই তার কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল। আমরা দেখেছি, খাদ্য-সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য-উৎপাদনকারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে মানুষ তার আদিম যুগেই। স্বামীজী তাই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। খাদ্য-সংগ্রহ ও খাদ্য-উৎপাদনে যে দলীয় প্রয়াস চলেছিল সেটিই মানুষকে একটি বিশেষ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলেছিল যার ফলে সমাজের মধ্যে নানারকম রীতিনীতিরও প্রচলন হয়ে উঠেছিল।

মোটামুটিভাবে চার রকম সমাজ আমরা সে-যুগে দেখতে পাই। "যারা সমতল দেশ পেলে"—স্বামীজী বলেছেন[৫]—"[তারা] চাষবাস শিখলে, তারা পেটের দায়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবকাশ পেলে, তারা অধিকতর সভ্য হতে লাগলো।" "জম্বুদ্বীপের তামাম সভ্যতা—সমতল ক্ষেত্রে, বড় বড় নদীর উপর, অতি উর্বর ভূমিতে উৎপন্ন—ইরু-চিকিরু, গঙ্গা, সিন্ধু, ইউফ্রেটিস-তীর। এ সকল সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস।"[৬] ইউফ্রেটিস নদীর তীরে যে সভ্যতা গড়ে উঠছিল তার সাথে স্বামীজী নীল নদের প্রাচীন সভ্যতারও উল্লেখ[৭] করেছেন। অর্থাৎ প্রাচীন চীনা, ভারতীয় আর্য, সুমেরীয় ও মিশরীয় সমাজকে স্বামীজী কৃষিভিত্তিক সমাজ বলে বলেছেন। ইতিহাসে আমরা এর সমর্থন পাই। খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছরের আগেই নবাপ্রস্তরযুগ অতিক্রম করে মানুষের বিভিন্ন দল নীল নদ থেকে শুরু করে ভূমধ্য সাগরের পূর্বতীর বরাবর ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার মধ্যে বহু জনপদের সৃষ্টি করেছিল। এবং এগুলির অধিকাংশই ছিল সুস্থিত কৃষিপল্লী।

বড় বড় নদীর ধারে বর্ষব্যাপী খাদ্যপ্রাপ্তির পরিবেশ মানুষ গড়ে তুলেছিল সেচ-ব্যবস্থার সাহায্যে। ফলে তারা সেখানেই স্থায়ী বসতি গড়ে তুলতে লাগলো। অন্যদিকে ইওরোপের জঙ্গলে ছিল নর্ডিক জাতির লোকেরা যাদের পেশা ছিল শিকার ও পশুপালন। আর ঐ মহাদেশের যে-সব জায়গায় হ্রদ ছিল সেখানে মানুষ মাছ ধরে আর শিকার করে জীবনযাপন করতো। এশিয়ার স্টেপ্‌স্ অঞ্চলে হূণ জাতি বেঁচে থাকতো পশুপালনের সাহায্যে। সিরিয়া ও আরবের মরুভূমিতে সেমিটিক জাতির লোকেরাও ছিল পশুপালক, কিন্তু ইওরোপ ও আফ্রিকার ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সেমিটিক লোকেরা হয়ে উঠলো নাবিক। স্থায়ী বসতি ও কৃষিক্ষেত্র পেয়ে কৃষিজীবী জাতিগুলি পেটের দায় থেকে মুক্তি পেল এবং এর ফলে তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে নজর দিবার অবকাশ পেলো। বিপরীত দিকে শিকারী ও পশুপালক জাতিগুলির এই সুযোগ ছিল না। তারা বেছে নিলো যাযাবরের জীবন। একদিকে পাহাড়ী যাযাবরদের

৫। ঐ ৬ : ২০২।
৬। ঐ ৬ : ২০৪।
৭। ঐ ৬ : ১১৪।

জীবন ছিল শীতের চারণভূমি থেকে গ্রীষ্মের চারণভূমিতে ক্রমান্বয়ে যাতায়াত। আর মরুভূমির যাযাবরেরা এক চারণভূমি থেকে অন্য চারণভূমির খোঁজে কৃষিজীবীদের স্থায়ী বসতির আশে-পাশে ঘুরতো। হ্রদের ধারে যেসব জাতি বাস করতো তারা কৃষিজীবীদের মতো অতটা স্বচ্ছল না হলেও যাযাবর ছিলনা কারণ হ্রদগুলি থেকে তারা সারা বছরই মাছ পেতো। সাগরের তীরে যারা থাকতো তারা নাবিক হয়ে বিভিন্ন দেশে যেতো ব্যবসা-বাণিজ্যে; মোটামুটি স্বচ্ছল জীবন ছিল তাদের। কৃষিজীবী জাতিগুলি স্থায়ী ঘর তৈরীর কায়দা-কানুন আবিষ্কার করে ফেলেছিল। খাদ্যাবস্থার কিছুটা সুরাহা হওয়ায় হ্রদবাসী ও সাগরবাসী লোকেরাও মোটামুটিভাবে উন্নত ছিল। হ্রদবাসীরা অনেকেই জলের ওপর খুঁটি পুঁতে বাড়ি তৈরী করতো। মরুবাসী যাযাবরেরা চারণভূমির লোভে কৃষিজীবীদের বসতির আশেপাশে ঘুরতো বলে পরস্পরের মধ্যে যেমন সংঘর্ষ হতো তেমনি ব্যবসা-বাণিজ্যও কিছু চলতো। সুমেরীয়ার যাযাবরেরা চুরি-ডাকাতিতে ওস্তাদ ছিল।[৮]

	অঞ্চল	অধিবাসী	পেশা	রাজ্যের প্রকৃতি	সমাজ	জ্ঞান-বিজ্ঞান	যুদ্ধের সরঞ্জাম
সভ্য	সমতল, নদী-বিধৌত	ভারতীয়, চীনা-সিমীয়, ব্যাবিলোনীয়	প্রধানত কৃষি; অংশত ব্যবসা	কৃষিপল্লী	পুরোহিত-প্রধান	লিপি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান	পদাতিক সৈন্য, গাধাচালিত র
	সাগর-তীর	এশীয় মাইনর, ক্রীটের অধিবাসী; ফিনিশীয়	মৎস্য-শিকার, ব্যবসা-বাণিজ্য	ছোট ছোট নগর রাষ্ট্র	রাজা প্রধান হলেও রাজতন্ত্র নয়	লিপি, সাহিত্য, নৌ-বিজ্ঞান	নৌ-বাহিনী
অর্ধসভ্য	তৃণভূমি	মধ্য এশিয়ার ষ্টেপ-অঞ্চলের লোকেরা	সাময়িক চাষ-বাস; পশুপালন	রাজা বলে কিছু ছিলনা; ব্যাপক চারণভূমি	দলপতি-প্রধান; যাযাবর	?	অশ্ববাহিনী বর্শা ও তীর-ধনুক
অসভ্য	মরুভূমি	সিরিয়াবাসী	পশুপালন; সাময়িক ব্যবসা	রাজা ছিলনা; যাযাবর	-	ধাতুবিদ্যা	-
	পাহাড়	ইলাম পাহাড় ও চীনের পাহাড়বাসী	শিকার, পশু-পালন, অংশত ব্যবসা	রাজা ছিলনা; পাহাড়ী অঞ্চলে একত্রে থাকতো	দলপতি-প্রধান; অনেকটা যাযাবর প্রকৃতির	ধাতুবিদ্যা, খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে জানতো	-
	বন-জঙ্গল	নগ্নিক জাতি	শিকার	জঙ্গলেরএকাংশে অধিকার কায়েম রাখতো	-	বনজ সম্পদ সম্বন্ধে জানতো	পদাতিক, কিছু ঘোড়া, তীর-ধনুক

৮। এইচ, জি, ওয়েলস্: পৃথিবীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (বাংলা অনুবাদ: সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ও মনোজ ভট্টাচার্য। কোলকাতা, ১৯৫৮), পৃঃ ৫৩।

॥ বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস 'কি তত্ত্বমূলক' ? ॥

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ তিনখানি উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার আর দুইখানি উপন্যাসের তুলনায় 'সীতারাম' উপন্যাসখানির একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল কোনও দিনই গৃহধর্ম কিংবা তাহার স্বামীর সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিতে চাহে নাই। তাহার ফলে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তাহার মিলন নিতান্ত সহজ হইয়াছে, কিন্তু 'সীতারামে'র স্ত্রী স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় তাহার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া তাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার নিরন্তর সাধনা করিয়াছে। কিন্তু তাহার সেই সাধনা যতই আন্তরিক হউক না কেন, তথাপি সে শেষ পর্যন্ত স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করিয়া তাহার নিকট ফিরিয়া আসিয়াছে। তবে জয়ন্তীর আদেশমত স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই। নিজেকে প্রিয়প্রাণ-হন্ত্রী এবং প্রিয় বলিতে তাঁহার স্বামীকে ব্যতীত অন্য কাহাকেও বুঝায় না, ইহা বিশ্বাস করিয়াও সে তীর্থ হইতে স্বামীর সংসারের দিকে ফিরিয়া আসিয়াছে। সুকঠিন জ্যোতিষির ভবিষ্যদ্বাণীও তাহাকে স্বামীর প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টিতে বাধা দিতে পারে নাই। এখানে প্রেম প্রেমাস্পদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়াছে। সুতরাং প্রেমের শক্তি এখানে প্রবলতর বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করিয়াছেন। বহিরায়ত্ত শিক্ষা বা সংস্কার সেই তুলনায় শক্তিহীন, 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন।

বহিরায়ত্ত শিক্ষা এবং সংস্কার যে নরনারীর সহজাত বৃত্তির তুলনায় শক্তিহীন, তাহা 'সীতারামে'র জয়ন্তীর চরিত্রে আরও স্পষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। জয়ন্তীর মনে একটি অহঙ্কার ছিল যে সে নিজে সর্বসংস্কারমুক্ত সন্ন্যাসিনী। ভয়, লজ্জা, সে সব-কিছুই জয় করিয়াছে। নিজের প্রতি এই পরম বিশ্বাস লইয়াই সে শ্রীকেও সেইভাবেই শিক্ষা দিয়া তাহার শিক্ষা করিয়া তুলিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা দৃঢ় হইল। কিন্তু তাহার বিচারের দিনে বেত্রাঘাতের দৃশ্যে তাহার সকল শিক্ষা এবং সংস্কারের মুখোস যে কিভাবে খুলিয়া পড়িয়া গেল, বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সহজভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। জীবনে তাহার পরাজয়ই সব চাইতে শোচনীয় হইল। কারণ, শ্রী শেষ পর্যন্ত সীতারামকে স্বামীরূপে লাভ করিয়া তাহার মৃত্যুশয্যার পাশে স্থান পাইয়া মহিষীর মত গৌরবময় মৃত্যু বরণ করিল, জয়ন্তীর জীবন শেষ পর্যন্ত হাহাকারে পূর্ণ হইল, সে বুঝিতে পারিল, এতদিন সে যাহার সাধনা করিয়াছিল, তাহা সবই মিথ্যা, জীবনে তখন তাহার আর কোনও অবলম্বন রহিল না। তাহার সুদীর্ঘ সাধনার সন্ন্যাসিনী জীবনের অন্তঃসারশূন্যতায় তাহার অন্তর হাহাকারে পূর্ণ করিয়া দিল। এমন বিষাদাত্মক চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য কোনও উপন্যাসে নাই।

'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্লর জীবনে স্বামীপ্রেমে কোনও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল না, স্বামীর প্রতি তাহার পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিল, এমন কি, তাঁহার আর দুই সপত্নী থাকা সত্ত্বেও তাহার স্বামীর প্রেমে তাহার কোনও অবিশ্বাস সৃষ্টি হইবার কারণ ছিল না, স্বামীর সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদের

কারণ কেবল মাত্র বহির্মুখী। কিন্তু শ্রীর তাহা ছিল না, কঠিন অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া স্বামীপ্রেম সে রক্ষা করিয়াছে এবং কেবলমাত্র স্বামীর মৃত্যুশয্যার সঙ্গিনী হইবার গৌরবটুকুই সে লাভ করিয়াছে। এই জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া স্ত্রী-চরিত্রের ক্রমবিকাশ নির্দেশ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা তাঁহার আর কোনও উপন্যাসে দেখা যায় না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৪৯ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম' রচনা করেন। 'সীতারামে'র উৎসর্গ পত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার পূর্ববর্তী দুইখানি উপন্যাসের মতই গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রধানতঃ সেইজন্যই তাঁহার এই উপন্যাসখানি ধর্মতত্ত্বের সমস্যামূলক বলিয়া মনে করা হইয়াছে। এমন কি, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এমন কথাও বলিয়াছেন যে, " 'সীতারামে'ও একটা ধর্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হইয়াছে"। কিন্তু তিনি এই কথাও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, 'কিন্তু এখানেও ধর্মতত্ত্বের প্রাধান্য ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টিকে ক্ষীণ করিতে পারে নাই, পরন্তু চরিত্রের সূক্ষ্ম-পরিবর্তন সংঘটনে ও তাহার কারণ বিশ্লেষণে গ্রন্থকার আশ্চর্য নিপুণতাই দেখাইয়াছেন'।[১] সুতরাং যে উপন্যাসে 'চরিত্রের সূক্ষ্ম পরিবর্তন সংঘটনে গ্রন্থকার আশ্চর্য নিপুণতা দেখাইয়াছেন, সেখানে উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সার্থকতাই প্রত্যাশিত এবং তাহাতে বাস্তব জীবনই প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে পারে, ধর্মতত্ত্বের সমস্যা কদাচ সেই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হইতে পারে না। এখানেও ধর্মতত্ত্বের যেটুকু আলোচনা আছে, তাহা নিতান্তই উপন্যাসের বাহিরের বিষয়, তাহা কখনও ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলির অন্তর স্পর্শ করিয়া কাহিনীর ধারা কিংবা চরিত্রগুলির পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে নাই। সুতরাং এখানেও ধর্মতত্ত্বের সমস্যাই উপন্যাসের প্রকৃত বিষয় হইতে পারে না, এখানেও তাহা যেমন পারে নাই, কোনও ক্ষেত্রেই তাহা পারে না।

মানুষের জীবনে অতৃপ্ত ক্ষুধাতৃষ্ণা এবং অসংযত ইন্দ্রিয় লালসা কি দুর্জয় শক্তি ধারণ করিয়া যে তাহাকে উদ্দামবেগে এক নির্মম পরিণতির সম্মুখীন করে, 'সীতারাম' উপন্যাসের সীতারাম এবং গঙ্গারামের চরিত্রের মধ্য দিয়া তাহাই দেখান হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোনও নীতি কিংবা ধর্মতত্ত্বকথা নাই। ইহাতেও উপন্যাসের কোনও কোনও চরিত্র ধর্মের কথা মুখে বলিয়াছে কিংবা আপাতদৃষ্টিতে আচরণ করিতেও দেখা গিয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহাদের মুখের কথা কিংবা তাহাদের ব্যবহারিক আচরণ দ্বারা চরিত্রসৃষ্টি কিংবা কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে নাই। উপন্যাসখানি পাঠ করিলে কোনও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ের প্রতি পাঠকের মন আকৃষ্ট হয় না, মানবিক বৃত্তির দুর্জয় শক্তির নিকট অসহায় মানুষের পরাজয়ের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই বৃত্তি যে মহান্ আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ চরিত্রকেও নিজের হীন দাসত্বে পরিণত করিয়া তাহার সকল মাহাত্ম্য হইতে তাহাকে বিচ্যুত করিয়া তাহাকে ধরাশায়ী করিয়া দিতে পারে, সেইজন্যই ইহাতে 'সীতারামে'র মত চরিত্রের পরিকল্পনা করা হইয়াছে।

১। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ১১।

গঙ্গারামও সৎ প্রকৃতির লোকই ছিলেন। তিনিও চরিত্রবান্ এবং তিনি সত্যনিষ্ঠ আদর্শ পুরুষই ছিলেন। রমা যখন তাহাকে গোপনে অন্তঃপুরে ডাকাইয়াছিল তখন সে তাহা রাজপরিবারের আদেশ বলিয়াই তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিল। তারপর রমা যখন তাহার নিকট তাহার শিশু সন্তানকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পণ করিবার পরামর্শ দিল, তখন গঙ্গারাম শিহরিয়া উঠিয়া—বলিল, 'মহারাণি। আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন বল্লেন—আর কখন কাহার সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।'

সুতরাং গঙ্গারাম সৎ এবং আদর্শ চরিত্র ব্যক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, গঙ্গারাম কিংবা রমা 'কাহারও মনে কোনও মলা নাই।' কিন্তু সেই মুহূর্তেই গঙ্গারামের মনে যে 'মলা' প্রবেশ করিল, তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না। তাহা তাহার মনে এ'যাবৎ অনড় থাকিয়া, নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিল, তাহা রমার মুহূর্ত দর্শনেই এমন সৎ এবং আদর্শ-চরিত্র ব্যক্তির মনের মধ্যেও মুহূর্তে সক্রিয় হইয়া উঠিয়া এক বিধ্বংসকারী প্রলয়ের শক্তি লাভ করিল। তারপর তাহা অনিবার্য গতি লাভ করিয়া তাহার সর্বনাশ ত্বরান্বিত করিয়া তুলিল।

সীতারামের তাহাই হইল। পরোপকারী, সৎ, ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ সীতারামের মনের রূপতৃষ্ণা শ্রীকে দর্শন মাত্রই মুহূর্তে উজ্জীবিত হইয়া উঠিল, তারপর হইতেই তাহার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান ও কর্ম কেবলমাত্র শ্রীর রূপ কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

●

॥ মীরার কৃষ্ণ ভাবনা ॥

ডক্টর শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রাজস্থানের মরুপ্রান্তে, যেখানে বিনা বর্ষণেও গোধূম উজ্জীবিত হয়, সেই মালবের দেহলন্ন প্রাচীন রাজ্য মেদপাট, ইতিহাসে যার নাম মেবার বা মেওয়ার। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মেবারের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার পরিচয় বিধৃত আছে। দিল্লীর সুলতান আলা-উদ্-দীনের সৈন্যবাহিনী যেদিন তাবৎ ভারতবর্ষে হিমালয় থেকে সেতুবন্ধরামেশ্বর পর্যন্ত ইসলামের পতাকা তুলেছিল সেইদিন হিন্দু স্বাধীনতার এবং সেইসঙ্গে ভারত সংস্কৃতির প্রবহমান ধারার প্রথম পূর্ণচ্ছেদ ঘটে। এই ঘটনার পরে অনেক রাজশক্তিই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে আত্মস্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস করেছে; কিন্তু একমাত্র মেবার ভিন্ন আর কোন শক্তির পক্ষেই এই প্রয়াসে সাফল্য অর্জন করা সম্ভবপর হয়নি। জনশ্রুতিতে মেবারের পদ্মিনীর কাহিনী অতি ব্যাপক প্রচার লাভ করে থাকলেও অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই কাহিনীর মূলে কোন ঐতিহাসিকতা নেই। পদ্মিনীর রূপলাবণ্যের খ্যাতি আলা-উদ্-দীনকে মেবার আক্রমণে প্রবুদ্ধ না করে থাকলেও সুলতানের মেবার আক্রমণের ঘটনা সত্য এবং সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধের পরই যে চিতোর দুর্গের পতন ঘটেছিল এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চিতোরের পতনের পর এখানে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত প্রাচীন ওহিলোট বংশের অবসান ঘটে। যে পৈশাচিক বর্বরতার সঙ্গে খল্‌জি সৈন্য চিতোরে হত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল তার কিছু বিবরণ পর্যটক বার্‌নি ও ঐতিহাসিক ফিরিস্তার রচনায় বিধৃত হয়ে আছে। প্রাচীন ওহিলোট বংশের আর একটি শাখা রাজস্থানেরই সেশোদা নামে অন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করত। এই বংশের বিশ্রুতকীর্তি বীর হাম্মীর (১৩২৬-১৩৬৪ খ্রীঃঅব্দ) সম্ভবত দিল্লীর তুঘলক সুলতান ঘিয়াস্-উদ্-দীনের আমলে মুসলমানদের হাত থেকে চিতোর পুনরুদ্ধার ক'রে সেখানে শিশোদিয়া বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘটনার পরে মেবারকে অবলম্বন ক'রে ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নূতন যুগের প্রবর্তন হয়। ভারতে মুসলমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর দক্ষিণে সাময়িকভাবে দেশরক্ষাশক্তি হিসেবে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও বিলয় ঘটে ছিল। এছাড়া একমাত্র মেবারই ছিল অন্যতম দেশজ শক্তি, যারা মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল পর্যন্ত পূর্ণ আত্ম স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অপ্রমেয় মুঘল শক্তির বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহের প্রতিরোধের কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে আছে। পরে জাহাঙ্গীরের নিকট অধীনতা স্বীকার করলেও অমিতপ্রতাপ ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে মেবার অধিপতি রাজসিংহের উত্থান ও স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ ভারতের প্রবহমান সংস্কৃতির কাল উত্তরণের এক বিস্ময়কর অধ্যায় সন্দেহ নেই। সমগ্র হিন্দুস্থানের প্রাচীন সংস্কৃতি যখন ধর্মান্ধ ঔরঙ্গজীবের বিধ্বংসী প্রয়াসের সম্মুখে বিলীয়মান তখন মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শিবাজী এবং মেবারের রাজসিংহ এই সংস্কৃতির রক্ষাকল্পে অমিতবিক্রমে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন।

এই শিশোদিয়া বংশের অন্যতম খ্যাতিমান নরপতি মহারাণা কুম্ভের রাজমহিষী মীরা ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। বিস্তীর্ণ রাজপাট, ও প্রভূত আড়ম্বরে

আকীর্ণ জীবন। কিন্তু রাজমহিষীর চিত্তকে কে যেন আকর্ষণ করে, তার দূরশ্রুত গোপবেণুর ধ্বনিতে। কে যেন তার কোমলকান্ত শ্যামরূপে ক্ষণে দর্শন ক্ষণে অদর্শন ঘটিয়ে আপ্লুত ক'রে তুলেছিল মীরার হৃদয়তন্ত্রীকে। পরম আবেগ নিয়ে রাজমহিষী আবেদন জানিয়েছিলেন স্বামীর নিকটে—প্রভু আমাকে সেই পরম আরাধ্য শ্যামরূপ দর্শন করাও। রাজকার্যের ফাঁকে ফাঁকে রাণা কুম্ভের হৃদয়েও হয়ত শ্যামরূপের কিছু আকর্ষণ ছড়িয়েছিল। কুম্ভের চরিত্রে সংমিশ্রিত হয়েছিল পূর্বপুরুষ হাম্মীরের ক্ষাত্রতেজ আর লক্ষরাণার রূপপিপাসা আর কাব্যপ্রবণতা। মালবের খল্‌জী সুলতান মহম্মদ সেবার চিতোর আক্রমণ করলে রাণাকুম্ভ তাকে পরাজিত ও বন্দী ক'রে আপন শৌর্য যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তেমনি সেই পরাজিত শত্রুকে সসম্মানে মুক্তি দিয়ে প্রবহমান ক্ষাত্র-সংস্কৃতির মহনীয়তারও পরিচয় দিয়েছিলেন। কুম্ভের এই কীর্তির উল্লেখ আছে তার প্রতিষ্ঠিত চিতোরের গগনচুম্বী 'বিজয়স্তম্ভে'। কুম্ভরাণার স্থাপত্য প্রীতির আরও পরিচয় আছে নিজ নামে প্রতিষ্ঠিত নূতন দুর্গনগরী 'কুম্ভলমীরে'। আর তাঁর সাম্প্রদায়িক ঔদার্যের পরিচয় আছে সাদ্রি গিরিপথে প্রতিষ্ঠিত জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মন্দিরে। কিন্তু বৃন্দাবনের নটচূড়ামণিও যে রাণার হৃদয়তন্ত্রীতে গোপবেণুর অনুরণন সৃষ্টি করেছিল তার সাক্ষ্য রেখেছেন রাণার অনুগ্রহধন্য জৈনকবি নয়চন্দ্রসূরী তাঁর রচিত 'কুম্ভকর্ণ বসন্তবিলাস কাব্য' নামক কাব্যে।

জিস্ বৃংদাবনি পাবনি, হরষিত গোপীর বৃংদু।
কাহ্নডু তিম আনংদউ, নংদউ কুংভ নরিংদু॥

জনশ্রুতি আছে এই কুম্ভরাণাই রাজমহিষীর প্রেরণায় চিতোর নগরীতে বিখ্যাত 'কুম্ভশ্যাম' নামে কৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যদিও মেবারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর বাপ্পাদিত্যের দীক্ষাগুরু শৈব সন্ন্যাসী লাকুলিশ পন্থী হারিত রাশির উপাস্য একলিঙ্গজীই ছিলেন মেবার রাজবংশের কুলদেবতা, তা হলেও রাণা কুম্ভ মনেপ্রাণে একান্তই কৃষ্ণভক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

নানা গুণরাজিতে সমৃদ্ধ রাণার উপযুক্ত সহধর্মিনী ছিলেন রাঠোর বংশের মৈরতা শাখার কুলকন্যা মীরা। রাণা নিজে কবিখ্যাতিতে পরিচিত থাকলেও আপন অধিকারেই মীরাও ছিলেন বঙ্গ-হৃদয় আলোড়নকারী কাব্যসঙ্গীতের রচয়িত্রী। কীর্তিমান শাসক রাণা কুম্ভ রাজকার্যের দায়িত্ব থেকে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি সত্ত্বেও নিজেকে বিচ্যুত করেন নি; এই কারণেই রাণার সঙ্গে মীরার মতান্তর, মনান্তর ও শেষপর্যন্ত রাজপাট অনায়াসে পরিত্যাগ করে মীরার বৃন্দাবনে আশ্রয়গ্রহণের কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল। রাজপুত চারণকুল প্রচারিত অসংখ্য কল্পনাবিলাসের মধ্যে মীরার জীবনকাহিনীতে কতটুকু নিখাদ সত্য আছে তার নির্ধারণ সম্ভবপর না হলেও রাজরাণী মীরা যে তাঁর প্রাণ, মন, দেহ বৃন্দাবনের রসবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চরণে উৎসর্গ করেছিলেন, দীর্ঘ অর্দ্ধসহস্র বৎসর পরেও জনচিত্তে সে স্মৃতি এখনও সমুজ্জ্বল। চিতোরে প্রতিষ্ঠিত শ্যামের মন্দিরে মীরা তার দয়িতের সঙ্গে ক্রীড়াচ্ছলে শুনেছিলেন তাঁর আহ্বান; জনশ্রুতি আছে আপন সিংহাসন থেকে নেমে এসে প্রেমালিঙ্গনের প্রসাদ দিয়ে মীরার প্রভু তাকে

তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাছে [The God descended from his pedestal and gave her an embrace which extricated the spark of life. 'Welcome Mira'. Said the Lover of Rādhā and her Soul was absorbed into his— Tod, J., Annals and Antiquities of Rajasthan, 1845 Edn, Vol II, p. 607].

মীরার প্রাণ, মন, দেহ এমনি করে কৃষ্ণবিগ্রহে সমর্পণের মধ্যে সম্ভবত ইতিহাসের এক গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত নিহিত ছিল যার সুস্পষ্ট প্রতিমূল্যায়ন এখনও হয়নি। মীরার এই জীবন পর্যালোচনায় যে প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ তা হল মীরার পরম প্রেমাস্পদ এই 'কৃষ্ণনামের' আত্যন্তিক পরিচয় সম্পর্কে।—একলিঙ্গ শাসিত মেবার রাজ্যের রাজমহিষী মীরার জীবনে এই কৃষ্ণনামের যোগাযোগ ঘটেছিল কোনপথে? পুরাণপুরুষ ভগবান কৃষ্ণকে বিষ্ণুপুরাণ বলেছেন মায়ামানব। সম্ভবত এই মায়ামানব কৃষ্ণেরই প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদে, যেখানে তার পরিচয় ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য, ভগবান সূর্যের উপাসক, দেবকীর পুত্র হিসেবে। এরপর শ্রীকৃষ্ণের জীবন পারুষ্যের প্রতি আলেখ্য রূপায়িত আছে মহাভারতে, যেখানে তাঁকে সকল সাধনার শেষ ফলশ্রুতি পুরুষোত্তমরূপে বর্ণনা করা হয়েছে—

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥　　শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১৫/১৮

ভারত সংস্কৃতির ইতিহাসে, ভারতীয় ধর্ম সাধনায় কৃষ্ণ উপাসনার উদ্ভব ও কালবৃত্তের অনুসন্ধানে ভারতীয় ও বৈদেশিক বহু পণ্ডিতের প্রয়াসই লক্ষ্য করা যায়, যেখানে কৃষ্ণভাবনার বিবর্তনের উপর ব্যাপক আগ্রহ এবং গভীর বিষয়বোধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই কৃষ্ণভাবনা যে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় অসংখ্য বিশ্লেষণকারীর কৃষ্ণজিজ্ঞাসায়। এই বিশ্লেষণপথেই স্বনামখ্যাত পণ্ডিত স্যার রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে বিদেশাগত আভীররাই খ্রীষ্টধর্মের প্রভাবে ভারতে কৃষ্ণোপাসনার প্রবর্তন করেছিল [Bhandarkar, R. G. Vaishnavism, Saivism and minor Indian Cults p. 17] তৎকালীন ঔপনিবেশিক শাসকেরা ভাণ্ডারকারের পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিতে তাঁকে সম্মানসূচক নাইট উপাধিতে ভূষিত করে থাকলেও কৃষ্ণ উপাসনা সম্পর্কে তাঁর এই মত তেমন সমর্থন পায়নি; তবে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণ উপাসনাকে অনেকেই অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত বলে বিবেচনা করেছেন। মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি সুপ্রাচীন উপকরণসমূহে কৃষ্ণভাবনার বিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও ভাগবত পুরাণেই গোপীজনবিমোহন ভগবান কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার বিস্তৃত ব্যাখ্যানের ভেতর দিয়ে শ্যামরূপী কৃষ্ণের উপাসনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। এই ভাগবত পুরাণ কিন্তু খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। আর এই ভাগবতবিহিত বৈষ্ণবধর্মের কোনও স্বীকৃতিও বোধহয় এর পূর্বে উচ্চতর রাজন্য বা পুরোহিত-ব্রাহ্মণ সমাজে ছিল না। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার জনৈক ভারততত্ত্ববিদ হপকিন্সের (T. J. Hopkins) একটি উক্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণের উপাসনা সম্পর্কে হপকিন্স বলছেন—এই উপাসনা 'definitely does not represent the view point of the established orthodox Social and economic groups'. তাঁর মতে এই বৃন্দাবন-কৃষ্ণের উপাসনা কেবল যে গোঁড়া ও

অথবান সমাজের অনুমোদিত ছিল না তাই নয়, এইসব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা গোপালকৃষ্ণের ভক্তিমূলক উপাসনার ঘোর বিরোধী ছিলেন—"The wealthy, learned and influential supporters of the Status quo appear to be the prime opponents of the devotional religion as it appears in the Bhāgavata". [Hopkins, T. J.—The Social teachings of the Bhāgavata Purāna in Krishna Myths, rites and attitudes—Edited by Milton Singer, Chicago, 1966, p. 21] ভারত-সংস্কৃতিতে ভগবান কৃষ্ণের প্রভাব নিয়ে পাশ্চাত্যে বিচার গবেষণার কোন বিরতি নেই : ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে হপকিন্সের এই মন্তব্য নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নেই।

যদিও 'ভাগবত' বলতে বর্তমানে বৈষ্ণবদেরই পরিচয়রূপে গণ্য হয়ে থাকে, তা হলেও ভাগবত-পরিচিতি চিরকালই বৈষ্ণবদের একচেটিয়া ছিল না। সুপ্রাচীন কিছু দলিলে, সাহিত্যে এবং শিলালেখে বুদ্ধদেবকে ভগবান, এমনকি কোন কোন যক্ষকেও ভগবান বলে অভিহিত হতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে এক সম্প্রদায়ের শৈবরাও 'শিবভাগবত' নামে অভিহিত হত। তবে মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতাতে বর্ণিত ভগবান কৃষ্ণকে অবলম্বন করে যে বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তন ঘটেছিল সেই ধর্মই ব্যাপকভাবে ভাগবত ধর্মনামে স্বীকৃতি লাভ করে। ঐতিহাসিক যুগে গুপ্তবংশের প্রথম চক্রবর্তী সম্রাট সমুদ্রগুপ্তকে তার প্রশস্তিকার রাজসভার হরিষেণ অচিন্ত্যপুরুষ বা কৃষ্ণ বাসুদেবের প্রতীক বলে অভিহিত করেছিলেন। এরপর গুপ্তবংশের উত্তর পুরুষেরা সকলেই নিজেদের পরমভাগবত বলে অভিহিত করে গিয়েছেন। বস্তুত এই যুগ থেকেই সম্ভবত বৈষ্ণবেরা ভাগবত নামে পরিচিত হতে থাকে। পূজা বা উপাসনার প্রয়োজনে বিষ্ণুরূপী বাসুদেবের মূর্তি কবে প্রথম প্রচলিত হয়েছিল আজও তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। তক্ষশীলার যবন (গ্রীক্) অধিপতি অ্যান্টি আলকিডাসের দ্বারা বিদিশায় কাশীপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত রাজদূত হেলিওডোরাস প্রাচীন বিদিশায় (বর্তমান মধ্যভারতের বেশনগরে) ভগবান বাসুদেবের প্রীত্যর্থে একটি গরুড় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শীর্ষদেশে গরুড় মূর্তি শোভিত এই ধরণের স্তম্ভ সাধারণত বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করার রেওয়াজ ছিল। এই যুক্তিতে মনে হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত বিদিশার এই স্তম্ভটির সঙ্গে একটি মন্দিরেরও অস্তিত্ব ছিল যে মন্দিরে বাসুদেব বিষ্ণুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের কোন কোন মুদ্রায় শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-হস্ত, চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তির বর্তমানতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে কনিষ্কের আমল, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই বাসুদেবরূপী বিষ্ণুর মূর্তির প্রচলন হয়েছিল। অনেকে মনে করেন বৈষ্ণব ধর্মের ব্যূহবাদ থেকে মূর্তির পরিকল্পনা, বিকাশ ও উপাসনার প্রবর্তন ঘটেছিল। এই ব্যূহ পরিকল্পনায় বাসুদেব কৃষ্ণ ছাড়া সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ, বৃষ্ণিকুলের এই চতুর্বীরকে পরাশক্তি বিষ্ণুর অভিপ্রকাশ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশ্য এঁদের মধ্যে বাসুদেব কৃষ্ণকেই প্রধান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকার করা এবং ব্যাপকভাবে অচিন্ত্যপুরুষরূপে তাঁর উপাসনারই ব্যাপক স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। [ক্রমশঃ]

।। অবক্ষয় ও পুনরুজ্জীবন ।।

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি গভীর ভাব-রসের মানুষ এবং ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতি-ধর্ম ও দর্শনের উদ্গাতা ও ব্যাখ্যাতা। আমাদের কথাবস্তু ছিল সম্প্রতি-কালের সার্বিক অবক্ষয় সম্পর্কে। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত ক্ষণকাল এই আলোচনায় যোগ দিয়ে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মৌলিক অবদানের বর্তমান অভাব সম্পর্কে হতাশা জ্ঞাপন ক'রে উঠে পড়লেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বললেন: 'যে অবক্ষয়ের সামনে এসে আমরা পৌঁছেছি তাতে আশঙ্কা হয়—হাজার হাজার বছরের গ'ড়ে ওঠা ভারতীয় সংস্কৃতির গগনচুম্বি প্রাচীরগুলি অলক্ষ্যে কবে না-জানি একেবারেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।' তাঁরপক্ষে এরকম আশঙ্কার হেতু নিরর্থক নয়। তিনি একাধারে ধর্মতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক। জ্ঞানলব্ধ বহু বিষয়—যা বহু শতাব্দীব্যাপী এদেশের সাধারণ মানবমনের অনধিগম্য ছিল—তার একটা বিশেষ অংশকে নানা ব্যঞ্জনায় ও ভাবার্থে সাজিয়ে নতুন ক'রে যথাযথ পরিবেশন করার কৃতিত্ব তাঁরই। তাই সামূহিক জ্ঞানমার্গের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশঙ্কাও তাঁকেই বেশী ক'রে আলোড়িত করা স্বাভাবিক।

বললাম: 'যদিও নতুন ক'রে কোনোকিছুর পুনরুজ্জীবন কঠিন, কিন্তু অসম্ভব ব'লে বিশ্বাস করবো না। কারণ ভারতে নানা সময়ে নানা আকারে অন্ধকার যুগ এসেছে, আবার অপসারিতও হয়েছে। তবে আমাদের জীবনবৃত্তে সেই বিবর্তন হয়তো দেখে যেতে পারবো না।'

কিন্তু একথা ভাবতেও কষ্টবোধ হয় বৈকি। যদি অবক্ষয়ের পথেই আমাদের জীবনান্ত ঘটে, তবে কী রেখে যাবো আমরা উত্তরপুরুষের উদ্দেশ্যে?

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বললেন: 'কিছু লিখুন আপনি এই নিয়ে।'

জানি—আমার লেখনী ও চিন্তাধারার উপর তাঁর বিশ্বাস আছে, তাই এই স্নেহসিক্ত আদেশ। কিন্তু কিভাবে লিখলে শুধু লেখার জন্যেই লেখা নয়, সেই লেখা দিয়ে মানুষের মনে একটা সাংস্কৃতিক আন্দোলন গ'ড়ে তোলা যায়, সেইটেই প্রশ্ন। এই আন্দোলন মানেই একটা সার্বিক জাগরণ। আর সেই জাগরণ মানেই অবক্ষয়ের কুহেলি-কুজ্ঝটিকার কুটিল গর্ভ থেকে সমূহ সুন্দরের পুনরুজ্জীবন। সেই পুনরুজ্জীবনের একমাত্র আশ্রয় যখন মানুষেরই শিল্পীগত মন, তখন সেই মানুষের মানসিক সুকুমারবৃত্তি ও শিল্পচেতনার উন্মোষন চাই সর্বাগ্রে।

বর্তমানে যে অবস্থার মধ্যে আমরা রয়েছি, তাতে বারবার মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কাব্যনাট্যে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের একটি উক্তিকে। দুরাচার সন্তান দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে গান্ধারী যখন আবেদন করছেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র বলছেন: যখন 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে', তখন 'ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে।' আজ সেই অবস্থা চলেছে

আমাদের সমাজের সর্বত্র। 'Sin is multiplied by sins and therefore it is vain to compromise with Virtue and Religion.' কিন্তু তাই কি? শুধু 'মিছে' বা 'vain' বলেই কি আমরা থেমে থাকবো, না তার বিরুদ্ধে আমাদের বিচার-বুদ্ধির উন্নত খড়্গ নিয়ে সাংস্কৃতিক সমরে অবতীর্ণ হবো?

সম্প্রতি অপসংস্কৃতিরোধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টা যতটা প্রশংসনীয় ছিল, ততটা কার্যকরী হয়নি। যাকে দ্রুত আইনের অধীনে এনে উচ্ছেদ করা প্রয়োজন, তাকে শুধু বিজ্ঞাপন বা প্রচারের মাধ্যমে বন্ধ করা সম্ভব নয়। আইনও যতক্ষণ না ব্যবহারিক হয়, ততক্ষণ তার মূল্য নেই। সমাজের কল্যাণ ও জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার দ্বারা দেশের সার্বিক মঙ্গলের জন্য যেমন চাই শক্তিশালী ও দরদী প্রশাসন, তেমনি চাই দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজের স্বতঃপ্রণোদিত শুভ-কর্মশক্তির উন্মেষ ও সহযোগিতা।

বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে ভারতের সর্ববিদ্যা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র পৃথিবীকে নানাভাবে আলোকের সন্ধান দিয়েছে। পৃথিবীর নানা দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু মানুষ যুগে যুগে ছুটে এসেছে ভারত আবিষ্কারে। ইতিহাসবেত্তাদের কাছে তার কোনো একটি পর্বই অজ্ঞাত নয়। সেই আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই ভারতের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে পৃথিবীর নানা দেশের। কত জনপদ সমুদ্র গ্রাস ক'রেছে, কোণারকের ভাস্কর্যের মতো কত সমুচ্চ মন্দির ধ্বংস হয়েছে, ভূমিকম্পে ও অগ্নিকাণ্ডে কত পুঁথি ও তাম্রলিপির অবলুপ্তি ঘটেছে, কত সম্রাট ও নবাবের অঙ্গুলিহেলনে কতবার কতদিকে ধর্মের চাকা ঘুরেছে, কিন্তু তারমধ্যেও ভারত চিরকাল তার সার্বভৌম প্রজ্ঞার দীপশিখাটি সযত্নে পৃথিবীর সামনে উঁচিয়ে ধ'রে বলেছে: চরৈবেতি, চরৈবেতি। আজ যদি তার সর্বদিকের অবক্ষয় পৃথিবীর কাছে ভারতকে হীনমন্য করে, তারমতো লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

শুধু পৃথিবীর কাছে ভারতকে হীনমন্য করাই নয়, নিজের ঘরেই নিজে দেউলে হ'য়ে যাওয়া। আজকের জাতীয় চরিত্রের এইটেই প্রধান দিক। কিন্তু কোনো ঘটনাই কোনো কারণশূন্য নয়; প্রতি ঘটনার পশ্চাতে সূক্ষ্ম বা স্থূল কিছু কারণ অবশ্যই থাকে। সেই কারণই ক্রমে বিষয়কে ঘটনায় পৌঁছে দেয়। বহু শতাব্দী ধ'রে ভারত তুর্কী, পর্তুগীজ, মোঘল ও ইংরেজ-শাসনের অধীনে থাকার পর যখন স্বাধীনতা অর্জন করলো, সে স্বাধীনতাও এলো দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের উপর দিয়ে। লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষে ভ'রে গেল সারাদেশ। গৃহ নেই, খাদ্য নেই, শিক্ষা নেই, জীবিকা নেই। এই এতকিছু 'নেই'-এর মধ্যেও দেখা গেল—প্রশাসনক্ষেত্রে দুর্বলতা, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে গোষ্ঠীগত পক্ষপাতিত্ব, শিক্ষার নৈরাজ্য, আইনপরিষদ থেকে শুরু ক'রে সর্বত্র অশ্লীল উক্তি ও আচরণ, কর্মক্ষেত্রে ঔদাসীন্য ও পলায়নী মনোবৃত্তি, দেশের মধ্যে অগণিত রাজনৈতিক দলের উত্থান,—তারমধ্যেই পারস্পরিক দলগত বিরোধ ও শ্রেণীসংগ্রাম, যুবক ও ছাত্রসমাজের উপর রাজনৈতিক দলগুলির বিভ্রান্তি সৃষ্টি, এবং এরকম অজস্র ঘটনা—যা সমাজতাত্ত্বিক ব্যক্তিমাত্রের কাছেই একটা বৃহৎ স্ট্যাটিস্টিক্ হিসেবে বিবেচিত। মাত্র তিনদশকের এতবড় মহামৃত্যুযজ্ঞের শ্মশানদৃশ্য পূর্বাপর কোনো ইতিহাসে

বোধকরি এতবড় ক'রে দেখা যাবে না। এ মৃত্যু সার্বিক মৃত্যু; চিন্তায়-মননে, ব্যবহারে-আচরণে, চলনে-বলনে, বিশ্বাসে-ঐতিহ্যে, সভ্যতায়-সংস্কৃতিতে, অর্চনায়-অনুষ্ঠানে, পাঠে-অধ্যয়নে —সর্বব্যাপী সামূহিক মৃত্যু। যৌথপরিবারের বিলুপ্তি তো কবেই ঘটেছে! যে মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে শিল্পী, সাহিত্যিক, দার্শনিক, ধর্মপ্রবক্তা প্রভৃতি উত্থিত হ'য়ে একদা দেশকে নব নব ভাবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই মধ্যবিত্ত সমাজ আজ যক্ষাক্রান্তের মতো কলগ্রস্ত। অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে বাঙালী আজ বহির্বাসে অঙ্গ আচ্ছাদন ক'রে কোনোভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যর্থ প্রয়াস পাচ্ছে। তার পূজামণ্ডপে তাই পূজা নেই, আছে আড়ম্বর, মাইকে অবিরাম ধ্বনিত হয় হিন্দী ও পশ্চাত্যের রুচিবিগর্হিত সঙ্গীত। কোনো কোনো মনীষী একেই বলেছেন— **Culture of the decaying period.**

অথচ মাতৃসাধনা ও মাতৃসঙ্গীতের পবিত্রক্ষেত্র এই বঙ্গভূমি। আমরা ইতিমধ্যেই জাতীয় ঐতিহ্যবোধের ক্ষেত্রে ভুলে গেছি রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে। সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ যখন আক্ষেপ করেন যে, রামপ্রসাদী সুর বিকৃতভাবে পরিবেশিত হচ্ছে, তখন দু'কান সজাগ রেখে একথা বলতে বাধা নেই যে একদা যে রামপ্রসাদী সুর বাংলার বায়ুহিল্লোলকে মধুসিক্ত করেছে, শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে এনেছে মহামায়ার মাধুর্য, এমন কি রবীন্দ্রনাথকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে, সেই রামপ্রসাদ এখন বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে পুরোপুরি বর্জিত। বাংলার পূজামণ্ডপে তাই মাতৃসঙ্গীত নেই, যা এখন কালীগলির খুঁটেকুড়োনী। আসলে বাঙালীত্বই আজ একটা দারুণ সংশয় ও বিতর্কিত হ'য়ে উঠেছে। বিকৃত রাজনীতির দলীয় শিকার হ'য়ে বাঙালী এখন বিভিন্ন দল ও মতের ধ্বজাবাহী হ'য়ে বঙ্গচেতনাকে রি-এ্যাক্শনারী ভাববোধের আস্তাকুঁড়ে, নিক্ষেপ ক'রে প্রগতিবাদী অগ্রগতির ফেস্টুনে বড় বড় অক্ষরে নিজেদের নাম লিখিয়ে তর্কশাস্ত্রের উত্তুঙ্গশিখরে আত্মপ্রাধান্য ও আত্মপ্রসাদে বিমোহিত। অথচ একথা সমস্ত তর্কবহির্ভূত যে, জাতি ও জাতীয়বোধই মানুষকে আন্তর্জাতিকতায় পৌঁছে দেয়। এই বোধ নেই বলেই বাঙালী আজ বাঙালীত্ব হারিয়েছে। দেশে, বিদেশে নানা প্রদেশে প্রচণ্ড মার খেয়েও সে-মার হজম ক'রে নিজেকে শম্বুকের মতো নিজের মধ্যে জড়ত্বের বন্ধনে সঙ্কুচিত ক'রে রেখেছে। অথচ এই বাঙালীই একদা সারাভারত তথা বিশ্বকে সার্বিক চেতনায় নিজের দিকে আকর্ষণ করেছে। বাঙালীয়ানা এখন শুধু অপরের কাছে নয়, তার নিজের কাছেও প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট, অথচ এই ভূমিতেই জাত সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির ইন্ধন সংগৃহীত হচ্ছে এখান থেকেই।

বাঙালীয়ানা বা বাঙালীত্ব যে প্রাদেশিকতা নয়, সেই কথাটি বঙ্গবাসীকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। বাঙালীত্ব হচ্ছে এমন একটি সার্বভৌম মানবিক বোধ—যা সমগ্র বিশ্ব-ভারতকে আবৃত ক'রে আছে। সেই সার্বভৌমত্বের উদ্গাতা হচ্ছেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর থেকে শুরু ক'রে শ্রীচৈতন্য-রামমোহন-রামকৃষ্ণ-বিদ্যাসাগর-কেশবচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ প্রভৃতি বঙ্গমহাজনবৃন্দ। সর্বভারতের ক্ষেত্রে এমন লোকোত্তর মহাজনের অভাব কি? তাঁদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে পৃথিবীর বহু বহু মনীষী ও মনস্বিনী ভারতীয়তা ও

বাঙালীয়ানা গ্রহণ ক'রে এদেশের মাটিকেই মা ব'লে চিনেছিলেন। সেই মাতৃময়ী মাটির ভবিষ্যৎ সন্তানদের জীবনে সাম্প্রতিক মাতৃবোধহীনতা পরম লজ্জার ও পরিতাপের বিষয় ভিন্ন আর কিছুই নয়। সন্দেহ নেই যে, বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই এরজন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী। কিন্তু সেইসঙ্গে জাতীয় চরিত্রও কি সমধিক দায়ী নয়? 'পাপের দুয়ারে পাপ সহায় মাগিছে', কিন্তু প্রবল চুম্বকের মতো পাপ আকর্ষণ করলেই কি তার ইস্পাত-নগরে ধরা দিতে হবে? আসলে মানুষের মনের মধ্যে যে 'Satan' বাস করে, সে চায় বারবার তার Rationality-কে খর্ব ক'রে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে; Satan নানাভাবে নানারূপে প্রলুব্ধ করে মানুষকে। জাতির কোনো দুর্বলতর সময়ের জন্যে তার প্রতীক্ষা থাকে ধৈর্যের। সেইসময় উপস্থিত হ'লেই Satan Rationality-র মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করে, মিল্টনের Paradise Lost-এর ভাষায় সে বলে: 'It is better to reign in Hell than to serve in Heaven'. জাতির এই চরমতম দুর্বলতার সময়টা হচ্ছে সেই Satan-এর আত্মপ্রকাশের মহালগ্ন। আজকের জাতীয় চরিত্রই তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সর্বদিকে তাই বিশৃঙ্খলা, উন্মত্ততা, অরাজকতা, ভাঙ-চুর, নৈরাজ্যের অন্ধকার, নীচতা, শঠতা, নিম্নগামিতা, লঘুতা, অনাচার, ধর্মের বিকৃতি, সংস্কৃতির বিকৃতি, শিক্ষার বিকৃতি, মস্তিষ্কহীনতা, Satanic activity. আর এসবকে ঘিরে চলেছে রাজনীতির খেলা ও জনে জনে নেতৃত্ববোধের অহমিকা। ফলে রাতারাতি সাদা কালো হ'য়ে যাচ্ছে, কালো হলুদ হচ্ছে। যাঁরা দ্বিতধী—তাঁরা সর্ষেফুল দেখছেন চোখে। আর এরই প্রতিফলন ঘটছে শিল্পে, সাহিত্যে, ধর্মে, দর্শনে, শিক্ষায়—সর্বত্র। ফলে জ্ঞানাত্মনী বৃত্তি ও মৌলিক চিন্তার ক্ষেত্রে যে বিরাট ধ্বস নেমেছে, তা গভীর শোকাবহ। অর্থনৈতিক ভারসাম্যের অভাবে সমাজের গোটা দেহটাই আজ পক্ষাঘাতে জর্জরিত। যে মন সুন্দরের উপাসনায় ধ্যানী হ'য়ে উঠতে পারতো, সেই মনই আজ বিভ্রান্ত উর্ণনাভের মতো নিজের বিকৃত জটিল জালে শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে ঘুরে মরছে। ফলে বিকৃতি এসেছে সর্বক্ষেত্রে। সঙ্গীতে যেমন সুরের বিকৃতি ঘটছে, তেমনি নাট্যক্ষেত্রে মননশীলতার অভাবে নব নব ভাবের মৌলিক নাটক গ'ড়ে উঠছে না—যা জাতিকে প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ ক'রে চরিত্রগঠনে সহায়ক হ'তে পারে; আচারে, আচরণে, ব্যবহারে এবং বিভিন্ন সৃজনশীল রচনার ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। দেশের উচ্চকোটি মহলে যাঁরা বাস করেন, শ্রেণী হিসেবে তাঁরা নিম্নকোটি মানুষ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেশের চিত্ত তাই তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। ফলে সর্ববিষয়ের সুরক্ষার দায়িত্ব বর্তায় সরকারের উপর। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য হ'লেও দ্বিতধী প্রজ্ঞাবান মানুষেরও তো অভাব নেই দেশে। তাঁদের সম্মিলিত শক্তি দেশকে বিভ্রান্তি থেকে বাঁচাতে পারে, পারে জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে, পারে নব নব ভাবোন্মেষ ঘটিয়ে মানুষ গ'ড়ে তুলতে।

ঐতিহ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে চীন, রাশিয়া, জাপান, আমেরিকা, জার্মানী, ইংলণ্ড প্রভৃতি বৃহত্তর দেশগুলি যে প্রযত্নের পরিচয় রেখেছে, ইতিহাসের দিক থেকে তা একটা মস্তবড় দৃষ্টান্ত। তেমনি নব নব উদ্ভাবনী শক্তি ও ভাবসম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতির বিরাম নেই।

সেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কি এদেশের বিভ্রান্ত ও নীতিভ্রষ্ট জনচিত্তকে স্পর্শ করে না? জানি, দেশের প্রয়োজনে দেশই আবার জন্ম দেবে সেই যোগ্য মানুষকে, নইলে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের আশঙ্কায় সবই যে নিরর্থক হ'য়ে যাবে। তবু মাঝখানের যে বিরাট ব্যাকুয়াম—যাকে আধুনিক ভাষায় বলা হয়—Generation Gap—সেই ব্যাকুয়াম বা Gap পূর্ণ করবার জন্যেও যে আদর্শ চাই, আদর্শবাদী মানুষ চাই। ধর্মের নামে, সংস্কৃতির নামে, শিক্ষার নামে, ঐতিহ্যের নামে সেই মানুষের সাড়ম্বর সারস্বাগ্রহণই আজ একান্তভাবে কাম্য। একদা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের উদ্দেশেই উচ্চারণ করেছিলেন: 'তোমরা প্রত্যেকে নিজের প্রতি এই বিশ্বাসসম্পন্ন হও যে, অনন্তশক্তি তোমাদের সকলের মধ্যে রহিয়াছে। তোমরা সমগ্র ভারতকে পুনরুজ্জীবিত করিবে।...আয়ু স্বল্প, সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য—সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য আত্মবলিদানই তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম।'

এলো দোল

(গান)

শ্রীঅজিত কান্তি সরকার

(কাব্যসুধানিধি)

ধরার শ্যামল অঙ্গনে এলো আবার পুণ্য দোল,
গগনে পবনে একী দোলা লাগে ; মন আজ উতরোল।
আম্রপরাগ মাখিয়া অঙ্গে
গাহিছে ভ্রমর ; কতনা রঙ্গে
নাচে ফুলদল ; জলতরঙ্গে
বাজিয়া উঠিছে অমরাবতীর আনন্দ-কল্লোল।

পলাশ তরুরা ওই দেখ আজ আবীর ছড়ায় নভে,
শ্যাম বনতল মাতিয়া উঠেছে এ কোন্ মহোৎসবে।
কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়
রক্তকেতন ওড়ে মৃদুবায়,
চম্পা পারুল চোখ মেলে চায়,
নবকিশলয় পুলকে উতল কোকিলের কুহুরবে।

ভুবনে ভুবনে লেগেছে যে দোলা—আয় সবে ছুটে আয়,
রঙের খেলায় মাতিব হরষে ; লাগ বহিয়া যায়।
লাজ-ভয়-মান আজ ভুলে যাবো,
অনুরাগ-রঙে হৃদয় রাঙাবো,
প্রেমের আবীরে ভুবন ভরাবো,
মহামিলনের সুরে সুরে মোরা মাতাব এ বসুধায়।

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(বারো)

এক্ষণে রসচেতনা কি ও কখন তা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় একথাও জানার বিষয়। আচার্য অভিনবগুপ্তের শিক্ষাগুরু পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রের অভিমত যে, যখন মানুষ 'রসসমাহিতচেতাঃ'—অর্থাৎ রসে সমাহিত চিত্ত হয় তখনই তার মধ্যে আসে সমতার ভাব ও ঔচিত্যের জ্ঞান। এক্ষণে ঔচিত্য কাকে বলে? আলঙ্কারিকরা বলেন,

'উচিতং প্রাহুরাচার্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ।

* * *

উচিতস্থানবিন্যাসাদলঙ্কৃতিরলংকৃতিঃ।

অর্থাৎ 'অলংকৃতিঃ উচিতস্থানবিন্যাসাদলং কর্তুং ক্ষমা ভবতি। অন্যথা তু অলংকৃতিব্যপদেশমেব ন লভতে'। মোটকথা অলঙ্কার যদি যথাস্থানে ব্যবহৃত না হয় তবে তা ঔচিত্যের অন্যথা বলতে অনৌচিত্য সৃষ্টি হয়। যথাস্থানে অলঙ্কারের ব্যবহার হ'লে তা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং রসও সৃষ্টি করে। ঔচিত্য থেকে স্থায়ীরসের সৃষ্টি হয়, অনৌচিত্যে রসাভাসের সৃষ্টি হয়: "ঔচিত্যেন প্রবৃত্তৌ চিত্তবৃত্তেঃ আস্বাদ্যত্বে স্থায়িন্যা রসঃ ব্যাভিচারিণ্যা ভাবঃ। অনৌচিত্যেন আভাসঃ"। কিন্তু আলঙ্কারিক ভোজরাজ ঔচিত্যসম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করেন নি[১]। পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র এ'প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বহু কবি ও সাহিত্যিকই অলঙ্কারের ঔচিত্য স্বীকার করেন, আবার অনেকে করেন না। সে'জন্য কোন বিদগ্ধ কবি যখন রসের প্রতি সচেতন হন—'রসসমাহিতচেতাঃ', তখনই আসে তাঁর মধ্যে সাম্য বা সমতা ও ঔচিত্য। তাই যদি কেহ কোন বস্তুর ভাব ও রসের উপর যথার্থভাব দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তখনই অলঙ্কার হয় রসভাবপর, আর তার অর্থ হ'ল বস্তু বা কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীত যখনই অলঙ্কারযুক্ত হয় তখনই সৃষ্টি হয় রস—'that which is adorned by Alamkāra, is the Rasa'—বলেছেন ডঃ রাঘবন।

১। কিন্তু তাহলেও 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ' ও 'শৃঙ্গারপ্রকাশ'-গ্রন্থদুটিতে ভোজরাজ একেবারে ঔচিত্য ও অনৌচিত্য-সম্বন্ধে যে আলোচনা করেন নি, তা নয়। 'বাক্যপদীয়'-গ্রন্থে ভর্তৃহরি 'বাক্যাৎ প্রকরণাদ্ অর্থা। ঔচিত্যাদ্ দেশকালতঃ' প্রভৃতি ব'লে ঔচিত্য ও অনৌচিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সেরূপ ভোজরাজও ঔচিত্যকে বলেছেন কবিধর্মের একটি অন্যের বস্তু। তিনি 'দোষ'-পর্যায়ে পদদোষের উল্লেখ করে বলেছেন যে, পদদোষের নাম 'অপদ', আর বাক্যার্থদোষকে ভোজ বলেছেন 'বিপদ' এবং সেটিকে তিনি আলঙ্কারিক রূঢ়তা-উল্লিখিত রস-ঔচিত্যের পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। তৃতীয় দোষের নাম বিরুদ্ধ। এই বিরুদ্ধ দেশবিরুদ্ধ ও কালবিরুদ্ধ দু'ভাগে বিভক্ত এবং এ'দুটি বিরুদ্ধদোষ ঔচিত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—বলেছেন ভোজরাজ। সুতরাং দেখা যায় ভোজরাজ যে ঔচিত্য ও অনৌচিত্য-সম্বন্ধে একেবারে আলোচনা করেন নি—তা নয়। তিনি শৃঙ্গারপ্রকাশে উল্লেখ করেছেন—

'পদং পদাংশ চ মিশ্রং চ কাব্যং যৎ সা গতি স্মৃতা:।
অথৌচিত্যাদিভিঃ সাপি বাগলঙ্কার ইষ্যতে।'

আলঙ্কারিকরা বলেন যে, ধ্বনিই কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে অলঙ্কার। 'বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈব অলংকার্যঃ। কটককেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরস্যবায়িভিঃ আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তিবিশেষৌচিত্য-সূচনাদ্বারতয়া অলংক্রিয়তে'—বলেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত ধ্বন্যালোকের 'লোচন'-টীকায়। 'লোচন'-টীকায় আরও বলা হয়েছে : 'রসবৎ-অলঙ্কারঃ'। কথা এই যে, যে বস্তু যথাযথ স্থানে ও কর্মে থেকে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাকেই অলঙ্কার বলে ('thus whatever, remaining in a functionary place, aids to embellish and add to the main theme's beauty, is Alamkāra'। সুতরাং রসও একদিক থেকে বস্তুর বা ভাবের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ব'লে অলঙ্কার নামে কথিত। আলঙ্কারিক রুদ্রভট্টের অভিমত অনেকটা তাই।

অলঙ্কার রসের অনুসঙ্গী ও সহায়ক, অথবা বলা যায়, অলঙ্কার রসের অনুভূতিকে মূর্ত করে অলঙ্কারের পক্ষে রসও তাই। আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের অভিমত—

(ক) রসের প্রয়োজনে বা রসের উদ্বোধনে অলঙ্কারের সার্থকতা ;

(খ) অলঙ্কার সৃষ্টি করেন কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পী উদাহরণের উপস্থাপনে এবং রসপ্রকাশের প্রয়োজনে ;

(গ) অলঙ্কারের সৃষ্টি বা উপস্থাপন সহজসাধ্য ;

(ঘ) অলঙ্কার যতক্ষণ না প্রকাশ পায় বা রূপ গ্রহণ করে, ততক্ষণ কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পীর প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে রসের সঙ্গে সৌন্দর্য ও লাবণ্য সৃষ্টি করার পথে।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-রচিত 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থের আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক শিবপদ ভট্টাচার্যের অভিমত হ'ল : অলঙ্কারের উপযোগিতা রসসৃষ্টি করা, বা রসসৃষ্টিপক্ষে পরিবেশ ও প্রেরণা সৃষ্টি করা : "The role of the *alankāra* as supplementing the aesthetic element in poetry, arrived at by suggestion, and *alankāra*, are most happily placed when they appear as *vyanga* (suggested) a truism in the line of thought, formulated by Anandavardhana, has been harped on ever and anon in the RG. as coexisting with it (*samānādhikarana*), nay, even vying with it, is presaged by this poeticist." রসগঙ্গাধরেও (II. 29) উল্লিখিত আছে : "……কাব্যমানোবাদ্যস্য রমণীয়তাপ্রযোক্তা অলঙ্কারা নিরূপ্যন্তে·· "।

পূর্বে আমরা কাব্যে অলঙ্কারের প্রসঙ্গে রস ও অলঙ্কারকে অনেকাংশে সমগোত্রীয় বলে মন্তব্য করেছি, কেননা আলঙ্কারিক ভট্টনায়ক ও কুন্তক অলঙ্কারকে সৌন্দর্যের সমপর্যায় বলেছেন,—যদিও টীকাকার কুমারস্বামী বলেছেন : 'যদ্যপি রসালঙ্কারাস্তনেকবিষয়মিদং শাস্ত্রং তথাপি ছন্দোবিচিত্রেন অলঙ্কারশাস্ত্রমুচ্যতে'। ভট্টর রাঘবনের অভিমত যে, আলঙ্কারিক বামনের হাতে অলঙ্কার চারুতা ও সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ভট্টর রাঘবন পুনরায় বলেন যে, বামন এ'বিষয়ে অনুসরণ করেছেন আলঙ্কারিক দণ্ডীকে : 'He (Vamana)

realized that it (*Alamkára*) meant Beauty' এবং 'To Vāmana, Alamkara was Beauty, *Sundarya*'. পাশ্চাত্য দার্শনিকদের অভিমত অনেকটা তাই।

ডক্টর রাঘবন এ'প্রসঙ্গে পুনরায় বলেছেন : 'We have to resign to the magic of the poet's genius ultimately, to what Bhatta Nayaka and Kuntaka would call *Kavivyápára*. *Sundara* and *Saundarya* are words which Abhinavagupta uses very often in his descriptions of poetry in the Lochana on the Dhanyāloka. The synonym *cháru* (চারু) is also used by Anandavardhana'.

এ'প্রসঙ্গে ডক্টর রাঘবন আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক' থেকে কয়েকটি চারুতার নিদর্শনও দিয়েছেন তাঁর *'Some Concepts of Alamkára-Sástra'*-গ্রন্থে (পৃঃ ২৬১)। তিনি দুটি প্রধান উদাহরণের উল্লেখ করে বলেছেন—

1. 'শব্দগতাঃ চারুত্বহেতবঃ' (পৃঃ ৫) :-'কামনীয়কম্' and 'চারুত্বম্' (পৃঃ ৮) ; 'কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ' (পৃঃ ১১) ; 'বিবিধবিশিষ্টবাচ্যবাচকরচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ' (পৃঃ ২৭)।

2. 'প্রতিভা অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা। তস্যা বিশেষো রসাবেশাবৈশদ্যসৌন্দর্যকাব্য-নির্মাণক্ষমত্বম্' (লোচনটীকা, পৃঃ ২১)। 'ন হি যয়া বিপদো হতা ইতি যাদৃগলংকৃতোঽয়ং বাক্যার্থঃ তাদৃগয়ম্। অপি তু সুন্দরীভূতঃ' (লোচন, পৃঃ ৭২)।

সেজন্য ডক্টর রাঘবন বলেছেন : 'Beauty is the primary factor, and in its absence neither *Alamkara*, nor *Dvani* can have any claim to be called such or make for poetry : 'তথাজাতীয়ানামিতি। চারুত্বাতিশয়বতাম্ ইত্যর্থঃ। যল্লক্ষিতা ইতি যৎকিলৈষাং তাবিনির্ভুক্তং রূপম্, ন তৎ কাব্যেঽভ্যর্থনীয়ম্। উপমা হি—'যথা গৌঃ তথা গবয়ঃ' ইতি (রূপকম্)…'।

অবশ্য ভোজরাজ 'শৃঙ্গারপ্রকাশ'-গ্রন্থে এরূপ (অলঙ্কার যে রসের প্রতিপাদক ও প্রকাশক) প্রায়ই ব্যবহার করেছেন এবং আচার্য অভিনবগুপ্ত 'লোচন'-টীকায় সে'কথার উল্লেখও করেছেন। ভোজরাজ পুনরায় আলঙ্কারিক দণ্ডীর কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'কাব্যশোভাকরান্ ধর্মান্ অলংকারান্ প্রচক্ষতে'। রস অলঙ্কারের মতো কাব্যের শোভাবর্ধক, সুতরাং অলংকারের মতো রস, শোভা, চারুতা ও সৌন্দর্যবর্ধনের ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত— 'সোঽপি অলংকারঃ কবিসময়প্রসিদ্ধ্যনুরোধেন হৃদ্যতয়া কাব্যশোভাকর এব অলংকারতাং ভজতে'। পুনরায় তিনি বলেছেন : 'সহৃদয়হৃদয়প্রবেশক্ষমত্বমিতি ব্যাখ্যাতাং রসবদাদ্যলংকারতা-পত্তিঃ' এবং 'চিত্তবৃত্তিসমাধিরূপত্বাচ্চ রসবদলংকার্যস্য'।[২] সেজন্য ডক্টর রাঘবনের অভিমত

২। ধ্বন্যালোকে আচার্য আনন্দবর্ধনও স্বীকার করেছেন—

'রসভাবাদিতাৎপর্যমাশ্রিত্য বিনিবেশনম্।
অলংকৃতীনাং সর্বাসামলংকারত্বসাধনম্।'

পূর্বেও এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছি অলংকারপর্যায়ে।

হ'ল : 'Therefore the poetic beauty is the real soul of poetic expression. Abhinavagupta accepts that *beauty is the esssence*, the soul of the art'. 'লোচন'-টীকায় অনুরূপ স্বীকারোক্তিই করেছেন আচার্য অভিনবগুপ্ত এই ব'লে : 'যচ্চোক্তম্—'চারুত্বপ্রতীতেস্তর্হি কাব্যস্য আত্মা স্যাৎ ইতি তদঙ্গীকৃতমেব। নাস্তি খলুয়ং বিবাদ ইতি' (লোচন, পৃঃ ৩৩)।

পাশ্চাত্য *Aesthetics* বা সৌন্দর্যশাস্ত্রও ঐ একই কথা বলে। মহামতি টলষ্টয় What is Art ?—'শিল্প কি' বলতে গিয়ে ঐ এককথা বলেছেন।

অবশ্য কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে ধ্বনির ও রসের রূপায়ণে এবং সার্থকপ্রকাশে অলঙ্কারের ও রসের প্রয়োজনীয়তা বড় কম নয়। তবে একথা ঠিক যে, রসের ও অলঙ্কারের রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কবি, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পীর প্রতিভা ও দক্ষতা বিশেষভাবে সাহায্য করে। আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত উভয়ে তাই বলেছেন—

(ক) 'নিষ্পত্তাবাশ্চর্যকৃতঃ' (ধ্বন্যালোক) ;

(খ) 'প্রতিভানুগ্রহবশাৎ স্বয়মেব সংপত্তৌ নিষ্পাদনানপেক্ষাত্মামিত্যর্থঃ' ('লোচন'-টীকা)। অবশ্য অলঙ্কারই রসপ্রকাশকে ও রসদীপ্তিকে যথাযথভাবে সাহায্য ও সমৃদ্ধ করে। ডক্টর রাঘবন তাঁর *Some Concept of Alamkāra-Sastra*-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন : "For instance, in the verse : 'কপোলে পত্রালী করতলনিরোধেন মুষিতা'···i.e. the Shaṭha-Nayaka, who entreats the Khanditā-Nāyikā, describes her anger as another lover who is dearer to her than him self ; though he may even fall at her feet." এখানে শেষোক্ত ছত্রে শ্লেষ, রূপক ও ব্যতিরেক-অলঙ্কারই প্রকাশ পেয়েছে, সেজন্য ঈর্ষ্যাপ্রলম্ভরসের প্রকাশকে অধিকতর বরং সাহায্য করেছে, প্রশমিত করেনি।

আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন এ' প্রসঙ্গে ধ্বন্যালোকে 'কাদম্বরী'-গ্রন্থ থেকে একটি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন : "অলঙ্কারান্তরাণি হি নিরূপ্যমানদুর্ঘটাঙ্গানি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেঃ, অহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি। যথা কাদম্বর্যাং কাদম্বরী দর্শনাবসরে"। রামায়ণ-মহাকাব্যেও এর নিদর্শন পাওয়া যায়—যখন ভরত অরণ্য থেকে ফিরে এলেন অযোধ্যায় ও রাবণ-কর্তৃক সীতাহরণ-প্রভৃতিতে শোক প্রকাশ করলেন। মোটকথা শৃঙ্গার, বীর, করুণ, হাস্য প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রোক্ত আটটি রসের প্রকাশ ও তাদের সার্থকতা সম্পন্ন হয় কাব্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে ও নাটকে অলঙ্কারের সমাবেশে এবং এই অলঙ্কারের সমাবেশই সৃষ্টি করে রস, ধ্বনি ও ঔচিত্য। ঔচিত্যের ক্ষেত্র ও প্রসারতা অবশ্য শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে—যদিও রস ঔচিত্যের সহকারী হয়ে আঙ্গিকরূপে থাকে। সেজন্য মহামহোপাধ্যায় এস. কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রীয়ার সংস্কৃত রসশাস্ত্রের সীমা নির্ণয় করেছেন অলঙ্কার থেকে ঔচিত্য পর্যন্ত। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত রসকেই অবশ্য শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন এবং আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত রসকেই কাব্যের 'প্রাণ' (Soul) বা

প্রাণকেন্দ্ররূপে স্বীকার করেছেন। রস শুধুই কাব্যের প্রাণ নয়,—রস, সাহিত্য, সঙ্গীত ও নাটকেরও প্রাণস্বরূপ। এজন্য ঐ সকল ক্ষেত্রে রসের আলোচনাই প্রধান। কিন্তু ভট্টনায়ক, মহিমভট্ট এমনকি কুন্তক ধ্বনিকেই বলেছেন কাব্যের প্রাণ,—যদিও এ'বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই।

সঙ্গীতে সাহিত্য (পাঠ্য)-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা পূর্বে করেছি, কেননা সাহিত্যের সহিতত্ব বা সহযোগ ছাড়া সঙ্গীত সুরময়, সুবোধ্য ও প্রাণময় হয় না। আলঙ্কারিক ভামহের কাব্য-সম্বন্ধে অভিমত—'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্', কিন্তু মানুষের রসগ্রাহী চিত্ত বা মন যখন সংস্কৃতির আলোকে আরো পরিশুদ্ধ হয়, তখনই 'সাহিত্য'-শব্দ বেশীর ভাগ সময়ে সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত হ'তে থাকে—

(১) 'সঙ্গীত-সাহিত্য-কলা-বিহীনঃ পশুঃ পুচ্ছ-বিষাণহীনঃ।'

(২) 'সঙ্গীতমপি সাহিত্যম্ সরস্বত্যাঃ স্তনদ্বয়ম্।'

একথা অবশ্য সত্য যে, 'অলঙ্কার'-শব্দের মতো 'সাহিত্য'-শব্দ অধিক প্রাচীন নয়, তবুও স্বীকার করি যে, সংস্কৃত রসশাস্ত্র (Sanskrit Poetics) সাহিত্য নামেও পরিচিত এবং অলঙ্কার-শাস্ত্রের সমগোত্রীয়।

পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলি যে, শব্দ ও অর্থের হর-পার্বতির মতো যুগল ও সম্মিলিত রূপ। ধাররাজ ভোজ তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ'-গ্রন্থে সাহিত্যের রূপ ও সার্থকতা-সম্বন্ধে অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন।[৩] কাব্যে ও সাহিত্যে চারুত্বই প্রধান এবং এ'কথা আলঙ্কারিকরা স্বীকার করেছেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাহলেও পুনরায় বলি : "শব্দগতাঃ চারুত্বহেতবঃ', 'কামনীয়কম্' ও 'চারুত্বহেতু', 'কাব্যস্য হি ললিতোচিতসন্নিবেশচারুণঃ', 'বিবিধবিশিষ্টবাচ্যবাচকরচনাপ্রপঞ্চচারুণঃ', প্রভৃতি। কাব্য ও কাব্যের মতো সহিতত্বগুণসম্পন্ন সাহিত্য কবি ও সাহিত্যস্রষ্টার প্রতিভারই দান এবং সেই প্রতিভাকে বলা যায় 'প্রজ্ঞা'—যে প্রজ্ঞা রসলালিত্যসম্পন্ন কাব্য ও সাহিত্য সৃষ্টি করে। আসলে প্রজ্ঞাই কাব্যে ও সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে—যার অভাবে এমনকি অলঙ্কার ও ধ্বনির যথার্থ মূল্য পরিগণিত হয় না।

তবে কাব্য, সাহিত্য ও সঙ্গীতের (সঙ্গীতের কথা বা সাহিত্যের) ব্যাপারে চারুত্ব বা সৌন্দর্যের স্থান সর্বজনস্বীকৃত। পূর্বেই বলেছি যে, চারুত্ব বা সৌন্দর্যের স্থান অলঙ্কার বা ধ্বনি কোনদিনই পূর্ণ করতে পারে না, কেননা 'চারুত্বপ্রতীতিস্তর্হি কাব্যস্য (সাহিত্যস্য বা) আত্মা স্যাৎ' ইতি অঙ্গীকুর্ম এব। নাস্তি খলুয়ং বিবাদ ইতি'—বলেছেন 'লোচন'-টীকার আচার্য অভিনবগুপ্ত। সৌন্দর্যের অপর নাম 'চমৎকার' এবং 'চমৎকারচন্দ্রিকা'-র রচয়িতা পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর একথাই স্বীকার করেছেন। তাছাড়া পণ্ডিত বিশ্বেশ্বরের মতে বিচিত্তি, বৈচিত্র্য ও এমন কি বক্রতা শব্দগুলিও সৌন্দর্যের বা চারুত্বের প্রকাশক। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের মতে রামায়ণ-মহাকাব্য চমৎকার বা সৌন্দর্যের প্রকাশক।

৩। দ্রষ্টব্য বি. রাঘবন : *Bhoja's Shringāra Prakasha*, Vol. I. পৃঃ ৮৭—১১০ দ্রষ্টব্য।

সুন্দরের প্রকাশক ও ধারকই সৌন্দর্য এবং সেজন্য সৌন্দর্যশাস্ত্রকে পাশ্চাত্যদর্শনে Aesthetics ও ভারতে রসতত্ত্ব বলে—সেকথা পূর্বে বলেছি। মহামতি টলষ্টয় সৌন্দর্যের আলোচনায় Beautiful ও Subline উভয় শব্দই ব্যবহার করেছেন।

সৌন্দর্যের প্রকাশক বা দ্যোতক চারুতা ও চমৎকারিতা-সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যে ও অলঙ্কারশাস্ত্রে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে রসপর্যায়ে অলঙ্কারের অন্তর্প্রবেশ ছিল প্রধানভাবে ও সেদিক থেকে সাহিত্যের ও কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কার সম্পর্কিত হয়ে 'কাব্যালঙ্কার' নামে কথিত হয়। পরে ধ্বনির অন্তর্প্রবেশ ঘটে। ধাররাজ ভোজ তাঁর 'শৃঙ্গারপ্রকাশ'-গ্রন্থে রসধ্বনির প্রসঙ্গে সাহিত্য-বিচারের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। আলঙ্কারিক কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থে[৪] চারুতা বা চমৎকারিত্বের আলোচনায় সাহিত্যের প্রসঙ্গ করেছেন। সেখানে গুণ এবং শব্দালঙ্কার থেকে রস ও ধ্বনি পর্যন্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন কুন্তকও। সাহিত্যমীমাংসা-সম্বন্ধে আলঙ্কারিক রুয্যকও (Ruyyaka) তাঁর 'অলঙ্কারসর্বস্ব'-গ্রন্থে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করেছেন।

পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র এবং আচার্য অভিনবগুপ্ত রসপর্যায়ে বলেছেন যে, চমৎকার বা চারুতার স্বভাব বা চরিত্রই হোল রস সৃষ্টি করা। আলঙ্কারিক কুন্তকের অভিমতও তাই। অগ্নিপুরাণকারও আত্মচৈতন্যকে চমৎকার ও রসের পর্যায়ভুক্ত করেছেন (অগ্নিপুরাণ ৩৩৯।২)। 'কবিকণ্ঠাভরণ'-গ্রন্থে আচার্য অভিনবগুপ্ত চমৎকারপ্রসঙ্গে কাব্যের আলোচনা করেছেন—সেকথাও বলেছি। পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র 'কাব্যমালাগুচ্ছক'-গ্রন্থে দশটি চমৎকৃতির বা চমৎকারের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "তত্র দশবিধশ্চমৎকারঃ—অবিচারিতরমণীয়ঃ, বিচারিত-রমণীয়ঃ, সমস্তসূক্তব্যাপী, সূক্তৈকদেশদৃশ্যঃ, শব্দগতঃ, অর্থগতঃ, শব্দার্থগতঃ, অলঙ্কারগতঃ, রসগতঃ, প্রধ্যাতবৃত্তিগতশ্চ"। এ'সম্বন্ধে পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর তাঁর 'চমৎকারচন্দ্রিকা'-গ্রন্থে সর্বপ্রথমে যথাযথভাবে 'চমৎকার'-বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, চমৎকার সহৃদয়-আনন্দেরই পরিণতি বা প্রকাশ এবং চমৎকারের আলম্বন সাতটি—গুণ, রীতি, বৃত্তি, পাক, শয্যা, অলঙ্কার ও রস—

'চমৎকারস্তু বিদুষামানন্দপরিবাহকৃৎ।
গুণং রীতিং রসং বৃত্তিং পাকং শয্যামলঙ্কৃতম্।
সপ্তৈতানি চমৎকারণং ক্রবতে বুধাঃ।'

চমৎকার পুনরায় তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—চমৎকারী (শব্দচিত্র), চমৎকারীতর (অর্থচিত্র ও গুণীভূত-ব্যঙ্গ) এবং চমৎকারীতম (ব্যঙ্গ-প্রধান)। পরিশেষে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ তাঁর প্রসিদ্ধ অলঙ্কারশাস্ত্র 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে চমৎকারের বা চমৎকৃতির নিদর্শন দিয়ে বলেছেন : "রমণীয়ার্থপ্রতি-পাদকঃ শব্দঃ কাব্যম্। রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনকজ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতঃ চমৎকারাপরপর্যায়ঃ অনুভবসাক্ষিকী জাতিবিশেষঃ"।

৪। এ'সম্বন্ধে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি।

কথা এই যে, 'চমৎকার'-পদ আহ্লাদ ও আনন্দের অতিশয়তা (বৃদ্ধি) যাতে সম্পন্ন হয়, সেই বস্তুই কাব্য ও সাহিত্য। ডক্টর রাঘবন বলেছেন যে, ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে মথুরামিশ্রের পুত্র হরিপ্রসাদ 'কাব্যালোক'-গ্রন্থ[৫] রচনা করেন এবং ঐ গ্রন্থে তিনি সহজ-সরলভাবে প্রমাণ করেছেন যে, চমৎকারই কাব্য ও সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ। তিনি বলেছেন—

'বিশিষ্টশব্দরূপস্য কাব্যস্যাত্মা চমৎকৃতিঃ।
উৎপত্তিভূমিঃ প্রতিভা মনাগত্যোপপাদিতম্ ॥' [৬]

সুতরাং দেখা যায় যে, রমণীয়তা, চারুতা, চমৎকৃতি বা চমৎকারিতা সৌন্দর্য এবং আনন্দ বা আহ্লাদের প্রেরণা যে গ্রন্থ সৃষ্টি ও পরিবেশন করে তাকেই প্রধানভাবে 'সাহিত্য' বলা যেতে পারে।[৬]

এরপর সঙ্গীতে ও নাটকে অলঙ্কারসম্পর্কে আলোচনা করবো।

●

৫। Vide Peterson's III, Report, pp. 356–এ দ্রষ্টব্য।

৬। অধ্যাপক শিবপদ ভট্টাচার্য *Three Lost Masterpiece of Alaṅkāra-Śāstra*-নিবন্ধে 'ভাবহৃদিবরণ' বা 'ভাবহৃদ্বৃত্তি', (৬ষ্ঠ-উত্তর—৮০০ খ্রীষ্টাব্দ), 'অলঙ্কারদর্পণ' (৬ষ্ঠ-মাঝামাঝি—৯০০ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'কাব্যকৌতুক' (৬ষ্ঠ-শেষ—১০০ খ্রীষ্টাব্দ)—এই তিনটি অধুনালুপ্ত অলঙ্কারগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এই অলঙ্কারশাস্ত্রের দু'জন প্রবক্তার কাশ্মীরের আচার্য অভিনবগুপ্তের মিত্র।

।। কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য ।।

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বভাগ)

একদিন শ্রীকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ বলরাম ও সখাদের সঙ্গে গাভীদের নিয়ে ব্রজ হতে অনেকদূরে চলে গিয়েছিলেন। শ্রান্ত ক্লান্ত সখাদের তিনি ছায়াঘন কিছু বৃক্ষ দেখিয়ে বলেছিলেন :

পশ্যৈতান্ মহাভাগান্ পরার্থৈকান্তজীবিতান্।
বাতবর্ষাতপহিমান্ সহন্তো বারয়ন্তি নঃ ॥
অহো এষাং বরং জন্ম সর্বপ্রাণ্যুপজীবনম্।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিনঃ ॥
পত্রপুষ্পফলচ্ছায়ামূলবল্কলদারুভিঃ।
গন্ধনির্যাসভস্মাস্থিতোক্মৈঃ কামান্ বিতন্বতে ॥[১]

অর্থাৎ এসকল মহাভাগ কল্পবৃক্ষ পরার্থেই একান্ত জীবিত। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অক্লেশে সহ্য করে যুগযুগান্ত ধরে অবস্থান করছে বরজন্ম মহাভাগবত এই বৃক্ষসকল—কোন প্রার্থী এদের কাছে প্রার্থনা করে বিমুখ হয় না—সর্বস্ব দিয়ে অপরের কল্যাণসাধনের জন্যই এদের জন্ম। এরা পত্র পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি (ত্বকের নীচের কঠিন অংশ) ও পত্রাঙ্কুরের দ্বারা অপরের বাসনা পূরণ করে। কল্পতরুর চরিত্র চিত্রন করে মানুষজীবনের সঙ্গে এর তুলনা করে শ্রীকৃষ্ণ আরও বলেছিলেন :

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় এবাচরেৎ সদা ॥

কল্পতরুসদৃশ যে সকল মানুষ নিজের প্রাণ, ধন, বুদ্ধি বা বাক্যদ্বারা অপরের কল্যাণসাধন করেন তাদের জীবনই সার্থক। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত এরূপ পরার্থৈকান্তজীবিত শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় তাঁর জীবনধারণ। তিনিই কল্পপাদপের সার্থক তুলনা।

তাঁর জীবনকালের মধ্যে একটি বিশেষ দিন ভক্তমণ্ডলীতে 'কল্পতরুদিবস' নামে চিহ্নিত। এ-দিবসের ঐতিহাসিক সূত্র ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে সংঘটিত বিচিত্র ঘটনা। আবেগ-বিহ্বলতায় উদ্বেলিত ভক্তজনের কাছে বা জ্ঞানীজনের যুক্তিবিচারের মাপকাঠিতে ঘটনা দুর্বোধ্য। কুয়াশাঘেরা সংশয়াচ্ছন্ন হলেও ঘটনার সত্যতা অনস্বীকার্য। অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ বিমিশ্র প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীতে বিধৃত সে-ঘটনা মানুষকে আজও বিস্মিত করে, ঘটনার অন্তর্নিহিত শক্তির অমোঘ প্রভাব স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলকে আকর্ষণ করে। এ-ঘটনার মধ্যে ভগবান ও ভক্তের সম্মেলনে উদ্ভীন হয়েছিল ভক্তির বৈজয়ন্তী, যার আশ্রয়লাভের জন্য প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ কাশীপুর বাগানবাটীতে উপস্থিত হচ্ছে।

১। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২২।৩৫-৩৮

কাশীপুর বাগানবাটী কৃপাতীর্থ। 'যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ' এই তাৎপর্যবহ স্বীকৃতি শ্রীরামকৃষ্ণকণ্ঠে উৎসারিত হয়েছিল এই তীর্থস্থানেই। এইস্থানেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তর্লীলার অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাঁর কৃপাঘন স্বরূপটি ভক্তদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করেছিলেন।

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-বিমণ্ডিত কাশীপুরমঞ্চে বিভূবিলাসের মন-মাতানো চেতনা-চমকানো ঘটনা ঘটেছিল অনেকবার। তাবমধ্যে বিশেষ কিছু ঘটেছিল ১লা জানুয়ারীতে যার জন্য সে-দিনটি কল্পতরুদিবস নামে সেবিত হচ্ছে চুয়ান্নব্বই বছর ধরে।

ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক আলো ও উদ্ভিদের সম্পর্কের মত ঘনিষ্ট। ভক্তমনের নিকট সে-সম্পর্ক যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি তৃপ্তিকর। ভগবানের অমিয় করুণাধারায় নিষ্ণাত ভক্তহৃদয় সর্বদাই কল্যাণনিলয় ঈশ্বরাবতার বা আধিকারিক পুরুষের কৃপালাভের জন্য লালায়িত। ভক্ত চায় ঈশ্বরাবতারকে কল্পতরুরূপে পেতে। কল্পতরু পুরাণ-কথিত নন্দনস্থিত দেবতরুবিশেষ। তার কাছে প্রার্থনা করে কেউ বিমুখ হয় না। শ্রীধরস্বামী বলেন কল্পতরু হচ্ছেন সর্বপুরুষার্থোপায়। ১লা জানুয়ারীতে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ভক্তেরা দেখেছিলেন উজ্জিত কৃপার ঐশ্বর্য। পেয়েছিলেন অমিত তেজসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের চির-অভয়-বর।

পয়লা জানুয়ারীতে কৃপা-বিতরণের ঘটনার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ পাই পুরাতন এক মাসিকপত্রে। "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) অপরাহ্ণকালে সকলের নিকট আসিয়া বলিলেন, 'আমি আর তোমাদের কি বলিব তোমাদের সকলের চৈতন্য হউক,' এই বলিয়া তাঁহার ভাবাবেশ হইয়া গেল। ভক্তেরা পুষ্পচয়নপূর্বক 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া তাঁহার চরণে দিতে লাগিলেন। একটু ভাবাবসান হইলে, তিনি উপস্থিত মণ্ডলীর বক্ষে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন, কেহ হাসিতে লাগিলেন, কেহ কাঁদিতে লাগিলেন, কেহ নাচিতে লাগিলেন, সে-এক অদ্ভুত দৃশ্য।"[২]

রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর অনেকে মনে করে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমদিনটি শ্রীরামকৃষ্ণের "পূর্বকথিত প্রেমভাণ্ড ভঙ্গ করিবার দিন।" এ-দিন সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথিকার লিখেছেন, "প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল, শুন বিবরণ, / হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন" / সেই হাঁড়িভাঙ্গা-রূপ আধিকার দিনে।" আবার যেহেতু শ্রীরামকৃষ্ণ "নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয়প্রদানের পরিচয়ই ঐ ঘটনার সুব্যক্ত" করেছিলেন সেকারণে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ এই বিস্ময়াস্পদ ঘটনাটিকে বলেছেন, "ঠাকুরের অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান।" রামচন্দ্রদত্ত-প্রমুখ ভক্তগণের মতে ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন কল্পতরু হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল নিজের অভিজ্ঞতা ও অপরের উপলব্ধিসকল বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ভক্তদের আশা মিটাবার জন্যই "কল্পতরু প্রভু" প্রসন্নচিত্তে ভক্তদের অমোঘ আশীর্বাদ করেছিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হোক্"।

২। "রামকৃষ্ণলীলা", ভক্তমঞ্জরী, ১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, পৃঃ ১২৩

ভগবানের করুণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আলোকসম্পাতে বিধৃত ভক্তের জীবনপট। বিশেষ মুহূর্তে ভক্তের আকাঙ্খিত প্রার্থনা মঞ্জুরকালে ভগবদ্‌কৃপার সোনালী আভা কৃপাপ্রাপ্ত ও অন্যান্য ভক্তদের চেতনালোককে উদ্ভাসিত করে তোলে, আবেগ-বিহ্বলতায় তাদের দেহতট উদ্বেল করে, সে-সঙ্গে সংঘটনের স্থান ও কালকে তীর্থীকৃত করে। ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিবহন ক'রে কাশীপুর গর্বিত। কৃপাতীর্থ কাশীপুরের সর্বাঙ্গ জুড়ে প্লাবিত স্পন্দিত উল্লসিত ঈশ-দীপ্ত করুণার মলয়-বাতাস। সুখস্মৃতি বিজড়িত কৃপাবিতরণ-বৈচিত্র্যের একটি মূল্যবান দলিল স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিচারণ। তিনি লিখেছেন: গৃহস্থ ভক্তগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে আরম্ভ করিল। শ্রীশ্রীঠাকুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও ভাবাবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার পর সংজ্ঞালাভ করিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, "তোমাদের চৈতন্য হোক্।" কাহাকেও বা স্পর্শ করিয়া অধ্যাত্মনেত্র খুলিয়া দিলেন এবং যে যাহা প্রার্থনা করিল তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন 'তোর হবে।' ভাই কৃপতি সমাধি প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাকে ঠাকুর কৃপা করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তোর সমাধি হবে।' উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত গরীব অবস্থায় অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে কৃপা করিয়া বলিলেন, 'তোর অর্থ হবে।' রামলালদাদা, বৈকুণ্ঠ সান্যাল প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তদিগকে তাহাদের যাহা প্রার্থনা ছিল তাহা তিনি আশ্বাস দিয়া 'পূর্ণ হবে' বলিয়া কৃপা করিলেন।[৩]

পাঁচখণ্ডের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে কল্পতরু শব্দটি অন্ততঃ একুশবার ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন পটভূমিকায় ব্যবহৃত কল্পতরু শব্দটি কিঞ্চিৎ বিভিন্ন অর্থ ও ব্যঞ্জনা প্রকাশ করছে। অবশ্য সকলক্ষেত্রেই প্রকটিত ঈশ্বর কল্পতরু, কালী কল্পতরু বা ব্রহ্মকল্পতরুর নিকট ভক্তের হৃদয়ের আকুতি। কল্পতরুর সর্বোচ্চ সম্পদ মোক্ষফল। ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান বলেছেন: আমার কি ফলের অভাব, / পেয়েছি যে ফল জনম সফল, / মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম-হৃদয়ে।

এযুগের সহজতম উপায় ভক্তিপথ। ভক্তির মাহাত্ম্য বিভিন্নভাবে চিত্রিত ক'রে ভক্তানুকম্পায়ত্তবিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ঈশ্বরের কল্পতরু রূপটি তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রবর্তিত কল্পতরু ভগবানের তিনটি সুস্পষ্ট পর্যায়। প্রথম ও প্রধান পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তুলে ধরেছেন ঈশ্বরের নিত্য শাশ্বত কল্পতরুরূপটি। একদিকে ভক্তহৃদয়ের উচ্ছলিত প্রেমভক্তির প্রতি ভগবান ও ভগবানের অবতারের স্বমুখতা, অপরপক্ষে করুণাসিন্ধু ভগবানের সামুজ্য সালোক্যলাভের জন্য ভক্তের চির-আকুতি—এরমধ্যে ভগবানের কল্পতরুসদৃশ ক্রিয়াকলাপ বিস্ময়কর সমাপতন বৈ ত নয়।

শাশ্বত কল্পতরু শ্রীভগবান সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: তিনি অনাদি অনন্তব্রহ্ম। তিনি আছেনই, তিনি নিত্য। তবে একটি কথা আছে—তিনি 'কল্পতরু'—[৪]

৩। স্বামী অভেদানন্দ: আমার জীবনকথা, পৃ: ৮০

৪। শ্রীম: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩।১৮।২

এই ঈশ্বরের কোন বৈষম্য নেই। ঈশ্বর কল্পতরু। এই নিত্য শাশ্বত কল্পতরুকে লক্ষ্য করেই নরেন্দ্রনাথ গান গেয়েছেন :

আমার প্রাণপিঞ্জরে পাখী গাওনা রে।
ব্রহ্মকল্পতরুপরে বসে রে পাখী, বিভু গান গাও দেখি,
(গাও গাও) ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, সুপক্ক ফল খাও না রে।[৫]

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি যে কাল তার স্বরূপ সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতামুখে বলেছেন, "অহমেবাক্ষয় কাল:" (১০।৩৩)। এই কালশক্তিই কল্পতরুরূপে প্রাণীবর্গকে চতুর্বর্গ ফল বিতরণ করেন। এই কালশক্তিই কালী মহাকালী সর্বলোকশাসনকর্ত্রী। এই কালশক্তি মহাকালীর মূলস্থান অধিকার করে আছেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ। "শ্রীরামকৃষ্ণতত্ত্বাভাস" নিবন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ লিখেছেন : শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর আমিত্ব ছিল না।...তাঁহার নিজের আমিত্ব তাঁহার ভিতর ছিল না বলিয়া জগৎপ্রসূতি কালীর আমিত্বই তাঁহার ভিতর দিয়া সর্বতোভাবে প্রকাশ পাইত।[৬] এই কালীকল্পতরুর আশ্রয়লাভের জন্য আহ্বান করেছেন রামপ্রসাদ ও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই কালীকল্পতরুর নিকট হতে সহজেই চতুর্বর্গ ফল সংগ্রহ করা যায়।

আমাদের বুঝতে হবে শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত আশীর্বাদ, "তোমাদের চৈতন্য হোক' কোন ক্ষণিকের বা নির্দিষ্ট একক কোন দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি শাশ্বত ঈশ্বরের নিত্যকালের আহ্বান। ভাগ্যবানসাধকমাত্রই শুনতে পায় এই আহ্বান, এবং এ-আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে অমৃতান্বিত করে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখি কল্পতরু ভগবান অবতারের অবয়ব অবলম্বন করে ক্রিয়মান। সচ্চিদানন্দের সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য হচ্ছেন অবতার। একথা ধারণা করা কঠিন যে যারই নিত্য, তারই লীলা, যিনি স্বরাট তিনিই বিরাট। শ্রীরামকৃষ্ণ-মুখে শোনা গেছে 'অবতারলীলা এসব চিৎশক্তির ঐশ্বর্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।" (ক ৫।৮।২) তিনি আরও বলেছেন, "সেই একই অবতার যেন ডুব দিয়ে এখানে উঠে কৃষ্ণ হলেন, ওখানে উঠে যীশু হলেন।" (সু-উপ ৩৬৪।১৪) "আদ্যাশক্তির সাহায্যেই অবতারলীলা। আদ্যাশক্তির শক্তিতেই অবতার। অবতারকে আশ্রয় করলেই সন্ধান মিলবে অবতারীর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, "ঈশ্বরের সব ধারণা কে করতে পারে ?...তাঁর অবতারকে দেখলেই তাঁকে দেখা হল।"

ভক্তের অতৃপ্ত আকাঙ্খা পূরণের জন্য, অনাস্বাদিত ভক্তিরস সম্ভোগের জন্য ভগবান অবতীর্ণ হন মানুষের সাজে মানুষের মাঝে। অধ্যাত্মরামায়ণ বলেন, "ভক্তচিন্তানুসারেণ জায়তে ভগবানসঃ।" (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৫।২৫)। অপরপক্ষে ঈশ্বরাবতারের যাবতীয় আচরণ বিচরণ ভক্তের দৃষ্টিতে লীলাবিলাস মাত্র, শাস্ত্রের বিচারে ভক্তদিগের নিকট নজির স্থাপনের জন্য। শ্রীমদ্ভাগবত সে-কারণেই অবতারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বলেছেন, "ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।" (১০।৩৩।৩৬) অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণও, বুঝিয়ে

৫। ঐ, ৪।৩১
৬। উদ্বোধন, ৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ: ১০৭।

বলেছেন : তিনি (ঈশ্বর) মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন। প্রেমভক্তি শেখাবার জন্য।···অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেমভক্তি আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্তলীলা—কিন্তু আমার দরকার প্রেম, ভক্তি। আমার ক্ষীরটুকু দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর বাঁট। (ক ৪।৭।২)

ইদানীংকালেও বিভূতিবিলাসের প্রকৃষ্ট স্ফুরণ শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর জীবন-আচরণ, ধ্যান-ধারণা সব কিছুই মানবকল্যাণমুখী। শুধু কি তাই? তাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরপ্রেমের যে স্ফুরণ ঘটেছে এমনভাবে যে সকল মানুষই তাঁর প্রতি অনুভব করেছে এক অকথিত তীব্র আকর্ষণ। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের স্বরূপসত্তার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বলেন : 'আমি আর কি?—তিনি।···এর ভিতর ঈশ্বরের সত্তা রয়েছে। তাই এত লোকের আকর্ষণ বাড়ছে। ছুঁয়ে দিলেই হয়। সে টান, সে-আকর্ষণ ঈশ্বরেরই আকর্ষণ।'[৭] আজ নিত্য শাশ্বত ঈশ্বরই বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুনরাবির্ভূত হয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ ধারণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন তাঁর স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য : তোমাদের একটা গুহ্যকথা বলছি। সেদিন দেখলাম আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এসে রূপ ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার। দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব ; তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।[৭]

শাশ্বত কল্পতরু ঈশ্বরের কৃপা-গোমুখ হচ্ছেন অবতার। সেখানে কালও ঈশ্বরের বিভূতিমাত্র। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : কালঃ কলয়তামহম্। কালগণনাকারিদের মধ্যে কালরূপী আমি। কালের পটভূমিকায় ঈশকৃপা বিশ্বব্যাপী অনুস্যূত। কৃপাঘন অবতারপুরুষকে বন্দনা করেছে চৈতন্যচন্দ্রোদয়। বলেছে 'কৃপাসুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।' প্রেমদাদাস মিশ্র লিখেছেন, 'কৃপাসুধাস্তিভুবি রামকৃষ্ণঃ'। স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে তিনি 'নিষ্কারণ-ভবত-শরণ'। অভূতপূর্ব করুণা বিতরণই শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের অন্যতম মাধুর্য।

ভক্তগণের মধ্যে কৃপাসঞ্চালন যেন অবতারের দায়। শ্রীরামকৃষ্ণ সে-দায়িত্বের বোঝা কাঁধে বয়েছেন, বলেছেন : এসে পড়েছি যে দায়, সে দায় বলব কায়। / যার দায় সে আপনি জানে, পর কি জানে পরের দায়।' শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপাবিতরণের ভূমিকাটি সুচিত্রিত হয়েছে ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি স্মৃতিচারণে। তিনি বলেছিলেন : একদিন পরমহংসদেবের নিকট গিয়ে দেখি তিনি কর কর করে কাঁদছেন ও বলছেন, 'নিতাই আমার হেটে হেটে ঘরে ঘরে প্রেম দিয়েছিলেন, আমি কিন্তু গাড়ী না হলে চলতে পারি না।' আর একসময়ে বলেছিলেন, 'আমি সাত ঘেরেও পরের উপকার করব।' তাঁর কাছের কোন প্রত্যাশা ছিল না। তিনি আমার নিষ্কামধর্মের ও প্রত্যাশাশূন্য হইয়া পরোপকারের আদর্শস্থল।'[৮] ভক্ত গিরিশচন্দ্রের মুখে শুনতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা : আমি কোন জায়গায় আবদ্ধ নাই, কেবল দয়া। সব গেছে কেবল এক দয়া আছে। গিরিশচন্দ্র যথার্থই বলেছিলেন : যেখানে সর্বজীবে দয়া, আমি তাহাকেই অবতার বলি। এই যুক্তিবিচারে শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু অবতার নন, তিনি অবতারবরিষ্ঠ।

৭। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত / ৫ খণ্ড পরিশিষ্ট : শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র, ১০।৫৭

৮। রামকৃষ্ণ মিশন এগোশিবসমের ষোড়শ অধিবেশনে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্রের ভাষণ।

মানুষ-অবয়বে আবদ্ধ একখণ্ড দয়াঘন ঈশসত্তাই শ্রীরামকৃষ্ণ-অবতার-বিগ্রহ। 'প্রেম-গলিত চিত্ত' 'প্রেমাক্তি গম্ভীর' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবৈশ্বর্য কল্পপাদপসদৃশ। আশৈশব তাঁর জীবনে কৃপার ছড়াছড়ি। শৈশবে চিন্তুশাঁখারীকে ইষ্টদর্শন করান, ভিক্ষা-মা ধুনী কামারনীর আকাঙ্খা পূরণ, যৌবনে হৃদয়-জননী হেমাঙ্গিনীকে কৃপাদান, মথুরনাথের অভীষ্ট প্রদান, প্রৌঢ়াবস্থায় অসংখ্য ব্যক্তিকে কৃপাবিতরণের কাহিনীর ফুল্লকমল কথার সূত্রে গাঁথলে গড়ে উঠবে শ্রীরামকৃষ্ণের গলশোভিত প্রেমমালাখানি।

মানুষ ও দৈবভাবের সংমিশ্রণে অবতারজীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'এর ভিতর দুটি আছেন। একটি তিনি—আরেকটি ভক্ত হয়ে আছে।' মানুষভাবের আধিক্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দীন ভক্ত। সেইভাবে তিনি বলতেন, "আমার আশীর্বাদ করতে নেই।" আবার দৈবভাবের আধিক্যে তিনি বলিষ্ঠভাবে স্বীয় গুরুশক্তি প্রকট করেছেন। সে-ভাবের আধিক্যে তিনি বলতেন : ন্যাংটা এখানে ঢং ফং নেই। আমি ভাবে বলেছি—মা! এখানে যারা আন্তরিক টানে আসবে তারা যেন সিদ্ধ হয়।" তিনি বিভিন্ন সময়ে বলেছেন, 'আশীর্বাদ করি, তোমাদের চৈতন্য হোক।" জীবনভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ বলেছেন, "বিশ্বব্যাপী আমি বা শ্রীজগদম্বার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিজানুগ্রহসমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত।...তখন কল্পতরুর মত জিজ্ঞাসা করিতেন 'তুই কি চাস?' প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্য-বিচারে অবতারপুরুষের জীবন ও কল্পতরু প্রায় সমার্থক।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণগীতি ॥

শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস

রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ ভজ মন,
তাঁর মধুর মূরতী কর আরতি
হৃদয়মন্দিরে অনুক্ষণ।
তিনি গোলকবিহারী পূর্ণব্রহ্ম-হরি,
এসেছেন জগতে নররূপ ধরি,
অজ্ঞান আঁধারে আলোর দিশারী
তাই, খুলে দিলেন সবা জ্ঞানলোচন।
পার হয়ে যাবে অকূল পাথার
সমুখে রয়েছে ভবকর্ণধার,
দুইহাতে ধরো চরণ তাঁহার
তিনি যে এবার অধমতারণ।
হৃদয়ে লইয়া প্রেমের মাধুরী,
সর্ব ধর্ম তিনি সাধন করি'
দিয়ে গেলেন সবে অন্তরভরি
মাতৃমন্ত্র পরমধন।

●

॥ হিমালয়ের পথে পথে—কেদারনাথ ॥

শ্রীবিশ্বজিত দাস

এই সেই ঋষিকেশ। যেখান থেকে আমার যাত্রা হবে শুরু। শুনেছি হিন্দিতে ঋষিক্ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় দমন করা যায় যেখানে। কিন্তু বর্তমানের ঋষিকেশে ইন্দ্রিয় দমন দূরে থাক ইন্দ্রিয়কে প্রলুব্ধ করার মত উপকরণের কোন অভাব নেই।

বরাহপুরাণের দেবদত্তের কন্যা রম্ভা কি এই ঋষিকেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন? তিনি তো মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন—'হে দেবাদিদেব আমার তো নিজের জন্য চাইবার কিছুই নেই। আপনি যে আমায় দর্শন দিয়েছেন এতেই আমি ধন্য। তবে এই পৃথিবীতে তপস্যা করার মত ভূমির বড় অভাব। আপনি অনন্তকাল এই শান্ত স্নিগ্ধ ঋষিকেশে অবস্থান করে তাকে ঋষিদেরই তপস্যাভূমির উপযুক্ত করে তুলুন।'

কিন্তু আজকের ঋষিকেশ দেখলেই মনে হয় সেই দুরূহ কাজটিতে মহাদেব সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। আর তাই তিনি এখানকার হৈ চৈ আর রেডিও সিলোনের চীৎকারে ঋষিকেশ ছেড়ে পালিয়ে বেঁচেছেন।

বাসস্ট্যাণ্ডে দীর্ঘ লাইন। বোধহয় আগামী দু'তিন দিনের টিকিট পাওয়া সম্ভব হবে না। তবে আমার ভাগ্যটি বোধহয় ভালো ছিল। এক মিলিটারী অফিসারের সৌজন্যে আগামীকালই কেদারনাথ যাবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লছমনঝুলার দিকে এগিয়ে চলি।

তার আগে একটি কাজ সেরে নিতে হয়। আর সেই কাজটাতেই আমি ছোট বেলা থেকে ভয় পেয়ে এসেছি। কিন্তু উপায় নেই। সে কাজটি সমাধা না হলে আমার কেদার-যাত্রা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহ'ল কলেরার ইন্‌জেক্‌শন্ নেওয়া। এর প্রমাণপত্র যাত্রা-পথের শুরুতেই দেখানোর প্রয়োজন হয়। সুতরাং উপায় যেখানে একেবারেই নেই সেখানে ইন্‌জেক্‌শন্ নিতেই হোলো। অসুখের ভয়ের থেকে যাত্রাবন্ধের ভয়টাই আমার কাছে বড়।

পাহাড়ের আঁকা বাঁকা শিচঢালা পথে একটু এগোলেই ডানদিকে লছমনঝুলা যাবার পথ। ঝুলায় পৌঁছবার আগেই লক্ষণেশ্বর শিবের মন্দির এবং লক্ষ্মণ মন্দির।

কথিত আছে যে ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করার পাপে লক্ষ্মণ একবার বড় কঠিন অসুখে আক্রান্ত হন। তখন বশিষ্ঠ দেব তাঁকে পরামর্শ দেন এই ঋষিকেশে এসে মহাদেবের তপস্যা করতে। বড় কঠিন সে তপস্যা। তপস্যার প্রথম কয়েক বছর লক্ষ্মণ অনাহারে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকতেন। এরপর এক শতাব্দী তিনি কেবল নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন, কিন্তু কোন খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করতেন না। এবং শেষ একশো বছর তিনি কেবল সামান্য ফলমূল খেতেন। তাঁর এই দীর্ঘ তপস্যা তিনি এক পায়ে দাঁড়িয়ে সমাধা করেন। সেই তপস্যা-ক্ষেত্রেই গড়ে উঠেছে এই লক্ষ্মণ মন্দির।

মহাদেব তুষ্ট হয়ে লক্ষ্মণকে দর্শন দিয়ে তাঁর সমস্ত পাপ বিনাশ করলেন। এবং নিজেও সেখানে লক্ষণেশ্বর শিব নামে বিরাজ করতে লাগলেন। পাশেই তাই তৈরী হয়েছে লক্ষণেশ্বর শিবের মন্দির।

এরপর ঝুলা। গঙ্গার ওপারে যাবার সেতু। আগে ঝুলাটি ছিল দড়ির। তার ফলে দুলতোও খুব। কিন্তু আজ শক্ত তারের বাঁধনে পড়ে তার সে দুলুনী স্তব্ধ হয়ে গেছে।

ঝুলা পেরিয়ে গণেশজীর মন্দির, হনুমানজীর মন্দির আর টিকারি মন্দির। এছাড়াও রয়েছে গীতা ভবন, পরমার্থ নিকেতন। গীতাভবনটি স্থাপন করেন শেঠ জয়দয়াল গোয়েন্কা। ভবনটির গায়ে কেবল গীতা নয় রামায়ণের পাঁচটি কাণ্ডও সেখানে উৎকীর্ণ রয়েছে।

এবার নৌকো করে গঙ্গা পেরোই। ফিরে আসি সেই শত্রুঘ্নমুখর ঋষিকেশে। আজকের রাতটি এখানে কালীকমলীর ধর্মশালায় কাটাতে হবে। নতুবা উপায় নেই। কারণ বাস আগামীকাল সকালে।

হিমালয়ের পথে পথে রয়েছে এই কালীকমলীর ধর্মশালা। যাঁর আসল নাম শ্রী ১০৮ স্বামী বিত্তানন্দ গিরি। দীর্ঘকাল বদ্রীনাথে তপস্যা করার পর তিনি হিমালয়ের তীর্থপথে ধর্মশালা তৈরী করার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে নির্দেশ পান। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর কলকাতায় আসা। কলকাতায় একটা কালো কম্বল গায়ে দিয়ে আর মাথায় পেতলের হাঁড়ির মধ্যে জলন্ত কয়লা রেখে ঘুরে বেড়াতেন বাড়ী বাড়ী। সকলের কাছে অনুরোধ করতেন ধর্মশালা নির্মাণের জন্য সাহায্য করতে। ধনীদের অনুরোধ করতেন ধর্মশালা বানিয়ে দিতে। কাজ এগিয়ে চলল। আর ঐ কালো কম্বল থেকেই তিনি পরিচিত হলেন কালিকমলী নামে।

• • •

ঘুম ভেঙেছে অনেক আগেই। যাত্রা শুরুর উত্তেজনায় পথে বেরিয়ে পড়েছি। তখনও অন্ধকার ভালো করে কাটেনি। ইতিমধ্যে সেই মিলিটারী অফিসারও এসে হাজির, আমায় যিনি যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁকে তাই আবার একবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনিও প্রতি নমস্কার করেন।

বাস যখন ছাড়লো তখন পাহাড়ের কোলে সোনালী রোদ তার লুকোচুরী খেলা শুরু করে দিয়েছে। প্রচণ্ড গর্জন করে বাস ওপরে উঠতে শুরু করেছে। গঙ্গাকে কখনো ডাইনে কখনও বাঁয়ে রেখে সে ছুটে চলেছে।

দেবপ্রয়াগ। ঋষিকেশ থেকে দূরত্ব ৬৯ কিলোমিটার। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর মিলিত ধারা এখানে এসে যুক্ত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। নাম হয়েছে গঙ্গা। উচ্চতা খুব একটা বেশী নয়। তাই এখনও বেশ গরম লাগছে। কলকাতার গরমের চেয়ে কোন অংশে তা কমতি নয়। একেই এপ্রিল মাস।

আমার পাশের এক বাঙালী পরিবারের মজা দেখছিলাম। তাঁরা তিন বন্ধু আর তাঁদের একজনের স্ত্রী—এই চারজনের দল। তাঁরা সবাই একটা মাত্র ভিজে গামছা নিয়ে টানাটানি করছেন। বার বার তাতে তাঁদের ঘর্মাক্ত মুখ মুছে সন্তোষ হবার চেষ্টা করছেন।

বাস দেবপ্রয়াগে একটু থেমেছিল। আবার সচল হতেই এবার ওঁরা আমার সঙ্গে আলাপ জমানোর জন্য সচেষ্ট হলেন। কথাবার্তা শুরু করে দিলেন হিন্দিতেই। শেষে আমি বাঙলা বলছি দেখে ঘাবড়ে গেলেন। এবং শেষে যখন শুনলেন ওঁদের মত আমিও কলকাতা থেকেই আসছি তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

চিরঞ্জীব প্রসাদ চৌধুরী চলেছেন সস্ত্রীক। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন একই অফিসের কর্মী পদ্মভূষণ লাহিড়ী আর কীর্তি চক্রবর্তী। আমাকে একা দেখে তাঁরা বেশ বিস্মিতও হলেন। বললেন—'এ পথে তো একা সাধারণতঃ কেউ আসে না।' বললুম—'কেউ আসে না আমি এলুম। কারণ নিজের মত বলতে পারার আনন্দ আছে। তবে কেউ যদি আমার তালে চলতে পারে তবে তাকে আমার সঙ্গী করে নিতে আপত্তি নেই?' কথা শুনে চিরঞ্জীববাবু খুব খুশী। বললেন—'বেশ আমরাও যাবো আপনার সঙ্গে।' জিজ্ঞেস করলুম—'কোথায় যাবেন?' উত্তর হোলো—'বদ্রীনাথ'।—'তাহলে হোলো না। কারণ আমি আগে যাবো কেদারনাথ। তারপর বদ্রীনাথ।' একটু ভারাক্রান্ত মন নিয়েই ওঁরা নেমে গেলেন রুদ্রপ্রয়াগে। ওখান থেকেই মিলবে বদ্রীনাথের বাস। বাস না ছাড়া পর্যন্ত ওঁরা দাঁড়িয়ে রইলেন। বিদায় দিলেন চোখের জলে।

হিমালয়ের এও এক অদ্ভুত গুণ। পথের অচেনা মানুষকে সে এক মুহূর্তে আপন করে দেয়। একের কাছে অপরের দুঃখ বেদনাকে ভাগ করে দেয়।

প্রায় সন্ধ্যে নাগাদ বাস এসে সীতাপুর পৌঁছলো। আজকেই শোনপ্রয়াগ পৌঁছে যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু পথে বহু দেরী হয়ে গেছে। সুতরাং আজকের মত সীতাপুর চটিতেই আমাদের রাত কাটাতে হবে। সীতাপুরে যাত্রীরা সাধারণতঃ কেউ থাকেন না। কারণ থাকার প্রয়োজন হয় না। আজ হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে এতগুলি খদ্দের পেয়ে মালিক স্বাভাবিক কারণেই খুব খুশী হয়ে উঠেছে।

• • • •

সকাল হতে না হতেই যাত্রীদের সবার মধ্যেই সাড়া পড়ে গেছে। বাসও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিল। পিচ ঢালা রাস্তা আর নেই। মাটি আর পাথুরে পথ। একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্যপাশে খাদ। এরই মধ্যে দিয়ে বাস এসে পৌঁছল শোনপ্রয়াগ। কেদারনাথের পথে শেষ বাস রাস্তা। এখন অবশ্য শোনপ্রয়াগ থেকে জীপ আরও তিন মাইল পথ এগিয়ে নিয়ে যায়।

এবার হাঁটা পথ। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের যাত্রা হোলো শুরু। প্রথম দিকটায় চড়াই বড় বেশী। পথও কাদায় পিচ্ছল। কোন মতে পা চেপে চেপে হাত দিয়ে মাটি আঁকড়ে এগিয়ে চলেছি।

বড় অদ্ভুত পরিবেশ। চারপাশে সবুজের মেলা, বাতাসের হু হু শব্দ আর মন্দাকিনীর উত্তাল গর্জন। মাঝে মাঝে ডিনামাইটের শব্দ পাচ্ছি। পাহাড় ভেঙে তৈরী হচ্ছে যানবান চলার পথ। আর সেই সাথে নষ্ট হচ্ছে পাহাড়ের আসল সৌন্দর্য্য। যে পাহাড় একদিন

নিবিড় শান্তির আশ্রয় আর দুর্গমতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারই কোল ঘেঁষে আজ ছুটে চলেছে বাস আর মোটর। কোথায় হারিয়ে গেছে সেই কাঁচা পরিবেশ।

পেরিয়ে এলাম 'মুণ্ডুকাটা গণেশ', পেরিয়ে এলাম গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডে একটি উষ্ণ কুণ্ড আছে। যেটি পার্বতীর স্নানের জন্য মহাদেব সৃষ্টি করেছিলেন। সেখানে স্নান করার ইচ্ছে থাকলেও সময় নেই। যাত্রা শুরুতেই দেরী হয়েছে। তাই আজকেই কেদারনাথ পৌঁছানোর জন্য দ্রুত চলতেই হবে।

হেঁটে চলেছি প্রায় সাড়ে ছ'হাজার ফুট উঁচু দিয়ে। পথ আস্তে আস্তে উঁচু হচ্ছে। এক একটা করে বাঁক ঘুরছি আর চোখের সামনে খুলে যাচ্ছে নতুন নতুন দৃশ্যপট।

আকাশ আজ ঝকঝকে নীল। যাত্রাপথে এমন আকাশ পাওয়াই ভার। তাই দাঁড়াতে মন চাইছে না। মন না চাইলেও পা একটু বিশ্রাম চাইছে। গৌরীকুণ্ড থেকে ৬ কিলোমিটার এসে জংগল চটিতে একটু দাঁড়াই।

একটু চা খাই। কলকাতার পাঞ্জাবী হোটেলের চা নয়। কিংবা চৌরঙ্গীর বিখ্যাত হোটেলের চা-ও নয়। তবু নিজস্ব বৈচিত্র্যেই এ অনুপম। সস্তা দামের চায়ের গুঁড়োতে গরম জল ঢেলে তৈরী হচ্ছে লিকার। এবার তাতে পোয়াটাক খাঁটি দুধ মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে এই চা। চায়ের গ্লাস হাতে নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাই।

পাহাড়ের মাথায় বরফের সাজ। জায়গায় জায়গায় সে বরফ গলে নেমেছে ঝরণার দল। ভাবতে চেষ্টা করি এখানে যখন বরফ গলছে কলকাতার রাস্তায় তখন গলছে পিচ্।

এবার সামনে মৈসিয়ার। বরফের মাঠ। নরম নয়, মোটামুটি শক্ত বরফ। তারই ওপর পা রেখে সাবধানে এগোতে হবে। একবার পা পিছলোলেই মন্দাকিনীর গর্ভে সলিল সমাধি।

সামনে এক বৃদ্ধ অতি কষ্টে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেও বিফল হচ্ছেন। হাতের লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হু হু করে উড়ছে তাঁর অবিন্যস্ত ধুতি। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে তাঁর হাত ধরি। বলি চলে আসুন। এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে মারা পড়বেন।'

বরফের মাঠ পেরিয়ে শক্ত মাটির রাস্তায় নেমে প্রশ্ন করি 'এই বুড়ো বয়েসে কি এত কষ্ট না করলেই আপনার চলছিলো না? ভারতবর্ষে তো আরও অনেক তীর্থ রয়েছে।' বৃদ্ধ বললেন—'কি জানি বাবা। আমি তো নিজে যাচ্ছি না। মনে হয় কে যেন আমায় টেনে নিয়ে চলেছে'। আমি কেবল শিশুর মত তাঁকে অনুসরণ করছি।' প্রশ্ন করি, 'একা এসেছেন?' বললেন—'হ্যাঁ'।

সামনেই রামওয়াড়া চটি। বিকেল হয়ে গেছে। বৃদ্ধকে সেদিন রামওয়াড়াতেই বিশ্রাম করতে বলে আমি এগিয়ে যাই। আমাকে আজ কেদারনাথ পৌঁছতেই হবে।

এপথে যারা ফিরে আসছে তাদের মুখে জয়ধ্বনি 'কেদারনাথজী কি জয়'। মনে সাহস পাই এই জয়ধ্বনিতে। মনে হয় পারবো, পারবো সেই দুর্গম তীর্থের পরম দেবতার কাছে পৌঁছতে, আজই পারবো।

সামনে আবার গ্লেসিয়ার। সাবধানে পার হচ্ছি। ঠাণ্ডাও বেড়েছে। উচ্চতাটাও তো কম নয়। প্রায় ১০ হাজার ফুট ওপরে বিচরণ করছি। ঝোড়ো বাতাসের সঙ্গে অল্প অল্প বরফের টুকরোও এসে গায়ে পড়ছে। ঐ তো। ঐ তো সামনে দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের চূড়া। তাহলে আর দেরি নেই। কিন্তু আর যে চলতে পারছি না। বরফের গুড়োয় হাত পা মাথা ভরে যাচ্ছে। নিঃশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। তবু থামলে চলবে না।

কার শক্ত হাত যেন আমার হাত চেপে ধরে। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যায়। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানি না। তবে সামনে এগিয়ে চলেছি এটুকু ঠিক। দূরত্ব কমছে। দূরত্ব কমছে আমার সেই দুর্গম তীর্থদেবতার সঙ্গে।

আস্তে আস্তে উষ্ণতার পরশ পাই। চোখ মেলে দেখি সামনে বড় উনুন জ্বলছে। আমার মাথা গা থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলছেন এক যুবক।

হোটেলের ম্যানেজার তিনি। মিঃ নেগী। আমায় এনে তুলেছেন তাঁর হোটেলে। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার নেই।

• • •

ভোরবেলাই মন্দাকিনীর বরফ-শীতল জলে স্নান সেরে চললাম মন্দির দর্শনে। কাঠের বিশাল প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে মন্দিরের প্রথম অংশে এসে পৌঁছলাম। এখানে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত লক্ষ্মী জনার্দ্দনের মূর্তি, ভক্ত গরুড়ের প্রতিমূর্তি, এবং ধাতুনির্মিত ষাঁড়ের মূর্তি। দেওয়ালে পঞ্চপাণ্ডব, শ্রীকৃষ্ণ, দ্রৌপদী এবং মাতা কুন্তীর মূর্তি। মাঝে সুবিশাল যজ্ঞ বেদী। জনপ্রবাদ বলে যে মন্দিরের এই অংশটি বহু পরে, শঙ্করাচার্য্য যখন মন্দির সংস্কার করেন তখন নির্মিত হয়।

ডানদিকে মাতা গৌরীর মূর্তি রেখে সামনে এগোই। সামনেই কেদারনাথের শিলাময় রূপ। ভগবান মহাদেবের বারোটি জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম একটি। চারপাশে ছোট ছোট খুপরীতে জ্বলছে খাঁটি ঘি-এর প্রদীপ, মোমের আলো। কেদারনাথের মাথায় সুগন্ধি ফুলের সমাবেশ। গায়ে ঘিয়ের আস্তরণ।

আকুল হয়ে জড়িয়ে ধরি কেদারনাথকে। তীর্থের দেবতাকে এমনি করে আঁকড়ে ধরতে পারার সুযোগ বুঝি আর কোন তীর্থে নেই। এমনি করে আঁকড়ে ধরে মানুষ ভুলে যায় তার দুঃখ, কষ্ট, পথের ক্লান্তি, খুঁজে পায় মনের শান্তি।

প্রার্থনা করি তুমি আমাদের শক্তি দাও, অভয় দাও, জীবনের দুর্গম পথে সহায় হও।

কেদারনাথ এখানে এবড়ো খেবড়ো বৃহৎ একটুকরো পাথর মাত্র। তবু তার মধ্যেই মানুষ খুঁজে পায় তার চিরদিনের আকাঙ্খিতকে।

এই কেদারনাথকে নিয়ে প্রচলিত রয়েছে দুটি গল্প। আজ তার দু'টিই আপনাদের শোনাব।

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে স্বয়ং মহাদেব রয়েছেন পাণ্ডব শিবিরে দ্বারী হয়ে। শিবিরে রয়েছে পঞ্চপাণ্ডবদের নিত্য পঞ্চ পুত্র। এদিকে অশ্বত্থামা বন্দী আঁটছেন পাণ্ডবেরা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত

থাকবেন ততক্ষণে তাদের ঐ পাঁচটি শিশুকে হত্যা করা যায় কিভাবে! মহাদেবকে বিল্বপত্রে সন্তুষ্ট করে অশ্বত্থামা শিবির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কার্য সমাধা করলেন। সব জানতে পেরেও দেবাদিদেব শঙ্কর নিশ্চুপ হয়ে রইলেন।

এদিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে পাণ্ডবেরা এই অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। বেগতিক দেখে মহাদেব হিমালয়ে পলায়ন করলেন। ভীমসেনও মহাদেবের পশ্চাৎধাবন করলেন। এই কেদারে এসে আটকা পড়লেন মহাদেব। দেখলেন তিনদিকের পথ রুদ্ধ। অন্য দিক থেকে ভীমও এসে পৌঁছেছেন।

সেখানে বিচরণ করছিল একটি মহিষের দল। মহাদেব মহিষের রূপ ধারণ করে মিশে গেলেন তাদের মধ্যে। ভীম ব্যাপার দেখে তৎক্ষণাৎ এক বুদ্ধি খাটালেন। দুই পা ফাঁক করে সেই মহিষদলের সামনে দাঁড়ালেন বৃহৎ প্রাচীরের মত। তারপর একটি একটি করে মহিষকে তাঁর দুই পায়ের ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করাতে লাগলেন। কিন্তু মহিষরূপী মহাদেব পারলেন না প্রবেশ করতে। ধরা পড়ে গেলেন। ভীমসেন প্রচণ্ড ক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মহিষরূপী মহাদেবের ওপর। সেই প্রচণ্ড চাপে মহাদেব ভূগর্ভে প্রবেশের চেষ্টা করলেন। কথিত আছে মস্তকের ভূগর্ভস্থ অংশ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেপালের পশুপতিনাথে প্রকাশ পায় এবং বাকী অংশ এই কেদারেই থেকে যায় প্রস্তরীভূত অবস্থায়। এই সেই কেদারনাথ। মহাপ্রস্থানের পথে যাবার সময়েও পাণ্ডবরা এই কেদারনাথের পূজা করেন।

আবার এ ঘটনাও কম জনপ্রিয় নয় যে সত্যযুগে হিরণাক্ষ, সুবাহু, বজ্রকন্দর, ত্রিশৃঙ্গ এবং লোহিতাক্ষ নামে পাঁচ দানব ছিল। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইন্দ্র এই কেদারে বসে মহাদেবের তপস্যা করেন। তখন মহাদেব মহিষরূপ ধারণ করে ধরাতল থেকে উত্থিত হয়ে ঐ পঞ্চদানবকে বিনাশ করেন এবং ইন্দ্রের অনুরোধে ত্রিলোকের মঙ্গলার্থে এই পুণ্য কেদারে অধিষ্ঠিত হন।

মন্দির থেকে বেরিয়ে যেদিকে তাকাই সেদিকেই কেবল শুভ্র তুষার। বরফের মুকুট পরে নাগাধিরাজ আপন গৌরবে ঈষৎ পশ্চাতে হেলে দণ্ডায়মান রয়েছেন।

কেদারনাথের মন্দিরের ঠিক পেছনেই নীলকণ্ঠ পাহাড়। তার নীল কণ্ঠ সাদা মেঘ আর বরফের আচ্ছাদনে আবৃত। নীলকণ্ঠ পাহাড়ের ঠিক ওপাশেই বদ্রীনাথের মন্দির। পথের দৈর্ঘ্য মাত্র ৬ মাইল। কিন্তু সে পথে আজও যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ সে পথে রয়েছে তুষারঝঞ্ঝা, তুষারসমুদ্র। তাই সেই ছ'মাইলের বিপদসংকুল পথকে এড়িয়ে আজও বদ্রীনাথ যেতে হচ্ছে শত মাইল ঘুরে।

কেদারনাথের মন্দিরের পেছনে নীলকণ্ঠর প্রায় গা ঘেঁষেই রয়েছে শঙ্করাচার্যের সমাধি। যখন বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে অধ্যাত্মবিদ্যা বিপর্যস্ত হতে শুরু করেছিল তখনই ভগবান শঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন কেরলের কালাদি গ্রামে। তিনি তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ঐশ্বরিক শক্তির বলে প্রাতঃসূর্যের মত সমস্ত অন্ধকারকে দূরীভূত করে অধ্যাত্ম বিদ্যাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

অনেকে বলেন কেদারনাথের ধ্যানে মগ্ন হয়ে এইখানেই তিনি তাঁর নশ্বর দেহত্যাগ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন স্বাভাবিক লীলা সমাধি করে শঙ্কর এগিয়ে যান সেই পথে যে পথে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে গিয়েছিলেন। পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তখন স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাঁর মরদেহ তুলে এনে এইখানে সমাধিস্থ করে।

যুক্তিতর্কের মধ্যে যেতে চাই না। হিমাদ্রির কোলে পরম শান্তিতে যে মহাপুরুষ আজও বিরাজ করছেন মনে মনে তাঁকেই প্রণাম জানাই। আজ আমি ধন্য। মনের মধ্যে যে সুপ্ত বাসনা এতদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল আজ তার নিরসন হল। এই সেই পুণ্যভূমি কেদার যেখানে পাণ্ডবরা এসেছেন। এসেছেন স্বয়ং ইন্দ্র তপস্যা করতে করতে, তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব দেখা দিয়েছেন এখানেই। আবার এই কেদার পবিত্র হয়েছে ভগবান শঙ্করের পাদস্পর্শে। যুগে যুগে এই কেদার তার স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে মানুষকে হাতছানি দেবে। শান্তির অন্বেষণে মানুষ তাই বহু যুগ অতীত থেকেই ছুটে আসে এই দুর্গম তীর্থে। কত কামনা, কত বাসনা, কত দৈন্য বেদনা নিয়ে। তীর্থের দেবতাকে আলিঙ্গন করে সে সব থেকে মুক্তি পায় তারা, শান্তির পরম ঐশ্বর্যে হয়ে ওঠে ভাস্বর।

ফিরতি পথের সব মানুষের মুখ তাই আনন্দে উজ্জ্বল। হবেই তো। তারা যে আনন্দের সন্তান। অমৃতের সন্তান। আনন্দে থাকাই আমাদের লক্ষ্য। আর যাদের চোখে জল—সে অশ্রু আনন্দের।

আমিও আজ ফিরতি পথের যাত্রী। মিঃ নেগীকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। তাঁর উপকার আমি কোনদিন ভুলতে পারবো না। ঐ তুষার ঝড় থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করে না নিয়ে এলে কি যে হোতো তা কল্পনাতেও আনতে পারি না। আবার হোটেলে থাকা-খাওয়ার জন্য তিনি আমার কাছ থেকে একটি পয়সাও নেননি।

তীর্থ থেকে ফেরার পথে পিছুটান রাখতে নেই। তাই দ্রুত এগিয়ে চলেছি। ইচ্ছে আছে আজই গৌনপ্রয়াগ পৌঁছে কালকেই বদ্রীনাথের বাস ধরবো।

ফেলে এলাম রামওয়াড়া, জংগল চটি। কিন্তু ঐ দূরে কাদের দেখতে পাচ্ছি। পাকদণ্ডী বেয়ে যে চারজন মানুষ উঠে আসছে তাদের অতি পরিচিত মনে হচ্ছে। কিন্তু এই একদিনের মধ্যে বদ্রীনাথ দর্শন সেরে চিরঞ্জীবদারা ফিরে এলেন কি করে?

আমিও দ্রুত এগিয়ে যাই। আমাকে দেখতে পেয়েই চিরঞ্জীবদা বললেন—'আরে। আপনি নেমে যাচ্ছেন। আপনার জন্য বদ্রীনাথ বাতিল করে কেদারনাথেই আগে এলুম। তাহলে এবারেও আপনার সঙ্গ পাবো না? তার চেয়ে চলুন কেদারনাথ ফিরে চলুন। আমরা তারপর একসাথে এগোবো।' বললাম—'তা কি করে হয়? যে পথ একবার পেছনে ফেলে এসেছি সেদিকে আর ফেরা যায় না। দেখুন ভগবান আবার ঠিক মিলিয়ে দেবেন আমাদের।'

বিদায় জানিয়ে আমরা এগিয়ে চলি দুই বিপরীত পথে। দূরত্ব বাড়তে থাকে। কানে বাজতে থাকে কেদারনাথের জয়ধ্বনি।

●

।। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও ইতিহাসের যোগসূত্র ।।

শ্রীরতন দাশগুপ্ত

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ রচনার পিছনে ইতিহাসের যোগসূত্র কতটুকু রয়েছে এবং যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করে উপন্যাসের মূল কাঠামোকে চিত্রিত করা হয়েছে তাতে ইতিহাসের উপাদান কতটুকু রক্ষিত হয়েছে ?

এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হোল·····আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন এ গ্রন্থের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব·····ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। (দেবীচৌধুরাণীর বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা লেখেন)।

আনন্দমঠের চরিত্রগুলি বঙ্কিমের ভাবাদর্শের সঙ্গে অন্বিত হয়ে নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে একটা ভাবগত সংহতি রক্ষা হয়েছে। এই ভাবাদর্শের মূল চরিত্রগুলি আদর্শায়িত হয়েছে, সন্তানধর্মের ত্যাগ ও তপস্যার মধ্যে, ভক্তিতত্ত্ব হোল যার চরম পরিণতি। দেশমাতৃকার ধ্যানে অন্তর্লোক পরিশুদ্ধ ক'রে জীবনসর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হবে না।

আনন্দমঠ পুস্তক-আকারে প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর। বন্দেমাতরম্ গানটি তার পূর্বেই রচিত হয়েছিল পরে এটি সংযোজিত হয়। এই সংযোজনের ঘটনা নিয়ে একটি ছোট কাহিনী জড়িয়ে আছে। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্যে পাওয়া যায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের প্রাক্কালে কিছু পৃষ্ঠাপূরণের জন্য এই গানটি টেবিলের উপর দেখতে পেয়ে জনৈক পণ্ডিত (যিনি বঙ্গদর্শনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন) সেটি চেয়ে নিয়ে বঙ্গদর্শনে পত্রস্থ করার জন্য অনুরোধ করেন। লেখক তাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। এই গানটিকে কেন্দ্র করে আমাদের ভাবোদ্দীপনার বন্যা বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। এই গানটিকে ঘিরে জাতীর জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তার মূলে ছিল দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিজেকে উৎসর্গ করা। এই দেশ-চেতনাই বৃহত্তর ভারতের সম্মিলিত সাধনার সঙ্গে অখণ্ড ভারতের যোগসূত্র রচনা করে। এই যোগ অবশ্য হিন্দুধর্মের মধ্য দিয়ে একদিন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ঈশ্বর-চেতনার দ্বারা।

আধুনিক রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গত কারণগুলির মধ্যে দেশকে মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা বঙ্কিমের বন্দেমাতরম্। দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার জন্য এই মন্ত্র রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেন সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দ। তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করে পরশাসন থেকে মুক্ত হবার প্রাণোদনা শক্তি সঞ্চার করেন। সেই শক্তি প্রয়োগ হয় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বীর সন্তানদের দ্বারা। অত্যাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথকে প্রশস্ত করেছে এরা। অকুতোভয়ে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, কণ্ঠে ছিল এদের মাতৃবন্দনার মহামন্ত্র—বন্দেমাতরম্। জেটল্যাণ্ডের ভাষায় Ananda Math would serve as the best introduction to the study of Revolutionary movement of Bengal.

আনন্দমঠের আরম্ভ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের গ্রাম বাঙলার হাহাকারের নিখুঁত বর্ণনা, সেই সঙ্গে আছে ১৮৮৬ সালের উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ, ১৮৭৭ সালে দাক্ষিণাত্যের দুর্ভিক্ষ, এতে যথাক্রমে কুড়ি লক্ষ, তিপ্পান্ন লক্ষ ও পঞ্চাশ লক্ষ লোক মারা যায়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আরম্ভ হলেও শেষ পর্যন্ত ইতিহাস-নিরপেক্ষ ঘটনায় পর্যবসিত হয়নি। ব্যাপক বিদ্রোহের মধ্যে ঐতিহাসিক পারম্পর্য কোথাও রক্ষিত হয়নি—ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র আছে সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মধ্যে। সন্ন্যাসীরা মূলত লুঠেরা, এরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দস্যুবৃত্তি করতো। রাজ্য চালাবার মত ব্যবহারিক দক্ষতা ছিল না। হানটারের মতে এদের বৃত্তি ছিল লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ, গ্রামের ধ্বংসসাধন ইত্যাদি।

"The President and Council of Fort William in Bengal informed the Court of Directors in 1773 that bands of Sanyasis and faquirs, with their ranks swollen by Crowds of Starving peasents, came down upon the hervest fields of lower Bengal burning plundering ravaging in bodies of fifty thousand men.[1]

এই সব সন্ন্যাসীরা হলেন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের সমর্থক। এই অদ্বৈতবাদ আবার দশটি শাখায় বিভক্ত, এরা গিরি ও নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত। এরাই গোসাই হিম্মতগিরির অধীনে বক্সার যুদ্ধে মীরকাশেমের পক্ষে যুদ্ধ করেছিল।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথমদিকে রাজ্যে একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে চরম অদূরদর্শিতার জন্য ১৭৭০ সালে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় তার সুযোগ এরা গ্রহণ করেছিল। আনন্দমঠে এর ছায়াপাত ঘটে কিন্তু এই কাহিনীর বৃহৎ পরিসরে ইতিহাসের মর্যাদা কোথাও স্বীকৃতি পায়নি। সে কাহিনী সম্পূর্ণভাবে বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত। এতে নানা তন্ত্রাশ্রয়ী মতবাদের বিচারবুদ্ধি-প্রণোদিত মিশ্রিত-ভক্তিকেই ধর্মের ভিত্তি মনে করা হয়েছে। এই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আত্মত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে তাতে তরুণদের মধ্যে স্বদেশানুরাগ ও দেশাত্মবোধের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। তরুণ মনে একটা দেশপ্রীতির প্রেরণা এনে দিয়েছিল। পরবর্তী জীবনে একে কেন্দ্র করে প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বন্দেমাতরমের সেই সুর ধ্বনিবিক্ষুব্ধ মানসিকতার অভিব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে সন্তানদলের মধ্যে। তারই উত্তরসূরীদের আত্মত্যাগের মধ্যে এই মন্ত্রকে ফরাসী জাতীয়সঙ্গীত মার্সেলিজ পর্যায়ে উন্নিত করেছে। এই দুই জাতীয়সঙ্গীতের মূল চেতনার মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান। মার্সেলিজ বিদ্রোহের উদ্দীপনায় ভরপুর, শাসন শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলার আহ্বান। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত ভক্তিমূলক ও কর্মপ্রবর্তনার উদ্দীপক। মাতার দুঃখ দুর্দশার হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা না করলে এই হতচেতন জাতীকে জাগানো যাবে না, বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা ভালভাবে জানতেন, তাই মাতৃবোধের মধ্য দিয়ে দেশের চিত্তকে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। সেই সঙ্গে বাৎসল্য ধর্মে দীক্ষা দিয়ে দেশকে একান্ত আপনার

1. Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter.

করে তুলেছেন। স্বদেশের দুঃখ দুর্দশার গ্লানিময় দৃশ্য প্রত্যেক দেশপ্রেমিককে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে এই দেশবন্দনার মধ্যে মানুষ মুক্তির বাণী খুঁজে পেয়েছে। সংগ্রামের মধ্যেও এই বাণীকে হাতিয়ার করে তুলেছে।

সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের স্থান নির্ণয় করেন বীরভূমে। ক্যাপটেন টমাসের নেতৃত্বে রঙপুরে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ দমন করার জন্য ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তারা ১৫০০ মত বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এদের স্থানীয় লোকেরা সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। এ কথা লিখেছেন হেস্টিংস কোলব্রুককে (১৭৭৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে), অবশ্য হেস্টিংস এদের বলেছেন দুর্বৃত্ত (Bandit)।

আসলে একটা বিদ্রোহ হয়েছিল কিন্তু তার মধ্যে ইংরাজ-রাজত্বের উৎখাতের জন্য যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াস তার কোন প্রভাব পড়েনি ; কিছুটা লুণ্ঠন প্রবৃত্তির তাড়না ও মন্বন্তরের অভাব-জনিত অবস্থা, কেন্দ্রীয় ও রাজ্যশক্তি, সেই সঙ্গে স্বদেশচেতনার অভাব এর জন্য দায়ী।

বঙ্কিমচন্দ্র এই পটভূমিকায় আনন্দমঠের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেশাত্মবোধের সংহত চেতনার দ্বারা দেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য প্রয়াসী হন। দেশকে জানতে হলে এর পিছনে একটি বড় আদর্শ চাই, মাতৃভাবনাই এই আদর্শের মূল লক্ষ্য। যাঁরা এই আদর্শে ব্রতী হবেন তাঁরা নিঃস্বার্থ, পরোপকারী, উদারচেতা, আদর্শনিষ্ঠ হবেন—যাঁদের আত্মস্বার্থের দিকে মোহ থাকবে না, যাঁরা জীবন পণ করে প্রতিষ্ঠা করবেন মাতৃমন্দির যার মধ্য দিয়ে ভাবীকালের সমাজ গড়ে উঠবে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন, "আনন্দমঠ—আধুনিক বাঙলার জন্মদান করিয়াছে। আধুনিক বাঙালীর হৃদয় ও মনোবৃত্তি গঠিত করিয়াছে। দেশাত্মবোধ আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর সাধারণ মানস-সম্পত্তি, বঙ্কিম তাহার প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়াছেন। ইউরোপের দেশপ্রীতি বাঙালীর বিশেষ অবস্থার মধ্যে বাঙালীর বিশেষ পূজোপকরণের সাহায্যে বাঙালী হৃদয়ের ভিত্তি চন্দনচর্চিত করিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে এমন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নাই যাহার প্রথম প্রেরণা এই আনন্দমঠ হইতে আসে নাই। বাঙালীর রাজনীতির চর্চার বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক বক্তৃতার ভাষা পর্যন্ত বঙ্কিমের কল্পনার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। বঙ্কিম পৌত্তলিক বাঙালীর মানসস্বর্গে এক নতুন দেবী প্রতিমা সৃষ্টি করিয়া স্থাপিত করিয়াছেন। বাঙালীর হৃদয়ের ভক্তিকে এক নতুন পথে চালিত করিয়াছেন। পৃথিবীর যে কয়েকখানি যুগান্তকারী গ্রন্থ আছে আনন্দমঠ তাহাদের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। বন্দেমাতরম্ আধুনিক বাঙালীর বেদমন্ত্র।[2]

বঙ্কিমচন্দ্র যদিও আনন্দমঠকে ইতিহাস নির্ভর নয় বলে চিহ্নিত করেছেন কিন্তু তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাদৃষ্টে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে তখন থেকেই স্বাদেশিকতার উন্মেষ হয়। আনন্দমঠে যে সব চরিত্র রয়েছে

2. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

তার মধ্যে বিদ্রোহের ব্যাপক আয়োজন আছে। বঙ্কিমের সময় থেকেই দেশে নবজাগ্রত স্বদেশীয়ানার প্রভাব ক্রমশঃ দানা বেঁধে ওঠে। ইংরাজ-প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রে ভারতীয়দের ন্যায্য পদমর্যাদার প্রশ্নও দেখা যায়। সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে একটা দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষা দীক্ষায় যারা ওদের থেকে ন্যূন নহে তারা এটাকে একটা জাতীয় চ্যালেঞ্জ হিসাবে ধরে নিয়ে প্রতিবাদে মুখর হন। এই সময় দুটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। একটি লর্ড রিপনের স্বায়ত্বশাসন-বিষয়ক, অন্যটি ইলবার্ট বিল। দুটি ঘটনার উপর বঙ্কিমের মন্তব্য, স্থানীয় লোকদের হাতে শাসনভার দিলে শাসক-সম্প্রদায় অবশ্য নিজেদের দায়মুক্ত হবেন কিন্তু সেটা মঙ্গলকর হবে না। ইলবার্ট বিল নিয়ে যে গোলযোগ হয় বঙ্কিমচন্দ্র Bransonism প্রবন্ধে তা প্রদর্শন করেন। ইলবার্ট বিলে শাসক-সম্প্রদায়ের বক্তব্য হোল, "Trial of a whiteman by an Indian Magistrate as an intolerable piece of degradation." এ দেশের লোকদের অভিমত প্রকাশ করেন বেঙ্গলী পত্রিকা, A great principle is at stake. It will be decided..... whether. Englishman will rule India according to the principles of justice and equality or by force.[3]

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশভক্ত হলেও রাজনীতি পরিহার করে চলতেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, সেজন্য অনেক কিছু প্রকাশ্যভাবে ব্যক্ত করতে পারতেন না। ইংরাজ প্রবর্তিত শাসন-ব্যবস্থাকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাঁর মতে পূর্ববর্তী সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এ সরকারের বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে। আধুনিক রাষ্ট্রচেতনা, সার্বিক মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী দক্ষতা, ন্যায়-বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, মহৎ জীবনাদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এগুলি ইংরাজদের চারিত্রিক মহৎ গুণ। তৎকালীন এ সব আন্দোলনের বাইরে নিরপেক্ষ থাকলেও দ্রুত পরিবর্তিত অবস্থার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ণের জন্য তিনি যে পথ নির্দেশ করেছেন তা সর্বজনবিদিত। এ বিষয়ে তিনি অনেককে উৎসাহ দেন, ঐতিহাসিক চরিত্র তাঁর উপন্যাস ও অন্যান্য লেখার মধ্যে প্রকাশিত। উপন্যাসের বাতাবরণের মধ্যে কল্পনাশ্রয়ী ঘটনার যোগসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র দত্তের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, তিনি বলেছিলেন—Anandamath was published in 1882, about the time of agitation arising out of Ilbert bill.

সমসাময়িক যুগে ঠিক অনুরূপ আর একটি ঘটনার সঙ্গে আনন্দমঠের তুলনা করা যেতে পারে। ঘটনার সঙ্গে এক বিপ্লবীর নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি হলেন বাসুদেব বলবন্ত ফাদকে। তিনিও সন্তানদলের মত ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ইংরাজ রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য লোক সংগ্রহ করে থানা, কোষাগার, রেল, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি অকেজো করে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাতে চেয়েছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ফাদকে এই ধরণের একটি পরিকল্পনা করেন। ৫'শ লোক সংগ্রহ করে হায়দরাবাদের অন্তর্গত শৈল ট্রেজারী

3. History of the Freedom Movement in India. Vol. II—Dr. Tarachand.

লুট করা এবং ইংরাজদের ধ্বংস করার চেষ্টা, অবশ্য এ পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। তাঁকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাঁর পরিধানে ছিল সন্ন্যাসীর পোষাক। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়, তিনি লোক সংগ্রহ করেছেন বিদ্রোহের উদ্দেশ্যে, গোলা বারুদ, আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের চেষ্টা করেছেন। তাঁকে যখন কোর্টে উপস্থিত করা হয় তখন অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য পাওয়া গিয়েছিল। এতে মনে হওয়া স্বাভাবিক তাঁর কার্যকলাপ লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তাঁর আত্মজীবনী ও ডাইরি থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে তিনি দেশকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এ সময় এ বিষয় নিয়ে প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বঙ্কিমচন্দ্র হয়ত এ সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। ১৮৭৯ সালে ডেকান স্টার পত্রিকায় এ বিষয়ে আলোচনা হয়, এতে ফাদকে-কে প্রশংসা করা হয়। তাঁকে পুণাতে পুলিশ যখন ধরে নিয়ে যায় তখন একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা তাঁকে পুষ্পস্তবক উপহার দেন। ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকা লেখে, ১৮৭৯ সালে লেবেন ফাদকে-কে যখন কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন লোকেরা তাঁকে দেখে অভিনন্দন জানিয়েছিল। ইংলিশম্যান, ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ, ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া, বেঙ্গলী, প্যাট্রিয়ট প্রভৃতি কাগজে ১৮৭৯ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বরের মধ্যে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে এ ঘটনার যোগসূত্র অস্বীকার করে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থাদৃষ্টে সন্তানদলের ব্যর্থতার মধ্যে দুটি ঘটনার যোগ থাকা অসম্ভব নয়। ফাদকে দীপান্তরিত হন ১৮৭৯ সালে এবং বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস সমাপ্ত করেন ১৮৮০ সালে। ফাদকে যখন ইংরাজ রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য কৃতসংকল্প তখন পশ্চিম ভারতে দুর্ভিক্ষ বর্তমান। এতে লোকের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষের কারণ বিদেশী শাসনের ফল, তাই বিদেশী শাসনের অবসান চাই। বঙ্কিমের আনন্দমঠেও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়াপাত ঘটেছে। ফাদকের মত সন্ন্যাসীবেশে সন্তানদলও অনুরূপ কার্যকলাপে লিপ্ত ছিল। দুটি ঘটনার যোগ একই সূত্রে গাথা কাজেই দুইয়ের মধ্যে মিল থাকা অসম্ভব নয়। এ ছাড়া আরও প্রমাণ আছে, বৃটিশ পার্লামেণ্টে ও গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলে এ নিয়ে আলোচনা হয়েছিল সমাচার চন্দ্রিকা এ বিষয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল।

ফাদকের কাহিনী পুস্তিকা-আকারে ছেপে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়েছিল। এ সব ঘটনায় কি বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি? বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠস্পৃহা সর্বজনবিদিত, দেশী বিদেশী অনেক সংবাদ তিনি রাখতেন আর এমনি একটি আলোড়নকারী ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না, এটা ভাবা কঠিন।

আনন্দমঠের সন্তানদলের কার্যকলাপ ও ফাদকের কার্যকলাপের সঙ্গে যে সাদৃশ্য রয়েছে তার তুলনামূলক বিচার।

আনন্দমঠের শুরুতেই মন্বন্তরের ছবি, লক্ষ লক্ষ লোকের কাতর ক্রন্দন, ধনী নির্ধন সকলেই দু'মুঠো অন্নের কাঙাল। যারা এককালে ছিল ধনাঢ্য তারাও আজ পথের ভিখারী। '৭৬ সালের মন্বন্তর লেখকের মনোজগতে ক্রিয়াশীল ছিল। তৎকালীন শাসকদলের রাজা-

পরিচালনার ব্যর্থতার মধ্যে ফুটে উঠেছে মনের ক্ষোভ যদিও রাজভক্ত বঙ্কিম সে হাওয়া ঘুরিয়ে দিয়েছেন মুসলিম বিচারব্যবস্থার অনুদারদর্শিতার দিকে। কাদকের জীবনেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ১৮৭৬-৭৭ সালে মহারাষ্ট্রেও দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া বিস্তার করে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষকে পথে বসিয়েছিল। এদের পাশে এসে দাঁড়ালেন কাদকে, এই সব মানুষকে সঙ্ঘবদ্ধ করে সন্তানদলের মত বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে সকলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা মূলতঃ স্বৈরাচারী ইংরাজ-সরকারের বিরুদ্ধে।

সন্ন্যাসীরা গৃহের বন্ধনকে অস্বীকার ক'রে এই বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কাদকেও তাঁর অনুগামীদের অনুরূপ নির্দেশ কঠোরভাবে পালন করতে বলেছিলেন। তিনি নিজেই তাঁর স্ত্রীকে বলেছিলেন স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ না করা পর্যন্ত তিনি ঘরে ফিরবেন না।

সন্তানদলের সত্যানন্দের উক্তি—আমাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নেই। সবাই একই মায়ের সন্তান।

কাদকেও সকলকে এক করে নিয়েছিলেন, কোন জাতিভেদ ছিল না, ছোট জাত, বড় জাতের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে।

কাদকে টাকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খেদ ট্রেজারী লুঠ করার চেষ্টা করেছিলেন। অনুরূপ-ভাবে সন্তানদলও সরকারী টাকা আত্মসাৎ করেছিলেন। এঁরা বিস্তৃত জায়গা নিয়ে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়েছিলেন, তাঁরা পুলিশ বা সৈন্যদলের সম্মুখ সমরে না গিয়ে গেরিলা যুদ্ধ ক'রে প্রতিপক্ষকে কাবু করতেন।

কাদকেও এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। এইজন্য মহারাষ্ট্রের লোকেরা তাঁকে দ্বিতীয় শিবাজী বলে মনে করতেন।

কাদকে সন্তানদের মত ছিলেন ধর্মপরায়ণ, গৃহদেবতার পূজা করতেন, আধ্যাত্মিক অনু-প্রেরণার জন্য কাছাকাছি মন্দিরে গিয়ে উপাসনা করতেন। তখন তাঁর পোষাক ছিল সন্ন্যাসীর মত, তাঁকে অনেকে বেনারসের মোহন্ত বলে মনে করতেন। প্রার্থনা ও পূজাপদ্ধতি ছিল দৈনন্দিন কর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। ধর্মীয় চেতনার মধ্য দিয়ে নৈতিক শুচিতাবোধ সকলকে অনু-প্রাণিত করতো।

কাদকে কার্যসিদ্ধির জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তা সম্পন্ন হচ্ছে না দেখে মাঝে মাঝে ভেঙে পড়তেন এবং একদিন শৈলদেবীর মন্দিরে আত্মাহুতি দেবার জন্য কৃতসংকল্প হলেন কিন্তু ঐ মন্দিরের পুরোহিত তা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করান।

সত্যানন্দের জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল।

কাদকের আত্মজীবনীতে তিনি নিজেকে সন্তান বলে অভিহিত করেন। সত্যানন্দ ও তাঁর অনুগামীরা নিজেদের সন্তান বলে পরিচয় দিতেন।

কাদকে অথবা সত্যানন্দ বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থের দিকে চিন্তা না করে, তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতীয় সাধারণতন্ত্র গড়ে তুলতে।[4]

---

4. ডাঃ বিমান বিহারী মজুমদারের বক্তৃতা, ১লা জুন ১৯৬৬, রামকৃষ্ণ ইনস্টিটিউট অফ কালচার।
The probable source of Anandamath—C. R. Banerjee, Bulletin of Victoria Memorial, Cal. Vol-VI-VII. 72-73.

॥ গ্রীসের শিল্পকলায় মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র ॥

শ্রীদিবাকর সেনরায়

মানবসভ্যতার উত্থানপতনের যে-ইতিবৃত্ত—সে-ইতিবৃত্তের গতিপ্রকৃতি ও কালনির্ণয়ে সিরামিক্স্ যে এক নির্ভরযোগ্য দলিল—সে-কথা আজ আর কারুরই অজানা নেই। হাজার হাজার বছরের মানবসংস্কৃতির বিবর্তনের ছাপ ধারণ করে অসংখ্য সিরামিকপাত্র মৃত্তিকার অভ্যন্তরে সমাধিস্থ হয়ে আছে পৃথিবীর ভৌগলিক পরিধির নানান্ প্রান্তে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধিৎসা এবং নিরলস অনুসন্ধানের ফলে ওই সিরামিকপাত্রের যে-নিদর্শনগুলো আজ পর্যন্ত মাটির বিভিন্ন স্তর খুঁড়ে বের করে আনা হয়েছে—সেগুলোর সংখ্যাও নেহাত কম নয়।

য়ুরোপের যে-ভূখণ্ড বর্তমানে গ্রীস নামে পরিচিত—সে-ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির পূর্ব-পুরুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির যে-ইতিহাস—সে-ইতিহাসের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে ওই ভূখণ্ডের মাটির তলায় প্রাপ্ত সিরামিকপাত্রের মাধ্যমে। ওইসব সিরামিকপাত্রের মধ্যে যেসব চিত্রিত পাত্র পাওয়া গেছে—সেগুলো পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গ্রীসের ভূখণ্ডে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী জনসমাজের সামাজিক, যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, এমনকি তাদের জীবনযাত্রাপদ্ধতির কোনো কোনো বিষয়ে জানা যেমন সম্ভব হয়েছে, তেমনই সম্ভব হয়েছে ওই দেশের শিল্পকলা এবং শিল্পীদের সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের কাজটি। ওই চিত্রিত সিরামিকপাত্রগুলো প্রাচীন গ্রীসের চিত্রকলার অন্যতম উল্লেখযোগ্য নিদর্শনও বটে।

আনুমানিক দু'হাজার দু'শো খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের প্রাচীন ভূখণ্ডের উত্তর অংশে আক্রমণকারীদের অভিযান ঘটে। ওই আক্রমণকারীদের অস্ত্রশস্ত্র ছিলো ব্রোঞ্জ ধাতুর তৈরী; তারা সঙ্গে করে কিছুসংখ্যক চিত্রিত সিরামিকপাত্রও নিয়ে এসেছিলো বলে মনে হয়—সম্ভবতঃ পানীয় বহন অথবা সংরক্ষণের প্রয়োজনে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে গ্রীসের উত্তর অঞ্চলে ওই ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র এবং চিত্রিত সিরামিকপাত্রগুলো আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন, উল্লিখিত অস্ত্র এবং সিরামিকপাত্র সম্ভবতঃ মেসোপটেমিয়ায় নির্মিত হয়েছিলো; সিরামিকপাত্রগুলোর গড়ণ এবং অলংকরণে মেসোপটেমীয় সংস্কৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। কেউ কেউ এ' প্রসঙ্গে ক্রীটের সিরামিক-সংস্কৃতির কথাও বলেছেন। কিন্তু সেটা না হওয়াই সম্ভব। কারণ প্রথমতঃ ক্রীট দ্বীপটির ভৌগলিক অবস্থান গ্রীসের দক্ষিণে, দ্বিতীয়তঃ ক্রীটের মিনোয়ান বংশীয় রাজাদের রাজধানী নসোজএর ধ্বংসস্তূপে যেসব প্রাচীন চিত্রিত সিরামিকপাত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোর কোনোটির সঙ্গেই গ্রীসের উত্তরাঞ্চলে প্রাপ্ত উল্লিখিত সিরামিক-পাত্রের সাদৃশ্য চোখে পড়েনা। অবিশ্যি প্রাচীন ক্রীটএর সভ্যতা ও সংস্কৃতি অত্যন্ত উন্নত স্তরের ছিলো এবং ক্রীটএর প্রাচীন সংস্কৃতি যে একসময়ে গ্রীসের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো—তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে।

আনুমানিক এগারোশো খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের উত্তর ভূখণ্ডে পুনরায় অভিযান ঘটে। এবারে আক্রমণকারীরা ছিলো বর্তমান জার্মানী ভূখণ্ডের অধিবাসী এবং ইতিহাসে এরা উল্লিখিত

হয়েছে 'এ্যাকিয়ান্' নামে। গ্রীসে এই এ্যাকিয়ান্ সংস্কৃতির প্রভাব ছিলো আনুমানিক সাতশো খৃষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত। এথেন্সএর নিকটবর্তী জায়গায় প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যেসব চিত্রিত সিরামিকপাত্র আবিষ্কৃত হয়েছে—সেগুলোর অলংকরণে জ্যামিতিক নকশার প্রাধান্য দেখা যায়। শিল্পকলার ইতিহাসে এই সিরামিকপাত্রগুলো এ্যাকিয়ান্ সিরামিকপাত্র নামে অভিহিত হয়েছে।

আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই গ্রীসের প্রাচীন ভূখণ্ডে কয়েকটি নতুন শহর গড়ে ওঠে। প্রধান শহরগুলোর নাম এথেন্স, স্পার্টা, কোরিন্থ, থীবস্, ভ্যামোস্ এবং মিলেটাস্। গ্রীকরা অবিশ্যি এর মধ্যে ইতালী, সিসিলি এবং কৃষ্ণসাগরের তীরে উপনিবেশও স্থাপন করে। গ্রীসের ভূখণ্ড পাহাড়ি উপত্যকা এবং কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত হওয়ার প্রথম দিকে গ্রীস ছিলো ছোটো ছোটো রাজ্যে বিভক্ত। এসব রাজ্যের রাজা অথবা শাসনকর্তাদের পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস্এর রচনা থেকে জানা যায়, দুটো ক্ষেত্রে গ্রীকদের ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে উঠতো। প্রথমতঃ 'ইলিয়াড্' ও 'অডিসি'পাঠে; দ্বিতীয়তঃ অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগীতার যোগদানে। অলিম্পিয়ার ক্রীড়া প্রতিযোগীতা প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হতো এবং গ্রীসের সব কটি রাজ্য থেকে প্রতিযোগীরা এতে যোগ দিতো। এই সময়ে, অর্থাৎ, খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নত হতে থাকে। থেলস্, আনাক্সিমাণ্ডার, হেরাক্লিটাস্এর মতো দার্শনিক এবং চিন্তানায়কের আবির্ভাব ঘটে। এই সময় থেকেই গ্রীসের বাণিজ্য ও প্রসারলাভ করতে থাকে। ৪৯০ খৃষ্টপূর্বাব্দে পারসিক সম্রাট দারিয়ুস এবং ৪৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে দারিয়ুস্এর পুত্র জেরেক্সস্ গ্রীস আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে দুটো জিনিষ ঘটেছিলো। প্রথমটি হলো, সাময়িকভাবে হলেও গ্রীসের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ঐক্যভাব এবং দ্বিতীয়টি হলো, সমগ্র গ্রীসে পারসিকদের সম্পর্কে ভীতি ও প্রবল ঘৃণা। পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে অগণিত সংখ্যায় নিহত হলেও গ্রীক যোদ্ধারা অসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পারসিকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গ্রীকদের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ এবং বীরপূজার ভাবটি প্রবল হয়ে ওঠে। গ্রীসের সংস্কৃতিতেও এর প্রতিফলন ঘটে। পারসিকদের প্রতি ভীতি ও ঘৃণা থেকেই গ্রীসে পারসিক তথা মধ্যপ্রাচ্যীয় সংস্কৃতিবর্জনের মনোভাব গড়ে ওঠে। গ্রীক শিল্পীদের মধ্যেও মধ্যপ্রাচ্যের শিল্পরীতির প্রভাব ক্রমক্ষীয়মান হতে থাকে। তাঁরা নব শিল্পাদর্শের সন্ধান করতে থাকেন। এ সময়ে সমগ্র গ্রীসে শরীরচর্চা এবং ক্রীড়া-প্রতিযোগীতার প্রসার ঘটছে: সুদেহী জিম্নাষ্ট্ এবং খেলোয়াড়রা বিশেষ সম্মান ও সমাদরলাভ করছেন। গ্রীসের তৎকালীন শিল্পীরাও আদর্শরূপে গ্রহণ করলেন সুদেহীদের দেহাকৃতি। সে যুগের ভিত্তিচিত্র এবং ভাস্কর্যে যেমন এই নব শিল্পাদর্শের ছাপ পড়লো, তেমনই এই শিল্পাদর্শ প্রতিফলিত হলো সিরামিকপাত্রের চিত্রণে। সিরামিকপাত্রের চিত্রণে মুখ্যস্থান অধিকার করলো সুগঠিত পেশীসমৃদ্ধ অর্ধনগ্ন পুরুষের অবয়ব এবং স্বল্পবাসআবৃত মেদহীন সুললিত নারীদেহের মূর্তিচিত্র। পুরুষ ও নারীদেহের

মূর্তিচিত্র অবশ্য ইতিপূর্বে প্রাচীন মিশরের ভিত্তিচিত্রেও দেখা গেছে। কিন্তু ভিত্তিচিত্রের সমতলক্ষেত্রে মনুষ্যমূর্তি অঙ্কণ আর বেলনাকার (Cylindrisal) সিরামিকপাত্রের উত্তল-ক্ষেত্রে মনুষ্যমূর্তিচিত্রণ-এর কাজ একই পর্যায়ে ফেলা চলেনা। শেষোক্ত কাজটি অভিজ্ঞ এবং দক্ষ শিল্পীদের পক্ষেও যথেষ্ট আয়াসসাধ্য। গ্রীক সিরামিকশিল্পীরা এ বিষয়ে বিশেষ প্রতিভা এবং কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

মনুষ্যমূর্তির চিত্র অঙ্কিত গ্রীসীয় সিরামিকপাত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে কোনো য়ুরোপীয় সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'The greatest art of the ceramist ever known on this earth.' কিন্তু কিছু সমালোচক এই মন্তব্যের বিরোধী মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন। এঁদের মধ্যে ওয়ায়েন ই. কক্সএর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাঁর ভাষায় —'মনুষ্যদেহের মূর্তিচিত্রিত অধিকাংশ গ্রীসীয় সিরামিকপাত্রই গড়নে ধাতুনির্মিত পাত্রের অনুকৃতিমাত্র'। কক্সএর মতে—'প্রাচীন গ্রীসের সিরামিকশিল্পীরা সিরামিকপাত্রের গড়ণ এবং অলংকরণের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না; চিত্রাঙ্কণের বিষয়েই তাঁরা মুখ্যতঃ আগ্রহী ছিলেন। সেজন্যে সিরামিকপাত্রের চিত্রণেই তাঁদের মনোযোগ কেবলমাত্র নিবদ্ধ ছিলো। এর ফলে মূর্তিচিত্রসম্বলিত গ্রীসীয় সিরামিকপাত্রগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়নি—ওগুলোকে বলা যায় গ্রীক চিত্রকলার অন্যতম নিদর্শনমাত্র'। কক্স আরও বলেছেন —'মধ্যপ্রাচ্য এবং মিশরের গ্লেজযুক্ত সিরামিকপাত্রের সঙ্গে গ্রীক শিল্পীদের পরিচয় থাকলেও তাঁরা গ্লেজএর চমৎকারিত্ব সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন'। কক্সএর এই অভিমত সম্পর্কে কিছু কিছু সমালোচক অবিশ্যি ভিন্নমত পোষণ করেন। এঁদের মতে, গ্রীক শিল্পীরা গ্লেজএর ব্যবহার জেনেও যে মূর্তিচিত্রঅঙ্কিত সিরামিকপাত্রে গ্লেজ ব্যবহার করেননি—তার কারণ হলো এই যে, সিরামিকপাত্রের জমির ওপর অঙ্কিত চিত্রের রেখা ও রঙ অবিকল এবং অবিকৃত রাখবার দিকে তাঁদের তীক্ষ্ণ নজর ছিলো। তাঁরা জানতেন যে, গ্লেজ হলো গলিত কাঁচ এবং ভাঁটিতে যথোপযুক্ত উত্তাপে পুরোপুরি গলে যাবার পরই কেবলমাত্র গ্লেজএ উজ্জ্বলতা এবং মসৃণতা আসা সম্ভব। সিরামিকপাত্রের জমিতে রঙএর সাহায্যে চিত্রাঙ্কণ করে তার ওপর গ্লেজ লাগিয়ে ভাঁটিতে পোড়ালে গ্লেজ গলবার সঙ্গে সঙ্গে জমিতে চিত্রাঙ্কণের রঙও কিছুটা গলে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে অঙ্কিত চিত্রের রেখার তীক্ষ্ণতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। সুতরাং শেষোক্ত সমালোচকদের অভিমত হলো এই যে, গ্রীসীয় সিরামিকশিল্পীরা গ্লেজ ব্যবহার জেনেও গ্লেজ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন—একথা বলা ঠিক নয়। গ্রীক শিল্পীরা সিরামিকপাত্রে অঙ্কিত চিত্রের রেখার তীক্ষ্ণতা বজায় রাখা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন বলেই গ্লেজ ব্যবহার করেননি। সমালোচকদের এ-মত যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।

মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত গ্রীক সিরামিকপাত্রের গড়ণ সম্পর্কেও বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ সমালোচক একটি বিষয়ে একমত যে, গ্রীক সিরামিক-শিল্পীরা সিরামিকপাত্রের গড়ণের পরিকল্পনায় (design) উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় রেখেছেন। গ্রীসীয় সিরামিকশিল্পীরা সিরামিকপাত্র নির্মাণের পরিকল্পনায় যে-তিনটি মূল সূত্রকে অবলম্বন

করেছেন—সেগুলো হলো, 'ঐক্য' (Unity), 'সামঞ্জস্য' (Order) এবং 'বৈচিত্র্য' (Variety)। এফ্. এইচ্. নরটন্ তাঁর রচিত 'Ceramic. for Artist-Potter' বইটিতে উল্লিখিত বিষয়টি একটি চিত্রের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। চিত্রটিতে একটি গ্রীক সিরামিকপাত্রের উচ্চতা এবং পরিধিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি অংশের সঙ্গে অপর অংশের সম্পর্ক ও সাযুজ্য এবং সব কটি অংশ একত্র মিলে যে-সামগ্রিক ঐক্যের সৃষ্টি হয়েছে—তা চিত্রটি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। পাত্রটির দু'দিকে দুটো হাতল যুক্ত হবার ফলে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত পাত্রটির গড়ণের সামগ্রিক ঐক্যের ক্ষুণ্ণতা ঘটেনি। হাতল দুটোর গড়ণও, লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পাত্রটির গড়ণের বক্ররেখার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই করা হয়েছে। তাছাড়া হাতলদুটো এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন হাতলদুটো পাত্রটির মূল অংশ থেকে স্বতোৎসারিত। অর্থাৎ প্রকৃতিজাত গাছের ডালপালার মতোই সিরামিকপাত্রের হাতলদুটোকে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে, কৃত্রিম অথবা অনাবশ্যক বলে মনে হচ্ছেনা। এ থেকেই বোঝা যায়, একটি সিরামিকপাত্র নির্মাণের পরিকল্পনা (design) করতে গিয়ে প্রাচীন গ্রীসীয় শিল্পীরা কতোটা গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন।

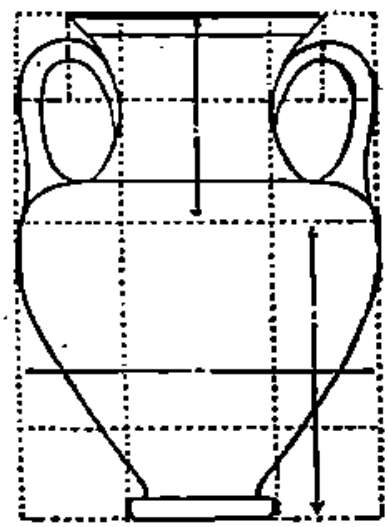

'এ্যামফোরা' সিরামিকপাত্র। প্রাচীন গ্রীক সিরামিকপাত্রের ডিজাইনে অনুপাতের ঐক্য ও সুষমা।
(এফ্. এইচ্. নরটন্ অনুসরণে)

খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে গ্রীসে, সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকপাত্রের লাল অথবা বাদামী জমির ওপর কালো রঙ-এ মানব-মানবীর দেহমূর্তি চিত্রিত হতে দেখা যায়। অবিশ্যি মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র যে ইতিপূর্বে গ্রীসে নির্মিত হয়নি—তা নয়। তবে

ওই পাত্রগুলোর গড়ণ এবং চিত্রাঙ্কণরীতিতে তৎকালীন মিশরীয় সিরামিক-সংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্থূলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকেই এ-প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে এবং সিরামিকপাত্রের গড়ণ এবং মূর্তিচিত্রণে গ্রীসীয় শিল্পীদের স্বকীয় উদ্ভাবনীশক্তির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই সময়েই গ্রীক সিরামিকশিল্পীরা পরীক্ষানিরীক্ষার পর সাধারণ মাটির মণ্ডের মিশ্রণের কিছুটা উন্নতিসাধন করেছিলেন; তাছাড়া একধরণের উজ্জ্বল কালো রঙও তাঁরা আবিষ্কার করেন। এই কালো রঙ সাধারণ মাটির সঙ্গে পটাশ (potash) মিশিয়ে তৈরী করা হতো। গ্রীক শিল্পীরা সিরামিকপাত্রে চিত্রাঙ্কণের পর যে গ্লেজ লাগাতেন না—সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সিরামিকপাত্রের গড়ণ ও চিত্রাঙ্কণ সম্পর্কে গ্রীক শিল্পীদের উন্নতধরণের মানসিকতা এবং রেখাচিত্রের তীক্ষ্ণতা ও রঙএর পারিপাট্য সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতাবোধের ফলেই উল্লিখিত উজ্জ্বল কালো রঙএর উদ্ভাবন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো।

সিরামিকপাত্রের লাল অথবা বাদামী জমির ওপর কালো রঙএ পুরুষ অথবা নারীমূর্তির পুরোটাই ভরাট করে এঁকে ওই ভরাট রঙ (silhouette)-এ রেখাঙ্কণ করা হতো কোনো সূঁচীমুখ ধাতুশলাকার সাহায্যে আঁচড় কেটে। ফলে রেখাগুলোতে ফুটে উঠতো জমির লালচে অথবা বাদামী রঙ। পাত্রটিকে এরপর যথোপযুক্ত উত্তাপে ভাঁটিতে পোড়ালে ওই কালো রঙ হয়ে উঠতো উজ্জ্বল ও চকচকে।

গ্রীক শিল্পীদের স্বাক্ষরিত কয়েকটি কালো রঙএ মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীর 'মিউজিয়ো আর্কিওলজিকো' সংগ্রহশালায় রয়েছে। একটি পাত্রে যুগ্ম শিল্পীর স্বাক্ষর দেখা যায়। শিল্পীদ্বয়ের নাম আর্গোটিমোস্ এবং ক্লেইটিয়াস্। আর্গোটিমোস্ ছিলেন কুমোর (potter) এবং ক্লেইটিয়াস্ ছিলেন চিত্রকর। সাধারণতঃ কালো রঙএ মনুষ্যমূর্তি-চিত্রিত সিরামিকপাত্রগুলোর আকার বড়ো মাপের হতে দেখা যায়। এ ধরণের বড়ো আকারের পাত্রগুলোকে বলা হয় 'কাঁধযুক্ত এ্যাম্ফোরা'। এই পাত্রগুলোর ঊর্ধাংশ মানবদেহের ঊর্ধাংশের নামের অনুকরণে 'কাঁধ' এবং 'গলা' নামে পরিচিত। পাত্রের প্রধান অংশে মানব-মানবীর দেহমূর্তি চিত্রিত হতো এবং কাঁধ ও গলায় চওড়া পটিতে আঁকা হতো পদ্মফুল, গাছের পাতা এবং সূর্যরশ্মির ছটার প্রতীকি নকশা। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে-শিল্পীত্রয় একযোগে সিরামিকপাত্র তৈরী করে তাতে কালো রঙএর মনুষ্যমূর্তি আঁকতেন—তাঁদের নাম লিডোস্, এ্যামাসিস্ এবং এক্সেকিয়াস্। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এই শিল্পীত্রয়ের নির্মিত ও চিত্রিত পাত্রগুলো গ্রীসীয় কালো মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। এক্সেকিয়াস্ লম্বা ধরণের এ্যাম্ফোরা-র ডিজাইন পরিবর্তিত করে বেঁটে ধরণের এ্যাম্ফোরা তৈরী করেছিলেন। লিডোস্ এবং এক্সেকিয়াস্এর সুযোগ্য শিষ্যরা পরবর্তীকালে গ্রীসে সিরামিকপাত্রচিত্রণের এক নতুন শৈলীর সৃষ্টি করেন। আনুমানিক ৫১৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫২৫ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে গ্রীসের পূর্বাঞ্চলের সিরামিকপাত্রনির্মাণকেন্দ্রগুলোতে বহু সংখ্যক কালো মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র নির্মিত হয়েছিলো। চওড়া কাঁধবিশিষ্ট লম্বা ধরণের এই এ্যামফোরাগুলোতে প্রধানত নারীমূর্তি চিত্রিত হয়েছে। এ্যাম্ফোরা-র বাদামী রঙএর জমিতে কালো রঙএ আঁকা এই নারীরা

কোনোটি দলবেঁধে চলেছে ধর্মীয় শোভাযাত্রায়. কোনোটিতে বা উৎসব উপলক্ষে বিচিত্র ভঙ্গীতে নৃত্যরতা।

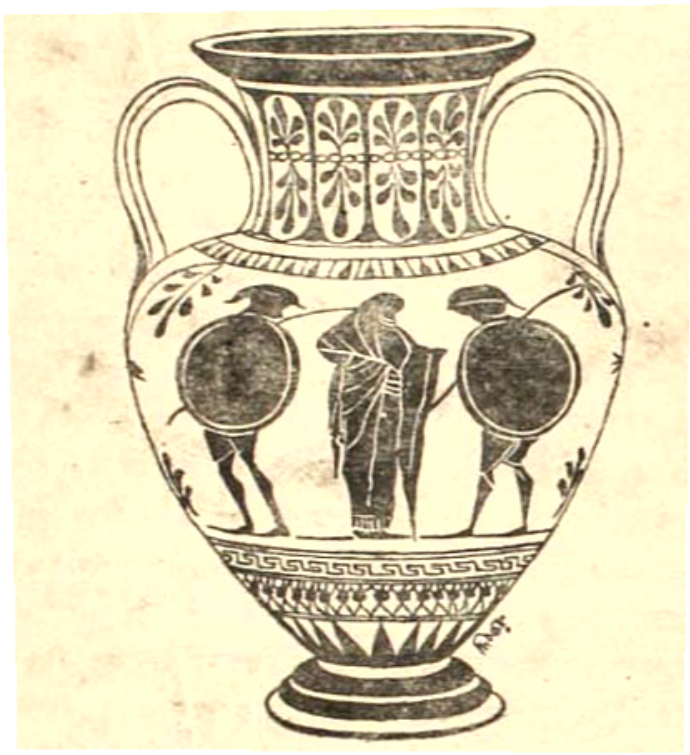

কালো মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র।
'এথেনিয়ান' শৈলী (৫৫০ খ্রীঃ পূঃ)
উচ্চতা—১৭ ইঞ্চি।

সিরামিকপাত্রে লাল রঙএ মানব-মানবীর মূর্তিচিত্রণের সূচনা হয় আনুমানিক ৫৩০ খৃষ্টপূর্বাব্দে। এই শৈলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে পরিচিত ছিলেন এপিক্‌টেটোস্। তবে এপিক্‌টেটোস্‌এর স্বাক্ষরিত যেসব শিল্পিক সিরামিকসএর নিদর্শন এ যাবত পাওয়া গেছে—সেগুলোর মধ্যে সিরামিকপাত্রের সংখ্যা নগণ্য; অধিকাংশই হলো সিরামিক-পেয়ালা এবং সিরামিক-থালা। সাধারণ মাটিতে তৈরী সিরামিকপাত্রের লাল অথবা বাদামী রঙএর জমিতে মানব-মানবীর দেহমূর্তির রেখাচিত্র এঁকে দেহমূর্তির অংশটুকুতে জমির লাল অথবা বাদামী রঙ ছেড়ে বাকি অংশ কালো রঙএ ঢেকে দেওয়া হতো। রেখাকণ অথবা ডিটেল্ আঁকা হতো কালো রঙএ। লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রণের রীতিকে কালো মনুষ্যমূর্তিচিত্রণের বিপরীত রীতি বলা যেতে পারে। লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্রের জমি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কালো রঙএর বদলে গাঢ় বাদামী রঙএ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। লৌহকণাযুক্ত সাধারণ মাটির সঙ্গে কাষ্ঠজাতীয় ব্রেজ মিশিয়ে এই গাঢ় বাদামী রঙ তৈরী করা হতো। বিখ্যাত গ্রীক ভাস্কর এবং চিত্রকর মিডিয়াস্ কিছুসংখ্যক সিরামিকপাত্রে লাল রঙএর মনুষ্যমূর্তি এঁকেছিলেন

বলে জানা যায়। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্র গ্রীসে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। অবশ্য কালো মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্রের চাহিদা তখনও ছিলো। খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ থেকে পশ্চিমের বাজারে কালো ও লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত গ্রীক সিরামিকপাত্রের চাহিদা ক্রমশঃ কমে যেতে থাকে। এই কারণেই তৎকালীন গ্রীসীয় সিরামিকশিল্পীরা নতুন শিল্পরীতির সন্ধানে পরীক্ষানিরীক্ষা সুরু করেন বলে মনে হয়। এই পরীক্ষানিরীক্ষার ফলশ্রুতিরূপে এথেন্স নগরীর সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে 'রিলিফ' (relief) মনুষ্যমূর্তি অলংকৃত সিরামিকপাত্র নির্মিত হতে থাকে। এই আধা-ভাস্কর্য অথবা রিলিফ-মনুষ্যমূর্তির প্রভাব মনুষ্যমূর্তিচিত্রণেও পড়েছিলো। গ্রীসের পূর্বাঞ্চলে কোরিন্থ্ এবং বোশিয়া-র সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রে পরবর্তী কালে যেসব কালো ও লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত সিরামিক-পাত্র নির্মিত হয়েছিলো—সেসব চিত্রণে গ্রীক ভাস্কর্যের ছাপ সুস্পষ্ট, বিশেষতঃ লাল মনুষ্যমূর্তি-চিত্রণে। অধিকাংশ লাল মূর্তিচিত্রণই প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন অঙ্গভঙ্গির।

লাল মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত 'গোথিকস্'
সিরামিকপাত্র। 'রাইপ আর্কেইক্'-শৈলী।
(৪৮০ খ্রীঃ পূঃ)
উচ্চতা—১৩ ইঞ্চি।

প্রধানতঃ গড়ণ অনুযায়ী লাল এবং কালো মূর্তিচিত্রিত সিরামিকপাত্রগুলোকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীগুলোর মধ্যে রয়েছে এ্যাম্ফোরা, লেকিথস্, ষ্ট্যামনোস্, সিক্টার, ক্র্যাটার নামে পরিচিত সিরামিকপাত্র। এই পাত্রগুলোর গড়ণের সীমারেখার (outline)

দিকে লক্ষ্য করলে মনে হবে যেন প্রতিটি পাত্রই নির্মিত হয়েছে জ্যামিতিক নিয়মের মূল সূত্রগুলোর বিশ্বস্ত অনুসরণে। মনুষ্যদেহের মূর্তিচিত্রণের কথা বাদ দিলে পাত্রগুলোর কাঁধ ও গলার গঠন অলংকরণ সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। অলংকরণে গাছের পাতা, ফুল ইত্যাদির যে-নকশা আঁকা হয়েছে—সেগুলোতেও স্বাভাবিকতার তুলনায় জ্যামিতিক গঠনের ওপরই বেশিমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছে। সিরামিকপাত্রে বিভিন্ন ভঙ্গীতে মনুষ্যমূর্তিচিত্রের উপস্থাপনায় প্রাচীন গ্রীসীয় শিল্পীরা যে অভিজ্ঞ এবং অভ্রান্ত ছিলেন—এ সম্বন্ধে যেমন মতদ্বৈততা থাকবার সম্ভাবনা নেই, তেমনই নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এটাও প্রতিফলিত হবে যে, জ্যামিতিকসূত্রের নিয়মাবলীর দিকে তাঁদের অত্যধিক মনোনিবেশের ফলে মনুষ্যমূর্তিচিত্রিত গ্রীক সিরামিকপাত্রের গড়ণ এবং অলংকরণের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা ঘটেছে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। The Book of Pottery and Porcelain—W. E. Cox.
২। Pottery through the ages—G. Savage.
৩। Ceramics for Artist-Potter—F. H. Norton.

।। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্যচরিতামৃত ।।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

চৈতন্যলীলার ব্যাস-বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত রচনা করিবার অনেককাল পরে তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে বৃন্দাবনবাসী গোস্বামীগণের অনুপ্রেরণায় চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। বৃন্দাবন-গোস্বামীগণের চৈতন্য-ভাবনা সম্পূর্ণ কৃষ্ণলীলার উপাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাঁহারা চৈতন্যভাগবতে লিখিত শ্রীচৈতন্য-দেবের অলৌকিক জীবন-কাহিনী অতি শ্রদ্ধার সহিত পারায়ণ করিতেন। চৈতন্য-ভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবের শেষ জীবনের কোনও বিবরণ না থাকায় গোস্বামীগণ তাহা জানিবার জন্য কৃষ্ণদাসের উপরই এই গুরুভার ন্যস্ত করেন। চৈতন্যচরিতামৃত কেবলমাত্র চৈতন্য-ভাগবতের ন্যায় চৈতন্যচরিত-কাব্য মাত্র নয়। জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম বিবরণ ও বিশ্লেষণ থাকায় এই গ্রন্থে একাধারে—ইতিহাস, সাহিত্য ও বৈষ্ণবদর্শনের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বহিরঙ্গ বিষয় নহে। চৈতন্যলীলার সহিত বৈষ্ণবগণের নীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব অবিচ্ছেদ্যভাবে বিধৃত থাকায় গ্রন্থে বিশিষ্টতা ও উৎকর্ষ বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৃন্দাবনদাস কেবল ভক্তির আবেশে অতিপ্রাকৃত বিষয়বস্তুর সমাবেশ করিয়া তাহাতে নিজের ভাবোন্মাদময় ভক্তজীবনের উপভোগ করিয়াছিলেন। তাই গ্রন্থের মধ্যে ঐতিহাসিকতা আংশিকভাবে এবং দার্শনিকতা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ স্বীয় বিচারবুদ্ধি মাধ্যমে নিজ গ্রন্থের মধ্যে দার্শনিক তত্ত্ব বিচারের সহিত ঐতিহাসিকতা ও রসজ্ঞতার সমাবেশে যে চৈতন্য-চরিত পরিবেশন করিয়াছেন তাহা অতি অপূর্ব। চৈতন্যদেবের শেষ কয়েক বৎসরের ভাবোন্মাদ অবস্থা সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস সম্পূর্ণ নীরব থাকিলেও কৃষ্ণদাস অতি নিপুণতার সহিত স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাস অবলম্বনে তাহা বর্ণনা করিয়া তাঁহার লীলা জীবনের সম্পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের কোন বর্ণনা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই এবং তিনি ধর্মপ্রচারকও ছিলেন না। কিন্তু স্বীয় লোকাতিশায়ী মাধুর্যপূর্ণ চরিত্রপ্রভাবে ভক্তবৃন্দের মন আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদর্শনের ও রসতত্ত্বের মতবাদগুলিকে লিপিবদ্ধ ও প্রচার করা বিষয়ে তিনি দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের উপর ভার দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে স্বরূপ দামোদরের নাম প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। তিনি স্বহস্তে কিছু লিখিয়া না গেলেও শিক্ষাষ্টক নামে পরিচিত স্বরচিত আটটি শ্লোকের মধ্যে তাঁহার সাধনময় জীবনের সার অংশ প্রতিফলিত হইয়াছে এবং এই শিক্ষাষ্টকের মাধ্যমেই বৈষ্ণবগণ তাঁহার ভাবময় জীবনের পরিচয় উপলব্ধি করিতেন সেই সঙ্গে সমস্ত মানবসমাজকে সেই শিক্ষায় উৎসাহিত হইবার চেষ্টা করিতেন। প্রচারক না হইলেও শ্রীচৈতন্যদেব স্বীয় অলৌকিক চরিত্রমাধুর্যের দ্বারা ভক্তগণের চিত্ত উন্মেষিত ও আকৃষ্ট করিতেন এবং বৈষ্ণবগণও তাঁহার সাধনে সাধনময় জীবন অনুসরণে শিক্ষাষ্টক মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত বৈষ্ণব-জীবনযাপনের ধারা অনুসরণ করিয়া ধন্য হইতেন। এই শ্লোকগুলি পরস্পর

নিরপেক্ষ বলিয়া বোধ হইলেও নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা আছে। মানুষের মধ্যে শিক্ষণীয় করিবার জন্য বৈষ্ণবগণ শিক্ষাষ্টকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কীর্তনকেই এ যুগের শ্রেষ্ঠ অবলম্বনরূপে নির্ণয় করিয়া ইহার দ্বারা মানবচিত্তকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে ঈশ্বরের নাম অনন্ত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রুচি ও অভিলাষ বশতঃ মানব ঈশ্বরের নামকীর্তন করিতে করিতে চিত্তে নির্মলতা আনিতে পারিবে। এই প্রসন্ন চিত্তে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিফলিত হইলে মানুষ তখন তাহার অজ্ঞানজনিত অহঙ্কার অভিমান প্রভৃতি ভুলিয়া নিজেকে সে বিরাট-শক্তির এবং বিরাটশক্তিসৃষ্ট জগতের নিকট অতি তুচ্ছ মনে করিয়া তৃণ ও বৃক্ষবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বিনয় এবং সহিষ্ণুতা প্রভৃতি ধর্মকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিবে। এই অবস্থায় মানুষের অন্য কোন কামনা থাকে না এবং যে বাসনা কামনা মানব-চিত্তকে উদ্বেলিত এবং চঞ্চল করিয়া তোলে সেই বাসনা, কামনার বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়—আর তখনই তাহার প্রসন্নচিত্তে প্রকৃত তত্ত্ববস্তু প্রতিফলিত হয়। এই অবস্থায় মানব-চিত্ত আত্মতৃপ্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থান করে এবং তখনই মানুষ অপার আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হয়। প্রথম হইতে পঞ্চম শ্লোক পর্যন্ত এই তথ্য অতি সূক্ষ্মভাবে সন্নিবিষ্ট। তাহার পর (৬—৮) মানুষের সংসারে অন্য কোন কাম্য বস্তু থাকে না এবং তখনই তাহার চিত্ত ঈশ্বরস্বরূপে লীন হয়। সেই অবস্থায় অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা থাকে না বলিয়া অনপেক্ষিত মানবচিত্ত তখন নিজের এবং জীবসাধারণের কল্যাণে তৎপর হয় এবং সেই উন্নত অবস্থায় মানব-মন ঈশ্বরোন্মুখ থাকে বলিয়া মুহূর্তের জন্যও ঈশ্বর-সান্নিধ্যের বিরহ সহ্য করিতে পারে না। সাত্ত্বিকভাবের প্রাবল্যে তখন স্বেদ, অশ্রু, কম্পনাদি দ্বারা তাড়িত হয়। ইহাই ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকের সারমর্ম।

ইহার পর পূর্ণ আত্মসমর্পণের ভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং তাহাই বিশেষ ভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে অষ্টম শ্লোকে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীগণের নির্দেশ অনুযায়ী চরিত বিষয়ে বৃন্দাবনদাসকে এবং তত্ত্ববিষয়ে স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি অন্তরঙ্গকে—যাঁহাদের উপর শিক্ষাষ্টকের প্রচারভার শ্রীচৈতন্যদেব ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহাদের অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ-রচনাকালে চরিত অপেক্ষা তত্ত্বের উপরই অধিক জোর দিয়াছেন। তাহার কারণ এই যে, বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্য-জীবনের উপর সমূহ কৃষ্ণলীলা আরোপ করিতে গিয়া চরিতাংশকে অত্যন্ত বহুল করিয়াছেন এবং তাহাতে ধারাবাহিকভাবে আসল বৈষ্ণব রসতত্ত্বের কোন প্রকৃষ্ট পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার গ্রন্থগুলিতে তত্ত্ব বিশালভাবে আলোচনা করিলেও গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হওয়ায় বৈষ্ণব-রসতত্ত্ব বিষয়ে বৈষ্ণবগণের চিত্তবৃত্তি অন্ধকারেই থাকিয়া গিয়াছে। তাই কবিরাজ গোস্বামী দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব অতি সুললিত ভাষায় ভক্ত-সাধারণের জন্য পরিবেশন করিতে গিয়া চরিতাংশকে আংশিকভাবে উপেক্ষা করিয়া তত্ত্বাংশেই বহুলাংশে সন্নিবেশ করিয়াছেন। রূপগোস্বামীর গন্ধাবলী, উজ্জ্বল-নীলমণি, জীবগোস্বামীর ষটসন্দর্ভ, স্বরূপ দামোদরের কড়চা প্রভৃতি গ্রন্থের একত্র সমন্বয় করিয়া যে বৈষ্ণবশাস্ত্ররূপ সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন

তাহা হইতে উঠিয়াছে তত্ত্বামৃত যাহা পান করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ যুগে যুগে সাধনময় জীবনের অপূর্ব মাধুর্য উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। এতদাতীত কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্ত্যলীলা যথাযথভাবে সন্নিবদ্ধ করিবার জন্য এত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আদি ও মধ্যজীবনের চরিত্রাংশের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়া প্রেমই বৈষ্ণবধর্মীয়ভক্ত-জীবনের একমাত্র পরমার্থ তাহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং জীবন-সায়াহ্নে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি সম্পাদন করিতে পারিবেন কিনা এ বিষয় সন্দিহান হইয়া মধ্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই অন্ত্যলীলার ঘটনাগুলি লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সমুদয় হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চরিত্রাংশের প্রতি তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না যতটা ছিল তত্ত্বাংশের উপর। তত্ত্বাংশকে স্পষ্টরূপে বিবৃত করিতে গিয়া তিনি লীলাচরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন ইহা প্রকাশানন্দ ও বাসুদেব সার্বভৌম, বিজয় প্রভৃতির মাধ্যমে বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের সার ভাব এবং ভাবের শ্রেষ্ঠ পরিণতি মহাভাব ইত্যাদি দুরূহ তত্ত্বজ্ঞানের মধ্য দিয়া কবিরাজ গোস্বামী গ্রন্থের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাব বর্ণনা করিয়া চৈতন্যলীলার পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন। রাধাভাব-দ্যুতিলিত শ্রীচৈতন্য ভাবনাই ছিল বৃন্দাবন গোস্বামীদের লক্ষ্য এবং কৃষ্ণদাস তাঁহাদের সেই ভাবই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করিয়া সেই মহাভাবের পরিণতি দেখাইয়াছেন মধ্যলীলায় শ্রীচৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদের মাধ্যমে। পুষ্পমাল্যস্থিত বিভিন্ন কুসুমরাশি মধ্যে সূত্র যেমন অলক্ষ্যভাবে সমস্ত মাল্যকে ধারণ করে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যে উপাখ্যানগুলিও আনুষঙ্গিকভাবে তত্ত্বামৃতের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত হইয়াছে। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের চরিত্রাংশই প্রধান কাহিনী নয়, তত্ত্বাংশই প্রধান এবং তাহাই কল্পধারার ন্যায় অলক্ষ্যভাবে অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে চলিয়াছে গ্রন্থের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত এবং তাহাই গ্রন্থের পরিণতি ও গ্রন্থকারের একমাত্র উদ্দেশ্য। সে কথা চরিতামৃতকার স্পষ্টই বলিয়াছেন :

'চৈতন্যলীলামৃত দুগ্ধাব্ধি সমান,
কৃষ্ণামৃতরূপ বারি ভরি তেঁই করি পান।'

●

শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তুলসী মহারাজের তপস্যার ও শাস্ত্র-আলোচনায় হরিদ্বার ও হৃষিকেশের সাধুরা অভিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া তাঁহারা সকলে কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। সাধুগণকে আসিতে দেখিয়া কালীপ্রসাদ ও তুলসী মহারাজ ছোট শিশুর ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কালীপ্রসাদ অকস্মাৎ পুনরায় অসুস্থ হন এবং যন্ত্রনায় একেবারে বেহুস হইয়া পড়িলেন এবং চলাফেরার অবস্থাও ছিল না। হৃদযন্ত্রেরও পীড়া হইয়াছিল। সেইজন্য একান্ত দুর্বল ও বাক্যশক্তিহীন, কিন্তু তথাপিও কালীপ্রসাদের সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। রোগযন্ত্রণায় কাতর না হইয়া তিনি নির্বিকারচিত্ত ছিলেন এবং পূর্বের মতোই ধ্যান-ধারণা চলিতেছিল। মন স্থির করিয়া তিনি প্রায়ই ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। তুলসী মহারাজ, হরি ভাই -বা স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং সান্যাল মহাশয় হরিদ্বারে উপস্থিত হইয়া কালীপ্রসাদের সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। কিন্তু বলিয়াছি যে, কালীপ্রসাদ দুর্বল হইলেও সেই অবস্থার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তিন-চারদিন পরে সামান্য সুস্থ হইলে তুলসী মহারাজ, হরিভাই প্রভৃতি পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, কাশীতে অন্নপূর্ণা মা-র নিকট বিশ্রামের জন্য কালীপ্রসাদকে রাখিয়া তাঁহারা উত্তরাঞ্চলে পরিভ্রমণে যাইবেন। তবে তুলসী মহারাজের নিজের মনগত ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আরও কিছুদিন হৃষিকেশে থাকিয়া ধ্যান-ধারণা করেন, কিন্তু হরিভাই প্রভৃতির ইচ্ছা কালীপ্রসাদকে লইয়া কাশী যান এবং তাহাই পরিশেষে স্থির হইল। তাঁহারা কালীপ্রসাদকে সঙ্গে করিয়া হৃষিকেশ হইতে গরুরগাড়ী করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং কাশীর টিকিট কিনিয়া কালীপ্রসাদকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া তাঁহারা যে যাহার গন্তব্যপথে গমন করিলেন। কালীপ্রসাদ একাই কাশী যাইতে পারিবেন অভিমত প্রকাশ করিলেন। যাহাহউক এই ব্যাপারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরুভাইদের নিজেদের মধ্যে কিরূপ হৃদ্যতা ও ভালবাসা ছিল। তাঁহাদিগের পরস্পরের ভালবাসার মধ্যে কোনরূপ ত্রুটী ও সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। প্রকৃতকথা বলিতে কি, শ্রীশ্রীঠাকুরের অনাবিল স্নেহ ও ভালবাসার স্নিগ্ধ ছায়ায় মানুষ হইয়া তাঁহারা প্রেম ও ভালবাসার জলন্ত প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হইয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন সচল ও জীবন্ত বিগ্রহস্বরূপ ও প্রেম-মন্দাকিনী, সুতরাং তাহাতে অবগাহন করিয়া তাঁহার সন্তানেরাও যে পরিপূর্ণ প্রেমসাগরের অধিকারী হইবেন— ইহাতে আর আশ্চর্য কি। কালীপ্রসাদ কাশীতে অন্নপূর্ণা মা-র বাড়ীতে নিরাপদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অন্নপূর্ণা-মা কালীপ্রসাদকে দেখিয়া যেমন আনন্দে অধীরা হইয়াছিলেন, তেমনি কালীপ্রসাদের অসুস্থ ও দুর্বল শরীর দেখিয়া দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি কালীপ্রসাদের নিকট সকল ঘটনা শুনিয়া বিশেষযত্নে সেবা করিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণা-মা কালীপ্রসাদের

হোমিওপ্যাথিক-চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অন্নপূর্ণা মা-র একান্ত স্নেহপূর্ণ যত্নে এবং সুশ্রূষায় কালীপ্রসাদ ক্রমেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

সামান্য সুস্থ হইবার পরে কালীপ্রসাদ মনে মনে স্থির করিলেন তিনি কাশীতে বংশীদত্তের বাড়ীতে আর কিছুদিন বিশ্রাম করিবেন। অন্নপূর্ণা-মার বাড়ীতে থাকাকালে প্রতিদিন প্রমদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) গাজীপুর হইতে কাশীতে উপস্থিত হইয়াছেন এবং তিনি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়াছেন এবং লোকাভাবে তাঁহার (নরেন্দ্রনাথের) উপযুক্তভাবে সেবা-যত্ন হইতেছে না। কালীপ্রসাদ সেইকথা শুনিয়া অধীর হইয়া পড়িলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রমদাবাবুর সহিত তাঁহার বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসাদকে বহুদিন পরে দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কালীপ্রসাদকে রুগ্ন ও শীর্ণ দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। সেইজন্য তিনি কালীপ্রসাদকে অধিক পরিশ্রম করিতে বার বার নিষেধ করিলেন, কিন্তু কালীপ্রসাদ নিজের কষ্টের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়া পরম-আদরের গুরুভাইয়ের সেবা-সুশ্রূষায় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন যে, তুচ্ছ তাঁহার নিজের স্বাস্থ্য, নরেন্দ্রনাথকে ভাল না করিলে তাঁহার জীবনে শান্তি নাই। সুতরাং নিজের জীবনের দিকে লক্ষ্য না করিয়া কালীপ্রসাদ দিবারাত্রি পার্শ্বে থাকিয়া নরেন্দ্রনাথের সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রমে নরেন্দ্রনাথ সুস্থ হইয়া অন্নগ্রহণ করিলেন। গুরুভাইয়ের পরস্পরের প্রতি ভালবাসার নিদর্শন এখানেও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

●

॥ মনের উৎস ও তার বিকাশ ॥

স্বামী পরমাত্মানন্দ

ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ ব'লে যাঁরা পরিচিত তাঁদের মধ্যে যোগীশ্রেষ্ঠ এবং 'অলৌকিকী প্রজ্ঞা'-র অধিকারীরূপে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন স্বামী অভেদানন্দ। অবতার-পার্ষদ হয়েও যে জ্ঞান, তপস্যা, যোগ, কর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও সর্বোপরি ব্রহ্মানুভূতির মহামিলন ঘটেছিল স্বামী অভেদানন্দের জীবনে—তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পাই তাঁর জীবনসিদ্ধি ও কর্মের মধ্যে। সমাজকল্যাণের এমন বহুবিধ বিষয়েই ছিল তাঁর অসাধারণ দৃষ্টি এবং অনুভূতি। বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, শিল্প, যোগ, কর্ম, অধ্যাত্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং এমনি আরও অনেক বিষয়ে তিনি যে মৌলিক অবদান রেখে গেছেন সেজন্য সারাবিশ্ব এবং গোটা মনুষ্যসমাজ আজ তাঁর দৃষ্টির ও প্রচেষ্টার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে তাঁর বহুবিধ অবদানকে অবলম্বন করে। সেই অমূল্য সম্পদের একটি সামান্য অধ্যায় আলোচিত হয়েছে এই নিবন্ধে।

যোগীদের যে চরমলক্ষ্য মনের বিলয়সাধন—তার প্রকৃত তত্ত্ব কি, ব্যক্তিমনের উৎস ও তার বিকাশ কি ধরনের—এ সকল বিষয়ে মানুষমাত্রেরই অনুসন্ধিৎসা আছে। ভূমাচৈতন্যই যে মনের প্রকৃত স্বরূপ এবং ব্যক্তিচিত্তে মনের বিকাশ যে ভূমাচৈতন্যের অবিচ্ছিন্ন প্রকাশ, এ তত্ত্বের আশ্চর্যকর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ আমেরিকায় তাঁর পাঁচটি বক্তৃতায়। তাঁর সেই বিখ্যাত বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রকাশন-বিভাগ থেকে 'Science of Psychic Phenomena'-নামে। উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন, "মানবচিত্তের মধ্যে যে মানসশক্তি আছে তা উদ্ভূত হয় বিশ্বচৈতন্য থেকে। এই বিশ্বচৈতন্যই অনন্ত শক্তি ও অপরিমেয় সম্পদের ভাণ্ডার এবং ব্যক্তিমনের পটভূমিকা ও উৎস এই বিশ্বমন।

বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে বিরাটমন—যাকে 'হিরণ্যগর্ভ'-ব্রহ্ম বলা হয়, এবং মুখ্যপ্রাণ এ'দুটি একসঙ্গে মিলিত হ'য়ে সৃষ্টি করে বিশ্বচরাচর এবং কেন্দ্রীভূত সমষ্টিসংস্কার। এই সমষ্টিসংস্কারকেই কারণ-অজ্ঞান বলা হয়েছে বেদান্তে। বিশ্বসংস্কারের মূলে আছে—(১) সমষ্টিমন অর্থাৎ 'হিরণ্যগর্ভ'-ব্রহ্ম এবং (২) প্রাণের ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়াশীল প্রাণ—যা'কে সাধারণভাবে সগুণ-ব্রহ্ম বা 'প্রজাপতি' বলা হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রথমে ইচ্ছারূপে সূক্ষ্ম-আকারে ('সঐক্ষৎ'-ঋক্‌বেদ) এবং পরে সেই ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ স্থূল-আকারে বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয় বিশ্বসংসার। এক কথায় বলা যায় যে, মনের ইচ্ছাই সকল সৃষ্টির কারণ, আর মনে যে ইচ্ছাশক্তির উদ্ভব হয় তা প্রাণেরই ক্রিয়া। মন ও প্রাণ একই চৈতন্যশক্তির অভিব্যক্তি—নামে ভিন্ন মাত্র। প্রাণ ব্যতীত মন ক্রিয়াশীল হয় না। প্রাণেরই অভিব্যক্তি হয় মনঃশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতিরূপে। তাই সমষ্টি-ইচ্ছা প্রাণের দ্বারা অভিব্যক্ত হ'য়ে সৃষ্টি করে বিশ্বসংসার। বিরাটের ইচ্ছা সর্বদা কম্পনশীল—'যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্' বলেছে কঠোপনিষৎ। ব্যষ্টি-মনও এই বিরাট ইচ্ছারই প্রতিচ্ছবি। ব্যষ্টি-মন প্রতিটি মানুষের ও প্রাণীর মধ্যে নিহিত। মানুষ ও

প্রাণীসমূহ ইচ্ছার প্রেরণায়ই জীবনের ও বিশ্বের সকল কর্ম করে। জীবের জীবনীশক্তিই আবার প্রাণশক্তির অভিব্যক্তি—যা' সকল কর্মে প্রেরণা যোগায়। জীবের এই জীবনীশক্তি বিরাটপ্রাণসত্তা থেকে কিছু ভিন্ন বস্তু নয়। একই বিশ্বপ্রাণের অভিব্যক্তির পরিমাণগত পার্থক্য মাত্র থাকে বিশ্বজগতে এবং ব্যষ্টি-মনে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তই করতে হয় যে, হিরণ্যগর্ভ-প্রজাপতির সমষ্টি-ইচ্ছার মতো ব্যষ্টি বা ব্যক্তি-ইচ্ছাও প্রবল শক্তিশালী ও সকল বিষয়ের স্রষ্টা। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ জীবনকে কেন্দ্র করে বিরাট চৈতন্যশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে পারে একই জীবনে সাধনার দ্বারা। মুক্তিসাধক এবং যোগীরা এই শক্তির সহায়েই মুক্তির আশীর্বাদ লাভ করেন। তাঁরা জাগতিক ধন-মান, যশ-খ্যাতির বাসনা পরিহার ক'রে একমাত্র আত্মস্বরূপকে উপলব্ধির জন্যই সকল শক্তিকে কাজে লাগান। মনকে বৃত্তিশূন্য ও কেন্দ্রায়িত করেই তাঁরা প্রাণশক্তিকে নিজের করায়ত্ত করেন। জীবনীশক্তি তখন ওজঃশক্তিতে পরিণত হয়। সেই অমিত তেজসম্পন্ন আত্মিকশক্তিকে জাগতিক কোন বাসনাপূরণের কাজে না লাগিয়ে তাঁরা তাকে নিয়োগ করেন সকল বন্ধনের পারে জীবের মুক্তস্বরূপকে উপলব্ধি করার জন্য। আর তখনই তাঁরা হন সিদ্ধযোগী। একই জীবনে নিজ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করে তাঁরা সংসারে থাকেন জীবন্মুক্তরূপে। তাঁদের জীবনের সকল কাজই হয় তখন লোককল্যাণের জন্য। কোনও স্বার্থবুদ্ধি এবং এমন কি নিজেদের শরীরজ্ঞানও থাকে না তাঁদের। তাঁরা বিচরণ করেন অশরীরী মুক্ত আত্মারূপে।

ব্যক্তিচিত্তে চৈতন্যশক্তির সবটুকুই নিহিত থাকে মনের অবচেতনস্তরে। "মনের অবচেতনস্তর এক সুবিশাল ক্ষেত্র। অসীম অপরিমেয় তার শক্তি ও সম্ভাবনা। উদ্যম ও উৎসাহের অফুরন্ত ভাণ্ডার সেই প্রচ্ছন্ন অবচেতনস্তর"।—বলেছেন স্বামী অভেদানন্দ। তিনি আরও বলেছেন: "শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যত-কিছু বিকাশই ঘটে থাকে তা হচ্ছে অবচেতন-মনের অসীম প্রাণসত্তার বিচিত্র রূপ। বিরাট চৈতন্যশক্তিই মানুষের ব্যক্তিত্ব ও অদৃষ্টকে গড়ে তোলে। এই অফুরন্ত উৎসই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা ও কর্মের প্রেরণা ও শক্তি জুগিয়ে থাকে। এ'শক্তিকে কেন্দ্রিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়। শাশ্বত জ্ঞান ও ভূমানন্দকামী নিষ্কাম যোগীগণ একে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের আয়ত্তে আনতে পারেন। এই অবচেতন-মনে নিহিত সকল শক্তিকেই তাঁরা ঐকান্তিক সাধনা ও যোগাভ্যাসের সাহায্যে পরিস্ফুট করতেও পারেন"।

সাধারণ ব্যক্তির মনের চেতনস্তরের পরিধি অতি সীমিত। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক বস্তুসমূহ ছাড়া তাঁরা কিছুই প্রত্যক্ষ করেন না জাগ্রত অবস্থায়। তবে নিদ্রিত অবস্থায় মনের অবচেতন-স্তরে লুক্কায়িত অসংখ্য কামনা-বাসনার অংশমাত্র প্রত্যক্ষ হয় স্বপ্নে। ব্যক্তিচিত্তের বাসনাগুলি সবই থাকে মনের অবচেতনস্তরে এবং অবলুপ্তি ঘটেনা কোনটিরই। তাই স্বপ্নে সেগুলি ভেসে ওঠে মনের চেতন-স্তরে। চেতন এবং অবচেতন,—এই উভয় স্তরের বাসনাই মনে সৃষ্টি করে বৃত্তিচাঞ্চল্যের। সুতরাং চেতন এবং অবচেতন একই মনসমুদ্রের দুটি স্তর। চেতন-স্তরটির ক্ষেত্র সমুদ্রের ঊর্মিমালার মতই সীমিত, কিন্তু অবচেতন-স্তরের ক্ষেত্র

বিস্তৃত সমুদ্রের অসীম জলরাশির মতই অপরিসীম। গাঢ়-নিদ্রায় যে সুষুপ্তি অবস্থা হয় তখন মনের চেতন অথবা অবচেতন কোন স্তরই কাজ করেনা। তাই কোনও বৃত্তিচাঞ্চল্যও থাকে না মনে। মন তখন থাকে শান্ত, তাই গাঢ়নিদ্রার পর সুষুপ্তিতে আমরা অনুভব করি শান্তি ও আনন্দ। যোগীরা স্বেচ্ছায় ধ্যান ও সমাধির মাধ্যমে মনের অনুরূপ অবস্থা লাভ করেন এবং বৃত্তিচাঞ্চল্যরহিত হয়ে তাঁরা শাশ্বত আনন্দ ও শান্তির রাজ্যে বিচরণ করেন। মুক্তিকামী যোগসাধকের চরমলক্ষ্যই তাই ব্যক্তিমনের বিলয়সাধন করা কূর্মাচৈতন্যের মহাসমুদ্রে। তখন বিশ্বমনের অতল গহ্বরে যা-কিছু আছে—তা আর তাঁর জানতে বাকী থাকে না। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে করেন তাঁরা প্রত্যক্ষ। অবতারপুরুষ এবং সিদ্ধযোগীদের জীবনে আমরা তার পরিচয়ই পাই।

সাধারণ মানুষের জীবনের মধ্য দিয়ে ইচ্ছা, চিন্তা, বিবেক, বিচার, অনুভব প্রভৃতি মানস-শক্তির অতি সামান্য ও সাধারণ অংশটুকুই প্রকাশ পায় মাত্র, আর যখনই এইসকল শক্তির কোন অসাধারণ প্রকাশ দেখি তখন আমরা পরমবিস্ময়, শ্রদ্ধা প্রভৃতিতে স্তম্ভিত হই। যাঁরা এ'ধরনের অলোকসামান্য শক্তি প্রকাশ করেন তাঁরা প্রতিভাবান ও মনীষী বলে পরিচিত হন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: 'বুদ্ধি ও ললিতকলার ক্ষেত্রে যথার্থ ধীমানেরা যেমন অবচেতন মনের অপরিমেয় শক্তি প্রকাশ ক'রে থাকেন, তেমনি আত্মিকক্ষেত্রেও বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি আছেন বিভিন্ন স্তরের'। সুতরাং দেখা যায় যে, স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ মনুষ্যমনকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। একটি সাধারণ ব্যক্তির মন এবং অপরটি প্রতিভাবান বা মনীষী ব্যক্তির মন। দ্বিতীয়টিকে তিনি বলেছেন, 'বিশেষ-মন'। তবুও উভয়প্রকার মনই যে একই বিশ্বমনের বিরাট-বিস্তৃত তরঙ্গের ওপর এক একটি ঘূর্ণি ছাড়া কিছু নয় একথা পাই তাঁর উক্তিতে, যথা—"ব্যক্তিমনের ক্ষুদ্র-খণ্ড ঘূর্ণি বা আবর্ত সৃষ্টি করতে করতে চলেছে একই কূর্মাচৈতন্যের অখণ্ডপ্রবাহ—অসীম হতে অসীমে; কত আকার ও কত রকমের চিত্তলীলা তৈরী করতে করতে চলেছে সে অনন্তের দিকে। এই সব তরঙ্গ অবচেতন স্তর হতে উঠে আসে সচেতন-স্তরে, তারপর আবার অবচেতন-মনের গহনে তলিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে যায়"। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হ'ল যে, সাধারণ-মন এবং বিশেষ-মন উভয়ক্ষেত্রেই হয় একই আত্মিকশক্তির বিকাশ। সাধারণ ব্যক্তি-মনে যে আত্মিকশক্তির বিকাশ হয় তা বিস্ময়কর হলেও সচরাচর সর্বত্রই তার দেখা মেলে, তাই তাকে আমরা আশ্চর্যজনক বলে মনে করি না, কিন্তু প্রতিভাবান এবং মনীষী ব্যক্তিদের 'বিশেষ'-মনের মাধ্যমে যে সব আত্মিক-শক্তির বিকাশ দেখি তা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি-ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সুতরাং তা আশ্চর্যজনক—কারণ সচরাচর তেমন আত্মিকশক্তির বিকাশ দেখা যায় না। হিপ্‌নোটিজম্, টেলিপ্যাথি, ভাবসংযোজন, মনপাঠন, দূরশ্রবণ, দূরদর্শন প্রভৃতিকেও আশ্চর্যকর মনের বিকাশবৈচিত্র্য বলেই উল্লেখ করেছেন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ। যোগদর্শনেও একই কথা স্বীকৃত হয়েছে। ঋষি পতঞ্জলি তাঁর যোগদর্শনের বিভূতিপাদে বিভিন্ন প্রকারের যোগজ-শক্তিবিকাশের বর্ণনা করেছেন। রাজযোগ অনুসারে ধারণা-ধ্যান-সমাধি—একত্রে যা'কে সংযমনপদ্ধতি বলা হয়—সেই পদ্ধতিতে সমস্ত প্রাণশক্তিকে কেন্দ্রায়িত ক'রে যোগীরা

যে-কোন জাগতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক বিষয়ে মনঃসংযম করেন সেই বিষয়েই পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হন তাঁরা।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাই বলেছেন : "এই দৃশ্যমান স্থূল স্তরই একমাত্র অস্তিত্ব নয়, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরেরও অস্তিত্ব আছে। দৃশ্যজগতের স্থূলস্তরের পিছনে মানসিক-স্তর, আর মানসিক-স্তরেরও ওপর অধ্যাত্মিক স্তর বা আধ্যাত্মলোক।.....সাধারণতঃ আমাদের মন ইন্দ্রিয়নিচয়ের সীমানায় আবদ্ধ থাকে। এগুলির ওপরই প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নির্ভর করে, কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ববিদ্ যাঁরা, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়শক্তির ওপর তাঁরা নির্ভর ক'রে থাকেন না। মুক্ত তাঁদের মন, মুক্ত এই ইন্দ্রিয়ের দাস্য হতে ও দেহযন্ত্রের বন্ধন-যন্ত্রণা হতে। কিন্তু যাঁরা ইন্দ্রিয়বোধের স্তরে থাকেন, ইন্দ্রিয়শক্তিকে অবলম্বন ক'রে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না যে, মনই দ্রষ্টা, মনই শ্রোতা।" অধ্যাত্মপথের সাধকরা তাই এ-সকল আত্মিকশক্তির বিকাশকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর মনে করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বিশেষ বাধাস্বরূপ মনে করেন ঐ-সব বাহ্যিক আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যকে—যা' সাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিমানসে বিকাশ লাভ করে থাকে। কারণ শক্তির বিকাশবৈচিত্র্যের দিকে বেশি দৃষ্টি দিলে ব্রহ্মচেতনার উচ্চ স্তরে ওঠা যায় না, ঐ আপাত সমারোহের মোহে আবদ্ধ হ'য়ে যেতে হয়। সেজন্য বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং অপর সকল মহামানব ও অবতার পুরুষরা ঐ-সব শক্তি-বিভূতি দেখাতে নিষেধ ক'রে গেছেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়ে গেছেন এ-সবের ওপরে উঠে যথার্থ অধ্যাত্ম-নিয়মের ধারা পালন করতে।

পরিশেষে উপসংহারে বলি, আত্মিকশক্তির চরমবিকাশ হ'ল প্রবল ইচ্ছাশক্তি যা সিদ্ধযোগীরা লাভ করে থাকেন অতন্দ্র যোগ-সাধনার মাধ্যমে। প্রাণের জীবনীশক্তি থেকেই উৎপন্ন হয় ইচ্ছাশক্তি যার অপর নাম আধ্যাত্মিক শক্তি। তবে এর জন্য আবশ্যক শুদ্ধ সংযত ও পবিত্র জীবন-যাপন আর শিক্ষার প্রয়োজন প্রাণায়াম এবং যোগ-অভ্যাসের মাধ্যমে স্নায়বিক ও জীবনীশক্তিকে ইচ্ছাশক্তিতে পরিণত করার প্রয়োগ-রহস্যটি।

●

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে

মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

Statement about ownership and other particulars about

'VISVAVANI'

1.	Place of publication		Shri Ramakrishna Vedanta Math 19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2.	Periodicity of Publication	...	Monthly
3&4.	Printer's & Publisher's name	...	Swami Paramatmananda
	Nationality	...	Indian
	Address	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
5.	Editors name	...	Swami Sadatmananda & Swami Prajnanananda
	Nationality	...	Indian
	Address	...	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or share-holders holding more than one percent of total capital :—

The monthly magazine is the property of the Ramakrishna Vedanta Math, Calcutta-6, a philanthropic and charitable institution, which is managed by a Board of Trustees consisting of the following members :—

1.	Swami Sadatmananda	19B, Raja Rajkrishna St., Cal.-6
2.	.. Prajnanananda	do
3.	.. Sadrupananda	do
4.	.. Adyananda	do
5.	.. Swarupananda	do
6.	.. Parameshananda	do
7.	.. Tapasananda	do
8.	.. Buddhatmananda	do
9.	.. Paramatmananda	do
10.	.. Pranabeshananda	do
11.	Sri Birendra Nath Roy ...	do

I, Swami Paramatmananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Swami Paramatmananda

Dated, 15th March 1980 *Publisher*

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

১। গণতন্ত্রকে রক্ষা ও সম্প্রসারিত করুন।

২। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় সংহতিকে অক্ষুন্ন রাখুন।

৩। শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করার সংগ্রামকে শক্তিশালী করুন।

৪। পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ধারাকে গ্রামে গ্রামে প্রসারিত করুন।

৫। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করুন। শিক্ষায় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করুন।

৬। ক্ষেতমজুর বর্গাদার সহ সমস্ত কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করুন। কৃষির উন্নতি ও ভূমি সংস্কারের কাজ জোরদার করুন।

৭। এই রাজ্যের শিল্পের পুনরুজ্জীবনে সহায়তা করুন।

৮। জনগণ ও সরকারের সহযোগীতাকে আরও শক্তিশালী করুন।

৯। প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থের সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

আই সি এ ২২১৪

মনে করো, জুতো হাঁটছে
পা রয়েছে স্থির.....

Bata understands shoes

সে বড়ো সুখের সময় নয়'

লেখক বলেন, আমরাও বলি।
কারণ, জুতোর সঙ্গে পায়ের
কোনরকম ঝগড়াই আমরা হতে
দিতে পারিনা। সেজন্যই আপনার
মনোমত, রুচিমাফিক, হালফ্যাশানের
জুতোর জন্য সর্বদা বাটায় আসুন।

Bata

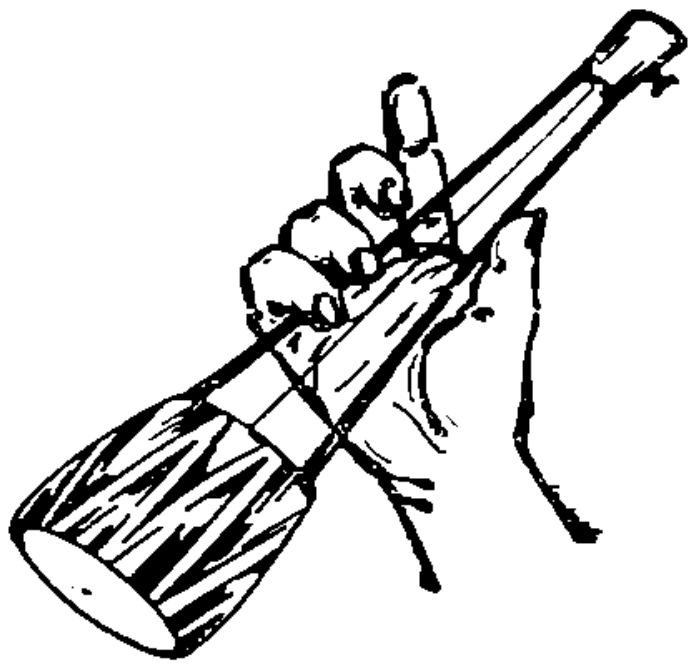

জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একসুরে বাঁধা

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

কথা বলতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এর উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করে রেখেছি

এর নাম রাহুল।

বয়স তিন এবং সবে কথা বলছে। আমি কিন্তু এরই মধ্যে ওর উচ্চশিক্ষার সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

আমি চাইনা ও আমার মতো কষ্ট করে লেখাপড়া শিখুক।

এই কারণেই আমি ইউকোব্যাঙ্কের গ্রো ইওর মানি স্কীমে ১২০ মাসে টাকা জমানো শুরু করেছি। এর ফলে আমার ছেলের স্কুল-কলেজের মাইনে এবং আনুষঙ্গিক খরচ যোগাতে কোনো অসুবিধা হবে না।

১০ বছর বাদে এই পুরো টাকাটা আমি ফিক্সড ডিপোজিট স্কীমে জমা করে দেব, যতদিন না রাহুল কলেজে পড়ার মতো বড় হয়ে উঠছে।

ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমানো কোনো সমস্যাই নয়। আজই আসুন ইউকোব্যাঙ্কের কোনো শাখায়।

আমাদের সকল পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে খবরাখবর এখানেই পাবেন।

ইউকোব্যাঙ্ক-এর লাভজনক জমা প্রকল্প

সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট স্কীম
ফিক্সড ডিপোজিট স্কীম
ডিপোজিট সার্টিফিকেট স্কীম
রিকারিং ডিপোজিট স্কীম
গ্রো ইওর মানি স্কীম (কুবের যোজনা)
টাইনি সেভিং স্কীম (লঘু বচৎ যোজনা)
মান্থলি পেনশন স্কীম

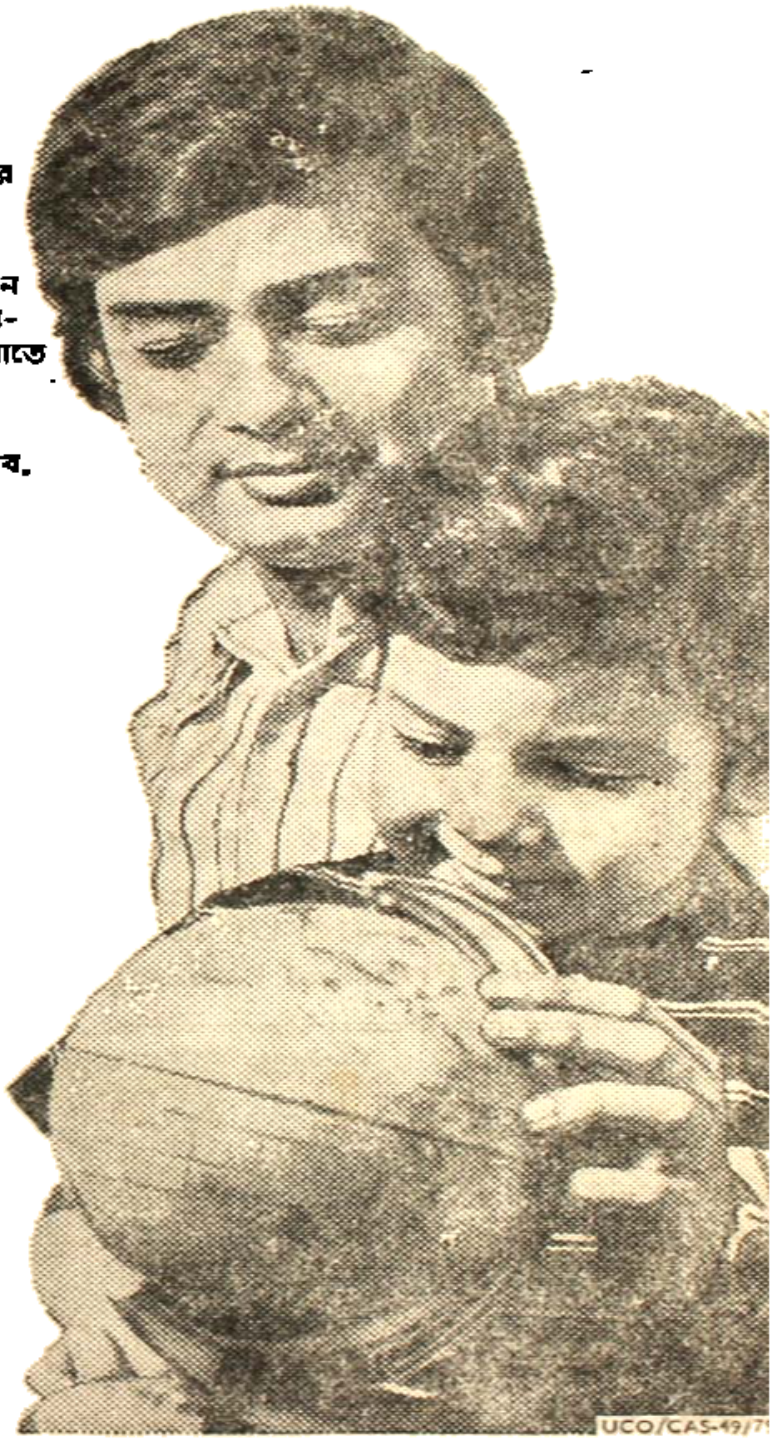

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক

ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে, ইউকোব্যাঙ্কে টাকা জমান

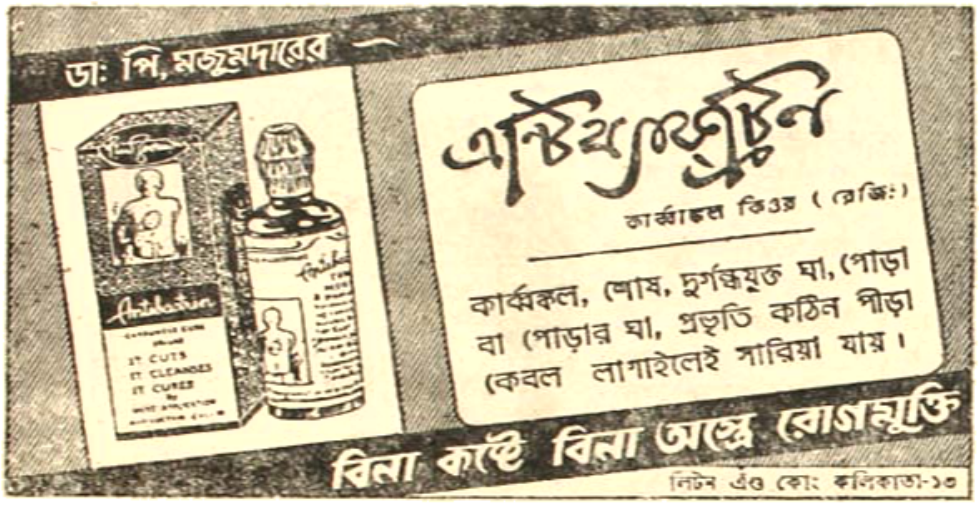

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

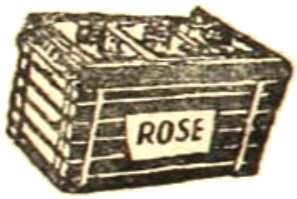

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

89, Harish Mukherjee Road

Calcutta-3

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিবাদীবাগ সরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক ।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৩ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৫·০০
বীরত্বে বাঙ্গালী ৪·০০
বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ৮·০০
বাংলার ঋষি ৬·৫০
বাংলার মনীষী ৩·০০
বাংলার বিদুষী ৪·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

With best Compliments of :—

BRITISH ELECTRICAL & PUMPS PRIVATE LTD.

4, B. B. D. BAG EAST, CALCUTTA-700 001

★

Grams :	Telex :	Phones :
'BIIOWMKAL'	021-2426	22-7826, 27, 28 & 23-8711

With the Compliments of :— **Phone : 22-7168**

CHATTERJEE BROTHERS

DEALERS IN EVERYTHING ELECTRICALS

Dealers of Philip's Light and Radio

Distributors : **Venus Water Heater,**

7, POLLOCK STREET, CALCUTTA.700001

Phone : 36:1207

THE ARTISAN

107/A, B. B. GANGULI STREET,

CALCUTTA-700017

★

DESIGNERS BLOCK-MAKERS & COLOUR PRINTERS

ফোন : ৩৫-২১৪৫

সৌন্দর্য্যের প্রতীক

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

ভারতীয় বাইণ্ডিং ও কার্টুন কাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রক্রোজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা

তিল তৈল

বিশুদ্ধ ও সুগন্ধিযুক্ত তিল তৈল ব্যবহার করুন
অবশ্যই শিরঃপীড়া প্রতিরোধ

আর মিত্র এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড

ফোন নং ৭৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

মডার্ণ ডেকোরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ / ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECY' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

যাবতীয় পেটেন্ট ঔষধের

ভাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৪-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৪৪-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪১, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৪·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্তোত্র-রত্নাকর	
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৮·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

বেনারসী
সিল্ক
সাড়ী
পোষাক

শৈলবালা মণিলাল
ষ্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী
শাল
বিছানা
হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক
শান্তিরস সালসা
ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং
ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ
সর্ব্ব ত্র প্রাপ্তব্য
৪০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চঃ-৩১/২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।

রূপচর্চ্চায়
কে, হোড়ের
প্রসাধনী

কে. হোড় এণ্ড সন্স

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায়
অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৬·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—
১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

হোমিওপাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্প্রার-ড্রাই-বিজ্ঞানে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক
পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র ত্রঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

Just Out *A New Book*

AN ENQUIRY INTO PSYCHOLOGY, SOUL AND ABSOLUTE

by

Swami Prajnanananda

এই গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদগুলির পরিচয় দিয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছে।

আর আলোচনা করেছে স্বামী অভেদানন্দের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দোষ ও গুণ গুলির বৈজ্ঞানিক বিচার।

স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, আমেরিকার মনোবৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অধ্যাপক উলিয়াম জেম্‌স ও জসিয়া রয়েসের চারখানি আলোকচিত্র-সম্বলিত ডিমাই সাইজ— মূল্য—দশ টাকা।

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH

Publication Department (Phone : 55-1800)

19B, Raja Rajkrishna Street

CALCUTTA-700006

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1600)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Estab ished by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 67
ANNUAL SPECIAL NUMBER
42nd Year. March 1980 VOL. I

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুকমী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুকমী প্যাকেটের লেবেলে কুকমী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

প্রাচীনতম মশলা ব্যবসায়ী ফোন-৩৩-০১১৩
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ফাইন্স) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

PRICE Rs. 2·50
Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ২·৫০টাকা

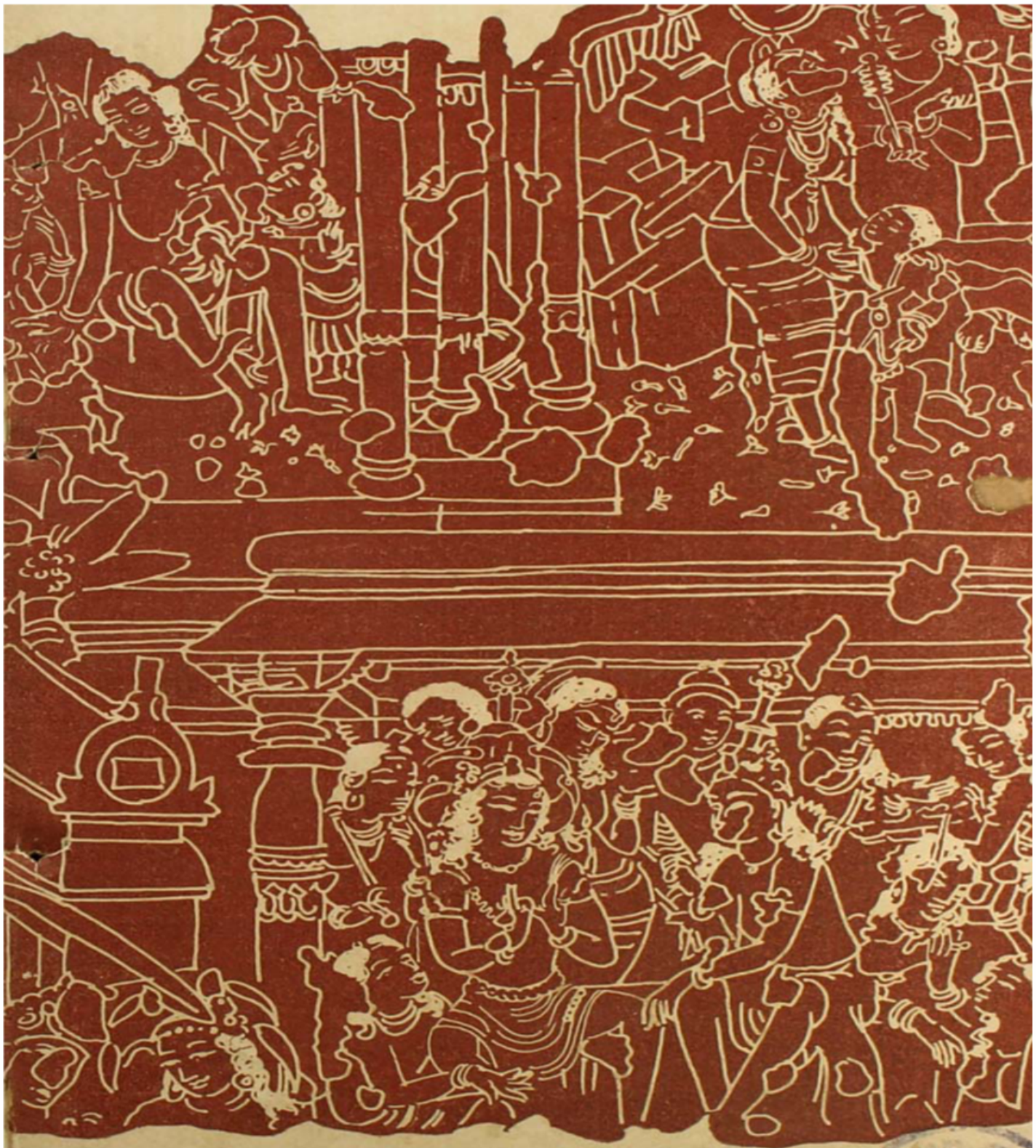

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

সম্পাদক ঃ
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক ঃ
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
চৈত্র
১৩৮৬

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।
- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১০ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani. Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

দুলালের তালমিছরী

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	১৪·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	
পুনর্জন্মবাদ	প্রকাশের অপেক্ষায়	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ দ্বিতীয়ার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১১-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেন্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১১০
ল্যাবরেটরি—৫৩-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ / ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
"JECI" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

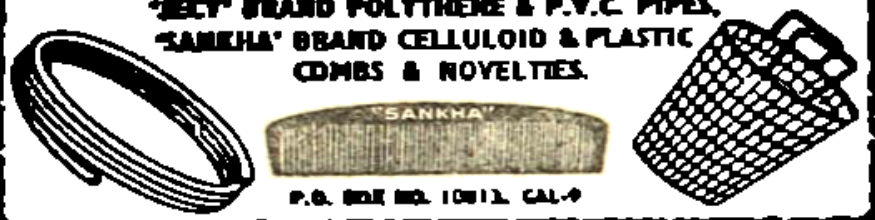

P.O. BOX NO. 10013, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি:-৬

ফোন: ৩৪-

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-২

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ভাদ্র, ১৩৮৬

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅবিরকুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন সোদার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• ডক্টর মঞ্জরী সেনগুপ্তা প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'ভারতীয় মনোবিশ্লেষণের ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস সৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিমলভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৌজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

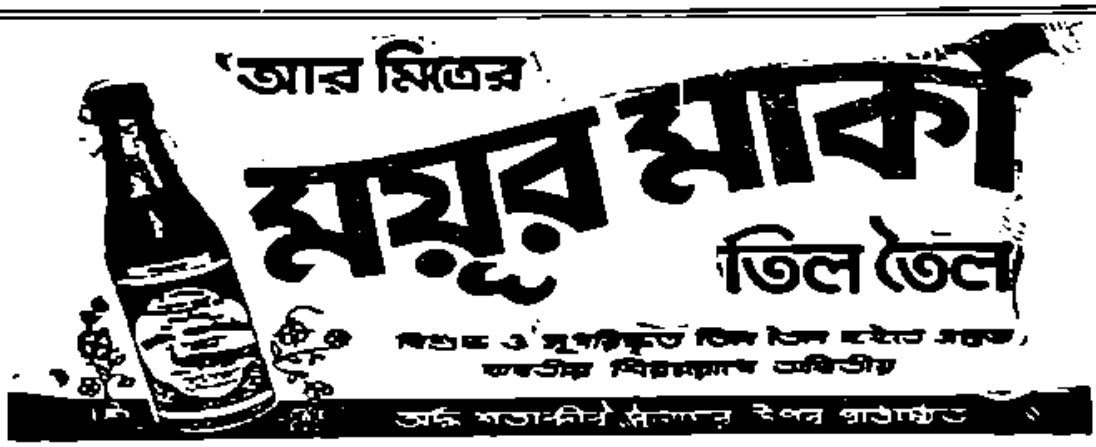

ফোন নং ৪৬-৮৯৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, জাতেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • লালবাগ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

চৈত্র, ১৯৮৬

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৬১	
২।	কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য	৭৮	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ	৮৪	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪।	বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা	৯০	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৯৪	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৬।	শ্রীমদ্‌ভেদানন্দাষ্টকম্‌	৯৫	ডাঃ শ্যামল সেন
৭।	মীরার কৃষ্ণভাবনা	৯৬	ডঃ শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
৮।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	১০১	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৯।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম উপন্যাস' কি 'তত্ত্বমূলক'	১০৪	ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১০।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	১০৭	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১১।	শ্যামাসঙ্গীত	১১১	শ্রীসুরেশ চৌধুরী
১২।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	১১২	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৩।	সংঘবার্তা	১১৫	

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এঁটি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

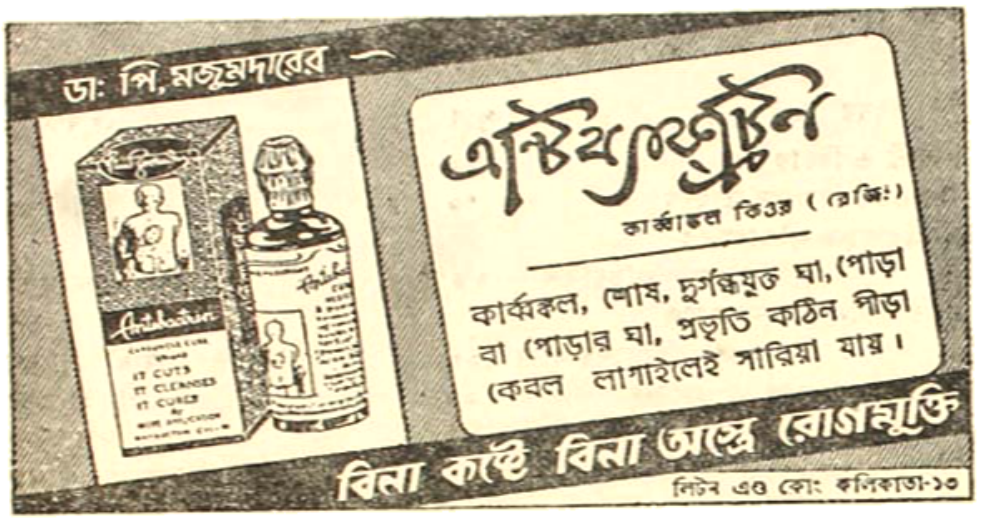

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

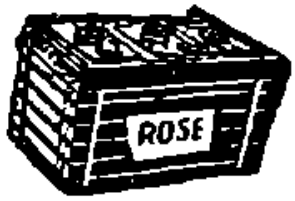

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

87, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

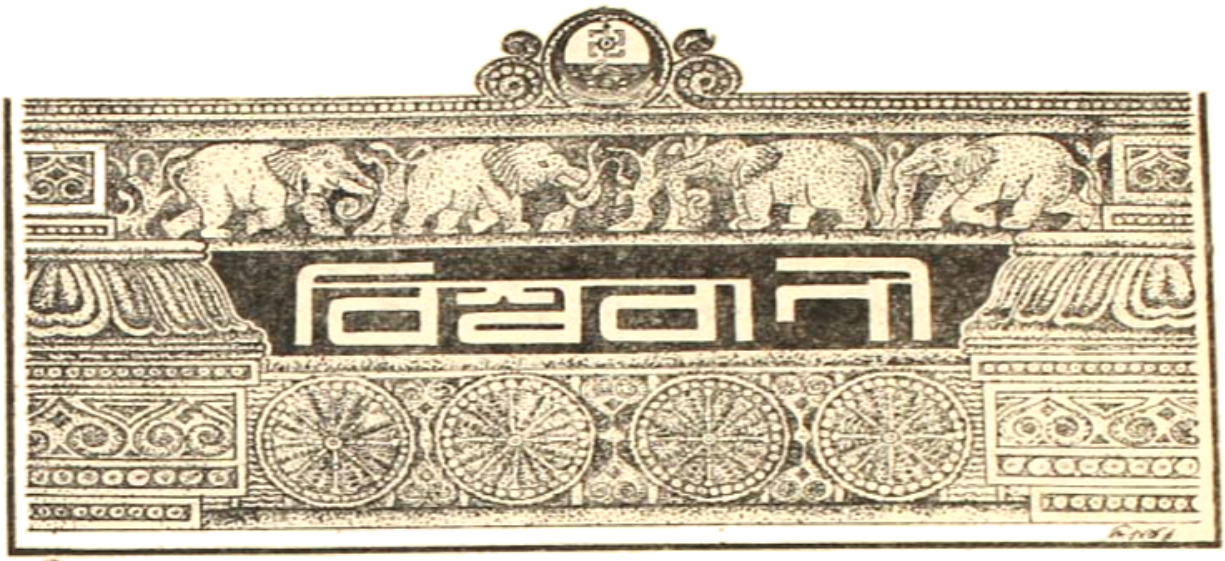

বিয়াল্লিশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা | চৈত্র ১৩৮৬

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। এ'অবস্থায় (সহজানন্দ-অবস্থায়) সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।

নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ)। খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল।

শ্রীরামকৃষ্ণ। অবস্থাবিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে—জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়।..."

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, (১৩৬৬), পৃঃ ১৯৬

পূর্বপ্রসঙ্গ—'মহাষ্টমীদিবসে রামের বাটীতে—বিজয় প্রভৃতি-সঙ্গে'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব (বিজয়কৃষ্ণ-গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তদের লক্ষ্য ক'রে) বলেন: 'কারণের বোতল একজন এনেছিল, আমি ছুঁতে গিয়ে আর পারলুম না।...' সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়ে যায়। মদ (মন্ত্র-পরিশুদ্ধ কারণবারি আর) খেতে হয় না'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহজেই অর্থাৎ কারণবারি গ্রহণ না করলেও অমনি নেশা হয়ে যেত—'ঠিক যেমন পাঁচ-বোতল মদ (কারণবারি) খেলে হয়'। এই সহজানন্দ[১]-অবস্থায় 'সব সময়

১। 'সহজানন্দ' এখানে সহজ-সমাধির অপার্থিব আনন্দ—যে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ বা ব্রহ্মেরই অভিন্ন রূপ। কারণবারি না খেয়েও নেশার আনন্দ হয়—সেকথাই সাধারণভাবে বুঝতে হবে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এখানে ঠিক তা নয়। এই সহজসমাধির আনন্দ ব্রহ্মানন্দেরই অভিন্ন রূপ বা প্রকাশ, আর ব্রহ্মানন্দ শুদ্ধব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নয়। যেমন, যেখানে উপনিষদে 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে...' প্রভৃতি বলা হয়েছে সেখানে সগুণ-ব্রহ্ম যে বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গ করেন এইকথা বলার উদ্দেশ্য যে, মহাকারণ-ব্রহ্মই সকল-কিছুর কারণ। সহজানন্দে মন চৈতন্যে সমাধিত হয়, সুতরাং তখন চৈতন্যরূপী মন আর পার্থিব বিষয় ভোগ করে না।

সব রকম (খাদ্য) খাওয়া চলে না। সহজানন্দের অবস্থা সমাধির সহজ, সরল ও অপার্থিব অবস্থা। এই সমতার অবস্থায় যোগশাস্ত্রানুসারে মূলাধারস্থাতী কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হয়ে সহস্রার-পদ্মবাসী পরমশিবের সঙ্গে এক বা একীভূত হয়। এরই নাম কুণ্ডলিনীর জাগরণ। তখন কুণ্ডলিনীশক্তি স্থূল (মূলাধার) পরিত্যাগ ক'রে অকূলে পরমশিবের সমরসসম্পন্ন হয় বলতে সামরস্য-অবস্থাযুক্ত হয় এবং শক্তি ও শিব—কালী ও ব্রহ্ম এক ও একাকার হয়। তন্ত্রের সিদ্ধান্ত তাই। বেদান্তমতে জীব তখন 'তত্ত্বম্'-পরিশুদ্ধ ক'রে (জীব যে ব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নয়—এই তত্ত্ব স্থির ক'রে) বিশুদ্ধব্রহ্মের[২] সঙ্গে একভাবাপন্ন হয় এবং জীব তখন শিবত্ব বা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। 'লাভ করে' বলতে জীব তখন অজ্ঞানজন্য ভেদভাব থেকে মুক্ত হয়ে শিব বা ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়। এই পরিশুদ্ধ ও পরমাবস্থায় জীবন্মুক্ত-মানুষ সকল সময়ে সকল রকম খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, বা সকল রকম কাজ করতে পারে না—এটিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এর চাক্ষুষ-নিদর্শনও বহুবার পেয়েছি। শুচি-অশুচি-বিচার তাঁর জীবনে ছিল না, বরং তিনি বলতেন—'শুচি-অশুচিরে লয়ে দিব্যঘরে কবে শুধি, দুই সতীনে পিরীত হলে, তবে শ্যামা-মাকে পাবি'।[৩] 'দিব্যঘর' বলতে ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্র। দিব্যানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্রে শুচি-অশুচি—ব্রাহ্মণ-শূদ্র—জাতি-বর্ণ-প্রভৃতির কোন ভেদ থাকে না। তখন এক ও একাকার। সকলেই তখন মহাচৈতন্যসাগরে একরস ও একবর্ণ—ব্রহ্মচৈতন্যস্বরূপ। এই একাকার এ সর্বাকার-অবস্থায় সামাজিক জাতাজাতির কোন বালাই থাকে না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে, লীলার ক্ষেত্রে বা বিশ্বখেলার ক্ষেত্রে অবতারদের জীবনেও একটু পরিশুদ্ধ ও অপরিশুদ্ধ—এই গুণ ও দোষের সংস্পর্শরূপ 'বাদ'-এর (মিশ্ররূপ বাদ-বিচারের) স্পর্শ দেখা যায়। খাঁটিসোনায় যেমন অলঙ্কারাদির যথার্থভাবে গড়ন হয় না, একটু খাদের বা মিশ্রণের প্রয়োজন হয়, তেমনি বিশ্বলীলার ক্ষেত্রে বা জ্ঞান ও অজ্ঞানের মিশ্ররূপ সংসারখেলার ভূমিতে একটু বাদ-বিচারের প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে সাধারণদৃষ্টিতে নয়,অসাধারণ, অলৌকিক ও অপার্থিব রহস্যময় ক্ষেত্রেও। অবতারজীবনের লীলাখেলার যথার্থরহস্য নির্ণয় করা সাধারণ (কেবল বুদ্ধিজীবী) মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, বোধির ক্ষেত্রে হয় তো কিছুটা সম্ভব হ'তে পারে।

নরেন্দ্রনাথ (তখন স্বামী বিবেকানন্দ হন নি) সাধারণদৃষ্টিতে তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ অবস্থায় (সহজানন্দের সমদৃষ্টি ও সমানুভূতির অবস্থায় বা ক্ষেত্রে) 'সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না' কথা শুনে বলেছিলেন : 'খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে যদৃচ্ছালাভই ভাল'। যদৃচ্ছালাভ বলতে যখন যেমন পাওয়া যায়, তখন তেমন তেমন গ্রহণ করা (খাওয়া প্রভৃতি) ভাল। এই 'ভাল' কথার ইঙ্গিতে বোঝা যায় যে, শুচাশুচ বা পাত্রাপাত্র-বিচার প্রভৃতি না থাকাই ভাল। যেমন সাধু-সন্ন্যাসীরা যখন মাধুকরী-ভিক্ষা করেন তখন ভাল-মন্দ ভিক্ষা বা খাদ্য পাওয়া

২। বিশুদ্ধব্রহ্ম অর্থে মায়াবিরহী তুরীয়-ব্রহ্ম—যে ব্রহ্ম কেবল সত্তা বা সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ।

৩। এ'কথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন কালীপ্রসাদ তথা স্বামী অভেদানন্দকে দক্ষিণেশ্বরে দীক্ষা দেওয়ার সময়ে।

গেল—কি না গেল—সেই সম্বন্ধে বাদ-বিচারের আর প্রশ্ন করেন না, তখন 'যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট'। স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) অবশ্য সাধারণভাবেই ঐকথা বলেছিলেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সে'কথা শুনে তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন : 'অবস্থাবিশেষে উটি হয়। জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই', কেননা জ্ঞানীর জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সকল-কিছুই পুড়ে ভস্মীভূত হয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এ'ভাবটি একটু অন্যভাবেই বলেছেন : 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন' (৪।৩৭)। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলেছেন—

'জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ॥' —গীতা ৬।৮

শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও ব্রহ্মোপলব্ধিবান যোগীর (যোগযুক্ত জ্ঞানীর) কাছে লোষ্ট্র (পাষাণখণ্ড বা ঢিলি) এবং কাঞ্চন বা সুবর্ণখণ্ড সমমূল্য ও সমানজ্ঞান। শ্রীধরস্বামী টীকায় এখানে এ'কথাই বলেছেন : 'জ্ঞানং ঔপদেশিকং, বিজ্ঞানং অপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ, অতঃ কূটস্থঃ নির্বিকার অতএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ...'। তাতে আচার্য মধুসূদন-সরস্বতীর অভিপ্রায়ও তাই। এ'প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সিদ্ধান্তও অনুরূপ[৪]—'জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। জ্ঞানযুক্ত জ্ঞানী ও যোগযুক্ত যোগী এককথা। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এরপর বলেছেন : 'গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়'।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ ও জ্ঞানযজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞের কথা আছে, তবে 'আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে' (৪।২৭) প্রভৃতি প্রসঙ্গের পর শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানযজ্ঞকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন—

'শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥' (৪।৩৩)

শ্রীকৃষ্ণ 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্' (৪।২৪) —'ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মের দ্বারা (যজ্ঞকর্ম যিনি করেন—তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ) সম্পন্ন হোমও ব্রহ্ম' বলেছেন। কথা এই যে, হোমকর্ম, হোমাগ্নি, হোমকর্মকর্তা—সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সুতরাং 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে' প্রভৃতি প্রাণায়ামকর্ম ব্রহ্মাগ্নিতেই সকল-কিছুর আহুতিকর্ম, ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দেওয়া ছাড়া অন্য-কিছু নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'গীতার মতে জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়'। জ্ঞানীর কাছে বা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে যখন আপন-পর কোন ভেদই থাকে না,

---

৪। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যোগী ও জ্ঞানীর সমদর্শনরূপ জীবন-সার্থকতার কথা এ'ভাবে বলেছেন—

'যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে।
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥' —গীতা ৬।২৮-২৯

যোগী সমদর্শী বলতে সর্বত্র ও সকল-কিছুতে এক ব্রহ্মসত্তাই দর্শন ও অনুভব করেন।

সকলেই অভেদ বা ব্রহ্মস্বরূপ, তখন তিনি যা-কিছু খান, যা-কিছু কর্ম করেন—সবই আহুতি দেন ব্রহ্মস্বরূপ 'আপনাতে—' ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা'। আহুতিও ব্রহ্মস্বরূপ এবং আহুতি দেন যিনি—তিনিও ব্রহ্মস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'প্রসঙ্গে বলেছেন : 'কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়'—জ্ঞানী আপনি যায় না। 'কুণ্ডলিনীতে' বলতে মূলকুণ্ডলিনীমুখে। 'মূল' অর্থে মূলাধারস্থ-আধারশক্তি—কালী। আবার কুণ্ডলিনী অর্থে মহাশক্তি—কালী। কালী লীলাচঞ্চলা সৃষ্টিমুখী বা সৃষ্টিময়ী শক্তি, আর শিব অচঞ্চল সৃষ্টির বিপরীত ও প্রলয়মুখী কূটস্থ ও নিত্যচৈতন্য,—যেমন তরঙ্গচঞ্চল অস্থির-জল ও তরঙ্গহীন স্থির-জল,—দুইই জল, জল ছাড়া অন্য-কিছু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই মূল-কুণ্ডলিনী-কালী এবং অকূল-শিব বা কূটস্থ-ব্রহ্মকে এক ও অভিন্ন বলেছেন। উভয়ের মধ্যে কেবল অবস্থার ভেদ, দৃষ্টির ভেদ বা ভিন্নতা ; একটি বিরূপে ও অপরটি স্বরূপে। মোটকথা তরঙ্গচঞ্চল জলও জল, আবার নিস্তরঙ্গ অচঞ্চল জলও জল।

কুণ্ডলিনীর ধ্যান মাতৃকাভেদতন্ত্রে এ'রূপ : 'ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গমাশ্রিতাম্। বিদ্যুৎ-কোটিপ্রভাং দেবিং বিচিত্রবসনান্বিতাম্॥ শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসাং সর্বদা কারণপ্রিয়াম্'। এই কুণ্ডলিনী-কালীর চিন্তা ও কল্পনা তন্ত্রশাস্ত্রে বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। (১) কামকলা-কুণ্ডলিনীশক্তি মূলাধারচক্রে প্রসুপ্তা ও পরে পরমশিবের সঙ্গে সামরস্যরূপ অমৃতে আপ্লুতা ; (২) কুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভূশিবসংস্থিতা বা বেষ্টিতা। তিনি শ্যামারূপে ও কালীরূপে কল্পিতা, সৃষ্টিরূপা অথবা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াত্মিকা, আবার বিশ্বাতীতা ও জ্ঞানরূপা, আবার জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপা ; (৩) কুণ্ডলিনী ক্ষুরদ্বালার্কবর্ণা সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিতা তড়িল্লিতা মৃণালতন্তুকল্পা প্রসুপ্তভুজগাকারা সার্ধত্রিবলয়ের দ্বারা বেষ্টিতা প্রভৃতি (এবং 'বিজ্ঞানভৈরব'-গ্রন্থও দ্রঃ)।

মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'কুণ্ডলিনী'-সম্বন্ধে বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন : 'কুণ্ডলিনীর অপর নাম আধারশক্তি (Basic Energy)—যে শক্তি যাবতীয় পদার্থকে আশ্রয় দিয়া সকল পদার্থের মূলসত্তারূপে বর্তমান রহিয়াছে।···কুণ্ডলিনী যখন চৈতন্যময় হইয়া যায়, তখন জগতের সকল বস্তুই চৈতন্যময় রূপ ধারণ করে। সুতরাং যাহাকে কুণ্ডলিনীর জাগরণ বলা হয় তাহা এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই শ্রুতিনির্দিষ্ট সর্বত্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মময়তা-অনুভবের সাধনা একই বস্তু।···'

'মূলবস্তুটি পরমসাম্যাবস্থারূপ। উপনিষৎ ইহার স্বরূপনির্দেশপ্রসঙ্গে 'পরমং সাম্যম্' এই পদই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাতে নামরূপ কল্পনা চলে না, ইহার চিন্তা নাই, বর্ণনা নাই—অব্যক্ত মনসোচর'।·· ইহা বিশ্বাত্মক (immanent) হইয়াও বিশ্বাতীত (transcendent)। ইহাই উপনিষদের পূর্ণ (the Absolute)।

'ওঁকার বিন্দু হইতে যে মণ্ডলের বিকাশ হয় তাহার নাম আজ্ঞাচক্র। তাহার ঊর্ধ্বেই সহস্রারচক্র।[৫] মূলাধার বা সর্বনিম্ন চক্রই ঘোর-অন্ধকারের কেন্দ্রস্থল। মূলাধার বিন্দু হইতে

৫। আজ্ঞাচক্র ও সহস্রারচক্রের মাঝে বঙ্কা, চিত্রিণী, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি আরও কয়েকটি সূক্ষ্ম-স্তর আছে।

বহির্গত হইলেই জীবকলা বা সুষুম্নাবাহী জীবরশ্মি স্থূলপঞ্চকৃত ত্রিতমস-আবরণে বেষ্টিত হইয়া পড়ে।...মহাপ্রলয়ের সময় এই পঞ্চীকৃত স্তর স্বভাবের নিয়মে অপঞ্চীকৃত হইয়া পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয় এবং বিত্তন্মাদি চক্রে বিলীন হইয়া যায়।...বিত্তন্মাদি পঞ্চবিন্দু হইতে রশ্মি বিকীর্ণ হয়—ইহাই পঞ্চতন্মাত্রাচক্র।...পঞ্চীকরণকালে পঞ্চতন্মাত্রার মিশ্রণের তারতম্যানিবন্ধন অনন্ত-প্রকার স্থূলকলা বা অণু (বীজ) উৎপন্ন হয়।...যে শক্তিপ্রবাহ প্রথমত জ্যোতিরূপে ও পরে নাদরূপে প্রকটিত হইয়াছিল তাহাই স্থূলস্তরে আসিয়া প্রাণরূপে প্রকাশিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদিবায়ু প্রভৃতি এই প্রাণশক্তিরই বিকাশ।

'কুণ্ডলিনী চৈতন্যের সঙ্গে-সঙ্গে ইড়া-পিঙ্গলায় প্রবাহমান স্রোত সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া সুষুম্নাপথে প্রবেশ করে এবং সুষুম্নাপথে ও ঊর্ধ্বে উঠিতে উঠিতে ক্রমশ আরও অধিকতর সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জীবশক্তি বজ্রা ও চিত্রিণী-নাড়ী ভেদ করিয়া অবশেষে ব্রহ্মনাড়ী অথবা আনন্দময়কোষে[৬] গমন করে। ইহাই ঐশ্বর্য-অবস্থা। আনন্দময়কোষেও যখন আর লক্ষ্য থাকে না, তখনই গুণাতীত পরমসাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে।...'

কুণ্ডলিনীশক্তি বা স্থূলকুণ্ডলিনী ও তার সার্থক-জাগরণের তত্ত্বকথার পরিচয় দিয়েছেন বিদগ্ধ তন্ত্রতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়। কুণ্ডলিনী ও তার পরম-তত্ত্বের সকল রহস্যই অবগত ছিলেন চৌষট্টিতন্ত্রের সাধনাভিজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণদেব। তন্ত্রসাধনায় জ্ঞাননিষ্পন্না ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় কুণ্ডলিনীতত্ত্বের যুক্তই রহস্য জানা সম্ভব হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পক্ষে। 'জ্ঞানী আপনি খায় না, কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়'—এই রহস্যময় ইঙ্গিত তাঁর তন্ত্রসাধনায় অসাধারণ অভিজ্ঞতার ও সিদ্ধান্তের মর্মকথাই প্রকাশ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ উক্তির ('কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়') সামান্য-কিছু পরিচয় দিলে বলা যায় যে, কুণ্ডলিনীমুখে সকল-কিছু আহুতি দেওয়ার তন্ত্রনির্দিষ্ট বিধান বা পদ্ধতি হ'ল : প্রথমে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় (চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-ত্বক্-জিহ্বা), পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ), পঞ্চবায়ু (প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান) এবং মন ও বুদ্ধি (এর সঙ্গে চিত্ত ও অহংকার)—এই সতেরোটি অবয়ব বা উপাদান এবং এই সকল (সতেরোটি) উপাদানের আধার অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্মশরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে নিবাত-নিষ্কম্প-দীপকলিকার মতো চিন্তা ক'রে হৃদয় থেকে সুষুম্নাপথে আকর্ষণ ক'রে মূলচক্র-মূলাধারে মহাশক্তিময়ী স্থূলকুণ্ডলিনীতে লীন অর্থে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতি শুধুই মূলাধারে নয়, মূলাধারের মতো স্বাধিষ্ঠানে, মণিপুরে, অনাহতে, বিশুদ্ধে, আজ্ঞায় ও পরিশেষে সহস্রারপদ্মে পরমশিবে আহুতি দিতে হয়। এই আহুতি দেওয়ার অপর নাম উদ্দীপনা, জাগৃতি বা প্রদীপ্তি ; অর্থাৎ সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত করা। এক একটি পদ্ম বা চক্র প্রদীপ্ত ও জাগ্রত হলেই তার নিম্নমুখ (অধোমুখ) ঊর্ধ্বমুখ হয়। আজ্ঞাচক্র ভেদ ক'রে যখন সহস্রারচক্রের দিকে মহাশক্তি-কুণ্ডলিনীর গতি হয় তখনই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ মনের বা চিত্তের লয় বা নাশ হয় এবং কুণ্ডলিনী সহস্রারবাসী পরম-

৬। আনন্দময়কোষের স্থান আজ্ঞাচক্র। এ-প্রসঙ্গে 'আনন্দময়অভ্যাসাৎ...' প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে আচার্য শঙ্করের ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জ্যোতির্ময় মহাশিব বা পরমশিবের সঙ্গে একসত্তা বা সমরসসম্পন্ন হয়। এরই নাম সমাধি বা মুক্তি যোগসাধনায় ও তন্ত্রসাধনায়। বেদান্তে জীব নিজের ব্রহ্মসত্তায় সমাসীন হলে, অর্থাৎ জীব যখন সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করে যে, সে জীবসত্তা নয়, কিন্তু ব্রহ্মসত্তা—'ব্রহ্মৈবনাপরঃ', তখনই তার তেমনরূপ অজ্ঞান অপসারিত হয়, নাশ হয়, বা অজ্ঞান জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। অজ্ঞান ভ্রম বা ভুলজ্ঞান। এই ভ্রম বা ভুলজ্ঞান নষ্ট হয় বলতে অভ্রান্তিরূপ সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়। সুতরাং 'কুণ্ডলিনীতে আহুতি দেয়' বলতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়+পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়+পঞ্চপ্রাণ+মন ও বুদ্ধি—এই সতেরোটি অবয়বযুক্ত জীবকে বা জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপী পরমশিবে বা ব্রহ্মে সমর্পণ করে বা আহুতি দেয়। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ২৫-২৯ শ্লোকগুলিতে 'জুহ্বতি' বা 'আহুতি দেওয়া'-র কথা আছে—'যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি' (৪।২৫), 'সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি' ও ও 'ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি' (৪।২৬), 'জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে' (৪।২৭), 'প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি' (৪।২৯)। 'অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে' (৪।২৯)—অপানবায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে যেমন আহুতি (জুহ্বতি) দেওয়া হয়, তেমনি জীবকে শিবে বা জীবত্বকে শিবত্বে বা ব্রহ্মে বলতে ব্রহ্মস্বরূপসত্তায় আহুতি দেওয়া হয়। আহুতি দেওয়ার অর্থই সমরসসম্পন্ন করা, বা বিরূপ থেকে স্বরূপে, বা ভেদ থেকে অভেদেপ্রতিষ্ঠিত করা। বাঙলার শক্তিসাধক রামপ্রসাদ এই আহুতি দেওয়ার প্রসঙ্গে বলেছেন—

মন বলি ওরে কালী ইচ্ছা হয় যে আচারে।
মুখে, গুরুদত্ত মহামন্ত্র, দিবানিশি জপ করে॥
শয়নে প্রণামজ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
আহার কর মনে কর, আহুতি দেই শ্যামা-মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজেন সর্বঘটে,
নগর ফের মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা-মারে॥

বর্ণময়ী ও মন্ত্রময়ী[১] শ্যামা-মা বিশ্বসৃষ্টির মূলকারণ এবং বিশ্বসৃষ্টির সকল প্রাণী ও বস্তু তাঁরই অভিন্ন রূপ। 'আহার কর', 'নগর ফের'—যেকোন কাজই করি না কেন, সকল-কিছুই শ্যামা-মার পাদপদ্মে আহুতি দান করা। এই আহুতি দেওয়ার সকল অহংকারের অভিমান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই সমর্পণ বা আহুতি দেওয়ার পিছনে থাকে প্রপত্তি বা আত্মসমর্পণের ভাব বা মনোবৃত্তি—যাতে ক'রে 'আমি'-'আমার'-অভিমান দূর হয়ে মন প্রশান্ত হয় ও শান্তির আলোকে সুস্নাত হয়। এই শান্তিলাভের অপর নাম নির্বাণ, মুক্তি বা মোক্ষ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারপর বলেন: 'ভক্তের পক্ষে উঁচি (দোষ) হয়, জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই'। কথা এই যে, জ্ঞানীর পক্ষে সাতখুন-মাপ, কিন্তু ভক্তের পক্ষে তা নয়। জ্ঞানীর জ্ঞানরূপ অগ্নিতে সকল-কিছুই ভস্মীভূত হয়ে সুবর্ণে পরিণত হয়। ভক্ত ও জ্ঞানীর

১। 'কালী পঞ্চাশদ্বর্ণময়ী'—পঞ্চাশটি বর্ণ (স্বরবর্ণ+ব্যঞ্জনবর্ণ) পঞ্চাশটি কালীর নাম।

স্বভাব ও আচরণ তাই সাধারণভাবে দু'রকম, এক রকম নয়। ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবান ভক্তির অধীন হলেও ভক্ত ও ভগবান—উপাসক ও উপাস্য ভিন্ন ভিন্ন, এক নয়, কিন্তু জ্ঞানীর কাছে ভগবান দূরে নন, বহু রূপী হলেও তিনি এক ও অন্তর্যামী। অন্তর্যামী অন্তরেই থাকেন, অন্তরে বিরাজ ক'রে সব-কিছুই সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি যন্ত্রী, আমরা তাঁর যন্ত্র। ভক্তির ক্ষেত্রে যন্ত্র তাঁর (যন্ত্রীর) ইঙ্গিতে বা আদেশে সর্বদাই চলে।[৮] কিন্তু জ্ঞানী দেখেন ও ভাবেন যে, যন্ত্রীরূপ ঈশ্বর সাক্ষীচেতা বা চৈতন্য ও নির্গুণ, তিনি সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত—যেমন পদ্মপাতায় জল থাকলেও জল নির্লিপ্ত, জল পাতায় লাগে না। তেমনি দ্রষ্টা ও সাক্ষী-স্বরূপ ঈশ্বর সবার ও সকল-কিছুর অন্তরে চৈতন্যরূপে বিরাজ করলেও মানুষ ও সকল প্রাণীই যে-যার কৃতকর্মের অনুযায়ী ফল ভোগ করে। মানুষ তার ইচ্ছার বা প্রবৃত্তির অনুযায়ীই সংসারে কাজ করে, প্রকৃতি বা স্বভাব তাকে সকল কাজেই প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা যোগায়[৯] এবং সে তাই কাজ করে ও কাজের ফল ভোগ করে। 'চক্রবৎ পরিবর্তন্তে'—চক্র বা ধারাবাহিক-ভাবে ও গতানুগতিকভাবে মানুষের জীবনযাত্রা সংসারে চলে। তবে সে যদি আত্মস্থ হয়, সকলের মধ্যে ও নিজের মধ্যে মহাচৈতন্য ও বিশ্বচৈতন্যের প্রকাশ অনুভব করে, তবেই তার দৃষ্টি কেবলই নিজের (ব্যষ্টিচেতনার) দিকে নিবদ্ধ থাকে না, থাকে সবারই বা সমষ্টিচেতনার দিকে এবং তখনই সর্বগত বা সর্বব্যাপী মহাপ্রাণচৈতন্যের দিকে তার দৃষ্টি ও জ্ঞান প্রসারিত হয় এবং তখনই সে কেবল আত্মতুষ্টি ও সংকীর্ণ-স্বার্থপরিপোষণের জন্য কোন চেষ্টা ও কর্ম করে না, করে সকল বিশ্ববাসীর জন্য। তখনই সে 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'—গীতার এই মহান্ তত্ত্ব ও সত্য জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, ফলে দৃষ্টিভেদের ও সংকীর্ণতার আবরণ আত্মপ্রসারতার সমুজ্জ্বল আলোককে আর ক্ষুণ্ন ও ম্লান করতে পারে না। এটিই হ'ল যথার্থজ্ঞানীর লক্ষণ ও অবস্থা। এই যথার্থজ্ঞানীর বা বিজ্ঞানীর কাছে তখন 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'—বিশ্বের সকল প্রাণী ও বস্তুই আপনার থেকে আপনার বলে মনে হয়, আর তখনই সেই জ্ঞানী নিজের মধ্যে ও বিশ্বের সকলের ও সকল-কিছুর মধ্যে দেখেন এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্যময় পুরুষকে—যে বিজ্ঞানঘন পুরুষ বিশ্বের ভিতরে ও বাইরে ('অন্তর্বহিঃ') একইভাবে সর্বদা বিরাজিত। এই দিব্যদর্শন (বিশ্বরূপদর্শন) লাভ করেছিলেন পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ-বাসুদেবের কৃপায় কুরুক্ষেত্রের-সমরাঙ্গনে এবং তখনই অর্জুনের সকল সংশয় ও অজ্ঞান জ্ঞানের সমুজ্জ্বল আলোকে দূরীভূত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন: 'জ্ঞানের পক্ষে উটি নয়', অর্থাৎ জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ বা ত্রুটী হয় না, কিন্তু ভক্তের পক্ষে ভিন্ন কথা। ভক্তকে সংসারের বাধা-নিষেধ এবং ভাল-মন্দ

৮। নিয়ন্ত্রিত হয়।

৯। গীতার ৩।৩৬-৩৭ শ্লোকে এর ইঙ্গিত আছে: (১) "অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং……অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ"। (২) 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ…'।

(৩) 'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'। ৩।২৭

অনেক-কিছুই মানতে হয়। তারপর অবতারজীবনের কথা স্বতন্ত্র। যুগপ্রয়োজনে যুগে যুগে যাঁদের আসা, তাঁরা পার্থিব সংসারের সকল বাধা-নিষেধের বহু ঊর্ধ্বে হলেও তাঁদেরকেও সংসারের ও সমাজের কিছু-কিছু নিয়ম-নীতিকে ব্যবহারিকভাবে মেনে চল্‌তে হয়, কেননা লোকশিক্ষার জন্যই তাঁদের পৃথিবীতে আসা (অবতরণ)। সকল যুগে সকল অবতারপুরুষদের জীবন লক্ষ্য করলে একথাই সত্যকারভাবে প্রমাণিত হয়।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে অর্থাৎ ব্যবহারিক জীবনধারার মধ্যেও ব্যতিক্রম ছিল। এ'কথার ইঙ্গিতেই তিনি বলেছেন : 'আমার এখনকার অবস্থা,—বামুনের দেওয়া ভোগ না হ'লে খেতে পারি না। আগে এমন অবস্থা ছিল—দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়াপোড়ার যে গন্ধ আসতো—সেই গন্ধ নাক দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্টি লাগ্‌তো। এখন সব্বাইয়ের হাতে খেতে পারি না'।

ব্রাহ্মণ-শূদ্র বা উচ্চ-নীচ-জাতি-বর্ণের ছোঁওয়া-ছুঁয়ির সংস্কারের কথা বলছেন না শ্রীরামকৃষ্ণদেব, তিনি বলেছেন নিজের সিদ্ধজীবনের প্রাত্যহিক জীবনব্যবহারের কথা। ছুঁৎমার্গের সংকীর্ণ-সংস্কারের বশবর্তী ছিলেন না সর্বসংস্কারবর্জিতজীবন শ্রীরামকৃষ্ণ, সাধকদের সাধনজীবনে এবং অবতারপুরুষদের সিদ্ধ-পবিত্র-জীবনের আচরণ, ভাবনা ও অনুভূতির ক্ষেত্র কি ধরনের হয়—সে'কথারই আভাস বা পরিচয় দিয়েছেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনেও আমরা দেখি যে, কত-কিছু বিধি-নিষেধের সম্মুখীন হয়েছেন তিনি, আবার সমাজের অন্ধবিশ্বাসের ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরমন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর বিগ্রহপ্রতিষ্ঠার কথাই আলোচনা করি এখানে। ধর্মপ্রাণা রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তিপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নিষ্ঠাবান রামকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুরুদ্ধ হয়েছিলেন মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কর্মে ব্রতী হবার জন্য, তখন কৈবর্ত্যবংশজাত রাণী রাসমণি, সুতরাং নীচজাতীয়া রাণীর কর্মে শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্রতী হওয়া অশাস্ত্রীয় ও সমাজবিরুদ্ধ—এই আপত্তির বিরুদ্ধে দারুণভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন যুক্তিবাদী শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রাহ্মণদের পক্ষে শূদ্রান্নগ্রহণ নিষেধ বলে বিধান দিয়েছিলেন যখন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা, তারও কঠোর সমালোচনা করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন ছোট ভট্টাচার্য তথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব। সুতরাং ন্যায় ও বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি শ্রীরামকৃষ্ণ কোনদিনই অন্ধসংস্কারের বশবর্তী হয়ে। তবে সাধনসিদ্ধ মহামানবদের এবং বিশেষ ক'রে যুগাবতারদের অপাপবিদ্ধ পুণ্যস্নাত জীবনে মাঝে মাঝে বিভিন্ন ভাব ও অনুভূতি-অনুযায়ী ব্যবহারিক আচরণের মধ্যে কিছু-কিছু বৈলক্ষণ্য বা ব্যতিক্রম দেখা যায় ও সেই ব্যতিক্রম বা বিসদৃশ-আচরণের সঠিক উত্তর ও পরিচয় অনেক সময়েই দেওয়া সম্ভব হয় না। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, যুগনায়ক শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারদের জীবনাচরণ লৌকিক সমাজে ও ব্যবহারিক জগতে সাধারণভাবে ধরাছোঁয়ার মধ্যে এলেও তা রহস্যপূর্ণই ছিল—সাধারণ বুদ্ধিতে যার সঠিক উত্তর অনেক সময়েই মেলে না।

যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেই দেখি যে, তিনি বলেছেন : 'আমার এখনকার অবস্থা—বামুনের দেওয়া ভোগ না হলে খেতে পারি না', আবার কিছু পরেই বলেছেন : 'পারি না

বটে, আবার এক একবার হয়ও। কেশবসেনের ওখানে (নবৃন্দাবন) থিয়েটারে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। লুচি, ছক্কা আন্‌লে। তা ধোবা—কি নাপিত আন্‌লে, জানি না (সকলের হাস্য)। বেশ খেলুম। রাখাল বললে—একটু খাও'। পূর্বে তিনি বলেছেন : 'সহজানন্দ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না'। তাই এখানে দু'রকম এবং পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে এ'দুটি কথা বিরোধী নয়। ভাবমুখে শ্রীশ্রীঠাকুর যখন ছিলেন, তখন এক এক সময়ে এক এক রকম ভাবে তিনি আত্মহারা হ'য়ে থাকতেন। সমাধিও হ'তো মাঝে মাঝে। তাই বিভিন্ন ভাবের ও অনুভূতির অবস্থায় তাঁর জীবনে বিভিন্ন আচরণও দেখা যেতো অনেক সময়েই। তাঁর সঙ্গে যাঁরা সর্বদা বা প্রায়ই থাকতেন, বা নিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে মিশতেন, তাঁরাই কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিভিন্ন ভাবের, কথার ও আচরণের অর্থ বুঝ্‌তেন, কিন্তু অপরের কাছে সেইসব থাক্‌তো আলো-আঁধারি ও রহস্যময়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ষদদের জীবনেও আমরা এ'ধরনের আচরণ লক্ষ্য করেছি—যেগুলি সাধারণ বুদ্ধির বিচারে ধরা পড়ে না কোনদিনই। তবে সত্যই সেগুলি ঘট্‌তো, কাল্পনিক বা গল্পকথা নয়।

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে যেতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব নরেন্দ্রনাথকে সকলের অপেক্ষা বুদ্ধিমান বলে মনে করতেন। নরেন্দ্রনাথের জন্য গোপনে অনেক সময়ে অনেক জিনিসই তিনি রাখতেন—যা একমাত্র নরেন্দ্রনাথই খাওয়ার অধিকারী ছিলেন। তিনি বলতেন : 'নরেন খাপখোলা তরোয়াল। ওর কিছুতেই দোষ হয় না'। শ্রীশ্রীঠাকুর বুঝেছিলেন নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ছিলেন জ্ঞানী ; জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই।...ভক্তের পক্ষে উটি নয়'। সেজন্য যখন বলেন : 'পারি না বটে, আবার এক একবার হয়ও···', তখন নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : (নরেন্দ্রের প্রতি)—'তোমার এখন হবে। তুমি এতেও আছ, আবার ওতেও আছ। তুমি এখন সব যেতে পারবে'। কথা এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বুঝেছিলেন যথার্থ জ্ঞানী যারা, তারা যথার্থ ভক্তও। জ্ঞান পাকা হলে ভক্তিও পাকা হয় ; আর জ্ঞান যেখানে থাকে, ভক্তিও সেখানে থাকে। ভক্তি ও অনুরাগ ছাড়া জ্ঞানও সার্থক হয় না, কেননা জ্ঞান ও বিচার ছাড়া ভক্তির পূর্ণরূপের প্রকাশ হয় না। তাই জ্ঞান ও ভক্তি যেন দু'টি যমজ-ভাই, একের অবর্তমানে অপরে অচল ও অপূর্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল সময়েই সকলের জীবনের দিকে লক্ষ্য রাখতেন ও জীবনের লক্ষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলতেন। তিনি উপায়কে বলতেন ঐ লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। কিন্তু সাধারণ মানুষ অনেক সময়েই উপায় বা পথকেই বড় বা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, ফলে জীবনের লক্ষ্য হয় তাদের ক্ষুণ্ন ও অবহেলিত। তিনি বলেছেন : '(ভক্তদের প্রতি) শূকর মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে, সে লোক ধন্য। আর হবিষ্য ক'রে যদি কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকে, তাহলে সে ধিক্'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্য এই যে, খাদ্য (খাওয়া) ও খাদ্যের (খাওয়ার) বাধ-বিচার, অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যের বিচারের কোন মূল্য বা সার্থকতা নাই—যদি জীবনের লক্ষ্যরূপ ঈশ্বরের প্রতি না দৃষ্টি, আকর্ষণ, শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকে। তাই ঈশ্বরদৃষ্টিই

আসল বা মুখ্য, আর ধান্তাধান্তের বাদ-বিচার গৌণ। কামিনী[১০]-কাঞ্চনই সংসারে ভোগ ও আসক্তি, এই কামিনী-কাঞ্চনই মানুষকে সংসারে আবদ্ধ করে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকলকে জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখতে বলেছেন, আর আচার-বিচার প্রভৃতি অবান্তর বা গৌণ। সাধিকা মীরাবাঈয়ের কথাও তাই, তিনি পরমপ্রীতির সঙ্গে অহরহঃ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের সাধন-ভজন করতে বলেছেন, কেননা শ্রীভগবানে প্রেম ও অনুরাগ ছাড়া শ্রীভগবানকে লাভ করা যায় না। এ'সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গানটি হ'ল—

সাধন করনা চাহিয়ে মনবা, ভজন করনা চাই।
প্রেম লগান চাহিয়ে মনবা প্রীতি করনা চাই॥
নিত নাহনসে হরি মিলে তো জলজন্তু হোয়।
ফল-মূল খাকে হরি মিলে তো বাদুর বাঁদরায়॥
তুলসী পুজনসে হরি মিলে তো মায় পুঁজু তুলসীবাড়।
পাথর পুজনসে হরি মিলে তো মায় পুঁজু পাহাড়॥
তিরণ ভখনসে হরি মিলে তো বহুৎ মৃগী অজা।
স্ত্রী ছোড়নসে হরি মিলে তো বহুৎ রহে হোয় যোজা॥
দুধ পিনেসে হরি মিলে তো বহুৎ বৎস বালা।
মীরা কহে বিনা প্রেমসে মিলে নহীঁ নন্দলালা॥

কথাই তাই যে, প্রেম বা প্রেমাভক্তি ছাড়া, যথার্থ-অনুরাগ ছাড়া নন্দলালা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না। শ্রীভগবানকে বা ঈশ্বরকে পাওয়ার নামই অজ্ঞানের পারে যাওয়া ও পরমজ্ঞানপ্রাপ্তি মুক্তি লাভ করা।

●

১০। কামিনী বলতে কাম বা কামনা ও বাসনা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন: 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।...বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্' (৩।৩৭)। বৈরী অর্থে শত্রু ও প্রতিবন্ধক।

॥ কল্পতরু দিবসের তাৎপর্য ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(উত্তর ভাগ)

তৃতীয় পর্যায়ে দেখা যায় কোন কোন মুহূর্তে ভগবৎ-কৃপার উচ্ছ্বসিত প্রকাশ। কল্পতরুর এই তাৎক্ষণিক কৃপা-উৎসার কৃপাভিলাষীর হৃদয়পটে বিদ্যুৎ-চমকের ঝিলিক দেয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীর ঘটনা যেন আগ্নেয়পর্বতের অগ্ন্যুৎপাত। স্বল্পকালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-আধার হতে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল দুর্লভ সম্পদ সকল। বাদুলে পোকার মত ছুটে গিয়েছিল কৃপাভিলাষিগণ। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ বাসনা পূরণ হতে দেখে উদ্বেলিত হয়ে পড়েছিল। কল্পতরু-দিবস নামে চিহ্নিত ১লা জানুয়ারীর নিকটবর্তী ২৩শে ডিসেম্বর ও ৬ই নভেম্বর তারিখে প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক কৃপা-প্রকাশের ঘটনাবলীর পরস্পরের মধ্যে বেশ কিছু মিল আছে, আবার অমিলও কিছু কম নেই। এসকলের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষণীয় নিম্নলিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য।

(ক) কৃপাভিলাষী ভক্তদের স্তব-আরাধনায় অবতারপুরুষের কৃপা-প্রস্রবন উন্মোচিত হয়। ৬ই নভেম্বর কালীপূজার দিন ভক্তবীর গিরিশচন্দ্র-প্রদত্ত পুষ্পাঞ্জলিই শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাদীপটিকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল। কল্পতরুদিবসে গিরিশচন্দ্রের স্তবস্তুতি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাবর্ষণের অবিলম্ব কারণ।

(খ) কল্পতরুদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্যাগী ভক্তদের আড়াল করে গৃহীভক্তদের নিয়ে লীলাবিলাস করেছিলেন, কৃপা বিতরণ করেছিলেন।

(গ) ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ তারিখের কাশীপুরের কৃপার-হাটবাজারে স্ত্রীপুরুষ ভক্ত নির্বিশেষে কৃপা লাভ করেছিলেন। কল্পতরুদিবসে কৃপাপ্রাপ্তদের মধ্যে মহিলাভক্ত অনুপস্থিত।

(ঘ) কল্পতরুদিবসে কৃপাপ্রাপ্তদের মধ্যে প্রত্যেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কম বেশী পরিচিত।

(ঙ) কল্পতরুদিবস ছিল ইংরাজী বছর পয়লা, অফিসকাছারী স্কুলকলেজের ছুটির দিন। কাশীপুর বাগানবাড়ী মুখ্যতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল। কিন্তু লীলাময় শ্রীরামকৃষ্ণের অলক্ষ্য নির্দেশে ত্যাগী যুবক ভক্তগণ কঠোর সাধনভজনে মেতে উঠেছিলেন। বাগানবাড়ী পরিণত হয়েছিল মঠবাড়ীতে। সংসার-কোলাহলের প্রান্ত-উত্তীর্ণ মঠবাড়ীর বাতাবরণে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন গৃহী ভক্ত অবসর সময়ে জমায়েত হয়েছিলেন। এই ভক্তগণই উপযুক্ত স্থান ও কালে শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক স্ফুরিত কৃপার স্নাত হয়ে জীবন সার্থক করেছিলেন।

(চ) ঈশ-কৃপা অহেতুক হলেও কৃপা-বিতরণ নির্বিচার নয়। কল্পতরুদিবসে সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ হরিশ মুস্তাফিকে কৃপা করেছিলেন। তিনিই পূর্বসপ্তাহে হরিশকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কৃপাধন্য হরিশ আনন্দে উন্মত্ত হয়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলেন, "ভাইরে, আমার আনন্দ যে ধরে না। একি ব্যাপার! জীবনে এমন ঘটনা একদিনও দেখি

নাই।" এদিকে দেখা যায় কল্পতরুদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ হরমোহন মিত্রকে কৃপাদান করতে অসম্মত হয়েছেন। প্রতাপচন্দ্র হাজরাকে কৃপা করতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। প্রাণপ্রিয় নরেন্দ্রনাথের বারংবার অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরাকে আশ্বস্ত করেন। বলেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে কৃপা করবেন।

প্রাগুক্ত কল্পতরুদিবসের কৃপামকে যাঁরা ইষ্টদর্শনাদিরূপ বিশেষ কৃপালাভ করেছিলেন এবং যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই জীবন শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতুক অভয়াশ্রয়লাভে অমৃতান্বিত হয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন "জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয় প্রদান" করেছিলেন, কল্পবৃক্ষের মত প্রার্থীর শুভাশুভ বিচার না করে তিনি যে কোন প্রার্থনা মঞ্জুর করেন নি। সুতরাং সমাদৃত বা আপাতদৃষ্টিতে প্রত্যাখ্যাত সকল ভক্তই ঈশকৃপা দ্বারা ঈষদ্স্পৃষ্ট এবং ঈশাশ্রয়ে নিশ্চিন্তভাবে সুরক্ষিত হয়েছিলেন।

(ছ) সেদিন রামকৃষ্ণের করুণার প্রাবণ-উৎসার কত বিচিত্রভাবেই না প্রকটিত হয়েছিল। অনুসন্ধানে জানা গিয়েছিল, "কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ; কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির আজ্ঞলামান দর্শন, কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড়সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে এইরূপ বোধ ও আনন্দ এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতির্ময় চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল।...একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—একথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল।" রামলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর হৃদপদ্মে ইষ্টমূর্তির সর্বাঙ্গসুন্দর মূর্তিদর্শনে বিমোহিত। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল সর্বভূতে শ্রীরামকৃষ্ণের "প্রসন্ন হাস্যদীপ্ত মূর্তি" দর্শনে পুলকিত। তাই ভূপতির সমাধির প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের অর্থোপার্জন প্রার্থনা পূরণ হয়।

দেখা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাবশে সকল প্রার্থীর প্রার্থনা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করেছিলেন। প্রার্থিত-কৃপা-ধারণে অসমর্থ ব্যক্তির ক্ষেত্রে তিনি কৃপাবর্ষণ সাময়িকভাবে রুদ্ধ করেছিলেন, অথবা প্রার্থীর আকাঙ্ক্ষার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই অবতার-পুরুষের করুণাঘন মানসিকতার স্ফুরণ নির্ভেজাল ও অহৈতুকী লক্ষ্য করে ভক্তমাত্রেরই জিজ্ঞাসা হয়েছিল ব্যাপ্ত, বোধ হয়েছিল গভীরতার, সর্বস্তর প্রসন্নতায় সকলের অন্তরঘট হয়েছিল পরিপূর্ণ। অমৃত ও অভয়ের পতি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি সকলেই অনুভব করেন তীব্র আকর্ষণ।

(ঘ) কল্পতরুদিবসে ব্যাপক কৃপা বিতরণপর্বের পরক্ষণে নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভব করেছেন "শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জ্বলে যায়।"[১] পুঁথিকার এবিষয়েও লক্ষ্য করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের "গঙ্গাজলে অঙ্গখানি করিলে মোক্ষণ। তবে না হইল পরে জ্বালা নিবারণ।"

১। রামলালদাদার স্মৃতিকথাতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "শালাদের পাপ নিয়ে আমার অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। গঙ্গাজল দিয়ে আয় গায়ে মাখি।"

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের কৃপাদান করে সে-সঙ্গে ভক্তদের যাবতীয় দুষ্কৃতির বোঝা নিজে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জ্বালাযন্ত্রণার ভোগ সত্ত্বেও কৃপাবিতরণ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বভাবধর্ম। অগ্নিতে যেমন দাহিকাশক্তি, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ তেমনি ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর কৃপাবিতরণের মধ্যে চিরসাযুজ্য। আনন্দরসাশ্রয় শ্রীরামকৃষ্ণ এই ভাব হতেই বলতেন: "যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করে একজনের উদ্ধার সাধন করতে পারি তাহাও সার্থক বোধ করি।"[১০]

অখিলাত্মা ঈশ্বর কল্পতরু। ঈশ্বরাবতার কল্পতরু। যে যা চায় সে তাই পায়। কৃপালাভের মাধ্যমে কৃপাধন্য পায় কৃপাদাতাকে। "কৃপারূপে নিজে প্রভু লীলার ঈশ্বর। আপনি বিরাজমান কৃপার ভিতর।" সে-কারণেই ভক্তমাত্রেই কৃপা-লোলুপ। কিন্তু এসকল কৃপাই সঙ্গে সঙ্গে বা ক্রমে ক্রমে পরমার্থের সংযোগ ঘটিয়ে দেয়। কিন্তু কৃপাদাতা করুণাপরবশ হয়ে দান করতে চাইলে ভক্তমাত্রেই কৃপাগ্রহণ বা ধারণে সমর্থ নাও হতে পারে। নরেন্দ্রনাথের মত উঁচু আধারও প্রথম অবস্থায় ঈশ-কৃপা সাদরে বরণ করতে পারেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শ লাভ করে তিনি আর্তনাদ করে উঠেছিলেন 'ওগো, তুমি আমায় একি করলে, আমার যে বাপ-মা আছেন।' কৃপাপ্রাপ্ত মথুরানাথের পরবর্তী প্রার্থনা বিবেচনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রদত্ত মহা-কৃপা প্রতিসংহার করেছিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাভার সহ্য করতে না পারায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কৃপার প্রভাব প্রতিসম্বরণ করেছিলেন। এসকল ঘটনা হতে সহজেই বোঝা যায় যে প্রার্থীকে কৃপালাভ ও ধারণের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কল্পতরু ভগবান সদাব্রত খুলে বসে আছেন। সে-কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হবে। কল্পতরুর সামীপ্য বা সান্নিধ্য কৃপালাভের অন্যতম সর্ত। কালীকল্পতরুমূলে বসে চাইতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, "ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পায়।" (কথামৃত ৩।১।৪)। শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেছেন শশধর পণ্ডিতকে: প্রার্থনা কর। তিনি দয়াময়। তিনি কি ভক্তের কথা শুনেন না? তিনি কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে।" (কথামৃত ৩।১।৩) অনুরূপভাবের কথা শুনতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে, "কল্পতরুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়।—তবে ফল তরুর মূলে পড়ে—তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়।" (কথামৃত৩।১৮।২) বীরভক্ত হনুমানও বলেছেন, "শ্রীরামকল্পতরুমূলে বসে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা, সেই ফল প্রাপ্ত হই।" যোদ্দা কথায় কল্পতরুর কৃপাফল লাভ করতে হলে প্রার্থীকে কল্পতরুর সামীপ্য লাভ করতে হবে, কল্পতরুমূলে ঠাঁই নিতে হবে এবং অনুরাগ-আপ্লুত ব্যাকুল প্রার্থনা করতে হবে।

ঈশ্বরকৃপা কোন সর্তাধীন নয়। কৃপা অহৈতুকী। সেক্ষেত্রে কৃপালাভের জন্য আয়াস-প্রয়াসের বা পুরুষকারের প্রশ্ন উঠবে কেন? বুঝতে হবে পুরুষকারযোগে কর্ম, আর কৃপা বা দৈবযোগে সিদ্ধি। কর্ম দিয়ে কৃপাবারি আকর্ষণ করতে হয়। আবার কৃপাবারি বর্ষণ হলে কি হবে, হৃদয়ভূমির যদি না কর্ষণ থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন যে পুরুষকারের সীমা উত্তীর্ণ হলেই কৃপার এলাকায় অনুপ্রবেশ ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী: যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন

১০। রামকৃষ্ণ মিশন এসোসিয়েশনের ১১তম অধিবেশনে প্রদত্ত গিরিশচন্দ্রের ভাষণ।

ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক দেন না। এইজন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখো না সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম করে তবে কৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ করলে তাঁর কৃপার দশজন্মের ভোগটা একজন্মে কেটে যায়।"[১১] বুঝতে হবে, কল্পতরুর কৃপা-উন্মোচনের আবহপর্বে ভক্তের পুরুষকারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ঈশ-কৃপার সমীর বইছে। কিন্তু সমীরস্পর্শ অনুভব করতে হলে চাই প্রস্তুতি। চাই ঈশ্বরপ্রীতি। চাই ঈশ্বরানুরাগ। চাই প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ত। বিষয়বাসনাপরতন্ত্র মানুষের সন্দেহ খোচাবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন: কিন্তু কৃপা কি অমনি হয়? ভিখারী যদি পয়সা চায় দেওয়া যায়। কিন্তু একেবারে যদি রেলভাড়া চেয়ে বসে। (কথামৃত ৫।১২।৩)। কল্পতরু-ঈশ্বরের কৃপাসমীর বইছে। বরঞ্চ ঈশ্বরাবতারের সমুপস্থিতিতে কৃপাসমীর হয় সহজলভ্য। কিন্তু তৎসত্ত্বেও পাল তুলতে হবে, তবেই কৃপার মলয় পালে শক্তি সঞ্চয় করবে, জীবন-নৌকাকে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কল্পতরুর কাছে কি চাইবে মানুষ? কামাবস্তু কি হবে? কল্পতরুর কাছে যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যায়। বিবিধ বাসনা-প্রপীড়িত মানুষের মনে অসংখ্য হিজিবিজি বাসনাকামনার ভীড়। সে-রকম মন নিয়ে কল্পতরুর কাছে উপস্থিত হলে বিপদেরই সম্ভাবনা। এ-বিষয়টি ভক্তদের অন্তরে গেঁথে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ একটি চমৎকার গল্প উপহার দিয়ে। কল্পবৃক্ষতলে উপবিষ্ট পথিকের গল্প। পথিক অনেক বৈষয়িক সুখভোগ করে, শেষপর্যন্ত বাঘের পেটে যায়। গল্পের উপসংহারে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ঈশ্বর সাধন করতে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথবা মানযশ ইত্যাদি কামনা করলে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে বাঘেরও ভয় থাকে। অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, অপমান ও বিষয়-নাশ-রূপ বাঘ—স্বাভাবিক বাঘ হতেও লক্ষগুণে কষ্টদায়ক।"[১২]

প্রকৃতপ্রস্তাবে সকাম উপাসনার মধ্যেই রয়েছে বিপদের আকর। কিন্তু নিষ্কাম উপাসনা-প্রার্থনা সহজসাধ্য নয়। উপাসনা-প্রার্থনার প্রধান সম্পদ বিশ্বাস। বিশ্বাসের শিকলের পাশ ধরে ধরে ভক্ত ভগবানের দিকে অগ্রসর হয়। বিশ্বাসসূত্র আশ্রয় করেই মানুষ কল্পতরুমূলের দিকে অগ্রসর হয়। Essays on the Gita নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "By seeking all his good from the Divine, he shall come in the end to seek in the Divine all his good." মূল লক্ষ্য ভগবানের দিকে নজর রেখে ভগবৎবিশ্বাসাশ্রয়ী মানুষ সকাম উপাসনা অবলম্বন করেও অগ্রসর হতে পারে। ক্রমে ক্রমে সাধক কামনাশূন্যতার শুদ্ধতা লাভ করে।

এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তিপূর্ণ নির্দেশ। তিনি বলেছেন: মনে নিবৃত্তি এলে তবে বিবেক হয়। বিবেক হলে তত্ত্বকথা মনে ওঠে। তখন বেড়াতে যেতে সাধ হয় কালীকল্পতরুমূলে। সেই গাছতলায় গেলে, ঈশ্বরের কাছে গেলে চার ফল কুড়ায়ে পাবে—অনায়াসে পাবে, কুড়িয়ে পাবে—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। তাঁকে গেলে ধর্ম, অর্থ, কাম—যা সংসারীর দরকার তাও হয়—যদি কেউ চায়।" (কথামৃত ১।৯।২)।

১১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ: সাধকভাব, অবতরণিকা।
১২। কথাসার: সংসারারণ্য, প্যারা ১২ পৃঃ ৬-৭।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর আশ্রিতগণকে ভরসা দিয়ে বলেছেন : তবে একটি কথা আছে—তিনি ভাবগ্রাহী। যে যা মনে করে সাধন করে তার সেইরূপই হয়। যেমন ভাব তেমনি লাভ।" (কথামৃত ৩।১।৩)। কল্পতরু ভগবান অন্তর্যামী ও ভাবগ্রাহী। মুখনিঃসৃত প্রার্থনাবাক্যের চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বাক্যোদ্দীপক মনের ভাবটি। সেদিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে প্রার্থীকে।

অধিকতর ভরসার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ শিখিয়ে দিয়েছেন কি প্রার্থনা করতে হবে, কেমন ভাবেই বা করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে হাজরা প্রশ্ন করেছিলেন : প্রার্থনা করলে তিনি শুনবেন ? শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেন : এক-শো-বার।—যদি ঠিক হয়—যদি আন্তরিক হয়।' (কথামৃত ৪।২০।৫)। সাধন ভজনের দ্বারা মন যখন ক্রমে ক্রমে শুদ্ধ হয়, তখন সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। যে ঠিক ভক্ত সে শুদ্ধাভক্তিই প্রার্থনা করে। শক্তি বা সিদ্ধাই বা কারুর অমঙ্গল তার মনে ঠাঁই পায় না। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধা ভক্তি হয় না, কামনাশূন্য ভক্তি আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু তাঁর কৃপা হলে জ্ঞান ভক্তিও দেন,—আবার টাকা-কড়িও দেন। কিন্তু একে বলে মলিন ভক্তি।' (কথামৃত ৪।২২।১)। মলিনভক্তিতে বিপদের বীজ লুকিয়ে থাকে। সেকারণে চিত্তশুদ্ধ হয়ে তবেই কল্পতরু ভগবানের সদাব্রতে উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শুভসম্বান্বিত মানসিক প্রস্তুতি, সেইসঙ্গে অপ্রসলভ বিশ্বাস নিয়েই প্রার্থীকে চেষ্টা করতে হবে অমৃত ও অভয়ের অধিপতি চিঘনলীলাবিগ্রহের সান্নিধ্যলাভ। এভাবে কৃপালাভের যোগ্যতা নিয়ে অগ্রসর হলেই প্রার্থী কল্পতরুর বিশেষ কৃপায় অভিসিঞ্চিত হয়, তার দিব্যচক্ষু ফুটে ওঠে, সমস্ত বন্ধন টুটে যায়, ভূমানন্দে সর্বতোপ্রসন্নতা লাভ হয়।

কল্পতরু দিবসের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন রামকৃষ্ণজীবনীকার ঈশারউড, "All said later that they felt Ramakrishna has that afternoon for the first time revealed himself as a Divine incarnation." রোমা রোলা লিখেছেন. "But all were agreed that they received as it were an electric shock. an access of power..." স্বামী সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন, "দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তের প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্যভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ।" কৃপাকল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণের সেদিনকার আচার-আচরণ শুধুমাত্র ভক্তের উপভোগ-উপলব্ধির অন্দরমহলে দোলা দেয় না বা কৃপাকাঙ্ক্ষী ভক্তমাত্রের অন্তঃকরণে অসংখ্য বিস্ময়ের বাতায়ন উন্মোচন করে না, বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্থাপনও করে থাকে। কিন্তু সকল অনুসন্ধিৎসা পর্যবসিত হয় ভক্ত-ভগবানের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্ক-দ্যোতক সিদ্ধান্তে। ভগবৎ-কৃপার সোনালী আভায় সুরঞ্জিত কল্পতরুর ঘটনায় ভক্তমাত্রেই শুনতে পায় কৃপাময় শ্রীরামকৃষ্ণের আকুতিপূর্ণ আহ্বান : তোরা কে কোথায় আছিস আয়, কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপন করেছি, তোদের মধ্যে কৃপাবারি সিঞ্চনের জন্য বসে আছি।

চির-অপেক্ষমান ঈশ-কল্পতরুর অভয়পদে আমাদের প্রাণ সমর্পণ করতে হবে। এর উপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও কল্পতরু ঈশ্বরাবতারের প্রতি আন্তরিক অনুরাগ।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঞ্জনে : শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশ ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ তিন ॥

লীলাবার্তা :

[পণ্ডিতের অনুতাপ]

'এত বুঝি ধ্যান ভাঙি ধায় দ্রুতবেগে।
উঠে পড়ে তাড়াতাড়ি মন্দিরের দিকে ॥
... ...
বরাবর দ্বিজবর আপনার মনে।
উপনীত হইলেন প্রভুর সদনে ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

তারপর শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয় আসন ত্যাগ করে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কক্ষ অভিমুখে, দ্রুতপদে ধাবিত হন। ভক্তেরা যাঁরা উদ্যানে ছিলেন, তাঁরা এঁকে ঐভাবে আসতে দেখে অবাক্ হন এবং কৌতূহলভরে এঁর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রতে থাকেন।

'সবে তাঁরে একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ।
কোথা যায় কিবা করে বিটল ব্রাহ্মণ ॥
... ...
ভক্তগণে সকৌতুক পাছু পাছু ধায়।
দেখিবারে কিবা কাণ্ড ব্রাহ্মণ ঘটায় ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

পণ্ডিত মহাশয় বরাবর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে প্রবেশ করেন। এঁর কাণ্ড দেখার জন্য সেই ভক্তেরাও তখন এঁকে অনুসরণ ক'রে ঐ ঘরে উপস্থিত হন।

সেই অবসরে, শ্রীশ্রীঠাকুর দেবদেবীগণের নামোচ্চারণ ও স্মরণমননের পর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট রয়েছেন। 'কথামৃত'-কার মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরের শ্রীচরণতলে পাশোবটিতে ব'সে আছেন। অন্যভক্তেরা মেজেতে মাদুরে উপবিষ্ট। শ্রীমান্ রাখাল, লাটু প্রভৃতি ঐঘরে আসা-যাওয়া ক'রছেন।

'গম্ভীর নিস্তব্ধভাবে মন্দির ভিতর।
নিরাসনে ভূমিদেশে বসে দ্বিজবর ॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

পণ্ডিত শ্যামাপদ এগিয়ে গিয়ে ছোট খাটের নিকট খালি মেজেতে, ঠাকুরের চরণতলে, গম্ভীরভাবে উপবেশন করেন। বোধহয়, ইনি নিজ পূর্বকৃত আচরণের জন্য মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত। কারণ, পাণ্ডিত্যাভিমানে ইনি সরল-সুন্দর প্রেমময় পরমহংসের মহত্ত্ব তখন কিছুই বুঝতে পারেন নি। ইনি তাঁকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে তাঁর সঙ্গে নানা রঙ্গপরিহাস ও রহস্যালাপ ক'রেছেন। কিন্তু তবুও শ্রীশ্রীঠাকুর নিজ প্রেমস্বভাববশে এঁর প্রতি বিন্দুমাত্রও রুষ্ট

হন নি ; বরং পরম সমাদরপূর্ণ ব্যবহার ক'রেছেন। তাঁর ভক্তেরাও এঁর প্রতি কোন অশিষ্ট আচরণ করেন নি। এ-সমস্ত কারণে এঁরপক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া স্বাভাবিক।

[পণ্ডিতসহ ঠাকুরের তত্ত্বালোচনা*]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পণ্ডিতের প্রতি, মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন—'ইনি [শ্যামাপদ] একজন বেশ লোক'।

তারপর ঠাকুর পণ্ডিতকে বলেন—"নেতি নেতি ক'রে যেখানে মনের শান্তি হয়, সেইখানেই তিনি [ঈশ্বর]।

"সাত দেউড়ীর পর রাজা আছেন। প্রথম দেউড়ীতে গিয়ে দেখে যে, একজন ঐশ্বর্যবান পুরুষ অনেক লোকজন নিয়ে ব'সে আছেন ; খুব জাঁকজমক। রাজাকে যে দেখতে গিয়েছে, সে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা ক'রলে—'এই কি রাজা' ? সঙ্গী ঈষৎ হেসে ব'ল্‌লে—'না'।

"দ্বিতীয় দেউড়ী আর অন্যান্য দেউড়ীতেও ঐরূপ ব'ল্‌লে। ভাবে, যত এগিয়ে যায়, ততই ঐশ্বর্য। আর জাঁকজমক। সাত দেউড়ী পার হ'য়ে যখন দেখলে, তখন আর সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা ক'রলে না। রাজার অতুল ঐশ্বর্য দর্শন ক'রে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।—বুঝলে, এই রাজা।—এ-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নাই।

"পণ্ডিত—মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে গেলে তাঁকে দেখা যায়।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—তাঁর সাক্ষাৎকারের পর আবার ভাবে, এই মায়া জীবজগৎ তিনিই হ'য়েছেন। এই সংসার ধোকার টাটী—স্বপ্নবৎ—এই বোধহয়, যখন 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে। তাঁর দর্শনের পর আবার এই সংসার মজার কুটী। শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে।

"পণ্ডিত—আমায় কেউ পণ্ডিত ব'ললে ঘৃণা করে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—এটা তাঁর কৃপা। পণ্ডিতেরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে। সাক্ষাৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে—নারায়ণই সব হ'য়েছেন।

"পণ্ডিত—নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর।

"পণ্ডিত— সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনঃ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥†

"শ্রীরামকৃষ্ণ—আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে ?

"পণ্ডিত—আজ্ঞে হাঁ, একটু দেখা আছে।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—ওতে জ্ঞান-ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ। তবে, একটা কথা আছে। তিনি বিষবুদ্ধি থেকে অনেকদূর।

---

* কথামৃত-৪র্থ। ১০।১।১৮৪-১৮৮ থেকে উদ্ধৃত।

† যোগযুক্ত পুরুষ সর্বত্র সমদর্শী হন। তিনি আত্মাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আত্মাতে দর্শন ক'রে থাকেন।—গীতা—৬।২৯

"পণ্ডিত—যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি [সেখানে] 'সুদূরম্', আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি 'অদূরম'। উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয্যেকে দেখে এলাম—বয়স হ'য়েছে কেবল নভেলের গল্প শুনছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীবজগৎ।

"পণ্ডিত আনন্দিত হইয়া যমলার্জুনের এইভাবের স্তব শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ [২১-৩১] হইতে আবৃত্তি করিতেছেন—

'কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ ত্বমাদ্যঃ পুরুষঃ পরঃ।
ব্যক্তাব্যক্তমিদং বিশ্বং রূপং তে ব্রহ্মণো বিদুঃ॥
ত্বমেকঃ সর্বভূতানাং দেহপ্রাণেন্দ্রিয়েশ্বরঃ।
ত্বমেব কালো ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয় ঈশ্বরঃ॥
ত্বং মহান্ প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা রজঃসত্ত্বতমোময়ী।
ত্বমেব পুরুষোঽধ্যক্ষঃ সর্বক্ষেত্রবিকারবিৎ।'*

[ঠাকুর কর্তৃক পণ্ডিতকে চৈতন্যদান]

স্তব শুনতে শুনতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হ'য়ে পড়েন এবং আবেশের প্রাবল্যে, হঠাৎ ছোট খাটটি থেকে নেমে, মেজেতে দণ্ডায়মান হন। স্তবরত পণ্ডিত মহাশয় তাঁর শ্রীচরণতলে উপবিষ্ট ও উচ্চভাবে নিমগ্ন। শ্রীশ্রীঠাকুর আবেশের ঘোরে হুঙ্কার দিয়ে পণ্ডিতের কোলে ও বক্ষে নিজ দক্ষিণ চরণ স্থাপন ক'রে সমাধিমগ্ন হন। তাঁর শ্রীমুখকমল স্বর্গীয় সুষমায় মণ্ডিত, দিব্যহাস্যে উৎফুল্ল। উপস্থিত ভক্তেরা নির্বাক্, স্থির নেত্র—দিব্য করুণার ঐ অপরূপ চিত্রদর্শনে আত্মহারা।

'হুঙ্কার সহিত প্রভু আবেশের ঘোরে।
থুইলা দক্ষিণপদ ব্রাহ্মণের শিরে॥
... — ...
ভাগ্যবলে দ্বিজ আজি পাইয়া চরণ।
সমাদরে শিরোদেশে স্থাপেন এখন॥
দু'হাতে ধারণ করি গায় স্তব-স্তুতি।
কণ্ঠে যেন মূর্তিমতী নিজে সরস্বতী॥
দেহি সে চৈতন্য-ভক্তি বার বার বলে।
ভাসিয়া ভাসিয়া দু'টি নয়নের জলে॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৮

* হে কৃষ্ণ। হে মহাযোগিন্! আপনি প্রকৃতির ঊর্ধ্বে, গুণাতীত, আদি পুরুষ। এই স্থূল সূক্ষ্ম বিশ্ব-প্রপঞ্চ-সমস্তই পরব্রহ্মস্বরূপ আপনারই রূপ ব'লে পণ্ডিতগণ জানেন॥ ২৯। হে ভগবন্! আপনি বিশ্বপ্রাণীর দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও অহঙ্কারের প্রভু। আপনি শুদ্ধজ্যোতিঃ মহাশক্তিমান্ কাল। আপনি সনাতন ও সর্বব্যাপী পরমেশ্বর॥ ৩০। আপনি মহান্ (মহৎ তত্ত্বস্বরূপ)। আপনিই সত্ত্ব-রজঃ-তমোময়ী (ত্রিগুণাত্মিকা) সূক্ষ্ম (কারণস্বরূপা) প্রকৃতি। আপনিই সর্বান্তর্যামী, সর্বনিয়ন্তা, আদিপুরুষ॥ ৩১॥

'কথামৃত'-কারের অক্ষরলিপিতে ঐ স্মরণীয় দৃশ্যের বর্ণনা—"ঠাকুর স্তব শুনিয়া সমাধিস্থ। দাঁড়াইয়াছেন। পণ্ডিত বসিয়া। [ঠাকুর] পণ্ডিতের কোলে* ও বক্ষে একটি চরণ রাখিয়া হাসিতেছেন। পণ্ডিত চরণ ধারণ করিয়া বলিতেছেন—'গুরো, চৈতন্য দেহি'। ঠাকুর ছোট ভক্তার কাছে পূর্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।"—কথামৃত-৪র্থ। ২৫।১।২৮৬-২৮৭

[পণ্ডিতের ক্ষমাভিক্ষা]

'চরণ পরশ পেয়ে চরণ-নরম।
কাকুতি-মিনতি সহ অভয় চরণ॥
ধারণ করিয়া দ্বিজ করেন প্রার্থনা।
কার্কশ্য প্রয়োগ হেতু প্রভুর মার্জনা॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮১

পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরের অভয় চরণ নিজ বক্ষে সযত্নে ধারণ ক'রে, বহু কাকুতি-মিনতি সহকারে, সজল নয়নে বলেন : প্রভো! শুষ্ক বিদ্যামদে আমি অন্ধ। তাই আপনার দিব্য মহিমা বুঝতে পারি নি। সেই অজ্ঞতা এবং হীন বুদ্ধিবশে আমি আপনাকে অনেক কঠোর কথা ব'লেছি ও আপনার সঙ্গে নানা রহস্য-পরিহাস ক'রেছি। কিন্তু আপনি অপার করুণাময় পরমপুরুষ। আপনি নিজ কৃপাগুণে এই অধম পাতককে অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করুন।

ইনি তাঁকে আরও বলেন : প্রভো! আপনি চির ক্ষমাশীল; নিজ স্বভাবগুণে আপনি নিশ্চয়ই আমায় ক্ষমা ক'রেছেন। তবুও সেই অপরাধজনিত আমার হৃদয়বেদনা দূর করার জন্যই আপনার অভয় চরণে বার বার ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি। আমার সমস্ত অভিমান ও অহঙ্কার নাশ ক'রে আপনি আমায় চৈতন্য এবং ভক্তিদানে কৃতকৃতার্থ করুন।

'প্রত্যক্ষ ঘটনা দেখা চরণের গুণ।
কিবা ছিল কি হইল পণ্ডিত যাদুন॥
নিমেষে আলোকময় অন্তর আগার।
বিদ্যামদে তমাচ্ছন্ন যে ছিল আঁধার॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮১

তারপর পণ্ডিত মহাশয় সেখানে উপস্থিত ভক্তগণের নিকটও করযোড়ে প্রার্থনা করেন। ইনি সজলনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে তাঁদের বলেন : সাক্ষাৎ শ্রীভগবান মানবদেহে এই পরমহংসরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। কিন্তু বিদ্যামদে আমি অন্ধ—আমার চোখে দৃষ্টিশক্তি নেই। তাই আমি না চিনে এই মহাত্মাকে বহু অবজ্ঞা ও উপহাস ক'রেছি। কিন্তু সেজন্য আমার ভয় নেই।

পণ্ডিত তাঁদের আরও বলেন : এই মহাত্মা ভবভয়হারী, কৃতান্তহরণকারী স্বয়ং নারায়ণ। অধম-পতিত, দীন-আর্তদের পরিত্রাণ করার জন্যই এই মহাপুরুষের আবির্ভাব। এঁর কায়-বাক্য-মনে কেবল জীবহিতসাধনের অবিরাম প্রচেষ্টা। যারা দীনহীন দুর্বল-অক্ষম, সাধনভজনাদি শূন্য, তাদের উদ্ধারসাধনের জন্যই ইনি করুণাবশে আবির্ভূত হ'য়েছেন। বস্তুতঃ, আমাদের মত

* পণ্ডিতের মাথায় না কোলে-বক্ষে ঠাকুরের চরণস্থাপন বিষয়ে 'পুঁথি' ও 'কথামৃত' গ্রন্থটিতে মতপার্থক্য থাকলেও ঘটনাটির মূলপ্রবাহ উভয় গ্রন্থেই অক্ষিত। পুঁথিকার ও কথামৃতকার উভয়েই ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী।—লেখক

অজ্ঞান পামরদের কোন অপরাধই ইনি কখন গ্রহণ করেন না। কেননা, ইনি অহৈতুক কৃপাসিন্ধু। সুতরাং আমার কোন অপরাধই এই মহাত্মার শ্রীচরণে গ্রাহ্য নয়। সেই ভরসাতেই আমি একান্তই নির্ভয়।

'কিন্তু আমি ভরি ভারি তোমা সবাকারে।
অগ্নির প্রয়োগ হেতু বিদ্যামদভরে॥
দয়ালপ্রকৃতি ভক্ত শাস্ত্রের বর্ণনা।
ব্রাহ্মণের অপরাধ করহ মার্জনা॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৯

উপস্থিত ভক্তদের পণ্ডিত আরও বলেন: আমি কিন্তু আপনাদেরকেই বড় ভয় করি। আপনাদের সাক্ষাতে আমি এই মহাত্মাকে অনেক কঠোর কথা ব'লেছি এবং আপনাদেরকে নিয়েও এঁকে বহু ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রেছি। তবে, শাস্ত্রে বলে যে, ভক্তেরাও ভগবানের মতই দয়াল-প্রকৃতি। সুতরাং আপনারাও দয়াগুণে আমার অনুগ্রহ ক'রে ক্ষমা করুন এবং আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন।

পরিশেষে, পণ্ডিত মহাশয় তাঁদের বলেন: এঁর হেন মহাত্মা যখন দেহধারণ ক'রে পৃথিবীতে আসেন, তখন তাঁর মহত্ত্ব ও করুণার প্রভাবে মুক্তি ছড়াছড়ি যায়। সেই সুদুর্লভ মুক্তি তখন অযাচিতে লাভ হয়। মুক্তি খুঁজতে হয় না, অনায়াসেই পাওয়া যায়। যেমন—বর্ষাকালে উপরে নীচে, চারধারে কেবল জলে জলময় হ'য়ে থাকে; জল পাওয়ার জন্য তখন কোন কষ্টই ক'রতে হয় না।

'পরে আর এক কথা কহেন ব্রাহ্মণ।
এমন প্রভুর মত মহাত্মা যখন॥
জনম গ্রহণ করি আসেন ধরায়।
সুদুর্লভ যেই মুক্তি ছড়াছড়ি যায়॥
খুঁজিতে না হয় মোটে মিলে অবহেলে।
জলের ফোঁটার মত বরিষার কালে॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৯

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ ভাবাবেশ ধীরে ধীরে প্রশমিত হ'লে, পণ্ডিত মহাশয় ঘরের বাহিরে যান। ঠাকুর সেইখানেই পূর্বাস্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর ছোট খাটটিতে বসেন। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ।

"পণ্ডিত ঘর হইতে চলিয়া গেলে ঠাকুর মাষ্টারকে বলিতেছেন—আমি যা বলি, মিলছে? যারা আন্তরিক টানে ধ্যান-জপ ক'রেছে, তাদের এখানে আসতেই হবে'।"—কথামৃত-৪র্থ। ২৪।১।২৮৭

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ গূঢ় উক্তি যে, এই ভাগ্যবান পণ্ডিতেরই বিষয়ে, তা সহজেই অনুমেয়।

[দক্ষিণেশ্বরে পণ্ডিতের রাত্রিযাপন]

রামবাগীশ মহাশয় পূর্ব ব্যবস্থানুসারে সেই রাত্রে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতেই অবস্থান করেন। পরমপুরুষের অযাচিত কৃপালাভের অমির স্মৃতি এবং সেই সঙ্গে তাঁর করুণায় উপলব্ধ দিব্য

অনুভূতি এঁকে সারারাত্রি পরম সুখোল্লাসে আত্মহারা ক'রে রাখে। পরদিন সকালে ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণে আশীর্বাদ ও বিদায় প্রার্থনা ক'রে স্বস্থানে গমন করেন।

'পাইয়া নূতন আঁখি ভয়-সন্দ দূর।
ব্রাহ্মণ এখন দেখে মাহাত্ম্য প্রভুর॥
এতই আনন্দরাশি উদয় অন্তরে।
আধার ছাড়িয়া কত উথলিয়া পড়ে॥
আশাতীত জ্ঞানাতীত বাসনা পূরণ।
অতি খুশি গোটা নিশি করিল যাপন॥
পরদিন প্রভুপদে মাগিয়া বিদায়।
জনম সার্থক করি নিকেতনে যায়॥'—পুঁথি, পৃঃ ৪৮৯

কথাপ্রসঙ্গে :

প্রসঙ্গক্রমে পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে, শ্রীযুক্ত বলরাম বসুর সঙ্গে পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়বাগীশের ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয় ছিল। যাহোক, উল্লিখিত ঘটনার দু'-একদিনের মধ্যেই মনে হয়, পণ্ডিত মহাশয় বলরাম বাবুকে নিজ কৃপালাভের ঐ কাহিনীটি বলেন এবং বলরামবাবুর নিকট হ'তে কথাপ্রসঙ্গে, ঠাকুর কর্তৃক শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথকে ঐভাবে কৃপাদানের ঘটনাটি শোনেন। সেই সংবাদ শুনে ইনি বলরামবাবুকে আক্ষেপ ক'রে বলেন—"কই আমার তো তা হয় নাই'।

যাহোক, পণ্ডিত শ্যামাপদকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপাদানের চারদিন পরে—১৭ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর (১৮৮৩ খৃঃ) মঙ্গলবার জন্মাষ্টমী দিবসে, সকালের দিকে বলরাম বসু দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রতে আসেন। সে-দিন তিনি প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুরকে শ্যামাপদ পণ্ডিতের ঐ আক্ষেপের কথা বলেন।

"শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা হইতেছে।

"বলরাম—তিনি [শ্যামাপদ] ব'লেছেন যে, 'নরেন্দ্রের যেমন বুকে পা দিয়ে ভাবাবেশ হ'য়েছিল, কই আমার তো তা হয় নাই'।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—কি জান, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে, ছড়ানো মন কুড়ানো দায়। ওর [শ্যামাপদ পণ্ডিতের] সালিশী ক'রতে হয়, ব'লেছে। আবার বাড়ির ছেলেদের বিষয় ভাবতে হয়। নরেন্দ্রাদির মন তো ছড়ানো নয়, ওদের ভিতর এখনো কামিনী-কাঞ্চন ঢোকে নাই। কিন্তু শ্যামাপদ খুব লোক।"—কথামৃত-৪র্থ। ২৬।২।২৯২-২৯৩

(সমাপ্ত)

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(দুই)

॥ বিভিন্ন সমাজের মধ্যে সংঘর্ষ ও মিলন ॥

কৃষিজীবী জাতিগুলিকে স্বামীজী তাঁর "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইয়ে 'দেবতা' বলে উল্লেখ করেছেন আর যাযাবর জাতিগুলিকে বলেছেন 'অসুর'। দেবতা ও অসুর শব্দ দু'টির সাহায্যে তিনি কিন্তু শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধাসূচক মনোভাব প্রকাশ করেননি। যারা অধিকতর সভ্য তাদেরই তিনি 'দেবতা' বলেছেন রূপক প্রয়োগে।[৯] দুই দলের তুলনা করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—"দেবতারা ধান চাল খায়, সুসভ্য অবস্থা, গ্রাম নগর উদ্যানে বাস, পরিধান—বোনা কাপড়; আর অসুরদের পাহাড় পর্বত [জঙ্গল] মরুভূমি বা সমুদ্রতটে বাস; আহার বন্য জানোয়ার বন্য ফলমূল; পরিধান [গাছের ও পশুর] ছাল; আর [ব্যবসা[১০]] বুনো জিনিস বা ভেড়া ছাগল গরু, দেবতাদের কাছ থেকে বিনিময়ে বা ধানচাল। দেবতাদের শরীর শ্রম সইতে পারেনা, দুর্বল। অসুরের শরীর উপবাস, কৃচ্ছ্র, কষ্ট-সহনে বিলক্ষণ পটু"।[১১]

আগেই বলা হয়েছে, পর্যাপ্ত খাদ্যের সন্ধান পেলেই মানুষ স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে, এবং সেই সাথে তারা অধিকতর সভ্য হয়েছে। অন্যদিকে যাযাবর দলগুলি পর্যাপ্ত খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়। এ-সময়েই দল দু'টি পরস্পরের কাছে এসেছে। ফলে একদিকে যেমন উভয়ের সংঘর্ষ বেধেছে, তেমনি মিলনও ঘটেছে। স্বামীজী লিখেছেন—"অসুরের আহারাভাব হলেই দল বেঁধে পাহাড় হতে, সমুদ্রকূল হতে গ্রাম নগর লুঠতে এল। কখনও বা ধনধান্যের লোভে দেবতাদের আক্রমণ করতে লাগলো। দেবতারা বহুজন একত্র না হতে পারলেই অসুরের হাতে মৃত্যু; আর দেবতার বুদ্ধি প্রবল হয়ে নানাপ্রকার যন্ত্রতন্ত্র নির্মাণ করতে লাগলো। ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র—সব দেবতাদের; অসুরের সাধারণ অস্ত্র, কিন্তু গায়ে বিষম বল। বারংবার অসুর দেবতাদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু অসুর সভ্য হতে জানে না, চাষবাস করতে পারেনা, বুদ্ধি

৯। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, উদ্বোধন, ১৩৭১, ৬ : ১০৩ দ্রষ্টব্য। এ-জায়গায় ১নং পাদ-টীকায় বলা হয়েছে—" 'দেবতা' ও 'অসুর' এখানে গীতার ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত দৈবী ও আসুরী সম্পদের প্রাধান্যযুক্ত মানব (জাতি) সম্বন্ধে ব্যবহৃত"। আমাদের মনে হয়, সমাজের 'পেশা' দেখেই স্বামীজী দেবতা ও অসুর শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ৬ : ২০৪ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন, জম্বুদ্বীপের তামাম···সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস। এ সকল সভ্যতাই দেবতাপ্রধান। আর ইউরোপে···ডাকাত আর ঘোষেটে এ সভ্যতার ভিত্তি, এতে অসুরভাব অধিক।"

১০। বাণী ও রচনা ৬ : ২০৩ দ্রষ্টব্য। এ-জায়গায় ব্রাকেটে 'আহার' শব্দটি রয়েছে, কিন্তু আমাদের মনে হয় 'ব্যবসা' শব্দটিই বেশি উপযোগী যেহেতু ঐ পংক্তিতে স্বামীজী আহারের কথা আগেই উল্লেখ করেছেন।

১১। বাণী ও রচনা ৬ : ২০৩।

চালাতে জানে না। বিজয়ী অসুর যদি বিজিত দেবতাদের স্বর্গে রাজত্ব করতে চায় তো সে কিছুদিনের মধ্যে দেবতাদের বুদ্ধিকৌশলে দেবতাদের দাস হয়ে পড়ে থাকে। নতুবা অসুর লুঠ করে সরে আপনার স্থানে যায়। দেবতারা যখন একত্রিত হয়ে অসুরদের তাড়ায়, তখন হয় তাদের সমুদ্রমধ্যে তাড়ায়, না হয় পাহাড়ে, না হয় জঙ্গলে তাড়িয়ে দেয়। ক্রমে দু-দিকেই দল বাড়তে লাগলো, লক্ষ লক্ষ দেবতা একত্র হতে লাগলো, লক্ষ লক্ষ অসুর একত্র হতে লাগলো। মহাসংঘর্ষ, মেশামেশি, জেতাজেতি চলতে লাগলো"।[১২]

উল্লিখিত বক্তব্য থেকে আমরা কয়েকটি পয়েন্ট সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই :

(ক) যাযাবর দল কৃষিজীবীদের আক্রমণ করতো (১) খাদ্যাভাবে ও (২) সম্পত্তির লোভে।

(খ) যাযাবর দলের মূল শক্তি দৈহিক, কৃষিজীবীদের বৌদ্ধিক।

(গ) যাযাবরেরা দলে ভারী হতো ; কৃষিজীবীরা প্রধানত ছোট ছোট পল্লীতে বাস করলেও কিছু কিছু নগরও গড়ে তুলেছিল।

(ঘ) কৃষিজীবীরা বৌদ্ধিক শক্তিতে বলীয়ান হলেও শারীরিক দিক থেকে দুর্বল ছিল। ফলে যাযাবরদের নির্মম আক্রমণে তারা প্রায়ই হেরে যেতো।

(ঙ) বিভিন্ন কৃষিজীবী গোষ্ঠী যখন সম্মিলিত হয়ে আত্মরক্ষা করতো, কেবল তখনই তারা যাযাবরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জিততো।

(চ) যাযাবরেরা কৃষিজীবীদের লুঠ করে পালিয়ে যেতো, সুবিধে হলে তাদের রাজ্যও অধিকার করতো।

(ছ) কৃষিজীবীদের রাজ্য অধিকার করলেও যাযাবরেরা বিজিত জাতির উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা গ্রহণ করতো।

স্বামীজীর এই মন্তব্যগুলি যে ইতিহাস-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত তা ইতিহাস-সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারেন। আমরা এখানে এগুলির তাৎপর্য আলোচনা করে পরে দেখবো পৃথিবীর ইতিহাসে এগুলি কি-রকম ক্রিয়াশীল ছিল। এ থেকেই ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠবে সমাজ-বিবর্তনের ধারাটি।

কৃষিজীবী সমাজের বিভিন্নীল জীবনে ছিল খাদ্যের প্রাচুর্য এবং সেইসাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসিকতা। আর এরই পাশাপাশি লক্ষণীয় ছিল যাযাবর সমাজের অনিশ্চিত প্রায়মাণ জীবন, খাদ্যাভাব, এবং প্রকৃতির বিরোধিতা। ফলে স্বাভাবিক কারণেই যাযাবরেরা ঝাঁপিয়ে পড়তো কৃষিজীবীদের সুস্থির পল্লীগুলির ওপর। হিকসোস্‌দের মিশর-অভিযান ও ক্যাসাইটদের ব্যাবিলন-আক্রমণ এরই প্রমাণ। এরা উভয়েই ছিল বর্বর জাতি। আর চারিদিকে বর্বরতার মাঝে কৃষিজীবী সভ্য সমাজগুলি ছিল ছোট ছোট দ্বীপের মতো। হিকসোস্‌রা মিশর অধিকার করেছিল ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘকাল তা ধরে রাখতে পারেনি।[১৩]

১২। ঐ।

১৩। প্রাচীন মিশর—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, [কোলকাতা, আশ্বিন ১৩৬০], পৃঃ ৬৮।

পঞ্চতাল্লিশ বছর ধরে যে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালিয়েছিল মিশরীয়রা, রাজা আহমিসের নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল কারণ সমগ্র মিশর তখন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল হিকসোস্-বিতাড়নে। বিপরীতদিকে ব্যাবিলোনিয়াতে ইলামের রাজা হাম্মুরাবি সফল হয়েছিলেন কারণ তিনি সু-ব্যবস্থার সাহায্যে ঐ রাজ্যের সভ্যতার মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন।[১৪]

কৃষিজীবী সমাজে খাদ্যাভাব না থাকলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এসব সমাজের কিছু কিছু দল নতুন ভূমির খোঁজে বেরিয়ে পড়তো। এভাবে এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকায় আমরা বেশ কিছু কৃষিজীবী গোষ্ঠীকে ছড়িয়ে পড়তে দেখি। [ক্যাসাইটরা অনুন্নত জাতি হলেও কৃষিকর্ম জানতো।[১৫]] যাযাবর গোষ্ঠীগুলি খাদ্যাভাব ছাড়াও ধন-সম্পদের লোভে বিভিন্ন স্থানে গিয়ে অন্য রাজ্য আক্রমণ করতো। বিপরীতদিকে সমতলবাসী কৃষিজীবীরাও যাযাবরদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশ দখল করতো।[১৬] এইভাবে সমাজগুলি ধীরে ধীরে পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সভ্য যাযাবরদের অন্য একটি সভ্য রাজ্য আক্রমণ ও অধিকারে নতুন সভ্যতা কতদূর উন্নত হতে পারে তার উদাহরণ গ্রীস। মধ্য এশিয়া থেকে আগত এই হেলেনীয় গোষ্ঠী গ্রীসের বন্দর-নগরগুলি অধিকার করে মিশরীয় ও এশীয় সভ্যতার মিলনে আরও উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। আবার পরবর্তীকালে মিশরীয়-মেসোপটেমীয়-গ্রীক সভ্যতার মিলনে রোমান সাম্রাজ্য তেমনি ইওরোপের বিভিন্ন স্থানে উন্নত সভ্যতা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল।[১৭]

মানুষের মনে দুটি প্রধান ধারা দেখা যায়। একটির ফলে সে নিজস্ব রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়, এবং অন্যটির ফলে সে নতুন কিছু গ্রহণ করে জীবনে পরিবর্তন আনতে চায়। এই আপাত-বিরোধী দুটি ভাবের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সমাজেও দেখা যায়। স্থিতিকামী ও পরিবর্তনকামী ভাব দুটির মধ্যে জনসাধারণ কতটা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারছে তার ওপরই নির্ভর করে সমাজের প্রগতি। বস্তুত এই সামঞ্জস্যের অভাবেই জাতির মৃত্যু ঘটে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমান ও ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা আজ মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে কারণ নতুন পরিস্থিতিতে এই জাতিগুলি উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিতে পারেনি। বিপরীতদিকে ভারত তার সভ্যতা ও আদর্শকে ধরে রাখতে পেরেছে জাতির অন্তরাত্মার শক্তিতে।

যাযাবর জাতিগুলি বৌদ্ধিক দিক দিয়ে অনুন্নত হলেও শারীরিক দিক থেকে তারা ছিল কৃষিজীবীদের থেকে উন্নত। কৃষিজীবী সমাজে খাদ্যের প্রাচুর্য ও সহজ জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণকে শারীরিক দিক থেকে কম শক্তিশালী করে তুলেছিল। এই দৈহিক শক্তি ও অশ্ববাহিনীর সাহায্যে যাযাবরেরা বারবার কাঁপিয়ে পড়তো কৃষিজীবীদের

১৪। ঐ।

১৫। প্রাচীন ইরাক—নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, [কোলকাতা, শ্রাবণ ১৩৬৮], পৃঃ ১৭৩।

১৬। প্রাচীন মিশর, পৃঃ ৩৯।

১৭। The Story of Mankind—H. W. Van Loon, [New York, April 1940], pp. 60-1.

ওপর, এবং স্বভাবতই যুদ্ধে জয়লাভ করতো। খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ শতাব্দী ও পরবর্তীকালে পূর্ব-ইওরোপ বা কাস্পিয়ান সাগরের এলাকা থেকে পূর্ব-কৃষ্ণসাগরীয় এলাকায় এদের আসতে দেখা যায়। পাশাপাশি হিটাইট্, সিথিয়ান্ ও পার্শিয়ান্রা অভিযান চালায় এশিয়ার নানান স্থানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাযাবরেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে।

যাযাবরদের ঘন ঘন আক্রমণ রোখার তাগিদেই কৃষিজীবীরা জোর দেয় সামরিক শক্তি ও ঐক্যের ওপর। প্রাচীন ইতিহাসে আমরা দেখি, আরবের মরু-অঞ্চল থেকে সেমেটিক জাতীয় যাযাবরদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে সুমেরীয়রা গড়ে তুলেছিল শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। ব্যাবিলন, টায়র, কার্থেজ, সুসা, পার্সেপোলিশ, একবাটানা ইত্যাদি শহরে দেখা যায় রাজ্যের প্রধান-কেন্দ্রে দুর্গ তৈরী করে প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা হয়েছে। আবার মিশর গ্রীস ব্যাবিলোনীয়া প্রভৃতি রাজ্যে বিভিন্ন ছোট ছোট গোষ্ঠী সম্মিলিত হয়ে গড়ে তুলেছিল শক্তিশালী দেশ ও যৌথ প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা।

এইভাবে সুরক্ষিত কৃষিশিল্পীগুলির জায়গায় গড়ে উঠলো নগর-রাষ্ট্র। দেবতার মন্দিরকে কেন্দ্র করে সামাজিক জীবন গড়ে উঠেছিল এবং প্রধান পুরোহিতের বাসস্থান মন্দিরের কাছে হওয়ায় রাজাও তার প্রাসাদ তৈরী করলেন মন্দিরের কাছেই। ফলে রাজ-কর্মচারীবৃন্দ ও সৈন্যবাহিনীর কেন্দ্রও হয়ে দাঁড়ালো ঐ স্থানটি। রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় বাজার এবং ব্যবসা-কেন্দ্রও হয়ে উঠলো জায়গাটি। এইভাবেই আমরা দেখতে পাই, প্রাচীন সভ্য সমাজগুলি মিশর, ব্যাবিলোনীয়া, সুমেরীয়া, ভারত ও চীনে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্র।[১৮]

আরব ও মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতিগুলি যখন এসব নগর-রাষ্ট্রে হানা দিতে লাগলো, অধিকাংশ স্থানেই সভ্য জাতিগুলি পরাস্ত হলো। ফলের পর অবশ্য যাযাবর জাতিগুলি বিজিতদের উন্নত সংস্কৃতির কবলে এলো এবং এইভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রে দেখা দিল ব্যাপক পরিবর্তন। সভ্য জাতিগুলি নগর-রাষ্ট্র নিয়ে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলেও সাম্রাজ্য-বিস্তারে এরা বিশেষ উৎসাহী ছিলনা। কিন্তু যাযাবর জাতিগুলি মন দিলো সাম্রাজ্য বিস্তারে। এরা প্রথম থেকেই ছিল অভিযান-প্রিয়, স্বভাবে যাযাবর হওয়ায় ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রে এরা তৃপ্ত ছিলনা। সভ্য জাতিগুলির কাছ থেকে এরা শিখলো শিল্পচর্চা, আইন-ব্যবস্থা, স্থাপত্য ও সাহিত্য। আর যাযাবরদের কাছ থেকে যৌথ ও সংহতি-বোধ নিলো সভ্য জাতিগুলি। ধর্মীয় ব্যাপারে যাযাবরেরা নিলো সভ্যদের দর্শন ও পুরাণ, বিনিময়ে তাদের বেশ কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ করলো সভ্য জাতিগুলি।

●

১৮। History of Mankind : Cultural and Scientific Development—by Luigi Pareti, P. Brezzi & L. Petech, [London, under the auspices of UNESCO, 1965], Vol. I, p. 177.

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ দুর্বল শরীরে স্বামীজীকে (নরেন্দ্রনাথকে) প্রাণ দিয়া সেবায় যত্ন সুস্থ করিয়া তুলিলেন বটে, কিন্তু তারপরেই নিজে আবার ভীষণভাবে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইলেন। শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন কালীপ্রসাদ। তখন স্বামীজী পুনরায় কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া অক্লান্তভাবে কালীপ্রসাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা শরীরকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দেয়, সুতরাং কালীপ্রসাদ প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। কিন্তু কালীপ্রসাদ কোনদিনই কোন-বিষয় গ্রাহ্য করিতেন না। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে কালীপ্রসাদ মনেরই জোরে দুঃসহ রোগযন্ত্রণার কষ্ট ও বেদনা নির্বিকারচিত্তে সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কোনদিনই কোনরকম কষ্ট স্পর্শ করিতে পারিত না। কালীপ্রসাদ ঐ সময়ে আচার্য শঙ্করের রচিত স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ করিতেন এবং গীতার শ্লোক বিচার করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেন। আচার্য শঙ্করের রচিত 'চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্' স্তোত্রটি কালীপ্রসাদের জীবনের জপমালা ছিল। তাই মাঝে মাঝে জীবনে তিনি সামান্য কষ্ট অনুভব করতেন, কিন্তু মনে মনে চিন্তা করতেন শরীর চৈতন্যস্বরূপ শরীরী বা আত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সেইজন্য গীতার সেই শাশ্বত বাণী 'আত্মা বিজ্বরো বিমৃত্যু বিশোকি' সর্বদাই তিনি চিন্তা করিতেন ও আবৃত্তি করিতেন। কালীপ্রসাদের জীবনে সর্বদাই একাগ্রতার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) একান্তভাবে বিস্মিত হইতেন এবং গুরুভাইয়ের জীবনে ধ্যানময় ভাব লক্ষ্য করিয়া গর্ব অনুভবও করিতেন।

এই প্রসঙ্গে বলিতে হয় ভারতের অধ্যাত্মসাধনা ও আত্মসংযমের মহিমা। বহুযুগ ধরিয়া এই অধ্যাত্মভূমি ভারতবর্ষে কত সাধনশীল মানুষ কত কষ্ট ও অসুবিধা সহ্য করিয়া তাঁহাদিগের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়া জীবনে শান্তি ও পরমসান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। কালীপ্রসাদ যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে থাকিয়া সাধনা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরমাশ্চর্যময় শ্রীগুরুর আশীর্বাদে জীবনে সকল কর্মেই কৃতকার্য হইয়াছেন। সাধনপথে এবং শুধু সাধনপথে কেন, জীবনের অগ্রগতির সকল পথে কত কষ্ট ও যাতনা মানুষকে সহ্য করিতে হয়, তবে দেখা গিয়াছে যে, সেই অসীম সহ্যগুণের এবং সঙ্গে সঙ্গে সংযমশীলতার জন্য প্রবলশীল ও বলশীল মানুষ কৃতকার্যতার উত্তুঙ্গশিখরে আরোহণ করিয়া নিজেদের জীবনকে এবং যাঁহারা তাঁহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছেন—তাঁহাদিগকেও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে ঋষি পতঞ্জলি যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য কত-কিছু কৃচ্ছ্রসাধনরূপ সাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন, পৃথিবীর মানুষ সেইগুলি লক্ষ্য করিয়াছে এবং জীবনে পালন করিয়াছে এবং ফলে জীবনকে তাঁহারা আনন্দমুখরিত করিয়াছে। সোনাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তবেই তাহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়, তেমনি জীবনের দুঃখ-কষ্টও মানুষের জীবনকে উত্তরোত্তর করে।

কাশীতে প্রমদাবাবুর বাড়ীতে থাকার সময়ে কলিকাতা হইতে বাগবাজারে বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ কলিকাতা অভিমুখে রওয়ানা হইবেন স্থির করিয়াছিলেন,

কিন্তু কালীপ্রসাদ তখনও বেশ সুস্থতা লাভ করেন নাই, সেইজন্য গুরুভাইকে অসুস্থ অবস্থায় রাখিয়া কলিকাতায় যাইতে স্বামীজীর মন চাহিল না। তিনি বারবার প্রমদাবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন—যেন কালীপ্রসাদের শরীরের যত্ন ও সেবা ঠিক ভাবে হয় এবং তাহা হইলেই তিনি কলিকাতায় রওয়ানা হইতে পারেন। হইলও তাহাই। অবশেষে নরেন্দ্রনাথ বালকের ন্যায় সজলনয়নে কালীপ্রসাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কাশী হইতে কলিকাতাভিমুখে রওয়ানা হইলেন।

তিন-চারি দিন অতীত হইবার পর কালীপ্রসাদ দেখিলেন যে, স্বামীজী কলিকতায় উপস্থিত হইয়া শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও গুপ্ত মহারাজকে (স্বামী সদানন্দকে) কাশীতে তাঁহার (কালীপ্রসাদের) নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য। তাঁহাদের দেখিয়া কালীপ্রসাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

শরৎ মহারাজ এবং সদানন্দ মহারাজের অত্যন্ত যত্নে ও সেবা-শুশ্রূষায় কালীপ্রসাদ ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিলেন। অবশ্য তাঁহার পক্ষে আরোগ্যলাভ করিতে প্রায় চার মাস লাগিয়াছিল। কালীপ্রসাদের মনে তখন সর্বদাই উদিত হইতেছিল তাঁহার গুরুভাইদের স্বার্থশূন্য সেবা ও ভালবাসার কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দের) নিঃস্বার্থ প্রেম ও ভালবাসার কথা।

●

।। শ্রীমদভেদানন্দাষ্টকম্ ।।

ডাঃ শ্যামল সেন

রামকৃষ্ণপার্ষদায় কালীতপস্বিনে তথা।
অভেদানন্দনাদায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
কৈশোরে যোগশিক্ষার্থং যোঽগমদ্দক্ষিণেশ্বরে।
রামকৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
যস্য স্তোত্ররচনায়াং শ্রীমা-প্রীতিমুপাগতা।
জিহ্বাগ্রেঽস্তুতে বাগ্দেবী তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
বিবেকেন প্রযুক্তো যঃ পাশ্চাত্যদেশমগমৎ।
বেদান্তপ্রচারে সিংহ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
যশ্চামেরিকাদেশেষু রামকৃষ্ণকথামৃতম্।
প্রচারি সিংহগর্জেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্য যো বহূতীর্থানি প্রাব্রজৎ।
দুর্গমং তিব্বততীর্থং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
কলিকাতানগর্যাং যো বেলান্তমঠমস্থাপয়ৎ।
শ্রীরামকৃষ্ণাদেশেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীরামকৃষ্ণদাসং হি শ্যামলকুমারং তথা।
যঃ পরম-কৃপয়তে তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

●

।। মীরার কৃষ্ণভাবনা ।।

ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(দুই)

মহাভারত গ্রন্থে বাসুদেব-কৃষ্ণকে পুরুষোত্তম ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং সেই অবধি বাসুদেব আখ্যায় অভিহিত কৃষ্ণ বিষ্ণুর প্রতীক পূর্ণব্রহ্মরূপে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পরিপূর্ণ মর্যাদায় গৃহীত ও পূজিত হয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাসুদেবরূপে পরিচিত এই কৃষ্ণের পরিচয়ের ভিত্তি ভগবান বাসুদেবের পরিণত বয়সের জীবন। মহাভারতে পরমপুরুষ কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব পাঞ্চাল রাজদুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। সেই সময় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত মহাভারত-কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহের বাসুদেব কৃষ্ণই মূল অধিকর্তা ও প্রধানতম নায়ক। এই কাহিনীর সর্বত্রই তাঁরই ব্যক্তিত্ব সর্বোচ্চে; এখানে সেখানে কিছু-কিছু অলৌকিকত্ব আরোপের মাধ্যমে ক্ষত্রিয়াগ্রগণ্য ও মহাবীর বাসুদেবকে মহাভারত শেষ পর্যন্ত 'পরমপুরুষ' সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্মত্বে' অধিষ্ঠিত করে এক বিচিত্র পরিণতির সৃষ্টি করেছে দেখা যায়। অর্জুনকে 'মহাযোগেশ্বরো হরিঃ' দিব্যচক্ষুদানের দ্বারা যে 'পরমং রূপমৈশ্বরম্' দেখিয়েছিলেন সেই বিশ্বরূপ দর্শনে 'ভয়বিহ্বল' অর্জুন যখন তাঁকে তাঁর পরিচিত স্বকীয় রূপ প্রদর্শন করবার আবেদন জানিয়েছিলেন তখন সৌম্যবপুধারণ করে কৃষ্ণ তাঁকে বাসুদেব রূপে দর্শন দিয়ে অর্জুনকে আশ্বস্ত করেছিলেন।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকংরূপং দর্শয়ামাসভূয়ঃ
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ।—শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ১১।৫০

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের অচ্যুত, জনার্দন, মাধব, হৃষিকেশ, কেশব, মধুসূদন ইত্যাদি নানা নামের উল্লেখ দেখা যায়; কিন্তু এই বিভিন্ন নামে কোন বিগ্রহের বর্ণনা মূর্তিগঠন শাস্ত্রে পাওয়া যায়না। মূর্তিশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ বাসুদেব নামেই অভিহিত হয়েছে দেখা যায়। স্বভাবতই প্রতীয়মান হয় যে প্রত্যক্ষ উপাসনার ক্ষেত্রে বাসুদেব নামে অভিহিত কৃষ্ণই সাধারণ্যে ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন—এবং একটিই মন্ত্র এই উপাসনার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হয়েছিল—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'—সুপ্রাচীন কাল থেকে এই মহামন্ত্রই আসমুদ্রহিমাচলে প্রচার লাভ করেছিল।

যদিও বিষ্ণুকে অন্যতম আদিত্য দেবতারূপে ঋগ্বেদে প্রথম উল্লিখিত হতে দেখা যায় তা হলেও গরুড়ারূঢ়, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-হস্ত, কিরীট-উপবীত-বনমালাশোভিত বিষ্ণুর পরিকল্পনা মহাভারত ও পুরাণের পূর্বে দেখা যায় না। আরও লক্ষণীয় এই পরিকল্পনাবিহিত বিষ্ণু ও বাসুদেব-কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণে এই বাসুদেব-বিষ্ণুর প্রথম উল্লেখ বিদিশার হেলিওডোরাসের গরুড়স্তম্ভে; সম্ভবত শুঙ্গ সম্রাট পুষ্যমিত্র ও তাঁর বংশধরেরা এই বাসুদেব-বিষ্ণুরই উপাসক ছিলেন। শুঙ্গসাম্রাজ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব-উপাসনা শুঙ্গ রাজবংশের আনুকূল্যে সারা উপমহাদেশেই বিস্তার লাভ করেছিল। পরবর্তী যুগে বিভিন্ন

ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাবলম্বী রাজবংশের কুলদেবতারূপে বাসুদেব নামে অভিহিত কৃষ্ণের জনপ্রিয়তাই ছিল অগ্রগণ্য। গুপ্ত আমলের অব্যবহিত পরে গৌড়ের মহারাজাধিরাজ জয়নাগ (আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দী) এবং পূর্ববঙ্গের ভোজবর্মদেবের তাম্রপট্টলীতে এই উভয়কেই গুপ্তসম্রাটদের মত পরমভাগবত বলেই উল্লিখিত হতে দেখা যায়। গৌড়ের প্রখ্যাত কীর্তি পাল সম্রাটেরা বৌদ্ধধর্মানুরাগী থাকলেও তাঁদের ব্রাহ্মণ-আমাত্য বংশ ছিল বাসুদেব-বিষ্ণুর উপাসক। দক্ষিণ-ভারতে পল্লবরাজবংশের আমল থেকে যে বৈষ্ণব-উপাসনার প্রবর্তন হয়েছিল সেই বৈকুণ্ঠপেরুমল নামে অভিহিত বিষ্ণুর প্রতিমাতে চতুর্ভুজ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেবরূপেরই প্রকাশ দেখা যায়। উত্তর ভারতের পরাক্রান্ত প্রতিহার বংশের সম্রাট মিহির ভোজ (আনুমানিক ৮৩৬—৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন পরম বৈষ্ণব। জেজাকভুক্তির চান্ডেল্ল রাজারা ছিলেন শৈব; কিন্তু এই বংশের সম্রাট যশোবর্মণ তাঁর রাজ্যে একটি অতি মনোরম বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে বৈকুণ্ঠের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বৈকুণ্ঠ-বিষ্ণুর মূর্তিটি প্রতিহার বংশীয় সম্রাট হরপতি দেবপাল যশোবর্মণকে উপঢৌকন দিয়েছিলেন। বিখ্যাত মন্দিরনগরী খজুরাহোতে লক্ষ্মণ-মন্দির নামে পরিচিত দেবায়তনে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। এই লিপিটিতেও ভগবান বাসুদেবের প্রশস্তিসূচক সেই—'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' এই মন্ত্রটি উৎকীর্ণ আছে। এই প্রশস্তির লিপিকারের নাম ছিল জজ্ক; ইনি ছিলেন পেশায় কায়স্থ; একে সংস্কৃত ভাষাবিদ ও গৌড়দেশীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রায় সমসাময়িক যুগে চান্ডেল্লরাজ পরমার্দিদেবের রাজত্বকালে (১১২৯—১১৬৩ খ্রীষ্টাব্দে) রাজকর্মচারী লক্ষ্মীধর নামে জনৈক গৌড়দেশীয় ব্রাহ্মণ একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; এই প্রতিষ্ঠালিপিতেও বাসুদেবের প্রশস্তিসূচক মন্ত্রটির উল্লেখ আছে। আর সারা ভারতে যে অসংখ্য বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া যায় তার প্রায় সবই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী প্রতিমা শাস্ত্রবিহিত বাসুদেব-বিগ্রহ। বস্তুত প্রধানত ভাবে ব্যাপকপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অভিলষিত মূর্ত উপাস্য প্রতিমা ও মন্ত্রে এই ভগবান বাসুদেবই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এবং এই বাসুদেব নামে পরিচিত কৃষ্ণই ছিলেন বৈষ্ণব-উপাসনার মূল আধার। রাজন্য ও উচ্চকোটীর মানুষের সমাজে বাসুদেব-বিষ্ণুই ব্যাপক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

এই বাসুদেব-বিষ্ণুর উপাসনা একলিঙ্গের উপাসক গুহিলটদের রাজ্য মেবারেও অজ্ঞাত ছিলনা। যদিও রাজারা ছিলেন একলিঙ্গের উপাসক, এই রাজ্যের অনেক রাজকর্মচারী এবং সৈন্যাধ্যক্ষ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। গুহিলট বংশের রাজা অপরাজিতের রাজত্বকালে (৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে) সেনাপতি বরাহসিংহ রাজধানী নাগহ্রদে (বর্তমান নাগদায়) একটি বাসুদেব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-লিপিতে 'নমো পুরুষোত্তমায়' এই মন্ত্রে যে-দেবতার অভিনন্দন আছে তিনি যে মহাভারতোক্ত পুরুষোত্তম বাসুদেব-কৃষ্ণ এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। রাজস্থানের যোধপুরের সন্নিকটে ঘাঘরাবিহা নামক একটি স্থানে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি বিষ্ণুমন্দিরের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মন্দিরের একটি লিপিতে যশোধবল নামে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের ভগবান বাসুদেবের সেবার জন্য

কিছু অর্থদানের উল্লেখ আছে। ঐ যুগে স্বকীয় নামে ইষ্টদেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। উদয়পুরের সন্নিকটবর্তী আহারে [প্রাচীন নাম আদিবরাহপুর] বিক্রমসংবৎ ১০০০ বা খ্রীষ্টীয় ৯৪৩ অব্দে আদিবরাহ নামে পরিচিত একব্যক্তি আদিবরাহ বিষ্ণুর নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। ঐ আহারে গুহিলটরাজ অল্লাটের রাজত্বকালে ৯৭১—৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে একটি মুরারী (বিষ্ণু) মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দিল্লীর সুলতান আলাউদ্-দীন খলজী খ্রীষ্টীয় ১৩০৩ অব্দে চিতোর অধিকার করে এবং মেবার রাজ্যের প্রাচীন মন্দির ও দেবস্থান সমূহ ব্যাপকভাবে ধ্বংস করে। অবশ্য মুসলমান শক্তি খুব বেশি দিন মেবার অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়নি। শিশোদিয়া বংশের বীর রাণা হাম্মীর চিতোর পুনরুদ্ধার করলে মেবারে এক পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। অত্যাচার ও ধ্বংসের তাণ্ডবে উদ্বাস্তু উত্তর ভারতের বহু অধিবাসী এই সময় এসে রাজস্থানে আশ্রয় নিতে থাকে। রাণা লক্ষণ সিংহ মেবারের বহু প্রাচীন মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন এবং বেশ কিছু নূতন মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মণসিংহের উত্তরাধিকারী রাণা মুকুল চিতোরে এক 'চতুর্ভুজ' দেবতার মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সম্ভবত এই চতুর্ভুজ দেবতা বাসুদেব ভিন্ন কেউ নন। রাণা মুকুলের পরে মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন শিশোদিয়া বংশের অন্যতম খ্যাতিমান নরপতি রাণা কুম্ভকর্ণ। এই রাণা কুম্ভরই মহিষী ছিলেন রাজরাণী মীরা। এই কুম্ভরাণাই সম্ভবত রাজধানী চিতোরে এমন একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যে-মন্দিরে সর্বপ্রথম এমন একটি কৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় যে-বিগ্রহ চতুর্ভুজ বাসুদেববিগ্রহ থেকে ভিন্ন। রাণার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই বিগ্রহের নামকরণ হয় 'কুম্ভশ্যাম'।

এপর্যন্ত আমরা ভগবান বিষ্ণুর আরাধনায় যে মন্ত্র এবং যে মূর্তির পরিচয় পেয়েছি তাতে প্রধানত বাসুদেব নামেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়েছে। বাসুদেব ভিন্ন বিষ্ণুর আরাধনায় অন্যান্য যে সব নামের উল্লেখ আছে তার মধ্যে 'বৈকুণ্ঠ' ও 'পুরুষোত্তম' নামও পাওয়া যায় যাদের মূর্তি চতুর্ভুজ বাসুদেব-মূর্তিরই প্রকারভেদ। লক্ষ্মীসেবিত অনন্তশায়ী নারায়ণ-মূর্তির ক্ষেত্রেও চতুর্ভুজ বিষ্ণুর শঙ্খচক্রগদাপদ্মআয়ুধ মূর্তিকে বাসুদেব-মূর্তিরই বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সব ক্ষেত্রেই দেবতা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতগীতার পরিকল্পিত বাসুদেব-কৃষ্ণ,—যে-রূপের পূজা ও উপাসনা উচ্চকোটীর সমাজে সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোন মন্দির বা প্রতিষ্ঠানে 'বাসুদেব' ভিন্ন অন্য কোন রূপে পরিকল্পিত কৃষ্ণের মূর্তি এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে বলে জানা নেই। কৃষ্ণের এই 'শ্যাম'নামে পরিচিতি ভাগবতেই প্রথম পরিলক্ষিত হয়; ভাগবত পুরাণের প্রচলনের পূর্বে কৃষ্ণের এই শ্যামনাম বা শ্যামবিগ্রহ, যে-বিগ্রহে কৃষ্ণ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বাসুদেব নন, তিনি বংশীধারী মদনমোহন কৃষ্ণ। রাণাকুম্ভ প্রতিষ্ঠিত এই 'শ্যাম'-বিগ্রহরূপী কৃষ্ণই মহারাণী মীরার হৃদয় দেবতা। মীরার বহু ভজনে বৃন্দাবনের এই গোপতনয় গিরিধারী শ্যামেরই আকুতি দেখা যায়—

অপনা শরণো শ্যাম হরে,
অব অপনা শরণো শ্যাম হরে।

* * *

প্রভু উঁবরে ব্রজভূষণ রে,
সরসিজ নয়নে বিষহর শয়নে।
নয় মধুরাপতি হে মুরলীধর হে,
নন্দসুত হে ; গোকুল নায়ক হে—
জয় মাধব হে জয় যাদব হে।
গোপীজন মন মোহন হে,
জয় অশরণ শরণো শ্যাম হরে।

বা

ঘনশ্যাম অরো রী,
মেরে ঘনশ্যাম আরোরী।
অধরপরহৈ গান উস্‌কে হাথমে মুরলী,
পুষ্পবেণী গুংথ কর উপহার লারোরী।

মীরার এই 'শ্যাম'-কৃষ্ণ নন্দসুত, বৃন্দাবনের গোপীজন-মনমোহন মুরলীধর গোপাল-কৃষ্ণের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখা যায় ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে। শৈশব ও কৈশোরক বয়সের গোপীজন-মনমোহন, গিরিধারী, বংশীবাদক নন্দসুত কৃষ্ণভাব, কল্পনা ও লীলাবৈচিত্র্যে চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী দেবকীনন্দন বাসুদেব কৃষ্ণ থেকে মানস প্রকল্পে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট এক সংস্কৃতি-প্রবাহের সৃষ্টি ; এই গোপাল কৃষ্ণের পরিকল্পনা ও ভাগবতে এই গোপীজন-মনমোহন কৃষ্ণের পূর্ণ বিকাশে বৈষ্ণব-আরাধনা ও উপাসনায় এক বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়।

ভাগবতপুরাণের রচনাকাল নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও এই গ্রন্থ সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। ভাগবতের রচনাস্থল দক্ষিণভারত ; ঐ অঞ্চলে আলোয়ার ভক্তেরা ভক্তিমূলক ভাগবত-ধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন বলে জানা যায়। এই ধারা অতীতের নারদভক্তিসূত্রের পরিপূরক বলে অনুমিত হয়। এই নারদভক্তিসূত্রেই প্রথম শৃঙ্গার রসের মাধ্যমে ভক্তির উন্মেষ পাওয়া যায়। দক্ষিণে আলোয়ার বা আড়বারবীও গোপীপ্রেম অবলম্বনে ভক্তি-সাধনার পথ খুঁজেছিলেন। এরপর রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধব ও বল্লভাচার্য বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে এক বিশিষ্ট সাধনধারায় রূপায়িত করে তুলেছিলেন। এই ভক্তিধর্মের উদ্দিষ্ট ভগবান কৃষ্ণ উপনিষদে বর্ণিত দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, যিনি ক্রমে মহাভারত ও গীতায় সুউচ্চ তত্ত্বভিত্তিক বিষ্ণু-বাসুদেবরূপে বিবর্তিত হয়েছিলেন সেই বাসুদেব-কৃষ্ণ থেকে এক স্বতন্ত্র গভীর রসগর্ভ ছোতনায় বিশিষ্ট। সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রত্নতাত্ত্বিক দলিল, তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি এবং প্রতিমায় রাজকুল, পুরোহিত-ব্রাহ্মণসমাজ এবং অর্থশালী বণিক-সম্প্রদায় ভগবান বাসুদেবকেই অভিষ্ট দেবতারূপে শ্রদ্ধানিবেদন করে থাকলেও গোপাল বা গোবিন্দ নামে অভিহিত গোকুল, ব্রজ বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণ-ভগবানও যে জনসমাজের এক বিস্তৃত অংশের নিকট প্রভূত জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

পরমপুরুষ ভগবান বাসুদেবরূপী কৃষ্ণের প্রথম আবির্ভাব পঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায়। এরপর ক্রমে মহাভারতকার কৃষ্ণ-বাসুদেবকে মহাকাব্যের প্রধান নায়ক, মূল নিয়ন্তা ও শেষ পর্যন্ত পরিপূর্ণ পুরুষোত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত করে থাকলেও এই মহাকাব্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ও গোপজীবন সম্পর্কে সমস্ত সংবাদ যেন প্রায় ইচ্ছাকৃতভাবেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে মনে হয়। সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর এই মানসিকতায় গোপজনলালিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর জীবনকাহিনীর প্রতি অনীহা লক্ষ্য করা গেলেও সাধারণ্যের সমাজে কৈশোরক কৃষ্ণের প্রতি প্রবল অনুরাগের অস্তিত্ব ও তার স্বীকৃতির দাবীর ফলেই হয়ত মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বা খিলরূপে হরিবংশপুরাণ রচনা করে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। এই হরিবংশ পুরাণেই প্রথম পুরাণ প্রতিষ্ঠিত পরম দেবতা হরি বা বিষ্ণুর পূর্ণাবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবনকাল পর্যন্ত বিস্তৃত কাহিনীর সংযোজনে শ্রীকৃষ্ণজীবনকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া হয়েছিল। এই বিবর্তন লক্ষ্য করলে মনে হয় যে মহাভারত থেকে যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের প্রসঙ্গ অনুল্লেখ রাখবার প্রয়াস করেছিলেন তাঁরা গোপসমাজে প্রতিপালিত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনকে কোন মর্যাদা দিতে চাননি; যদি সেই জীবনকে স্বীকৃতি দিলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েতর গোপসমাজ কোন প্রাধান্যলাভ করে সেই কারণেই হয়ত সেই বাল্যজীবনকে তাঁরা স্বীকৃতি দিতে চাননি। সেই বিচারেই মনে হয় উপনিষদের পর যেখানে শ্রীকৃষ্ণের প্রাচীনতম উল্লেখ দেখা যায় সেই পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে তাঁকে বাসুদেব নামেই অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সমাজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোর জীবনের যে ব্যাপক পরিচিতি ছিল সাধারণের কথ্য পালি ও প্রাকৃত রচনায় বৌদ্ধ ও জৈন-সম্প্রদায় কর্তৃক রক্ষিত সাহিত্যে তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। পালি এবং প্রাকৃতে কৃষ্ণ-শব্দ কহ্নতে পরিণত হয় এবং এই কহ্ন-শব্দ থেকেই পরবর্তী যুগের কথ্য ভাষায় কানু বা কানাই শব্দের উদ্ভব ও প্রবর্তনে কহ্ন-কৃষ্ণের ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন পালি সাহিত্যে কহ্ন-কৃষ্ণের বাল্যজীবনের বিস্তৃত উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী যুগে কৃষ্ণউপাসনা বৌদ্ধউপাসনার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলে বৌদ্ধ-সাহিত্যে কৃষ্ণজীবন সম্পর্কে আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায়না। কিন্তু জৈনসমাজে ভগবান বাসুদেবকেও ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ বা বলরামকে শলাকাপুরুষরূপে প্রভূত সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ও জৈন সমাজে কৃষ্ণের এই ব্যাপক স্বীকৃতি লক্ষ্য করেই হয়ত শেষ পর্যন্ত গোপসমাজে প্রতিপালিত গোপালকৃষ্ণের জীবনকেও ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়কে উপযুক্ত মর্যাদায় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(তেরো)

॥ সঙ্গীতে বর্ণ ও অলঙ্কার ॥

সঙ্গীতে প্রসন্নাদি অলঙ্কার-সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা আলোচনা করেছি। এখন বিস্তৃতভাবে সঙ্গীত-রত্নাকরে, অন্যান্য সঙ্গীতগ্রন্থে এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রে তাদের কীভাবে বর্ণনা ও আলোচনা আছে এবং প্রয়োগবিধিই বা তাদের কীধরনের—সে'সব আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

সঙ্গীত-রত্নাকরের প্রথম স্বরগত-অধ্যায়ে আছে—

'প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নান্তস্তসংজ্ঞকঃ।
ততঃ প্রসন্নমধ্যঃ স্যাৎ পঞ্চমঃ ক্রমরেচিত ॥' ১।৬।৫

১।৬।৩ শ্লোকে, অলঙ্কারের (রূপের) পরিচয় দিয়ে পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব বলেছেন : 'বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভমলংকারং প্রচক্ষতে ॥' বিশিষ্ট বর্ণসন্দর্ভ বা বর্ণসকলকে অলঙ্কার বলে। এই শ্লোকের দুটি টীকা পাওয়া যায় : একটি 'কলানিধি'-নামে পণ্ডিত কল্লিনাথ-রচিত, আর অপরটি 'সুধাকর'-নামে মহারাজ সিংহভূপাল-রচিত। দুটি টীকার মধ্যে 'সুধাকর' বা মহারাজ সিংহভূপালের টীকা বিস্তৃত ও অর্থসম্পদপূর্ণ। কল্লিনাথ ১।৬।৩ শ্লোকটির উপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন : 'বর্ণসন্দর্ভোঽলংকার ইত্যেতাবৎ উক্তে বর্ণবিশেষে সঞ্চারিণি ব্যভিচারঃ স্যাৎ ; স মা ভূদিতি বিশিষ্টমিতি বিশেষণম্'। এর মধ্যে বর্ণের পরিচয়প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : 'গানক্রিয়োচ্যতে বর্ণঃ',—গানকর্মে স্বরের যে উচ্চারণবিধি—তাই বর্ণ। সিংহভূপাল বলেছেন : 'স্বরাণাং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ গানক্রিয়া গানকরণম্, উচ্চারণমিতি যাবৎ। সা বর্ণশব্দেনোচ্যতে'। পণ্ডিত কল্লিনাথ প্রায় একভাবেই বলেছেন : 'গানক্রিয়ায়া বর্ণত্বং স্বরপদাদের্বর্ণনাদ্বিস্তারকরণাৎ'। গানকর্মে স্বর ও পদ প্রভৃতিকে যথাবিহিতভাবে বর্ণনা ও বিস্তার করার নাম বর্ণ। সেই বর্ণ চারপ্রকার—'সা চতুর্ধা নিরূপিতঃ',—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারি। (১) 'স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ সং একস্যৈব স্বরস্য যঃ, স্থায়ীবর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ' ; অর্থাৎ যেখানে একটি স্বরের গতি বা প্রয়োগ হয় ধীরে ধীরে বলতে বিলম্ব ক'রে তাকে স্থায়ীবর্ণ বলে। যেমন ষড়্‌জস্বরের প্রয়োগ—সা-সা-সা-সা, কিংবা মধ্যমস্বরের প্রয়োগ—মা-মা-মা-মা প্রভৃতি ; অথবা সা-সা-সা, রি-রি-রি, গা-গা-গা প্রভৃতি। যখন স্বরের আরোহণ বা ক্রমারোহণগতি হয় তখন আরোহীবর্ণ —সা-রি-গা-মা, কিংবা সা-রি-গা-মা-পা-ধা-নি প্রভৃতি। স্বরের আরোহণগতি না হয়ে যখন অবরোহণগতি হয় তখন অবরোহী'—নি-ধা-পা-মা-গা-রি-সা। এই স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণতিনটির মিশ্রনে যখন গতি, প্রচার বা প্রয়োগ হয় তখন সঞ্চারীবর্ণ—'সা সা স নি ম মা নি ম প নি বি রি পা পনীপানিধ'—এই উদাহরণ দিয়েছেন বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গ (খ্রীষ্টীয় ৭ম-৭ম শতাব্দীতে)। বর্ণগুলি গানের সময়েরও নির্দেশক

গানের বর্ণগুলিকে অবলম্বন ক'রেই সঙ্গীতে অলঙ্কারের সৃষ্টি। বর্ণ স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারীভেদে চারটি এবং এ'চারটি বর্ণের এক-একটির অলঙ্কারও অনেকগুলি সেকথা বলেছি। সুতরাং চারটি বর্ণের অলঙ্কারসমষ্টি তেষট্টি—'ইতি প্রসিদ্ধালংকারাস্ত্রিষষ্টিরুদিতা'। কিন্তু সঙ্গীতের অলঙ্কার তেষট্টি নয়, অনন্ত—'অনন্তাস্ত্বাত্তু তে শাস্ত্রে ন সামস্ত্যেন কীর্তিতা'। সেজন্য সঙ্গীতশাস্ত্রে

সকল অলঙ্কারের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়নি। মোটকথা রক্তিলাভ বা সঙ্গীতে স্থায়ী প্রভৃতি বর্ণগুলির সঙ্গে সঙ্গে স্বরগুলির রঞ্জকত্বের জ্ঞান, স্বরজ্ঞান ও বর্ণাঙ্গসকলের বৈচিত্র্যসম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে অলঙ্কার নির্ণয় ও সম্পন্ন করা যায় না—'ইতি প্রয়োজনান্যাপুরণংকারনিরূপণে'। 'অলঙ্কারপ্রয়োজন' বলতে আচার্য সিংহভূপাল বলেছেন: 'স্বরাণাং রঞ্জকত্বজ্ঞানং স্বরূপজ্ঞানং স্থায়াদিবর্ণনাং বৈচিত্র্যাং চালংকারনিরূপণে-প্রয়োজনম্'।

পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে (প্রথম স্বরগত-অধ্যায়ে) পাঁচ থেকে চৌষট্টি শ্লোকগুলিতে বিচিত্র অলঙ্কার ও তাদের প্রয়োগের কথা বলেছেন। নাট্যশাস্ত্রে আচার্য ভরত, ভরতভাষ্য— 'সরস্বতীহৃদয়ালংকারে' রাজা নান্যদেব এবং 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যে আচার্য অভিনবগুপ্ত ছাড়া 'দত্তিলম্'-গ্রন্থে দত্তিল, 'বৃহদ্দেশী'-গ্রন্থে আচার্য মতঙ্গ, 'সঙ্গীতমকরন্দ'-গ্রন্থে আচার্য নারদ (ইনি নারদীশিক্ষাকার নারদ নন) প্রভৃতি সঙ্গীতে অলঙ্কারসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তাঁরা আলোচনা করেছেন সঙ্গীতে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ ক'রে অলঙ্কার দিয়ে রসসৃষ্টির জন্য।

'অলঙ্কার'-শব্দের ব্যুৎপত্তি ও বিবরণ দিয়ে সিংহভূপাল 'সুধাকর'-টীকায় বলেছেন: 'কেনচিৎ লক্ষণবিশেষেণ বিশিষ্টং বর্ণসন্দর্ভং বর্ণসমুদায়মলংকারং প্রচক্ষতে ভরতাদয়ঃ। মতঙ্গেনা-পালংকারস্য লক্ষণব্যুৎপত্তী কথিতে'। কিন্তু 'অলঙ্কার'-শব্দে কি বুঝায় এবং তার শব্দগত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি কি ?—'উচ্যতে—অলংকারশব্দেন মণ্ডনমুচ্যতে। যথা কটককেয়ূরাদিনাঙ্গালংকারেণ নারী পুরুষো বা মণ্ডিতঃ শোভাবাবহেৎ তথৈবৈতৈরলংকারৈঃ প্রসন্নাদিভিরলংকৃতা বর্ণাশ্রয়া গীতির্গাতৃশ্রোতৃণাং সুখাবহা ভবতীতি'; অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হলে যেমন শোভাসম্পন্ন ও আনন্দের বিষয় হয়, তেমনি সঙ্গীতে প্রসন্নাদি-অলঙ্কারে গান বা গীতি ভূষিত হ'লে শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে আনন্দান্বিত করে। যেমন সঙ্গীতে, তেমনি কাব্যে, সাহিত্যে, নাটকে অলঙ্কার শোভাবর্ধন করে।

মিথিলাধিপতি নান্যদেব 'ভরতভাষ্য'-গ্রন্থে (নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্যে) পঞ্চম অধ্যায়ে 'অথ প্রথমং বর্ণালংকার-প্রকরণম্' বলে অলঙ্কারসম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন—

'বর্ণা এব হি জাতীনাং দেহ ইত্যাভিধীয়তে।
অলংকারাস্তু, তদ্ধর্ম্যা বর্ণনামেব লক্ষণম্॥'

স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী বর্ণচারটি জাতির (জাতিরাগগুলির) দেহবিশেষ। সুতরাং শোভাবর্ধনের জন্য যেমন দেহের অলঙ্কারের প্রয়োজন, তেমনি জাতিরাগ, গ্রামরাগ ভাষারাগগুলির দেহরূপ বর্ণের জন্য অলঙ্কারের প্রয়োজন। পরে রাজা নান্যদেব সপ্তম শ্লোক থেকে নিষ্কূজিত প্রভৃতি তেত্রিশটি অলঙ্কারের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—

'নিষ্কূজিতঃ সহুংকার-হসিতো বিন্দুরেব চ।
প্রেঙ্খোলিতস্তথা ক্ষিপ্তো বিধুতোদ্ঘাহিতৌ তথা॥' প্রভৃতি

অর্থাৎ নিষ্কূজিত, বিন্দু, হুংকার, হসিত, বিধুত, হলাদমান, প্রেঙ্খোলিত, আক্ষিপ্ত, উদ্ঘাহিত, সংপ্রদান, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, প্রসন্নাদি, প্রসন্নান্ত, প্রসন্নভেদ্য, প্রসন্নমধ্য, গাত্রবর্ণ, প্রস্তার, প্রসাদ, মত্ত, কম্পিত, সম, সুহৃদ, বেণু, রঞ্জিত, উপলালক, প্রাবর্তক, পরাবৃত্ত, উদ্গীত, মন্দ্রতার, তারমন্দ্র, রুক্ষ, রেচিত, সন্নিবৃত্ত-প্রবৃত্ত।

'বর্ণাশ্চত্বার এবৈতে' উক্তিতে বর্ণের প্রসঙ্গ কেন করা হ'ল তার উত্তরে আচার্য অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যে 'হ্রস্বকারাস্তদাশ্রয়াঃ'—এই ভরতবাক্যেরই সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি এ'প্রসঙ্গে ভাষ্যে বলেছেন: **'সম্প্রবায়ে গান্ধর্বমিতি বিশ্বাখিলাচার্যঃ'**—বিশ্বাখিল একজন গন্ধর্বাচার্য গন্ধর্ব নারদ, তুম্বুরুরই মতো এবং বিশ্বাখিল বৈদিকগানের সমসাময়িক বা বৈদিকোত্তর গান গান্ধর্বেরও ('গান্ধর্বঃ—স্বরতালপদাশ্রয়ম্')[১] প্রচারক। 'পদাশ্রয়ম্' বা 'পদাস্তকম্' (নাট্যশাস্ত্র ২৮শ অধ্যায়)—'পদসম্বন্ধঃ সর্বত্র প্রযোজকঃ'। পদ—অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ: 'অনিবদ্ধং নিবদ্ধং চ দ্বিবিধং তৎপদং স্মৃতম্' (নাট্যশাস্ত্র ২৮।১৮)।[২] আচার্য অভিনব-গুপ্ত বলেছেন: এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, পদ না হয় গান্ধর্বের অপরিহার্য উপাদান বা অঙ্গ, কিন্তু তার (গান্ধর্বের) সঙ্গে বর্ণের কি সম্বন্ধ? তার উত্তরে তিনি বলেছেন: 'কিং তু বর্ণো নাম পদসম্বন্ধমন্তরেণ লক্ষয়িতুমেব ন শক্যতে', অর্থাৎ পদের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক যদি পদের সঙ্গে না থাকে তবে গানের লক্ষণ স্থির করা সম্ভব নয়। সেজন্য 'পদাধীনস্বভাববাদেষাং বিনিয়োগানন্তরমেব যুক্তমভিধানম্'। তাছাড়া আচার্য ভরতের উক্তি—'হ্রস্বকারাস্তদাশ্রয়াঃ' (২৮।১৪) শ্লোকাংশের টীকায় বলা হয়েছে ('টীকাকারাস্তবাহ্যঃ')—'আশ্রয়স্বরস্বরূপেণ জাতীনাং গান উপযোগী, ন তু রক্তিসম্পাদকত্বেন। তত্ত্ব গ্রামরাগাণামেব'। এখানে বক্তব্য এই যে, 'জাতীনাং'—জাতিরাগগুলির (ষাড়জী, আর্ষভী প্রভৃতির) ও এমনকি জাতিসম্ভূত গ্রামরাগ-গুলির রক্তিভাব বা রাগস্বভাব প্রকাশ করা সম্ভব নয় বর্ণ ও বর্ণালঙ্কারগুলির সহাযোগিতা ছাড়া—'ন তু রক্তিসম্পাদকত্বেন'। রক্তিভাব একমাত্র রাগেরই থাকে এবং জাতিরাগ, গ্রামরাগ, প্রভৃতি গান্ধর্বগানেরই অঙ্গ।

বর্ণ ও অলঙ্কারের প্রসঙ্গে ভাষ্যকার আচার্য অভিনবগুপ্তের বক্তব্যই যথেষ্ট। তিনি ভরতের 'শারীরস্বরসম্ভূতাস্ত্রিস্থানগুণগোচরাঃ' (২৮।১৭) শ্লোক বা শ্লোকাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেছেন: 'শারীরস্বরেষু মুখ্যোবর্ণাভিব্যক্তেষু লক্ষণমিদমুক্তম্। তৎসদৃশস্বরোপলম্ভ এবাস্তত্র বীণাদাবিতি তত্রাপি গৌণবস্তুতীতি, নতু বীণাদাবলংকারাভাবঃ। অতএবোক্তম্—

'শরীরাৎ স্ফুটা যে তু দারব্যা তে ব্যবস্থিতাঃ।
দারব্যাং চলিতা যে তু শারীরাং তে সুনিশ্চলা॥'

বীণা—গাত্র ও দারবী দু'রকম। এই গাত্রবীণা ও দারবীবীণার উল্লেখ করেছেন গন্ধর্বাচার্য নারদ নারদীশিক্ষায়। আচার্য অভিনবগুপ্তের বক্তব্য হোল: শুধুই গান বা জাতিগান বা জাতিরাগগান, গ্রামরাগগানেই বর্ণ ও অলঙ্কারের সহযোগ নয়—গাত্রবীণা, দারবীবীণা প্রভৃতি বৈদিক ও বৈদিকোত্তর বীণাযন্ত্রেও প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হ'ত।

এরপর 'অভিনবভারতী'-ভাষ্যে আচার্য অভিনবগুপ্ত নান্দীসূত্রপালোর (ভরতভাষ্যের) মতোই চারটি বর্ণের অন্তর্গত অলঙ্কারগুলির উল্লেখ ক'রে তাদের প্রয়োগ ও সার্থকতার কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, এমনকি নাট্যগীতি প্রবাগানেও বর্ণ ও অলঙ্কারগুলির প্রয়োগ ছিল।

১। 'গান্ধর্বমিতি তন্ত্রজ্ঞেয়াং স্বরতালপদাশ্রয়ম্' ।২৮।৮

২। 'পদ'—গান্ধর্বগানের একবিংশ উপাঙ্গের মধ্যে অন্যতম—'ইত্যেকবিংশকো জ্ঞেয়···গান্ধর্বসংগ্রহো যেষ···' ।২৮।২১

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম, উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক' ।।

ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(দুই)

শ্রী যখন দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর সীতারামের নিকট ভ্রাতা গঙ্গারামকে রক্ষা করিবার প্রার্থনা করিতে সীতারামের সম্মুখে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হইল, তখন শ্রীর দিকে চাহিয়া সীতারামের মনের মধ্যে নিতান্ত মানবিক রূপতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল, শ্রীর অনুরোধ পালন করিবার মধ্যে যে দুঃসাধ্যতা আছে, তাহার কথা সীতারাম মুহূর্তও ভাবিল না, শ্রী যাহা বলিল, তাহা শুনিল, নিজের জীবন বিপন্ন করিবার কথাও ভাবিল না, রূপমোহ এইভাবে যে আত্মবিস্মৃতি সৃষ্টি করিতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইতে চাহিলেন। শ্রী যখন তাহার নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হিন্দুর কথা তুলিলেন, তখন আত্মবিস্মৃত সীতারামও তাহার প্রতিধ্বনি মাত্র করিল। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' রূপমুগ্ধ সীতারাম গঙ্গারামের জন্য যথাসাধ্য করিবার জন্য স্বীকৃত হইল। কারণ, সে ভাবিল, 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' গঙ্গারাম হিন্দু ছাড়াও আরও বেশি কিছু এবং তাহাই এখানে গভীরতর সত্য—গঙ্গারাম শ্রীর ভাই। আর শ্রী সীতারামের মনের ভাবনায় 'শ্রী এমন· শ্রী? তা ত জানি না। আগে শ্রীর কাজ করিব তারপর অন্য কথা।'

এখানেই সীতারামের মনের ভাবনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট ধরা পড়িল যে গঙ্গারাম হিন্দু বলিয়া নহে, শ্রীর ভাই বলিয়াই জীবন বিপন্ন করিয়াও সে রক্ষনীয়। রূপমুগ্ধ পুরুষ পতঙ্গের মত নিজ বিপদের কথাও বিস্মৃত হইয়া গিয়া বিপদের মধ্যে গিয়া আত্মসমর্পণ করে, সীতারামও তাহা করিয়াছিল, কেবল মুখে বলিয়াছিল, 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?' ইহা হিন্দুর স্বার্থরক্ষায় উদ্বুদ্ধ হিন্দুরাজা সীতারামের কথা নহে, বরং পরিত্যক্ত পত্নী শ্রীর রূপমুগ্ধের কথা। সুতরাং সীতারাম চরিত্রের মূল শক্তি তাহার হিন্দুত্বের প্রেরণা হইতে আসে নাই, নারীর রূপতৃষ্ণার অতৃপ্তিতা হইতে আসিয়াছে। ইহাতে তাই সীতার বাণী গৌণ, মানবিক দুর্বলতার বিষয়ই মুখ্য। ইহার মধ্যে ধর্মীয় তত্ত্বকথা নাই। যাহা আছে তাহা বাস্তব জীবন-সত্য। মহৎ চরিত্রের সমগ্র মহত্ত্বের আদর্শ মানবিক রূপমোহ যে কিভাবে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে, সীতারাম এবং সীতারামের জীবনে তাহাই দেখান হইয়াছে।

বহুদিন অদর্শনের পর সীতারাম তাঁহার প্রথমা পত্নী শ্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন, সীতারাম দেখিলেন, মুখখানা অশ্রুপূর্ণ, বর্ষা বারিনিষিক্ত পদ্মের ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর। বলিলেন, 'তুমি শ্রী এত সুন্দরী।'

সীতারাম শ্রীর মুখখানির দিকে তাকাইয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, শ্রী কাঁদিতেছিল। দীর্ঘদিনের পর পূর্বভূমিকাহীন সাক্ষাৎ, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ আছে, তাহার অশ্রুভারাক্রান্ত দুই চোখ, তাহাতেও সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার প্রত্যাশিত ছিল, কিন্তু সেই অবস্থায় বিস্ময় এবং সহানুভূতির ভাব কাটাইয়া উঠিয়া সীতারাম শ্রীকে যাহা বলিলেন, তাহা কদাচ সময়োপযোগী

বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু ইহার মধ্য দিয়াই সীতারামের যথার্থ প্রকৃতি প্রকাশ পাইয়াছে—'তুমি শ্রী এত সুন্দরী'।

শ্রী যত সুন্দরীই হোক, সীতারামের পক্ষে সেই মুহূর্তে তাহার রূপের প্রশংসা ঘটনা-মূলক ও নহেই, সাধারণভাবেও স্বাভাবিক নহে। যে পত্নী তাঁহাকে যে কোনও কারণেই হোক, পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে, যাহার সঙ্গে দীর্ঘদিন যাবৎ কোনও সম্পর্কই নাই, এমন কি, দেখা শোনা পর্যন্ত নাই, তাহার সঙ্গে আকস্মিক এই দর্শনের মধ্যে যে বিস্ময় ও কৌতূহলের ভাব থাকা আবশ্যক ছিল, সীতারামের আচরণে তাহা প্রকাশ পায় নাই। নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না থাকিলে শ্রী যে তাঁহার সামনে আবির্ভূত হইতে পারে না, এই বিষয়েও সীতারামের মত চরিত্র অবহিত থাকা স্বাভাবিক ছিল। সুতরাং তাঁহার পক্ষে সেই কারণটি প্রথম জানিতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সীতারাম সেই বিষয়ে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ দেখান নাই, তাহার পরিবর্তে তাহার সঙ্গে তাঁহার প্রথম দর্শনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তাঁহার মধ্যে শ্রীর দৈহিক সৌন্দর্যের প্রতি একটি লুব্ধ আকর্ষণের ভাব প্রকাশ করিলেন। ইহার মধ্যে সীতারাম চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাইয়াছে, এই কথা পূর্বে বলিয়াছি।

রূপতৃষ্ণাই সীতারাম চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা। শ্রীকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার রূপতৃষ্ণা যখন সকল শক্তি লইয়া উঠিল, তখন তাহা প্রথমতঃ শ্রীর অনুরোধ রক্ষা করিবার কার্যে ইহার সেই শক্তি নিয়োগ করিল, গঙ্গারামকে রক্ষা করিবার কার্যে সীতারামের যে দুঃসাহসিক আচরণের প্রকাশ, তাহার মূলেও তাঁহার দুর্বার এবং অন্ধ রূপতৃষ্ণা। কাজী সাহেব যখন সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ও তোমার এমন কে যে, উহার জন্য সর্বস্ব দিতেছ ?'

সীতারাম ইহার কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য উত্তর দিতে পারিল না। শুধু আবেগময় ভাষায় বলিল, 'ও আমার যেই হউক, আমি উহার প্রাণ দানে স্বীকৃত—আমি সর্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব, এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম।'

সীতারামের এই হৃদয়াবেগের প্রেরণা কোথায়, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। কাজী সাহেবের জিজ্ঞাসার এখানে উত্তর নাই; এই বাক্তি যে কে এই প্রশ্নটি এড়াইয়া গিয়া তিনি বলিলেন, তিনি তাহার প্রাণ দানে স্বীকৃত। শ্রীর নিকট গঙ্গারামের প্রাণ রক্ষায় তিনি স্বীকৃত, ইহার মধ্যে গঙ্গারামকে অসহায় অবস্থা হইতে উদ্ধার করিবার পবিত্র লোকহিতকর নিঃস্বার্থ সঙ্কল্পের পরিবর্তে শ্রীর অনুরোধই যে কার্যকর হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না। এখানে হিন্দুধর্মের নাম করিয়া সীতারাম শ্রীর প্রতি আকর্ষণই প্রকাশ করিয়াছেন। সীতারামের পরোপকার, তখন হইতে কেবলমাত্র শ্রীর উপকার, হিন্দুধর্মের কথা আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। যে মুহূর্তে শ্রীর সঙ্গে তাহার দর্শন হইয়াছে, সেই মুহূর্তে পরোপকারী সীতারাম আর নাই, তাহার মধ্যে স্বার্থান্ধতা জন্মিয়াছে।

বিবাহের পর পিতার আদেশে প্রথমা পত্নী শ্রীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকিবার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন, 'যার একদিকে গঙ্গা, একদিকে যমুনা, তার তলে কোথায় বালির মধ্যে সরস্বতী শুকাইয়া লুকাইয়া আছে, তা কি মনে

পড়ে।' সীতারামের প্রকৃতিটিও ইহার মধ্যে কিছুমাত্র গোপন নাই। অন্যায়ভাবে তাহার প্রথমা পত্নীকে পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও সেজন্য তাহার কোনও অনুতাপ কিংবা অপরাধ-বোধ জাগ্রত হয় নাই, তিনি নিরপরাধে পরিত্যক্ত পত্নীর কোনদিন কোনও সন্ধানও লইতে যান নাই। এই অপরাধের জন্য নিজের দিক হইতে সীতারাম কোনও প্রায়শ্চিত্তও করেন নাই। বরং শ্রীর কথা ভুলিয়াছেন; একদিকে 'তপ্ত কাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দা' ও অপর দিকে 'হিম রাশি প্রতিফলিত-কৌমুদীরূপিণী রমা'র সান্নিধ্যে অর্থাৎ রূপের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়াই তিনি শ্রীর কথা ভুলিয়াছেন, শ্রীর জন্য তাঁহার কোনও দিন প্রেম বিকাশলাভ করিবার সুযোগ হয় নাই, তাহার জন্য তিনি কোনদিন বৈরাগ্যও অবলম্বন করেন নাই। শ্রীর জন্য তাঁহার কোনও দিন মানসিক প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। তিনি রূপভোগ-বিলাসী। নন্দা ও রমার রূপের মধ্যেই ডুবিয়াছিলেন, শ্রীর রূপ দেখিয়া তিনি তাহার প্রতি আকর্ষণ বশতঃ এক কপট কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কারণ, রূপের তৃষ্ণা কোনদিন মিটিতে পারে না। এখানে বিদ্যাপতির সেই সুপরিচিত পদটি স্মরণ করা যাইতে পারে—

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

রূপ কখনও রূপতৃষ্ণা মিটাইতে পারে না, সীতারামের রূপতৃষ্ণা 'তপ্ত কাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দা যেমন মিটাইতে পারে নাই, তেমনই 'হিম রাশি প্রতিফলিত কৌমুদী-রূপিণী' রমাও মিটাইতে পারে নাই। এমন কি, শ্রী যত সুন্দরী হউক না কেন, সেও কেবলমাত্র তাহার রূপে সীতারামের রূপতৃষ্ণা মিটাইতে পারিত না। কিন্তু সীতারাম স্ত্রীর দৈহিক রূপকে অতিক্রম করিয়াও আর একটি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার 'সিংহবাহিনী মূর্তি'; 'আমার এমন কি আর হয়।' ইহা শ্রীর রূপাতীত আর এক রূপ। যে রূপের স্পর্শ নন্দাতেও নাই, রমাতেও নাই।

●

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

"তত্র নারদ ইবাবভৌ মহান্ শ্রীপতেঃ প্রথমজো দ্বিজোত্তমঃ।
দণ্ডবদ্ভুবি নিপত্য সুরর্ষিঃ প্রাণমন্মুনিরজাত্মজো ভিতম্ ॥"[২৪]

নারদের পিছনে পিছনে তাঁর চেলা বা শিষ্য সেজে এলেন শ্রীরামপণ্ডিত বগলে আসন ও হাতে কমণ্ডলু নিয়ে। এসেই তিনি শ্রীবাসের বসবার জন্ত আসন বিছিয়ে দিলেন। দর্শকেরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নারদরূপী শ্রীবাসপণ্ডিতকে দেখে। তাঁদের মনে হল,

"সাক্ষাতে নারদ যেন দিলা দরশন ॥"[২৫]

অদ্বৈত আচার্য গম্ভীরস্বরে তাঁর আগমনের কারণ জানতে চাইলে শ্রীবাস বললেন,

" "নারদ আমার নাম, কৃষ্ণের গায়ন।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাঙ—কৃষ্ণ দেখিবার তরে।
শুনিলাঙ 'কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগরে' ॥
... ...
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি লক্ষ্মী-বেশ।
অতএব এ-সভায় আমার প্রবেশ ॥" "[২৬]

দেবর্ষিবেশী নারদের নিষ্ঠাপূর্ণ এইকথা শুনে সমবেত বৈষ্ণবেরা আনন্দিত হয়ে জয়ধ্বনি করে উঠলেন। মুরারি গুপ্ত লিখেছেন, দেবর্ষিরূপী দ্বিজশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসের মুখে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যের কথা শুনে উপস্থিত দ্বিজবরগণ প্রেমসাগররসতরঙ্গে আর্দ্র হয়ে অচিরেই পরমানন্দে নিমগ্ন হলেন।

"এবমুক্তবতি ভূসুরবর্যে প্রেমসাগররসোর্মিভিরার্দ্রাঃ।
সংবভূবুরতি তে রসপূর্ণাস্তূর্ণমেব মুদিতা দ্বিজবর্য্যাঃ ॥"[২৭]

বিস্মিত হয়ে সকলে দেখলেন।

"অভিন্ন-নারদ যেন শ্রীবাসপণ্ডিত।
সে-ই রূপ, সেই-বাক্য, সে-ই সে চরিত ॥"[২৮]

শ্রীবাসপণ্ডিতের সাজসজ্জা, চালচলন ও কথাবার্তা এতখানি চরিত্রানুগ হয়েছিল যে কেউ তাঁকে চিনতে পারেন নি। এমন কি পরমাবৈষ্ণবী সর্বলোকজননী শচীদেবীও অবাক হয়ে শ্রীবাস-পত্নী

২৪। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে পঞ্চদশঃ সর্গঃ, শ্লোক—৯, পৃষ্ঠা—৭১।
২৫। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোকার্ধ—৫০, পৃষ্ঠা—৭১।
২৬। " " " " শ্লোক—৫৬-৫৭ ও ৬০, পৃষ্ঠা—৭১-৮০।
২৭। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে পঞ্চদশঃ সর্গঃ, শ্লোক—১৮, পৃষ্ঠা—৮০।
২৮। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—৬২, পৃষ্ঠা—৮০।

মালিনীদেবীকে প্রশ্ন করেছিলেন, ইনি কি পণ্ডিত? কেবলমাত্র তাই নয়, শ্রীবাসের প্রগাঢ় কৃষ্ণভক্তি তাঁর অন্তরকে এতদূর অভিভূত করে তুলেছিল যে অপরিসীম আনন্দে তিনি মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন।

অন্যদিকে সাজঘরে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রেমিকা পরমাপ্রকৃতি রুক্মিণীর রূপসজ্জা করছেন। সাজতে সাজতে সেখানেই তিনি রুক্মিণী ভাবে আবিষ্ট হলেন। নিজেকে বিদর্ভ-রাজদুহিতার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে তাঁর মত ব্যবহার করতে লাগলেন। মহাপ্রভুর এই ভাবাভিনয় সত্যই বিস্ময়কর। যে-ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, সেই অভিনেত্রীর চরিত্র এবং ভূমিকাভিনেতার এইরূপ একাত্মতা একান্ত দুর্লভ। মহাপ্রভু যে কতবড় অভিনেতা ছিলেন, এই বর্ণনা তার স্বাক্ষর বহন করছে।

"গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।
রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইলা নির্ভর॥
আপনা' না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।
বিদর্ভের সুতা হেন আপনারে বসে'॥
নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।
পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে।"[২৯]

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত "শ্রীমদ্ভাগবতম্" মহাকাব্যের দশমস্কন্ধের উত্তরার্ধে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়ে সপ্তশ্লোকবদ্ধ রুক্মিণী-প্রেমপত্রিকা বিবৃত হয়েছে। ছেদিরাজ অত্যাচারী শিশুপালের হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের অভীপ্সায় নামামৃত শ্রবণে তথাগতপ্রাণা বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা পরমাপ্রকৃতি রুক্মিণীদেবী সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করে এই বিখ্যাত প্রেমপত্রিকা প্রেরণ করেছিলেন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে পত্রবাহকরূপে নিযুক্ত করে। মহাপ্রভু রুক্মিণীর ভাবাবেশে এই অংশেরই অভিনয় করতে লাগলেন। বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যে মধুর রসসিক্ত মাধুর্যমণ্ডিত এই শ্লোক-সপ্তকের সুন্দর ও সাবলীল কাব্যানুবাদ করেছেন।[৩০] অনুসন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল নিবারণের জন্য প্রথমে মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করে পরে তার বাংলা গদ্যানুবাদ করলুম।

"শ্রীরুক্মিণ্যুবাচ।
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর। শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গ। তাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে॥১॥

২৯। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—১০-৭১, পৃষ্ঠা—৮১।

৩০। " " " " শ্লোক—৭১-৯৬, পৃষ্ঠা—৮২-৮৪।

কা ত্বা মুকুন্দ। মহতী কুলশীলরূপ—
বিদ্যাবয়োদ্রবিণধামভিরাত্মতুল্যাম্।
ধীরা পতিং কুলবতী ন বৃণীত কন্যা
কালে নৃসিংহ। নরলোকমনোঽভিরামম্ ॥২॥

তস্মে ভবান্ খলু বৃতঃ পতিরঙ্গ। জায়া—
মাত্মার্পিতশ্চ ভবতোঽত্র বিভো। বিধেহি।
মা বীরভাগমভিমর্শতু চৈদ্য আরাদ্
গোমায়ুবন্মৃগপতের্বলিমম্বুজাক্ষ। ॥৩॥

পূর্ত্তেষ্টদত্তনিয়মব্রতদেববিপ্র—
গুর্ব্চ্চনাদিভিরলং ভগবান্ পরেশঃ।
আরাধিতো যদি গদাগ্রজ এত্য পাণিং
গৃহ্লাতু মে ন দমঘোষসুতাদয়োঽন্যে ॥৪॥

শোভাবিনি ত্বমভিতোঽমহনে বিদর্ভান্
গুপ্তঃ সমেত্য পৃতনাপতিভিঃ পরীতঃ।
নির্ম্থ্য চৈদ্যমগধেন্দ্রবলং প্রসহ্য
মাং রাক্ষসেন বিধিনোদ্বহ বীর্য্যশুল্কাম্ ॥৫॥

অন্তঃপুরান্তরচরীমনিহত্য বন্ধূং—
স্ত্বামুদ্বহে কথমিতি প্রবদাম্যুপায়ম্।
পূর্ব্বেদ্যুরস্তি মহতী কুলদেববাত্রা
যস্যাং বহির্নবকুমারিকয়া বহিত্র্যা ॥৬॥

যস্যাঙ্ঘ্রি পঙ্কজরজঃস্নপনং মহান্তো
বাঞ্ছন্ত্যুমাপতিরিবাত্মতমোঽপহত্যৈ।
যর্হ্যম্বুজাক্ষ। ন লভেয় ভবৎপ্রসাদং
জহ্যামসূন্ ব্রতকৃশান্ শতজন্মভিঃ স্যাৎ ॥৭॥"[৩১]

শ্রীরুক্মিণী বললেন,

হে ভুবনসুন্দর। হে অচ্যুত। আপনার যেসকল গুণগ্রাম শ্রোতাদের কর্ণবিবরে প্রবেশ করে অঙ্গের (সংসার) তাপ হরণ করে এবং আপনার যে রূপদর্শনে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণের

৩১। মহানামব্রত ব্রহ্মচারী সম্পাদিত "শ্রীমদ্ভাগবতম্", দশমঃ স্কন্ধঃ, চতুর্থখণ্ড, দ্বারকালীলা (১) দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ, শ্লোক—৪৭-৫৩, পৃষ্ঠা—১০-১১।

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত "আর্য্যশাস্ত্র" পত্রিকায় প্রকাশিত "শ্রীমদ্ভাগবতম্", দশমঃ স্কন্ধঃ, উত্তরার্দ্ধঃ, দ্বিপঞ্চাশঃ অধ্যায়ঃ, শ্লোক—৩৭-৪৩, পৃষ্ঠা—২২৩৮-৪১।

অখিলার্থ অর্থাৎ যাবতীয় কাম্যবিষয় লাভ হয়। সেইসকল গুণ ও রূপের কথা শ্রবণ করে আমার চিত্ত লজ্জা ও ভয় পরিত্যাগ করে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। (১)

হে মুকুন্দ। কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়স, ধন ও প্রভাবে আপনি আপনার নিজেরই তুলনা। হে অনঘ! আপনি নরলোকের মনোরঞ্জনকারী (মনোহরণকারী)। হে নৃসিংহ। এমন কোন্ মহতী ধৈর্যশীলা কুলবতী কামিনী আছে যে যথাকালে আপনার মত ব্যক্তিকে পতিরূপে বরণ না করে? (২)

হে প্রভু! আমি এই কারণেই আপনাকে পতিত্বে বরণ করে আপনাতেই আত্মসমর্পণ করেছি। (অতএব) আপনি এখানে এসে আমাকে আপনার পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। হে অম্বুজাক্ষ! শৃগাল যেমন সিংহের ভোগ্যবস্তু স্পর্শ করতে অগ্রসর হয় না, তেমনি আপনাকে নিবেদিত আমার এই দেহকে চেদিপতি শিশুপাল যেন কখনও স্পর্শ করতে সাহস না করে। (৩)

আমি যদি (জলাশয়াদি খননরূপ) পূর্তকর্ম, (যজ্ঞাদিরূপ) ইষ্টকর্ম, বিবিধদান (সৎপাত্রে হিরণ্যাদি দান), নিয়মপালন, (চান্দ্রায়ণাদি) ব্রতানুষ্ঠান এবং দেব, দ্বিজ ও গুরুর অর্চনাদির দ্বারা ভগবান্ পরমেশ্বরের পর্যাপ্ত আরাধনা করে থাকি, তবে সেই সুকৃতিফলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আপনি এসে আমার পাণিগ্রহণ করুন। দমঘোষ-সুত শিশুপাল প্রভৃতি যেন আমাকে গ্রহণ করতে না পারে। (৪)

হে অজিত! আগামী পরশ্ব আমার বিবাহের দিন। আপনি প্রথমে গুপ্তভাবে বিদর্ভপুরে আসবেন, পরে সৈন্যসামন্তে পরিবৃত হয়ে চেদিরাজ শিশুপাল ও মগধরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতির সৈন্যগণকে বলপ্রয়োগে বিধ্বস্ত করে রাক্ষসবিধানে বীর্যশুল্কা হিসাবে আমাকে বিবাহ করবেন। (৫)

আমি অন্তঃপুরচারিণী। তাই আমাকে হরণ করতে হলে রক্ষকরূপে বিদ্যমান আমার আত্মীয়-স্বজনদেরই হত্যা করতে হবে—আপনি যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেইজন্য আমি এর উপায় বলছি, শুনুন। বিবাহের আগের দিন মহাসমারোহে আমাদের কুলদেবতার উৎসব হয়, এই উপলক্ষে নববধূ পুরের বাইরে অবস্থিতা গিরিরাজনন্দিনী পার্বতীকে দেখবার জন্য তাঁর মন্দিরে গমন করে। (৬)

হে কমললোচন। আপনার শ্রীচরণকমলরজে স্নান করে নিজেদের অজ্ঞানতারূপ অন্ধকার বিনাশের জন্য উমাপতি শিবের ন্যায় মহৎ ব্যক্তিরাও (ব্রহ্মাদি শ্রেষ্ঠ লোকপালরাও) যখন প্রার্থনা করেন, তখন আমি যদি আপনার প্রসাদলাভে বঞ্চিত হই, তবে যতদিন আপনার অনুগ্রহ না হয় ততদিন শত শত জন্ম ধরে উপবাস প্রভৃতি কৃচ্ছ্রব্রতানুষ্ঠানের দ্বারা দেহ ক্ষীণ করে জীবন পরিত্যাগ করব। (৭)

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমিকা রুক্মিণীদেবীর ভাবাবেশে এই সমস্ত কথা বললে উপস্থিত বৈষ্ণব-সমাজ অখিলরসামৃতসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমবিহ্বল হয়ে কখনও কাঁদতে আবার কখনও বা হাসতে লাগলেন। চতুর্দিকে প্রবল হরিধ্বনির রোল উঠল। হরিদাস সবাইকে আহ্বান

করে বললেন, জাগ জাগ জাগ। নারদের বেশে শ্রীবাসপণ্ডিত নাচতে লাগলেন। এইভাবে রাত্রির প্রথম প্রহর অতিবাহিত হল।

মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের কাব্য অবলম্বনে এপর্যন্ত অভিনয়ের যে বিবরণ দিয়েছি, তাতে উভয়কাব্যে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্রাভিনেতার পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও বাচনভঙ্গির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও অভিনেতাদের রঙ্গভূমিতে প্রবেশের ক্রমবিন্যাসে পার্থক্য দেখা যায়। মুরারি গুপ্ত রঙ্গভূমিতে প্রথমে এনেছেন শ্রীবাসপণ্ডিতকে, তারপরে হরিদাস ও সবশেষে অদ্বৈত আচার্যকে। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের রচনায় নান্দীপাঠের পর নাটকের শুরুতে প্রথমে প্রবেশ করেছেন হরিদাস, তারপরে এসেছেন শ্রীবাসপণ্ডিত; অদ্বৈত আচার্য সবসময়েই রঙ্গভূমিতে বর্তমান। আবার বৃন্দাবন দাসের কাব্যে বিস্তৃতভাবে রুক্মিণীচরিত্রে মহাপ্রভুর অভিনয়ের বর্ণনা থাকলেও মুরারি গুপ্তের কাব্যে তার বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত নেই। সেখানে কেবল রমা বা লক্ষ্মীর চরিত্রেই তাঁর অভিনয়ের কথা বলা হয়েছে, যা' বৃন্দাবন দাস পরবর্তী অংশে বলেছেন।

●

।। শ্যামা সঙ্গীত ।।

শ্রীসুরেশ চৌধুরী

আর কেন মা লুকোচুরি
　　এখনও এই বেলার শেষে,
মায়ার খেলা খুব খেলালি
　　এবার দেখা দেমা এসে ॥

পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রেখে
দেখছিলি মা ঘুরে থেকে,
তাও তো যাগো কেড়ে নিলি
　　এসে যাদুকরীর বেশে।
　　এবার দেখা দেমা এসে ॥

পাওনা দেনা নেই কিছু আর
এবার শেষ তোর সাধনার,
তোরই মন্ত্রে তোর পূজামা
　　ভোরাবো চোখের জলে ভেসে।
　　এবার দেখা দেমা এসে ॥

পূজার শেষে অঞ্জলী নে
তোর দেওয়া প্রাণ তোর চরণে,
এই মিনতি, পাঠাস নি আর
　　ছাড়িয়ে স্বদেশ এই বিদেশে।
　　এবার দেখা দেমা এসে ॥

●

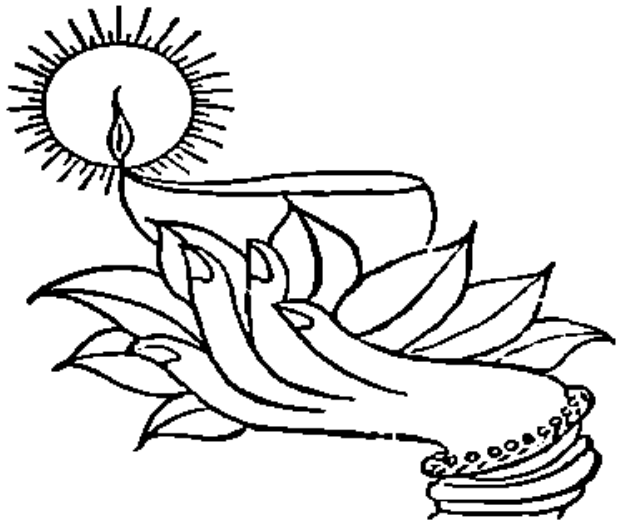

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(পাঁচ)

খ্রীষ্টীয় ষোড়শশতকে ইতালীর অন্যতম প্রধান সিরামিকনির্মাণকেন্দ্র ক্যাস্‌ল্ অব্ ক্যাকাজিরোলো-র অবস্থান ছিলো ফ্লোরেন্স শহরে। এই কেন্দ্রটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ইতালীর এক অভিজাত ও ধনী পরিবার—তাঁরা পরিচিত ছিলেন 'মেডিসি' নামে। বস্তুতঃ ক্যাস্‌ল্ অব্ ক্যাকাজিরোলো-কে মুখ্যতঃ মেডিসি পরিবারের সিরামিক সরবরাহকারী কেন্দ্রও বলা যেতে পারে। অবশ্য য়ুরোপের কয়েকটি দেশে একসময়ে কেবলমাত্র অভিজাত ও ধনবানদের পারিবারিক চাহিদা মেটাবার জন্যে বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রের সৃষ্টি হয়েছিলো। এ'থেকে একটা কথা অনুমান করা যায়, সেকালে বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত ও চিত্রিত উৎকৃষ্ট ধরনের সিরামিক্‌স্ সম্ভবতঃ জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে ছিলো। তাছাড়া সাধারণের রুচিবোধের সীমাবদ্ধতার জন্যেও ওই ধরনের সিরামিক্‌স্ য়ুরোপের ঘরে ঘরে পৌঁছতে পারেনি। উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার যে কোনো নিদর্শন একমাত্র উন্নত রুচিসম্পন্নদের কাছেই সমাদর পেতে পারে, তাছাড়া ওই ধরনের নিদর্শন স্বভাবতঃই মহার্ঘ হয়ে থাকে। এই ধরনের রুচিবান এবং ধনবানদের পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তৎকালীন য়ুরোপের সিরামিক-নির্মাতাদের পক্ষে শিল্পিত সিরামিক্‌স্‌এর উন্নত ধরনের নিদর্শন তৈরী করা সম্ভব ছিলোনা। ক্যাস্‌ল্ অব্ ক্যাকাজিরোলো-তে তৈরী বেসব মাইয়োলিকার নমুনা এযাবত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে—সেগুলোর অধিকাংশই বড়ো আকারের চিত্রিত থালা। এই থালাগুলো কিন্তু খাদ্যবস্তু রাখবার জন্যে ব্যবহার করা হতোনা। মেডিসি পরিবারের অট্টালিকার বসবার ঘরে কিংবা শয়নকক্ষের দেয়ালে ওই চিত্রিত মাইয়োলিকা থালাগুলো অয়েলপেন্টিংএর মতোই ঝুলিয়ে রাখা হতো। কখনো কখনো এগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে না রেখে টেবিলের ওপর ষ্ট্যাণ্ডএর সাহায্যে দাঁড় করিয়ে রাখারও চল ছিলো। এই মাইয়োলিকা থালাগুলো যে বিশেষভাবে

মেডিসি পরিবারের জন্যেই তৈরী করা হয়েছিলো—তার প্রমাণ পাওয়া যায় থালাগুলোর অলংকরণে মেডিসি পরিবারের পারিবারিক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহারে। থালাগুলোর কিনারায় ঘর্ডার অলংকরণে শিল্পীরা ইতালীয় শিল্পকলার প্রখ্যাসিদ্ধ বিষয়বস্তু (motif) ব্যবহার করেছেন। এসব মোটিফ্-এর মধ্যে রয়েছে নানান্ ধরনের বিজয়চিহ্ন (trophy) এবং মধ্যপ্রাচীয় কিংবা আরবদেশীয় (arabesque) নকশা। কিছুসংখ্যক থালা চিত্রিত হয়েছে 'ইন্‌টোরিয়ান্ রীতিতে'—অর্থাৎ ইতালীয় প্রাচীন দেয়ালচিত্র এবং তৈলচিত্রের রীতিতে। এক বিশেষ ধরণের উজ্জ্বল লাল রঙ এসব চিত্রণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরণের লাল রঙ ইতিপূর্বে ইতালীয় মাইয়োলিকাচিত্রণে ব্যবহার করা হয়নি। লাল রঙ উচ্চ তাপে—এমনকি মধ্যম তাপেও অবিকৃত রাখা সম্ভব নয়। নিম্ন তাপেও লাল রঙএর ঔজ্জ্বল্য যে সব ক্ষেত্রে বজায় রাখা সম্ভব হয়নি—তার প্রমাণ রয়েছে উল্লিখিত মাইয়োলিকা থালার 'এনামেল' অথবা 'ওভারগ্লেজ' লাল রঙএর অলংকরণে। সিরামিক্‌স্‌ও সাদা শ্লেষ লাগিয়ে যথোপযুক্ত উত্তাপে চুল্লীতে পোড়ানোর পর ওই সাদা শ্লেষএর জমির ওপর নিম্নতাপসহ যে-রঙ এ অলংকরণ করে পুনরায় চুল্লীতে আরও একবার পুড়িয়ে নেওয়া হয়ে থাকে—সেই নিম্নতাপসহ রঙকেই 'এনামেল' অথবা 'ওভারগ্লেজ' রঙ বলা হয়। এনামেল রঙ 'মাফ্‌ল্ ফারনেস্'এ (muffle furnace) অর্থাৎ চারিদিক বন্ধ বাক্সের মতো চুল্লীতে ৮৫০° থেকে ৭৫০° সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে পোড়ানো হয়ে থাকে।

ইতালীর অন্যতম মাইয়োলিকা-উৎপাদনকেন্দ্রগুলো সিয়েনা শহরের নামের উল্লেখ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে লেখা ইতালীয় ভাষার একটি বইতে পাওয়া যায়। বইটিতে একথাও লেখা রয়েছে, সিয়েনা-র মাইয়োলিকা-উৎপাদনকেন্দ্রের চুল্লীগুলোর চিমনিনিঃসৃত ধোঁয়া সমগ্র শহরের আবহাওয়াকে একসময়ে দূষিত করে তুলেছিলো। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে সিয়েনায় নির্মিত মাইয়োলিকার কোনো নিদর্শন কিন্তু এপর্যন্ত পাওয়া যায়নি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ইতালীর অভিজাত ও ধনবানদের অন্যতম মাত্তেস্‌ত্রো বেনেত্তো সিয়েনায় একটি মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্র স্থাপন করেন। এখানে নির্মিত অতি অল্প সংখ্যক মাইয়োলিকার নিদর্শন এপর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। নিদর্শনগুলোর চিত্রণ এবং অলংকরণে সবুজ ও লালচে খয়েরি রঙএর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ইতালীর বিখ্যাত হেলানো টাওয়ারএর শহর পিসা-য় একসময়ে মাইয়োলিকা তৈরী হতো বলে জানা যায়। তবে ষোলোশো খৃষ্টাব্দের পূর্বে পিসাতে কোনো মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্র ছিলো কিনা—সে সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে সক্ষম হননি। সিরামিক বিশেষজ্ঞ জর্জ ভাসেজএর মতে ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে পিসায় মাইয়োলিকা নির্মিত হয়ে থাকলেও তার কোনো নিদর্শন এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

আরও একটি মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্র ছিলো মন্টিলুপো শহরে। এখানে তৈরী কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা পাওয়া গেছে, যেগুলো খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিলো বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই মাইয়োলিকাগুলো অপেক্ষাকৃত

নিকৃষ্ট মানের। পাত্র এবং থালায় চিত্রিত হয়েছে বিভিন্ন ধরনের পোষাকপরিহিত যোদ্ধাদের প্রতিকৃতি। যেসব রঙ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে—তার মধ্যে প্রধানতম রঙ হচ্ছে গাঢ় হলদে বাদামী। পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে মন্টিলুপো-তে যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হতো—তার অধিকাংশই চালান হয়ে যেতো ফ্লোরেন্স শহরে। ফ্লোরেন্সএর অভিজাত ধনীরাই ছিলেন মন্টিলুপো-র মাইয়োলিকার প্রধান ক্রেতা।

আমব্রিয়া প্রদেশের ডেরুটা শহর ছিলো টাইবার নদীর ধারে। প্রথম শ্রেণীর মাইয়োলিকার নির্মাণকেন্দ্ররূপে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে ডেরুটা-র খ্যাতি ইতালীতে প্রচারিত ছিলো। যদিও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ডেরুটায় পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতকের পূর্বেও উচ্চশ্রেণীর মাইয়োলিকা নির্মিত হতো, কিন্তু তৎকালীন মাইয়োলিকার কোনো নিদর্শন আজ পর্যন্ত সংগৃহীত হয়নি। সিনারে বোর্গিয়ো নামে এক অভিজাত ও অর্থশালী ব্যক্তি ডেরুটার মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়। জর্জ ক্যাস্তেলএর মতে পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতকে ডেরুটায় নির্মিত মাইয়োলিকার নিদর্শনগুলো নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। প্রায় একই সময়ে ইতালীর অন্যান্য কয়েকটি মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্রে যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হতো—সেগুলো ডেরুটার মাইয়োলিকার সঙ্গে গড়ণ ও অলংকরণে প্রায় অভিন্ন। বিশেষজ্ঞরা ডেরুটায় নির্মিত মাইয়োলিকার নিদর্শনগুলোকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মাইয়োলিকাগুলো অলংকৃত হয়েছে বিভিন্ন বর্ণের লাস্‌চার (lustre)-এ (এ বছরের পৌষ সংখ্যা 'বিশ্ববাণী'তে লাস্‌চার সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাইয়োলিকার অলংকরণ করা হয়েছে উচ্চ এবং মধ্যতাপসহ বিভিন্ন বর্ণের সিরামিক-রঙএ। ইতালীয় মাইয়োলিকার ইতিহাসে ডেরুটা শহরের বিশেষ গুরুত্ব হয়েছে। কারণ লাস্‌চারমণ্ডিত মাইয়োলিকা নাকি সর্বপ্রথম ইতালীর ভূখণ্ডে এই ডেরুটাতেই নির্মিত হয়েছিলো। গোড়ার দিকে ডেরুটাতে যেসব লাস্‌চারমণ্ডিত মাইয়োলিকা তৈরী করা হতো—তাতে ব্যবহৃত হতো হালকা হলুদ বর্ণের লাস্‌চার। এই হালকা হলুদবর্ণের লাস্‌চারএর ব্যবহার ইতিপূর্বে দেখা গেছে স্পেনের 'হিস্‌পানো মোরেস্‌ক্‌' নামে খ্যাত মাইয়োলিকায়। এই লাস্‌চার তৈরী করা হতো রূপো থেকে। পরবর্তীকালে ডেরুটায় যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হয়েছে—তাতে অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে গাঢ় লাল এবং জলপাই সবুজ বর্ণের লাস্‌চার। অপর একটি বিষয়ে ডেরুটার লাস্‌চার অলংকৃত মাইয়োলিকার সঙ্গে স্পেনীয় লাস্‌চারঅলংকৃত মাইয়োলিকার অভিন্নতা চোখে পড়ে। সেটি হচ্ছে মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালার অবতল এবং উত্তল দিকের অলংকরণ। এ ধরনের অলংকরণে পাত্র অথবা থালার অবতল দিকের মতো উত্তল দিকেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম নকশার অলংকরণ চোখে পড়ে। অবশ্য এ ধরনের লাস্‌চার-অলংকরণ দেখা যায় কাস্তেলদ্যা, ক্যাপ্টেল ডুরান্টে, ক্যাকাব্রিয়োলো প্রভৃতি ইতালীর অন্যান্য মাইয়োলিকা-নির্মাণকেন্দ্রে তৈরী মাইয়োলিকাতেও। অন্য এক ধরনের অলংকরণ ও ডেরুটায় লাস্‌চার চিত্রিত মাইয়োলিকায় লক্ষ্য করা যায়। এধরনের অলংকরণে পাত্র এবং থালার অবতল দিকটিতেই কেবলমাত্র অলংকরণ করা হয়েছে, উত্তল দিক অর্থাৎ বাইরের দিকে কোনো অলংকরণই

করা হয়নি, কেবলমাত্র স্বচ্ছ গ্লেজ লাগিয়ে পোড়ানো হয়েছে। শেষোক্ত ধরনের অলংকরণেও স্পেনের প্রভাব রয়েছে বলে শিল্পসমালোচকরা মনে করেন। বার্নার্ড র‍্যাক্‌হামের মতে এধরনের মাইয়োলিকায় যে-লাল্‌চে বাদামী রঙএর অলংকরণ দেখা যায়—সেই লাল্‌চে বাদামী রঙ আসলে মাইয়োলিকা পাত্র অথবা থালার মাটির আসল রঙ। অর্থাৎ সাধারণ মাটিতে তৈরী পাত্র কিংবা থালার ওপর লাগানো সাদা এন্‌গোব্ অথবা গ্লেজএর গায়ে আঁচড় কেটে অলংকরণ করবার ফলে এন্‌গোব্ গ্লেজ সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে পাত্র অথবা থালার জমির আসল রঙ—অর্থাৎ লাল্‌চে বাদামী পোড়ামাটির রঙ। ডেরুটার মাইয়োলিকা থালার জমিতে সাদা এন্‌গোব্ কিংবা গ্লেজএর বদলে কখনও কখনও কমলা রঙএর এন্‌গোব্ অথবা গ্লেজ ব্যবহার করা হয়েছে। রেখাচিত্র আঁকা হয়েছে হাল্‌কা নীল রঙএ, নকশার জমি ভরাট করা হয়েছে জোগালো হলুদ, নীল এবং বাদামী রঙএ। কখনও কখনও সমগ্র নকশাটির ওপর হালকা নীল রঙএর 'ওয়াশ' (wash) দিতেও দেখা যায়। ডেরুটার নির্মিত যেসব মাইয়োলিকা থালা এবং বিভিন্ন আকারের পাত্র খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ কিংবা ষোড়শ শতকের বলে নির্ধারিত হয়েছে—তাতে যে-বর্ডারএর নকশা দেখা যায়—সেই নকশার মোটিফ্‌এ প্রধানতঃ স্থান পেয়েছে ফুল ও লতাপাতা। মাছের আঁশএর আকৃতির সাদৃশ্যযুক্ত অলংকরণও এই মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালাতে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক পর্যন্ত ডেরুটার নির্মিত মাইয়োলিকার গড়ন এবং অলংকরণ উন্নত ধরনের ছিলো। বিশেষজ্ঞদের মতে পরবর্তী কাল থেকে ডেরুটার মাইয়োলিকার গড়ন ও অলংকরণে ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

।। সংঘবার্তা ।।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব

গত ১৯ ও ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামকৃষ্ণ বেলুড়মঠে স্বামীজীর ১১৭-তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি দিয়ে শুরু এবং সাধারণ-ধর্মসভার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। উদ্বোধনী ভাষণে স্বামী প্রজ্ঞানন্দজী মহারাজ বলেন, স্বামীজী সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্যে ভেবেছিলেন। তাঁর বাণী রূপায়িত করলে সর্বসমস্যার সমাধান হতে পারে। কর্মজীবনকে পবিত্র উন্নত করবার জন্যে তিনি যে-আদর্শ প্রচার করেছিলেন তা সত্যিই অপূর্ব। বিশ্বের সাধারণ থেকে রাজা-প্রজা প্রত্যেকের জন্যই তিনি ভেবেছেন। তাঁর অবদান বহুমুখী, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁকে চেনা কত কঠিন।

অনুভূতিই মানুষের উদ্দেশ্য। প্রত্যেকের মধ্যে সুপ্ত সেই চেতনাকে জাগাতে হবে। এই নতুন ভাবনা স্বামীজী ও তাঁর গুরু শ্রীশ্রীঠাকুর বর্তমানে দিয়েছেন। এইকথা বোঝাতে পারলে নিশ্চিত সমাজই এক আদর্শ ও সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করবে।

ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী বলেন, স্বামীজী নিজের জীবনে যা উপলব্ধি করেছিলেন সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি সবকিছু বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তা নিজের জীবনে প্রমাণিত করেছেন। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন। মানবিক কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা তিনি চেয়েছিলেন। তাঁর বাণী গ্রহণ করলে ভারতের সব ভেদাভেদ দূরীভূত হবে। তিনি যে মানুষকে ভালবেসেছিলেন তা তিনি জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন। তিনি মানুষকে দেবতা বলেছিলেন।

অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার বলেন, স্বামীজী তাঁর অনুভূত সত্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল সর্বত্র প্রসারিত। মানুষের একটিমাত্র দিক নয়; বৈচিত্র্যময় দিক নিয়ে মানুষ। এইসবগুলির বিকাশসাধনই কাম্য। তিনি চেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক প্লাবনে যতকিছু মলিনতা দূরীভূত হোক। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, ভারতীয় আদর্শ শুধু ভারতবাসীর জন্যে নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। তাই, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায়ই জগৎবাসী তাঁর বাণী শুনেছে। জড়বাদী সমাজ থেকেও আমাদের শিক্ষণীয় আছে। তাই, বিজ্ঞানচর্চার জন্য তিনি ভারতবাসীকে বলেছিলেন। একমাত্র আধ্যাত্মিকতা নিয়েই যদি তিনি থাকতেন তবে ভারতের এই রূপ আমরা দেখতে পেতাম না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলন তিনি চেয়েছিলেন। জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের মিলনেই প্রকৃতরূপে দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত হতে পারে।

কারিগরি উন্নয়নের সাথে সাথে যদি আমরা আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করতে পারি তবে পরিপূর্ণতা আসবে। জড়বাদীরা আমাদের গ্রাস করত যদি না স্বামী বিবেকানন্দ ঐসময়ে আমাদের মধ্যে আসতেন। তিনি আত্মশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বন্ধন থেকে মুক্তি এনেছেন, ভয় থেকে সাহস এনেছেন। সন্ন্যাসীর পিছনে যে বিরাট কর্মবাদী বিবেকানন্দ তাঁকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দম্ শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। শান্তিপাঠ করেন স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ। ধন্যবাদ জানান এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ।

●

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

Madhusudan Nundy & Sons

MAIN DEALER

THE VAZIR SULTAN TOBACCO CO. LTD.

PUNDUA.
DIST. HOOGHLY.

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-14

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

Phone : 44-1170

Space donated by :

M/s. Radha Industries.

30/1, Dr. SURESH SARKAR ROAD,

CALCUTTA-700 014

★

FOUNDERS & MECHANICAL ENGINEERS.

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে

বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্বত্র প্রাপ্তব্য

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

৪০১/৭ এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিজ্ঞানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : বার টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২২·০০	সুলেখক শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অবয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২০·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৪·০০	বাংলার ঋষি	৬·৫০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিপ্লবী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

daCunha/BOI/3

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বপ্রকারসমন্বিত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫১)

শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র উপযোগী অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

১৯৩০ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। **গীতাধ্যান** (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। **গৌরীকথা** (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। **চণ্ডীচিন্তা** ৪·০০
৪। **উদ্ধব-সন্দেশ** ৫·০০
৫। **শ্রীমদ্ভাগবতম** ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। **মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ** ৫·০০
৭। **উপনিষদ্-ভাবনা** (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীচরিতা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3·00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanished and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year, April 1980
VOL. II

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

21 APR 1980

2 APR 1980

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

কুক্‌মী

ভারতের সেরা

গুঁড়া মশলা

বিশেষ দ্রষ্টব্য - জনপ্রিয় কুক্‌মী প্যাকেটের লেবেলে কুক্‌মী নামের সঙ্গে অন্য কোনও ব্রাণ্ডের নাম যুক্ত নাই এবং আমাদের কোনও ব্রাঞ্চ নাই।

চীনতম মশলা ব্যবসায়ী ফোন-৩৩-০১১৫
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (ক্ষাইস) প্রাইভেট লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলিকাতা-৭

ICE Rs. 1·50 Ramakrishna Vedanta Math.
19-B. Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006.
মূল্য ১·৫০ টাকা

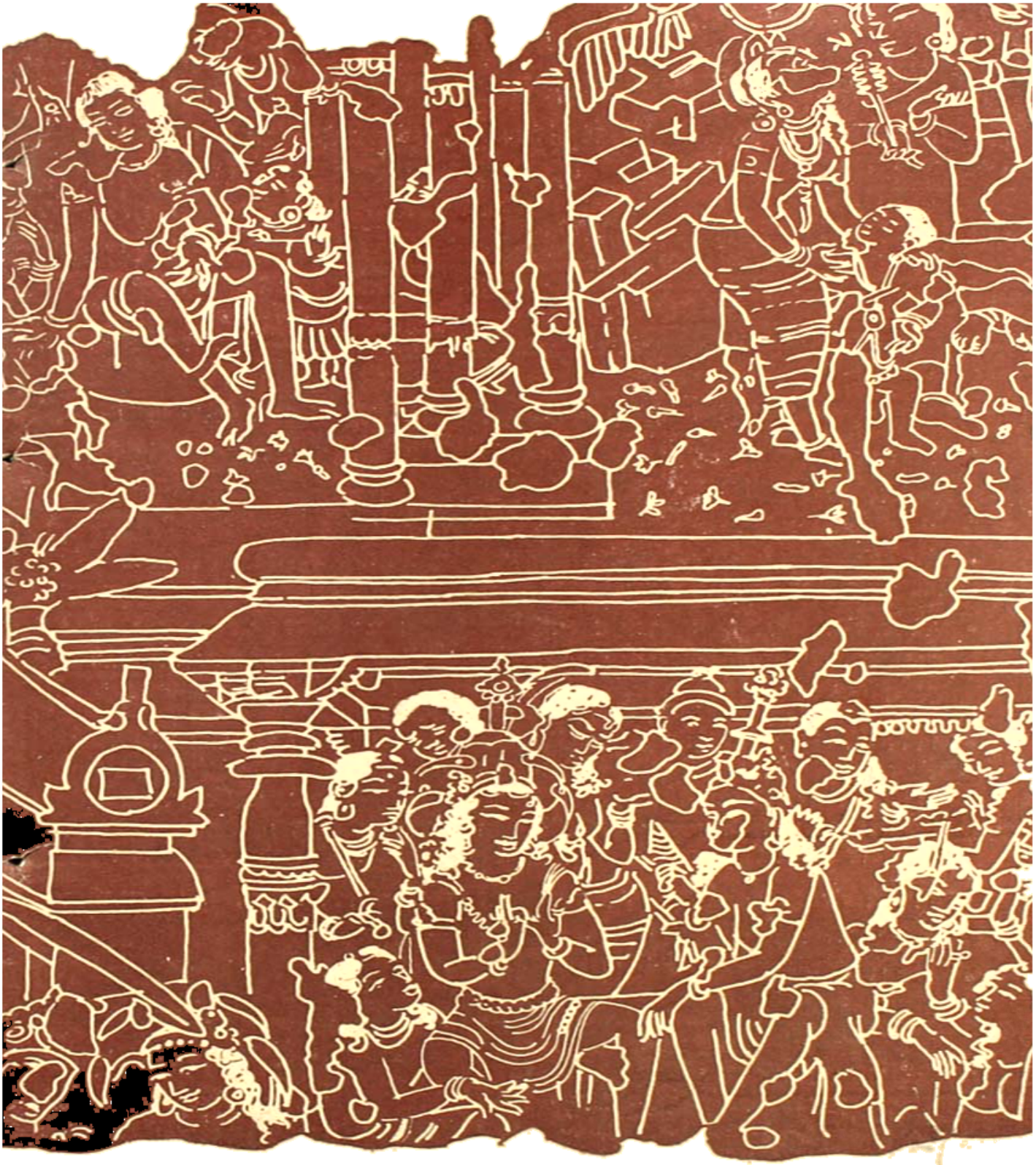

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহঃ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
তৃতীয় সংখ্যা
বৈশাখ
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাকে ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্ত্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্ত্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারনে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৫ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা তত্ত্ব-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৫·০০

বীরত্বে বাঙ্গালী ৪·০০

বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ৮·০০

বাংলার ঋষি ৬·৫০

বাংলার মনীষী ৩·০০

বাংলার বিদুষী ৪·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

ঘাম্বতীয় পেটেন্ট পীড়াহর

ডাঃ সেন্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু, সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JECT" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস গারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৪৭, ফোন : ৪৫-১৮০০

চৈত্রশেষ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীবীরেশ্বরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন সোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধ দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এ'টি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকোষ্ঠনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

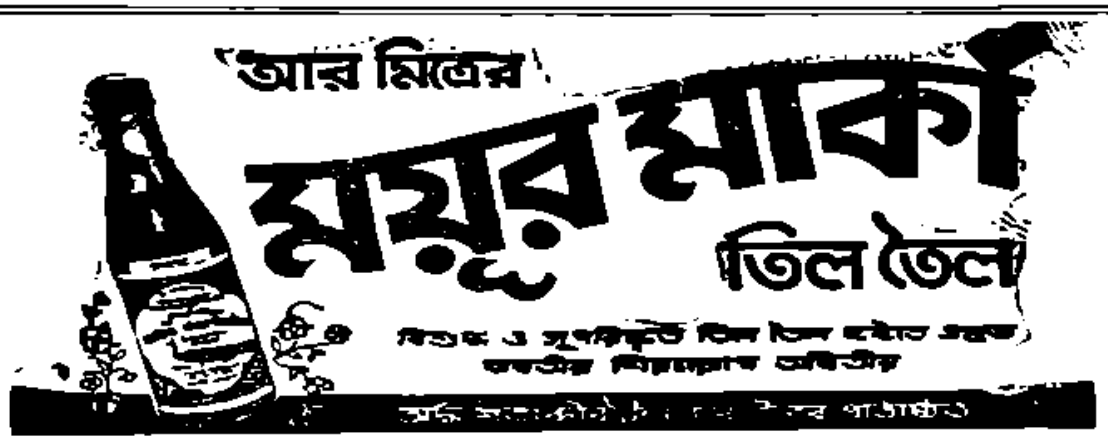

ফোন নং ৪৬-৮৪১৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

বৈশাখ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	১১৭	
২।	জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাগুরু	১২৬	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১২৯	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪।	বিবেকানন্দ-মনোলোকে সমাজ-বিকাশের ধারা	১৩৩	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৫।	ভারতাত্মা-স্বামী বিবেকানন্দ	১৩৫	নচিকেতা ভরদ্বাজ
৬।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	১৪০	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৭।	হে রুদ্র বৈশাখ	১৪১	শ্রীঅজিতকান্তি সরকার
৮।	পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা —স্বামী অভেদানন্দ	১৪২	অনুবাদক : শ্রীকৃপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৯।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	১৪৫	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১০।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম উপন্যাস' কি 'তত্ত্বমূলক'	১৪৯	ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১১।	মীরার কৃষ্ণভাবনা	১৫৩	ডঃ শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
১২।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	১৫৭	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১৩।	আলমোড়া ভ্রমণ	১৬২	শ্রীসুকুমার সাণ্ডাল
১৪।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	১৬৪	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৫।	সংঘবার্তা	১৬৬	

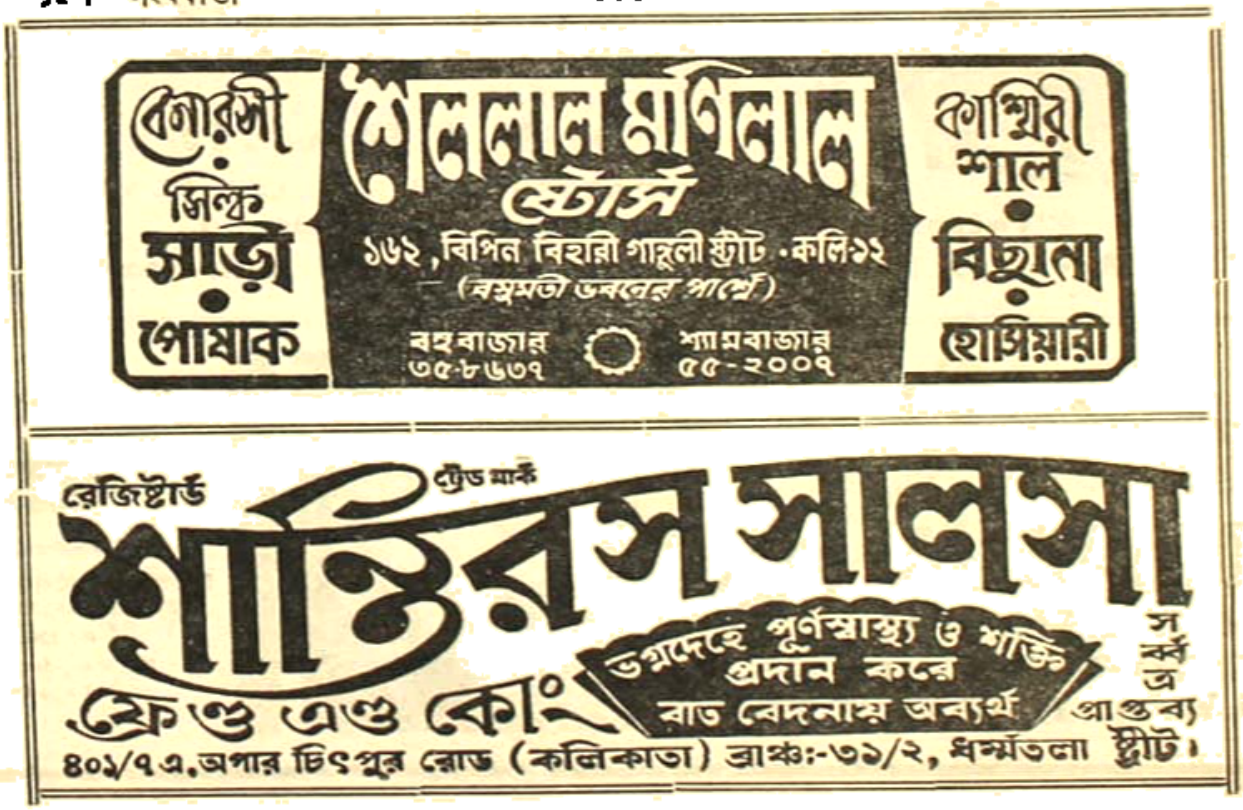

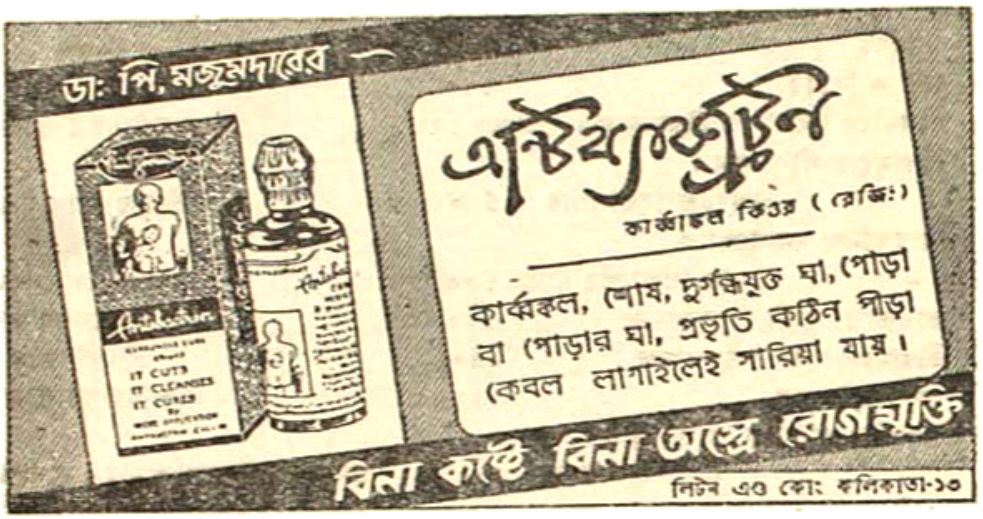

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, MALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

Netaji Subhas Road

Calcutta-1

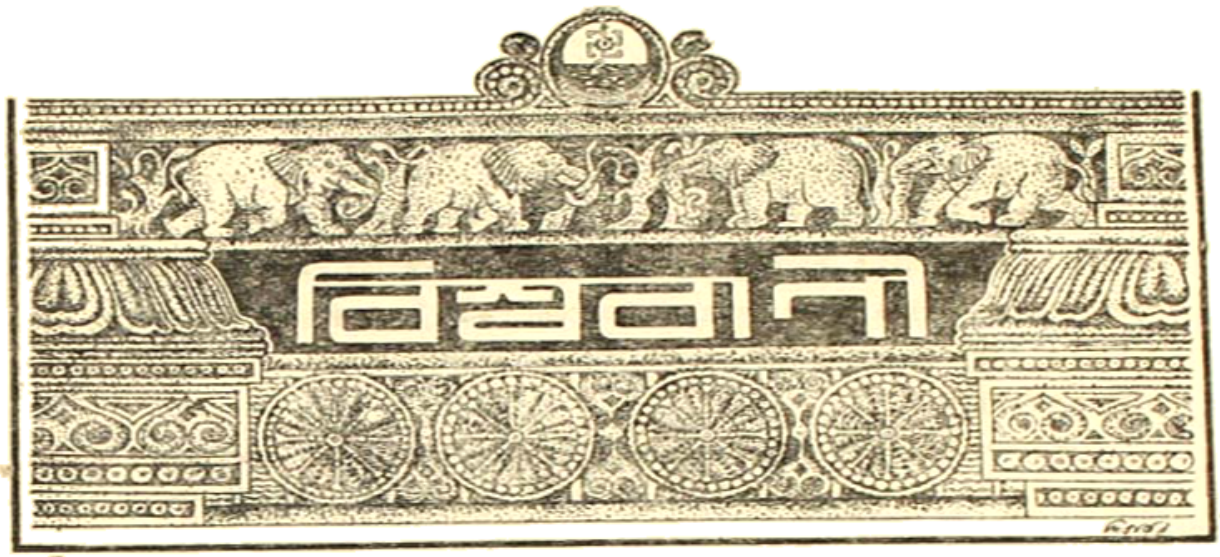

বিয়াল্লিশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা | বৈশাখ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

॥ বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রে শুদ্ধাচার ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। বেদ-পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ-পুরাণে যা ব'লে গেছে,—কোরো না, অনাচার হবে'—তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে……।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ (১৩৬৬), পৃঃ ১২৭

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সকল কথার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার পূর্বে শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় এ'সকলের শিরোনামায় যে বলেছেন : **'পূর্বকথা—প্রথম উদ্যমে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদ-বুদ্ধি ত্যাগ ··'** প্রভৃতি কথা তার আলোচনা করবো প্রথমে। গ্রন্থের মাষ্টার মহাশয় বলেছেন —'পূর্বকথা'। এই পূর্বকথা কি—সে'কথা জানতে হলে আমাদের শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থের প্রথম ভাগে উল্লিখিত 'পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, সাধকভাব এবং গুরুভাব-পূর্বার্ধ'-আলোচনাকে স্মরণ করতে হবে। গ্রন্থের 'পূর্বার্ধ'-অংশে আলোচিত অষ্টম অধ্যায়ে ও ষোড়শ অধ্যায়ে উল্লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের ঘটনাবলীকে আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। ঐ দুটি অধ্যায়ের মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ যে 'প্রথম চারি বৎসরের শেষকথা' আলোচনা করেছেন,—তারই কিছু-কিছু অংশ এখানে স্মরণ করার বিষয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের অষ্টম অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন : "পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম ১২৬২ হইতে ১২৬৫ চারি বৎসর—সেকালের

প্রধান প্রধান কথার ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয় ১২৬১ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত চারি বৎসর—সে সময়ের শেষ দুই বৎসরাধিক কাল ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানা প্রধান তন্ত্রনির্দিষ্ট সাধনসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয় ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্যন্ত চারি বৎসর—যে কালে তিনি জটাধারী নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন।.....উক্ত ষোড়শ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত 'সখী'-ভাবের এবং কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণবমতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধনমার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন"।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ষোড়শ বৎসরকালের সাধনকে ৪/৪ অংশে ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন—

(১) ১২৬২—১২৬৫,

(২) ১২৬৬—১২৬৯,

(৩) ১২৭০—১২৭৩ বৎসরগুলি।

(১) যে বৎসরগুলির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনলাভ হয় শ্রীশ্রীজগদম্বা ভবতারিণীর এবং রাগাত্মিকা বা রাগাত্মগা-ভক্তির পূর্বপ্রকাশ ঘটে, ভক্তির পরিণতিতে বাহ্যপূজা-ত্যাগ হয় প্রভৃতি।

(২) পরে সিদ্ধসাধিকা যোগেশ্বরী-ব্রাহ্মণীর সহায়তায় বাঙলাদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্রোক্ত সাধনা এবং (৩) পরে 'জটাধারী' রামাইত সাধুর কাছে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন। পরে ঐ বিগ্রহকে জীবন্ত দেবতারূপে চিন্তা ও বিগ্রহের সঙ্গে বিচিত্র ব্যবহার এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের সাধনা করেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছ'মাসকাল স্ত্রীবেশ ধারণ করেন, অদ্বৈতবেদান্তী শ্রীতোতাপুরীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে নির্বিকল্পসমাধিতে প্রতিষ্ঠালাভ করেন এবং অদ্বৈতবেদান্তের চরমভূমিতে আরোহণ ক'রে এবং প্রতিষ্ঠিত থেকে আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বজীবকে ও বস্তুকে এক ও অখণ্ড ব্রহ্মরূপে দর্শন (প্রত্যক্ষ অনুভূতিলাভ) করেছিলেন। পরে পুনরায় সকল সাধনমার্গের চরম-অনুভূতির মান ও সার্থকতা নির্ণয় করার জন্য গোবিন্দ রায়ের কাছে ইস্‌লাম বা মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হয়ে সাধন-ভজন করেছিলেন। সুতরাং বিচিত্র রকমের সাধনার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিচিত্র রকমের সিদ্ধির রূপের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এই সকল রকম সাধনার সময়ে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্দেশ লাভ করেছিলেন 'ভাবমুখে' থাকার জন্য।[১] তাছাড়া

১। 'ভাবমুখে'-থাকার নির্দেশ শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাশক্তিরূপিণী শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। 'ভাবমুখে থাকা' বলতে সত্তামাত্রের প্রভৃতি ভাবকে আশ্রয় ক'রে সমাধি থেকে ব্যুত্থিত অবস্থায় মায়ার সংসারে মনের অতীত হয়ে থাকা। এই ভাবমুখে থাকার কথায় কোন কোন সমালোচক মুখর হয়ে ওঠেন, কেননা শাস্ত্রপাঠের পাণ্ডিত্যে তাঁরা জ্ঞানী, যথার্থ ব্রহ্মানুভূতির হিটেফোটাও জীবনে লাভ করেন নি। এ'কথা সত্য যে, ভাবমুখে থাকার সময়ে সিদ্ধসাধকদের নিজের কোনো ইচ্ছাই থাকে না, তখন ভাগবতী-ইচ্ছাতেই তাঁরা নিয়ন্ত্রিত হন।

এ'সময়েই প্রায় তিনি পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা ক'রে নিয়মিতভাবে সাধনানুশীলনের প্রেরণাও লাভ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের (পূর্বার্ধ) ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন : 'বেদান্তসাধনের শেষকথা ও ইসলামধর্মসাধন'। তারপর তিনি লিখেছেন : "অদ্বৈতভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়েরও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম-উদ্দেশ্য।...অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন—'উহা শেষকথারে—শেষকথা। ঈশ্বরপ্রেমের চরম-পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধক-জীবনে স্বতই আসিয়া উপস্থিত হয়: জানিবি—সকল মতেরই উহা শেষকথা এবং যত মত তত পথ" (পৃঃ ৩০৭)।

অদ্বৈতব্রহ্মানুভূতির রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠ হ'লে মানুষ দেবমানুষে রূপান্তরিত হয় এবং সাধারণ পার্থিব-দৃষ্টি তখন অসাধারণ অপার্থিব দিব্যদৃষ্টিতে বা ব্রহ্মদৃষ্টিতে পরিণত (রূপান্তরিত) হয়। সাধারণ মানুষী-দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল-কিছুকে বাস্তব জড়বস্তু বলেই মনে হয়, আর অসাধারণ ব্রহ্মদৃষ্টিতে চৈতন্যদৃষ্টির স্ফুরণ হয়, তখন সিদ্ধসাধক সকল-কিছুকেই চৈতন্য বলে দেখেন। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের দ্বিতীয়ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে গুরুভাবের পূর্বপ্রকাশরূপ দিব্যানুভূতি-সম্বন্ধে লিখেছেন : "আমরা মানুষটাকে মানুষ বলিয়া, গরুটাকে গরু বলিয়া, পাহাড়টাকে পাহাড় বলিয়াই কেবল জানি। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখিতেন—মানুষটা, গরুটা, পাহাড়টা মানুষ, গরু ও পাহাড় বটে, অধিকন্তু আবার দেখিতেন—সেই মানুষ, গরু ও পাহাড়ের ভিতর হইতে সেই জগৎকারণ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ উঁকি মারিতেছেন।...সেজন্যই ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছি—'দেখি কি—যেন গাছপালা, মানুষ, গরু, ঘাস, জল সব ভিন্ন ভিন্ন রকমের খোলগুলো! বালিশের খোল যেমন হয়, দেখিস নি? কোনোটা খেরোর, কোনোটা ছিটের, কোনোটা বা অন্য কাপড়ের;—কোনোটা চারকোণা, কোনোটা গোল—সেই রকম। আর বালিশের ঐ সবরকম খোলের ভেতরে যেমন একই জিনিস তুলো ভরা থাকে—সেইরকম ঐ মানুষ, গরু, ঘাস, জল, পাহাড়, পর্বত সব খোলগুলোর ভেতরেই সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ রয়েছেন। ঠিক ঠিক দেখতে পাই যে, মা যেন নানারকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানারকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন! একটা অবস্থা হয়েছিল—যখন সদা-সর্বক্ষণ ঐরকম দেখতুম" (পৃঃ ১৬৮-১৬৯)।

পুনরায় শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের প্রথমভাগে (পূর্বার্ধে) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ অদ্বৈত-ভূমির প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবনে জাতিবর্ণনির্বিশেষে চৈতন্যদৃষ্টির সঙ্গেসঙ্গে অসাম্প্রদায়িক-উদার-জ্ঞানের বিকাশ-সম্পর্কে লিখেছেন : "ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল।...কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে (অপরের মধ্যে) অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন" (প্রথমভাগ, পৃঃ ৩০৭)।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হৃদয় বা অন্তর ঐ সময়ে পরিপূর্ণভাবে উদার-ভাবসম্পন্ন হয়েছিল—যে উদার ও সমদৃষ্টির মধ্যে ছোট-বড়, ধনী-নির্ধন ও জাতি-বর্ণ-বিভাগের কোন বালাই ছিল না, ছিল একমাত্র পরিপূর্ণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম। তাছাড়া ঐসময়ে দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ও বিভিন্ন সাধনপথের পথিক এসে সমবেত হতেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুর সকলের সঙ্গে মিশে ও মত-বিনিময় ক'রে বুঝেছিলেন যে, ধর্ম ও সাধনপথ ভিন্ন ভিন্ন হলেও সকলের চরমলক্ষ্য এক ও অভিন্ন। তাই বিচিত্রমতে ও বিচিত্রপথে অগ্রসর হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক ও অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ভগবানকে লাভ ক'রে জীবনে অপার্থিব আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকতেন নিজে ও আনন্দে ভরপুর করতেন সকলকে—যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে আসতেন।

এইসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে আর একটি বিবর্তনময় অনন্যঘটনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এইসময়ে সুফী সম্প্রদায়ের গোবিন্দ রায়ের নিকট ইসলামধর্মে দীক্ষিত হন ও ইস্‌লামধর্মের অনুযায়ী সাধনভজন করতে থাকেন।

শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে (প্রথমভাগে, পৃঃ ৩০৮) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন : "গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে ধর্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত—ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন।···গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধহয়, ইস্‌লামের সুফী-সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশদিগের মতো তিনি (গোবিন্দ) এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন"। দরবেশ বাউলদেরই তৃতীয় অবস্থা—'আউল বাউল দরবেশ সাঁই, তার পরে আর কিছু নাই'। সাঁই অর্থে স্বামী।

কিন্তু সাধারণ মানুষের মনে এখানে বিচিত্র প্রশ্নের অবকাশ থাকতে পারে এজন্য যে, শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গের প্রথমভাগে (পূর্বার্ধে) শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমতসম্বন্ধে লিখেছেন : "অদ্বৈতবাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন—'উহা (অদ্বৈতভূমি) শেষকথা রে—শেষকথা" (পৃঃ ৩০৭)। সুতরাং অদ্বৈতসাধনা ও অদ্বৈতানুভূতি যদি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার শেষকথা ও চরমকথা হয় তবে অদ্বৈতানুভূতির পর পুনরায় গোবিন্দ রায়ের কাছে ইস্‌লামধর্মে দীক্ষা লাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পক্ষে মুসলমানধর্মে সাধনা করার সার্থকতা কি থাকতে পারে ? অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ' প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন নিজে। শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গে (প্রথমভাগে, পূর্বার্ধে) লিখেছেন : "প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং···। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইস্‌লামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন—'ইহাও তো ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্তলীলাময়ী মা এ'পথ দিয়াও তো কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন—তাহা দেখিতে হইবে; গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এই ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব" (পৃঃ ৩০৯)। সুতরাং সেই ইস্‌লামধর্মসাধনাও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে পরীক্ষামূলক সাধনা। তিনি তাঁর জীবনে বিচিত্র সাধনা পরীক্ষা ক'রে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে,—'যত মত,

ভক্ত পথ, কিন্তু সকলের লক্ষ্য যে ঈশ্বরলাভ—তা এক ও অভিন্ন'। ভারতে বিশেষ ক'রে তদানীন্তন বৃহত্তর-বাঙলার বিচিত্র মত ও পথের মধ্যে ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সঙ্ঘাতকে সমন্বয়দৃষ্টি দিয়ে একতাসূত্রে ও উদারতার বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্যই সর্বসমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণের ভারতভূমিতে আবির্ভাব হয়েছিল। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ১৯৭) লিখেছেন: "পূর্বকথা—প্রথম উন্মাদে ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদবুদ্ধি ত্যাগ"। ঈশ্বরীয়ভাবের উন্মাদনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের জীবনে বিচিত্র জীবনে বিচিত্র ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে পরিশেষে অদ্বৈতসাধনার উত্তুঙ্গশিখরে সর্বজীবে ও সকল বস্তুতে—চেতনে ও অচেতনে - ব্রহ্মদৃষ্টি লাভ করেছিলেন এবং সেই পরমলাভ শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে পরম-উদারদৃষ্টির ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জাতিবর্ণনির্বিশেষে নির্বৈর ও উদার-সমব্যথানুভূতির অপর নামই ব্রহ্মদৃষ্টি। সুতরাং শ্রীম তাঁর বিষয়ালোচনার শীর্ষভাগে যে উল্লেখ করেছেন: 'পূর্বকথা—প্রথম উন্মাদে (বা অধ্যাত্মভাবোন্মাদে) ব্রহ্মজ্ঞান ও জাতিভেদ-বুদ্ধিত্যাগ'—একথার সত্যতা বা যাথার্থই প্রমাণিত হয়েছে।

পূর্বকথার অবসরে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের খাদ্যাখাদ্যের বাচ-বিচার-সম্পর্কে পূর্বপ্রসঙ্গেরই পরিচয় পাই: "আমার কামারবাড়ির (ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিম্নস্তরের বা নীচজাতি কামারদের বাড়ীর) রান্না দাল (ডাল) খেতে ইচ্ছা ছিল—ছেলেবেলা থেকে কামাররা বলতো—'বামুনরা কি রাঁধ্‌তে জানে?' তাই খেলুম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ (সকলের হাস্য)।" (এখানে মাষ্টার মহাশয় কামার-প্রসঙ্গে পাদটীকায় উল্লেখ করেছেন: 'ঠাকুর তাঁহার ভিক্ষামাতা ধনী-কামারাণীর বাড়িতে গিয়াছিলেন'। ধনী-কামারাণী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভিক্ষামাতা ছিলেন, কিন্তু তাহ'লেও তাঁর দেহের মধ্যে বিশুদ্ধতার সংস্কার খাদ্যের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি করেছিল দেখা যায়। এই সংস্কার কিন্তু সামাজিক ও বর্ণগত সংস্কার—যা মজ্জাগতভাবে থাকে উচ্চশ্রেণীর বা উচ্চবংশীয় মানুষদের ভিতর। কিন্তু এখানেও তাই প্রশ্ন জাগে যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো ছিলেন সর্ববর্ণের ও সর্বসংস্কারের অতীত ব্রহ্মজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত মানুষ, কিংবা ঈশ্বরকোটির যুগপুরুষ, সুতরাং তাঁর মধ্যে সামাজিক বা বর্ণগত খাদ্যাখাদ্যবিচারের সংকীর্ণ সংস্কার থাকবে কেন? কিন্তু এ'সকল কথার বা সমস্যার আলোচনা আমরা পূর্বে করেছি, সুতরাং নূতন ক'রে পুনরালোচনার প্রয়োজন আর নাই বলেই মনে করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে যে বলেছেন: 'গোবিন্দ রায়ের কাছে 'আন্না'-মন্ত্র নিলাম—এ'কথার আলোচনাও করেছি ঠিক পূর্বে।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে বলেছেন: "বেদ-পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ—পুরাণে যা বলে গেছে,—'কোরো না, অনাচার হবে', তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১২৭)। তন্ত্রে বেদাচার প্রভৃতি বিভিন্ন আচারের কথা বলা আছে। তন্ত্রদৃষ্টিতে বেদাচার নিম্নশ্রেণীর আচার এবং তা পশ্বাচারেরই অন্তর্গত। তন্ত্রে কুলাচারেরই বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছে। কুলাচারাশ্রয়ী শক্তি-সাধকরা জীবনসিদ্ধিলাভের পর কেবল ও কুলাবধূত নামে অভিহিত হন। 'কুল' অর্থে কালী এবং 'অকুল' অর্থে শিব। 'কুল' কুণ্ডলিনী-শক্তি নামেও অভিহিত, কেননা কুল বা কালী বা দক্ষিণাকালী মহাশক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনী-শক্তি।

আবার কুণ্ডলিনীই কালী। কুণ্ডলিনী কুলকুণ্ডলিনী নামেও পরিচিতা। কিন্তু কুল+কুণ্ডলিনী—উভয়েই মহাশক্তিস্বরূপিণী করুণাময়ী ও ইচ্ছাময়ী কালী বা মহাকালী। কালী বা মহাকালীর উপাসকরাই শাক্ত বা শক্তিসাধক নামে পরিচিত। তন্ত্রসাহিত্যে 'কুল'-শব্দটি তাই অর্থপূর্ণ। তন্ত্রে বা তন্ত্রদৃষ্টিতে কুলাচারাশ্রয়ী কৌল বা কুলাশ্রয়ী শক্তিসাধক সাংসারিক ও সামাজিক সকল-কিছু আচার-বিচার ও বিধি-নিষেধের বাইরে অর্থাৎ বহির্ভূত। 'প্রাণতোষিণী'-তন্ত্র কুলাচার-সম্বন্ধে বিভিন্ন তন্ত্রসাহিত্য থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করেছে। কুলাচারী তান্ত্রিকসাধনাশ্রয়ী কালী বা শক্তিসাধক। কুলাচারসম্পর্কে নিত্যতন্ত্রের ৩য় পটলে আছে—

'কুলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কর্তা হর্তা সদাশিবঃ।
দিককালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে।
* * *
ক্বচিৎ শিষ্টঃ ক্বচিদ্‌ভ্রষ্টঃ ক্বচিদ্ধৃত পিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দমে চন্দনে ভিক্ষে পুত্রে মাত্রৌ তথাপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে॥
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ।
মথিত্বা জ্ঞানদণ্ডেন বেদাগমমহোদধিম্॥'

কুলাচারাশ্রয়ী কালীসাধক বা মহাশক্তির সাধক তাই কোন সামাজিক আচারের বা বিধিনিষেধের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নন, তিনি চিরদিনই মুক্ত অর্থে বাঁধনখোলা। বিষ্ঠা-চন্দনে, শত্রু-মিত্রে, বিপদে-সম্পদে, স্বর্ণে-মৃত্তিকায় বা তৃণে সমান শ্রদ্ধাশীল। তন্ত্রের এই কুলাবধূতরাই অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মজ্ঞানী বা 'ব্রহ্মবিন্ বরেণ্য' বলে পরিচিত ও পূজিত। তন্ত্রসাহিত্য তাই তন্ত্রমতাশ্রয়ী কুলাচারকে বিশেষভাবে প্রশংসা করেছে—

'বেদাগমপুরাণানি যানি শাস্ত্রাণি পর্বতি।
তন্মধ্যে সারভূতং হি কুলাচারং সুদুর্লভম্॥[২]

২। কিন্তু এ'কথা থেকে যেন আমরা মনে না করি, বা সিদ্ধান্ত না করি যে, তন্ত্রশাস্ত্র ও তন্ত্রাচার বেদান্তাদি শাস্ত্র ও আচার থেকে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং বেদান্তাদি শাস্ত্র ও বেদান্ত-আচার নিকৃষ্ট। কুলাচার বা তন্ত্রাচারের প্রসঙ্গে 'কুলাচারং সুদুর্লভম্' প্রভৃতি কথা বলা হয়েছে, যেমন ব্রাহ্মণ্য, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি দেবতাদের ধ্যানে বলা হয়েছে ওঁরা শ্রেষ্ঠ ও মহীয়ান এবং সেই থেকে প্রমাণ হয় না যে, এক দেবতা অন্য দেবতা থেকে শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট। অদ্বৈতবেদান্তের চরম-উপলব্ধিতেও সিদ্ধসাধকের জীবনে কোন সামাজিক জাতি-বর্ণ-বিভাগ বা ধনী-নির্ধন-তারতম্য থাকে না, ওঁদের জীবনও সামাজিক ও ধর্মীয় সকল ছোট-বড়-সীমার সম্পূর্ণ অতীত। ওঁদের জীবন উদারতার স্বচ্ছ আলোকে সর্বদাই উদ্ভাসিত। এর বিদর্শন পূর্বেই উল্লেখ করেছি অদ্বৈতবেদান্তসাধনায় উদ্ভাসিত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের অসাম্প্রদায়িক উদার আচরণ ও মনোভাবের কথাপ্রসঙ্গে।

কুলাচারাশ্রয়ী শক্তিসাধকরা সকল জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়রূপ সীমার বহির্ভূত এবং সর্বদাই উদারমতাবলম্বী। তন্ত্র তাই বলে—

'মূর্খো বা পণ্ডিতো বাপি ব্রাহ্মণো বরাননে।
ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যজঃ শূদ্রশ্চণ্ডালো বরবর্ণিনি।
সর্বে তুল্যাঃ কুলীনাশ্চ এতৎ সর্বার্থসাধকম্।'

এ'ভাবে নির্বাণ, কামাখ্যা, মুণ্ডমালা, কুলার্ণব, বামকেশ্বর, নিরুত্তর, গুপ্তসাধন প্রভৃতি তন্ত্রে কুলাচারাশ্রয়ী শক্তিসাধকদের এ'ভাবে লক্ষণের কথা বলা আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "বেদ-পুরাণে যা ব'লে গেলে—'কোরো না, অনাচার হবে',—তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে"। তন্ত্র সাহিত্য, আবার তন্ত্র সাধনা। তন্ত্রসাহিত্যের ও তন্ত্রসাধনার সৃষ্টি ও প্রচার এমন একটি সমস্যাসঙ্কুল যুগে হয়েছিল—যখন জাতি-বর্ণের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি হয়েছিল। বেদের আচারও নিষিদ্ধ হয়েছিল স্ত্রীলোক, শূদ্র ও নিম্নজাতীয় মানুষের পক্ষে এবং তাতে ক'রে কুলিন ও অভিজাত-ভাবাশ্রয়ীদের সঙ্গে সমাজে যারা তথাকথিত পতিত, শূদ্র ও অস্পৃশ্য নামে পরিচিত ছিল—তাদের মধ্যে অশান্তি ও অসন্তোষের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে সমগ্র সমাজদেহকে বিদগ্ধ, খণ্ডিত, সীমিত ও পঙ্গিল করেছিল। তন্ত্রের সৃষ্টি ও প্রচার তাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা-বিধান ক'রে খণ্ডিত ও মর্মাহত সমাজের মানুষকে আবার অখণ্ড-মনোভাবে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, নূতন মন্ত্রে ও প্রেরণায় প্রদীপ্ত ও প্রাণোচ্ছল করেছিল। ভারতে এক সময় ছিল—যখন কৌলিন্যের অত্যাচারে একধরণের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল সমাজের মধ্যে। তাই অনেকের অভিমত যে, ধর্মাচরণকে ও বিচিত্র সামাজিক আচরণকে সচ্ছল ও গতিশীল করার জন্য তন্ত্রমতের বা তন্ত্রবাদের সৃষ্টি ও প্রচলন সম্ভব হয়েছিল—যে তন্ত্রবাদে ও কুলাচারে জাতি-বর্ণ-বিচারের বাঁধন ছিল না; কি পুরুষ ও কি নারীজাতি, কি ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা সকলেই অবাধে ধর্মাচরণ ও সমাজের বিভিন্ন মাঙ্গলিক কর্মে ও আচারানুষ্ঠানে যোগদান করতো।[৩] তন্ত্রাচারী কৌল বা শক্তিসাধকদের সমাজে তাই ব্রাহ্মণ-শূদ্র, ধনী-নির্ধন প্রভৃতি শ্রেণী বা বর্ণবিভাগের কোন বালাই নাই। তন্ত্রসাহিত্যও বলে—

'ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যজঃ শূদ্রশ্চণ্ডালো বরবর্ণিনি।
সর্বে তুল্যাঃ কুলীনাশ্চ এতৎ সর্বার্থসাধকম্।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন: "বেদ-পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ-পুরাণে যা ব'লে গেছে—'কোরো না, অনাচার হবে'—তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে"। 'তাই ভাল বলেছে' অর্থে বেদ-পুরাণের শুদ্ধাচার ঠিক তন্ত্রশাস্ত্রনির্দেশিত শুদ্ধাচারের সমগোত্রীয় নয়,

---

৩। বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণজাতির যখন আধিপত্য ছিল, তখন ব্রাহ্মণেতর জাতির এবং নারীজাতির পক্ষে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি-নিষেধ যথেষ্টপরিমাণে ছিল। ব্রাহ্মণেতর জাতির ও নারীজাতির বেদ, প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতিতে অধিকার লোপ করা হয়েছিল। তন্ত্রে যা আচারে জীব শিব এবং নারীজাতিমাত্রেই মহাশক্তিস্বরূপিণী। সুতরাং তন্ত্রে বাধা-নিষেধের স্থান কোথায়।

কেননা বেদ-পুরাণে যেখানে বাধা-নিষেধের বিধি আছে, তন্ত্রে সেখানে জাতি-বর্ণ ও ধনী-নির্ধন-নির্বিশেষে কি পুরুষ ও কি নারী সকলের পক্ষেই সমান অধিকার দেওয়া আছে। 'কোরোনা কোরোনা'-র বাধা-বিপত্তি নাই তন্ত্রে কিংবা তন্ত্রাচারে। পরমসিদ্ধির বেলায় অবশ্য ভিন্নকথা, সেখানে যা পরমলক্ষ্যে বেদ ও পুরাণ এক। 'এক' বলতে বন্ধনমুক্তির কথা বেদও বলেছে, তন্ত্রও বলেছে।

আর এক কথা যে, অধ্যাত্মসাধনার চরম-বিষয়ে ও পরম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে কি বেদ ও কি তন্ত্র—উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন কেবল আচারে বিচারে ও সাধনপথে, কিন্তু লক্ষ্যে নয়।

তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের সাধনাবস্থার কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "কি অবস্থাই গেছে। মুখ ক'রতুম আকাশ-পাতাল-জোড়া, আর 'মা' বলতুম। যেন মা-কে পাকড়ে আন্‌ছি। যেন জাল ফেলে মাছ হড়্‌ হড়্‌ ক'রে টেনে আনা"।

বিভিন্ন সাধনার অবস্থায় ও বিশেষ ক'রে তন্ত্রসাধনার সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবনে সিদ্ধিলাভের জন্য সর্বদাই ব্যাকুল থাকতেন; সর্বদাই যেন উন্মাদ। সমগ্র সংসার (দুনিয়া) আছে—কি নাই, সেদিকে তাঁর কোন হুঁসই থাকতো না। 'মা আছেন—আর আমি আছি' —এই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও অবস্থা সে'সময়ে। দিবারাত্র কোথা দিয়ে কেটে যেত সে'সব দিকে বিন্দুমাত্র হুঁস থাকতো না। সাধনকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের উন্মাদের মতো অবস্থার কথাই শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে অপরূপভাবে বর্ণনা করেছেন। কেবলই মুখে 'মা, মা'-শব্দ, আর অন্তরে পাগল-করা আকুলি-বিকুলি ভাব। "যেন মা-কে পাকড়ে আন্‌ছি, যেন জাল ফেলে মাছ হড়্‌ হড়্‌ ক'রে টেনে আনা"। শ্রীরামকৃষ্ণের সেইসকল সাধনা মন ও মুখের সমান্তরাল ও সমবেত-সাধনা। চৈতন্যময়ী ও বিশ্বরূপিণী-মা-কে পেতেই হবে, নইলে জীবন বাঁচে না। সাধনসময়ের সেই পাগলকরা অনন্যসাধারণ ভাবের ও ব্যাকুলতার উপমা সাধনজগতে মেলে না। কেবলই উচ্চৈঃস্বরে 'মা মা' রব—লোক দেখানো নয়—আন্তরিকতার ভরা। সাধক রামপ্রসাদ বলেছিলেন—

'আর মা সাধন-সমরে,
দেখি, মা হারে—কি পুত্র হারে।'

এ'যেন চাওয়ার আকুলতা দিয়ে প্রাণভরে ভালবাসা ও প্রপত্তির প্রার্থনা। এ'যেন প্রতিদ্বন্দ্বীতার চ্যালেঞ্জ—'দেখি, মা হারে—কি পুত্র হারে'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে তথাগত-বুদ্ধের অন্তরের প্রতিজ্ঞা—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু···' প্রভৃতি। নির্বাণ লাভ করার জন্য ধ্যানাসনে উপবেশন করার পূর্বে বুদ্ধদেব প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, হয় নির্বাণ লাভ জীবনে—নয় মৃত্যু। এই প্রাণপণ বজ্রকঠোর অথচ ব্যাকুল-করা মনোভাব না হ'লে কি কেন্দ্রমুখী হয় মন যোগবল ও পরমপ্রাপ্তিরূপ লক্ষ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থাও তাঁর সাধনার সময়ে ঠিক এ'রকমই হয়েছিল—"যেন জাল ফেলে মাছ হড়্‌ হড়্‌ ক'রে টেনে আনা"। হচ্ছি-হবো নয়, এখুনি—এই মুহূর্তেই ব্রহ্মাণ্ডরূপিণী চৈতন্যময়ী ও আনন্দময়ী 'মা'-কে পেতে হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজের নিবিড় আকুলকরা অন্তরের কথা জানিয়ে 'গানে আছে'—ব'লে রামপ্রসাদের গানের উদাহরণ দিয়েছেন—

'এবার কালী তোমায় খাব।
(খাবো খাবো গো দীন দয়াময়ী)।
তারা গুরুযোগে জন্ম আমার।
গুরুযোগে জন্মিলে সে হয় যে মা থেকো ছেলে।
এবার তুমি খাও কি—আমি খাই মা,
দু'টার একটা ক'রে খাব॥
*　　*　　*
কালীর বেটা শ্রীরামপ্রসাদ, তাদমতে তাই জানাবো।
তাতে, মন্ত্রের সাধন শরীর-পতন,
যা হবার তাই ঘটাইব॥'

এখানেও সাধক রামপ্রসাদের সেই প্রতিজ্ঞা—'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর-পতন'। রামপ্রসাদের ভাবে আত্মহারা হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, তাই তাঁর এই গান—'এবার কালী তোমায় খাব'। রামপ্রসাদ বলেছেন—

'খাবো খাবো বলি মা গো, উদরস্থ না করিব।
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে, মনোযানসে পূজিব॥'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব শ্রীশ্রীমা-ভবতারিণীর আদেশে সন্তানভাব নিয়ে ভাবমুখে ছিলেন বিশ্বকল্যাণকর্ম সাধন করার জন্য, আর তাই তাঁর মন-প্রাণ ও জীবনকর্ম সমস্তই কালীময় হয়েছিল। ইচ্ছাময়ী কালীর বা শ্রীশ্রীভবতারিণীর ইচ্ছাতেই তিনি নিয়ন্ত্রিত হতেন সর্বদা—'যেমন চালাও তেমনি চলি'। নিজের সকল-কিছু তাই তিনি সমর্পণ করেছিলেন ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী-মার চরণে।

সাধনার কালে জীবনে কি পাগলকরা ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল। এই ব্যাকুলতা!" কথাই তাই যে, পাগল-করা ব্যাকুলতা না এলে ভাগবতজীবন লাভ ক'রে জীবনকে চিরকৃতার্থ করা যায় না!

প্রসঙ্গটি শ্রীশ্রীকথামৃত দ্বিতীয় ভাগের ষোড়শ খণ্ডের (পৃঃ ১৯২) আলোচনা। 'মহাষ্টমী-দিবসে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৮শে সেপ্টেম্বর, মহাষ্টমী) শ্রীশ্রীশারদীয়াপূজা-উপলক্ষে রামচন্দ্রের বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন। সঙ্গে বিজয় (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী), কেদার, রাম, সুরেন্দ্র, চুনী, নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, বাবুরাম ও শ্রীম বা মাষ্টার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) একটি গান গাইলেন—

'আমায় দে মা পাগল ক'রে
আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে।'

গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাধিস্থ হলেন। সমাধি ভঙ্গ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হয়ে একটি আগমনী-গান করতে লাগলেন। গানের শেষে সমবেত সকলকে লক্ষ্য ক'রে

বল্লেন : "আজ মহাষ্টমী কিনা,—মা এসেছেন। তাই এতো উদ্দীপন হচ্ছে"। ভক্ত কেদার সে'কথা শুনে প্রাণের উচ্ছ্বাসে বল্লেন : প্রভু, আপনিই এসেছেন। মা কি আপনি-ছাড়া ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবে মাতোয়ারা। তিনি পুনরায় গান করতে লাগলেন—

'তারে কৈ পেলুম সই,
হলাম যার জন্য পাগল।'

গানের পর গান চল্‌তে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই পুনরায় একটি গান ধর্‌লেন—

'কখন কি রঙ্গে থাকো মা
শ্যামা-সুধাতরঙ্গিণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাভাবে উন্মত্ত, ভাবের ঘোরে পা-দু'টি টলমান। তিনি বিজয়কৃষ্ণাদি ভক্তদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে নৃত্য করতে লাগলেন। এ'যেন প্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে নদীয়ার চাঁদ গৌরাঙ্গদেবের ভক্তদের সঙ্গে নৃত্য। পাগল দু'জনেই—শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ। এ'রকম ভাবোন্মত্ত পাগল ও প্রেমপাগল না হ'লে কি প্রেমস্বরূপ ভগবানকে লাভ করা যায়। প্রেম ও প্রেমাস্বাদনের জগতে ভক্ত ও ভগবান এক ও অভিন্ন। তাই মহাভাবে উন্মত্ত।

●

॥ জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাগুরু ॥

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আদ্যলীলাকাণ্ডে বিদ্যাগুরু শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের ভূমিকা বিশেষ স্মরণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বালো সর্বপ্রথম যাঁর কাছ থেকে হাতে খড়ি নিয়ে বিদ্যাশিক্ষা শুরু করেন—তিনি হলেন শ্রীযদুনাথ সরকার। কামারপুকুর গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাড়ীর সম্মুখস্থ আটচালায় একটি পাঠশালার অধিবেশন হত। প্রধানত তাঁদের ব্যয়েই একজন গুরু নিযুক্ত থেকে তাঁদের ও নিকটস্থ গৃহস্থ সকলের বালকদের অধ্যয়ন করাতেন। বালক গদাধর যখন চতুর্থ বৎসর অতিক্রম করে পঞ্চম বৎসরে পদার্পণ করল, তখন শুভদিন শুভক্ষণে রঘুবীর-মন্দিরে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় গদাধরের হাতে খড়ি দিলেন। বালক গদাধর পরে পাততাড়ি বগলে দুকুল এসে সেই পাঠশালায়।

সকালে-বিকেলে দু'বার করে পড়া হয়। সকালে দু'তিন ঘণ্টা পড়ে ছাত্ররা স্নানাহার করতে যে যার বাড়ী চলে যেত। এইসময় অনেক পড়ুয়া জমিতে বাপ-মাকে সাহায্য করত, কর্মরত চাষীর দুপুরের খাবারটুকু এগিয়ে দিত। বয়সে যারা একটু বড়, তারা গিয়ে ক্ষেতখামারের কাজে হাত লাগাত। বিকেল থেকে পুনরায় সন্ধ্যে পর্যন্ত পাঠাভ্যাস চলত। গদাধরের ন্যায় তরুণ-বয়স্ক ছাত্রদের অবশ্য এতো অধিক সময় পাঠাভ্যাস করতে হত না। কিন্তু পাঠশালায় ঠিকই হাজির থাকতে হত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করে তারা

সেখানে বসে থাকত, কখনও বা সঙ্গীদের সঙ্গে ওখানেই খেলাধূলা করত। পাঠশালার পুরানো ছাত্ররা আবার নতুন ছাত্রদের পড়া বলে দিত এবং তারা পুরানো পড়া নিত্য অভ্যাস করে কিনা তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করত।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার শিক্ষকতা কার্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। কিভাবে শিক্ষাদান করলে ভবিষ্যতে বালকেরা জনসমাজে প্রকৃত মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, এই চিন্তাই তাঁর হৃদয়ে জাগরূক ছিল। যদুনাথ ধনী-নির্ধন সকলের সন্তান-সন্ততিদের সমান চোখে দেখতেন। সকাল থেকে বেলা এগারোটা পর্যন্ত শিক্ষাদান করে বিদ্যালয় বন্ধ করতেন। স্নান-আহার সমাপনান্তে তিনি কোনদিনই বিশ্রামলাভ করেন না। প্রত্যেক বালকের ঘরে গিয়ে তিনি খোঁজ-খবর নিতেন, ছাত্ররা পড়াশুনা করছে, না খেলাধূলা করেই কাটাচ্ছে? পরের দিন তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ সমালোচনা ও যথেষ্ট ব্যবস্থা নিতেন।

বর্তমান সময়েও যদুনাথ-শিক্ষক সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত আছে। কামারপুকুর ও তার পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধূলার সময় সুর করে ছড়াটি আবৃত্তি করে—'আই কোম্ বাই কোম্ তাড়াতাড়ি / যদুমাষ্টার যায় শ্বশুরবাড়ী / রেলগাড়ি ঝমাঝম্ / পা পিছলে আলুর দম।' এই ছড়া শুনে বুঝা যায় যে, সে সময়কার ছাত্ররা যদুনাথকে কেমন শ্রদ্ধা ও ভীতির চোখে দেখত।

বিদ্যালয়ে এসে বালক গদাধর শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু ও ভ্রাতুষ্পুত্র গদাবিষ্ণুকে প্রিয়সঙ্গী হিসেবে পায়। এরা উভয়েই গদাধরকে 'ভাওাৎ' বলে সম্বোধন করত, এবং আহার-বিহার ও পাঠের অনেকটা সময় পরস্পর একত্রে কাটাত। যদুনাথ উপযুক্ত শিক্ষক হয়েও গদাধরকে অনেক সময় শিক্ষায় মনোনিবেশ করাতে পারতেন না। সে সময় সাত-আট বৎসর বয়ঃক্রম গদাধর ভোরে সকলের অগোচরে বাড়ী থেকে পালিয়ে যেত এবং বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। যদ্যপি কোনদিন যদুনাথ গদাধরকে ধরে ফেলতেন, সেদিন রীতিমতো বেত্রাঘাতপূর্বক হাতেপায়ে বেঁধে নানারকম শাস্তি দিতেন। এত লাঞ্ছনা ভোগ করেও অচল-অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওই বালক শিক্ষকের চোখের অন্তরালে পালিয়ে যেত। সে প্রায়ই মানিকরাজার আমবাগান কিংবা ভূতির খাল ময়দানে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে নানারূপ খেলাধূলা করত। যদুনাথ গদাধরের এই সহনশীলতা দেখে নির্যাতন বন্ধ করে নানারূপ প্রলোভনে বশীভূত করার প্রয়াস পান। এই সময় থেকে বালক গদাধরের সামান্য শিক্ষালাভ হয়।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের দেহাবসানে গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে কিছু বিঘ্ন ঘটলেও কিছুদিন পরেই গদাধর পুনরায় পূর্ববৎ বিদ্যাভ্যাস করতে থাকে। কিন্তু এইসময় পুরাণ কথা ও যাত্রাগান শ্রবণ করা এবং দেবদেবীর মূর্তিগঠন করা তার নিকট অধিকতর প্রিয় হয়ে উঠে। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যাদি উপাধিভূষিত ব্যক্তিদলের ঐহিক ভোগসুখ ও ধনলালসা দেখে গদাধর বিদ্যার্জনে দিন দিন উদাসীন হয়ে উঠলেও নিয়মিতভাবে পাঠশালায় যাচ্ছিল এবং মাতৃভাষায় লেখা ছাপা বই পড়তে ও লিখতে গদাধর বিশেষ পটু হয়ে উঠেছিল। গণিতশাস্ত্রের

নামতা, শুভঙ্করী অঙ্ক প্রভৃতিতে গদাধরের উদাসীনতা থাকলেও যদুনাথের তদারকিতে তার বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যন্ত এবং পাটীগণিতে ভেরিজ থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট গুণ-ভাগ পর্যন্ত তার শিক্ষা অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু দশমবর্ষে উপনীত হয়ে ধ্যানের পরিণতিতে যখন গদাধরের মধ্যে মধ্যে ভাবাবেশ হতে থাকল, তখন তার মাতা চন্দ্রামণিদেবী ও অগ্রজ রামকুমার বাধা দেওয়া হয়েছে ভেবে তাকে তার পল্লীস্থিত পাঠশালায় যেতে দিতেন এবং যা ইচ্ছে শিখতে স্বাধীনতা দিতেন। এই সময় গদাধরের শিক্ষা আর অগ্রসর হচ্ছে না দেখেও শিক্ষক যদুনাথ তারজন্যে কোনরূপ পীড়ন করেন নি।

যদুনাথ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বালক গদাধরের স্বভাব-প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং তার অকপট কথাবার্তা ও সহজ সরল আচার-ব্যবহারের নিগূঢ় মর্ম সহজেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। তাই গদাধরের প্রতি অচিরেই যদুনাথের প্রগাঢ় অপত্য স্নেহ জন্মাল। কামারপুকুরে লাহাবাবুদের এই পাঠশালায় অনেক ছাত্রকেই তিনি মানুষ করেছেন কিন্তু তাঁর জীবনে এত তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি কোন ছাত্রের থাকতে পারে—ভাবতেই পারলেন না।

এর অল্পকালের মধ্যেই যদুপণ্ডিতের পাঠশালায় গদাধরের পাঠ সমাপ্ত হলেও তার সূক্ষ্মদৃষ্টি তাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করতে শিখিয়েছিল। তাই অর্থলাভে সহায়তা হবে বলে যে পাঠশালার বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধিভূষিত হতে লোকে সচেষ্ট হয়—তা বুঝতে তার বিলম্ব হয়নি। তাই পরবর্তীকালে রামকুমার তাঁর চতুষ্পাঠীতে অনুজকে বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হবার জন্য তিরস্কার ও অনুযোগ করলে তার উত্তরে গদাধর স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন,—'চাল কলা বাঁধা বিদ্যা আমি শিখতে চাহি না, আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়।'

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় কামারপুকুরের মুকুন্দপুর পল্লিতে বসবাস করতেন। আনুমানিক বাংলা ১১৮০ সালের কোনো সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। যদুনাথ জাতিতে একাদশ তিলি ছিলেন। তাঁরা পুরুষানুক্রমে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর পুত্র অনন্তনাথ এবং পৌত্র মহেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ও লাহাবাবুদের আটচালায় শিক্ষকতা করতেন। মহেন্দ্রনাথের কোনও বংশধর ছিল না। কালক্রমে জেলা বোর্ডের বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় এই ঐতিহ্যপূর্ণ পাঠশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অবসর গ্রহণকালে রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামে যে ব্যক্তি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে পাঠশালার কার্যভার গ্রহণ করেছিলেন বলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে, ওই রাজেন্দ্রনাথ যদুনাথের হয় বংশধর, নয় নিকট কোনো আত্মীয় বলে অনুমান। আনুমানিক বাংলা ১২৬০ সালের নিকটবর্তী কোনো সময়ে যদুনাথ সরকার দেহত্যাগ করেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

॥ এক ॥

পূর্বভাষ :

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি স্বনামধন্য চরিত্র। পরমহংসদেব বঙ্গের যে-সমস্ত খ্যাতিমান পণ্ডিত, সমাজসংস্কারক ও পুণ্যাত্মার সঙ্গে সাগ্রহে মিলিত হ'য়েছিলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মিলন ও আলাপনের বিস্তৃত বিবরণী 'কথামৃত' ও 'পুঁথি'-তে পাওয়া যায়, এবং 'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থেও তার উল্লেখ রয়েছে। যা হোক, বর্তমান নিবন্ধে আমরা সেই সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য সহায়েই তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎকার ও কথোপকথনের অমিয় বার্তা অনুধ্যানে চরিতার্থ হব।

পরিচিতি :

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গের তথা ভারতের একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা। পৌরুষের আশ্চর্যদীপ্তি ও প্রতিভার ভাস্বর গৌরবে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের জাতীয় জীবনে বিশিষ্ট আসন অলঙ্কৃত ক'রে র'য়েছেন। বস্তুতঃ এঁরমত বলিষ্ঠ ও মহানুভব চরিত্রসম্পন্ন পুরুষ পৃথিবীতে কমই জন্মেছেন। ইনি একদিকে অগাধ বিদ্যাবত্তার জন্য যেমন 'বিদ্যাসাগর'-রূপে বিখ্যাত, অন্যদিকে অপরিসীম হৃদয়বত্তা ও দয়ার জন্য তেমনি 'দয়ার সাগর'-রূপেও সুপূজিত।

ঈশ্বরচন্দ্র ১২২৭ সালে ১২ই আশ্বিন (২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃ) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দরিদ্র হ'লেও অত্যন্ত তেজস্বী ও ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন এবং মাতা ভগবতী দেবীও ছিলেন যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি স্নেহশীলা ও দয়াবতী।

ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় শিক্ষারম্ভ করেন। তারপর ইনি মাত্র আট বছর বয়সে পিতার সঙ্গে ক'লকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ক'লকাতায় সামান্য মাহিনায় চাকুরী ক'রতেন। সে-জন্য ঈশ্বরচন্দ্রকে কঠোর দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে বিদ্যার্জন ক'রতে হয়। ছাত্রহিসেবে ইনি বরাবরই অনন্যসাধারণ মেধা ও কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং মাত্র একুশ বছর বয়সে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে বিভূষিত হন। পরে চাকুরীকালে ইনি নিজ প্রচেষ্টায় ইংরেজি, হিন্দী এবং ফরাসী ভাষায়ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ক'লকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতরূপে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কর্মজীবন শুরু হয়। তারপর ইনি সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারি, অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষের পদও ক্রমান্বয়ে অলঙ্কৃত করেন। ঐ কলেজে অধ্যক্ষতাকালে এঁকে কয়েকটি জেলার স্কুল-পরিদর্শকের কর্মও

সম্পাদন ক'রতে হয়। অবশেষে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় ইনি পাঁচশত টাকা মাহিনার ঐ সম্মানিত চাকুরীতে অবলীলাক্রমে ইস্তফা দেন এবং তারপরে আর কোনও চাকুরী গ্রহণ করেন না।

দেশবাসীর সর্বস্তরে শিক্ষাবিস্তার এবং হিন্দুসমাজের বিবিধ সংস্কার সাধনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যমশীলতা ও অবদান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় পরিদর্শকের পদে থাকাকালে এঁর পরামর্শে ও উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় অনেকগুলি নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারকল্পেও ইনি বহু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরবর্তীকালেও এঁর প্রচেষ্টায় কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উচ্চতর শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যেও ইনি নিজ শ্রমে ও অর্থে 'মেট্রোপলিটন কলেজ' (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নারীজাতির প্রতি বরাবরই অগাধ মমতাপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। বহু আন্দোলন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ইনি বিধবা-বিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ করেন এবং সেইসঙ্গে পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা নিবারণকল্পেও তুমুল সংগ্রাম করেন।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন এবং ব্যাপক প্রচারকল্পেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যম ও অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলা গদ্যকে সাবলীল, সুললিত এবং অলঙ্কৃত ক'রে তোলার কাজেও ইনি অমিত কীর্তির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এ-জন্য ইনি বাংলা গদ্যসাহিত্যের জনকরূপে সুপ্রসিদ্ধ।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সহজপাঠ্য ক'রে তোলার কাজেও এঁর কৃতিত্ব সর্বজন-প্রশংসিত। ইনি বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, কথামালা, আখ্যানমঞ্জরী, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, সংস্কৃত ব্যাকরণ-কৌমুদী, ঋজুপাঠ প্রভৃতি পাঠ্যপুস্তক এবং বেতালপঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস, শকুন্তলা, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি বাংলা অনুবাদ-সাহিত্য রচনা করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথিতযশা পণ্ডিত হ'য়েও সেই ধর্মান্দোলনের যুগে কোন ধর্মমত বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কখনো সরব হন নি। এ-জন্য ঐ বিষয়ে এঁর ধ্যান-ধারণা বা মতবাদ সঠিকভাবে জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন, ইনি 'জ্ঞানী' ছিলেন এবং ঈশ্বরের 'নিরাকার তত্ত্ব' মান্য ক'রতেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ভারতীয় জাতির পরম গৌরব। পোষাকে-পরিচ্ছদে, আহারে-বিহারে, এবং আচারে-ব্যবহারে ইনি প্রকৃত ভারতীয় ছিলেন। এই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ (১৮৯১ খ্রীঃ ২৯শে জুলাই) প্রায় ৭১ বছর বয়সে লোকান্তরিত হন।

লীলাবার্তা :

[বিদ্যাসাগর দর্শনে ঠাকুরের আগ্রহ]

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালেই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃভক্তি ও দয়াগুণের কথা শোনেন। তারপরে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে অবস্থানকালেও তিনি এঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং জনহিতকর ও সমাজসংস্কারমূলক নানা মহৎ কীর্তির কথা জানতে পারেন। অবশেষে,

শ্যামপুকুরস্থিত বিদ্যাসাগর স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('মাষ্টার' মহাশয়—'কথামৃত'-কার) শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এলে, তাঁর মুখেও তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মহদ্ গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা শোনেন। এইভাবে তাঁর অন্তরে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে দর্শনের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন কথাপ্রসঙ্গে মাষ্টার মহাশয়ের নিকট নিজ অন্তরের ঐ অভিলাষ ব্যক্ত করেন,—"আমাকে বিদ্যাসাগরের কাছে কি লয়ে যাবে? আমার দেখার বড় সাধ হয়।"—কথামৃত-৩য় ।১।১।১

তার উত্তরে, মাষ্টার মহাশয় সবিনয়ে ঠাকুরকে আশ্বাস দেন : আজ্ঞা হাঁ, তাঁকে ব'লে আপনাকে শীঘ্রই একদিন নিয়ে যাব।

[বিদ্যাসাগর-দর্শনের প্রস্তুতি]

তারপর মাষ্টার শ্রীশ্রীঠাকুরের ঐ আগ্রহের কথা একদিন বিদ্যাসাগরের নিকট নিবেদন করেন। তা শুনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আহ্লাদিত হন এবং পরবর্তী এক শনিবারে বিকেল চারটার সময় এঁর বাদুরবাগানস্থিত ভবনে 'পরমহংস মহাশয়'-কে আনয়ন ক'রতে বলেন।

ঐ দিন বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কি রকম পরমহংস? তিনি কি গেরুয়া প'রে থাকেন?"

মাষ্টার উত্তরে বলেন,—"আজ্ঞা না। তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ। লালপেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নিশ করা চটিজুতা পরেন। রাসমণির কালীবাড়িতে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন। সেই ঘরে তক্তাপোশ পাতা আছে, তার উপর বিছানা-মশারি আছে। সেই বিছানায় শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই। তবে, ঈশ্বর বই [ছাড়া] আর কিছু জানেন না। অহর্নিশি তাঁরই চিন্তা করেন।"—কথামৃত-৩য় ।১।১।১

[বিদ্যাসাগর-দর্শনে ঠাকুরের যাত্রা]

সেই অনুসারে পরমহংসদেব ৫ই আগষ্ট ১৮৮২ খ্রীঃ শনিবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি থেকে ঘোড়াগাড়ি ক'রে এঁর ভবনে যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে মাষ্টার, ভবনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্রতাপ হাজরা।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিধানে লালপেড়ে পরিচ্ছন্ন ধুতি, গায়ে লংক্লথের পরিষ্কার জামা। জামার বোতামগুলি খোলা এবং পরিহিত ধুতির আঁচলখানি বেশ পরিপাটি ক'রে বাঁ কাঁধের উপর ফেলা। পায়ে বার্নিশ করা চটি জুতা। তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে উৎফুল্লচিত্তে আলাপনারত; সহাস্য বদন, আনন্দময় মূর্তি।

ঠাকুরের গাড়ি বাগবাজারের পোল অতিক্রম ক'রে, শ্যামবাজার হ'য়ে ক্রমে আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে প্রবেশ করে। সে-সময় হঠাৎ তাঁর ভাবান্তর হয়; ঈশ্বরাবেশের উপক্রম, আত্মসমাহিত অবস্থা। যেন ভাবনেত্রে অন্তর্লোকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চরিত্রের বিবিধ দিক দর্শনরত।

গাড়ি ক্রমশঃ রাজা রামমোহন রায়ের ভবনের নিকট এলে মাষ্টার মহাশয় ঠাকুরকে বলেন—"এইটি রামমোহন রায়ের বাটী।" তাঁর কথার প্রণালি ভঙ্গ হওয়ায়, ঠাকুর বিরক্তির সুরে তাঁকে বলেন,—"এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না।" ঐ কথা শুনে মাষ্টার মহাশয় লজ্জিত হন। তিনি ঠাকুরের ঐ ভাবাবেশ লক্ষ্য করেন নি। যাহোক, বেলা প্রায় চারটার সময় ঠাকুরের গাড়ি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হয়।

[বিদ্যাসাগরের বাড়ি]

"গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ-পছন্দ। আরগায় আরগায় বাটী ও আরগায় চতুর্দিকে প্রাচীর। বাড়ির পশ্চিমধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকটি রাস্তার দক্ষিণদিকে। পশ্চিমের প্রাচীর ও দ্বিতল গৃহের মধ্যবর্তীস্থানে মাঝে মাঝে পুষ্পবৃক্ষ।

"পশ্চিম দিকের নীচের ঘর হইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। উপরে বিদ্যাসাগর থাকেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই উত্তরে একটি কামরা, তাহার পূর্বদিকে চলঘর।

"হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একটি কামরা আছে—এই কয়টি কামরা বহুমূল্য পুস্তকে পরিপূর্ণ। দেওয়ালের কাছে সারি সারি অনেকগুলি পুস্তকাধারে অতিসুন্দররূপে বাঁধানো বইগুলি সাজানো আছে।

"হলঘরের পূর্ব সীমান্তে টেবিল ও চেয়ার আছে। বিদ্যাসাগর যখন বসিয়া কাজ করেন, তখন সেইখানে তিনি পশ্চিমাস্য হইয়া বসেন। যাঁহারা দেখাশুনা করিতে আসেন, তাঁহারাও টেবিলের চতুর্দিকে চেয়ারে উপবিষ্ট হন।

"টেবিলের উপর লিখিবার সামগ্রী—কাগজ, কলম, দোয়াত, ব্লটিং, অনেকগুলি চিঠিপত্র, বাঁধানো হিসাব-পত্রের খাতা, দু'-চারখানি বিদ্যাসাগরের পাঠপুস্তক রহিয়াছে—দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ কাষ্ঠাসনের ঠিক দক্ষিণের কামরাতে খাট বিছানা আছে—সেইখানেই ইনি শয়ন করেন।"—কথামৃত-৩য় ।১।১২

(ক্রমশঃ)

●

॥ বিবেকানন্দ-মললালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

বিভিন্ন জাতির নবযৌবন কিংবা মৃত্যু কেন হয় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী উনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর কতগুলি উদাহরণ নিয়ে মন্তব্য করেছেন[১৯], "ভিয়েনা শহরে জার্মান পাণ্ডিত্য বুদ্ধিবল আছে, কিন্তু যে-কারণে তুর্কি ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে গেল, সেই কারণ এখানেও বর্তমান—অর্থাৎ নানা বিভিন্ন জাতি ও ভাষার সমাবেশ। আসল অষ্ট্রিয়ার লোক জার্মান-ভাষী, ক্যাথলিক; হঙ্গারীর লোক তাতারবংশীয়, ভাষা আলাদা; আবার কতক গ্রীকভাষী, গ্রীক-মতের ক্রিশ্চান। এ সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একীভূত করণের শক্তি অষ্ট্রিয়ার নেই। কাজেই অষ্ট্রিয়ার অধঃপতন। বর্তমানকালে ইওরোপখণ্ডে জাতীয়তার এক মহাতরঙ্গের প্রাদুর্ভাব। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতীয় সমস্ত লোকের একত্র সমাবেশ। যথায় ঐ প্রকার একত্র সমাবেশ সুসিদ্ধ হচ্ছে, সেথায়ই মহাবলের প্রাদুর্ভাব হচ্ছে; যেথায় তা অসম্ভব, সেথায়ই নাশ"। "অষ্ট্রিয়া ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে, আর ইতালী নব জীবনের অপব্যবহারে তদ্বৎ জালবদ্ধ হয়েছে"।[২০] প্রাচীন ইতিহাসেও আমরা স্বামীজীর এই সূত্রকে ব্যবহারোপ-যোগী দেখতে পাই।

॥ সুমেরীয় রাজ্য ॥

এইভাবে পারস্পরিক আদান-প্রদানে ক্রমশই নূতনতর সভ্যতার সৃষ্টি হতে লাগলো বিভিন্ন দেশে। এরই বাস্তব উদাহরণ দেখা যায় সুমেরীয়ায়। লাগাস, নারসা, উর, এরিদু ইত্যাদি নগর-রাষ্ট্রের গৌরবময় দিনের পর উত্তরে কিশ্ আর দক্ষিণে উম্মা নগরকে কেন্দ্র করে সভ্য সুমেরীয়রা কতগুলি রাষ্ট্রগোষ্ঠী তৈরী করেছিল প্রাচীনযুগে। নিকটবর্তী অঞ্চলে সেমেটিক যাযাবরেরা প্রায়ই হানা দিয়েছে এদের ওপর যদিও পুরোপুরি জয়লাভ কখনোই ঘটেনি তাদের। কিন্তু ২৬৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ এই নগর-রাষ্ট্রগুলির শক্তি যখন পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ক্ষীণ হয়ে এলো সে-সময় সেমেটিক-নেতা সারগণ তাদের আক্রমণ করলেন পরিকল্পিতভাবে। তিনি যুদ্ধে জিতেছিলেন কারণ প্রথমত তিনি সুমেরীয়দের সুসংবদ্ধ রণপ্রণালী শিখে তার সাথে মিলিয়েছিলেন ক্ষিপ্র তীরন্দাজ বাহিনীকে, এবং দ্বিতীয়ত অনৈক্যে জর্জরিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিনি এসেছিলেন এক সুসংহত শক্তি নিয়ে। সম্রাট সারগণ সুমেরীয়া জয় করলেও সভ্য জাতির সাহায্য নিতে তিনি দ্বিধাবোধ করেননি। এ-সময়ের শিলাচিত্রে দেখা যায়, লম্বা চুল-দাড়ির সেমেটিক শাসকদের নানান কাজে সাহায্য করছে মুণ্ডিত মস্তক ও দাড়ি-গোঁফহীন সুমেরীয়রা। সেমেটিকরা শিখলো ইটের তৈরী বাড়িতে বাস করতে, কিউনিফর্ম লিপি শিখে নিরক্ষরতা দূর করতে, কারিগরী ও শিল্পের কাজে দক্ষতা অর্জন করতে। বিপরীতদিকে সেমেটিকদের প্রাণপ্রাচুর্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সুমেরীয়রা। এরই লক্ষণ দেখা যায় পরবর্তীকালে লাগাসের শিল্পকলা আঁটসাঁট ভাবের কনভেন্শনাল্ রীতি ছেড়ে সহজ স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গিতে

১৯। বাণী ও রচনা ৬ : ১৫২।
২০। ঐ ৬ : ১৮০।

উন্নত হয়েছিল নতুন রূপসজ্জায়[২১], দেখা যায় সারগণের অনুকরণে পরবর্তীকালের [সুমেরীয়] উরের অধিপতিদের দিগ্বিজয়ে বের হতে। সুমেরীয় রাজারা আগে নিজেদের 'দেবতার প্রতিনিধি' হিসেবেই গণ্য করতেন, সেমেটিক রাজা সারগণ এসে নিজেকেই ঘোষিত করলেন দেবতার স্তরে, এবং তাকে অনুসরণ করে পরবর্তী [সুমেরীয়] উরের রাজারাও নিজেদের দেবতা বলেই প্রচার করতেন।

॥ মিশর ॥

হিক্‌সোস্‌রা মিশর অধিকার করার পর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক আদান-প্রদান কতখানি হয়েছিল তা জানা যায় না কারণ মিশরীয়রা পরবর্তীকালে হিক্‌সোস্‌দের সব চিহ্ন ধ্বংস করে দিয়েছিল। তবে যেটুকু সূত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় যে হিক্‌সোস্‌ নৃপতিরা মিশরীয় রীতিনীতি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিলেন।[২২] বিপরীতদিকে মিশরীয় নৃপতিদের মধ্যেও লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা গেল। মিশর আগে এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে যে অভিযান চালাতো তা ছিল বাণিজ্যিক, কিন্তু হিক্‌সোস্‌দের হাত থেকে স্বাধীনতা পাবার পর সেই মিশরই সাম্রাজ্যবাদের দিকে ঝুঁকলো। অশ্বচালিত বিরাট বিরাট রথ আর ক্ষিপ্রগতিশীল তীরন্দাজদের নিয়ে বিশাল ছিল দেশের সৈন্যদল। মধ্যমবর্গীয়-শ্রেণীর প্রতিটি নাগরিকের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান আবশ্যিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মিশরীয় সম্রাট (ফারাও) আগে 'দেবতার সন্তান' ছিলেন বলে জনসমাজ থেকে দূরে থাকতেন, কিন্তু এখন থেকে প্রশাসনের ব্যাপারে তিনি সক্রিয় অংশ নিতে লাগলেন। চৌত্রিশটি জেলার শাসকদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়ে কেবল কর আদায় ও বিচারের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে উঠলো যদিও অপরাধীদের দণ্ডের নির্দেশ আসতো সম্রাটের কাছ থেকেই। দেশের জন্য সুসংবদ্ধ আইনের বই লিখিত হলো এই কালে। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে দেশটিকে ভাগ করে দু'জন উজির নিযুক্ত করা হলো যারা সম্রাটের সাথে নিয়মিতভাবে শাসন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। আগে জেলা-অধিপতিরা ছিলেন সামন্তের মতো, কিন্তু পরে সমস্ত ভূমির মালিক হলেন সম্রাট নিজে। চাষবাসের জন্য জমি-হস্তান্তর, জমির মালিকানা ইত্যাদি বিষয় সরকারী কাগজপত্রে রেজিস্টারী করা হতে লাগলো। এভাবে সরকারী কর্মী ও করণিকের সংখ্যা বেড়ে গেল বহু গুণ। এ-থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মিশরে তখন ঢিলেঢালা প্রশাসনের বদলে কঠোর শৃঙ্খলায় শাসন চালু হয়েছিল। বস্তুত যে জাতীয়তাবাদ মিশরীয়দের হিক্‌সোস্‌দের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিল, সেই জাতীয়তাবোধই পরে সমগ্র দেশকে এক অবিভাজ্য সত্তায় পরিণত করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এর প্রভাব দেখা যায় তাদের ধর্মেও। যে মিশরে বহু দেবদেবীর পূজো চালু ছিল যুগ-যুগ ধরে, সেখানে ফারাও ইখনাটন সব দেবদেবীকে বাতিল করে একমাত্র সূর্যদেব আটনের উপাসনা চালু করলেন। এ-ধরনের একেশ্বরবাদ মিশরীয় ধর্মের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। [ক্রমশঃ]

২১। প্রাচীন ইরাক, পৃঃ ৬৭।

২২। প্রাচীন মিশর, পৃঃ ৬৬।

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি একদা ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন প্রসঙ্গে যে কথা উচ্চারণ করেছিলেন আমিও সে কথাটির পুনরাবৃত্তি করে আমার বক্তব্য শুরু করতে চাই : "মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্"। প্রতিভার ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্র্যে, শক্তির প্রকাশে, বোধ ও বোধির ঐশ্বর্যের অমিত দীপ্তিতে, প্রেমের বিগলিত করুণার যখন কোনো মানুষ সাধারণের নাগালের অনেক বাইরে চলে যান, যাঁর প্রতিভার পরিমাপ করতে আমরা হিমশিম খেয়ে যাই ; বা অন্যভাবে বলা যায়—যা আমরা হতে চাই অথচ হতে পারিনা, এবং অন্যত্র কোনো একজন মানুষের ভিতরে কোথাও তার উজ্জ্বল অস্তরীন প্রকাশ দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হই, তখনই অলৌকিকের অধিবাসনায় আমরা তাঁকে মণ্ডিত করে ঈশ্বরকল্প করে গড়ে তুলি। এ হ'ল মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এবং এভাবেই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে মহৎ জ্যোতিষ্কের ঘিরে অলৌকিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। বস্তুত: প্রতিভার ব্যাপ্তিতে ও বৈচিত্র্যে—শক্তির মহৎ প্রকাশে, সাহসে সাধনায় প্রেমে কর্মে সেবায় —সমস্ত রকম মানবিক অর্জনের আভিজাত্যে স্বামীজী আমাদের কাছে ঈশ্বরকল্প পুরুষ। এবং গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ তো তাঁকে সপ্ত-ঋষির একজন বলে অভিহিত করে গেছেন ; লীলা-সঙ্গী হয়ে এসেছেন মানব-প্রেমের প্রতিভূ হয়ে—নববেদান্তের ব্যাখ্যাতারূপে। এবং "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—এতো সেই স্বামীজীরই উক্তি। বর্তমান লেখক নিজের অক্ষমতা ও দৈন্য সম্পর্কে সচেতন বলেই উপরোক্ত শ্লোকটি খুব সহজেই তার মনে এল। বস্তুতঃ তিনি কৃপা না করলে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলার সামান্যতম অধিকার আমার নেই। আমার কেন, অনেকেরই হয়তো নেই। একটি জাতির জীবনে—তিনি যে কতখানি এবং বিশ্বমানবের সার্বিক উন্নয়ন এবং উত্তীর্ণের প্রয়োজনে তাঁর অবদান যে কতটা—সে বিচার আজো শুরুই হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। স্বামীজী নিজেই যে বলে গিয়েছিলেন—বিবেকানন্দ কী করে গেছেন—তা বুঝতে হলে আর একজন বিবেকানন্দের প্রয়োজন—এ একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্য। একক ব্যক্তিসাধনায়—কর্মের ও তপস্যার জোরে—শুধু একটি মহৎ জীবনাদর্শের অঙ্গীকারে ও যোজনায় একটি জাতিকে একমুহূর্তে যেন জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার রন্ধ্রমঞ্চে, আধুনিকতার পাদপীঠে একই সঙ্গে যেন জীবন ও মহাজীবনের সঙ্গমস্থলে, ধ্যান ও কর্মের মহাসম্মিলনে তিনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা কারা ?—আমরা কী ? এই আত্ম-পরিচয়ের মহান সনদ তিনি জাতির হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। তাঁর আমেরিকার দিগ্বিজয়ের পর এই কারণে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল—দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দ মিলে এত বছর ধরে যে কাজ করতে পারেন নি, মাত্র তিরিশ বছরের যুবক নরেন্দ্রনাথ সেই অসাধ্য সাধন করে গেলেন। বিশ্বপৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ মনীষী রোঁলাঁকে বলেন—ভারতবর্ষকে জানতে হলে

বিবেকানন্দ-সাহিত্য পড়তে হবে। এই কারণেই ছোট্ট কয়েক পৃষ্ঠার চিকাগো বক্তৃতাকে ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষের মুক্তির মহাসনদ আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। স্বামীজীর আদর্শকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে বিপ্লববাদ গড়ে ওঠার অনেক আগেই এই কারণেই নিবেদিতা স্বামীজীকে "verily our great national hero" বলে ঘোষণা করেছিলেন জাতির কাছে। মোহিতলালের মত কাঠ-প্রতিভা এই কারণেই বলেন "যে আকাশের দিকে যখনই তাকাইয়াছি, তখনই নিজ জীবনের ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত হইয়া চন্দ্রতারকার সভাতলে আসন পাতিয়াছি"। এই কারণেই আচার্য সুনীতিকুমারের মত অজ্ঞেয়বাদীও বলেন, "সংশয় ও নৈরাশ্য এবং আশা ও আশঙ্কার মানসিক সংকটে কেবল (বিবেকানন্দ-সাহিত্যে উপস্থাপিত) এই তত্ত্বই অধ্যাত্ম ও অধিমানসের মধ্যে একপ্রকার সমানুপাত রক্ষা করিতে পারে"। এই কারণেই সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন, "বিবেকানন্দ আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে আশ্রয় দিয়াছেন, দুঃখের মধ্যে দিয়াছেন আশা, নৈরাশ্যের মধ্যে সাহস"। চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী বলেন, "ভারতের আত্ম-মহিমার দিকে ভারতের নয়ন তিনি উন্মিলিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি রাজনীতির আধ্যাত্মিক ভিত্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। আমরা অন্ধ ছিলাম, তিনি আমাদের দৃষ্টি দিয়াছেন। তিনি ভারতীয় স্বাধীনতার জনক,—আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার তিনি পিতা"। "তিনি তাঁহার শিক্ষা ও কার্যক্রম দ্বারা জাতির জীবনে নবপ্রাণের সঞ্চার করিয়াছিলেন।...তিনি ছিলেন শক্তি ও তেজের প্রতীক"—একথা পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর। আর স্বামীজীর মানস-পুত্র নেতাজী বললেন, "আজ তিনি জীবিত থাকলে আমি তাঁর চরণেই আশ্রয় নিতাম। স্বামী বিবেকানন্দই বর্তমান বাংলার স্রষ্টা—একথা বললে বোধ হয় ভুল করা হবে না"। "স্বামীজীর বাণীর মধ্য দিয়াই বর্তমানের মুক্তি-আন্দোলনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছে"। "স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, ধর্ম ও বিজ্ঞানের, অতীত ও বর্তমানের সমন্বয় করিয়াছিলেন, তাই তিনি মহৎ। তাঁহার শিক্ষায় দেশবাসী অভূতপূর্ব আত্মসম্মান, আত্মবিশ্বাস এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার বোধ লাভ করিয়াছে"। "Freedom, freedom is the Song of the Soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর অন্তরের রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন তাহা সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে। তাঁহার সাধনার ভিতর দিয়া, আচরণের ভিতর দিয়া, কথা ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া এই সত্যই বাহির হইয়াছে"। "স্বামীজী মানুষকে যাবতীয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া খাঁটি মানুষ হইতে বলেন এবং অপরদিকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচারে ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপন করেন"। "কার্লমার্কসের গ্রন্থ হইতে সমাজতন্ত্রের জন্ম হয় নাই। ভারতের চিন্তা ও সংস্কৃতিতে ইহার উৎস। স্বামী বিবেকানন্দ যে গণতন্ত্রের আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের রচনায় ও কর্মে মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল"। "শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট আমি যে কত ঋণী তাহা ভাষায় কি করিয়া প্রকাশ করিব? তাঁহাদের পুণ্য প্রভাবে আমার জীবনের প্রথম উন্মেষ। নিবেদিতার মত আমিও মনে করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ একটা অখণ্ড ব্যক্তিত্বের দুই রূপ। আজ যদি স্বামীজী জীবিত

থাকিতেন তিনি নিশ্চয়ই আমার গুরু হইতেন—অর্থাৎ তাঁকে আমি নিশ্চয়ই গুরুপদে বরণ করিতাম"।—[বিশ্ববিবেক থেকে সংগৃহীত] বিশ্ববরেণ্য মনীষী রোঁমা রোলাঁর উক্তিটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে : "The present leaders of India : the king of thinkers, the king of poets and the Mahatma—Aurobindo Ghosh, Tagore and Gandhi—have grown, flowered, and borne fruit under the double constellation of the swan and the Eagle—a fact publicly acknowledged by Aurobindo and Gandhi". দেশে বিদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিভাধর মনীষীদের কণ্ঠে উচ্চারিত এরকম অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানবজীবনে তাঁর সুগভীর প্রভাব প্রমাণ করা যায়।

কিন্তু ঐ সর্বব্যাপ্ত বিচিত্রপথগামী বহুমুখী প্রতিভাই আবার তাঁকে বুঝবার পথে অন্তরায় হয়ে আছে। খুব বড় মাপের মানুষদের সম্পর্কে এরকম ঘটে। অন্ধের হস্তি-দর্শনের মত তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও বিশাল ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা খুবই মুশকিলে পড়ি। অংশকে সমগ্র বলে বোঝাতে গিয়ে সবটাই এলোমেলো হয়ে যায়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর উজ্জ্বল অম্লান আত্মপ্রকাশকে তাঁর সমগ্র বিশাল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঠিক যেন মেলাতে পারি না। এই কারণেই তাঁর সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এখানে একটি উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—"Now-a-days the young-men imbibed with a smattering of Marxism call him a reactionary. In his lifetime the social reformers of the day called him a reactionary as well : because he did not advocate that only by giving widows to remarriage or by making some inter-caste marriage and such like social reforms India's regeneration would be achieved. The desideratum according to him is to raise the masses, to educate them and to elevate them in the scale of advanced humanity". Patriot & Prophet by Bhupen Datta.

বস্তুতঃ স্বামীজী আমাদের জাতীয় জীবনের এবং বিশ্বজীবনের ও বিশ্বমানবের এমন কোনো সমস্যা নেই যা নিয়ে আলোচনা করেন নি এবং আলোকসম্পাত ঘটান নি। মানব-সভ্যতার আগামী দেড় হাজার বছরের পথ-নির্দেশ রেখে গেছেন তাঁর সাহিত্যে, তাঁর বক্তৃতায়, তাঁর পত্রাবলীতে, তাঁর বহুমুখী বিচিত্রধারা কর্মের পরিকল্পনায়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আধুনিক মানুষের সমস্ত জিজ্ঞাসায় ও সমস্যায়—সামাজিক, বাস্তিক, আত্মিক, অর্থনৈতিক—নৈষ্ঠিক, শৈল্পিক, রাজনৈতিক—দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-সঙ্গীত-চারুকলা-সম্পর্কিত,—এমন কি বিলাস বিভ্রম খেলাধুলা, আসবাবপত্র, শিশুপালন, স্বাস্থ্য, জীববিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র, বিবাহ, পরিবার-পরিকল্পনা—এই দৃশ্যমান জীবন ও অদৃশ্য জীবনাতীতের সব কিছু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেছেন এবং সমাধান নির্দেশ করে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর মাতৃভূমি এই

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আগামী দেড় হাজার বছরের যত কিছু সমস্যা ও জিজ্ঞাসা হতে পারে তার সব কিছুর সমাধানের এক বিশাল ব্যাপ্ত নিপুণ পরিকল্পনা জাতির হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। কিন্তু এতো বাহ্য। এ সবের চেয়েও তাঁর ব্যক্তিত্ব আরো অনেক বড়, বিশাল। সেই বিশাল ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াতে গিয়েই আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ"।—তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন কোনো বাঁধা-ধরা ছকে ফেলে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা দুরাশা! তিনি বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও প্রথম সচেতন সোস্যালিস্ট অভিধায় চিহ্নিত। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের দুঃস্থ দুঃখীদের জন্য নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করেন। মানুষের অপরিসীম বেদনা ও দুর্দশা দেখে অশ্রুপ্লাবিত। বিশ্বের সঙ্গে একাত্মা হয়েও তিনি আমাদের জাতীয়তার মহান উদ্গাতা। আবার জাতীয়তাবাদের আদিগুরু হয়েও বিশ্বসৌভ্রাত্র্য ও আন্তর্জাতিকতার শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা। সচেতন সাহিত্যশিল্পী না হয়েও তাঁর সাহিত্য, তাঁর কাব্য-কবিতা—তাঁর পত্রাবলী, তাঁর বক্তৃতাবলী—মানুষের মনে আগুন জ্বালে। মানুষকে প্রবুদ্ধ করে। ঊর্ধ্বায়ত চেতনায় সমুত্তীর্ণ করে। এই সব আপাতঃ-বৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতার সমাধান করতে হলে যেতে হবে আরো মর্মের গভীরে। যেতে হবে তাঁর গুরুর কাছে। এবং এই নিবন্ধের বিষয়বস্তুর সম্যক বিশ্লেষণের ও উন্মোচনের মধ্য দিয়েই আমরা হয়তো পৌঁছাতে পারব বিবেক-গঙ্গার গোমুখী-উৎসে। অন্ততঃ চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য শিব-অংশে জন্ম স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বলতে বা লিখতে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে শিবমহিম্নঃস্তোত্রের এই অংশটি: "অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে / সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী। / লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং / তদাপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

আমার নিবন্ধের বিষয়বস্তু ভারতাত্মা বিবেকানন্দ। ভারতাত্মা বলতে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সামগ্রিক রূপটিকে বোঝায়। কিন্তু আত্মা কথাটির মধ্যে যেন একটি শাশ্বত সত্যের ইঙ্গিতে আছে। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। / ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥ / অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ। / নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ / ইত্যাদি এই সব আশ্চর্য পংক্তিগুলি আমাদের মনে পড়ে। হাজারো আঘাত বিপর্যয়ের মধ্যেও ভারত-সভ্যতার মৃত্যুঞ্জয়ী চিরকালীন কথাটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অলডাস হাক্সলি কথিত সেই পেরিনিয়াল ফিলোজফির কথা স্মরণে আসে। প্রশ্ন ওঠে, ভারত-সংস্কৃতির উপাদানে কী সেই শাশ্বত বস্তু যা চিরকাল দেদীপ্যমান হয়ে আছে—সহস্র সহস্র বছরের ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্র-বৃষ্টি-প্লাবনে ও নানা বিপরীত তরঙ্গের অবিরাম আঘাতেও যা মরেনি? তারই সন্ধান করতে প্রয়াসী হব এই নিবন্ধে। এককথায় বলা যায় বিশ্বচেতনা-বোধ সকলের মধ্যে সর্বত্র এক অমল অস্তির অবিনাশনা বা সর্বাস্তিবাদ এবং প্রেমের সৌভ্রাত্র্য-বন্ধনে সকলকে গ্রহণ করার মহাসমন্বয়বাদ এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সকল মানুষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির সাধনাই ভারতসংস্কৃতির মৌল একটা চিত্রলক্ষণ এবং বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে শ্রেষ্ঠতম অবদান।

কিন্তু এই বিষয়বস্তু ঠিক একালের অবক্ষয়-পীড়িত এবং নানা মতবাদ-লাঞ্ছিত অত্যাধুনিক-দের কাছে কতটা প্রিয়তা অর্জন করবে—আমি জানি না। কারণ সমকালীন সমযুগের মানুষ আমরা অন্ধকারে হারিয়ে গেছি। যে মহান পিতৃপরিচয়ের নষ্ট কোষ্ঠি—স্বামী বিবেকানন্দ উদ্ধার করে জাতির হাতে তুলে দিয়েছিলেন—তা আবার আমরা হারিয়ে ফেলেছি। হারিয়ে ফেলেছি বলেই পিতৃপরিচয়হীন জাতির শিয়রে, তার চারিদিকে আজ এত দুর্ভাগ্যের কালোছায়া ও লাঞ্ছনা ও অপমানের অন্তত ঘনঘটা। শিকাগো ধর্মমহাসভা শুধু একটি বক্তৃতার আসর মাত্র নয়, এখানেই প্রথম সমগ্র জাতির হয়ে স্বামীজী আমাদের জাতির পিতৃপরিচয় উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন।

স্বামীজী সাবধানবাণী জাতির কর্ণে অনেক আগেই তুলে দিয়ে গেছেন। "Ah inspite of the sparkle and glitter of western civilization, inspite of all its polish and its marvellous manifestations of power, standing upon this platform, I tell them to their face that it is all vain. It is vanity of vanities. God alone lives, the soul alone lives, spirituality alone lives. Hold on to that." আরো স্পষ্ট করে বলেছিলেন, "There are two great obstacles on our path in India, the Scylla of old orthodoxy and the Charybdis of modern European civilization. Of these two, I vote for the old orthodoxy and not for the European system; for the old orthodoxman may be ignorant, he may be crude, but he is a man, he has a faith, he has strength, he stands on his own feet: while the Europeanised man has no backbone, he is a mass of heterogeneous ideas picked up at random from every source—and these ideas are unassimilated, undigested, unharmonised"—এই unassimilated, undigested, এবং unharmonised—শিক্ষা ও সংস্কৃতিসঙ্করের প্রবণতাই আমাদের সর্বনাশের মূল কারণ। বন্ধু প্রিয়নাথ সিংহকে বলেছিলেন, "তোরা বিলেত যাবি—তাও তিমিরি হয়ে, কিনা বিদ্যে দাও। কেউ গিয়ে বড় জোর তাদের ধর্মের দুটো তারিফ করে এলি, বড় বাহাদুরি হল। কেন, তোদের দেবার কিছু নেই? অমূল্য রত্ন রয়েছে (ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা'সবে অবোধ আমি অবহেলা করি—পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ—তাঁরই প্রিয় কবির উক্তি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। কিন্তু তিনি মা'র আজ্ঞা পালন করে শেষ পর্যন্ত পূর্ণমণিজ্ঞানে দীপ্ত মাতৃভাণ্ডারখানি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন), দিতে পারিস—ধর্ম যে, মনোবিজ্ঞান যে, সমস্ত জগতের ইতিহাস পড়ে দেখ যত উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল ভারত জনসমাজে ভাবের খনি হয়ে এসেছে"। বলেছেন, "তোদের এই তিমিরী নাম ঘুচাবার জন্যেই ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।—কিন্তু হলে হবে কি? আমরা এখনো সেই তিমিরে সেই তিমিরে।　　[ক্রমশঃ]

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী বিবেকানন্দ কাশীতে বলরামবাবুর দেহত্যাগের কথা শুনিয়া যখন অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন তখন প্রমদাবাবু স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন : 'আপনি সন্ন্যাসী হয়েও এতো শোকাকুল কেন ? সন্ন্যাসীর পক্ষে শোক প্রকাশ করা অনুচিত'। স্বামীজী সেইকথা শুনিয়া উত্তরে বলিয়াছিলেন : 'বলেন কি ? সন্ন্যাসী হয়েছি বলে হৃদয়টা বিসর্জন দেব ? প্রকৃত সন্ন্যাসীর হৃদয় সাধারণ লোকের হৃদয় অপেক্ষা বরং আরও অধিক কোমল হওয়া উচিত। হাজার হোক, আমরা মানুষ তো বটে। আর তাছাড়া তিনি যে আমার গুরুভাই ছিলেন। যে সন্ন্যাসে হৃদয় পাষাণ করতে শিক্ষা দেয়, আমি সে সন্ন্যাস গ্রাহ্য করি না'।[১]

এই ঘটনা হইতে বুঝিতে পারা যায় শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদিগের হৃদয় কতখানি পূর্ণ ছিল এবং সকল গুরুভাইদের চিন্তাধারা কত উচ্চস্তরের ছিল—যাহা সাধারণ মানুষের চিন্তার বাহিরে।

কিছুদিন কাশীধামে অবস্থান করিয়া কালীপ্রসাদ সুস্থ হইলেন এবং পুনরায় তীর্থপরিক্রমায় বহির্গত হইতে সঙ্কল্প করিলেন। কালীপ্রসাদের পক্ষে কল্পনা করাও যা—তাহা বাস্তবে পরিণত করাও তা। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন পরিভ্রমণকালে অর্থ স্পর্শ করিবেন না, মাধুকরী করিয়া সারা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিবেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) দুইজনে কালীপ্রসাদকে অনুরোধ করিলেন কাশীতে বংশীদত্তের বাড়ীতেই কিছুদিন থাকিয়া যাইতে, কিন্তু কালীপ্রসাদ তাঁহাদিগের নিকট তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা উল্লেখ করিলে তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন।

যাহাহউক কালীপ্রসাদ শরৎ মহারাজ ও গুপ্ত মহারাজের অনুমতি লইয়া এলাহাবাদ-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এলাহাবাদে উপস্থিত হইয়া তিনি মনের আনন্দে যমুনার ধারে একটি ঝুপড়ী বা গুহার অনুসন্ধান করিয়া তাহার মধ্যে তপস্যা ও শাস্ত্রালোচনা করিয়া দিনাতিপাত করিতে মনস্থ করিলেন। এলাহাবাদে যমুনার ধারে ধারে ঐরূপ বহু ঝুপড়ী বা গুহা দেখিতে পাওয়া যায় এবং বহু সংসারত্যাগী সাধু-মহাত্মারা ঐখানে থাকিয়া তপস্যা করেন। কালীপ্রসাদও তাহাই করিলেন। ঐস্থানে একটি ঝুপড়ী বাছিয়া লইয়া তাহার মধ্যেই অন্যান্য সাধুদের সহিত শাস্ত্র-আলোচনা এবং ধ্যান-ধারণা করিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন পূর্বাহ্নে গ্রামের দিকে যাইয়া মাধুকরী করিতেন ও একবার আহার সমাপন করিতেন। কালীপ্রসাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া সেখানকার সাধু-সন্ন্যাসীরা একান্ত সম্মান ও সমাদর করিতেন। কালীপ্রসাদেরও আনন্দের সীমা থাকিত না।

তাহার কিছুদিন পরে কাশী হইতে অকস্মাৎ গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) অনুসন্ধান করিতে করিতে তথায় (এলাহাবাদে) উপস্থিত হইলেন এবং কালীপ্রসাদকে তথায় পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। কালীপ্রসাদও হঠাৎ গুপ্ত মহারাজকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। তখন

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ : 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি কালীপ্রসাদের নিকট শাস্ত্রাদি পাঠ করিবেন এবং প্রতিদিন বিচারসাগর (হিন্দী বেদান্তগ্রন্থ) ও সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবেন। যমুনার ধারে ধারে অসংখ্য ঝুপড়ী দেখিয়া গুপ্ত মহারাজের ইচ্ছা হইল ধ্যানধারণা এবং শাস্ত্রপাঠ করিয়া এলাহাবাদে সময় অতিবাহিত করেন। গুপ্ত মহারাজের অন্তরের সঙ্কল্প জানিয়া কালীপ্রসাদ আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন যে, তাহার ঝুপড়ী একটু বড় আছে সুতরাং দুইজনে একসঙ্গে অনায়াসে থাকিতে পারিব। গুপ্ত মহারাজের সঙ্কল্প কার্যে পরিণত হইল। কালীপ্রসাদ ও গুপ্ত মহারাজ দুইজনে মাধুকরী করিতেন। আবার কোন কোনদিন একাই গুপ্ত মহারাজ মাধুকরী করিতে যাইতেন এবং যাহা পাইতেন তাহা দুইজনে ভাগ করিয়া একবেলা আহার করিতেন। তাহারপর রাত ও সারাদিন একসঙ্গে দুইজনে ঝুপড়ীতে বসিয়া বিভিন্ন শাস্ত্র আলোচনা এবং বিশেষ করিয়া বেদান্ত-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। সাধন-ভজনে মগ্ন থাকিয়া দুইজনে বেশ মনের আনন্দে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের আনন্দ-ধনি হইতে তাঁহারা অনাবিল আনন্দ আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সকল তীর্থযাত্রায় কত রকম ভয়, কষ্ট ও কত বিপদের মুখ হইতে তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন তবুও মনের আনন্দ, সদ্বশক্তি, অন্তরের সাহসকে ক্ষণেকের জন্যও তাঁহারা বিসর্জন দেন নি। তাহাছাড়া একান্ত স্পষ্টভাষী আর অসীম সাহস ছিল কালীপ্রসাদের জীবনপথের পাথেয়। ●

॥ হে রুদ্র বৈশাখ ॥

শ্রীঅজিত কান্তি সরকার
(কাব্যসুধানিধি)

হে রুদ্র বৈশাখ, তুমি ধরাবক্ষে এসেছ আবার ;
তোমার বন্দনাগানে মুখরিত নিখিল সংসার।
নয়নে তোমার জ্বলে বহ্নিশিখা ; হে ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসী,
ভস্ম ক'রে দাও আজ ধরণীর আবর্জনা রাশি।
যুগান্ত-সঞ্চিত যত বঞ্চনার কর অবসান,
বাজুক পৃথিবীবক্ষে সত্যশিব সুন্দরের গান।
নীচতা অন্যায় লোভ যাক্ দূরে যাক্,
নবমন্ত্র উচ্চারিয়া এসো হে বৈশাখ।
ভয়াল মূরতি ধ'রে তুমি আজ এসেছ ভূতলে,
তোমার পিঙ্গল জটা অগ্নিশিখা সম যেন জ্বলে।
দীপ্ত দীপক রাগে রুদ্রবীণে উঠুক ঝঙ্কার,
তোমার ধনুকে দাও মহারবে আকর্ণ টঙ্কার।
কপট হিংসার বক্ষে তীক্ষ্ণ শর হানো জোরে হানো,
বেদনার লয় হোক্—পৃথিবীতে আনো আলো আনো।
প্লাবন বহিয়া যাক্ আনন্দ-সুধার,
হে বৈশাখ, নমস্কার লহ বসুধার।

●

॥ পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

সমবেত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

আমার আলোচ্য বিষয়টি এমনই নীরস ও দার্শনিক যে, আমার ভয় হয়, হয়তো বা আপনাদের তা' চিত্তাকর্ষক না-ও হতে পারে। আমার বক্তব্য-বিষয় হচ্ছে হিন্দুদের বেদান্ত-দর্শন। 'পঞ্চদশী'-গ্রন্থে ঐ দার্শনিক মতবাদের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—সেই সম্পর্কেই আমি বলবো।

বক্তব্য বিষয় আরম্ভের পূর্বে প্রথমে আমি 'বেদান্ত'-শব্দটির অর্থ, আর কেমন করে তা' ভারতে বিশেষ এক দার্শনিক মতবাদের পরিচিতি লাভ করেছিল—সে-সম্পর্কে আপনাদের কাছে বলবো।

সংস্কৃত 'বেদ' ও 'অন্ত'-শব্দদুটির সমন্বয়ে 'বেদান্ত' পদটি গঠিত হয়েছে। 'বেদ'-শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু হ'তে। 'বিদ্' অর্থাৎ জানা। কাজেই 'বেদ'-শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। 'জ্ঞান' একটি সাধারণ পদ—বহির্বিষয়ের জ্ঞানও হ'তে পারে, আবার অন্তর্বিষয়ের জ্ঞানও হ'তে পারে; প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞানও হ'তে পারে, আবার অপ্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞানও হ'তে পারে; বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত আপেক্ষিক জ্ঞানও হ'তে পারে, আবার সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ জ্ঞানও হ'তে পারে,—অন্যভাবে বলা যায়—সে সকল বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়, বোধগম্য নয়, অনুভূতিগ্রাহ্য নয়, চিন্তা ও কল্পনারও অতীত। 'অন্ত'-শব্দটির অর্থ 'শেষ' বা বেদের পরবর্তী অংশ। সুতরাং 'বেদান্ত' হচ্ছে জ্ঞানের সেই অংশ—যার সাহায্যে আমরা আন্তর্জাতিক বা মানসিক, অতিপ্রাকৃত বা প্রকৃতির মধ্যেও অপার্থিব, সম্পর্কহীন নিরপেক্ষ সকল বস্তুর স্বরূপ জ্ঞাত হতে পারি। এ জিনিসটি হচ্ছে শর্তহীন শাশ্বত—সার্বজনীন আত্মা।

বেদান্তে এই নিরপেক্ষ শাশ্বত বস্তুটিকে বলে ব্রহ্ম। ইংরেজী 'নলেজ' (knowledge) শব্দটির অর্থ 'জ্ঞান'। 'নিরপেক্ষ শাশ্বতের জ্ঞান' কথাটির পরিবর্তে বেদান্তীরা 'ব্রহ্মজ্ঞান'-শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। কাজেই বেদান্ত হচ্ছে ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান।

'বেদান্ত'-শব্দের এটি শাব্দিক বা শব্দগত অর্থ, আর এ'জন্যই হিন্দুদের যে-শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাকে বলে বেদান্ত। এই লিখিত সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশের নাম উপনিষদ। হিন্দুগণ একে প্রত্যাদিষ্ট বলে বিশ্বাস করে।

আরও একখানি গ্রন্থ আছে—ভগবদ্গীতা। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে বেদান্ততত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, গ্রন্থখানিতে তার উল্লেখ আছে। বেদান্তীরা গ্রন্থখানিকে প্রামাণিক গ্রন্থ ব'লে গ্রহণ করেছেন। এই ভগবদ্গীতা ও উপনিষদগুলিই হচ্ছে বেদান্ত-দর্শনশাস্ত্রের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই বিভিন্ন দার্শনিক ও আর্ষ ঋষিগণ

বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক শাক্যসিংহের বহুপূর্বে ও এমন কি পরবর্তীকালেও বেদান্তের সুবিশাল সৌধ নির্মাণ করেছিলেন।

সহজতম ভাষায় রচিত উপনিষদগুলির মধ্যে বৈদান্তিক সত্যের এই ফুলগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় প্রথম দেখা যায়। পরে মহর্ষি বাদরায়ণ সেগুলিকে সংগ্রহ করে প্রতিটি ফুলকে তার যথোপযুক্ত স্থানে সন্নিবিষ্ট করে এমন একটি স্তবক রচনা করেছিলেন যে সর্বদেশের সর্বকালের সকল দার্শনিকের বিচারশীল ও সত্যান্বেষী নয়ন তা'তে মুগ্ধ হয়েছিল। এ সকল মহান্ দার্শনিক তত্ত্বকে তিনি সংক্ষিপ্তসারাকার বাক্যে রূপদান করেছিলেন। বাক্যগুলিকে বলা হয় বেদান্ত-সূত্র বা বাদরায়ণ-সূত্র। যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অন্তর্নিহিত পটভূমি উপলব্ধির জন্য এ সকল উপনিষদ, গীতা ও বাদরায়ণ-সূত্রগুলি তিনটি 'প্রস্থান' বা সোপান গঠন করেছে। এ'তিনখানি গ্রন্থ বেদান্ত-ভাবধারার আকর। তা' হলেও পরবর্তী যুগে এগুলির উপর গদ্যে-পদ্যে বিভিন্ন ভাষ্য, ব্যাখ্যা, টীকা, টিপ্পনীর বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। সেগুলি রচনা করেছিলেন পরবর্তীকালের শঙ্করাচার্য, তাঁর শিষ্যবর্গ ও অন্যান্য খ্যাতনামা অদ্বৈতবাদীগণ। পঞ্চদশী হচ্ছে বেদান্ত-দর্শনের এ রকমই একখানি গ্রন্থ। বৈদিক সাহিত্যের বিশিষ্ট ভাষ্যকার মাধবাচার্য (সায়ন) উক্ত গ্রন্থখানি পদ্যে রচনা করেছিলেন। মাধব যত গ্রন্থ রচনা করে গেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খুব কম লেখকই তা' পেরেছেন। প্রথম জীবনে মাধব ছিলেন দক্ষিণ ভারতের নৃপতি বুক্কের প্রধানমন্ত্রী। শঙ্করাচার্যের (খ্রীস্টোত্তর অষ্টম-নবম শতাব্দী) প্রায় চার শ' বৎসর পরে তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি মন্ত্রীত্ব, ধনসম্পত্তি, পার্থিব পদমর্যাদা প্রভৃতি সবকিছু পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করেন। ভারতীতীর্থ নামে এক সন্ন্যাসীর কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তদবধি তাঁর নাম হয়েছিল বিদ্যারণ্য।

পঞ্চদশীর প্রথম ছয়টি সর্গ রচনা করেছিলেন ভারতীতীর্থ; কিন্তু তারপর আকস্মিকভাবে তাঁর দেহত্যাগ হলে ঐ আরব্ধ-অসমাপ্ত কর্মের দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর এ শিষ্যের উপর। গ্রন্থের পরবর্তী নয়টি সর্গ তিনি রচনা করেছিলেন। 'পঞ্চদশী'-শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃত 'পঞ্চদশ' হতে। 'পঞ্চদশ' অর্থ পনেরো। উক্ত গ্রন্থখানিতে মোট পনেরোটি সর্গ আছে বলেই তার নাম হয়েছে 'পঞ্চদশী'। পঞ্চদশীতে সর্বমোট পনেরোশো-ত্রিশটি শ্লোক রয়েছে; সমগ্র গ্রন্থখানি পাঁচটি সর্গ করে মোট তিন খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম সর্গে সর্বনিয়ন্ত্রণমুক্ত নিরপেক্ষ ব্রহ্মের স্ব-ভাব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আমরা কিন্তু সর্বনিয়ন্ত্রণমুক্ত এই ব্রহ্মের কোন সংজ্ঞা নিরূপণ করতে পারিনে। তার কারণ, মানব-মনের প্রতিটি চিন্তা বা বিচারশক্তি হচ্ছে কোন-না-কোন বিষয়সাপেক্ষ বা শর্তাধীন,—আর ব্রহ্ম হচ্ছেন সে-সকলকিছুর ঊর্ধ্বে। ব্রহ্ম দেশ-কাল-বহির্ভূত, মানুষের চিন্তার অনধিগম্য, সমস্ত প্রকাশক্ষমতার অতীত। তিনি আমাদের চৈতন্যের বিষয়বস্তুও ন'ন। আমাদের মন তাঁর কাছে যেতে পারে না। তিনি আমাদের যাবতীয় প্রকাশ-শক্তির ঊর্ধ্বে। তিনি বর্ণনার অতীত,—তিনি বাক্যের অতীত। যে অবস্থায় পৌঁছালে মানুষের যাবতীয় সত্যানুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটে, সে-অবস্থায় না পৌঁছানো পর্যন্ত মানুষের মন কিন্তু সন্তুষ্ট হ'তে পারে না।

এ হচ্ছে এমন এক অবস্থা যেখানে অনিত্য, পার্থিব বস্তুর প্রতি যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা লোপ পায়, অনন্ত সুখ-শান্তি বিরাজ করে, অহম্-নাহম্- (ego and non-ego) প্রভৃতির সকল গুণের পরিসমাপ্তি ঘটে, আর সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক অখণ্ড বিশ্বচৈতন্যের সমুদ্রে ডুবে যায়। ঐ চরমস্বর্গসুখ ও একত্বের অধিচৈতন্য (superconscious) অবস্থার উপলব্ধি করে বৈদান্তিক ঋষিগণ ভেরীনিনাদে জগৎসমক্ষে প্রচার করেছিলেন—

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।'

—"সেই চৈতন্যময় একটি পরমসত্তাকে আমি লাভ করেছি ; অনুপম দিব্যালোকে তিনি দীপ্যমান, তমসার সীমা ছাড়িয়ে তাঁর অবস্থান। একমাত্র তাঁকে জ্ঞাত হলেই মানুষ মৃত্যুর অনধিগম্য দেশে পৌঁছাতে পারে। এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই"।

এই সকল প্রাচীন ঋষি সমাধির অবস্থায় (superconscious state) যে উপলব্ধি লাভ করতেন, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেবার জন্য তাঁরা বিভিন্ন নূতন নূতন শব্দ গঠন করতে লাগলেন। ঐ সকল শব্দের অধিকাংশই নেতিমূলক। এদের বৈশিষ্ট্যগুলি সবই নেতিমূলক ; যেমন—এইটি বর্ণহীন, অবয়বহীন, গন্ধহীন ইত্যাদি। সেই অদ্বিতীয় এক (Absolute) বা ব্রহ্মকে নির্দেশ করতে খুবই কম ইতিবাচক শব্দ সঠিক বলে গৃহীত হয়েছে। আমাদের ব্যবহৃত শব্দগুলি আপেক্ষিক ও সেগুলি প্রত্যেকে এক-একটি শর্তযুক্ত ভাব বহন করে। অপরপক্ষে ব্রহ্ম হচ্ছেন নিঃশর্ত—সর্বশর্তমুক্ত। কাজেই, যিনি নিঃশর্ত, তাঁর বর্ণনাপ্রসঙ্গে আমাদের বিশেষ সতর্ক হ'তে হবে। তখন শব্দটিকে তার সাপেক্ষ অর্থে ব্যবহার না করে নিঃশর্ত অর্থে ব্যবহার করতে হবে। মনে করুন, ব্রহ্মকে বর্ণনার জন্য যদি আমরা 'অস্তিত্ব', 'বুদ্ধি', 'স্বর্গসুখ' প্রভৃতি শব্দগুলি ব্যবহার করি, তবে আমরা সেখানে সে-সকল শব্দের প্রচলিত সাধারণ অর্থ ধরব না,—আমরা শব্দগুলিকে তাদের শর্তহীন অর্থেই ধরব ; কিংবা পঞ্চদশীর ভাষায় তাদের বাচ্যার্থে নয়, লক্ষ্যার্থে ধরব। আর, সেজন্যই পঞ্চদশীতে ব্রহ্মকে বর্ণনা করা হয়েছে সৎ-চিৎ-আনন্দ হিসাবে। এই গ্রন্থে এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, মানবাত্মা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ,—তবে কিনা, মায়ার সম্মোহনীশক্তিতে তা' শর্ত-সাপেক্ষ অবস্থায় রয়েছে। আর, সেজন্যই মানবাত্মাকে ব্রহ্ম হ'তে পৃথক বলে মনে হয়—সে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করে, সে চিন্তা, বিচার, অনুভব, উপলব্ধি প্রভৃতি কর্ম করতে বাধ্য হয়।

এই মায়া জিনিসটি কী ? আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক ঘটনাবলী—যে সনাতন শাশ্বত শক্তির অভিব্যক্তি এই বিশ্বজগৎ—বেদান্তীরা সেই নিত্য শক্তিকেই মায়া নামে বিভূষিত করেছেন। এই মায়া লীলাচ্ছলে ব্রহ্মসমুদ্রে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, আর তা'কেই আমরা বলে থাকি প্রকৃতির বাস্তিক (organic) ও অবাস্তিক (inorganic) কার্য। অণু-পরমাণু হয়ে মায়াই নিজেকে ব্যক্ত করে—নানারূপে প্রকাশ করে। যাবতীয় মৌলিক পদার্থ সৃষ্টির জন্য মায়াই অণু-পরমাণুকে আকর্ষণ করে, সেগুলিকে পরস্পর সংযুক্ত করে ; আবার এই মৌলিক পদার্থগুলি দিয়েই অসংখ্য বিশাল সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও সৌরজগৎগুলি গঠিত হয়েছে। যে

সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিধরের অঙ্গুলিহেলনে এই বিশাল সৃষ্টির প্রকাশ ঘটেছে. তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করতে গিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীরগণ পর্যন্ত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যান। মায়া বিভেদ সৃষ্টি করে; জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে. বিভেদ বা পার্থক্য তাই মায়ারই সৃষ্টি। এই অভিক্ষেপণ কিংবা এই দৃশ্যমান জাগতিক রূপ কেবলমাত্র মায়া বা অজ্ঞানতার জন্যই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই মায়া বা প্রকৃতি ত্রিগুণান্বিতা—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। 'পঞ্চদশী'-গ্রন্থে 'মায়া'-র সর্বব্যাপক ও সাধারণ ভাবটি বুঝানোর জন্য 'প্রকৃতি'-শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; 'মায়া'-শব্দটিকে সেখানে সামান্য সঙ্কুচিত অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(চৌদ্দ)

॥ সঙ্গীতে বর্ণ ও অলঙ্কার ॥

আচার্য শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে আরোহীবর্ণের অলঙ্কারের প্রায় সবগুলির নামোল্লেখ করেছেন। তবে টীকায় সিংহভূপাল কিছু-কিছু অলঙ্কারের সম্পর্কে 'মতান্তরেণ গাত্রবর্ণস্য নিকর্ষাত্মকভাবমাহ —নিকর্ষসৈবেতি' বলেছেন। তাছাড়া অলঙ্কারের নাম-সম্পর্কে মতভেদও আছে—'সপ্তমঃ সপ্তরুদ্র উচ্চার্যতে তমলংকারং শিবপ্রিয়ঃ শার্ঙ্গদেবো হসিতমিতি ব্রুতে'। কিংবা সিংহভূপাল বলেছেন: '...তদাহসাবলংকারঃ প্রেঙ্খিতনামাহথবা ক্রমনামা ভবতি'। মিথিলার নান্যভূপাল বা নান্যদেব-রচিত ভরতভাষ্যের পাদটীকার অনুবাদকও কয়েকটি নামভেদের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: 'নিহুম্বিত = নিকর্ষ, উদ্গীত = উহিত, উপলোলক, অবলোকিত, অত্যুচ্চয়, ব্যালিত, প্রস্থার ইত্যাদি'। এ'প্রসঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাজা নান্যদেব ভরতভাষ্যে অলঙ্কারপ্রসঙ্গে 'গান্ধর্ব'-গানের কথা উল্লেখ করেছেন: 'যানি দেবতাহলংকারভেদজাতানি তানি তু, যোজ্যানি সর্বগান্ধর্বে সপ্তশীতিষু জাতিষু'। এখানে 'গান্ধর্ব'-শব্দ বিশেষার্থে প্রয়োগ করা হয়েছে বুঝতে হবে।

সে যাইহোক আচার্য ভরত নাট্যশাস্ত্রে ২৯শ অধ্যায়ে (বোম্বাই-কাব্যমালা-সংস্করণ, পৃঃ ৫৫৫) প্রথমে 'অত-ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি বর্ণালংকারলক্ষণম্' (২৯।১৬) বলে আরম্ভ ক'রে ২৯।২৩ শ্লোকপর্যন্ত 'প্রসন্নাদিঃ প্রসন্নান্তঃ প্রসন্নান্তস্ত এব চ, প্রসন্নমধ্যাক তথা···' প্রসন্নাদি অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন। এরপর আচার্য ভরত বলেছেন—

'প্রস্তারশ্চ প্রসাদশ্চ স্থায়িবর্ণসমাশ্রয়ঃ।
অথ সংচারিভাবস্থঃ কীর্ত্যমানাস্ত্রিবোধত ॥' —প্রভৃতি।

এ'প্রসঙ্গে সঙ্গীত-রত্নাকরে বলা হয়েছে—

'প্রস্তারোহথ প্রসাদঃ স্যাৎসপ্তে তে স্থায়িনি স্থিতাঃ।
যত্রঃ প্রকরণেহত্র স্যাদ্মূর্ছনাপ্রথমঃ স্বরঃ ॥' —প্রভৃতি।

ভারতভাষ্যে রাজা নান্যদেব অনুরূপভাবে পরিচয় দিয়েছেন—যদিও 'প্রস্তারঃ'-শব্দটি নিয়ে নাট্যশাস্ত্রের কোন কোন সংস্করণে পাঠভেদ আছে। তবে মনে হয় 'প্রস্তার'-শব্দই শুদ্ধ। প্রস্তার, প্রসাদ এবং প্রসরাদি (প্রসর আদিতে বা প্রথমে ব্যবহৃত যার, বা যে অলঙ্কারের), প্রসন্নান্ত, প্রসন্নাদ্যন্ত, প্রসন্নমধ্য, ক্রমহীন পঞ্চম ('পঞ্চমঃ ক্রমরেচিতঃ') = সাতটি অলঙ্কার স্থায়ীবর্ণে ব্যবহৃত হয়। এ'প্রকরণে মূর্ছনার প্রথম স্বর মন্দ্র (bass)—'মন্দ্রঃ প্রকরণেঽত্র স্যান্মূর্ছনাপ্রথমঃ স্বরঃ' (৬।৬)। পণ্ডিত কল্লিনাথ (টীকা—কলানিধি) অপেক্ষা সিংহভূপাল 'সুধাকর'-টীকায় বিশদ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন, (সঙ্গীত-রত্নাকর, আডেয়ার-মাদ্রাজসংস্করণ পৃঃ ১৫৬—১৬৮ দ্রষ্টব্য)।

অলঙ্কারগুলিকে স্বর ও বর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গীতে ব্যবহারিকভাবে প্রয়োগ করার নিয়ম এবং এই নিয়ম পালন করলে সঙ্গীতে বিচিত্র রসের লীলারূপে প্রাণের স্পন্দন সৃষ্টি হয়—যে সৃষ্টি সঙ্গীতের রূপকে সচল ও প্রাণচঞ্চল করে। শিল্পসেবীমাত্রেরই পাশ্চাত্যদর্শনের Aesthetic বা সৌন্দর্যতত্ত্বের এবং ভারতীয় দর্শনের অলঙ্কার ও রসতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত হওয়া উচিত, এবং মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় সঙ্গীতে প্রাণসঞ্চার করতে হলে ভারতীয় অলঙ্কার ও রসতত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হলে সঙ্গীতকে সার্থকভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না। পাশ্চাত্য সঙ্গীত স্বরময়, বর্ণময় ও মাধুর্যময় হলেও ভারতীয় সঙ্গীতের স্বররূপ, বর্ণরূপ ও প্রকাশরূপ পাশ্চাত্যসঙ্গীত থেকে বেশ স্বতন্ত্র বা পৃথক।

ভারতীয় সঙ্গীতে অলঙ্কারগুলির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। দু'একটি উদাহরণ যেমন—

১। প্রস্তার-অলঙ্কার— স রি র্স। স গ ম র্স। স প ধ নি র্স।

২। প্রসাদ-অলঙ্কার— স রি স। স গ ম স। স প ধ নি স। প্রভৃতি।

এ'ভাবে গাত্রবর্ণ, শিবপ্রিয়, প্রেঙ্খিত, আক্ষিপ্ত, সন্ধিপ্রচ্ছাদন, উদ্গীত, উদ্বাহিত, ত্রিবর্ণ, বেণি প্রভৃতি অলঙ্কারে স্বরপ্রয়োগ বা স্বরব্যবহারের বৈশিষ্ট্য আছে এবং সে'গুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ না করলে স্বরগতি, বর্ণগতি ও এমন কি রাগগতি প্রভৃতিকে নিয়ে সঙ্গীতের সৃষ্টি অসার্থক বলেই প্রমাণিত হবে। অলঙ্কারে স্বরপ্রয়োগের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, সেই বৈশিষ্ট্য রাগে ও গানে রসমাধুর্যের মধ্যে এক বিশিষ্ট রূপ ও অসামান্য ভাব সৃষ্টি করে এবং এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন ক'রেই ভারতীয় সঙ্গীত আপনার অপার্থিব আদর্শকে রক্ষা করে আসছে বহুযুগ ধ'রে। শাস্ত্রজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ মনীষীরা এ'সকল বৈশিষ্ট্যসম্বন্ধে চিরদিনই অবহিত এবং সেজন্য গুরুপরম্পরাক্রমে ভারতীয় সঙ্গীতসমাজে সঙ্গীতের আভিজাত্য, মাধুর্য ও সৌন্দর্যদৃষ্টির মান অক্ষুণ্ণ আছে বা রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা পরিশেষে বিযুক্ত, উপলোল ও উল্লসিত অলঙ্কারের স্বরপ্রয়োগরীতির নিদর্শন উল্লেখ ক'রে বর্তমান আলোচনা শেষ করি—

(১) বিযুক্ত-অলঙ্কার— সগসগ, রিমরিম, গপগপ, মধমধ, পনিপনি।

(২) উপলোল-অলঙ্কার— সরিগরি, গরিগরি, রিগরিগমগমগ, গমগমপমপম, মপমপধপধপ, পধপধনিধনিধ।

(৩) উল্লাসিত-অলঙ্কার— সসগগসগ, রিরিমরিম, গগপগপ, মমধমধ, পপনিপনি।

এই স্বরপ্রয়োগগুলি হয়তো আমরা স্বরসাধনার প্রাথমিক সঙ্গীতশিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহার করি, অথচ অলঙ্কারগুলির রূপের ও নামের সঙ্গে অনেক সময়ে যথাযথভাবে পরিচিত হতে পারিনি—যা মোটেই প্রশংসনীয় নয়।

অলঙ্কারের প্রসঙ্গে চতুর কল্লিনাথের টীকা উল্লেখ ক'রে পুনরায় বলি : 'বর্ণসন্দর্ভোঽলংকার ইত্যেতাবৎউক্তে বর্ণবিশেষে সঞ্চারিণি ব্যাভিচারঃ স্যাৎ।* * * ইহ প্রসন্নাদিপ্রভৃতীনামলংকারত্বং গীতিরেতৈরলংক্রিয়তে ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা, লোকে হারাদিভির্নারী কাব্যে বাহুপ্রসাদিভী রসাদিস্তথৎ।'[১]

সিংহভূপাল বিবিধ অলঙ্কারের পরিচয় দিয়ে বলেছেন (পুনরুল্লিখিত হ'ল)—

(১) 'মন্দ্রস্বরাৎপরে তারে প্রসন্নাদিকলীরিতঃ। স॑ স॑ স॑।'

সিংহভূপাল বলেন : 'মন্দ্রস্বরবয়মুচ্চার্য যদি সকৃত্তারস্বর উচ্চার্যতে তদা প্রসন্নাদিলংকারঃ'। সঙ্গীত-রত্নাকরে মন্দ্রস্বরের (bass note) চিহ্ন স্বরের উপরে বিন্দু (˙) এবং তার-স্বরের পরিচয় (acute note) উপরে দাঁড়ি (।)। বর্তমান সমাজে এই চিহ্নের পরিবর্তন হয়েছে।

(২) 'তদ্বৈলোম্যে প্রসন্নান্তঃ। স॑ স॑ স॑।'

সিংহভূপাল বলেন : 'তস্য প্রসন্নাদেবিপরীতত্বে পূর্বং সকৃত্তারঃ পশ্চাদ্ বিমন্দ্রশ্চেৎ তা প্রসন্নান্তঃ'।

(৩) 'দীপ্তে প্রসন্নাদ্যন্তঃ স্যাৎ। স॑ স॑ স॑।'

সিংহভূপাল বলেন : 'যদি পূর্বং মন্দ্রঃ পশ্চাদীপ্তঃ পুনরপি মন্দ্রস্তদা প্রসন্নাদ্যন্তঃ'।

(৪) 'মন্দ্রে প্রসন্নমধ্যাখ্যমলংকারং বিদো বিদুঃ। স॑ স॑ স॑।'

সিংহভূপাল বলেন : 'যদি পূর্বং তারঃ পশ্চান্মন্দ্রঃ পুনরপি তারস্তদা প্রসন্নমধ্যঃ'।

সিংহভূপাল পরবর্তী ক্রমরেচিত (সরিস সগমস সপধনিস), প্রত্যায় (সরিস সগমস সপধনিস), প্রসাদ (সরিস সগমস সপধনিস), বিস্তীর্ণ (সা রী গা মা পা ধা নী), নিকর্ষ (সস রিরি গগ মম পপ ধধ নিনি), গাত্রবর্ণ (সসস রিরিরি গগগ মমম পপপ ধধধ নিনিনি), বিষাদ্য,

১। অলঙ্কারগুলির পুনরুল্লেখের প্রয়োজনীয়তা এখানে এজন্য যে, বর্তমানে প্রাচীন ভারতের সঙ্গীতের ব্যাকরণের সঙ্গেই কেবল পরিচিত, তার বাস্তব বা ফলিত রূপের প্রতিপাদনে আমরা আগ্রহী ও যত্নশীল নই। আগ্রহী ও যত্নশীল নই কেন—সেকথা অবশ্য বলেছি, কিন্তু তাহলেও পুনরায় বলি যে, অলঙ্কার ও রসের প্রয়োগে সাধনার সামগ্রীকে প্রাণোজ্জ্বল করার উপযোগিতা আমরা যেমন বর্তমানে কাব্যে ও সাহিত্যে অনুভব করি, তেমনি সঙ্গীতে করি না। বিশেষ ক'রে বর্তমান যুগের সঙ্গীতশিল্পীরা সঙ্গীতে যথার্থ-আদর্শ একরকম বিস্মৃত হয়েই গেছেন, এজন্য সঙ্গীতের সৃষ্টিও বর্তমানে তাঁদের ও জনসাধারণের জীবনের সত্যকারের প্রেরণা সঞ্চার করতে পারে না।

সমুচ্চয়, শিবপ্রিয় বা হসিত (শার্ঙ্গদেব শিবপ্রিয়-অলঙ্কারকে হসিত বলেছেন—'প্রাহ হসিতং তং শিবপ্রিয়ঃ'। ...অলংকারং শিবপ্রিয়ঃ শার্ঙ্গদেবো হসিতামিতি ব্রুতে'—সিংহভূপাল), প্রসাব বা প্রেঙ্খিত বা ক্রম ('তদাহপ্রসারসংকারঃ প্রেঙ্খিতনাম্নাঽথবা ক্রমনাম্না ভবতি'—সিংহভূপাল), আক্ষিপ্ত, সিদ্ধিপ্রস্কন্দন উদ্গীত, বাহিত ('বাহিতাখ্যোঽলংকারঃ'), ত্রিবর্ণ প্রভৃতি অলঙ্কারের পরিচয় দিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি যে, একবার ' নামোল্লেখ করলেও পুনরায় গ্রন্থের পরিচয় দিলাম শার্ঙ্গদেবের ও টীকায় সিংহভূপালের প্রমাণবাক্য উদ্ধৃত ক'রে।

বর্ণ ও অলঙ্কারগুলি যে যথাযথভাবে জাতিরাগ, গ্রামরাগ ও ভাষারাগগুলিতে ব্যবহৃত হ'ত সঙ্গীত-রত্নাকরের রাগবিবেকাধ্যায়ে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শুদ্ধসাধারিত, ষড়্জমধ্যম, ষড়্জগ্রামরাগ, শুদ্ধকৈশিক প্রভৃতি রাগগুলির ব্যবহার কিভাবে করা হ'ত প্রাচীন-ভারতে—তার পরিচয় দিতে গিয়ে শার্ঙ্গদেব বলেছেন—

'ষড়্জমধ্যময়া সৃষ্টস্তারষড়্জগ্রহাংশকঃ ॥
* * *
অবরোহিপ্রসন্নান্তর্ভূয়ঃ ষড়্জাদিমূর্ছনঃ ॥ —প্রভৃতি।

কিংবা—

'কর্মারবাচ্চ কৈশিক্যাঃ সংজাতঃ শুদ্ধকৈশিকঃ ॥
* * *
সাবরোহি-প্রসন্নান্তঃ পূর্ণঃ ষড়্জাদিমূর্ছনঃ ॥'

কিংবা গান্ধারী ও রক্তগান্ধারী থেকে সৃষ্ট গান্ধার-পঞ্চম-গ্রামরাগে গান্ধার অংশ বা বাদী, গ্রহ এবং ন্যাসও গান্ধার, হরিণাশ্বা-মূর্ছনা প্রসন্নমধ্যম অলঙ্কার প্রভৃতি শোভিত। অকৃত-হাস্য-করুণ এই তিনটি রসসম্পৃক্ত গান্ধারপঞ্চম। প্রাচীন রাগ অর্থে খ্রীষ্টীয় শতকের প্রথমপাদ থেকে ১৩শ-১৪শ শতক, কিংবা তারও পরবর্তী কাল-পর্যন্ত গ্রামরাগ, ভাষারাগ ও দেশীরাগগুলিতে মূর্ছনা ও রসের মতো প্রসন্ন, প্রসন্নমধ্য, প্রসন্নান্ত প্রভৃতি অলঙ্কারেরও ব্যবহার ছিল সঙ্গীতের প্রকাশকে প্রাণবান করার জন্য। কাব্যভাবসম্পন্ন রসোজ্জ্বল সাহিত্যের সংযোগ তো ছিলই। যেমন টক্কৈশিক-গ্রামরাগের কথা বা সাহিত্য—

'শ্রীমৎ কট-তট-বিগলিত মদমদিরামোদমত্ত মধুপকুলসংকুলিশধরকমল'।

খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে বহু রাগই বর্তমান সমাজে অপ্রচলিত, সেই সবের স্থানে বহু রাগের নূতনভাবে সৃষ্টিও হয়েছে। কিন্তু তাহলেও সেই সব রাগে ও রাসসম্বলিত গানে মূর্ছনা, অলঙ্কার, রস ও ভাব প্রভৃতির অপরিহার্যভাবে সমাবেশ থাকতো—যেজন্য রাগরূপ ও সঙ্গীতরূপ প্রাণোজ্জ্বল ভাব নিয়ে শ্রোতাদের হৃদয়কে আনন্দায়িত করতো। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ১৬শ-১৭শ শতকে মুসলমানযুগের অনুপ্রবেশে রাগে, গানে ও সঙ্গীতের প্রকাশে বেশ-কিছু পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল। তখন থেকে রাগের ও গানের প্রকাশে শাস্ত্রনির্দিষ্ট রীতিনীতি ও পদ্ধতির প্রয়োগ অব্যাহত ছিল ঠিক কথা, কিন্তু বংশ ও শিষ্য-প্রশিষ্য-সাধনধারার সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন শিল্পীসমাজে নূতন ট্রাডিশন-সংরক্ষণনীতির কিছু-কিছু প্রবর্তন দেখা দিয়েছিল—যে সংরক্ষণনীতি আরও

প্রবল ও স্পষ্ট আকারে দেখা দিয়েছিল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১৭শ-১৮শ শতকের সঙ্গীতসমাজে। বর্তমানকালেও (বিংশ শতকে) সঙ্গীত-আলোচনার ক্ষেত্রে ঐ প্রয়োগরীতি ও পদ্ধতির অনুপ্রবেশ বেশ ভালভাবেই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই অনুপ্রবেশসম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে গেলে বলা যায়, ১৭শ থেকে ১৯শ-২০শ শতকের সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্র বেশ একটু আন্তরভাবনিষ্ঠাকে অতিক্রম ক'রে বাস্তববস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টিরই অনুগামী হয়েছিল বলা যায়, অর্থাৎ idealistic দৃষ্টি থেকে সরে এসে realistic দৃষ্টিরই অনুসারী হয়েছিল। সেজন্য রাগের ও গানের প্রকাশে সঙ্গীতাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে জীবনাদর্শও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ ও ম্লান হয়েছিল ও হয়েছে। বর্তমানের সঙ্গীতানুশীলনের প্রচেষ্টা ও প্রকাশ অবশ্য শেষোক্ত ভাবের প্রকাশক বলেই মনে হয়। সঙ্গীতানুশীলনের ক্ষেত্রে হিন্দোলরাগটির কথাই ধরা যাক্। হিন্দোলে মধ্যযুগেও আরোহীবর্ণের ও প্রসন্নাদি অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল, আর ব্যবহার ছিল বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস-তিনটির। হিন্দোল-সম্পর্কে শার্ঙ্গদেব ও টীকাকার কল্লিনাথের মধ্যে মূর্ছনার ও শ্রুতির প্রয়োগ নিয়ে কিছুটা মতভেদ থাকলেও হিন্দোলের রসপ্রকাশের ও ভাববিকাশের ব্যাপারে বিশেষ কোন মতদ্বৈত ছিল না। তেমনি রাগাঙ্গ বসন্তরাগটি হিন্দোল থেকে সৃষ্টি হয়েছিল (রত্নাকরের মতে)। বসন্তরাগকে সেই সময়ে 'দেশী-হিন্দোল' নামেও অভিহিত করা হ'ত, কিন্তু বসন্তরাগে হিন্দোলের মতো রসপ্রকাশে সার্থক রূপ ছিল। তখন কখনও বসন্তে বীর, রৌদ্র ও অদ্ভুত-রসের প্রাধান্য, আবার কখনও বা বীভৎস-রসের প্রাধান্য ও উদ্দীপনা ছিল। মোটকথা অলঙ্কারের প্রয়োগে মধ্যযুগেও রাগে ও সঙ্গীতে রস ও ভাব-মাধুর্যের আকুলতাকে বিশেষভাবে স্বীকার করা হ'ত।

এ'প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে, রস ও ভাবই শুধু সঙ্গীতশিল্পের নয়, ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতি সকল চারুকলারও প্রধান উপকরণ ছিল, অথবা বলা যায় যে, প্রাণস্বরূপ ছিল। যেমন লাবণ্যহীন পুরুষ ও নারী যথার্থ সৌন্দর্যের অধিকারী নয়, তেমনি রসপ্রকাশ ও ভাবসমৃদ্ধি ছাড়া সঙ্গীত সার্থক ও সুন্দর নয়। সেজন্য সঙ্গীতের প্রকাশে প্রথমে রসের ও পরে ভাবের দিকে লক্ষ্য দিতে হয়।

●

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক' ।।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(তিন)

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, কেবল সিংহবাহিনী মূর্তি স্মরণ করিয়াই সীতারাম পত্নীত্যাগের অধার্মিকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, ইহা একটি কারণ, তবে একমাত্র কারণ নহে। তিনি পূর্ব রাত্রিতে যখনই প্রথম শ্রীকে দেখিয়াছিলেন, তখনই মনে হইয়াছিল যে, 'আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া পাপাচরণ করিতেছি'। অর্থাৎ তাহার 'সিংহবাহিনী' রূপ দেখিবার আগেই যখন শ্রীকে প্রথম দেখিয়াছিলেন, তখনই তিনি পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়া যে পাপাচরণ

করিতেছিলেন, তাহা বুঝিয়াছিলেন। অর্থাৎ তখনই তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার রূপমুগ্ধ মনোভাবের উপর আবার তাহার 'সিংহবাহিনী' রূপ দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহার পত্নী-ত্যাগের পাপবোধ গাঢ়তর হইল। প্রথম দর্শনেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'শ্রীর চাঁদপানা মুখখানা, চলচল ছলছল জলভরা বলহারা চোখ দুটো বড় গোল করিয়া গিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্ট ভাষায় এখানে ব্যক্ত করিয়াছেন, 'রূপমোহ ? আ ছি ছি তা না', কিন্তু 'তা না' বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন, 'তবে তার রূপেতে, তার দুঃখেতে, আর সীতারামের স্বকৃত অপরাধে, এই তিনটায় মিশিয়া গোলযোগ বাধাইয়াছিল'। তবে এই তিনটার মধ্যে রূপের কথা প্রথমে আছে এবং সেই রূপমোহ হইতেই দুঃখ সহানুভূতি এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিবার পাপবোধ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং রূপমোহই হইতেছে সকলের মূল।

এই বিষয়ে 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে 'সীতারাম'-উপন্যাসের সীতারাম-চরিত্রে কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। তবে ব্রজেশ্বরের পিতা হরবল্লভ জীবিত ছিলেন বলিয়া তিনি পিতৃ-আচরণকে পাপাচরণ মনে করিয়া তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। সীতারামের বহু দিন পূর্বে পিতৃবিয়োগ হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার পিতার আচরণকে পাপা-চরণ মনে করিয়া তাহার বিরোধিতা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা এখানে সীতারামের অপরাধের মাত্রা বেশি। কারণ, ব্রজেশ্বরের পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু কাহিনীর আদ্যোপান্তই পিতার মৃত্যুর পরও সীতারাম শ্রীর কোনও সংবাদ লওয়া কর্তব্য বিবেচনা করেন নাই। আজ তাহার যৌবনশ্রী চোখের সম্মুখে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাইয়া তাঁহার পিতৃ-আচরণকে তিনি অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। শ্রীকে বিবাহ করিয়াও পিতৃ-আদেশে পরিত্যাগ করিয়া পিতার মৃত্যুর পরও তাহার কোন সংবাদ না লইয়া তাহার উপকার করিবার মধ্যে তাঁহার চরিত্রে কোনও মহত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে নাই। তাঁহার হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের মধ্যেও কোনও গৌরব প্রকাশ পায় নাই। তাঁহার মধ্যে রূপজ মোহজাত যে চারিত্রিক দৌর্বল্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে উচ্চতর চারিত্রিক গুণ বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছে। 'সীতারামে'র কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারও সীতারামের শ্রীকে প্রথম দেখিবার পর হইতে কেবলমাত্র শ্রীকে কেন্দ্র করিয়াই কাহিনী আবর্তিত হইয়াছে। শ্রীর জন্যই প্রথমাংশে গঙ্গারামের উদ্ধারের ঘটনা ঘটিয়াছে, শ্রীকে হারাইয়া সীতারাম তাহাকে ভুলিবার জন্যই তথাকথিত হিন্দুধর্মে উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, শ্রীর জন্যই গঙ্গারামের প্রতি সীতারামের দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফলে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, তিনি নিজেও বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে শ্রীর জন্য গঙ্গারাম মরিল এই কথা সত্য, কিন্তু গঙ্গারামের মৃত্যুর মধ্য দিয়া সীতারাম বাঁচিতে পারিলেন না, তাঁহারও পতন অনিবার্য হইয়া উঠিল।

কেবল মাত্র সীতারামের রূপজ মোহই এই উপন্যাসের করুণ পরিণতির মূল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তথাপি ইহার মধ্যে আরও একটি ইন্দ্রিয়-লালসার শোচনীয় পরিণতির কাহিনী আনিয়া সুকৌশলে যুক্ত করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইহার মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা গঙ্গারাম ও রমার কাহিনী। অসাধারণ কৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম-শ্রীর কাহিনীর মূলধারার

সঙ্গে গঙ্গারাম-রমার কাহিনী আনিয়া যুক্ত করিয়া কাহিনীর পরিণতি ত্বরান্বিত করিয়াছেন। উভয় ক্ষেত্রেই রূপজ মোহ ও ইন্দ্রিয়-লালসার বিষয় সমান প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে ইন্দ্রিয়-লালসার শোচনীয় পরিণতির বিষয় তিনি তাঁহার প্রথম জীবনের উপন্যাসের কাহিনীতে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহার ৪৯ বছর বয়সে রচিত শেষ উপন্যাসেও সেই বিষয়কেই নানাভাবে মুখ্য করিয়া তুলিয়াছেন। গঙ্গারাম এবং রমার প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া তাহারই তিনি এক অতি শোচনীয় চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাঁহার সর্বশেষ উপন্যাসের মধ্যে তিনি কোনও ধর্মতত্ত্বকে প্রাধান্য দেন নাই, বরং তাহার পরিবর্তে মানবচরিত্রের এই শাশ্বত দুর্বলতাকেই মুখ্য করিয়া তাহার মধ্যে মানুষেরই জীবন-সত্যের এক বলিষ্ঠ প্রকাশ সম্ভব করিয়া তুলিয়াছেন। বঙ্কিমের কল্পনা যে তাঁহার জীবনের কোনও স্তরেই মাটি ছাড়িয়া আকাশ স্পর্শ করিতে যায় নাই, তাঁহার শেষ উপন্যাসখানির মধ্যে তিনি তাহারই বলিষ্ঠতম প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

রমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব পর্যন্ত গঙ্গারাম আদর্শ চরিত্রের পুরুষ। তাহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সীতারামের প্রতি সে গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। তাহার কৃতজ্ঞতা এই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

গঙ্গারামকে নিজের ঘোড়াটিতে করিয়া পলাইয়া যাইবার সুযোগ করিয়া দিবার পর যখন সীতারাম আসিয়া তাহার সঙ্গে আবার মিলিত হইলেন তখন সীতারাম সেই ঘোড়াটিতেই চড়িয়া আবার সেখান হইতে তাহাকে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে যাইবার কথা বলিলেন। কিন্তু গঙ্গারাম তাহাতে সম্মত হইল না। সে বলিল,

'আপনাকে ত্যাগ করিয়া আমি যাইব না।'

সীতারাম। তুমি বড় নদী পার হইয়া যাও। শ্যামপুর চেনত ?

গঙ্গা। তা চিনি না ?

সীতা। সেইখানে অতি দ্রুতগতি যাও, সেইখানে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, নচেৎ তোমার নিস্তার নাই।

গঙ্গা। আমি আপনাকে ত্যাগ করিয়া যাইব না। তারপর সীতারাম তাহাকে ভ্রুকুটি করিলেন, চমক চমক করিলেন, তাহাতে ভীত হইয়া গঙ্গারাম নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহার নির্দেশ পালন করিল।'

তারপর আর একদিন যখন রমা তাহার সন্তানের নিরাপত্তার কামনায় দাসীকে দিয়া গঙ্গারামকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া আনিয়া শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিয়া তাহাকে ও তাহার সন্তানকে রক্ষা করিবার পরামর্শ দিল, সেইদিন পর্যন্তও গঙ্গারাম আদর্শ চরিত্র, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং সীতারামের প্রতি তখন পর্যন্ত তাহার কৃতজ্ঞতাবোধ অটুট রহিয়াছে। সে রমার কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল—বলিল, মহারানী, আমার সাক্ষাতে যা বল্লেন—আর কখনও কাহারও সাক্ষাতে এমন কথা মুখে আনিবেন না। আমি প্রাণে মরিলেও এ কাজ আমা হইতে হইবে না। যদি এমন কাজ আর কেহ করে, আমি স্বহস্তে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।' বঙ্কিমচন্দ্র

লিখিয়াছেন, 'কাহারও মনে কোনও মলা নাই। তথাপি একটা গুরুতর দোষের কাজ হইয়া গেল। রমা ও গঙ্গারাম উভয়ে তাহা মনে বুঝিল। গঙ্গারাম ভাবিল, আমার দোষ কি? রমা বলিল, এ না করিয়া কি করি, প্রাণ যায় যে।'

গঙ্গারামের মনে কোনদিন 'মলা' ছিল না, কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার মনে 'মলা' পড়িল। তাহার প্রাণরক্ষাকারী সীতারামের প্রতি তাহার কৃতজ্ঞতাবোধ, নগর রক্ষক হিসাবে তাহার দায়িত্ববোধ মুহূর্তে দূর হইয়া গেল, সরল বিশ্বাসে এক শিশু প্রকৃতির নারী তাহার উপর যে নির্ভর করিয়াছিল, তাহার প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য হিংস্র হইয়া উঠিল। গঙ্গারামের এই আকস্মিক পরিবর্তনের মূলে যে তাহার রূপমোহ তাহা লেখক গোপন করেন নাই। সেইদিন হইতেই রমার মুখখানি গঙ্গারামের ধ্যান জ্ঞান হইল।

'তা সেদিন গঙ্গারামের আর কোনও কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর। কি সুন্দর আলোই বা তাহার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গারামের দিন গেল।' একদিকে শ্রীর কথা ভাবিতে ভাবিতে সীতারামের দিন কাটিতে লাগিল, আর একদিকে তাঁহারই পত্নী রমার মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গারামের দিন কাটিতে লাগিল। সীতারাম উপন্যাসের ইহাই ত মূল কথা। দুই রূপজ-মোহগ্রস্ত জীবনের শোচনীয় পরিণতির বিবরই ইহার উপজীব্য। পুরুষের উচ্চ আদর্শবোধ, সত্যনিষ্ঠা, চরিত্র-বল এক মুহূর্তেই যে নারীর রূপের আকর্ষণে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে, এই নিতান্ত সাধারণ জীবন-সত্যই ত ইহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। পুরুষ যে রূপবহ্নির নিকট পতঙ্গবৎ, সেই পুরুষ যত শক্তিশালী, বিবেচক এবং সত্যনিষ্ঠই হোক না কেন, তাহার সকল ব্যক্তিত্ব যে এখানে আসিয়া নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়, ইহা পুরুষের জীবনের একটি বড় ট্রাজিডি; সীতারামের মত চরিত্রের পরিকল্পনা করিয়া তাহার মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাহাই দেখাইয়াছেন। সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়াই সীতারাম ও গঙ্গারামের মানসিক পরিবর্তনের ধারা নির্দেশ করা হইয়াছে, কোথাও ধর্মতত্ত্বের কোনও প্রভাব দ্বারা তাহাদের কাহারও জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় নাই। সীতারাম যাহার প্রতি আকর্ষণের জন্য তাঁহার জীবনের সকল স্বস্তি বিসর্জন দিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার ধর্মপত্নী শ্রী, তাহার উপর তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল, সেইজন্য তাহার প্রতি ব্যবহারে সীতারামের এক প্রকার আচরণ প্রকাশ পাইয়াছে, শ্রীকে জীবন-সঙ্গিনী করিবার অভিপ্রায়ের মধ্যে সীতারামের কোনও পাপ ছিল না, কিন্তু গঙ্গারামের রমার প্রতি আকর্ষণের মধ্যে পাপ ছিল; রমাকে দেখা মাত্র এবং রমার মুখে তাহার এবং তাহার সন্তানের নিরাপত্তার জন্য গঙ্গারামের নিকট হইতে মিথ্যা আশ্বাস পাইয়া যখন বলিতে শুনিল, 'তুমি আমার প্রাণদান করিলে, আমি চিরদিন তোমার দাসী হইয়া থাকিব', তখন রমাকে লাভ করিবার সম্ভাবনা তাহার মধ্যে উচ্ছল হইয়া তাহার পাপ-বাসনাকে তীব্রতর করিয়া তুলিল। এই অনুভূতিকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন,

'একে ভালবাসা বলে না—তাহা হইলে গঙ্গারাম কখন রমাকে ভয় দেখাইয়া যাহাতে তাহার যন্ত্রণা বাড়ে তাহা করিয়া যাইতে পারিত না। এ একটা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি

যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তাহার সর্বনাশ করিয়া ছাড়ে। এই গ্রন্থে তার প্রমাণ আছে।' সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতেও দেখা যায় যে 'সীতারাম' উপন্যাসে মানব-মনের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এক চিত্তবৃত্তির কথা আছে। প্রকৃতপক্ষে তাহাই এই গ্রন্থের উপজীব্য। গঙ্গারামের প্রতি রমার যে মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা বঙ্কিমের মত অনুসারে মানবের 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি'-জাত। শ্রীর প্রতি সীতারামেরও কি তাহাই ছিল ?

●

॥ মীরার কৃষ্ণভাবনা ॥

ডঃ কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(তিন)

হরিবংশ পুরাণের একোনবিংশতিতম অধ্যায়ের গোবিন্দাভিষেক বর্ণনায় গোবিন্দ নামে অভিহিত গোপসমাজে লালিত কিশোর কৃষ্ণের পূর্ণস্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের গোবিন্দনামের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃতি সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় বোধায়ণের ধর্মসূত্রে যেখানে গোবিন্দ এবং দামোদর, শ্রীকৃষ্ণের এই দুটি জনপ্রিয় নামকে ভগবান বিষ্ণুর অন্যতম নামরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। হরিবংশ রচনার পর ক্রমে বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ ইত্যাদি নানাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনলীলার বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হতে থাকে। এইভাবে ধর্মীয়সাহিত্যে যখন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনের কাহিনী গ্রথিত হচ্ছিল তখন শিল্পের মাধ্যমেও এই বাল্যলীলার প্রতিফলন ঘটছিল দেখা যায়। বারাণসীর ভারত কলাভবন সংগ্রহশালায় শ্রীকৃষ্ণের এই কৈশোরকজীবনের অন্যতম প্রধান ঘটনা গোবর্দ্ধনধারণ অবলম্বনে রূপায়িত যে অপূর্ব ধ্যানগম্ভীর মূর্তিটি রক্ষিত আছে গুপ্ত আমলে গঠিত সেই মূর্তিটিকে ভারতশিল্পের একটি বিশিষ্ট রূপকীর্তি বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যদিও এই মূর্তিটি একটি দুর্লভ শিল্পকীর্তি বলে স্বীকৃত হয়েছে তবু লক্ষ্য করবার বিষয় এইযে এটিকে ব্রাহ্মণ্যপুরোহিত সম্প্রদায় অনুমোদিত পূজার জন্য বিহিত প্রতিমারূপে গণ্য করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রাচীন শিল্পসাহিত্যে প্রতিমা সম্পর্কে যেসব বিধান আছে সেইসব বিধানে প্রতিমারূপে শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ভুজ বাসুদেব মূর্তিরই প্রচলন প্রতিমারূপ সিদ্ধ; পরবর্তীযুগে বটপত্রশায়ী, মোদকহস্ত, হামাগুড়ি দেওয়া নাড়ুগোপাল বংশীধারী কিশোর গোপাল, বা রাধাকৃষ্ণের যুগলপ্রতিমার কোন বর্ণনা বা অনুমোদন শিল্পশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই ধরনের বালক বা কিশোর গোপালের মূর্তি যে প্রচলিত ছিল তার ব্যাপক প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলাদেশের রাজসাহীজেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের প্রাচীরে খচিত আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত কৃষ্ণজীবনের নানা বাললীলা উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকে, রাজস্থানের মাণ্ডোরে আবিষ্কৃত কিছু শিল্প-নিদর্শনে, দক্ষিণভারতের, এমনকি মধ্যএশিয়ার তুর্কীস্থানে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় তৃতীয় শতকের বংশীবাদনরত কৃষ্ণমূর্তিতে।

এইভাবে সাহিত্যে ও শিল্পে প্রাকমহাভারত প্রকল্পের শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরজীবনের কাহিনীর যে বিবর্তন ঘটছিল শেষপর্যন্ত ভাগবত পুরাণে এই ধারার মহান ও ঐশ্বর্যময় এক

অভাবনীয় পরিণতি ঘটল। এই মহাগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবসাধনার যে গভীর ও স্তোতনাময় প্রতিবেদন আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই প্রতিবেদনকে অবলম্বন করে পরে সমাজে এক প্রবল আলোড়ন সংঘটিত হয়। বস্তুত অষ্টম নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যসাধনায় যে যুগবিপ্লব ঘটেছিল তার মূল প্রেরণা এসেছিল বাদরায়ন রচিত ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বেদান্ত অনুশীলনের মাধ্যমে। বিশ্রুতকীর্তি যুগাচার্য মহামনিষী শঙ্কর বেদান্তের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে যে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিলেন তার মূল প্রতিবেদন ছিল বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা; এই প্রজ্ঞাভিত্তিক ধর্মপ্রবাহকে রামানুজাচার্য ভক্তিরসের পথে এক নূতন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করে ভারতভূমিতে এক নূতন প্রাণধারায় সঞ্চার করলেন। আচার্য রামানুজের পরাভক্তির আধার ছিলেন ভগবান বিষ্ণু; এই বৈষ্ণবধারার সাধনপথেই বাসুদেব বিষ্ণুর আরাধনা থেকে গোপাল-কৃষ্ণের বা গোবিন্দের আত্মসমর্পনের মধ্যে ভক্তিধর্মের বিবর্তন ঘটে। এই নূতন ভক্তিধর্মের মুখ্য অবলম্বনরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এই নূতন 'পুরাণগ্রন্থ' শ্রীমদ্ভাগবত। যদিও অষ্টম নবম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল তথাপি এই গ্রন্থে প্রাচীন পুরাণ রচনার সকল লক্ষণই রক্ষা করা হয়েছিল। এই গ্রন্থের দশমস্কন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং সেই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বব্রহ্মত্বের প্রতিষ্ঠা অবলম্বনে পরবর্তী বাল্য ও কৈশোর জীবনের নানা ঘটনার বিবরণ বিবৃত দেখা যায়। এইসকল ঘটনার উল্লেখ হরিবংশাদিতেও আছে; ভাগবতের মূল বৈশিষ্ট্য অবশ্য শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোকুল এবং পরে বৃন্দাবনের গোপ কামিনীগণের সম্পর্ক। হরিবংশ পুরাণের বিষ্ণুপর্বনামক খণ্ডের গোব্রজগমন নামক পঞ্চমঅধ্যায়ে শিশুকৃষ্ণের ব্রজে বা গোকুলে নন্দগোপের গৃহে আগমন থেকে যে বর্ণনার সূত্রপাত হয় পরে ষষ্ঠঅধ্যায় থেকে এইসব বর্ণনা শিশুচর্যা নামে অভিহিত হয়েছে দেখা যায়। নবমঅধ্যায়ে কৃষ্ণের বৃন্দাবনে প্রবেশ বর্ণনার পর একাদশ অধ্যায়কে অভিহিত করা হয়েছে বালচরিত নামে। এই অধ্যায়ে গোপবেণু বাদনরত কাকপক্ষধর, শ্রীবৎসলেনোরসা-যুক্ত, পঙ্কজউদ্ভিন্নবর্চসা শ্রীমান শ্যামরূপী কৃষ্ণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান শ্যামঃপঙ্কজলোচনঃ।
শ্রীবৎসেনোরসাযুক্তঃ শশাঙ্ক ইব লক্ষণা॥ বিষ্ণু ১১।২

ক্রমে কিশোরকৃষ্ণের নানা অলৌকিক কৃত্যের পর বিংশৎ অধ্যায়ে গোপকামিনীগণসহ হাল্লিশক্রীড়ার বিবরণে ভাগবতের দশমস্কন্ধের ঊনত্রিংশৎ অধ্যায় থেকে ত্রিত্রিংশৎ অধ্যায়ের মহারাস বর্ণনার মূল বিবৃত রয়েছে এসত্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে হরিবংশের নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ এবং ভাগবতের রাসবর্ণন তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

কৃষ্ণলীলাপুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গণাঃ॥
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কুজন্তস্তত্রযোষিতঃ॥ হরিবংশ বিষ্ণুপর্ব।২০
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদংচবিষ্ণোঃশ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।

ভাগবত—১০।৩৩

এই ভাগবতকে অবলম্বন করে ভক্তিধর্মের যে প্লাবন ঘটেছিল সেই প্রবাহ পথেই বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাকবি জয়দেব সরস্বতী। গৌড়বঙ্গের শেষ স্বাধীন সম্রাট লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি জয়দেব তার গীত-গোবিন্দ কাব্যে ভাগবত প্রবর্তিত ভক্তিধর্মকে গোপী প্রধানা রাধার ও কৃষ্ণের—প্রেমবিগ্রহ লীলান্বিত অধ্যাত্মরূপরেখার সাহায্যে এক নবদিগন্তের প্রবর্তন করে বৈষ্ণবচেতনায় এক নূতন উৎসধারার প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। যে রস প্রবাহে অচিরকালের মধ্যে সারা ভারতবর্ষ পরিপ্লুত হয়ে গিয়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে কবি জয়দেব এবং কবি দয়িতা পদ্মাবতী ভারতের বহু বিষ্ণুমন্দির পরিক্রমণ করে মন্দিরের দ্বারে দ্বারে নৃত্যগীত সহযোগে গীত-গোবিন্দের রসধারা প্রবাহিত করে সারাদেশময় প্রেমপুলকের এক প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে গীতগোবিন্দ রচনার অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এই কাব্য গৌড়বঙ্গ থেকে সুদূর গুজরাটে উপনীত হয়েছিল। মালবার অঞ্চলের খ্যাতিমান কবি বিল্বমঙ্গল গীত-গোবিন্দের আদর্শে বালগোপাল স্তুতিনামক কাব্য রচনা করে 'দক্ষিণের জয়দেব' বলে বিস্তৃত খ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় দ্বিশতবর্ষ পরে নবদ্বীপে আবির্ভূত প্রেমবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমের যে নূতন রসধারা প্রবাহিত করেছিলেন তার মূলেও ছিল গীত-গোবিন্দের অপরিমেয় প্রভাব। চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার নিম্নোদ্ধৃত যে পদটি পাওয়া যায় তাতে এই প্রভাবের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ
স্বরূপ রামানন্দ সনে　　মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দে।

প্রায় সমসাময়িক কালে দক্ষিণভারতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রবক্তা বল্লভাচার্য (১৪৭৩-১৫৩২)। বল্লভাচার্যের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের একাধিকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল, চৈতন্যসাহিত্যে সেই সংবাদ বিধৃত আছে। উভয়েই পরম কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং বৃন্দাবনকে স্বমাহাত্ম্যে প্রতিষ্ঠিত করতে যথেষ্ট প্রয়াস করেছিলেন।

জনশ্রুতি আছে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের দ্বারাই রাজস্থানে কৃষ্ণসাধনার প্রসার ঘটে। রাজস্থানের আটটি কেন্দ্রে যে সব কৃষ্ণবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও পূজার প্রচলন হয়েছিল সেই সকল বিগ্রহেরই সেবাপূজার অধিকারী পুরোহিতেরা সকলেই বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ভুক্ত। এইসব বিগ্রহের অন্যতম নাথদ্বারার শ্রীনাথজী বিগ্রহ মেবার অধিপতি রাজসিংহের আমলে সেখানে আনা হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর বাদশার আমলে যে ধর্মীয় উদারতার উদ্ভব হয়েছিল তারই আনুকূল্যে অন্যান্য বহু দেবস্থানের মত বৃন্দাবনেও লুপ্তদেবস্থানসমূহের উদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। আবার ঔরঙ্গজীবের ধর্মান্ধতা ও গোড়ামী এইসব দেবস্থানের ধ্বংসসাধনে ব্রতী হয়। এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্যই বৃন্দাবনের বল্লভাচার্য প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধনধারী মূর্ত্তি মেবারে আনিত হয়। এর আগে মেবার বা রাজস্থানের অন্যত্র বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ে প্রভাব কতটা ছিল বলা দুষ্কর। রাজরাণী মীরার স্বামী মহারাণা ভোজ ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন

আরোহন করেন এবং ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বল্লভাচার্যের জন্ম হয় ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। মীরার সঙ্গে বল্লভাচার্যের কোন সাক্ষাৎকার বা মীরার উপর বল্লভাচার্যের প্রভাব এই কালবিচারে সম্ভবপর ছিল বলে মনে হয় না।

মীরার কৃষ্ণসাধনার উপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রভাব অনস্বীকার্য। মীরার কৃষ্ণভাবনায় শ্যামরূপের যে প্রাধান্য দেখা যায় তা ভাগবতীয় কৃষ্ণধারারই ফলশ্রুতি। এই শ্যাম গোপীজন-মনোহর প্রেমবিগ্রহরূপে বিবর্তিত গোবিন্দ-কৃষ্ণ। এই রসবিগ্রহ গোবিন্দ-কৃষ্ণ কবি জয়দেবের বহুল প্রচারিত গীতগোবিন্দের দ্বারাই সারাভারতে বিস্তৃত হয়েছিল বলে মনে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দের প্রভাব রাজরাণী মীরার আবির্ভাবের বেশ আগেই যে রাজস্থান অঞ্চলে অনুভূত হয়েছিল আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীতে অঙ্কিত রাজস্থানে আবিষ্কৃত ভাগবত ও গীতগোবিন্দের চিত্ররূপ থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। [Journal of the Indian society of oriental Art, vol X, hl. 3 & 4] বস্তুত কৃষ্ণসমর্পিত প্রাণ মীরা তাঁর কৃষ্ণভাবনা সেই ধারা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন যে ধারায় কিশোর কৃষ্ণের শ্যামরূপী বিগ্রহেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই ধারা ভাগবত অনুবর্তী জয়দেব প্রতিষ্ঠিত গীত-গোবিন্দের ধারা। এই ধারার অনুসরণেই শ্রীচৈতন্য তাঁর কৃষ্ণভাবনার প্রবর্তন করেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্তিত এই রসপ্রবাহের নির্দেশ চৈতন্যভাগবত থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত পদটিতে প্রত্যক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামমেব পরম রূপং পুরীং মধুপুরীংবরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্যমেব পরো রসঃ॥

কৃষ্ণতত্ত্বের এই বিবর্তনের বীজ হরিবংশের :

'কাকপক্ষধরঃ শ্রীমান শ্যামঃ পদ্মদলেক্ষণ' :—এই পরিকল্পনার মধ্যেই উপ্ত হয়েছিল। পরমপ্রেমের জন্য মানবাত্মার আকুতি বৈষ্ণব প্রেমধর্মের মূল সংবেদন। গোপিনী-কুল সমর্পিত হৃদয় কৃষ্ণ-শ্যাম এবং জ্ঞানমার্গের পুরুষোত্তম-বাসুদেব এক ও অভিন্ন। উচ্চতর জ্ঞানমার্গের সাধনার সমান্তরালে এই প্রেমবিগ্রহ কিশোর শ্যামের লীলারসের অনুপ্রেরণা সমাজের ব্যাপক-জনশ্রেণীর মধ্যে সেই ঘটমন্তিত জাতক এবং হরিবংশ রচনার কালথেকেই প্রবাহিত ছিল। মুসলমান আগমনে রাজকুল ও উচ্চকোটী পরিপোষিত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির ও বিগ্রহ নির্মাণে যখন ছেদ পড়েছিল সেই পরিবেশে ব্যাপকজনশ্রেণী তাদের এই অতিনিকটে হৃদয়াতিরিক্ত প্রেমবিগ্রহ কৃষ্ণভগবানকে অবলম্বন করেই সংস্কৃতির এক মহানিশা অতিক্রম করেছিল। রাজরাণী মীরা এই প্রেমধারাকে রাজস্থানে প্রবাহিত করে সংস্কৃতির নব জাগরণের অনন্য পথিকৃতের কাজ করেছিলেন। ভাগবৎ রসপিপাসু ভারত অনন্যচিত্তে প্রেমরসের এই মূর্তপ্রতীক মহারাণী মীরাকে চিরদিনই পরম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

●

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ চার ॥

দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে গদাধর পণ্ডিত রমার বেশে সুসজ্জিত হয়ে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন। হাতে লাঠি ও কাঁকে ডালি নিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে তাঁর পিছনে পিছনে ঢুকলেন ব্রহ্মানন্দ বৃদ্ধা বড়াই সখী সুপ্রভাতের রূপসজ্জায়। হরিদাস তাঁদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কে? ব্রহ্মানন্দ উত্তর দিলেন, আমরা মথুরায় যাচ্ছি। শ্রীবাস প্রশ্ন করলেন, তোমরা দু'জন কাদের বউ? ব্রহ্মানন্দ উত্তরে জানতে চাইলেন, একথা কেন জিজ্ঞাসা করছ? শ্রীবাস প্রত্যুত্তরে বললেন, জানতে চাওয়া কি অন্যায়? ব্রহ্মানন্দ মাথা নেড়ে বললেন, হুঁ। গদাদাস, বোধ হয় হরিদাসের কোনও অনুচর, জিজ্ঞাসা করলেন, আজ রাতে তোমরা কোথায় থাকবে? উত্তরে ব্রহ্মানন্দ বললেন, তুমি তো জায়গা দিবে। উত্তর শুনে গদাদাস অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, তুমি তো বেশ বললে। আর জিজ্ঞাসার কাজ নেই. তোমরা তাড়াতাড়ি সরে পড়। এইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপে তাঁদের পারস্পরিক কথাকাটাকাটিতে নাটকীয়তা যখন চরমে উঠেছে, তখন অদ্বৈত আচার্য সবাইকে থামিয়ে বললেন, এত বিচারে আবশ্যক কি? পরস্ত্রী মায়ের সমান, কেন তাঁদের লজ্জা দিচ্ছ? তারপর গদাধর পণ্ডিতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন,

"নৃত্য-গীত-প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এথারে নাচহ—ধন পাইবা প্রচুর॥"[৩২]

এই কথা শুনে পরম হৃষ্টচিত্তে গদাধর মনোহর নৃত্য আরম্ভ করলেন ও অনুচরেরা সময়োচিত গান করতে লাগলেন। নাচতে নাচতে তিনি এতদূর তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে আনন্দে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা বইতে লাগল।

"প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়ানে।
পৃথিবী হইয়া সিক্ত 'ধন্য হেন মানে'॥"[৩৩]

প্রেমাপ্লুত নৃত্য-গীত-সম্বলিত এই অভিনয় দেখে সকলে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। 'হরি হরি' ধ্বনিতে চতুর্দিক আনন্দ-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল।

দর্শকমণ্ডলী ও অভিনেতৃবর্গ যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, সেইসময় রঙ্গভূমিতে এলেন সমগ্র অভিনয়ের প্রাণপুরুষ নট ও নাট্য-পরিচালক স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব আদ্যাশক্তির রূপসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে আর তাঁর আগে আগে ঢুকলেন নবদ্বীপলীলার নিত্যানুচর নিত্যানন্দ বুড়ি বড়াই-এর বেশে।

"হেনই সময়ে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
প্রবেশ করিলা আদ্যাশক্তি-বেশধর॥

৩২। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—১০১, পৃষ্ঠা—৮৫।
৩৩। " " " " " , শ্লোক—১১৩, পৃষ্ঠা—৮৫।

আগে নিত্যানন্দ বুড়ী-বড়াইর বেশে।
বহু বহু করি হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে ॥"[৩৪]

মহাপ্রভুর অঙ্গসজ্জা এতখানি নিখুঁত এবং অভিনয় এমনই ভাববিহ্বল ও মর্মস্পর্শী হয়েছিল যে কেউই তাঁকে দেখে চিনতে পারেন নি। কেবলমাত্র বৃদ্ধা বড়াই-এর ভূমিকাভিনেতা নিত্যানন্দ সঙ্গে থাকায় সকলে তাঁকে মহাপ্রভু বলে অনুমান করলেন। কারণ সকলেই জানতেন যে নিত্যানন্দ সেজেছেন মহাপ্রভুর বড়াই; সুতরাং বড়াই-এর পিছনে যিনি রয়েছেন, তিনি মহাপ্রভু ব্যতীত আর কেউই হতে পারেন না। কিন্তু বেশ দেখে বুঝতে না পারায় তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন,

"সিন্ধু হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা।
রঘুসিংহগৃহিণী কি জানকী আইলা ॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী।
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী ॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী ধরা।
কিবা সেই মহেশমোহিনী মহামায়া ॥"[৩৫]

আজন্মকাল যাঁরা মহাপ্রভুকে দেখেছেন, প্রাত্যহিকজীবনে নিকটসান্নিধ্যে এসেছেন, বারম্বার ঘনিষ্ট সাহচর্য পেয়েছেন, এইভাবে তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও চিনতে না পারায় তাঁরা নিজেরাই বিস্মিত হয়ে গেলেন। অপরে তো দূরের কথা তাঁর জননী স্বয়ং শচীদেবীও ধরতে পারেন নি। তিনি ভাবলেন,

"মূর্তিভেদে লক্ষ্মী কিবা আইলা নাচিতে ॥"[৩৬]

মহাযোগেশ্বরী মহামায়া হলেন অচিন্ত্য, অব্যক্ত ও ত্রিগুণাত্মিকা; কায়, মন ও বাক্যের অতীত সেই জগজ্জননীর যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। আর পরমপুরুষ শ্রীহরি হলেন ভক্তি-স্বরূপ, অন্তরোৎসারিত অনাবিল ভক্তির অফুরন্ত ফল্গুধারা। মহাযোগেশ্বর মহেশ্বর ভক্তির মূর্ত প্রতীক শ্রীহরিকে দেখে পার্বতী-ভাবে ভাবিত হয়ে মহামোহগ্রস্ত হয়েছিলেন। সমবেত বৈষ্ণবসমাজ এখানে যে মহামোহের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেন না, তার কারণ পূর্বেই তাঁরা মহাপ্রভুর অপরিসীম অনুগ্রহলাভ করেছিলেন। সকলেরই অন্তরে জননী-ভাব জাগ্রত হল। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন তাঁরা। আর—

"জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর ॥"[৩৭]

৩৪। " " " " " , শ্লোক—১১৯-১২০, পৃষ্ঠা—৮৬।
৩৫। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—১২৫-২৭, পৃষ্ঠা—৮৭।
৩৬। " " " " " , শ্লোকার্ধ—১৫০, পৃষ্ঠা—৮৮।
৩৭। " " " " " , শ্লোক—১৫১, পৃষ্ঠা—৮৮।

মুরারিগুপ্তের কাব্যেও জগজ্জননীর রূপসজ্জায় মহাপ্রভুর অভিনয়ের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন, রসবিশেষবিনোদী বলদেব (নিত্যানন্দ) তখন গোপীবেশে নয়নাশ্রুপূর্ণ সুঠামদেহে প্রাণনাথের (মহাপ্রভু) করপল্লব দ্বারা ধৃত হয়ে প্রবেশ করলেন। তারপর স্বয়ং বাসুদেব (গৌরচন্দ্র) বিশেষ বেশবিন্যাস (গোপিকা) করে প্রবেশ করলেন ; তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় তাঁর দেহকান্তি, যেন স্বর্ণশৃঙ্গ পর্বতরাজ গতিশীল হয়ে পর্যটন করছেন। গোপিকার ন্যায় উত্তম কাচুলীতে তাঁর বক্ষ আচ্ছাদিত, শঙ্খ-কঙ্কনাদি হস্তে ধৃত, অরুণবস্ত্র পরিহিত, সুন্দর পাদপদ্ম নূপুর শোভিত, দেহমধ্যটি (কটিদেশ) অতি সূক্ষ্ম (ক্ষীণ)—এইভাবে তিনি নৃত্য করতে লাগলেন। ... ...অমিততেজা সেই ভগবান্ (গৌরচন্দ্র) আনন্দিতচিত্তে সুন্দরভাবে কীর্তন ও নৃত্য করলেন, শীঘ্রই তাঁর দেহ কমলার কান্তি ও ভাব প্রাপ্ত হল।

"গোপীবেশধরকো বলদেবঃ প্রাবিশদ্রমবিশেষবিনোদী।
প্রাণনাথকরপল্লবধৃতো নয়নবারিপরিপূর্ণসুদেহঃ॥
বাসুদেবকৃতবেশবিশেষঃ প্রাবিশৎ স ভগবানমৃতাংশুঃ।
তপ্তকাঞ্চনবপুঃ কনকাদ্রিশৃঙ্গরাজ ইব জঙ্গমবেশঃ॥
গোপিকেব বরকঞ্চুলিবক্ষাঃ শঙ্খকঙ্কনধরোঽরুণবস্ত্রঃ।
নূপুরেণ সুতপাদসুপদ্মঃ সূক্ষ্মমধ্যবপুষা স ননর্ত্ত॥
... ...
কীর্ত্তনং স ভগবানতিতেজা নর্ত্তনঞ্চ মুদিতঃ প্রচকার।
ভাবমাত্ত বিধতে কমলায়াঃ কান্তিভাবভৃদনুবোঽস্যাঃ॥"[৩৮]

অভিনয় করতে করতে এই সময়ে মহাপ্রভুর অন্তরে নানাপ্রকার ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে। ভাবাবেশের প্রাবল্যে এক ভাব থেকে অন্য ভাবে চলতে থাকে তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। দিশেহারা হয়ে যান দর্শকেরা। বুঝতে পারেন না তাঁরা মহাপ্রভু যথার্থ কোন্ চরিত্রে অভিনয় করছেন।

"হেন বুঝাইতে কেহো নারে কোন জন।
কোন্ প্রকৃতির ভাবে নাচে নারায়ণ॥
কখনো বোলয়ে "বিপ্র! কৃষ্ণ কি আইলা?"
তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বালা॥
নয়নে আনন্দধারা দেখিয়ে যখন।
মূর্ত্তিমতী গঙ্গা যেন বুঝিয়ে তখন॥
ভাবাবেশে যখন বা অট্ট অট্ট হাসে।
মহাচণ্ডী হেন সভে বুঝেন প্রকাশে॥
ঢুলিয়া ঢুলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে।
সাক্ষাত রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে॥

৩৮। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে ষোড়শঃ সর্গঃ, শ্লোক—৬—৮, ও ১১, পৃষ্ঠা—৮১-৮২।

ক্ষণে বোলে "চল বড়াই। যাই বৃন্দাবনে।"
গোকুল সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে॥
বীরাসনে ক্ষণে প্রভু বসে ধ্যান করি।
সভে দেখে যেন মহা-কোটি-যোগেশ্বরী॥
... ...
আদ্যাশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ।
সুখে দেখে তাঁর যত চরণের ভৃঙ্গ॥
কম্প-স্বেদ-পুলক অশ্রুর অন্ত নাই।
মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞি॥"[৩৯]

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের হাত ধরে এইভাবে নৃত্য করতে লাগলেন। সম্মুখে দীপধারী শ্রীবাস পণ্ডিতের ভাই শ্রীমান পণ্ডিত; পূর্বে নাটকের ভূমিকা-বণ্টনকালে উল্লেখ করেছি, স্বেচ্ছায় এই কাজটি তিনি চেয়ে নিয়েছিলেন মহাপ্রভুর কাছ থেকে। হরিদাস আগের মতই সকলকে সাবধান করতে লাগলেন। এমনসময়ে মাত্রাতিরিক্ত ভাবাভিশয্যে নিত্যানন্দ পড়লেন মূর্ছিত হয়ে। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে গেল তাঁর বুড়ি বড়াই-এর অঙ্গসজ্জা। এদিকে মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীভাবে বিভোর হয়ে ঠাকুরের সিংহাসনে বসলেন বিগ্রহ গোপীনাথকে কোলে নিয়ে এবং সবাইকে আহ্বান করে বললেন তাঁর স্তব করতে। এই কথা শুনে—

"কেহো পড়ে লক্ষ্মীস্তব, কেহ চণ্ডীস্তুতি।
সভে স্তুতি পড়েন—যাহার যেন মতি॥"[৪০]

মুরারিগুপ্তও বলেছেন, সর্বদেবময় তাঁর (মহাপ্রভু) আজ্ঞাতে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ আনন্দিতচিত্তে সেই স্ত্রীদেবীমূর্ত্তিকে প্রণাম করলেন এবং বিবিধ স্তবপাঠে ও বেদাদিমন্ত্রে স্তুতি করলেন। ক্ষণকাল-মধ্যেই আবার তাঁর সর্বশক্তিময়ী ভাগবতীভাবের আবেশ হলে সাধুগণ দেবাদিকৃত স্তবরাজিদ্বারা (চণ্ডীর) স্তুতি করে হৃষ্ট হলেন।

"তাং স্ত্রিয়ং প্রমুদিতাঃ পরিনেমুঃ সংস্তবেন শ্রুতিভিঃ প্রভুটুবুঃ।
আজ্ঞয়া সকলদেবময়স্য তস্য হৃষ্টমনসো দ্বিজমুখ্যাঃ॥
তৎক্ষণাৎ পুনরভূদ্ ভগবত্যাঃ সর্বশক্তিময়তাং তু বহত্যাঃ।
তাব এব সুজনা মুদমাপুস্তুটুবুঃ সুরকৃতৈঃ স্তবরাজৈঃ॥"[৪১]

সে রাত্রিতে অভিনেতৃগণ ভগবদ্ভক্তির অনুকূল ভাবাবেগপ্রধান এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয় করেন যে অভিনেতারা ও দর্শকেরা সকলেই অপরিসীম আনন্দে আত্মহারা হয়ে

৩৯। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—১৩৮-৪৪ ও ১৫১-৫৪, পৃষ্ঠা—৮৮-৮৯ ও ৯১।

৪০। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক—১৫৫, পৃষ্ঠা—৯০।

৪১। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে ষোড়শঃ সর্গঃ, শ্লোক—১৪-১৫, পৃষ্ঠা—৮২।

গিয়েছিলেন। অভিনয় করতে করতে কখন যে রাত্রির অবসান ঘটেছিল, তা কেউ বুঝতে পারেন নি।

"আনন্দ না জানে কেহ নিশি শেষ।
দারুণ অরুণ আসি ভেল পরবেশ॥"[৪২]

মুরারি গুপ্তও বলেছেন, এইরূপে সারারাত্রি অতিবাহিত করে সেই চন্দ্রবদন ভগবান্ (মহাপ্রভু) প্রাতঃকালে নিজ মন্দিরে গমন করলেন।

"এবং নিনায়ভগবান্সকলাংনিশাংসপ্রাতর্জগাম নিজমন্দিরমিন্দুবক্ত্রঃ।"[৪৩]

ভক্তিরসামৃত ভাবাবেশে আবিষ্ট ভাগবতীতনু মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের এই মর্মস্পর্শী অলৌকিক অভিনয়লীলার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত উল্লেখ করেছেন. আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখরের বাটিতে মহাপ্রভু যেখানে নৃত্য করেছিলেন, সেখানে (সপ্তাহকাল) এক অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল।

"শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্যরত্নবাট্যাং মহাপ্রভুঃ।
ননর্ত্ত যত্র তত্রাসীত্তেজস্তদ্বদদ্ভুতম্॥"[৪৪]

বৃন্দাবন দাসের কাব্যেও এর প্রতিধ্বনি দেখা যায়। তিনি বলেছেন,

"সপ্তদিন শ্রীআচার্য্য রত্নের মন্দিরে।
পরম অদ্ভুত তেজ ছিল নিরন্তরে॥
চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ—একত্র যেন জ্বলে।
দেখয়ে সুকৃতি-সব মহাকুতূহলে॥"[৪৫]

●

৪২। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক = ১৮৮, পৃষ্ঠা = ১০২।
৪৩। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্", দ্বিতীয় প্রক্রমে ষোড়শঃ সর্গঃ, শ্লোকাংশ = ২০, পৃষ্ঠা = ৮৩।
৪৪। ,, ,, ,, সপ্তদশঃ সর্গঃ, শ্লোক = ১, পৃষ্ঠা = ৮৩।
৪৫। "শ্রীচৈতন্যভাগবত", মধ্যখণ্ড, অপরার্ধ, অষ্টাদশ অধ্যায়, শ্লোক = ২২৪-২৫, পৃষ্ঠা = ১০৮।

॥ আলমোড়া-ভ্রমণ ॥

শ্রীসুকুমার সান্যাল

আলমোড়া দেখব বহুদিনের সাধ। স্বামী বিবেকানন্দের হিমালয়ের অন্যতম সাময়িক তপস্থাস্থল আলমোড়া। ভগিনী নিবেদিতা, মিস ম্যাকলাউড-প্রমুখ স্বামীজীর অন্তরঙ্গ-শিষ্যারা এখানে বেশ কিছুকাল কাটিয়েছেন। কথিত আছে নিবেদিতা স্বামীজীর ভাবধারাকে কেন্দ্র করে তাঁর অমূল্য গ্রন্থটি এখানে লিখেছিলেন। 'আলমোড়া'-নামটির সাথে স্বামীজীর পরিব্রাজক ছবিটি আমার মানসপটে আঁকা ছিল। ৬ই মার্চ নৈনীতাল থেকে রাণীক্ষেত-শহরে এসে পৌঁছলাম। আবহাওয়া অত্যন্ত খারাপ ছিল। ছোট্ট শহর। মিলিটারী-ছাউনী উপরের পাহাড় ঘিরে। নীচে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা—যেমন জলাপাহাড় আর দার্জিলিং শহর। উচ্চতা প্রায় ৬০০০ ফুট। নন্দাদেবী (২৫৬০০ ফুট), ত্রিশুল (২২৬০০) প্রভৃতি হিমালয়ের কয়েকটি হিমানী-শৃঙ্গ দর্শনই এখানকার প্রধানতম আকর্ষণ। রাণীক্ষেত হতে আলমোড়ার দূরত্ব ৪৭ কিঃ মিঃ। পরদিন আলমোড়া পাড়ি দোব স্থির করে ফেললাম—যত বৃষ্টিবাদল আর হাতকাপানো ঠাণ্ডাই হক না কেন। আলমোড়া যাব এই উত্তেজনায় প্রায় সারারাতই ঘুম হ'ল না। সকালে মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ দৃষ্ট হল। মেঘ উড়ে গেছে কোন ভিনদেশে। প্রাতঃকালীন সূর্যের সোনালী রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে বরফ-ঢাকা শৃঙ্গে। সে এক অপূর্ব মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, সূর্যের ছোঁয়ায় ঝলমল করছে নীচের দিকদিগন্তব্যাপী উপত্যকা। আমরা প্রাতঃরাশ সেরে বেড়িয়ে পড়লাম ট্যাক্সীতে আলমোড়ার পথে।

পাহাড়ী রাস্তায় আঁকা-বাঁকা চড়াই-উৎরাই ভেঙে আমাদের গাড়ী চললো। নন্দাদেবী ত্রিশুল হিমানীশৃঙ্গ রইল দৃষ্টিপথের বাঁদিকে। পাইন ও অন্যান্য নাম না-জানা হিমালয়ের বৃক্ষরাজি দু'দিকে দণ্ডায়মান থাকায় সবুজ-শ্যামল প্রকৃতির মনোহরণকারী দৃশ্য পথিকের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। গাড়ী ক্রমশঃ পৌঁছল কোশীনদীর উপর। পাহাড়ী নদী আপন-মনে বয়ে চলেছে চালুপথে। কাঠের সেতুর উপর দিয়ে পারাপার হওয়া গেল। আলমোড়া পৌঁছে গেলাম আধঘণ্টার মধ্যে।

তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে ছুটলাম শহরের শেষপ্রান্তে অবস্থিত মিশনের উদ্দেশ্যে। দুইজন সাধু থাকেন মিশনের হেপাজতে। একজন বৃদ্ধ সাধু আমাদের আপ্যায়িত করলেন যেন কতদিনের পরিচিত আমরা। ঠাকুরঘরে নিয়ে গেলেন যে ঘরটিতে একসময়ে তুরিয়ানন্দ স্বামী (হরি মহারাজ) থাকতেন। ঠাকুর-প্রণামাদি সারার পর মিষ্টান্ন-প্রসাদ দিলেন। তারপর পরিচয় করিয়ে দিলেন মিশন-সংলগ্ন একের পর একটি কুটির বা বাংলোর সহিত। কোনটির নাম ব্রহ্মানন্দ-কুটির, কোনটির বা প্রেমানন্দ, অদ্ভুতানন্দ, তুরীয়ানন্দ-লাইব্রেরী ও সারদা-কুটির। দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি দেখালেন। স্বামীজীর মিসেস সেভিয়ার, ক্যাপ্টেন সেভিয়ার, গুডউইন-প্রমুখ শিষ্য-শিষ্যার সমভিব্যহারে তোলা ছবি। তুরীয়ানন্দ মহারাজ,

ব্রহ্মানন্দ মহারাজ, সুবোধানন্দ মহারাজ এবং অভেদানন্দ মহারাজের সম্মিলিত ছবি এবং একক ছবি। সেই অতীতদিনের স্মৃতিপূর্ণ এই ছবিগুলি এক একটি অমূল্য সংগ্রহ। মহারাজ আবার দেখালেন দূরে বাঘের আকৃতির একটি পাহাড়—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ কঠোর তপস্যা করেছিলেন কয়েকদিনব্যাপী; আবার দেখালেন মিশন হতে মাইলখানেক দূরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ—যেখানে জনৈক মুসলমান ব্যক্তি অসুস্থ স্বামীজীকে একটি শর্পা বাইরে প্রাণরক্ষা করেছিলেন। হিমানীশৃঙ্গ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন কোন্‌টির নাম নীলকণ্ঠ, কোন্‌টি নন্দাঘুন্টি, কোন্‌টি ত্রিশুল এবং কোন্‌টি নন্দাদেবী। বললেন আমরা পাহাড়ীয়া। নিজেরা রান্নাবান্না করে খাই। ঠাকুরকে নিয়ে শেষজীবনে ভালই কাটছে এখানে। আমরাতো ভালই আছি। আগেকার মহারাজরা যেমন তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ এঁরাতো মাধুকরী করে খেতেন, আর তপস্যা করতেন এই বিজন প্রান্তরে। পথের নিশানা বলে দিলেন Thompson House ও Apolo House-এর যেখানে স্বামীজী ও নিবেদিতা অস্থায়ীভাবে বসবাস করেছিলেন। বিদায় নেবার আগে প্রণাম করে নাম জিজ্ঞাসা করাতে হেসে বললেন—সন্ন্যাস-নাম মনে থাকবে না, আটপৌরে নাম রমেশ মহারাজ। আমরা চললাম Thompson House-এর দিকে। Vivekananda Laboratory for Agricultural Research Office থেকে আবার খোঁজ নিয়ে Thompson House-এ পৌঁছে গেলাম।

বাড়ীটির অবস্থা। হাতবদল হয়ে এখন সরকারী Tectroical School. একান্ত compound-যুক্ত বাড়ী। কাউকে ধারে বা কাছে পেলাম না। বাড়ীটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম—পিছনের অংশটি ধ্বসে গেছে। ভাবতেও বিস্ময় লাগছিল যে, এই বাড়ীতে একদিন পৃথিবীর অন্যতম মহামানব পদচারণ করেছিলেন। এখানেই স্বামীজীর শিষ্য ও সেবক গুডউইন সাহেব গুরুকে সেবা করার প্রকৃষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন। ভাবাবেগে অস্ফুটস্বরে ব'লে উঠলাম—'প্রভো, বান্দাতো হাজির, হুকুম হউক'। কখন যে চোখের কোল বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়েছে তা টের পাইনি। তীর্থভূমির পবিত্র মাটি মাথায় ঠেকিয়ে চললাম Apolo House-এর উদ্দেশ্যে।

বাড়ীটির অর্দ্ধাংশে ব্যবহৃত হয় আলমোড়া Club-হিসাবে, বাকী অর্দ্ধাংশে থাকেন এক অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান ফৌজী-অফিসার। বললেন—শুনেছি স্বামীজী এই বাড়ীতে এসে প্রায়শঃ প্রাতরাশ সারতেন ভগিনী নিবেদিতার সাথে। ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের বুকে এই গৃহটি ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যা, ধ্যান-ধারণার কতই না ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এখানেই থেকেছেন শ্রীশ্রীমায়ের আদরের খুকী ও রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের নিবেদিতা। আমার চাওয়ার অতিরিক্ত পাওয়া হয়ে গেল। আশিনার রজঃ মাথায় নিয়ে যখন নীচে নেমে এলাম তখন পশ্চিম-গগনে সূর্য্য ঢলে পড়েছে। মনে মনে বললাম আলমোড়া তোমায় প্রণাম।

●

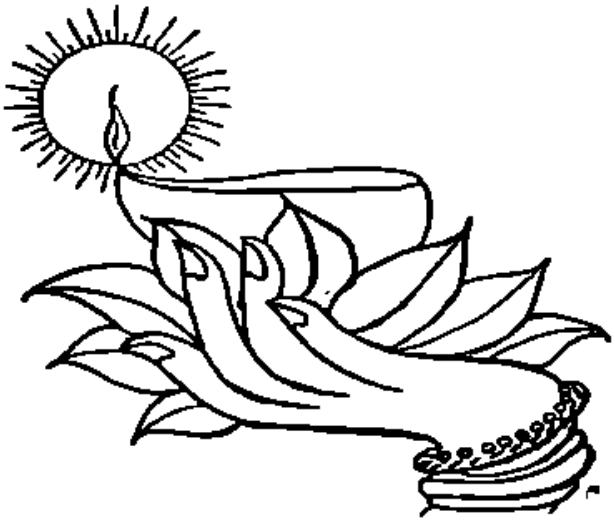

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(ছয়)

ইতালীর গুব্বিয়ো শহরটি আয়তনে ছোটো। কিন্তু সিরামিকপাত্র নির্মাণকেন্দ্ররূপে এ-শহরের খ্যাতি খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী কাল থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিলো। পাভিয়া শহরবাসী ভাস্কর মাত্তেস্ত্রো জর্জিয়ো এ্যাণ্ড্রোলি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে গুব্বিয়ো-তে চলে এলেন স্থায়ীভাবে। সঙ্গে এলেন তাঁর ভ্রাতা সালিমবেনে। সম্ভবতঃ পাভিয়া থেকে গুব্বিয়ো-তে আসবার পথে কোনো জায়গায় এ্যাণ্ড্রোলি লাস্‌চারএর ব্যবহার সম্বন্ধে জানতে পারেন। যাইহোক্, গুব্বিয়ো-তে এসে এ্যাণ্ড্রোলি যে-মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্রটি স্থাপন করেন, তাতে গোড়ার দিকে যেসব মাইয়োলিকা তৈরী করা হতো—সেগুলো চিত্রিত এবং অলংকৃত হতো লাস্‌চারএর সাহায্যে। লাস্‌চারএর সাহায্যে মাইয়োলিকাচিত্রণে এবং অলংকরণে এ্যাণ্ড্রোলি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। মাইয়োলিকাচিত্রণে এ্যাণ্ড্রোলি যেসব বর্ণের লাস্‌চার ব্যবহার করেছেন—সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো রক্তলাল বর্ণের 'রুবি' লাস্‌চার। কেউ কেউ বলেছেন, এই রুবি লাস্‌চার এ্যাণ্ড্রোলি তামা থেকে তৈরী করেছিলেন। কিন্তু জর্জ স্তাভেজএর মতে, এ্যাণ্ড্রোলি ব্যবহৃত লাস্‌চারএ তাম্রাক্ত বিন্দুরূপ দেখা যায় না। তাই স্তাভেজ মনে করেন, এই রুবি লাস্‌চার তৈরী করা হয়েছিলো সোনা থেকে। স্তাভেজ বলেছেন, সোনা থেকে যেসব সিরামিকরঞ্জক তৈরী করা যায়—তার মধ্যে রয়েছে লাল এবং বেগুনি রঙএর বিভিন্ন শেড্ (shade)॥ পরবর্তীকালে পারপল্ অব্ ক্যাসিয়াস্ অথবা ক্যামিল্ রোজ নামে খ্যাত নিম্নতাপসহ গোলাপী শেড্এর যে-সিরামিক রঙ ইতালীতে তৈরী করা হয়েছিলো—তা-ও তৈরী হয়েছিলো সোনা থেকেই। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যাণ্ডের ষ্ট্যাফোর্ডশায়ার

শহরের সিরামিকশিল্পীরা যে-লাল এবং যেগুলি রক্তএর লাস্‌চার সিরামিকপাত্রে ব্যবহার করেছিলেন—তা-ও সোনা থেকেই তৈরী করা হয়েছিলো। খৃষ্টপরবর্তী পঞ্চদশ শতকে ইতালীতে সোনা থেকে যেমন লাল রক্তএর লাস্‌চার তৈরী করা হতো, তেমনই রূপো থেকে তৈরী হতো শুকনো ঘড়ের রক্তএর মতো হালকা বাদামী লাস্‌চার, তামা থেকে তৈরী হতো তাম্রাভ লাল লাস্‌চার এবং মূল্যবান ধাতু প্ল্যাটিনাম থেকে তৈরী হতো রৌপ্যোজ্জ্বল লাস্‌চার। জর্জ ভাসেভ মনে করেন, আনুমানিক ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে এ্যাণ্ড্রিয়োলি গুব্বিয়ো শহরে মাইয়োলিকা তৈরী করতে সুরু করেন। ইতালীর অন্যতম মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্র ডেরুটা শহরে তৈরী মাইয়োলিকার গড়ন এবং অলংকরণের প্রভাব কিন্তু এ্যাণ্ড্রিয়োলি নির্মিত মাইয়োলিকাগুলোতে চোখে পড়ে। এছাড়াও ক্যাস্টেল ডুরান্টেতে যেসব মাইয়োলিকা পূর্ববর্তীকালে তৈরী হয়েছিলো—ওগুলোর গড়ন এবং অলংকরণের প্রভাবও এ্যাণ্ড্রিয়োলির শিল্পীমানসে ছাপ ফেলেছিলো বলে মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এ্যাণ্ড্রিয়োলি একসময়ে ভাস্কররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মানব-মানবীর দেহমূর্তি এবং প্রতিকৃতির প্রতি সেজন্যে তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিলো। তাঁর এই আকর্ষণের পরিচয় ছড়িয়ে আছে মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালার মনুষ্যমূর্তিসম্বলিত চিত্রণে।

ক্যাস্টেল ডুরান্টে শহরে বাস করতেন একই সময়ে দুই বিখ্যাত সিরামিকশিল্পী—নিকোলা পেলিপারিয়ো এবং সিপ্রিয়ানো পিকোলপাসো। পিকোলপাসো-র নাম পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হয়েছে। পিকোলপাসোর লিখিত একটি বই থেকেই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালীয় শিল্পিতসিরামিক্‌স্‌এর মূল্যবান কারিগরী তথ্য পাওয়া যায়। পোপ্‌ অষ্টম উরবান্‌ ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে ক্যাস্টেল ডুরান্টে শহরের নাম পরিবর্তন করে তাঁর স্বনামের অনুসরণে নতুন নামকরণ করেন 'উরবানিয়া'। এই উরবানিয়া অথবা ক্যাস্টেল ডুরান্টে শহরে নিকোলা পেলিপারিয়ো ১৫১০ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ ইতালীয় মাইয়োলিকা চিত্রকরদের মধ্যে পেলিপারিয়োকে শ্রেষ্ঠতম বলে অভিহিত করেছেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালে পেলিপারিয়ো উরবানিয়া শহর ছেড়ে নিকটবর্তী উরবিনো শহরে চলে যান্‌ এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। পেলিপারিয়ো-র পুত্র গুইডো ডুরান্টিনো একটি মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্র উরবিনোতে স্থাপন করেন। গুইডো ডুরান্টিনো পরবর্তীকালে স্বনাম পরিবর্তন করেন এবং 'ফন্‌টানা' নামে পরিচিত হন। ক্যাস্টেল ডুরান্টেতে অবস্থানকালে পেলিকারিয়ো যেসব মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালাতে চিত্রাঙ্কন করেছিলেন—সেগুলোর অধিকাংশতেই মানব-মানবীর দেহমূর্তি চিত্রিত হয়েছে। এই মূর্তিচিত্রগুলো পেলিপারিয়ো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে এঁকেছেন। চিত্রগুলো দেখলে বোঝা যায়, পেলিপারিয়ো কতো উঁচুদরের চিত্রকর ছিলেন। মাইয়োলিকাচিত্রণে যেসব রঙ পেলিপারিয়ো ব্যবহার করেছেন—তার মধ্যে প্রধান দুটো রঙ হলো হালকা নীল এবং সবুজ। কয়েকটি মাইয়োলিকা থালায় পেলিপারিয়ো প্রতিকৃতিও এঁকেছেন। এই প্রতিকৃতিগুলো অণুচিত্রণের (miniature painting) লক্ষণযুক্ত। প্রতিকৃতির প্রতিটি অংশ (detail) সূক্ষ্ম তুলিতে অত্যন্ত নৈপুণ্যের

সঙ্গে আঁকা হয়েছে। পেলিপারিয়ো অঙ্কিত চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রতিকৃতি ছাড়াও রয়েছে অর্ধমানব ও অর্ধপশুর চিত্র, বিভিন্ন ধরণের অস্ত্রশস্ত্র এবং বাদ্যযন্ত্রের চিত্র। এছাড়া কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা থালায় পেলিপারিয়ো মধ্যপ্রাচ্যীয় (দামাস্কাস) ধাতবপাত্রের অলংকরণের অনুসরণে অলংকরণও করেছিলেন। পেলিপারিয়ো তাঁর সমকালীন মাইয়োলিকা-চিত্রকরদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর একাধিক ছাত্র এবং অনুরাগী চিত্রকর তাঁর অঙ্কনরীতির অনুকরণে বেশ কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালার চিত্রাঙ্কন ও অলংকরণ করেন। পেলিপারিয়ো সাধারণতঃ যেসব শেড্‌এর রঙ অথবা লাস্‌চার ব্যবহার করতেন—অনুরূপ শেড্‌এর রঙ এবং লাস্‌চার তাঁর ছাত্র এবং অনুরাগী চিত্রকররাও ব্যবহার করেছেন। এঁদের কাজ পেলিপারিয়োর কাজের সঙ্গে এতোই নিকট সাদৃশ্যযুক্ত যে, ওইসব কাজের পার্থক্য নির্ণয় করা বিশেষজ্ঞদের পক্ষেও দুরূহ হয়ে পড়ে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

।। সংঘবার্তা ।।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব)

প্রতিবছরের মত এবছরও যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৪৫তম জন্মোৎসব প্রতিপালিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে। ১৮ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী দুদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিনে বিশেষ পূজা, মঙ্গলারাত্রিক, হোম, প্রসাদ বিতরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিনে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ মিত্র। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ এবং বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন।

ধর্মসভায় উদ্বোধন ক'রে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী মহারাজ বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী সহজ-সরল হলেও, বড় কঠিন। নতুনভাবে পুরাতনকে তিনি সর্বসাধারণকে দিয়েছেন। মানুষের রুচি, ধ্যান-ধারণা অনুসারে যুগ-প্রয়োজনে অবতারপুরুষ এসে থাকেন। বুদ্ধ, চৈতন্য প্রত্যেকে অনেক দিয়েছেন; কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর নতুন কি দিলেন? সর্বসমন্বয়ের অমর বাণী তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন। চিরন্তন সত্যকে তিনি নতুনভাবে দিলেন। তীব্র আকাঙ্খার বীজ তিনি রোপন করেছেন আমাদের মধ্যে। 'আপনি আচরি-ধর্ম অপরকে শিখায়'—এই চিরন্তন সত্যকে তিনি নিজের জীবনে রূপদান করেছেন। আজ আমরা এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করব যে তাঁর বাণী ও আদর্শকে আমরা জীবনে রূপায়িত করব। তাঁর সাধন-ধারা আমাদের অনুসরণ করতে হবে।

অধ্যাপক প্রেমবল্লভ সেন বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর, স্বামীজী, স্বামী অভেদানন্দের মত মহান তেজস্বী বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন। এতে অলৌকিকতার কিছুই নেই। কারণ তিনি ছিলেন সর্বজ্ঞানী। মহাপণ্ডিত কেশবচন্দ্র সেন বললেন, যদি সত্য, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ চাও—তবে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাও। সেই যুগের প্রত্যেক জ্ঞানীগুণী তাঁর প্রশংসা করেছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্য নয়, সমালোচক—তাঁরাই লিখেছেন তাঁর জীবনী। না লিখে উপায় ছিলনা—এত বড় প্রতিভা ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর। আমাদের প্রতিটি স্তরেই তিনি প্রবেশ করেছেন। যাঁরা তাঁর কথায় একমত হতেন না—তাঁরাও তাঁর কথা শুনবার জন্যে আকুল হয়ে থাকতেন। কি যেন ছিল সেই কথার মধ্যে। প্রতিটি স্তর থেকেই তিনি তাঁর শিষ্য বেছে নিয়েছেন। একদিকে বিবেকানন্দ—অপরদিকে লাটু মহারাজ। রসিক-বেধর-বারাঙ্গনা সকলকেই তিনি কতই না ভালবাসতেন। ছোট-বড় কোন ভেদকে তিনি স্বীকার করেন নি। নট-নটীদেরও তিনি আশীর্বাদ করেছেন। এর উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে নেই।

সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী এর পূর্বে সঠিক হয়নি। যতমত ততপথ এই বাণী পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাবেন না। তিনি তাঁর নিজের জীবনে সকল ধর্মের সাধনা করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরই প্রথম বললেন, প্রত্যেকটি সাধনার সমমূল্য।

ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ বলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন সত্যের পূজারী। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তা পালন করে গেছেন। ত্যাগ না হলে কোন কিছুই সফল হবেনা—এই ছিল তাঁর উপদেশ।

বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র বলেন, কথামৃত যতবার পড়া যায় ততবারই নতুন সত্য উপলব্ধি করা যায়। ভগবানকে কেন্দ্র ক'রে জীবন গড়ে তুলতে হবে। অধ্যাত্মবাদ সঠিক পথ দেখাবে। বিজ্ঞান ও দর্শন একদিন কাছাকাছি আসবেই। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ছন্দম সঙ্গীতগোষ্ঠীর শিল্পিবৃন্দ। শান্তিপাঠ করেন বেদান্ত মঠের ব্রহ্মচারীবৃন্দ। সমাগত ভক্তমণ্ডলী ও অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বামী পরমাত্মানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম, শিলিগুড়ি, কার্শিয়াং এবং দার্জীলিঙ্-এ যথাযথ সমারোহের সঙ্গে এই উৎসব পালিত হয় একই দিনে।

●

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-700014

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,

1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণে সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত এই কবচ ধারণে পরীক্ষায় পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—কুণ্ডা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র ভ্রমভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

জ্যোতির্বাণী

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয়

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক : শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী

সাংখ্যাদিতীর্থ, দর্শনাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, রাজ্যপাল-অনুমোদিত সদস্য।

ডাইরেক্টরী পত্রিকায় প্রধান জ্যোতিষী।

ওই পত্রিকায় প্রতি মাসে বিস্তৃত ব্যক্তিগত রাশিফল থাকে। বেদ, দর্শন, গুহ্য, জ্যোতিষ ও ধর্ম-সম্পর্কীয় আলোচনা থাকে।

প্রতি সংখ্যা ২ টাঃ। ২০·০০টাকা পাঠাইয়া বার্ষিক গ্রাহক হইলে ডাক-ব্যয় লাগে না।

৬/১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৫৫-৫১১৫

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
		Religion, Revelation and God	12·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Self Knowledge	12·00
		Science of Psychic Phenomena	8·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Spiritual Unfoldment	6·00
		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Christian Science and Vedanta		The Bases of Indian Culture	75·00
Doctrine of Karma	9·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
Divine Heritage of Man			
Epistles	12·00		
Great Saviours of the World	15·00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
How To Be A Yogi		The Steps Towards Perfection	2·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Vedanta Philosophy	
Ideal of Education	3·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
India and Her People	12·00		
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00		
Historical Development of Indian Music	65.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Music of the Nations	35.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Estabiished by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
42nd Year, May 1980
VOL. III

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

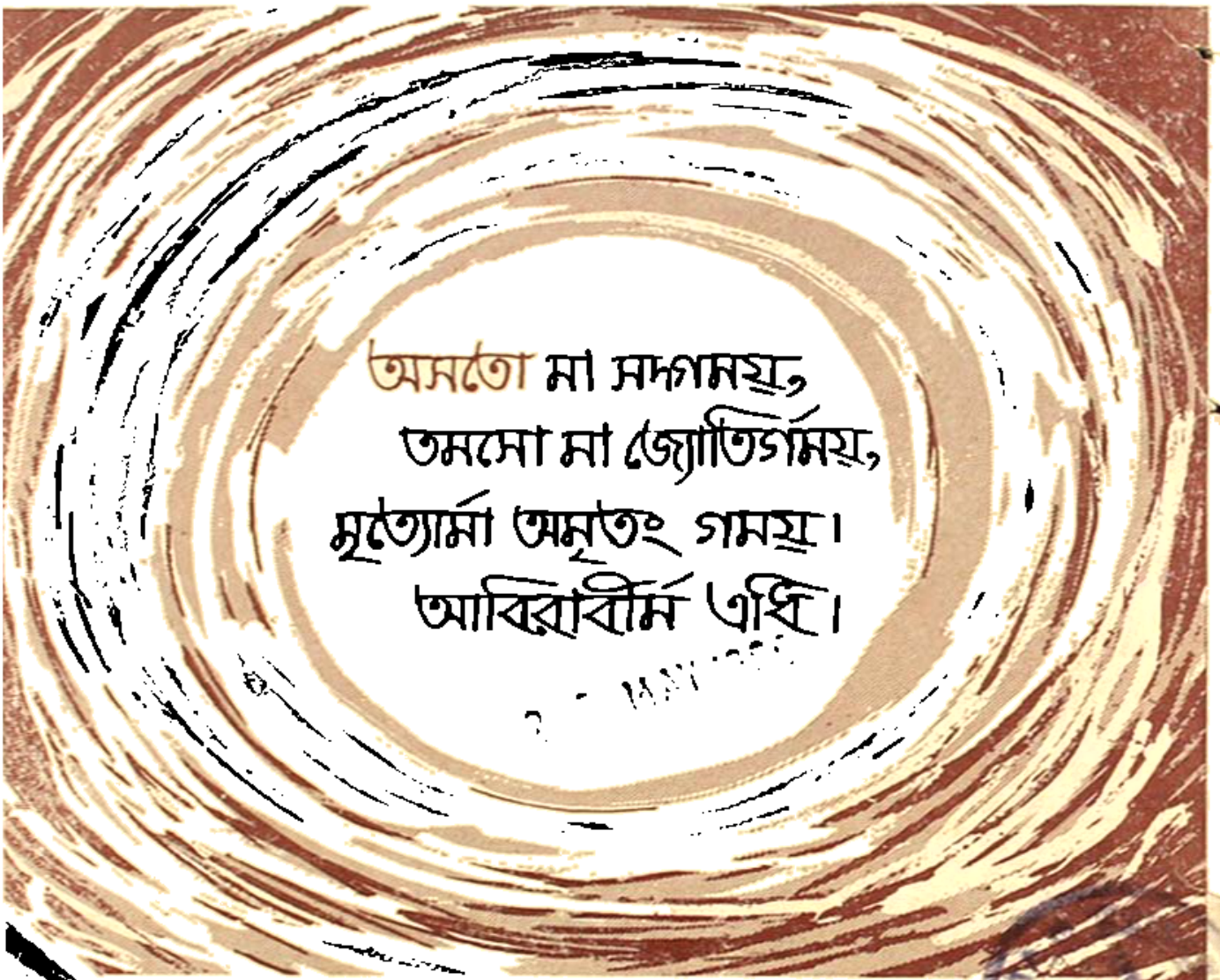

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৫৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৫৫০২২৫, ৫২৬৬৫২, ৩৬১২৩২
Cable:'Cookmepure','Sweetspice'
Telex:0212591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70
iaa 1293

ublished and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Mat
, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6,Duff Street, Calcutta-70
CE Rs. 1·50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১·৫০

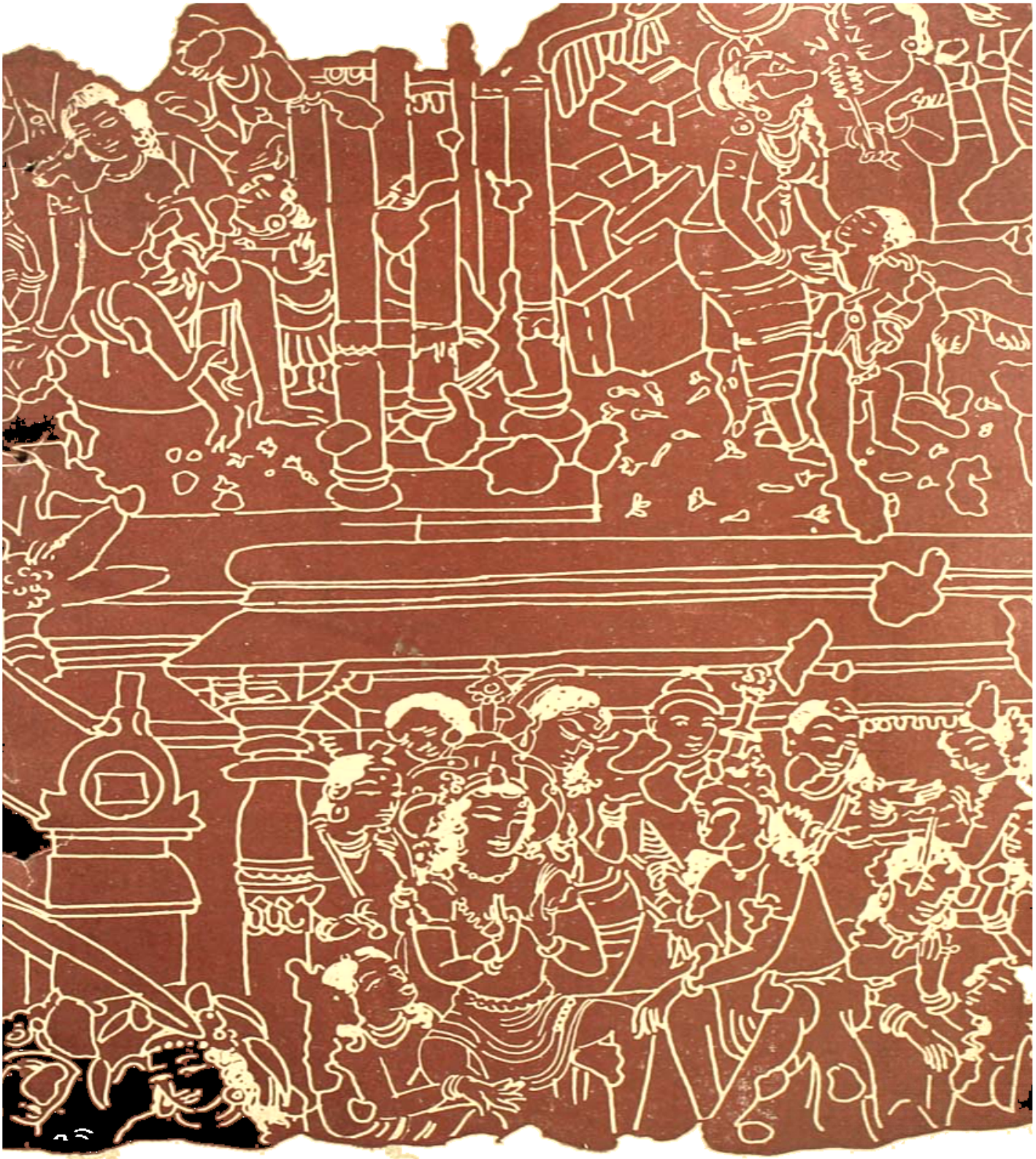

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

বিয়াল্লিশ বর্ষ
চতুর্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ
১৩৮৭

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১০ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১০ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।

- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

দুলালের তালমিছরী

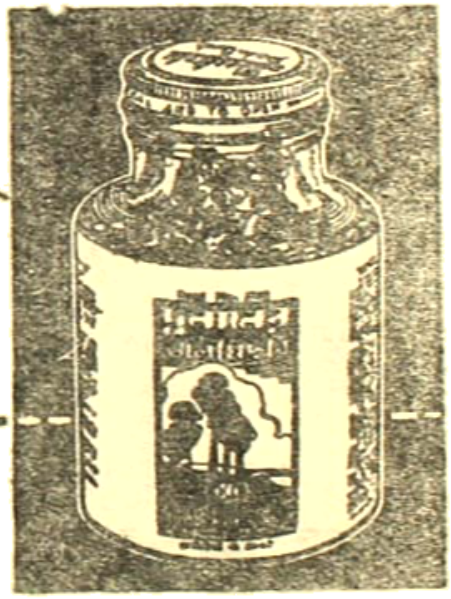

P. G

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত :

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৫·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
যন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৫·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—১·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৩০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৯

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

ন্যাশনাল ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৭

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

কে, এল, দত্ত এণ্ড কোং

অর্দ্ধ-শতাব্দীর জনপ্রিয় বস্ত্র, পোষাক, সুটিং, সার্টিং ও ছিট কাপড় বিপণি

৮০ নং বিধান সরণী, হাতীবাগান,

কলিকাতা-৭০০০০৬

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JEET' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.B. BOX NO. 10012, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৫-১৮০০

বৈশাখ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস্
৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এ'টি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৌজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

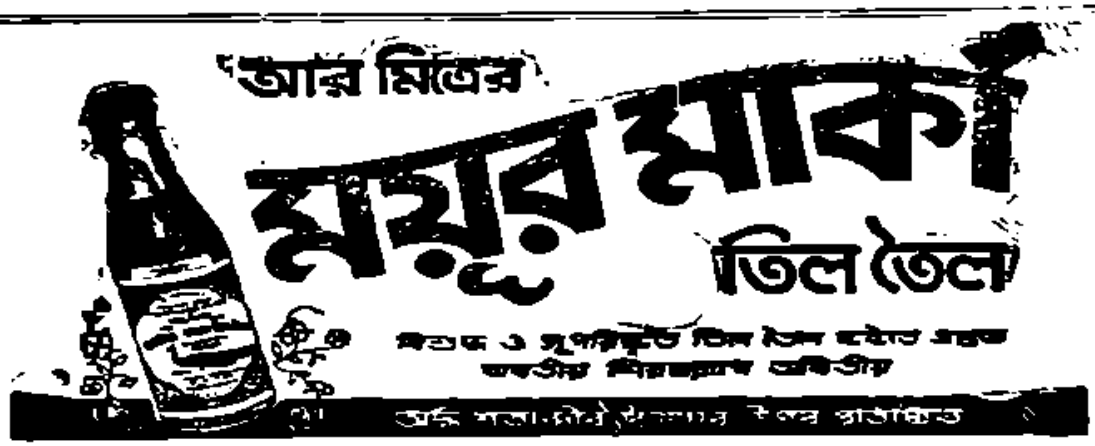

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • লালবাগ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

বৈশাখ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	১৬৯	
২।	বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা	১৭৫	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১৭৯	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	১৮৩	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৫।	ভগবান বুদ্ধ	১৮৬	ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ
৬।	পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা —স্বামী অভেদানন্দ	১৮৮	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৭।	ভারতাত্মা-স্বামী বিবেকানন্দ	১৯১	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৮।	পঁচিশে বৈশাখ	১৯৬	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
৯।	কেশব কালী মেনেছিলো	১৯৭	স্বামী প্রভানন্দ
১০।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	২০০	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
১১।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম উপন্যাস' কি 'তত্ত্বমূলক'	২০৪	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১২।	কালিদাস সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—বলাকা ও চাতক প্রসঙ্গ	২০৬	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
১৩।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	২০৮	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১৪।	পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা	২১৩	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৫।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২১৫	

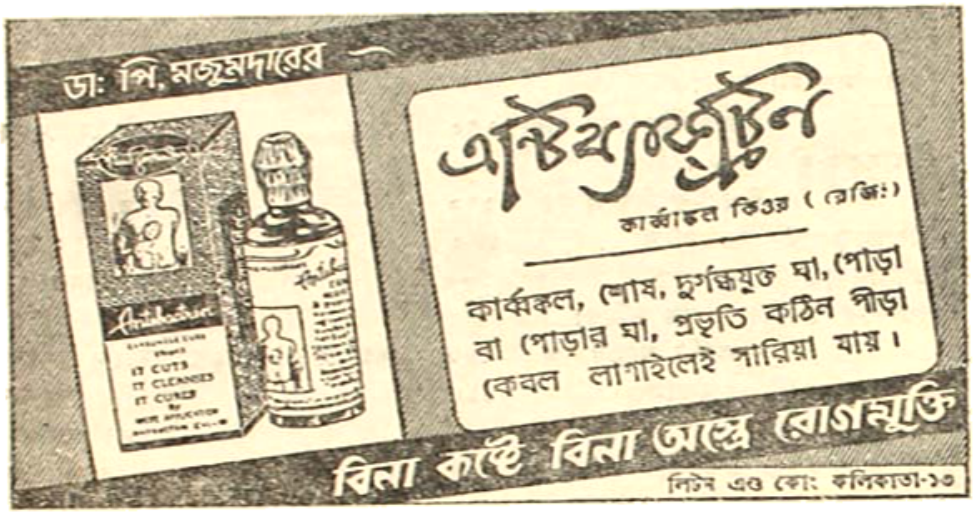

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

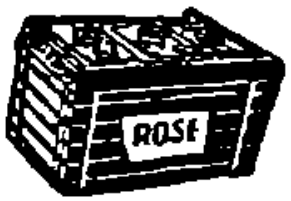

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

ATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

69, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

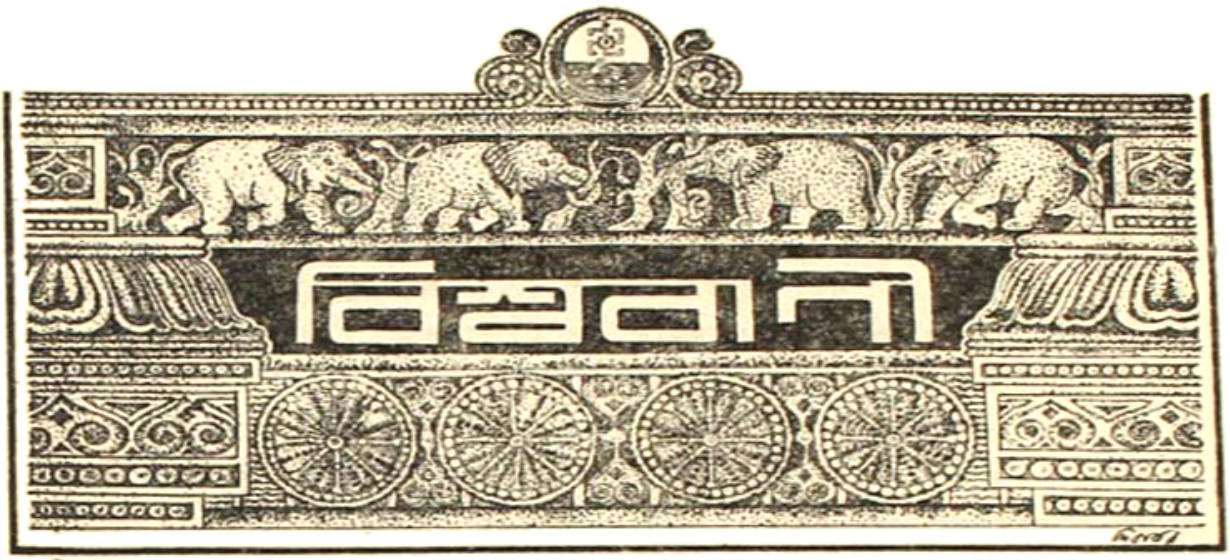

বিয়াল্লিশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ ॥

(প্রথমাংশ)

"শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)—'কি জানিস, যারা জীবকোটি, তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। প্রহ্লাদ 'ক' লিখতে একেবারে কাবা—কৃষ্ণকে মনে পড়েছে। জীবের স্বভাব সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে—হাঁ বটে, কিন্তু—।

"হাজরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়—তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন—তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বললে—দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়; দাহিকাশক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো-নাই।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ, পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৬, পৃঃ ২০৪
(১৪শ নূতন মুদ্রণ, ১৩৮৬, পৃঃ ১৩৬-১৩৭)।

সপ্তদশ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র, ভবনাথ প্রভৃতি সঙ্গে। গ্রন্থের শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) লিখেছেন :-"আজ নবমীপূজা (শ্রীশ্রীদেবী দুর্গার), সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল। মা-কালীর মঙ্গল-আরতি হইয়া গেল। নহবৎ হইতে রোশনচৌকি প্রভাতী রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছে। চাতালীহস্তে মালীরা সাজিহস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন।

মা-র (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) পূজা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ অতিপ্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে উঠিয়াছেন। ভবনাথ, বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ও মাষ্টার (শ্রীম) গতরাত্রি হইতে (দক্ষিণেশ্বরে) রহিয়াছেন। তাঁহারা ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘরের বারাণ্ডায় শুইয়াছিলেন। (তাঁহারা) চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখেন—ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) (ভাবে) মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন। বলিতেছেন—জয় জয় দুর্গে, জয় জয় দুর্গে।

"ঠিক একটি বালক (শিশু)। কোমরে (পরণে) কাপড় নাই। মা-র (শ্রীশ্রীভবতারিণীর) নাম করিতে করিতে (নিজের) ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন।

"কিয়ৎক্ষণ পরে আবার (শ্রীরামকৃষ্ণ) বলিতেছেন—সচ্চিদানন্দ, সচ্চিদানন্দ। শেষে গোবিন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) নাম বারবার বলিতেছেন—প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন। ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়াছেন। একদৃষ্টে (তাঁহারা) ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ভাব (প্রেমোন্মত্ত ভাব) দেখিতেছেন। হাজরাও কালীবাড়িতে আছেন। ঠাকুরের (শ্রীরামকৃষ্ণের) ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারাণ্ডায় তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) আসন (করা আছে)। লাটুও (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) আছেন ও তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) সেবা করেন। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ঐ সময়ে (তখন) বৃন্দাবনে। নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) মাঝে মাঝে আসিয়া (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দর্শন করেন। আজ (সেইদিন) নরেন্দ্র (বিবেকানন্দ) আসিবেন (দক্ষিণেশ্বরে)।··· সকলের মুখ ধোয়ার পরে এই উত্তর-বারাণ্ডাটিতে ঠাকুর (শ্রীরামকৃষ্ণ) একটি মাদুরে বসিলেন। ভবনাথ ও মাষ্টার কাছে বসিয়া আছেন। অন্যান্য ভক্তেরাও মাঝে আসিয়া বসিতেছেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৩-২০৪)।

শ্রীম-র এই বর্ণনা জীবন্ত ও চাক্ষুষ। বর্ণনাটি ধ্যানের বা চিন্তার সহায়ক। এই বর্ণনা আনন্দপূর্ণ। সে'দিনের বাস্তব ঘটনাটি মানসচক্ষে দর্শন করার সুযোগ পাবে প্রতিটি মানুষ এবং মানসদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সে'দিনের সেই মধুময় দৃশ্য ও ঘটনাটি ভক্তগণ চিন্তা ও অনুভব করার সুযোগ পাবেন। ঘটনার সঙ্গে উপদেশের নিবিড়-সম্পর্ক থাকলে উপদেশের বিষয়বস্তু ও তত্ত্ব সহজেই সুস্পষ্ট ও বোঝার সুবিধা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভক্ত ভবনাথকে লক্ষ্য করে বলছেন: "কি জানিস, যারা জীবকোটি—তাদের বিশ্বাস (ঈশ্বর বা যেকোন জিনিসের উপর বিশ্বাস) সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ" প্রভৃতি।

জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি-সম্বন্ধে বিচারের মধ্যে কখনও কখনও কিছু-কিছু বিতর্কের স্থান থাকে এবং এ' সম্বন্ধে যে কিছু-কিছু বিতর্ক ও মতভেদ নাই—তা নয়। জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি-সম্পর্কে পূর্বেও কিছু আলোচনা করেছি। পুনরায় ঐ প্রসঙ্গের আলোচনাক্ষেত্রে আমরা স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ-লিখিত 'আমার জীবনকথা'—তাঁর আত্মজীবনীতে (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৭৩, পৃঃ ১১৮) 'জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি'-সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে—তাকে অনুসরণ ক'রেই বলি: "একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পদসেবা করিতেছি। নিকটে কেহই ছিল না। আমি (স্বামী অভেদানন্দ) তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে) একাকী পাইয়া সেই জীবকোটি ও

ঈশ্বরকোটির তত্ত্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়া বলিলেন: 'ব্রহ্ম সকলের মধ্যে আছেন সত্য, কিন্তু সবার শক্তির প্রকাশে তারতম্য আছে। এই প্রকাশের তারতম্যেই মানুষ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি হয়। জীবকোটি নিজে মুক্তি পান,[১] কিন্তু অপরকে মুক্তি দিতে বা উদ্ধার করতে পারেন না। কিন্তু যিনি নিজে উদ্ধার লাভ ক'রে অপরকেও উদ্ধার করতে পারেন, তিনিই ঈশ্বরকোটি।[২] জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মধ্যে এই প্রভেদ। কেউ কেউ আবার ঐ শক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন' (ঈশ্বরকোটি বলতে এখানে অবতার বা অবতারকল্প মানবকে লক্ষ্য করা হয়েছে)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারপর বলেছেন: তবে "জীবকোটি যদি শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট অপরকে উদ্ধার করার জন্য শক্তি প্রার্থনা করেন, তবে মা (জগন্মাতা মহাশক্তি) তাঁকে তা (অপরকে উদ্ধার করার শক্তি) দেন"। এরই নাম 'কৃপা'। একান্ত শরণাগতির বা প্রপত্তির ভাব থাকলে যথার্থ জীবকোটি-সাধক নিজেকে মুক্ত করার মতো অপরকে মুক্তি দেওয়ার শক্তি লাভ করেন —একথা বলাই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদ্দেশ্য। অবতার ও যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে আসেন যাঁরা, বা জীবন্মুক্তপুরুষ যাঁরা—তাঁরা শ্রীশ্রীজগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করলে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী জগন্মাতা তাঁকে বা তাঁদের (শ্রীগুরুভাবের) শক্তি দান করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই অপূর্ব দৃষ্টান্ত (শ্রীরামকৃষ্ণদেব বনের মধ্যে চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা একটি জায়গা (স্থান) ও কতকগুলি লোকের 'হা-হা'-শব্দ ক'রে দেওয়াল পার হ'য়ে ঐ জায়গার ভিতরে হেসে পড়ার দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটি দিয়েছিলেন) শুনিয়া সেইদিন জীবকোটি (সাধনভজন ক'রে সাধারণ মুক্তিকামেচ্ছু সাধকের) ও ঈশ্বরকোটির (আত্মসিদ্ধ মহামানব বা অবতারপুরুষের) মধ্যে যে ভেদ বা পার্থক্য তাহা বুঝিতে পারিলাম"।

উপরিউক্ত আলোচনার ও বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকথিত "যারা জীবকোটি—তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না। ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ" কথার বা উপদেশের মর্মকথা সহজেই বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "কি জানিস্, যারা জীবকোটি —তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না"। জীবকোটিরা ভাগ্যবান সাধারণ সাধক। তাঁরা নিজেরা সাধন-ভজন ক'রে সাধনভজনের ফলশ্রুতিরূপে বন্ধনমুক্তি লাভ করেন। তাঁরা প্রথমে সন্দেহ ও অজ্ঞানের জগতে বাস করেন ও ক্রমে সেই সকল-কিছুর সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করেন, সুতরাং তাঁদের জীবনে ও জীবনের চিন্তায়, অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে প্রথমে 'আগে-পরে' (প্রথমে ও পরে) সন্দেহ ও বাধা-বিপত্তির ভাব থাকে, তারপর অধ্যাত্মসাধনার অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে এবং জ্ঞানের প্রসারতায় ও ক্রমসঙ্কোচের ফলে তাঁদের মধ্যে সন্দেহের অন্ধকার ধীরে ধীরে দূরীভূত হয় ও

১। জীবকোটি মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা (সাধনভজন) করে উচ্চতরসাধক আচার্যের সাহায্য নিয়ে, পরে নিজের সাধনার ফলশ্রুতিরূপে ঈশ্বরে মুক্তিলাভ করতে সাহায্য করে।

২। ঈশ্বরকোটি অবতার বা অবতারকল্প-মহামানব।

পরিশেষে পরমসত্তার অনুভূতির আলোকে তাঁরা চিরধন্য হন। কিন্তু আজন্মসিদ্ধ মহাপুরুষ ও অবতার-পুরুষদের জীবনের, চিন্তাপ্রণালীতার ও অনুভূতির ক্ষেত্র ঐ সাধারণ মুক্তিকামীদের মতো একই ধরনের নয় অর্থাৎ সমান নয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। সেজন্য মুক্তিকামী সাধনশীল জীবকোটি সাধকদের হয়তো ঈশ্বর ও যথার্থমুক্তি-সম্বন্ধে দৃঢ়ধারণা ও বিশ্বাস সহজে হয় না, কিন্তু আজন্মসিদ্ধ মহামানবদের ও ঈশ্বরের অবতারদের মন, চিন্তা, সাধনা সমস্তই পরিশুদ্ধ, সন্দেহাতীত ও ঈশ্বরভাবদগ্ধ, সেজন্য তাঁদের ঈশ্বরবিশ্বাস ও মুক্তির প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজন্মসিদ্ধ ও চিরকালের। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ঈশ্বরকোটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকোটিকে ঈশ্বরের অবতারও বলেছেন। অবতারপুরুষরা পৃথিবীতে আসেন (অবতীর্ণ হন) সকল মানুষের মুক্তিরূপ-কল্যাণসাধনের জন্য। তাঁরা লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করেন প্রথমে নিজেদের মুক্তির জন্য, এবং মুক্তির আশীর্বাদ লাভ ক'রে পরে অপর-সাধারণকে মুক্তিলাভের পথ প্রদর্শন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ঈশ্বরকোটি (অবতারাদি) না হ'লে সমাধির পর আর কেহ ফেরে না (নির্বিকল্পসমাধি হলে সাধারণ সাধকদের আর সমাধি থেকে ব্যুত্থান হয় না, জ্ঞান লাভ করার পর তাঁদের দেহপাত হয় ও তখন তাঁরা ব্রহ্মে লীন হন, কিন্তু জীবকল্যাণকামী অবতারদের কথা স্বতন্ত্র)। জীব (মানুষ) কেউ কেউ সাধনার ফলরূপে সমাধিস্থ হয়, কিন্তু সমাধিস্থ হলে প্রায় আর ফেরে না। কিন্তু তিনি (ঈশ্বর) যখন নিজে মানুষ হয়ে আসেন, অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবিকাটি তাঁর হাতে থাকে, সেজন্য সমাধির পর (তিনি বা অবতাররা) সংসারে ফেরেন লোকের মঙ্গল করার জন্য" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ৮৮)। এ'সকল কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যেন নিজের জীবনেরই কথা। শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় এজন্য লিখেছেন : "(স্বগতঃ) ঠাকুরের হাতে কি জীবের মুক্তির চাবি ?" শ্রীম-র একথা বলার উদ্দেশ্য যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবতারজীবনে বিশ্বাসী।

জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটির মতো বৈরাগ্যবান সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দুটি বিভাগ বা স্তর দেখা যায়—বিবিদিষা-সন্ন্যাসী ও বিদ্বৎ-সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীদের মধ্যে বিবিদিষা-সন্ন্যাসী যাঁরা তাঁদের মধ্যে মুক্তির ইচ্ছা থাকে, তবে হয়তো প্রবল নয়, সেজন্য সাধনা ও বিচার ক'রে তাঁদের আত্মানুভূতির বা ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্রে উন্নীত হতে হয়। হয়তো সাধনভজন ও বিচার ক'রে এক জীবনে তাঁরা ব্রহ্মানুভূতির চরমস্তরে উন্নীত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না, সেজন্য একান্ত আগ্রহ, প্রচেষ্টা ও বিবেক-বৈরাগ্য ক্রমশ তাঁদের জীবনে যথার্থমুক্তির আশীর্বাদ দান করে। আর বিদ্বৎ-সন্ন্যাসীরা জন্ম থেকেই সিদ্ধ, সুতরাং তাঁদের সাধনজ্ঞান ও বিচার সাধারণ মানুষদের পক্ষে উদাহরণ বা নিদর্শনস্বরূপ।[৩]

৩। আমার আছে কৃপাসিদ্ধ ও নিত্যসিদ্ধের থাক। থাক বলতে শ্রেণী। নিত্যসিদ্ধ-মানুষ ঈশ্বরকোটির বা বলতে তাঁরা আজন্মসিদ্ধ মুক্তপুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "প্রহ্লাদাদি নিত্যসিদ্ধের —সাধন-ভজন পরে। সাধনের আগেই ঈশ্বরলাভ,—যেমন লাউ-কুমড়োর আগে ফল, তারপরে ফুল"। (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৮৭)। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গেও প্রহ্লাদের কথা বলেছেন। প্রহ্লাদ জ্ঞানী অর্থে ব্রহ্মজ্ঞানী। তবে ব্রহ্মজ্ঞানী ও ঈশ্বরের অবতার বা অবতারপুরুষ ঠিক একশ্রেণীর নন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "জীবের স্বভাব—সংশয়াত্মক বুদ্ধি। তারা বলে—হাঁ বটে, কিন্তু—"। সংশয়াত্মক বুদ্ধির নাম মন। মনের কাজই হ্যাঁ করা ও না করা—সঙ্কল্প ও বিকল্প। সংশয় অর্থে সন্দেহ—ঠিক বুদ্ধি, ঠিক নির্ধারণ বা ঠিক জ্ঞান নয়—দুই দুই-মনোভাব—হাঁ ও না—দুটোর দিকেই মন দোলায়মান, একটা ঠিক বলে নিশ্চয় করতে পারে না তারা। সাধারণ লোকের মন তাই। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব জীবকোটির প্রসঙ্গে সাধারণ লোকের সংশয়াত্মক বুদ্ধিযুক্ত স্বভাব বা প্রকৃতির (মনের) কথা বলেছেন, আর ঈশ্বরকোটির প্রসঙ্গে তিনি ভক্ত ও জ্ঞানী প্রহ্লাদের কথা বলেছেন : "প্রহ্লাদ 'ক' লিখতে একেবারে কান্না—কৃষ্ণকে মনে পড়েছে"। প্রহ্লাদের আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণের নামের আদ্য-অক্ষর 'ক', তাই 'ক' লেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আরাধ্যদেবতা শ্রীকৃষ্ণের কথা, স্মৃতি বা মূর্তি মনে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে হয়ও তাই। যথার্থ ভক্ত যিনি, জ্ঞানী যিনি—তাঁর স্মৃতিপথে ও দৃষ্টিপথে সর্বদাই শ্রীভগবানের মূর্তি ভাসমান থাকে, কেননা ধ্যানসিদ্ধ বা চিন্তাসিদ্ধ তিনি, তাঁর সাধারণ প্রকৃতি বা স্বভাব ঈশ্বরচিন্তার, ঈশ্বরের নামের ও মূর্তির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করতে করতে ঈশ্বরময় হয়ে যায়। তাই সিদ্ধ ও ধ্যানময় তিনি। এই ধ্যানময় অর্থাৎ ধ্যানসিদ্ধ জ্ঞানময় মানুষেরাই সাধারণভাবে ঈশ্বরকোটি নামে পরিচিত। নচেৎ ঈশ্বরকোটিরা অবতারপুরুষই, অথবা জীবনসিদ্ধ মহামানব।

এরপর প্রসঙ্গ ও আলোচনা একটু ভিন্ন রকমের, বিচারমূলক অথবা অনুভূতিমূলক, কেননা এখানে প্রসঙ্গের অবতারণা—'ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি আর শক্তিমান অভেদ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "তোমরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যখন (ব্রহ্ম) নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই ; যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বললে দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৪)।

পূর্বে আমরা বহুবার এ'প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি অদ্বৈতপক্ষে বা অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে। কাশ্মীরশৈবাগমে বা কাশ্মীরীয়-শৈবতন্ত্রে শক্তি ও শক্তিমান—শক্তি ও শিব যে এক ও অভেদ—এ'তত্ত্ব প্রমাণিত হয়েছে। আচার্য অভিনবগুপ্ত 'পরমার্থসারঃ'-গ্রন্থে ও যোগরাজাচার্য 'বিবৃতি'-ভাষ্যে শক্তি ও শক্তিমান-তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া শ্রীসোমানন্দনাথ তাঁর 'শিবদৃষ্টিঃ'-গ্রন্থে ও আচার্য উৎপলদেব 'শিবদৃষ্টি'-গ্রন্থের বৃত্তিতে এবং তাছাড়া কাশ্মীরতন্ত্রাচার্যদের প্রায় সকলেই শিব ও শক্তির অভেদসত্তা প্রমাণ করেছেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখনই ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তিমান ও শক্তির কথা বলেছেন তখন একথা ঠিক যে, শক্তি শক্তিমান থেকে ভিন্ন নয় তাঁরও দৃষ্টিতে।

আচার্য অভিনবগুপ্তের 'পরমার্থসারঃ'-গ্রন্থের চতুর্থ শ্লোকের 'বিবৃতি'-মুখে শ্রীসর্বমঙ্গলাশাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে যোগরাজাচার্য বলেছেন—

'শক্তিশ্চ শক্তিমাংশ্চৈব পদার্থদ্বয়মুচ্যতে।
শক্তয়োহস্য জগৎসর্বং শক্তিমাংস্তু মহেশ্বরঃ'।

সাধারণ বা আপাতদৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিমান—শক্তি ও শিব ভিন্ন বা পৃথক বলে পরিচিত, কেননা শক্তি বলতে সেখানে বিশ্বচরাচর ও শক্তিমান শিব-মহেশ্বর। শ্রীসর্বমঙ্গলশাস্ত্রের মতে শক্তি ও শক্তিমানের বা শক্তি ও শিবের মধ্যে ভেদ কল্পিত—সত্য নয়। তাই শ্রীসোমানন্দনাথ 'শিবদৃষ্টি:'-গ্রন্থের তৃতীয় আহ্নিকের ২-৩ শ্লোকে সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন—

'তথা তত্ত্বাপদেশশ্চেত্যাপদেশ: শিবাত্মক:।
ন শিব: শক্তিরহিতো ন শক্তির্ব্যতিরেকিণ[১] ॥২
শিব: শক্তিস্তথা ভাবানিচ্ছয়া কর্তুমীহতে।
শক্তিশক্তিমতোর্ভেদ: শৈবে জাতুর্নিবর্ণ্যতে ॥৩

অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোনদিনই অবাস্তবভেদ কল্পনা করা যায় না। পরে সোমানন্দনাথ ৭-৮-ম শ্লোকে শক্তি ও শক্তিমান কীভাবে অভেদ সেই কথার প্রসঙ্গে বলেছেন—

'ন হিমস্য পৃথক্ শৈত্যং নাগ্নেরৌষ্ণ্যং পৃথগ্ভবেৎ।
মন্ত্রস্তম্ভনভায়াং হি নাসৌ বহ্নিস্তদোচ্যতে ॥৭
হেমাদিবন্ধ্যাস্বরং তদ্দ্রব্যং তৈর্বভিচারিতম্।
যদৌক্ষ্যাব্যতিরেকত্বে দৃষ্টান্তো দাহকস্রেয়াৎ' ॥৮

আচার্য উৎপলদেব তাঁর শিবাদ্বয়বাদের পক্ষে তাই বলেছেন: "সত্যমেব শক্তের্ব ব্যবহার-দর্শনাত্তদ্বয়বাদ এব বক্তুং যুক্তমিত্যেতদ্বস্তুপি ন ধর্মিনং বিনা ধর্মো ব্যবহারশক্ত:। ন হি-হিমাশ্রী-বিনা শৈত্যোষ্ণ স্পর্শৌ জাত্যাদিসংভবতি তদ্ব্যবহারেঽপি।..... বহ্নের্ভাসমানত্বাদ্ বহ্নিরয়মিতি সর্বোঽপি প্রত্যেতি, তত্র শক্তিব্যতিরেকেঽপি তস্য ব্যবস্থানাৎ কথামুক্তং 'মুক্তোঽপি' ইত্যাদি"। কথা এই যে, কাশ্মীরীয়-শৈবাগমে শক্তি ও শক্তিমান এক ও অভেদ এ'তত্ত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে 'শিবাদ্বয়বাদ' প্রতিষ্ঠা করার জন্য। কাশ্মীরীয়তন্ত্রে শিবাদ্বয়বাদ ও শাক্তাদ্বয়বাদ (শাক্তাদ্বৈতবাদ) একই কথা। অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত ব্রহ্মাদ্বয়বাদের প্রতিষ্ঠা করা—অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই অদ্বয়তত্ত্ব ও অদ্বৈতবাদ। এখানে শক্তির সত্তা ব্রহ্মসত্তা থেকে ভিন্ন নয়, তবে ব্রহ্মের ও শক্তির প্রকাশে পার্থক্য থাকতে পারে, কিন্তু স্বরূপে বা স্বরূপসত্তায় এক ও অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যও ঠিক এই এক ধরনের। তিনি বলেছেন: "ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। যখন (ব্রহ্ম) নিষ্ক্রিয়, তাকে তখন ব্রহ্ম বলে কই, যখন (তিনি) সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় করেন, তখন (সেই শক্তিমান ব্রহ্মকে) শক্তি বলি। কিন্তু (স্বরূপে) একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বললে (অগ্নির) দাহিকাশক্তি আপনাপনিই বা স্বতঃই বুঝায়, আর দাহিকাশক্তি বললে (শক্তিমান) অগ্নিকেই মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই"। অর্ধনারীশ্বরের মূর্তি পুরুষ ও নারীকে নিয়ে—একটিকে নিয়ে নয়। ঋগ্বেদে এই অর্ধনারীশ্বরের ধারণা পাওয়া যায়,—সৃষ্টি তত্ত্বের যুগ্মমূর্তি।

১। শক্তি:+বা+একিন=শক্তি একা-বা বিচ্ছিন্ন নয়।

অদ্বৈতবেদান্তীরা শক্তিকে মিথ্যা বলেছেন শক্তির আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তিটিকে স্মরণ ক'রে।[৫] তাঁরা বলেছেন : 'ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা'। মিথ্যা এই অর্থে যে, জগৎ, মায়া বা অবিদ্যা তখন ব্রহ্মের স্বরূপসত্তা থেকে বঞ্চিত। তবে জগৎ, মায়া বা অবিদ্যা একেবারেই তুচ্ছ ও অসৎ নয়, কিন্তু পারমার্থিকসত্তাযুক্ত সত্য নয়, ব্যবহারিকভাবে সত্য। অবশ্য এটিকে আরও পরিষ্কারভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

●

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ ইহুদীদের কথা ॥

প্যালেস্টাইনের প্রস্তরযুগীয় মানুষেরা ছিল কুটিরবাসী, পশুপালক ; মাটির ভাল টিপে টিপে তারা মৃৎপাত্র তৈরী করলেও নিজের হাতে তৈরী করা সুতীবস্ত্র পরতো। যাযাবর সেমিটিক জাতির বিভিন্ন দল এ-অঞ্চলে আসতে থাকায় রক্তের সংমিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। খ্রীঃ পূর্ব তিন হাজার বছর নাগাদ সেখানে এলো আরেকটি যাযাবর জাতি আমোরাইট তাদের তামা ও ব্রোঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। রক্তের সংমিশ্রণ যদিও ব্যাপকভাবে ঘটেছিল তবুও দ্বিরুক্তভাষী ইস্রায়েলীরা ক্যানানাইট-হিটাইট-আমোরাইটদের মধ্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিল। এরা ক্যানানের উপকথাগুলি তাদের শাস্ত্রে গ্রহণ করেছিল ঠিকই, তবে স্বকীয় কল্পনায় সেগুলির ভিন্ন রূপ দিয়েছিল। এই ইহুদীরা ঐ অঞ্চলে স্থায়ী বসতি স্থাপনের চেষ্টা করলেও মিশর-ব্যাবিলোনীয়া-আমিরীয়া ইত্যাদি দেশের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের মাঝে পড়ে বহুযুগ ধরে অত্যাচার সহ্য করেছে এবং এভাবে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। পরে দেখা যায়, মোজেসের নেতৃত্বে এরা মিশর ত্যাগ করে প্রায় ৪০ বছর মরুময় অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছিল। এরপর জোশুয়ার নেতৃত্বে এরা ক্যানাইটদের সাথে যুদ্ধ করে ক্যানন দখল করে। ইহুদীরা তখন ছিল অনেকগুলি খণ্ডজাতিতে বিভক্ত। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এদের সম্মিলিত করে রাজা সল্ চেষ্টা করেছিলেন ইহুদী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে, কিন্তু ফিলিস্টাইনের সাথে যুদ্ধে হেরে

৫। মায়ার দুটি শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। আবরণশক্তিতে মায়া বস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে ও বিক্ষেপশক্তিতে কল্পিত বা মিথ্যা বস্তুকে প্রতিভাত করে। যেমন দড়িতে সাপ দেখায়। এই ভুল দেখার কারণ হ'ল অজ্ঞান বা মায়া প্রথমে দড়ির সত্যস্বরূপকে আবৃত করে ও পরে দড়িতে ভুল-সাপকে প্রতীতি করায়। জীবের পক্ষেও তাই—আবরণশক্তি ব্রহ্মভাবকে আবৃত ক'রে বিক্ষেপশক্তির সাহায্যে ব্রহ্মকে জীব বলে দেখায়।

যাওয়ার ইতিহাসের চাকা ঘুরে যায়। ইহুদীদের প্রথম রাজা ছিলেন তিনি ; কিন্তু যাযাবর জাতির রীতিনীতি কিছুই ছাড়েন নি, এমন-কি বাস করতেন তিনি ঘরে নয়, শিবিরে।[২৩] পরবর্তী রাজা ডেভিড কিন্তু যুদ্ধে ফিলিস্টাইনদের হারিয়ে নগর-সভ্যতার দিকে ঝুঁকলেন। অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সুদৃঢ় দুর্গ তৈরী করে কোন নগরেই, রাজধানী স্থাপন করা দরকার। পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চল জয় করে তিনি এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। একদিকে ইহুদী-ধর্মের গোঁড়া বিশ্বাসী, নাচ-গানে দক্ষ, অন্যদিকে শত্রুর প্রতি নির্মম এই ডেভিড বাইবেলে অমর হয়ে আছেন। এরপর রাজা সলোমন ইহুদীদের গৌরব আরও বাড়িয়ে দিলেন। বিলাসী হলেও প্রজ্ঞা ও কর্মশক্তির মিলনে এই অসামান্য চরিত্র ইহুদীদের শিখিয়েছিলেন আইন-শৃঙ্খলা ও ঐক্যবোধ। ফিনিশীয় বণিকদের ও মিশরীয়দের সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপন করে সলোমন বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তার নৌ-বহর পাঠাতেন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য। ইহুদীদের ইতিহাসে প্রথম মন্দির তিনিই তৈরী করেছিলেন। মিশরীয় পদ্ধতিতে গড়া এই মন্দিরের কারুকার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল আমিরীয়া ও ব্যাবিলোনীয়া থেকে। কিন্তু অতিরিক্ত উদারতার ফলে তিনি ইহুদী একেশ্বরবাদের জায়গায় বহু দেবদেবীর পূজো প্রবর্তন করলেন এবং শান্তিপ্রিয় স্বভাবের জন্য রণসজ্জায় ছিলেন নিরুদ্যম।

এরপর ইহুদীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়লো। প্যালেস্টাইনের শস্যশ্যামল উত্তরাঞ্চলের সভ্য সমাজ (ইস্রায়েল) ও দক্ষিণের যাযাবর মরুবাসীর সমাজ (জুডা) শুধু যে ভাগই হয়ে গেল তা নয়, গৃহযুদ্ধেও জড়িয়ে পড়লো। আসিরিয় সাম্রাজ্যের আক্রমণে ইহুদীরা বিধ্বস্ত হয়ে গেল কয়েক বছর যাবেই। সম্রাট সারগণ দু'লক্ষ ইহুদীকে দাস করে পাঠালেন আসিরিয়ায়। ভবিষ্যতে এদের কোনও হদিশ আর পাওয়া যায়নি। ইস্রায়েলের এই শোচনীয় অবস্থার পর জুডা কিন্তু টিঁকে ছিল আরও কয়েক দশক। এতদিন ইস্রায়েলবাসীরা সলোমনের আদর্শে বহু দেবদেবীর পূজো করলেও জুডার অধিবাসীরা একেশ্বরবাদেই বিশ্বাসী ছিল (জাভ-উপাসক)। ব্যাবিলন-রাজ নেবুকাডনেজার জুডা ধ্বংস করে সব ইহুদীকে পাঠিয়ে দিলেন ব্যাবিলনে। পঞ্চাশ বছর পরে পারস্য-সম্রাট কুরুস ব্যাবিলন অধিকার করে ইহুদীদের মুক্তি দিয়ে জেরুজালেম ফিরিয়ে দিলেন তাদের হাতে। ধর্মীয় সূত্রে আবদ্ধ[২৪] ইহুদীরা আবার ঐক্যবদ্ধ হয়ে উঠলো প্রধান পুরোহিতের নেতৃত্বে।

আলেকজাণ্ডারের পর গ্রীকদের সাথে ইহুদীদের প্রবল সংঘর্ষ হয় কারণ রাজা অ্যান্টিওকাস্ ইহুদী ধর্মের উচ্ছেদ করে তাদের গ্রীক সংস্কৃতি ও ধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। ইহুদীরা প্রথমদিকে অত্যাচার সহ্য করলেও ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো এবং এরফলে জাতীয় ধর্মে রাজনীতির প্রবেশ ঘটলো। জুডাস মেক্কাবিয়াসের নেতৃত্বে ইহুদীরা স্বাধীন প্যালেস্টাইন

২৩। প্রাচীন প্যালেস্টাইন—শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, [কলিকাতা, ১৩৬৯], পৃঃ ৪০

২৪। Arnold J. Toynbee : A Study of History, [Oxford University Press, 1962], vol. 2, p. 236.

গড়ে তুললো। একশ' বছর বাদে প্যালেস্টাইন রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে পড়লে ইহুদীরা আবার ছড়িয়ে পড়লো বিভিন্ন দেশে ; সাথে তাদের ধর্মগ্রন্থ।

॥ চীন ॥

১৭৬৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চীনে যখন শাং-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখন চীনা সমাজ ছিল কৃষিজীবী। পশুপালনের কোন নজির না পাওয়া গেলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানে এরা যে অনেক উন্নত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এভাবে ব্রোঞ্জযুগেই চীনা সমাজ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল। সে-সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছিল নানান পিতৃতান্ত্রিক খণ্ডজাতি, এবং প্রতিটিরই একজন করে নেতা ছিল। সম্রাট ছিলেন তাদের সবার ওপর। সম্রাট ও খণ্ডজাতি-নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল[২৪] অনেকটা সামন্তরাজ্যে রাজা ও সামন্তের মতো। শাং-রাজবংশের শেষ রাজা চু-শিনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উ-ওয়াং নামে একজন খণ্ডজাতির সামন্ত-নেতা তাকে হত্যা করে ১০৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে চু-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন যা চীনে ন'শ বছর ধরে রাজত্ব করে গেছে।

উ-ওয়াংয়ের পূর্বপুরুষেরা চীনে এসেছিলেন পশ্চিমের কোন এক অঞ্চল থেকে। এরা ছিলেন যাযাবর পশুপালক এবং তৎকালীন চীনা সমাজের থেকে অনুন্নত। তবে চীনে স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করে এরা কৃষিজীবী সমাজের সভ্যতাকে খুব তাড়াতাড়ি গ্রহণ করে নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। চু-রাজবংশ চীনা সম্রাটের পদ পেয়ে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। আগে যেখানে শাংয়ের রাজ্য-সীমানা রাজধানী আনিয়াংকে কেন্দ্র করে চারদিকে ২-১শ' মাইল পরিধি নিয়ে বিস্তৃত ছিল, সেখানে চু-রাজারা পূর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত এবং দক্ষিণে ইয়াংসি নদী পর্যন্ত[২৫] বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে উঠলেন। আগের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও পাকা করা হলো। খণ্ডজাতি-নেতাদের বদলে রাজবংশের আত্মীয়-স্বজনেরাই এই সামন্ত-প্রদেশগুলির অধিপতি হলেন। চাষীরা সমস্ত-অধিপতিদের কাছ থেকে খাজনার বিনিময়ে চাষবাসের কাজ করতো। এভাবে গোড়ার দিকে সমগ্র রাজ্যে কঠোরভাবে কেন্দ্রীয় শাসন চালু করলেও পরে দুর্বল রাজাদের সময় বিভিন্ন সামন্ত-অধিপতিরা স্বাধীন হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন।

চু-রাজবংশেই কিন্তু চীনের শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য, দার্শনিক চিন্তা ইত্যাদির দ্রুত অগ্রগতি হয়েছিল যা চীনের সমাজে ও চিন্তাজগতে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করে। ব্রোঞ্জযুগ অতিক্রম করে লোহার ব্যবহারও এই যুগেই হয়েছিল।

॥ ভারত ॥

এবারে ভারতের প্রসঙ্গে আসা যাক। সিন্ধুতে একসময় অনার্য দ্রাবিড়রা বাস করতো এবং বহিরাগত আর্যরা এসে তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে ভারতে বৈদিক সভ্যতা গড়ে

২৪। শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : মহাচীনের ইতিকথা, [কোলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭], পৃঃ ২৫

২৫। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্র : পৃথিবীর ইতিহাস, [কোলকাতা, আশ্বিন ১৩৬০], পৃঃ ৪৩৭

তুলেছিল—এই মতের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি লিখেছেন, "ঐ যে ইউরোপী পণ্ডিত বলছেন যে, আর্যেরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনো'দের মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করলেন—ও-সব আহাম্মকের কথা।···কোন্ বেদে, কোন্ সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে কেটে ফেলেছেন"?[২৭] "[ভারতবর্ষের] আর্য ও দ্রাবিড়—এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, কপোটিতত্ত্বগত (craniological) বিভাগ নহে, সে-ধরনের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই"।[২৮] আর্য-দ্রাবিড় সমস্যা তিনি আরও লিখেছেন, "[প্রাচীনযুগে ভারতের] অন্যতম একটি প্রতিযোগী জাতি একটি পন্থা উদ্ভাবন করিয়া আপন উন্নততর সংস্কৃতির সাহায্যে ভারতের অধিকাংশ জনগণকে আয়ত্তে আনিতে সমর্থ হইল। এই উন্নত জাতি নিজেদের 'আর্য' বলিত"।[২৯] স্বামীজীর এই মতের যৌক্তিকতা আমরা অন্যত্র প্রমাণ করেছি[৩০] বলে এখানে তার পুনরুল্লেখ করছি না।

প্রকৃতপক্ষে ভারতে বহিরাগত জাতির আক্রমণ ঘটেছে যখন পাশ্চাত্যে রোমান্ সাম্রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সে-সময়ে। প্রথমে শক, পরে কুষাণ, হূন, মোগল ইত্যাদির আক্রমণ হয়েছে এ-দেশে। কিন্তু ভারতে এসে তাদের কি হলো? শকেরা এ-দেশে এসে মিশে গেল ভারতীয়দের মাঝেই। একই অবস্থা হলো কুষাণ ও মোগলদের। আরবী ও হূন জাতি ভারত আক্রমণ করেছিল ঠিকই, তবে এদের অধিকাংশই লুটপাট করে সরে গেছে; সামান্য এক অংশ, যারা রয়ে গেল, তারাও নিজেদের সত্তাকে মিলিয়ে দিয়েছে ভারতীয়দের সাথে। চন্দ্রগুপ্তের কিছু আগে গ্রীক জাতিও এসেছিল। কিন্তু দেশ জয় করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে তারাও শেষপর্যন্ত সরে গিয়েছিল। পুরুর সাথে যুদ্ধে আলেকজাণ্ডার হেরে গিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিলেন এ-কথা লিখে গেছেন দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের ঐতিহাসিক আরিয়ান এবং পরে প্লুটার্ক, জাস্টিন্, কার্টিয়াস্ প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা। পারস্যের প্রাচীন শিলালিপি ও দলিলপত্রও এ-কথার সাক্ষ্য দিয়েছে।[৩১]

(ক্রমশঃ)

২৭। বাণী ও রচনা ৬ : ২০৯-১০

২৮। ঐ ৫ : ৩৭৯

২৯। ঐ ৭ : ৩৭৮

৩০। লণ্ডনের HINDUISM পত্রিকায় প্রকাশিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ Aryan Invasion of India : A Deceptive Propaganda. ১৯৭৮-৭৯ সালে সাতটি কিস্তিতে প্রকাশিত এই প্রবন্ধে চারটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার উপস্থিত করেছি—(1) Ancient history and text-documents, (2) Archaeological findings, (3) Sociological views and their analysis, (4) Evolution of religious thoughts and rituals. চল্লিশটিরও বেশি যুক্তি উপস্থিত করে প্রচলিত মতসমূহকে খণ্ডন করে স্বামী বিবেকানন্দের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি প্রবন্ধটিতে।

৩১। মহেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রাচীন ভারতের সংক্ষিপ্ত কাহিনী, [কোলকাতা, ১৯৭৪], পৃঃ ২৫৪-৫

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(দুই)

লীলাবার্তা :

[বিদ্যাসাগরসহ ঠাকুরের মিলন]

শ্রীশ্রীঠাকুর গাড়ি হ'তে অবতরণ করলে, মাষ্টার মহাশয় তাঁকে এবং উক্ত ভক্তদ্বয়কে সঙ্গে করে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে প্রবেশ করেন। ঐ উঠানে ফুলবাগানের মধ্য দিয়ে সেই দ্বিতল ভবনে গতায়াতের পথ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ পথ ধরে সেই ভবন অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সময়, নিজের জামার খোলা বোতামে হাত দিয়ে, মাষ্টারকে বালকের মত জিজ্ঞাসা করেন—"আমার জামার বোতাম খোলা রয়েছে,—এতে দোষ হবে না ?"

মাষ্টার মহাশয় তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে বলেন,—"আপনি ওর জন্য ভাববেন না ; আপনার কিছুতে দোষ হবে না।

বালককে বুঝালে, সে যেমন সহজেই বুঝে, ঠাকুরও তেমনি মাষ্টার মহাশয়ের কথায় নিশ্চিন্ত হন। যা হোক, মাষ্টার তাঁকে পথ দেখিয়ে সযত্নে ঐ ভবনের দ্বিতলে নিয়ে যান। ঠাকুরকে অনুসরণ ক'রে সঙ্গী ভবনাথ এবং হাজরাও সেখানে উপস্থিত হন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বিতলের বৈঠকখানা ঘরে উত্তরাংশে নিজ চেয়ারে দক্ষিণাস্য হ'য়ে উপবিষ্ট রয়েছেন। এঁর সম্মুখে একটি লম্বা টেবিল ; টেবিলখানি চৌকোণ ও পালিশ করা। ঐ টেবিলের পূর্বধারে পেছন-হেলান দেওয়া একটি বড় বেঞ্চ এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম পাশে কয়েকটি চেয়ার। সেই বেঞ্চখানিতে ১৭।১৮ বছরের একটি ছাত্র উপবিষ্ট রয়েছে। পড়া-শোনার জন্য সে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহায্যপ্রার্থী। সেই হল-ঘরে আরও দু'একজন বন্ধু উপস্থিত। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁদের সঙ্গে আলাপনরত।

এমন সময় মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে ঐ বৈঠকখানার দ্বারদেশে উপস্থিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন মাত্রই বিদ্যাসাগর সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হ'য়ে করযোড়ে তাঁর কাছে এগিয়ে আসেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ ঘরে প্রবেশ ক'রে সেই টেবিলটির পূর্বধারে পশ্চিমাস্য হ'য়ে দণ্ডায়মান থাকেন। তাঁর বাঁ হাতটি টেবিলের উপর এবং পেছনে সেই বেঞ্চখানি। ঐভাবে দণ্ডায়মান থেকে তিনি বিদ্যাসাগরকে পূর্বপরিচিতের ন্যায় একদৃষ্টে দর্শন ও ভাবাবস্থায় মৃদু মৃদু হাস্য ক'রতে থাকেন। ঐভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর ঠাকুর ভাবসংবরণের জন্য মৃদুস্বরে কয়েকবার—'জল খাবো', 'জল খাবো' বলেন এবং তারপর নিজে নিজে ঐ বেঞ্চটিতে উপবেশন করেন।

ঠাকুর জল চাইছেন জেনে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যস্ত হ'য়ে, তাঁর জন্য একজনকে পানীয় জল আনতে বলেন এবং মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন,—"কিছু খাবার আনলে ইনি খাবেন কি ?

উত্তরে মাষ্টার বলেন,—"আজ্ঞা, আছুন না।"

তখন ইনি তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে কিছু মিষ্টি আনেন এবং বলেন,—"এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সাহায্যপ্রার্থী ছাত্রটিকে লক্ষ্য ক'রে, ভাবাবস্থায় বলেন,—"মা ! এ-ছেলের বড় সংসারাসক্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার। এ অবিদ্যার ছেলে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় পানীয় জলের সঙ্গে ঐ মিষ্টি শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করেন। ঠাকুরের সঙ্গী ভবনাথ এবং হাজরাও প্রসাদ পান। মাষ্টারকে একজন ঐ মিষ্টি দিতে গেলে বিদ্যাসাগর সহাস্যে বলেন,—"ও ঘরের ছেলে। ওর জন্য আটকাচ্ছে না।"

সম্মুখে উপবিষ্ট ভক্ত ভবনাথকে দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে বলেন,—"এ ছেলেটি বেশ সৎ, আর অন্তঃসার ; যেমন ফল্গুনদী—উপরে বালি, একটু খুঁড়লেই ভিতরে জল দেখা যায়।"—কথামৃত, ৩য়।১।২।৫

[বিদ্যাসাগর ও ঠাকুরের আলাপন*]

মিষ্টি মুখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেখিতে দেখিতে একঘর লোক হইয়াছে। কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি। এইবার সাগর দেখছি।'

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান !'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'না গো। নোনা জল কেন ? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও ; তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র।'

"বিদ্যাসাগর—'তা বলতে পারেন বটে।'

"বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর কথা কহিতেছেন।"

"তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ। এতে দোষ নাই। শুকদেবাদি লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ঈশ্বরবিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান, অন্নদান করছো, এও ভাল। নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে নামের জন্য, পুণ্যের জন্য। তাদের কর্ম নিষ্কাম নয়। আর সিদ্ধ তো তুমি আছই।"

---

* এই উপশিরোনামার যাবতীয় উপকরণ 'কথামৃত' (৩য় ভাগ, ১ম খণ্ড) থেকে হুবহু উদ্ধৃত।

"বিদ্যাসাগর—'মহাশয়, কেমন করে ?'

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'আলু-পটল সিদ্ধ হ'লে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া !'

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—কলাইবাটা সিদ্ধ তো শক্তই হয় !' (সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'তুমি তা নও গো ; শুধু পণ্ডিতগুলো দরকচা পড়া ! না এদিক, না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত, শুনতেই পণ্ডিত ; কিন্তু তাদের কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মত পচা মড়া খুঁজছে ; আসক্তি অবিদ্যার সংসারে ; দয়া-ভক্তি-বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।'

"বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শুনিতেছেন। সকলেই একদৃষ্টে এই আনন্দময় পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান করিতেছেন।"

...

"বিদ্যা ও অবিদ্যার কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা কহিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'ব্রহ্মবিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।'

"এই জগতে বিদ্যামায়া, অবিদ্যামায়া—দুইই আছে। জ্ঞান-ভক্তি আছে, আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে। সৎও আছে, অসৎও আছে। ভালও আছে, আবার মন্দও আছে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ—জীবের পক্ষে ; সৎ ও অসৎ—জীবের পক্ষে। তাঁর (ব্রহ্মের) ওতে কিছু হয় না।

"যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল ক'রছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত।

"সূর্য শিষ্টের উপর আলো দিচ্ছে, আবার দুষ্টের উপরও দিচ্ছে।

"যদি বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি—এসকল তবে কি ? তার উত্তর এই যে, ও-সব জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়, সাপের কিন্তু কিছু হয় না।"

...

'ব্রহ্ম যে কি মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হ'য়ে গেছে। বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে। মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই ; সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

"বিদ্যাসাগর (বন্ধুদের প্রতি)—'বা। এটি তো বেশ কথা। আজ একটি নূতন কথা শিখলাম।"

...

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি)—'শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' রেখেছিলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন না হয়, ততক্ষণই বিচার।

ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে, তখন আর একবার ছ্যাক্ কল্ কল্ করে। যখন কাঁচা লুচিকে পাকা করে, তখন আবার চুপ হ'য়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার জন্য নেমে আসে, আবার কথা কয়।"

"যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে, ততক্ষণ ভন্ ভন্ করে। ফুলে ব'সে মধুপান ক'রতে আরম্ভ ক'রলে, চুপ হ'য়ে যায়। মধুপান করার পর মাতাল হ'য়ে আবার কখনও কখনও গুন্ গুন্ করে।"

"পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্ ভক্ শব্দ হয়। পূর্ণ হয়ে গেলে আর শব্দ হয় না।···তবে, আর এক কলসীতে যদি ঢালাঢালি হয়, তা হ'লে আবার শব্দ হয়।"

...

"ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হ'য়ে ব্রহ্ম দর্শন করেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ তিনিই হয়েছেন। সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি। 'নি'-তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। 'আমি' যায় না; তখন দেখে—তিনিই আমি, তিনিই জীব জগৎ সব।"

...

"দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কতরকম জিনিস—চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র। কতরকম জীব—বড়-ছোট, ভাল-মন্দ; কার বেশি শক্তি, কার কম শক্তি।"

"বিদ্যাসাগর—'তিনি কি কারুকে বেশি শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'বিভুরূপে সর্বভূতে আছেন। পিঁপড়েতে পর্যন্ত। কিন্তু শক্তি বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায়; আর তা না হলে, তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো? তোমার দয়া আছে, তোমার বিদ্যা আছে—অন্যের চেয়ে। তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে আসে। তুমি একথা মানো কি না?'

"বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন।"

...

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—'আচ্ছা, তোমার কি ভাব?'

"বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বলিতেছেন,—'আচ্ছা, সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।' (সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা বিচার করে জানা যায় না।'

...

"[তোমার] অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে। যদি একবার সন্ধান পাও, অল্প কাজ করে যাবে। গৃহস্থের বৌর ছেলে হলে ছেলেটিকে

নিয়ে থাকে। ঐটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না'। (সকলের হাস্য)।

"আরো এগিয়ে যাও। ··নিষ্কাম করতে পারলে ঈশ্বরে ভালবাসা হয়; ক্রমে তাঁর কৃপায় তাঁকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি।' (সকলে নিস্তব্ধ)।"

...

"শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)—'এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য। আপনি সব জানেন, তবে খপর [খবর] নাই।' (সকলের হাস্য)। 'ঈশ্বরের ভাণ্ডারে কত কি রত্ন আছে। ঈশ্বর রাজার খপর নাই।'

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—'তা আপনি বল্‌তে পারেন।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'হাঁগো। অনেক বাবু জানে না চাকর-বাকরের নাম।' (সকলের হাস্য)।—যা বাড়ির কোথায় কী দামী জিনিস আছে।"

(ক্রমশঃ)

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ও গুপ্ত মহারাজ (স্বামী সদানন্দ) যখন মাধুকরী করিতে যাইতেন তখন তাঁহাদের সহিত আর একজন নানকপন্থী হিন্দুস্থানী সাধুও মাঝে মাঝে মাধুকরী করিতে যাইতেন। তখন ছিল বর্ষাকাল। প্রতিদিনই প্রায় সকাল হইতে ক্রমাগত ঝড়বৃষ্টি হইত। একদিন সকাল হইতে বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া সেই নানকপন্থী সাধুটি তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি মাধুকরী করিয়া আসিতে হইবে, কারণ এই বৃষ্টিতে ভিক্ষা মিলিবে না, অতএব উপবাস করিয়া কাটাইতে হইবে। এই কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদ মনে মনে একটু হাসিয়া সাধুজীকে জানাইয়া দিয়াছিলেন, ঐদিন আর তাঁহারা ভিক্ষায় বাহির হইবেন না। অজগর বৃত্তি[১] অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কালীপ্রসাদ একান্ত মনের জোরের

১। 'অজগর-বৃত্তি'-র অর্থ—অত্যন্ত বর্ষা হইলে প্রায় সমস্ত সর্প আহার করিবার জন্য আর বাহির হইতে চায় না, গহ্বরে বা ভরেকদিনের জন্য গর্তেই অতিবাহিত করে। সাধুদের পক্ষেও তাহাই। বর্ষাকালে তাঁহারা মাঝে মাঝে নিজেদের কুপড়িতেই থাকিতেন আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া।

সহিতই বলিয়াছিলেন যে, ভগবানের কৃপা ও ইচ্ছা হইলে এখানে আসিয়াই কেহ ভিক্ষা দিয়া যাইবেন। এই কথা শুনিয়া গুপ্ত মহারাজ ও হিন্দুস্থানী সাধুটি অবাক হইয়া গেলেন এবং তাঁহারা হয়তো মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—এইরূপ মনের দৃঢ় বিশ্বাস আসিল কোথা হইতে। কালীপ্রসাদের কথা শুনিয়া নানকপন্থী সাধুটি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিজের গুহায় চলিয়া যাইলেন।

কালীপ্রসাদের জীবনে এইরূপ কত ছোট-বড় অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে এবং সেই সম্বন্ধে একটি গল্প এইখানে বলিতেছি। হিন্দুস্থানী সাধুকে ঐকথা বলিবার পর গুপ্ত মহারাজ ও কালীপ্রসাদ সেইদিন আর বাহিরে ভিক্ষায় বাহির হইলেন না, তাঁহারা দুইজনে সারাদিন গঙ্গার তীরে বসিয়া শাস্ত্রাদি বিচার ও জপ-ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন। সেইদিন শাস্ত্রপাঠ বলিতে কালীপ্রসাদ নিশ্চলদাস-রচিত 'বিচারসাগর' ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন এবং সদানন্দ মহারাজ তাহা শুনিতেছেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয় হয়। এমন সময়ে কোথা হইতে একজন ভদ্রলোক আসিয়া একটি ঝুড়ি করিয়া প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আনিয়া তাঁহাদিগকে দিলেন। কালীপ্রসাদ ঐ ভদ্রলোককে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। ঐ ভদ্রলোক ছিলেন চিরপরিচিত বরাহনগরনিবাসী মৈত্র মহাশয়। তিনি কিভাবে তাঁহাদের সন্ধান পাইলেন জানেন না, তবে জিজ্ঞাসা করিলে মৈত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন: "আমি এলাহাবাদে উপস্থিত হয়ে শুনলাম যে, কালী-তপস্বী নামে একজন তিতিক্ষাবান সাধু ঝুঁসিতে গঙ্গার ধারে বাস করেন ও তপস্যা করছেন। কালী-তপস্বী নাম শুনে বেশ আগ্রহান্বিত হলাম এবং এখানে এসে বুঝলাম কালী-তপস্বী আপনিই হবেন, অন্য কেউ নন। তার পর গুপ্ত মহারাজ যে আপনার সঙ্গেই আছেন তা জানতাম না। যাইহোক আপনাদের দেখার জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো এবং রিক্ত হস্তে সাধু-দর্শন নিষিদ্ধ বলে এই সামান্য-কিছু মিষ্টান্ন-দ্রব্য সঙ্গে এনেছি। অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে এখন অকস্মাৎ আপনাদের এখানে পেয়ে"।

মৈত্র মহাশয়কে লইয়া কালীপ্রসাদ ও গুপ্ত মহারাজ তাঁহাদের গুহায় গেলেন। তাঁহারা দুইজনে ঝুড়ি হইতে প্রচুর মিষ্টি বাহির করিয়া কিছুটা মিষ্টি নানকপন্থী সাধুকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে দিলেন। কালীপ্রসাদ ঐ সাধুকে তখন বলিয়াছিলেন: "সাধুজী, গীতার 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল"। কালীপ্রসাদের সেই কথা শুনিয়া সাধুটি একেবারে বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া স্বীকার করিয়াছিলেন কালীপ্রসাদের কথা। তারপর মৈত্র মহাশয় তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া সহর-অভিমুখে চলিয়া গেলেন। কালীপ্রসাদ ও গুপ্ত মহারাজ তখন আনন্দের সহিত ঐ সকল মিষ্টান্ন গ্রহণ করিলেন এবং বারে বারে শ্রীশ্রীঠাকুরের অপার করুণার কথা বলিতে লাগিলেন। তিনি পুনরায় বলিয়াছিলেন যে, শ্রীশ্রীঠাকুরকে গভীর বিশ্বাসের সহিত আত্মসমর্পণ করিলে তিনি ভক্তের সকল ভার গ্রহণ করেন। কালীপ্রসাদের করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভক্তি দেখিয়া গুপ্ত মহারাজও (স্বামী সদানন্দ) অত্যন্ত বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং পরম-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে মস্তক-নত করিয়া প্রণাম জানাইয়াছিলেন।

কালীপ্রসাদ আপনার সংকল্প-অনুযায়ী স্থির করিলেন যে, এলাহাবাদে আরও কয়েকদিন থাকিয়া পুনরায় কাশী যাইবেন। সুতরাং দুই একদিন পরে গুপ্ত মহারাজের নিকট বিদায় লইয়া পদব্রজে তিনি এলাহাবাদ হইতে কাশী যাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌঁছিয়া সোনারপুরায় বংশীদত্তের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। কালীপ্রসাদ উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন তখন ওখানে রহিয়াছেন শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) ও যতি মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ)। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কালীপ্রসাদ আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তাঁহারাও কালীপ্রসাদকে ঐভাবে দেখিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। কালীপ্রসাদ, শরৎ মহারাজ ও যতি বা দীনু মহারাজ তিনজনে তখন একসঙ্গে মিলিয়া মনের আনন্দে দিবারাত্রি ধ্যান-ভজনাদি করিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। মাধুকরী করিয়া আহারের পর একদিন তাঁহারা পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা করিলেন। একদিনের কথা। ঐ সময়ে একদিন কালীপ্রসাদের সহিত প্রমদাবাবুর বেশ তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল তাঁহাদের সন্ন্যাসজীবনের ব্রত ও আদর্শ লইয়া। কালীপ্রসাদ ছিলেন অতিশয় স্বাধীনচেতা ও স্পষ্টভাষী। কালীপ্রসাদ হাসিতে হাসিতে প্রমদাবাবুকে বলিলেন যে, তাঁহারা শ্রীশ্রীঠাকুরের নামে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সুতরাং কাহারও কথায় ও নিষেধে তাঁহারা কর্ণপাত না করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শই অনুসরণ করিয়া চলিবেন।

যাহাহউক কিছুদিন কাশীতে থাকার পর কালীপ্রসাদ বরাহনগর-মঠে ফিরিয়া যাইতে একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং শরৎ মহারাজ প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিয়া বরাহনগরে ফিরিয়া যাওয়ার দিন স্থির করিলেন। শরৎ মহারাজের নিকট জানিতে পারিলেন স্বামীজী (স্বামী বিবেকানন্দ) ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন এবং তাঁহার সঠিক সংবাদ কেহই জানেন না। কালীপ্রসাদের বরাহনগর-মঠে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প শুনিয়া শরৎ মহারাজ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, কেননা তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে কালীপ্রসাদ বহুদিন পূর্বে বরাহনগর মঠ হইতে বাহিরে রহিয়াছেন। যাহা হউক শরৎ মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কালীপ্রসাদ পদব্রজে কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সারাদিন পথ চলিতেন ও বৈকালের দিকে কোন গ্রামে গিয়া মাধুকরী করিয়া একবেলা আহার এবং গাছতলায় রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এইভাবে পথ চলিতে চলিতে বালিতে (বালি-উত্তরপাড়া) আসিয়া পৌঁছাইলেন। তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, টাকা-পয়সা স্পর্শ করিবেন না, সুতরাং সেই ব্রত যথার্থভাবে পালন করিয়া পরিশেষে বালি হইতে গঙ্গা পার হইয়া বরাহনগর-মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘটনা সামান্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানগণের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ঈশ্বরনিষ্ঠা অনুসরণ করার বস্তু।

●

॥ ভগবান বুদ্ধ ॥

ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

তাঁর আবির্ভাবের পর আড়াই হাজার বছরের বেশী সময় কেটে গেছে, কিন্তু জগৎ ও জীবনের দিকে চেয়ে দেখলে মনে হয় তিনি এখনও আমাদের অনাগত নায়ক। যে চরিতার্থতায় আমাদের মনুষ্যজীবনের পূর্ণতা, সে পূর্ণতায় তিনি চির-আরাধিত সুদূর নক্ষত্র। অথচ আমাদেরই মতো সুখদুঃখময় জীবনলীলায় অংশীদার হয়ে এই মর্ত্যভূমি তিনি স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর জন্ম, তাঁর সিদ্ধি, তাঁর মহাপরিনির্বাণ—সব একটি তিথিতে—বৈশাখী পূর্ণিমায়। এমন পরিপূর্ণ জীবনবোধের প্রতীকী রূপ ঐ পূর্ণিমা। আশ্চর্য যোগাযোগ, আরো আশ্চর্য এর সার্থকতা।

যুগে যুগে দেশে দেশে পরিত্রাতার আবির্ভাব ঘটে, মানুষ তাঁকে অবলম্বন করে অন্তহীন জীবন-মৃত্যুর পালা অতিক্রম করতে চায়। কিন্তু এই একটি মাত্র পরিত্রাতার কথা ইতিহাস বলেছে, যিনি কাউকে অবলম্বন করে উদ্ধার পেতে বলেন নি, যিনি স্বয়ং বুদ্ধ হয়ে বলেছেন, আমরা সবাই বুদ্ধ হতে পারি। মানুষের দর্শনের ইতিহাসে এই বুদ্ধত্ব বা নির্বাণের সাধনা জ্ঞানযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিখর। কিন্তু মহাবোধির এই তুঙ্গ শিখর থেকেই নেবে এলো সর্বজীবের প্রতি অপার করুণার প্রেমধর্ম। ফলে নিজে যিনি 'ঈশ্বর'কে সত্য-সাধনার কোনো প্রয়োজনীয় সর্ত মনে করেননি, করুণা ও প্রেম, শান্তি ও মৈত্রী, সত্য ও সুন্দরের ঘনীভূত রূপে তিনিই আজ অর্ধেক পৃথিবীর ঈশ্বর। এ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সত্য যে মানুষ, সেকথা ভারত থেকে সমগ্র পূর্ব-পৃথিবীর মন্দিরে মন্দিরে রূপদক্ষের শতসহস্র কল্পনায় বিকশিত বিগ্রহে বিগ্রহে রূপায়িত। মানুষের সত্য-সন্ধানকে সর্বস্বত্যাগের কাষায় বস্ত্রে রঞ্জিত করে তিনিই বিশ্বের ইতিহাসে সন্ন্যাসীসংঘের আদি গুরু। আবার মানুষের সমগ্র জীবন যে অন্যের জন্য উৎসর্গিত, প্রীতি ও সহযোগিতার মিলিত ছন্দে পূর্ণতার অভিমুখী হতে পারে—তাঁর জীবনেই সে সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

একদা দুঃখ থেকে পুত্রকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে চেয়েছিলেন রাজা শুদ্ধোদন। ভেবেছিলেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধূলার সিংহাসন থেকে আগলে রাখবেন ছেলেকে তাঁর সোনার সিংহাসনে, বহুতল রাজপ্রাসাদে। জীবনের আপাতরমণীয় সব মাধুর্যের আড়ালে একে একে বার্ধক্য, রোগ, মৃত্যু তাদের আপন স্বরূপ নিয়ে রাজকুমারের সামনে যখন দেখা দিল, তাদের সেই আবির্ভাবকে অন্য মনে ফিরিয়ে দিলেন না সিদ্ধার্থ। বরং সন্ন্যাসীর সৌম্যমুখমণ্ডলে দুঃখোত্তরণের ইঙ্গিত গ্রহণ করে পত্নী-পুত্র অনায়াসে ত্যাগ করে দীর্ঘ তপস্যার শেষে একদিন বৈশাখী পূর্ণিমার রাতেই জীবনের জটিলতম গ্রন্থি মোচন করে পরম সত্যে অধিষ্ঠিত হলেন। অবিদ্যার নিরোধ থেকে সংস্কারের নিরোধ, সংস্কারের নিরোধ থেকে বিজ্ঞানের নিরোধ, বিজ্ঞানের নিরোধ থেকে নামরূপের নিরোধ—এমনি করে ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জন্ম, জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক, দুঃখ হতাশা এই সবকিছুরই সম্পূর্ণ নিরোধ তাঁকে নির্বাণের মহাসত্যে

উপনীত করল। সে সত্যকে তিনি মানব-কল্যাণে প্রেমধারায় রূপান্তরিত করে দীর্ঘ আশি বছর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত তৃষিত তাপিত জনের উদ্দেশে তাঁর অমৃতবাণী বিতরণ করে গেলেন।

জীবনের নানাপ্রান্ত থেকে নানান্ ধরণের জিজ্ঞাসু একে একে সম্যক সম্বুদ্ধ গৌতমের চরণপ্রান্তে সমবেত হলেন। ধীরে ধীরে সঙ্ঘে যখন ষাটজন শ্রমণ যোগ দিলেন, এঁদের নিয়ে 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এই বুদ্ধধর্ম, যার আদি মধ্য ও অন্ত কল্যাণময়, যা কৈবল্যময়, পরিশুদ্ধ ও ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই ধর্মকে যোগ্যজনের কাছে প্রচারের নির্দেশ দিলেন। শান্তি ও মৈত্রীর যে বাণী দিকে দিকে সেদিন ছড়িয়ে পড়লো, তা মূলতঃ নির্বাণের উপলব্ধিজাত আচরণ। কিন্তু এই আধ্যাত্মিক জীবনসত্যের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের জীবনসত্যের গভীর যোগ—সেকথা বুদ্ধদেবের সারা জীবনের নানান কাহিনীতে আপনি অভিব্যক্ত। বাণবিদ্ধ মরালের প্রতি যে তরুণ রাজকুমারের সমবেদনা, রাজপ্রাসাদের নাপিত উপালির প্রতি শাক্যসিংহের যে শ্রদ্ধা, বারবধূ অম্বপালীর আমন্ত্রণ গ্রহণে তাঁর যে মর্মদৃষ্টি, পুত্র রাহুলকে উপসম্পদাদানে তাঁর যে চিত্তবৈভব, কর্মকার চুন্দ—যাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিদারুণ ব্যাধিতে তাঁর দেহাবসান, সেই চুন্দের প্রতি তাঁর যে অন্তিম আশীর্বাদ—এ সব কাহিনীতেই মহাজ্ঞান ও মহাপ্রেম এমনি যুগ্মছন্দে প্রকাশিত।

মানবকল্যাণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের এই অপরূপ সমন্বয়ের জন্যই স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। বুদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মান্দোলনই তাঁর দৃষ্টিতে ভারতে সর্বপ্রথম সমাজবিপ্লবের সূচনা। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতিশাসিত ভারতবর্ষে তিনি যেভাবে সর্ববর্ণের কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দ্বার মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তা আজও আমাদের অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁর আরব্ধ সমাজবিপ্লব সমগ্র জাতির দেহে সঞ্চারিত হলে আজ ভারত পৃথিবীর অন্যতম অগ্রগামী দেশে পরিণত হতো।

বৌদ্ধসাধনায় চিত্তের একাগ্রতাসাধনের একটি উপায় ব্রহ্মবিহার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বুদ্ধপ্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখায় এই ব্রহ্মবিহারের আদর্শের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। তাঁর অনুবাদে—ব্রহ্মবিহারের মৈত্রীভাবনার আদর্শ—"যে কোনো প্রাণী আছে, কী সবল, কী দুর্বল, কী দীর্ঘ, কী প্রকাণ্ড, কী মধ্যম, কী হ্রস্ব, কী সূক্ষ্ম, কী স্থূল, কী দৃষ্ট, কী অদৃষ্ট, যারা দূরে বাস করছে বা নিকটে, যারা জন্মেছে বা জন্মাবে, অবশেষে সকলেই সুখী-আত্মা হোক।

"ঊর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

"যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চলছ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকাকে ব্রহ্মবিহার বলে।"

এ আদর্শকে যদি কেউ এ যুগের ভাষায় বিশ্বপ্রেম বলেন, তবে বলবো, আজ অবধি এমন বিশ্বময় ভালোবাসা আর ক'জনের জীবনে দেখা দিয়েছে? যাঁর মধ্যে যতোটা দেখা দিয়েছে তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রজীবনদর্শন স্বাভাবিকভাবেই মহাকারুণিক বুদ্ধের এই সর্বজীবে প্রীতির মধ্যেই মানুষের ধর্মকে খুঁজে পেয়েছে। যে বিচারমূলক জ্ঞানযোগ পক্ষপীল ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কঠোর নীতিবাদের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, তাকে পূর্ণচন্দ্রের মতো বিমল করুণায় বিশ্বময় বিভাসিত করে বুদ্ধ ভারতের সব শ্রেণীর মানুষের সবচেয়ে আপনজন হয়ে উঠেছেন। হৃদয়ে নির্বাণের পরমাশান্তি, জীবনে ও বচনে মৈত্রীর করুণানির্ঝর, বিশ্বচরাচরের উদ্দেশে এমন প্রেমতন্ময়হৃদয় মহামানব আমাদের অতীতের চিরগৌরব, বর্তমানের জীবন-অমৃত, ভবিষ্যতের ধ্রুবতারা।*

●

॥ পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(দুই)

পঞ্চদশী প্রকৃতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে,—মায়া ও অবিদ্যা।

তমোরজঃ-সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥ ১।১৫-১৬

যে শক্তিদ্বারা কোন বস্তুকে আমরা যথাযথ জ্ঞাত হতে পারি, তা'কে বলে সত্ত্বগুণ। এই সত্ত্বগুণ যখন রজঃ (সক্রিয়তা), তমঃ (অজ্ঞানতা) দ্বারা অভিভূত না হয়,—বরং আমাদের রজঃ-তমঃ অপেক্ষা সত্ত্বই প্রবল হয়, তখনই কেবল প্রকৃতিকে মায়া বলা হয়। আর, যখন রজঃ-তমঃ দ্বারা অভিভূতাবস্থায় থাকে, তখন প্রকৃতিকে অবিদ্যা বলা হয়। সত্ত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রতিফলনক্ষম শুদ্ধ বস্তু হিসাবে। দর্পণ যেমন কোনবিছুর রশ্মিকে প্রতিফলন দ্বারা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, সত্ত্বও তেমনি ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ধারণে সক্ষম এবং ঐ রশ্মিকে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতাও তার আছে।

এই মায়া-সমন্বিত ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব—যা' তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁকেই আমরা বলি ঈশ্বর, কিংবা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালক, সংহারক। যে দেবতাকে বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন নামে আরাধনা করে, যাঁর কাছে সকলে প্রার্থনা করে,—সেই দেবতা আর বেদান্তের ঈশ্বর এক। তিনি সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ ও সর্বে কৃপাময়।

অবিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিফলনই হচ্ছে জীব অর্থাৎ মানুষের মধ্যে গর্ভস্থ ব্রহ্ম। এই জীব তার আবিলতাপূর্ণ সত্ত্বের জন্য আংশিক জ্ঞানসম্পন্ন আর এই আংশিক জ্ঞানের সাহায্যেই সে পূর্ণজ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করে চলেছে। এজন্যই বেদান্তে জীবকে বলা হয়েছে প্রজ্ঞা অর্থাৎ আংশিক জ্ঞানী আর ঈশ্বর হচ্ছেন পূর্ণজ্ঞানী। এই জীব যখন

* ১৯৫৯ সালে বুদ্ধপূর্ণিমা-উপলক্ষে রচিত।

তার কারণ-শরীর অর্থাৎ কার্য-কারণ-সম্বন্ধযুক্ত দেহ হিসাবে অবিদ্যাকে গ্রহণ করে, তখন ঐ জীব 'প্রজ্ঞা' নামে পরিচিত হয়ে থাকে। পঞ্চদশীর শিক্ষা অনুসারে আমরা জানি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তিনটি কায়া আছে। তাদের নাম—(১) স্থূল-শরীর, (২) সূক্ষ্ম-শরীর এবং (৩) কারণ-শরীর। তৃতীয় শরীরটি অন্য দুই শরীরের কারণস্বরূপ; অন্যভাবে বলা চলে, উক্ত তৃতীয় শরীরের মধ্যেই রয়েছে স্থূল-শরীর ও সূক্ষ্ম- শরীরের আদি কারণ।

মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্তস্তত্ত্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

জীব ও তার সূক্ষ্ম-শরীরকে একসঙ্গে বলা হয় তৈজসঃ—"প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেনতৈজসত্বং প্রতিপদ্যতে।" এবং "সাকারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥" সূক্ষ্ম-শরীরে রয়েছে আন্তরীণ যন্ত্র অন্তঃকরণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়—বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, আর রয়েছে পঞ্চ প্রাণ। প্রাণ হচ্ছে জীবনধারী শক্তি বা আমাদের ভিতরকার মূল অপরিহার্য শক্তি। যদিও প্রাণ একটি, তবু সে পাঁচটি বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করে বলে তার ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি নাম আছে। যখন সে উপরের অংশে কাজ করে তখন তার নাম প্রাণ আর যা' নিম্নাংশ পরিচালনা করে তা' হচ্ছে অপান। যখন সে পরিপাক-ক্রিয়া সম্পাদন করে তখন সে সমান, আর যখন সে ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য খাদ্যনালি হ'তে পাকস্থলিতে নামিয়ে আনার কাজ করে তখন সে উদান। আবার, যখন সে দেহের নালিকাগুলির মধ্যে কাজ করে তখন সে ব্যান।

জীব যখন তার স্থূল দেহে একাকার থাকে তখন তাকে বলা হয় বিশ্ব। যে সকল যন্ত্র-মাধ্যমে ঐ ইন্দ্রিয় ও প্রাণসমূহ এই ভৌত জগতে কর্ম সম্পাদন করে, সে সকল যন্ত্র এই স্থূল দেহের মধ্যেই রয়েছে।

দৈহিক যন্ত্রগুলি যেমন বিনষ্ট হয়, এই স্থূল দেহেরও তেমনি নাশ হয়। তা' হলেও কিন্তু জীব, অর্থাৎ ভিতরকার মানুষটি কখনও মরে না কিংবা সে তার শক্তি, সংস্কার, ভাব হারায় না। জীব তখন স্বর্গে, নরকে বা অন্য কোন গ্রহে চলে যায়। সে বিভিন্ন দেহ ধারণ করে, আর যেখানেই সে যায়, সে তার সূক্ষ্ম দেহটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই সূক্ষ্ম দেহটাই হচ্ছে তার স্থূল দেহের বীজ। পঞ্চদশীর মতে এ সকল বিভাগ, বিভেদ, ত্রুটি-বিচ্যুতি সবই আত্মায় আরোপিত হয়। ঐগুলি মায়ার মতই মিথ্যা। তাদের কোন স্বাধীন পদমর্যাদা নেই। তারা অপরিবর্তনীয়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। যখন কোন রক্তবর্ণ পদার্থকে একটি স্ফটিকের কাছে এনে রাখা হয়, তখন স্ফটিকটি আপাত-রক্তিমাভ হয়ে উঠলেও সেটির নিজস্ব শ্বেতভাব বা স্বচ্ছতার কোন বিকার ঘটে না,—এ জিনিসটিও ঠিক সে রকম। পরিবর্তনশীলের ধর্মগুলি প্রায়শঃ অপরিবর্তনীয়ের উপর আরোপিত হয়। এ পদ্ধতিকে বলা হয় অধ্যাস। অবিদ্যাই এই অধ্যাসের কারণ। অবিদ্যার বশীভূত, ত্রিগুণের পাশবদ্ধ জীব নিজেকেই কর্তা ভোক্তা বলে মনে করে। যতদিন এই কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব জীবের মধ্যে থাকে, ততদিন তাকে কর্ম করতে ও সেই কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। দেহের

মৃত্যু হলেও কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব জীবের মধ্যে থাকে। এই দুই ভাব হ'তে বিবিধ বাসনার জন্ম হয়; আর যতদিন এসব বাসনা থাকে, ততদিন জীব নূতন নূতন দেহ সৃষ্টি করে। এজন্যই পঞ্চদশীতে আছে, "যখন কেউ অহংভাবের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে,—সঙ্গে সঙ্গে কামনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তখন তার সে-অবস্থাকে বলা যেতে পারে শোকাপনোদন। আর, এ অবস্থা থেকে যে সুখ-সম্ভোষ পাওয়া যায়, তাকে বলা যেতে পারে তৃপ্তি ও হর্ষ।

সংস্কৃতে আকাঙ্ক্ষাকে বলা হয় বাসনা। কর্মের ও ভোগের জন্য বাসনাগুলিই আমাদের জন্ম-পুনর্জন্মের কারণ। আমাদের মধ্যে যদি এসকল বাসনা থাকে তবেই আমাদের বারংবার জন্ম হয়। এসকল বাসনাই আমাদের ভালমন্দ যাবতীয় কর্মের কারণ বলে জীব তার বপন-করা বীজের গাছ থেকে ফসল না তুলে পারে না। সুতরাং সে তার ভালমন্দ কৃতকর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। আর, এভাবেই কর্মশৃঙ্খলে আবদ্ধ জীব তার কৃতকর্মের সুফল-কুফল হিসাবে সুখ-দুঃখ ভোগের জন্য এক দেহ হতে অন্য দেহে ঘুরে বেড়ায়।

এই জন্ম-পুনর্জন্মের ধারা কি কখনও শেষ হয় না? কর্মের অবশ্যম্ভাবী বিধির হাত হ'তে কি আমাদের পরিত্রাণ নেই? পঞ্চদশীর লেখক নিজেই এ প্রশ্নগুলি তুলেছেন:

নদ্যাং কীটা ইবাবর্তাদাবর্তান্তরমাততে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্বৃতিম্।
সৎ কর্ম পরিপাকাৎ তে করুণা নিধিনোদ্ধৃতা।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রামন্তি যথাসুখম্।

একটি ক্ষুদ্র কীট নদীর স্রোতে পড়ে গিয়ে এক আবর্ত থেকে অন্য আবর্তে ভেসে যায়; বিশ্রামের কোন স্থান সে খুঁজে পায় না। প্রতিটি মানুষের আত্মাও তেমনি জন্ম-জন্মান্তর শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছে,—বিশ্রাম বা সুখের সন্ধান সে পায় না। কিন্তু যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি স্রোতে ভাসমান ঐ কীটের দুর্দশা দেখে তাকে তীরস্থ কোন গাছের ছায়ায় স্থান দেয়, তা'হলে কীটটি চিরপ্রবহমান জলস্রোতের হাত থেকে রক্ষা পায়। ঠিক তেমনি, তত্ত্বদর্শী কোন মানুষ যদি জীবকে মুক্তি বা স্বাধীনতার পথ দেখিয়ে দেন, তবেই সে জন্মমৃত্যুর নিরবচ্ছিন্ন পুনরাবৃত্তির হাত হ'তে উদ্ধার পেতে পারে। তত্ত্বদর্শী কোন মানুষের উপদেশ পালন করে জীব প্রবঞ্চনাপূর্ণ এই জগতের যন্ত্রণা ও দুশ্চিন্তার হাত হ'তে মুক্তি পেতে পারে।

তারপর আসে আধ্যাত্মিক সাধনার কথা। উচ্চতম দার্শনিক ধারণাই ধর্মের ভিত্তি গঠন করেছে,—এমনটি কিন্তু একমাত্র ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। বেদান্তধর্ম কেবলমাত্র তত্ত্বমূলকই নয়, ব্যবহারিকও বটে। নিজের মধ্যে পরমাত্মার অনুভূতিই বেদান্তধর্ম। এ ধর্ম হচ্ছে শাশ্বত অস্তিত্বের সঙ্গে একাত্ম ও অভিন্ন হওয়ার ধর্ম।

(ক্রমশঃ)

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(দুই)

বিদেশী শিক্ষা ও সংস্কৃতি শৈশব থেকেই আমাদের ইনফেক্‌শন দিয়ে চলেছে। Family is the 1st unit of civilization—এ-তত্ত্ব নাকি আমরা ইওরোপের কাছ থেকে প্রথম শুনেছি। এবং এই মিথ্যা কথা আমাদের ভাবড় ভাবড় পণ্ডিতেরাও হজম করে নিয়েছেন। অথচ বাস্তবে কিন্তু ভারত-সভ্যতাই একান্তভাবে পরিবার-কেন্দ্রিক। পৃথিবীতে আর কোনো সভ্যতার নাম করা যাবে না যারা গার্হস্থ্যকে 'আশ্রম' বলে ঘোষণা করতে পেরেছে। একটি পুরুষ ও একটি নারীর যুগ্ম-জীবনকে কেন্দ্র করে মূলতঃ গড়ে ওঠে পরিবার। কিন্তু আমাদের সমাজে আমাদের কাছে—সেই পরিবার চিরকাল আশ্রমের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। কারণ আমরা জানতাম—প্রবৃত্তির উচ্ছেদ (annihilation) সম্ভব নয়—উদ্গতি (sublimation)-ই যথার্থ বেঁচে থাকার পথ। তাই বিবাহ আমাদের সমাজে একটি বিশেষ পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান। আধুনিক জীববিজ্ঞানের শেষতম গবেষণায়ও এই সত্যই প্রতিষ্ঠিত। জীবনকে মেনে নিয়েই জীবনকে ছাড়িয়ে যেতে হবে। উপনিষদোক্ত পঞ্চকোষের সমাহার এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই জীবন রচনা করতে হবে। পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে এই জীবন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষে উত্তীর্ণ হওয়াই ভারতের জীবন সাধনা। কারণ ইউরোপের মত তুমি-আমিকে নিয়ে আমাদের সংসার-সমাজ নয়। তুমি-আমির মুগ্ধ গোধূলি-বৃত্তে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনচর্চা আবদ্ধ নয়। কারণ আমাদের মন্ত্র: "ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন,—ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে। ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত— ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না ; নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই .. ।" আমাদের প্রার্থনা—'পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব'। এবং নব্য ভারতের তরুণ রূপকার তার সঙ্গে আরো যোগ করলেন বললেন, বলো মূর্খদেবো ভব, দরিদ্রদেবো ভব, চণ্ডালদেবো ভব। আমাদের কবিকণ্ঠেও ঐ একই সত্য অন্য ভাষায় বিঘোষিত: "স্বার্থমগ্ন যে জন / বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে / সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে"। এইভাবে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে—কিছুটা স্বার্থ ও লোভ ত্যাগ করে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে—মানুষের মত বেঁচে থাকার শিক্ষাই ভারতের চিরন্তন জীবনসাধনা। বিশ্বমানবের সকলের কল্যাণকামনা (সবের সুবিধা হোক), সকলের কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে এই বিশ্বসংসারে সবকিছু চেয়ে দেখা—জানা বোঝা—সকলের নিরাময় ও সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে কর্মযোগের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ রজোগুণ থেকে সাত্ত্বিকতায় সত্ত্বোত্তীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশ্বযোগে যুক্ত হওয়াই ভারতের চিরন্তন আকূতি ও মর্মবাণী। আমরা সমাজতন্ত্রবাদ শিখতে যাব কার কাছে? আমাদের সমগ্র দেশ, রাষ্ট্র,

সমাজ—সবই যে একটি মহান সমাজতন্ত্রবোধের অখণ্ড অধিবাসনায় নিষিক্ত। আমাদের প্রতিটি পরিবারই যে মহৎ মঙ্গলবোধে উদ্দীপ্ত এক একটি বলিষ্ঠ কমিউন।—এইসব শুভ সুন্দর জীবন-সুসমাচারই স্বামীজী নতুন করে, নতুন যুগের উপযোগী করে, নতুনতর কর্মপন্থায় বিধৃত করে উচ্চারণ করে গেলেন এবং আমাদের জন্য রেখে গেলেন সার্বজনীন সুধার সন্ধান। কিন্তু আমরা তা শুনেও শুনিনি। বুঝেও বুঝিনি।

সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূল ভিত্তিভূমিই যেখানে সহমর্মিতা, ঐক্যবোধ ও সামাজিক সমন্বয় এবং বিশ্বপ্রেম ও সার্বিক কল্যাণ, সেখানে একালের আমরা ভারতবাসীরা সমাজতন্ত্রের পাঠ গ্রহণ করতে ছুটে চলেছি ইউরোপের দরবারে। কোন্ ইউরোপ?—স্বামীজীর ভাষায় যে ইউরোপ পশুশক্তির জোরে, শুধুমাত্র কামানবন্দুকের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করে নিজেদের লোভলালসা চরিতার্থ করতে, নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে, এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন দেশে; নষ্ট করে দিয়েছে কত সভ্যতার ইতিহাস; গ্রাস করেছে, লুঠ করে নিয়েছে হাজার দেশের অর্থ-সম্পদ। অথচ নিজের গৃহ-প্রাঙ্গণে যাদের প্রীতি-ভালোবাসার চিহ্নটি পর্যন্ত নেই। সন্তান যেখানে বৃদ্ধ বাপমাকে একটুকরো রুটি দিতে চায় না, নিজেদের ঘরে থাকতে দিতে পরাঙ্মুখ—বাপমাকে যেখানে paying guest হয়ে থাকতে হয় নিজেদের সন্তানের গৃহে; পরিবার বা পারিবারিক শান্তি বা শুচিতার আদর্শ বলে যেখানে কিছু নেই; পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে গড়ে ওঠে না কোনো সামাজিক সখ্য বা প্রীতি বা স্নেহের সম্পর্ক; কী পুরুষ কী নারী—মনোমত জীবন-সঙ্গী নির্বাচন করতে যাদের কেটে যায় সারাটা জীবন, একটি ছোট্ট পরিবারের মধ্যে যারা সংহতি আনতে ব্যর্থ হয়েছে—তাদের কাছে সমাজতন্ত্র বা সমাজ-সংহতির পথ গ্রহণ করতে যাবার হাস্যকর প্রয়াস এদেশেই সম্ভব। একটা পরিবারকে যারা প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে পারে না, সমগ্র একটি দেশকে, জাতিকে, রাষ্ট্রকে বিশ্বমানবকে তারা সংহতি দেবে কিসের সাহায্যে? কী আছে তাদের? বিচ্ছিন্নতাবাদের কলুষ অন্ধকারে গ্রাস করে আছে যাদের সমগ্র সমাজকে, সমস্ত সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ককে; তারা নিজেরাই তো দেউলিয়া। অথচ রাজনীতির পাঠ গ্রহণ করতে আমরা হাত পেতেছি গিয়ে তাদের কাছেই। প্রেম ও প্রীতিই মানব সমাজের সমস্ত সংহতির মৌল প্রেরণা। তাই যেখানে নেই—সেখানে তাদের কাছে যাব কী আহরণ করতে? কারিগরী যন্ত্রবিদ্যার পেট হয়তো ভরে, কিন্তু হৃদয় ভরে না। এবং হৃদয়হীন মানুষ তো যন্ত্র মাত্র। এবং দুঃখের ও পরিতাপের কথা ভারতবর্ষের মানুষ হয়ে আজ আমরা অন্ধ যান্ত্রিকতার উপাসনায় মত্ত হয়েছি।—জীবনকে খুঁজছি বস্তুপুঞ্জের সঞ্চয়ের মধ্যে স্বর্গ ও শান্তির অন্ধ উন্মাদ আহরণের প্রয়াসে।

ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে যে রাজনীতিকে আমরা সর্বার্থসাধক দাওয়াই বলে ভেবে নিয়েছি একমাত্র মুখ্‌কিল আসান, তার যথার্থ স্বরূপটি কী—স্বামীজীর ভাষায় এখানে তা উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। "ও তোমার 'পার্লামেন্ট' দেখলুম, সেনেট দেখলুম, হোট অ্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান্ পুরুষরা যেদিকে

ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।…অবশ্য ভোট-ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের যে একটা শিক্ষা হয়, সেটা আমরা পাই না। কিন্তু রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা ভাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে নেই। (কিন্তু সত্যি নেই কি? অন্ততঃ একালে?) সে ঘুষের ঘুম, সে দিনে-ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি তেত্রিশের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে। 'সো-রুপ গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠি বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি, কসবিন পহনে খাসা'। যাদের হাতে টাকা, তারা রাজ্যশাসন নিজেদের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে শুষছে, তারপর সেপাই ক'রে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে, জিতে হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে। আর প্রজাগুলো তো সেইখানেই মারা গেল; হা রাম! চমকে যেও না, ভাঁওতায় ভুলো না।"—ইউরোপীয় রাজনীতির যে চেহারা স্বামীজী তুলে ধরেছেন,—ন্যাল হোক আর নীলই হোক,—আজো তার কোনো পরিবর্তন ঘটেছে বলে মনে হয় না। অথচ ওদের রাজনীতির আপাতরম্য বাইরের চাকচিক্য ও ভাঁওতায় আমরা কত সহজেই ভুলেছি এবং আত্মবিস্মৃত হয়েছি। তা নাহলে রাজনীতি আমাদের এমনভাবে গ্রাস করতে পারত না।—আর যে ইংরেজরাজত্ব সম্পর্কে আজো আমাদের মোহ ঘুচলো না—তাদের সম্পর্কে স্বামীজীর মন্তব্য আরো তীব্র ও তীক্ষ্ণ: "ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রান্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।" "ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রান্ডির বোতল—আর কিছু নয়।…ইংরেজের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এদেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে…।" এছাড়াও নানা পত্র-পত্রিকায় ভারতে ইংরেজ শাসনের নির্লজ্জ বীভৎস রূপটি বার বার স্বামীজী তুলে ধরেছেন দেশের লোকের চোখের সামনে। স্বামীজীর রচনাবলীই তার সাক্ষ্য বহন করছে।

রাজনীতি নয়, আসলে যে ধর্ম সমস্ত বিচ্ছেদ বিভেদ ভুলিয়ে যথার্থই এক অখণ্ড ঐক্যের বন্ধনে বেঁধে দিতে পারে তার নাম মানবধর্ম—প্রেমধর্ম। খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্নের মধ্যে ঐক্য আনয়নের ঐ একই পথ। সেই পথ প্রেমের পথ। ভালোবাসার পথ। ভারতবর্ষের শাশ্বত পথ। স্বামীজীর ভাষায় কর্মে পরিণত বেদান্তের পথ। দলের স্বার্থে বা রাজনীতির মুনাফা লাভের প্রয়োজনে ইউরোপের ভিত্তিহীন ঐক্যের অনুসন্ধান নয়। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে এক অখণ্ড অক্ষয় অমল 'অস্তিত্ব' আবিষ্কারের মধ্যেই রয়েছে বিশ্বমানবের যথার্থ ঐক্যবন্ধনের চাবিকাঠি। এরই নাম ভারতীয় দর্শনের সর্বাত্মবাদ বা অখণ্ড বিশ্বৈক্যবোধ। এই প্রেমের মন্ত্র-সুসমাচারই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের তথা ভারতাত্মার চিরন্তন

দিগ্‌দর্শন। মনীষী ম্যাক্সমূলার থেকে রোমাঁ রোলাঁ এবং একালের বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক টয়েনবি এবং উইল ডুরাণ্ট পর্যন্ত সকলেই বিশ্বশান্তি এবং বিশ্বৈক্যসাধনার প্রয়োজনে এই ভারত-পন্থারই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। ভারতের পথই মুক্তির পথ। বিশ্বজীবন-রচনার মহত্তম পথ। বেঁচে থাকার পথ।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! আমাদের সেই পরানুকরণ ও পরানুবৃত্তির হীন দাসসুলভ পথই রয়ে গেছে। স্বদেশ ও স্ব-সংস্কৃতি পরিপূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছি আমরা। মাইকেলের ভাষায় বলতে হয়—"তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি, / পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ / পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। / কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি। / অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায়, মনঃ, / মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি ;—/—এই অবরণ্যে বরণ করার বিফল তপস্যায় সমগ্র জাতি আজো নিমজ্জিত হয়ে আছে আত্মবিস্মৃতির নিদারুণ অন্ধকারে। সাহেব-পণ্ডিতেরা আমাদের বুঝিয়েছেন জাতীয়তাবাদ নাকি আমাদের ছিল না, ছিল না কোনো সর্বভারতীয় অখণ্ড চেতনা। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেই নাকি আমরা সর্বপ্রথম দীক্ষালাভ করেছি জাতীয়তার চৈতন্যবোধে। যবন-পণ্ডিতদের সঙ্গে তাঁদের গুরু-মারা চেলারাও সমস্বরে আমাদের শেখালেন, "হাঁা, হাঁা তাইতো।" আমরাও মেনে নিলাম বিনা প্রতিবাদে। অথচ এরচেয়ে ঘোর মিথ্যা আর হতে পারে না। অবশ্য একথা ঠিক তাদের মত পরধনলোলুপ, লুণ্ঠনধর্মী আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ আমাদের নেই। অন্ততঃ ছিল না কোনোদিন এ ভূখণ্ডের মানুষের মানবিক চেতনার শেষতম অন্তরালেও। খুনের রাজনীতি, পররাজ্য লুণ্ঠনের, অন্যকে আক্রমণের জাতীয়তাবাদ আমাদের নয়। লাঠির জোরে পশুশক্তির প্রবলতায় মদমত্ত হয়ে সহজ সমাধানের পথ আমরা কোনোদিন গ্রহণ করিনি জীবনের কোনো ক্ষেত্রে। মানুষ হিসাবে লজ্জা অনুভব করেছি আমরা আরণ্যক পশুদের সহযাত্রী হয়ে জীবন-সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে নিতে। পাশ্চাত্য সমাজের মত তরবারির দাপট নয়, যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষ জীবনের পথ-পরিক্রমা করেছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পদ্মপ্রদীপটিকে বুকে ধরে। ভারতীয় সমাজকে, তার রাষ্ট্রকে পথ-নির্দেশ দিয়েছেন বিদ্বজ্জনেরাই, জ্ঞানী সর্বত্যাগী তপস্বীরা, মহান রাজর্ষি-বৃন্দ ; উদ্ধত সেনানায়কেরা নন, স্বৈরাচারী বলদর্পী সম্রাট বা রাজারা নন।

কিন্তু জাতীয়তাবাদ মানে যদি হয় একত্ববোধের সুশৃঙ্খলা, সৌভ্রাত্র্য-বন্ধন ও মানবিক সংহতি—তাহলে তার অভাব ছিল না কোনোদিন এই ভূখণ্ডে। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবাসীর পূজা-অর্চনা ও যে কোনো ধর্মকর্মের প্রথমেই যে দুটি শ্লোক উচ্চারণ করতে হয়, তার সঙ্গে অল্পবিস্তর হয়তো সকলেরই পরিচয় আছে : "ওঁ গঙ্গে চ যমুনেচৈব গোদাবরী সরস্বতী। নর্মদে সিন্ধু কাবেরী জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু।" কিংবা "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণী চ। তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তীহ।" এই মন্ত্রগুচ্ছে উল্লিখিত নদী ও তীর্থগুলির ভৌগোলিক অবস্থান শুধু স্মরণ করুন। তাহলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে ভারতবর্ষের অখণ্ড সামগ্রিক চিত্রটি কী গভীর প্রত্যয়ে মুদ্রিত ছিল প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তরে, তার বোধে—তার চেতনলোকের অনন্ত গভীরে। শুধু তাই নয়, আচার্য শঙ্কর তাঁর মাত্র বত্রিশ বছরের

জীবনকালে ভারতবর্ষের চার প্রান্তে চারটি শঙ্কর মঠ স্থাপন করে ভারতবাসীর সামগ্রিক অখণ্ড ভারতবোধের ধারণাটিকেই প্রধান করে গেছেন। রামায়ণ-মহাভারত আজ আর আমাদের সিলেবাসে নেই বলে পড়তে হয় না, এবং পড়ার প্রয়োজনও মনে করি না। আমাদের তথাকথিত আঁতেল উচ্চশিক্ষিতেরাও সন্ধান রাখেন না। অন্তথায় দেখা যেত মহাভারতের মহাপ্রস্থান পর্বে এবং রামায়ণের, বিশেষ করে উত্তর খণ্ডে, সমগ্র ভারতবর্ষের মোহন চিত্রটি কী মনোরম মাধুর্যে ও গভীর মমতায় বিচিত্র হয়ে আছে। এছাড়াও রয়েছে নানা পুরাণ এবং সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ; যা পড়লেই বোঝা যায় যে সামগ্রিক একটি দেশ হিসাবে, পাদদেশে সমুদ্র এবং নগাধিরাজ হিমালয়শীর্ষে শোভিত ভারতবর্ষের পরিকল্পনা কত প্রাচীন। অথচ নয়া শিক্ষার দৌলতে এসবের কিছুই আমরা জানি না। খোঁজ রাখি না।

আমাদের বিদেশী শিক্ষার এই হল নমুনা। অথচ যাদের অনুকরণ করে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করেছি আমাদের দেশে—সেই ইংরেজের দেশে কিন্তু এখনো school learning certificate পেতে হলে বাইবেলখানা আদ্যোপান্ত না পড়ে গত্যন্তর নেই। এছাড়া রয়েছে আলাদাভাবে Divinity Course এর নানা পরীক্ষা। পাদ্রী-সাহেব হতে হলে এইসব ধর্মীয় পরীক্ষায় অবশ্যই কৃতকার্য হতে হবে। কিন্তু আশ্চর্য এই দেশ। এখানে রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবৎ-উপনিষদ বেদ-পুরাণ প্রভৃতি কিছু না পড়েই অনায়াসে বি.এ., এম.এ., পি.আর.এস., পি.এইচ.ডি., ডি.লিট. সব হওয়া যায়। ধর্মশাস্ত্র হাতে নিয়ে ধর্মানুশাসনের গুরুগিরি করা যায়। ব্যক্তিগত জীবনের একটি অভিজ্ঞতার করুণ কাহিনী এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করলে পাঠকবর্গ আমাকে মার্জনা করবেন। আজ থেকে ত্রিশ বছর আগের ঘটনা। তখন কেবল লিখতে শুরু করেছি। বঙ্গ-বিশ্রুত একজন স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক এবং নামী সম্পাদক আমাকে ভগিনী বলে সম্বোধন করে চিঠি দিয়েছিলেন। আমার অপরাধ—আমার নামটি হঠাৎ আপাতদৃষ্টিতে আকারান্ত শব্দ বলে ভ্রম হয়। নাম বললেই সকলে চিনতে পারবেন। তাই তাঁর সেই পণ্ডিত-সম্পাদকের নাম উল্লেখ করব না। তাছাড়া তিনি আজ অন্তলোকে। অথচ আমরা কিন্তু 'প্রমিথিউস বাউণ্ড', 'আনবাউণ্ড' দুইই ভাষ্যসমেত পড়ে ফেলি। ব্যাখ্যা করি। কিন্তু পূর্বের প্রমিথিউস নচিকেতা সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। জানতে চেষ্টাও করি না। জানি না মৃত্যুর দেবতাকে জয় করে কী করে তিনি মর্ত্যের জন্য চয়ন করে নিয়ে এলেন সার্বজন্য সুধার প্রতীক—মৃতসঞ্জীবনী যজ্ঞাগ্নি-রচনার দিব্য ইঙ্গিত। অথচ এইসব মহামহিমান্বিত পণ্ডিত-আঁতেলদের হাতেই দেশের ভবিষ্যৎ শিল্প-সাহিত্য রচনার মহান দায়দায়িত্ব। সংস্কৃতির রথরজ্জু। এবং এঁদের মধ্যে অনেকে আবার যুক্ত রয়েছেন নামী-দামী সব পত্র-পত্রিকার সঙ্গে। এবং সেখান থেকে জাতির উদ্দেশ্যে নানা বিষয়ে বাণীও বিতরণ করে যাচ্ছেন। অথচ নিজেরাই তাঁরা জানেন না কী তাঁরা বলছেন কী বাণী বিতরণ করে চলেছেন।

এম.এ., পি.আর.এস., পি.এইচ. ডি., ডিগ্রী-ভূষিত বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন মহান অধ্যাপক আমার সদ্য প্রকাশিত কোনো রচনায় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের একটি উদ্ধৃতি দেখে—"শ্বেতাশ্বেতর" বলে ভুধরে দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। মনে মনে বলেছিলাম যেকলে-

প্রবর্তিত শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের সমগ্র জাতিকে 'অশ্বেতর' জাতিতে পরিণত করতে প্রয়াসী হলেও—'শ্বেতাশ্বতর' এখনো 'শ্বেতাশ্বতর'ই রয়ে গেছে। বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব এবং পরধর্ম-গ্রহণ আমাদের কী সর্বনাশের অতল তলে নিক্ষেপ করেছে সেটা বোঝাবার জন্যই এসব ব্যক্তিগত কথা আমাকে নিবেদন করতে হল আপনাদের কাছে। এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। মনে রাখতে হবে সমূহ এই সর্বনাশের তীব্র সর্বাত্মক প্রাথমিক আক্রমণের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন স্বামীজী। এবং সেই আক্রমণের আঘাত এখন সর্বাত্মক সংক্রামিত হয়ে দেখা দিয়েছে জাতির সর্বাঙ্গে—মনে। এবং আমরা তার বিরুদ্ধে সৈনিকের শ্লাঘ্য ভূমিকা পরিত্যাগ করে এখন আশ্রয় নিয়েছি সর্ববিষয়ে সর্বাত্মক আত্মসমর্পণের অন্ধকার শিবিরে শিবিরে। (ক্রমশঃ)

●

।। পঁচিশে বৈশাখ ।।

—শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

চিরনূতনেরে দিতে ডাক
ফিরে এলে চিরন্তন
হে আনন্দ পঁচিশে বৈশাখ,
নিদাঘের উত্তপ্তশ্বাসে
শ্যামারণ্যে ফোটে ফুল,
বিহঙ্গের গীতরবে
কণ্ঠ সমাকুল
সে আজি অন্তরে মিলাক।

এক প্রান্তে দিনান্তের দিনে
বসে-থাকা গৃহকোণে
প্রতীক্ষায় আলোড়িত মন,
প্রতিটি প্রহর যায়
প্রতি পলে কাটে ক্ষণ
নিভৃতে নীরব রত
চিত্তে পাতি কাহার আসন।

আজি হবে এ মর্ত্যাবাসরে
বিভাবের পূর্ণ মন্ত্র
ঋত্বিকের পূতকণ্ঠরবে,
কাব্যরূপ সুষমার
সুললিত কবিতায়
দিব্য ভাবে নবোদ্গীত
পুণ্য সমাহার
বিশ্বকবি বন্দনা গৌরবে।

এ কালের কাল-কলরবে
বৃথা এই আয়োজন
স্বার্থদ্বন্দ্ব নিত্য যেথা চলে
স্তব্ধ যাঁর শুকরব,
অসত্যের গ্লানিভার
সত্যেরে হানিছে নিত্য
হীন অনাচার,
সাম্য মৈত্রী মিথ্যা শুধু বলে।

বৈশাখের রুক্ষশ্বাস তন্দ্রা
ঝঞ্ঝা পরে সুবর্ষণ
হয় যদি এ ধরার পরে—
হে যুগার্ষি কবি তবে
এস পুনঃ এস আজ
লজ্জার জঞ্জাল নাশি'
প্রাণ মহোৎসবে,
শুভলগ্নে মানব অন্তরে।

●

॥ কেশব কালী মেনেছিলো ॥

স্বামী প্রভানন্দ

'যথার্থ মহাত্মা' শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম সমর্থ-প্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র। কেশবচন্দ্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে, উপাসনার আসরে, বৈঠকী গল্পে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার করতে শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবাদ করেন, 'কেন ছাপালে ?' কেশব অকপটে স্বীকার করেন তাঁর প্রচারের উদ্দেশ্য।

যে কালে যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রচলিত ধর্মবোধকে নিরাশ্রয় করতে সমুদ্যত সেকালে "বেদান্ত-বিগ্রহ ধর্মমূর্তি" শ্রীরামকৃষ্ণ একটি পরম বিস্ময়। গুণগ্রাহী কেশবচন্দ্র তাঁকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইতিহাস তাঁর আবির্ভাবকে 'কেনোমেনন' বলে চিহ্নিত করেছে।

সে সময়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম-আন্দোলনের গগনে মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত দেদীপ্যমান। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বেলঘরিয়ার সাধক-কাননে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। এই সাক্ষাৎ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

এদিনটির কিছু পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে দেখতে পান ভাবচক্ষে—একঘর লোকের সামনে কেশবচন্দ্র যেন একটি সুদৃশ্য ময়ূর, পাখা বিস্তার করে শোভা পাচ্ছেন। কেশবের মাথায় লালমণি—রজোগুণের চিহ্ন। কেশব তাঁর অনুগামীদের বলেন, "ইনি কি বলছেন তোমরা শোন"। শ্রীরামকৃষ্ণ সব দেখে শুনে মা জগদম্বাকে বলেন,—"মা, এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কেন ?" জগন্মাতা বুঝিয়ে দেন, "কলিতে এরকমই হবে"। শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝেন, জগন্মাতার আদেশে তাঁকেই কেশবচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীদের লোকশিক্ষা দিতে হবে।

সাধারণ ভূমিতে মন সন্দেহপ্রবণ ও বিচারশীল। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে পরিদর্শক হয়ে নারাণ শাস্ত্রী কেশবচন্দ্রকে দেখতে যান। ফিরে এসে রিপোর্ট দেন, কেশব সেন জপে সিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হন।

আরও আগেকার কথা। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ : মথুরানাথ বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায়। দেখেছিলেন ব্রহ্মসভা যেন ব্রাহ্ম শোভা। অবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে, আচার্যের আসনে সমাসীন ভক্তিমান আচার্য কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "তাকের উপর কজন বসেছে, কেশব মাঝখানে বসেছে। দেখলাম যেন কাঠবৎ। সেজোবাবুকে বললাম, দেখ ওর কাতনায় মাছ খেয়েছে। ঐ ধ্যানটুকু ছিল বলেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় যেগুলো মনে করেছিল হয়ে গেল।" [কথামৃত ২।১৯।২]

এগারো বছর পরে প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়ের দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর ও ভাবমধু-মাখানো শ্যামাগানে কেশবচন্দ্র ও তাঁর সহকর্মী সাধকদের মোহিত করেছিলেন। ভাবতন্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন,

"কে জানে কালী কেমন
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥

* * * *

প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু হরণ।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বোঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন।"

তাঁর অমৃতবর্ষী মধুকণ্ঠের সঙ্গীত শ্রোতাদের আনন্দের শিহরণ তোলে। ভাব গভীরতর হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ অর্দ্ধবাহ্যদশা হতে অন্তর্দশায় প্রবেশ করেন। ভাব সমাধিতে প্রদীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মনোহর এক ভাবদ্যুতি ছড়িয়ে দেন চতুর্দিকে। স্পন্দহীন তনু, দৃষ্টি স্থির, প্রফুল্লবদন, প্রেমাশ্রুবিগলিত রক্তাভ নয়ন—এই মূর্তি ব্রাহ্মপ্রচারকদের বিস্মিত করে। কিছুক্ষণের মধ্যে উপস্থিত অনেকের ধারণা হয় "রামকৃষ্ণ একজন স্বর্গীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন।" ভাগিনের হৃদয় ওঁকারধ্বনি করেন। তাঁর অনুরোধে উপস্থিত সকলে ওঁকারধ্বনি করেন। এর ফলশ্রুতি, "পরমহংসের চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্রুর উচ্ছ্বাস হইল।"[১] এদিকে প্রথম সাক্ষাতের ফলেই শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে "আত্মায় আত্মায় গূঢ় যোগ হয়।" INDIAN MIRROR পত্রিকা ২৮শে মার্চ সংখ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণসাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঘোষণা করেন "were charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit." শ্রীরামকৃষ্ণকে যাচাই করার জন্য কেশবচন্দ্র পাঠান তিনজন পর্যবেক্ষক। কিন্তু এসব ব্যক্তির বিচারবুদ্ধির গণ্ডী অতিক্রম করে দুজনেই পরস্পরের প্রতি অনুরাগী ও অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েন। উভয়ের মিলনে "ঈশ্বর-প্রসঙ্গের মত্ততা ও ভাবে চলাঢলি ও গলাগলি" হত। প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ঈশ্বরকে যে ভক্ত যেরূপ দেখে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই, তাঁকে কোনরকমে যদি একবার লাভ করতে পারা যায়, তাহলে তিনি সব বুঝিয়ে দেন···যে দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আরো তিনি কত কি আছেন, মুখে বলা যায় না।"

কেশবচন্দ্র সর্বজনস্বীকৃত ব্রাহ্ম নেতা—জগৎ জুড়ে তাঁর নাম। যদিও রাজা রামমোহনের লেখাতে তিনি স্মার্তধৃত জামদগ্নিবচনের উদ্ধৃতি পাঠ করেছিলেন,

দ্বিতীয়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা। এবং

যদিও রামকমল সেনের নাতি কেশবচন্দ্র শৈশবেই কৃষ্ণনাম লাভ করেছিলেন, তাঁর হিন্দু কলেজের শিক্ষাদীক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মানুশীলন তাঁকে করে তুলেছিল মূর্তিপূজাবিরোধী। তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শুনেছিলেন দৃপ্ত ঘোষণা, "আমরা যেমন পৌত্তলিকতার বিরোধী, তেমনি অদ্বৈতবাদের বিরোধী"। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা পৌরাণিক ধর্ম বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্মের উপর ছিলেন খড়্গ হস্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণের-সংস্পর্শে এসব ব্রাহ্মনেতাদের মধ্যে ভাবের পরিবর্তন দেখা গেল। "রামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথে পৌরাণিক শাস্ত্র ও ভক্তিবাদ অস্বীকৃত ও বিকৃত হইলেও ব্রাহ্ম সংস্কার যুগের শেষাশেষি ব্রাহ্মধর্মে পৌরাণিক দেবদেবীবাদ, অবতারবাদ, ভক্তিবাদ ও লীলাবাদ এমনকি আদেশবাদ পর্যন্ত প্রথমতঃ খ্রীষ্টীয় পুরাণ বাইবেল, দ্বিতীয়তঃ হিন্দুর

১ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ঃ আচার্য কেশবচন্দ্র, সপ্তবার্ষিকী সংস্করণ। পৃঃ ১০৫০

পুরাণাদি, তৃতীয়তঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত কেশবাদি ব্রাহ্মপ্রচারকদের সাক্ষাৎ ও মিলনের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। ইহা ইতিহাস"[২] কেশবচন্দ্র মুগ্ধবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিত্বে সুপরিস্ফুট ভাবটি :

"ভবে সেই সে পরমানন্দ,
কালী ছাড়া নাম না শুনে কানে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে
যা করেন কালী সেই সে জানে ॥

তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্ব বাক্‌প্রধান ব্রাহ্মনেতাদের মনে গভীর নাড়া দেয়। কীর্তনে নৃত্যে শ্রীরামকৃষ্ণ আপনি মেতেছেন, সে সঙ্গে মাতিয়েছেন সকলকে। প্রেমে মাতোয়ারা তাঁর নাচ দেখে লোকে ভাবে শ্রীগৌরাঙ্গ কি আবার প্রকট হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবের রাজা। সব নদী গিয়ে মেলে সাগরে, তেমনি সব ভাব ঘুরে ফিরে মিলিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সাগরে। রসিকপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুখেই বলেন, "এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে—বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী," শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবাদি ভক্তদের বুঝিয়ে বলেন, কালী নানাভাবে লীলা করছেন। "কালী কি কালো ? দূরে তাই কালো। জানতে পারলে আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীলবর্ণ। কাছে গিয়ে দেখো কোন রং নাই…"। শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেন। ভাবের রসে মন ডুবে যায়,

—শ্যামা মা কি আমার কালো রে
কালোরূপে দিগম্বরী হৃদপদ্ম করে আলোরে ॥

কমলাকান্ত এভাব ভাবিয়ে সহজে পাগল হয়েছিলেন, ইদানীং গায়কও সকলের মধ্যে ভাবের আলোড়ন তুললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের মনে গেঁথে দেন, "ভববন্ধনের বন্ধনহারিণী তারিণী মা"। ভাবটি দৃঢ় করার জন্যই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে রামপ্রসাদী গান গাইলেন,

শ্যামা মা উড়াচ্ছ ঘুড়ি (ভব সংসার বাজার মাঝে)
(ঐযে) আশা বায়ু ভরে উড়ে, বাঁধা তাহে মায়া দড়ি ॥

জগন্মাতা লীলাময়ী, ইচ্ছাময়ী, আনন্দময়ী। জগৎ-সংসার নিয়ে তাঁর খেলা, লীলাবিলাস। লক্ষের মধ্যে এক একজনকে তিনি মুক্তি দেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সহানুভূতি। মমতামেদুর স্বরে বলেন, "তিনি মনকে আঁখি ঠেরে ইসারা করে বলে দিয়েছেন, 'যা এখন সংসার করগে যা'। মনের কি দোষ ?…"

মায়ের কাছে যেন অভিমান ভরে শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেছেন,

"আমি ঐ খেদে খেদ করি
তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি

• • • •

২। গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : স্বামী বিবেকানন্দ ও বাঙলার উনবিংশ শতাব্দী, ১৩৭৪, পৃঃ ১৮

প্রসাদ বলে মন দিয়েছ, মনেরে আঁখি ঠারি।
(ওহা) তোমার সৃষ্টি দুষ্টি পোড়া মিষ্টি বলে ঘুরি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মভক্তদের ভরসা দিয়ে বলেন, "সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছো এতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে হবে না। এক হাতে কর্ম করো, আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কর্ম শেষ হলে দুহাতে ঈশ্বরকে ধরবে।···মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধ, মনেতেই মুক্ত। মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপঘরের কাপড়···।"

(ক্রমশঃ)

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(পনেরো)

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য ॥

সংস্কৃতকাব্যের রীতি ও প্রকৃতি সঙ্গীতের জন্য নির্বাচিত কাব্যের ও সাহিত্যের রীতি ও প্রকৃতি থেকে কিছুটা পৃথক এবং অলঙ্কারশাস্ত্রে রীতিসম্বন্ধে আলোচনার সময়ে সে'সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোকপাত করার চেষ্টা করবো, কেননা মুনি ভরত নাট্যশাস্ত্রে রীতির আলোচনায় প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ করেছেন অনুরূপ নাট্য বা নাট্যসাহিত্যের বেলায়। পণ্ডিত রাজশেখর নাটকে প্রবৃত্তি ও রীতির মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের কথা আলোচনা করেছেন, তবুও নাটকের মতো সাহিত্যেও রীতির প্রয়োজনীয়তা আছে। সেজন্য রীতিসম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা সাহিত্য ও সাহিত্যের প্রকৃতি ও গুণ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করবো। তাছাড়া রাজশেখর সাহিত্য ও কাব্য-শব্দদুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন এবং সাহিত্য-আলোচনার ক্ষেত্রে কাব্য-শব্দের প্রয়োগ কত বেশী প্রাচীন সেকথাও তিনি আলোচনা করে দেখিয়েছেন।

সাধারণত ইংরাজীতে যাকে আমরা লিটারেচার (Literature) বলি; সংস্কৃতে ও অন্যান্য ভাষায় তাকেই সাহিত্য বলে মনে করি। প্রকৃতপক্ষে 'সাহিত্য' সহিতত্বের (=together বা associate) অর্থ প্রকাশ করে। তবে একথা ঠিক যে, দুটি বস্তুর সহমিলনই সহিতত্বরূপ সাহিত্যের ভাব প্রকাশ করে। ডক্টর কে. কৃষ্ণমূর্তি 'সাহিত্য কি ?'—এই নিবন্ধের আলোচনায় স্পষ্টই বলেছেন : " 'Sâhitya' is an abstract which denotes either the fact of 'togetherness' or the conscious activity involved in placing two things in relation." তিনি পুনরায় বলেছেন : "This abstract noun formed by adding the affix 'Syaṅ' in Pāṇinian terminology is coguate with

the other form with 'ngis' added in the same sense i.e. 'sābiti'. The word *sahitt* means a man of letters in popular usage today. But the Sanskrit original can denote nothing more than the abstract concept of *sahitya*".

অধ্যাপক এ্যাবরক্রোম্বি (Prof. Lascelles Abercrombie) *Principles of Library Criticism* (London, 1935)-গ্রন্থে সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মের উদ্দেশ্য-সম্পর্কে বলেছেন : 'The literary artist has built up in his symbolic medium, gradually and deliberately, the organic unity of his work'. তাঁর বক্তব্য এই যে, যখনই কোন সাহিত্যিক তাঁর সাহিত্যকর্মে ব্যাপৃত থাকেন তখনই তিনি নিজেকে যুক্ত করেন তাঁর নির্দিষ্ট মনোবৃত্তির বা চিন্তাসংস্কারের ধারাবাহিকতার সঙ্গে—যে চিন্তাধারা একটির সঙ্গে অপরটি সম্পৃক্ত ও তারা পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে অখণ্ড একটি চিন্তাধারার রূপ (form) সৃষ্টি করে এবং সেই অখণ্ড চিন্তাধারাই পরিশেষে পাঠককে দেয় সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের সম্পূর্ণ ধারণা ও চেতনা। একেই বলা যেতে পারে সাহিত্যের বা কাব্যের নির্দিষ্ট একটি পূর্ণরূপের উপস্থাপন বা পরিচয় 'of the *form* of the work as a completed whole'. অবশ্য আমরা ভাষার মাধ্যমেই সেই পূর্ণ প্রেরণা ও ধারণাকে চিন্তার পরিণতিরূপে পাঠকের কাছে (অন্তরে) উপস্থাপন করি এবং এই উপস্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয় সংস্কার বা ইম্প্রেসনের আকারে।

পূর্বে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি যে, 'সাহিত্য'-শব্দ সঙ্গীতের সঙ্গেই প্রায় ব্যবহৃত হ'ত—'সঙ্গীত-সাহিত্য-কলা-বিহীনঃ' প্রভৃতি। আসলে রসিক কবিই সাহিত্যরস সাহিত্যশিল্পে উপভোগ করার অধিকারী। কাব্য নিজেই একটি শিল্প, কেননা কাব্যকে আমরা বিশেষভাবে 'কলা' বা Art বলেই জানি এবং সে'দিক থেকে কবির চিন্তিত ও সৃষ্ট কাব্যকলা 'সাহিত্যবিদ্যা' নামেও পরিচিত। আলঙ্কারিক ও সাহিত্যবিদ্ রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে সাহিত্যকে 'বিদ্যা' বা 'সাহিত্যবিদ্যা' বলেই উল্লেখ করেছেন। প্রচলিত প্রবাদ যে, মহাবিদ্যারূপিণী বাগ্দেবী সরস্বতী যখন একটি পুত্রসন্তান কামনা করলেন তখন একদিন তিনি একটি কাব্যপুরুষ সৃষ্টি করলেন হিমালয়ের উচ্চ শিখরে এবং যিনিই এই 'কাব্যপুরুষ'-রূপ পুত্রসন্তানকে বর বা ভালবাসবেন তিনিই শুক্রাচার্য বা বাগ্মিকী নামে পরিচিত হন। এটি নিছক গল্প বা আখ্যান হলেও এই আখ্যানের পিছনে মর্মার্থ এই যে, কাব্যপুরুষের অনুরাগী কাব্যশিল্পেরই অধিকারী হন। কাব্যপুরুষ অর্থে কাব্যশিল্প বা কাব্যবিদ্যা। 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে পণ্ডিত রাজশেখর বলেছেন : "আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিশ্চেতি চতস্রো বিদ্যা। পঞ্চমী সাহিত্য-বিদ্যা। সা হি চতসাণামপি বিদ্যানাম্ নিষ্যন্দঃ" (কাব্যমালা, বরোদা সংস্করণ, ১৯০৪, পৃঃ ৪)। মুকুলভট্ট, ক্ষেমেন্দ্র, ভিল্লণ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ প্রভৃতি পণ্ডিতরা বিভিন্নভাবে 'সাহিত্য'-শব্দের পরিচয় দিয়েছেন এবং সেইসব উদাহরণ থেকে আমরা 'সাহিত্য' ও 'সাহিত্যী'-শব্দের সার্থকতা কিছুটা অনুমান করতে পারি।

আলঙ্কারিক ভামহ বলেছেন: "শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্", অর্থাৎ 'সাহিত্য'-শব্দ বিশেষভাবে সৌন্দর্যগত সমন্বয়সাধনের একটি সম্বন্ধ বা সম্পর্কমাত্র এবং ঐ সম্পর্ক সাধিত হয় শব্দের সঙ্গে অর্থের। শব্দ ও অর্থের মধ্যে নিবিড়সম্পর্ক কাব্যেরই একটি রহস্যময় ইঙ্গিত বা চিহ্ন। এই শব্দ ও অর্থ আকাশচারী যুক্তবিহঙ্গ—যে বিহঙ্গ সঞ্চরণশীল হয় শব্দ ও অর্থ এ' দু'টি ডানার উপর নির্ভর ক'রে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই উদাহরণই ব্যবহার করেছেন সুর ও কথার বা সঙ্গীত ও সাহিত্যের (পাঠ্যের) যুগ্মরূপের বেলায়। পণ্ডিত ভামহের মতো আলঙ্কারিক ও সাহিত্যবিদ্ কুন্তক এবং ধ্বন্যালোককার ধ্বনিবাদ প্রবর্তক এই মতবাদ পোষণ করেন—যদিও কবি কালিদাস, বাণ ও শ্রীহর্ষের উদাহরণে ও ভাষায় সেই রহস্য আরো পরিস্ফুট। কবি কালিদাস বলেছেন—

'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ॥

বাক্ ও অর্থ শিব-শক্তির মতো যুগল বা মিথুন-রূপ এবং আলঙ্কারিক কুন্তক এ রহস্যটিকে সাহিত্যরসে আরো সিক্তিত করেছেন।

তবে আলঙ্কারিক ভামহই বলতে গেলে প্রথমে সাহিত্যকে কাব্য ও অলঙ্কারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছিলেন, কিন্তু একথাও সত্য যে, ধাররাজ ভোজ ও রাজশেখর 'সাহিত্য'-শব্দের সার্থকতাকে আরও সমুন্নত করেছেন 'সন্নিত্ব' বা 'তুলারূপত্ব'-রূপে গুণের সাহচর্য বা সংস্পর্শ দিয়ে। ধাররাজ ভোজ 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-গ্রন্থে 'সাহিত্য'-শব্দের অর্থকে আরও সঙ্কল করেছেন। তাছাড়া 'সাহিত্যমীমাংসা'-গ্রন্থকার সাহিত্যকে বিশেষভাবে 'কাব্য'-পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন: "বরং তু শব্দার্থয়োর্মিলনমাত্রমুক্ত বরং সাহিত্যং তৎ শাস্ত্রাখ্যানয়োঃ সাধারণং অস্তু বং পরিকারবৈশিষ্ট্যম্ তৎ কাব্যমিতি মন্তামহে"। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আলঙ্কারিক কুন্তককেই বলা যায় 'সাহিত্য'-'শব্দ' ও সাহিত্যের ধারণাকে তিনি বিশেষভাবে প্রকাশিত করেছেন কবিসমাজে। তিনি সাহিত্যকে প্রতিভা ও ঔচিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত ক'রে সাহিত্যের ধারণা ও সার্থকতাকে আরও সমুন্নত করেছেন বলা যায়। 'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থ আলোচনার সময়ে আমরা পূর্বে এ'সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছি। তাছাড়া কুন্তক বলেছেন: 'শব্দার্থৌ সহিতৌ বক্রকবিব্যাপারশালিনি, বন্ধে ব্যবস্থিতৌ কাব্যং তদ্বিদাহ্লাদকারিণী"। এখানে কাব্য ও সাহিত্য সমগোত্রীয়—যে কাব্য ও সাহিত্য আনন্দরস বিতরণ করে কবিকে ও সাহিত্যসেবীকে। এজন্য কুন্তক গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলেছেন: "সাহিত্যার্থসুধাসিন্ধোঃ সারমুন্মীলয়াম্যহম্",—'আমি সাহিত্যের অর্থরূপ সুধাসাগর থেকে সার সংগ্রহ ক'রে সর্বসাধারণকে বিতরণ করলাম'। এজন্য ধ্বন্যালোকের ভাষ্যকার সমুদ্রবন্ধ কেবলই অলঙ্কার ও গুণকে গ্রহণ করেন নি, গ্রহণ করেছেন আনন্দবর্ধনের রস এবং ধ্বনিকে। কুন্তকের বক্রোক্তিকে ও ভট্টনায়কের ভোজকত্বরূপ গুণ সাহিত্যের অর্থকে সার্থক করার জন্যই সৃষ্ট ও আলোচিত।

আসলে সাহিত্য একটি সুকুমার শিল্প—যা অলঙ্কার, গুণ, রস প্রভৃতি উপাদান ও গুণকে বিশেষভাবে প্রকাশিত করে। 'ন্যায়মঞ্জরী'-কার পণ্ডিত জয়ন্তভট্ট এই সাহিত্যকে তাই শীতল ও সুস্বাদু পানীয় বলে বর্ণনা করেছেন: "যথাপানক- সর্করা-নাগকেসর-মরিচাদিভ্যোঽর্থান্তরম

এব যথা চ সিন্দূর-হরিতাল-লক্ষসাদিভ্যোঽর্থান্তরম্ এব চিত্রম্। যথা ষড়্জ-ঋষভ-গান্ধার-ধৈবতাদিভ্যোঽর্থান্তরম্ এব গ্রামরাগঃ, তথা পদেভ্যো বাক্যম্—পদার্থেভ্যো বাক্যার্থঃ"।

সুতরাং সাহিত্যকে প্রথমে আমরা কাব্য বা কাব্যশিল্প-নামে অভিহিত করতে পারি। 'সাহিত্যদর্পন', 'সাহিত্যমীমাংসা', 'সাহিত্যসঞ্জিবনী' প্রভৃতি গ্রন্থেও 'সাহিত্য'-শব্দের সার্থকতা বিশেষভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সাহিত্য সঙ্গীতের সহকারী বা আশ্রিত এবং রসের প্রকাশ ও সঙ্গীতশিল্পের অভিপ্রায়কে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।

সাহিত্য ও সঙ্গীত সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপাদান বা অঙ্গবিশেষ এবং যে দেশে ও যে জাতিতে এ'দুটি উপাদানের অনুশীলন তিমিত সেই দেশকে ও সেই জাতিকে ঠিক সুসভ্য ও সংস্কৃতিসম্পন্ন বলা যায় না। বিশেষ ক'রে সঙ্গীতের আলোচনার ক্ষেত্রে সঙ্গীতের আশ্রিতরূপে সাহিত্যের স্থান মহান সঙ্গীতের যথার্থ-অভিপ্রায় ও অর্থকে বোঝার ও জানার জন্য। ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য সত্যই বলেছেন : 'ভারতবর্ষের প্রাচীনতম রচনা ঋগ্বেদ ভাবের এবং ভাষার অপূর্ব সমন্বয়-হিসাবে সাহিত্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এই গঙ্গোত্রী হইতে উৎসারিত কবিমানস আদিকবি বাল্মীকির অমরকাব্য রামায়ণে হরিদ্বারের গঙ্গারূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। রামায়ণোত্তর সাহিত্য জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আদিকবির কাব্যরসে অভিষিক্ত এবং অনুপ্রাণিত। যুগে যুগে অনন্ত শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত হইলেও সংস্কৃতসাহিত্যের ঘৃতাক্তিবাহী প্রবাহ নব-নব রূপে প্রকাশ পাইতেছে'। সেজন্য বলি—কি সংস্কৃত, কি বাংলা ও অন্যান্য ভাষার সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার অবিচ্ছিন্ন ধারক ও বাহকরূপে সহৃদয়-হৃদয়-মাত্রেই পরমবস্তু ও আদরের সামগ্রী। বিচিত্র বিষয়ের সাহিত্য বিভিন্ন যুগে রচিত হয়েছে এবং রচিত হয়েছে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় ও ছন্দে সঙ্গীতের সাহিত্য বিচিত্র রস, ভাব ও অভিব্যক্তির সার্থকতা নিয়ে। খ্রীষ্টীয় ৯ম-১০ম শতকের সন্ধিক্ষণে মহারাষ্ট্রের সুপ্রসিদ্ধ যাযাবরীয় ব্রাহ্মণবংশজাত পণ্ডিত রাজশেখর তাঁর 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে সাহিত্যের রূপ, প্রকৃতি ও অভিপ্রায়-সম্বন্ধে সুদীর্ঘ ও সুবিস্তারিত বিচার করেছেন। সেরূপ করেছেন পণ্ডিত হেমচন্দ্র 'কাব্যানুশাসন-বিবেক' ও বাগভট্ট তাঁর 'কাব্যানুশাসন ও বৃত্তি'-গ্রন্থে কাব্য ও সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা। তাছাড়া 'শৃঙ্গারপ্রকাশ', 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ', 'ভাবপ্রকাশন' প্রভৃতি গ্রন্থেও সাহিত্যের সুষ্ঠু আলোচনা করা হয়েছে। এরপর আমরা সাহিত্য-সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করবো কাব্যবিদ্ রাজশেখর-রচিত 'কাব্যমীমাংসা'-কে অনুসরণ ক'রে।

●

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক' ।।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(চার)

এ কথা সত্য যে-উপাদানে সীতারামের চরিত্র গঠিত ছিল, গঙ্গারাম যত সৎ মহৎই থাকুন না কেন, সেই উপাদানে তাহার চরিত্র গঠিত ছিল না। উভয়ের চরিত্রের মৌলিক বিষয়েই পার্থক্য ছিল। সীতারামের চরিত্রের উপর বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা মহিমা আরোপ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু শ্রীর সঙ্গে ব্যবহারে তাহা তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন তাহা বলিতে পারা যায় না।

শ্রীকে বিবাহ করিয়া পিতার বাক্যে তিনি তাহাকে আর কোন সন্ধান করেন নাই, পিতার মৃত্যুর পর নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার পরও তাহার দায়িত্ব পালন করিতে তিনি অগ্রসর হন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি, এই দিক দিয়া সীতারামের চরিত্র 'দেবী চৌধুরাণী'র ব্রজেশ্বরের চরিত্র হইতেও হীন মনে হইবে। সীতারাম নন্দা ও রমার সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবিয়াছিলেন, পরিপূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য লইয়া শ্রী যখন সীতারামের সম্মুখে বহুদিন পর আবির্ভূত হইল, তখন শ্রীর দিকে তাকাইয়া তিনি তাহার সৌন্দর্য দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন,—'শ্রী, তুমি এত সুন্দরী।' বহুদিন পর তাহার প্রথম দর্শনে শ্রীর সৌন্দর্যই তাহাকে প্রথম আকর্ষণ করিল—শ্রীর দৈহিক সৌন্দর্যের পথেই সীতারামের সঙ্গে তাহার নূতন পরিচয় স্থাপিত হইল। সুতরাং ইহাকেও ভালোবাসা বলা যায় না। ইহাকেও মানব-মনের 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি' বলিতে হয়। তারপর শ্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদের মধ্য দিয়াও তাহার চিত্তশুদ্ধি হইল না। দীর্ঘদিন পর সন্ন্যাসিনী-রূপিনী শ্রী যখন তাহার সম্মুখে আবার ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার প্রতি তাহার প্রলোভন তেমনি সক্রিয় ছিল। তাহার সন্ন্যাসিনী রূপের মধ্যেও সীতারাম তাহার শ্রীকে খুঁজিয়া পাইলেন, তাহাকে তিনি ভোগের অধিকারের মধ্যে লাভ করিতে চাহিলেন, এমন কি, তাহাকে 'চিত্ত বিশ্রামে' লইয়া গিয়া বাস করিতে দিলেন এবং প্রতিদিন তাহার সাহচর্যে সময় কাটাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারিনী শ্রী তাহার করায়ত্ত হইতেছে না দেখিয়া তিনি তাহার উপর 'বলপ্রয়োগ' করিবেন বলিয়াই স্থির করিলেন।

বলাই বাহুল্য, ইহার মধ্যেও ভালবাসা নাই। যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার উপর 'বলপ্রয়োগে'র কথা কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং ইহাও মানুষের 'সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট চিত্তবৃত্তি'। গঙ্গারামের সঙ্গে সীতারামের এখানে কোনও পার্থক্য নাই। সীতারামের চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র যে গুণই আরোপ করুন না কেন, এখানে সীতারাম গঙ্গারামের মতই পশুর স্তরে নামিয়া আসিয়াছেন। মানুষের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম'-উপন্যাসে পশুকেই খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। সেই পশু যে কত দুর্জয় অন্যায় শক্তি লাভ করিয়া মানুষের সকল খ্যাতি, সকল প্রতিষ্ঠাকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া তাহার মনুষ্যত্বের সকল গৌরব কাড়িয়া লয়, তাহাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'সীতারামে'র মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন। ইহা দেখাইতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের

কোথাও কোনও দুর্বলতাকে গোপন করেন নাই, প্রত্যক্ষ জীবন-সত্য অনুসরণ করিয়াই তিনি এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ইহাতে চরিত্রগুলির যে ক্রম-পরিবর্তন নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে কোথাও মানব-বিজ্ঞান কিংবা মনোবিজ্ঞানকে উপেক্ষা করা হয় নাই। ধর্মের কিংবা তত্ত্বের কথা আসিয়া ইহাতে কোথাও সত্যকে বাধা দেয় নাই। সীতারাম ও গঙ্গারামের জীবনের মধ্যে চিরন্তন মানবিক দুর্বলতা ব্যতীত আর কিছু নাই। ইহার মধ্যে ধর্মতত্ত্ব বলিয়া কিছুই নাই, যদি তত্ত্ব কিছু থাকিয়া থাকে, তাহা মনস্তত্ত্ব। চরিত্রগুলির পরিবর্তন স্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের পথেই যে সম্পন্ন হইয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলিয়াছেন, 'যদিও সীতারামের জীবন-সমস্যার উপরে হিন্দু সমাজ ও ধর্মতত্ত্বের প্রভাব আসিয়া ইহাকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, শ্রীর সহিত তাঁহার সমস্ত সম্পর্কই হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—তথাপি তাঁহার নৈতিক অধঃপতনের চিত্রাঙ্কন ও ইহার কারণ বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে। নিতান্ত বাস্তবতা-প্রিয় পাঠকেরও এ বিষয়ে অসন্তুষ্ট হইবার বিশেষ কোনও কারণ নাই।'

'প্রকৃতপক্ষে সীতারামের জীবন-সমস্যার উপরেও হিন্দুসমাজ ও ধর্মতত্ত্বের কোনও প্রভাব পড়ে নাই। একজন হিন্দুর জীবনের কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনা করিতে গেলে যতখানি তাহার ধর্ম কর্ম ও সমাজের কথা অপরিহার্যভাবে আসিয়া থাকে, ততখানিই হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজের কথা ইহাতে আসিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু আসে নাই।

উক্ত সমালোচক 'সীতারামে'র মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের বাস্তবগুণ স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন, '...সীতারাম উপন্যাসে ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যা যে বঙ্কিমের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা অবিসংবাদিত।' কিন্তু তাহা বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও বলেন নাই কিংবা দেখান নাই এবং সমালোচকের নিজের উক্তি হইতেই তাঁহার এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হইয়াছে।

অনেকে শ্রী চরিত্রকে অবাস্তব বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুর সমাজে নারীর জীবনের ভিত্তিতে শ্রীর চরিত্র আলোচনা করিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের ভিত্তিতে নহে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের বাংলা উপন্যাসের সমালোচকগণ পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে অধিকতর 'পণ্ডিত' বলিয়া পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্পর্কে তাঁহাদের মনে যে একটি সংস্কার গড়িয়া উঠে, তাহা হইতে তাঁহারা কিছুতেই মুক্ত হইয়া বাংলা উপন্যাসের সমালোচনা করিতে পারেন না। একথা সত্য পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের নারী চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে শ্রী-চরিত্র অবাস্তব, কিন্তু ভারতীয় হিন্দুসমাজের নারী-চরিত্রের ভিত্তিতে আলোচনা করিলে ইহাকে অবাস্তব বলিতে পারা যাইবে না। তবে 'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক উপন্যাসের অন্তর্গত। ইহার মধ্যে অনেকেই 'রোমান্সের আতিশয্য' অনুভব করিয়াছেন, সুতরাং ইহাতে যতখানি অবাস্তবতা আছে, তাহা এই রোমান্সের সূত্র হইতেই আসিয়াছে।

শ্রীর চরিত্রকে যদি 'অবাস্তব' মনে করা হয়, তাহা হইলে ভারতীয় হিন্দু-সমাজের নারীচরিত্রমাত্রকেই 'অবাস্তব' বলিতে হয়। কারণ, তাহাদের জীবন আদর্শ-নির্ভর, একটি

আদর্শের উপর নির্ভর করিয়াই বাল-বিধবা স্বামী-পরিত্যক্তা এবং নানা কারণে স্বামী-সাহচর্য-বঞ্চিতা নারীদের জীবন কাটিয়া যায়। আমাদের নিকট স্বামী রক্তমাংসের কোনও মানুষের পরিবর্তে একটি অমূর্ত আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়, সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া স্বামীর ধ্যান-জ্ঞানেই তাহার জীবন কাটিয়া যায়। অন্তরের মধ্যে তাহার দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম থাকিলেও বাহিরে তাহার কিছু মাত্র প্রকাশ পায় না। শ্রীর চরিত্র আনুপূর্বিক তাহাই ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। সে স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা সে দৈবদোষে ভোগ করিতে পারে নাই। এই ভোগ না করিবার অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া তাহার সকল জীবন কাটিয়া গিয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে বহু অলৌকিক এবং অসম্ভবরূপে তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে। রোমান্টিক উপন্যাসের তাহা একটি স্বাভাবিক লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নহে।

(ক্রমশঃ)

●

॥ কালিদাসসাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—বলাকা ও চাতক প্রসঙ্গ ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যকৃতির ভুবনগগনে যাহারা সঙ্গীতসৌন্দর্যময় উৎসারণা রাখিয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে পতঙ্গজগতের ভ্রমর ও বিহগশ্রেণী সমুল্লেখ্য। বিহগকুলের মধ্যে বলাকা ও চাতক অন্যতম। কখনো সমতল জনপদে কখনো সমুচ্চ গিরিগাত্রে, কখনো বন্ধুর ভূমিভাগে, কখনো গহন বনদেশে, কখনো বা রমণীয় নদী-তড়াগতটে কবিনেত্র তাহাদের অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে। কালিদাসকাব্যের নানা প্রয়োজনে কতোরূপে কতোবারই না ইহারা আসিয়াছে। চিরপরিচিত তবু চিরনূতন।

মেঘ ও ময়ূরের মতো মেঘ ও বলাকার সম্পর্ক একান্ত নিবিড়। কুমারসম্ভবের একটি শ্লোক। শিবের বিবাহযাত্রা। সুবর্ণকান্তি জননীর দল চলিয়াছেন সম্মুখে, পশ্চাতে শ্বেত-নরকপালধারিণী কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী। কবি কল্পনা করিলেন শ্বেতবর্ণবলাকার শোভিত সুনীল মেঘমালা যেন ছুটিয়াছে—তাহার পুরোভাগে স্বর্ণকান্তি সৌদামিনীর বিলসন :

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং
কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োধরাজী
দূরং পুরঃ ক্ষিপ্তশতহ্রদেব ॥ ৭।৩৬

নীল মেঘমালিকায় বলাকা। অপূর্ব শোভা।

রঘুবংশের একাদশসর্গ। রামচন্দ্র তাড়কাবধে প্রস্তুত। জ্যাশব্দে রাক্ষসী সম্মুখে আসিয়াছে। অমা-রজনীর কৃষ্ণবর্ণ তাহার শরীরে শরীরে। কর্ণে কর্ণে নরকপালের চকল কুণ্ডল। কবি কালিদাস কল্পনা করিলেন তাড়কা যেন সবলাকা এক নিবিড় কৃষ্ণ মেঘ-খণ্ড।

অয়া নিনাদমধ গৃহ্ণতীতরো:
প্রাদুরাস বহুল ক্ষণাদ্ধবি:।
তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা
কালিকেব নিবিড়া বলাকিনী ॥ ১১।১৫

কালিদাসের মেঘদূত। কান্তাবিরহার্ত যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইতেছেন প্রিয়াসকাশে অলকায়। চতুর যক্ষ মেঘকে ডাকিয়া বলেন আজ শুভদিবস। যাত্রার উপযুক্ত ক্ষণ এইটি। অনুকূল পবন মন্দ মন্দ বহিতেছে। বামে আনন্দবিভোর চাতক গান ধরিয়াছে। গর্ভাধানের শুভলগ্ন বুঝিয়াই বলাকামিথুন মালাকারে আকাশের বুকে নয়নসুভগ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। তাহা মেঘের নয়নপথে আসিবে। দৃশ্য লোভনীয়।

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথাত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধ:।
গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালা:
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং যে ভবন্তং বলাকা: ॥ পূর্বমেঘ। ৯।

পবন অনুকূল
তোমারে লয়ে শিরে
অলকাপুর পথে
চলেছে ধীরে ধীরে।
তোমারে হেরি নভে
গরবভরে নব
কূজিছে সমধুর
চাতক বামে তব।
নয়ন অভিরাম
বলাকা ধরে ধরে
মিলন-সুখে চলে
তোমারি সেবা তরে! (নরেন দেব)

বলাকার অন্য নাম বিসকণ্ঠিকা।

মেঘ-বলাকার মতো মেঘ-চাতক সম্পর্ক। মেঘদূত কাব্যের পূর্বমেঘে দেখি যক্ষ মেঘকে অলকায় দূত করিয়া পাঠাইবার জন্য যখন উদ্যোগ করিতেছে তখন চাতক বামদিকে মধুর মধুর ডাকিয়া উঠিয়াছিল—'বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধ:'।

তোমারে হেরি নভে
গরবভরে নব
কূজিছে সমধুর
চাতক বামে তব। (নরেন দেব)

অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকের সপ্তমাঙ্কের প্রথমে দেখি ইন্দ্রলোক হইতে রাজা দুষ্মন্ত প্রত্যাবর্তন করিতেছেন পৃথিবীতে। তাঁহার রথ তখন মেঘলোকে। মেঘসঞ্চরণের পথে। সারথি মাতলি মেঘপথে রথাবতরণ বুঝি বুঝিতে পারে নাই। দুষ্মন্ত বুঝাইয়া বলিতেছেন—

অয়মহমবিষহ্যচাতকৈ র্নিপতদ্ভিঃ
হরিভিরচিরতাসাং তেজসা চাহুলিপ্তৈঃ।
গতমুপরি ঘনানাং বারিগর্ভোদরাণাং
পিণ্ডনমতি রথত্বে শীকর-স্নিগ্ধ-নেমিঃ॥

রথচক্রশলাকার মধ্য দিয়া চাতকপক্ষীর দল বাহির হইয়া আসিতেছিল, রথাশ্বগুলি বিদ্যুদ্দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছিল, সলিলশীকরে সিক্ত হইয়া গিয়াছিল রথের চক্র। রথ মেঘমালার উপর চলিতেছিল, এইগুলি তাহার প্রমাণ।

চাতক মেঘবারি পান করে। তৃষার্ত চাতক দল বুঝি পৃথিবীর জলাশয়ের জল পান না করিয়া মেঘলোকে উঠিয়া যায়। তাহা না হইলে উপর আকাশের মেঘ-সঞ্চরণ-পথে দুষ্মন্তের রথচক্রশলাকার মধ্যে চাতককুল উড়িয়া বাহির হইবে কেন?

মহাকবি তাঁহার ঋতুসংহারের বর্ষাসঙ্গীতে নবমেঘের নিকট চাতকের বর্ষাবারি-ভিক্ষার কথা বলিলেন:

তৃষাকুলৈ শ্চাতকপক্ষিণাং কুলৈঃ
প্রযাচিতস্তোয়তয়াকলস্বিনঃ॥

চাতক সারঙ্গ ও মেঘজীবন—অভিধানে অভিহিত হয়। চাতকের মেঘ-জীবন-আখ্যা তাহার মেঘ-বারি-বৃত্তিরই পরিচায়নী।

●

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুরারি গুপ্তের "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্" ও বৃন্দাবন দাসের "শ্রীচৈতন্যভাগবত" কাব্যগ্রন্থটিতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নবদ্বীপলীলার অভিনয়-কাহিনীতে মূলত বিশেষ পার্থক্য নেই। যেটুকু বৈসাদৃশ্য রয়েছে, তা' যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। পূর্বেই বলেছি, কবিকর্ণপুরের "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এর অভিনয় বর্ণনার সঙ্গে পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটির সাদৃশ্য অত্যন্ত অল্প। যদিও মহাপ্রভুর অনন্যসাধারণ জীবনকাহিনী পাঠকগোষ্ঠীর সামনে উপস্থাপিত করাই ছিল গ্রন্থগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাপ্রভু যে একজন প্রতিভাবান অভিনেতা ও সুদক্ষ নাট্যপরিচালক ছিলেন, কবিকর্ণপুরের নাটকেও তা' দেখান হয়েছে। আচার্যরত্ন চন্দ্রশেখরের গৃহপ্রাঙ্গণে যে অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার সমস্ত ব্যবস্থাই যে আগাগোড়া তিনি পরিচালনা করেছিলেন,—সেকথাও বলা হয়েছে। এইভাবে বর্ণনাগুলির কিছু কিছু মিল দেখা গেলেও

পার্থক্যও বড় কম নয়। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তা বিবৃত করেছি।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁর পার্ষদদের নিয়ে নাটক অভিনয় করবেন। মৈত্রী ও প্রেমভক্তির সংলাপের মধ্য দিয়ে এই নাটকাভিনয়ের ঘটনাটিকে প্রথমে দর্শক ও পাঠক সম্মুখে উপস্থিত করেছেন নাট্যকার। মৈত্রী সূচনাতেই প্রেমভক্তির নিকটে জানতে চেয়েছেন, দেবি। এখন আপনি একাকিনী কোথায় যাচ্ছেন? প্রেমভক্তি উত্তর দিলেন, মৈত্রি। সম্প্রতি যিনি বৃন্দাবনেশ্বরীর ভাব অভিনয় করতে ইচ্ছা করেছেন, আমাদের সেই পরম আশ্রয় সর্বাবতার অবতারী কোনও ভগবান শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের আদেশে সমস্ত লোকের হৃদয়শোধনের জন্য যাচ্ছি।··· মৈত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কোন স্থানে (অভিনয়) হবে? প্রেমভক্তি উত্তর দিলেন, আচার্য রত্নের গৃহপ্রাঙ্গণে। মহাপ্রভু স্ত্রীভূমিকায় অভিনয় করবেন জেনে মৈত্রী আপত্তি জানালেন, বিস্মিত হয়ে তিনি প্রশ্ন তুললেন, কি করে ঈশ্বরের অবতার হয়ে তিনি স্ত্রীভাবে নৃত্য করবেন? প্রেমভক্তি প্রত্যুত্তরে বললেন, হে বালা! তুমি জান না, ঈশ্বর যে সর্বরসময়, সকল ভক্তের আসক্তির (ভাবাসক্তির) অনুরোধে তিনি কত বিচিত্র লীলাই করে থাকেন।···মৈত্রী জানতে চাইলেন, বলুন, সেই নৃত্য কি অঙ্কবদ্ধ কিম্বা ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত? প্রেমভক্তি বললেন, অঙ্কবদ্ধই হবে। মৈত্রী আরও জানতে চাইলেন, বলুন, কে কার ভূমিকা গ্রহণ করবেন? প্রেমভক্তি উত্তরে বললেন, বাছা, অবধান কর।···(শ্রীগৌরাঙ্গ) অদ্বৈতাচার্যকে শ্রীকৃষ্ণের এবং নিজেকে শ্রীরাধার ভূমিকা গ্রহণ করালেন।

"মৈত্রী। দেই! দানীং ভুমং এআইণী কহিং বচ্চসি?

প্রেমভক্তিঃ। মৈত্রি। অস্মাকমাশ্রয়ভূতস্য ভগবতঃ কস্যাপি শ্রীবিশ্বম্ভরদেবস্য বিহিত-সর্বাবতারলীলস্য সংপ্রতি বৃন্দাবনেশ্বরী-ভাবমনুচিকীর্ষোরনুজ্ঞয়া সকললোকস্য হৃদয়শোধনায় সাধয়ামি।

...

মৈত্রী। সো জেব কো পদেসো?

প্রেমভক্তিঃ। আচার্যরত্নস্য পুরাঙ্গণম্।

মৈত্রী। কধং দাব ঈসরো হুবিঅ ইত্থি-ভাবেন পচ্চিস্সদি?

প্রেমভক্তিঃ। বালে। ন জানাসি, ঈশ্বরঃ খলু সর্বরসঃ সর্বেষাং ভক্তানামাশয়ানুরোধাদ্-বিচিত্রামেব লীলাং করোতি।···

মৈত্রী। কধেহি, তং নট্টং কিং অঙ্কবদ্ধং কিম্বা নইদ্বঅং।

প্রেমভক্তিঃ। অঙ্কবদ্ধেন।

মৈত্রী। কধেহি, কো কস্স ভূমিঅং গহিস্সদি?

প্রেমভক্তিঃ। বৎসেঽবধারয়।···

অদ্বৈতমাপাদয়দীশবেশং, স্বয়ঞ্চ রাধাকৃতিমগ্রহীৎ সঃ।"[৪৬]

৪৬। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্কঃ, পৃঃ ২৬-২৮।

অভিনয় বর্ণনার সূচনাতেই মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে কবিকর্ণপুরের পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের ভূমিকা কাকে দেওয়া হয়েছিল, একথা সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত অবশ্য কিছু বলেন নি। কিন্তু বৃন্দাবন দাস, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, পরিষ্কার বলেছেন, সিংহাসনে উপবিষ্ট গোপীনাথের বিগ্রহই নায়কের কাজ করবেন। মনে হয়, অভিনেয় নাটকে নায়ক শ্রীকৃষ্ণের কোনও সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, সবসময়েই তিনি ছিলেন মঞ্চের অন্তরালে। কিন্তু কবিকর্ণপুরের নাটক অনুসারে অদ্বৈত আচার্যই ছিলেন নায়ক শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকাভিনেতা। এই উক্তির সমর্থন একদিকে যেমন পূর্বোক্ত কাব্য দুটিতে নেই, অন্যদিকে বৃন্দাবন দাস তো স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে অদ্বৈত আচার্য বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেন—যার পরোক্ষ সমর্থন পাওয়া যায় মুরারি গুপ্তের রচনায়। অবশ্য মহাপ্রভু যে নায়িকার অভিনয় করেছেন, একথা সকলেই একবাক্যে বলেছেন।

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এও দেখা যায়, মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁর পার্ষদদের মধ্যে নাটকের সমস্ত ভূমিকা বণ্টন করে দেন। কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবেন, সে সম্বন্ধে প্রেমভক্তি মৈত্রীকে বললেন, · হরিদাস হলেন সূত্রধার, মুকুন্দ হলেন তাঁর পারিপার্শ্বিক ও বাসুদেব আচার্য নামক ব্যক্তি হলেন নেপথ্যরচনাকারী। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সংযোগকারিণী বৃন্দা ভগবতী যোগমায়া আশ্রয় করলেন নিত্যানন্দের দেহ অর্থাৎ যোগমায়ার ভূমিকায় নামলেন নিত্যানন্দ।

"প্রেমভক্তিঃ।

হরিদাসঃ সূত্রধারো মুকুন্দঃ পারিপার্শ্বিকঃ।
বাসুদেবাচার্যনামা নেপথ্যরচনাকরঃ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সংযোগকারিণী জরতীব সা।
যোগমায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনুঃশ্রিতা॥"[৪৭]

এখানে পূর্ববর্তী গ্রন্থদুটির সঙ্গে শেষোক্ত গ্রন্থটির বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বৃন্দাবন দাস বলেছেন যে হরিদাস কোতোয়াল বা কোটালের ভূমিকায় অভিনয় করেন এবং সেই অভিনয়ের বিষদ বর্ণনা করেছেন কবি তাঁর কাব্যে। মুরারি গুপ্তের রচনাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হরিদাস যে সূত্রধারের ভূমিকাভিনেতা, একথা যেমন অন্য সমর্থিত নয়; তেমনি মুকুন্দ যে পারিপার্শ্বিকের অভিনয় করেন, কোথায়ও তার উল্লেখ পর্যন্ত নেই। পরন্তু, বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা দেখে মনে হয়, পূর্বেই বলেছি, মুরারি গুপ্তই ছিলেন পারিপার্শ্বিক। মুকুন্দ সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত কিছু না বললেও বৃন্দাবন দাস স্বীকার করেছেন, পূর্বেই বলেছি। মুকুন্দ কীর্তনের শুভারম্ভ করেন। সংস্কৃত-দৃশ্য-কাব্যের রীতি অনুযায়ী অভিনয়ের সূচনায় দেবদেবী প্রশস্তিবাচক নান্দীপাঠ করাই ছিল সূত্রধারের কাজ। এখানে মুকুন্দ কীর্তনের বা অভিনয়ের আরম্ভে সেই কাজ করেন। এই বিবরণ দেখে মনে হয়, মুকুন্দ হলেন সূত্রধারের অভিনেতা, পারিপার্শ্বিক চরিত্রের নয়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনানুযায়ী অভিনেতাদের পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করার

৪৭। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্কঃ, পৃঃ ৯৯।

গরিষ্ঠ অর্পিত হয়েছিল সদাশিব ও বুদ্ধিমন্ত খানের উপরে, কিন্তু নেপথ্যরচনাকার হিসাবে বাসুদেব আচার্যের নামমাত্রও সেখানে নেই। মুরারি গুপ্ত অবশ্য এঁদের কারোরই সম্বন্ধে কিছু বলেন নি। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গৌরাঙ্গ-পার্ষদ নিত্যানন্দ যে বড়াই-এর ভূমিকাভিনেতা, একথা সর্বজনস্বীকৃত।

পূর্বেই বলেছি, "শ্রীচৈতন্যভাগবত" কাব্যে বিবৃত হয়েছে, মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা ও তাঁদের পরিবারবর্গ ব্যতীত আর কারো এই অভিনয়-অঙ্গনে প্রবেশাধিকার ছিল না, "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্"-এও তা' সমর্থিত হয়েছে। মৈত্রী প্রেমভক্তির নিকটে জানতে চাইলেন, সামাজিক বা দর্শক হলেন কারা? প্রেমভক্তি উত্তর দিলেন, অধিকারী ব্যক্তিই এই নাটকের সামাজিক বা দর্শক হতে পারেন—প্রথমেই এই কথা স্বয়ং ভগবান্ নিজেই তুললেন। যথা—হে শ্রীবাস। তুমি আজ সাবধানে সবদিক সামলাবে। এমন ব্যবস্থা করবে, যাতে শুধু যোগ্যজনই যেন প্রবেশাধিকার পায়, অযোগ্যজন নয়। কথার মাঝখানেই শ্রীবাস বললেন, দেব! কোন্ কর্মের দ্বারা এই যোগ্যাযোগ্য বিচার করতে হবে, আর কোথায়ই বা প্রবেশ করতে হবে। পুনরায় ভগবান্ বললেন, স্বয়ং তিনিই শ্রীরাধার অভিনয় করবেন আচার্যরত্নের গৃহপ্রাঙ্গণে। সেখানে দেবীর রসলীলার প্রকাশ্য আবির্ভাব হবে। মৈত্রী কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর, তারপর? প্রেমভক্তি বললেন, তারপর শ্রীবাসের অন্তরে প্রথমদিকে কিছু সন্দেহ থাকলেও ঈশ্বরবাক্য বলে বিশ্বাসও হল, তিনি গঙ্গাদাস নামে ভগবানের পরমপ্রিয় দ্বিজোত্তমকে দ্বারপালরূপে নিযুক্ত করলেন।···প্রেমভক্তি আরো বললেন,···তারপর কারো সেখানে প্রবেশাধিকার রইল না। কিন্তু শ্রীবাসাদি সহোদরভ্রাতাদের বধূগণ ও তৎসঙ্গে আচার্যরত্ন-মুরারি প্রভৃতির বধূগণ অনেক পূর্বেই সেখানে প্রবেশ করে বসেছিলেন। তাঁরা অধিকারীও বটে।

"মৈত্রী। সামাইআও কেহ্মী?

প্রেমভক্তিঃ। অধিকারিণো যেঽস্মিন্নর্থে স্বয়মেব ভগবানবাদীৎ প্রাগেব। যথা—

হে শ্রীবাস স্বয়মবহিতেনাত্ত ভাব্যং ত্বয়াস্মিন্
যোগ্যো যঃ স্যাৎ স বিশতিতরাং নাপরস্তন্নিষেধ্যম্।

ইত্যর্ধোক্তে শ্রীবাসেনাভাষি—দেব। কস্মিন্ কর্ম্মণি যোগ্যাযোগ্যব্যবস্থা করণীয়া, কুত্র বা প্রবেশঃ কারয়িতব্য ইতি। পুনর্দেবেনাপ্যবাদি—

শ্রীরাধাত্র স্বয়মিয়মহো নূনমাচার্যরত্ন
ভাবাসঙ্গাজ্জনয়তি রসাদ্ব্যক্তমাবির্ভবিত্রী।

মৈত্রী। অহো অহো?

প্রেমভক্তিঃ। ততঃ শ্রীবাসেন মনসি সন্দিহানেন ভগবদ্বচ ইতি বিহিতনিশ্চয়েনেতি গঙ্গাদাস-নামা ভগবতঃ পরমান্তো ভূসুরবরো দ্বারপালকর্ম্মেন স্মৃতো।

... ...

প্রেমভক্তিঃ। ··অতঃপরং ন কেষামপি তত্র প্রবেশঃ, কিন্তু শ্রীবাসাদিসহোদর-বধূভিঃ সহাচার্যরত্নমুরারি-বধূপ্রকৃতয়ঃ প্রাগেব তত্র প্রবিষ্ট স্থিতাঃ, অধিকার-ভাজশ্চ তাঃ।

দর্শকমণ্ডলীরূপে উপস্থিত পুরুষ ও মহিলা সামাজিকবর্গ সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈত দেখা না গেলেও গঙ্গাদাস-প্রসঙ্গে মতবিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে গঙ্গাদাসকে রঙ্গভূমিতে প্রবেশের দ্বাররক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু "শ্রীচৈতন্যভাগবত"-এর কোথায়ও দ্বাররক্ষকের উল্লেখমাত্র নেই। সেখানে গঙ্গাদাসের কথা বলা হয়েছে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে রমা ও সখী সুপ্রভাতের রূপলক্ষ্যে যথাক্রমে গদাধর পণ্ডিত ও ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করলে তাঁদের সঙ্গে কথোপকথনকালে। ঐ বর্ণনা দেখে মনে হয়, পূর্বেই বলেছি, গঙ্গাদাস সেজেছিলেন কোতোয়াল হরিদাসের কোনও অনুচর।

প্রেমভক্তি বিভিন্ন ভূমিকা-বণ্টন সম্বন্ধে মৈত্রীকে আরো বলেছেন, তারপর ভগবান্ পুনরায় শ্রীবাসকে বললেন, শ্রীবাস। তোমাকে সাজতে হবে নারদ; শুক্লাম্বরকে হতে হবে তোমার স্নাতক বা শিষ্য; সঙ্গীতশিল্পী হবে শ্রীরামাদি তোমার তিন সহোদর, আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধি। এইভাবে সকলে দেবতা কর্তৃক বিভিন্ন ভূমিকায় নিযুক্ত হলেন।

"প্রেমভক্তিঃ। ততো ভগবতা পুনরপি শ্রীবাস নিজগদে—শ্রীবাস। ভবতা নারদেন ভবিতব্যম্, শুক্লাম্বরেণ তব স্নাতকেন ভাব্যম্, গায়কাঃ শ্রীরামাদয়স্তব সহোদরাস্তত্র আচার্যরত্ন-বিদ্যানিধী চ ইতি দেবেনৈব নিয়োজিতা।"[৪৯]

শ্রীবাস পণ্ডিত যে নারদ সেজেছিলেন, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস দু'জনেই তা' স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্নাতকরূপে শুক্লাম্বরের উল্লেখ তাঁরা কেউই করেন নি। পূর্বেই বলেছি, বৃন্দাবন দাস বলেছেন, মহাপ্রভুর নির্দেশে শ্রীবাসেরই এক ভাই হয়েছিলেন তাঁর স্নাতক বা চেলা। কিন্তু গায়ক হিসাবে শ্রীবাসের শ্রীরামাদি তিন ভাই, আচার্যরত্ন ও বিদ্যানিধির কথা কোথাও নেই।

(ক্রমশঃ)

৪৮। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্ক, পৃঃ ৯৯-১০১।

৪৯। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্ক, পৃঃ ১০০।

।। পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা ।।

শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

(এক)

আজ থেকে দেড়শ বছরের কিছু আগে দক্ষিণ-ভারতের কোইম্বাটোর জেলার অধিকর্তা জন সুলিভন কয়েকজন সঙ্গী, খাদ্যদ্রব্য ও অভিযানের কিছু সামগ্রী নিয়ে নীলগিরি অভিযানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। কোইম্বাটোর থেকে নীলগিরির দূরত্ব মাত্র ষাট কিঃ মিঃ মত। সেই সময়ে পথ যেমন ছিল দুর্গম তেমনি জঙ্গলাকীর্ণ। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কয়েকদিন হেঁটে তিনি এক আশ্চর্য সুন্দর সুবিস্তৃত উপত্যকায় পৌছান। সমস্ত উপত্যকা জুড়ে ঘন সবুজের সমাবেশ। চারিদিকে ঘন নীল পাহাড়ের সারি। নীলগিরির শীর্ষে পৌছে তিনি সেখানকার বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট উচ্চে বিস্তৃত উপত্যকার স্নিগ্ধ মনোরম সবুজের সমাবেশ, সহনীয় ঠাণ্ডা এবং স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু তাঁকে এতো প্রভাবিত করে যে তিনি সেখানে এক শৈলাবাস গড়ে তোলার বাসনা নিয়ে কোইম্বাটোর ফিরে আসেন। ১৮১৯ সাল থেকে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত তিনি কয়েকবার নীলগিরি যাতায়াত করেন। অবশেষে ১৮২৪ সালে তিনি সেখানে প্রথম আবাস তৈরি করে উটাকামণ্ড শৈলশহরের পত্তন করেন। যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত ক্রমশঃ হতে থাকে এবং তৎকালীন বহু ইংরেজ অবসর গ্রহণের পর উটাকামণ্ডে বসবাস সুরু করেন। দেশীয় বহু রাজামহারাজারাও একে একে আসেন উটাকামণ্ডে গ্রীষ্মকালীন অবকাশযাপনের উদ্দেশ্যে। এইভাবে উটাকামণ্ড বা উটি দক্ষিণ-ভারতের অন্যতম অভিজাত শৈলশহরের মর্যাদা লাভ করে। বর্তমান দিনে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছে উটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণ হোল এখানকার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সহনীয় আবহাওয়া। হিমালয়ের শৈলশহরগুলির মত এখানে শীতের সময়েও ঠাণ্ডার প্রকোপ নেই। সারা বছর ধরে প্রায় একই রকম আবহাওয়া চলে। কেবলমাত্র বর্ষার সময়ে শীতের তীব্রতা কিছুটা বাড়ে। উটি শহরের ঝকঝকে চওড়া রাস্তা, ছোট বড় অসংখ্য দোকান, প্রচুর হোটেল, মাঝে মাঝে ফুলের বাগান সবই ইংরেজদের মনোরঞ্জনের জন্য নিখুঁতভাবে তৈরি। উটির বাজার আজও এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয় যে, কলকাতাবাসীর চোখে এক পরমাশ্চর্য। উটির সবটুকু সমতল জায়গা জুড়ে আছে ঘোড়দৌড়ের মাঠ। শহরের মাঝখানে মাঠটি। প্রতি রবিবার টাট্টু ঘোড়ার মত ছোট ছোট ঘোড়ার দৌড় হয়। ভীড়ও বেশ হয়। উটির অন্যতম আকর্ষণ এখানকার বট্যানিকাল গার্ডেন। দেশ ও বিদেশ থেকে সংগ্রহ করে আনা বহু বিচিত্র ও বিভিন্ন রঙের নানান্ ফুলের সমাবেশ বট্যানিকাল গার্ডেনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই বাগানে আছে প্রায় ৬৫০ রকমের বিভিন্ন উদ্ভিদ। বাগানের প্রবেশমুখে আছে ছোট ছোট বাহারি রঙিন গাছের সাহায্যে তৈরি ভারতবর্ষের মানচিত্র। প্রতিটি গাছ সমান মাপের এবং ভারতের প্রতিটি প্রদেশকে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ছোট ছোট বাহারি গাছের সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ঐ মানচিত্রের পাশেই আছে ভারত সরকারের প্রতীক চিহ্ন। ওটিও ছোট ছোট রঙিন পাথর দিয়ে তৈরি। অপরূপ শিল্পকর্মের নিদর্শন।

এই উটি শহরকে কেন্দ্র করে নীলগিরির বিভিন্ন প্রান্তে টোডা আদিবাসীরা বাস করে। নীলগিরির নিম্নভাগে ইরুলা ও কুরুম্বা আদিবাসীরা বাস করে। নীলগিরির উপরিভাগে টোডাদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে কোটা ও বাডাগা আদিবাসীরা বহুকাল ধরে বাস করে আসছে। টোডাদের সমাজব্যবস্থা যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি বিচিত্র এদের পরলোকের প্রতি গভীর বিশ্বাস। নীলগিরির অন্যান্য আদিবাসীদের মত টোডারা কৃষি-নির্ভর নয়। কৃষির উপযোগী প্রচুর জমি থাকা সত্ত্বেও টোডারা কৃষিকাজ করে না। তাদের সমস্ত কৃষি জমি বাডাগাদের দিয়ে দেয় এবং পূর্বশর্তানুযায়ী উৎপন্ন শস্য ভাগ করে নেয়। বাডাগারা স্বীকার করে নীলগিরি পাহাড়ে টোডারাই প্রথম আসে। সেইসূত্রে বাডাগারা প্রতিবছর তাদের শ্রদ্ধাস্বরূপ টোডাদের নানান উপঢৌকন দিয়ে থাকে। পশুপালনই টোডাদের মুখ্য জীবিকা। পুরাকাল থেকে টোডারা মহিষ পালনের কাজ করে আসছে। ওদের বিশ্বাস ভগবান প্রথম মহিষ সৃষ্টি করেন, পরে টোডাদের সৃষ্টি করেন। উটির বটানিকাল গার্ডেনে টোডাদের দুইটি কুঁড়েঘর প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আছে। পর্যটকেরা অবাক বিস্ময়ে দেখেন এই বিচিত্র কুঁড়েঘর দুইটিকে। বর্তমানে টোডাদের মোট সংখ্যা সাত শতের কিছু বেশী। উটি শহরে বহু টোডা আসে সংগৃহীত দুধ নিয়ে তাদের মহাজনদের কাছে। সহজেই তাদের চেনা যায় তাদের দীর্ঘ, শুভ্র ও ঢিলা বহির্বাস দেখে।

(ক্রমশঃ)

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন ধারা : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(সাত)

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের ইতালীতে যেসব মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রের কথা জানা যায়—সেগুলোর মধ্যে উরবিনো শহরের মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রটিতে সম্ভবতঃ সর্বাধিক সংখ্যায় বিভিন্ন ধরণের মাইয়োলিকা পাত্র, থালা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিলো। এই কেন্দ্রটি উরবিনো-র অভিজাত ডিউকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হতো। উল্লিখিত ডিউকেরা ইতালীতে 'ডেলা রোভেরে' পরিবার নামে পরিচিত ছিলেন। ইতালীয় ভাষায় ডেলা রোভেরে কথাটির অর্থ ওক্ গাছ। সেজন্যে ডেলা রোভেরে পরিবারের প্রতীক চিহ্নও ছিলো ওক্ গাছ। উরবিনোতে নির্মিত অধিকাংশ মাইয়োলিকা পাত্র ও থালার অলংকরণের নক্শায় বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ওক্গাছের পাতাসুদ্ধ ডাল এবং ফল। বিখ্যাত ইতালীয়ান চিত্রকর রাফায়েল উরবিনো শহরেই জন্মেছিলেন। গুইডো ডুরান্টিনো (পরবর্তীকালে 'কন্টানা' নামে পরিচিত)-র নাম উরবিনোর ষোলোশো খ্রীষ্টাব্দের সিরামিকশিল্পীদের মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত হলেও পেলিপারিও, ফ্রান্সেস্কো ষান্টো এ্যাভেলি, ওরাজিও ফন্টানা এবং ফ্রান্সেস্কো ডুরান্টিনো প্রমুখ শিল্পীরাও মাইয়োলিকা নির্মাণে স্বকীয়তা ও অনন্যসুলভতার পরিচয় রেখেছিলেন।

উরবিনোর মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রটিতে ষোড়শ খ্রীষ্টীয় শতকে নির্মিত মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালার অঙ্কিত যেসব নক্শা দেখা যায়—তার মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসূচক হলো অদ্ভুত আকৃতির মনুষ্যমূর্তি, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্ধ মনুষ্য ও অর্ধ পশু মূর্তি। তাছাড়াও এসব নক্শার মধ্যে রয়েছে ছাগলযুক্ত মনুষ্যমূর্তি, বীভৎসাকৃতি দৈত্যদানবের মূর্তি এবং ডানাযুক্ত অনঙ্গমূর্তি। এধরণের নক্শার ব্যবহার প্রাচীন রোমের দেয়ালচিত্রে দেখা যায়। রাফায়েলও অবশ্য কোনো কোনো চিত্রে এ-ধরণের মূর্তি এঁকেছেন।

উরবিনোর নিকটবর্তী পেসারো শহরে প্রাচীনকাল থেকেই সিরামিকপাত্র নির্মিত হতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু আনুমানিক ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তীকালে পেসারোতে নির্মিত সিরামিকপাত্রের কোনো নিদর্শন এযাবত আবিষ্কৃত হয়নি। ষোড়শ শ্রীষ্টীয় শতকে পেসারোর সিরামিকশিল্পীদের মধ্যে সিরোলামো শ্যান্‌ক্যান্‌কো মাইয়োলিকাচিত্রনে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। ইনি পেসারোতে একটি মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রও স্থাপন করেন। শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পরবর্তীকাল থেকে শ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পেসারোতে নির্মিত মাইয়োলিকার কোনো উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এপর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। অষ্টাদশ শ্রীষ্টীয় শতকে পেসারোতে যে-মাইয়োলিকা-শিল্পীরা কাজ করতেন—তাঁদের মধ্যে যে-তিনজনের নাম জানা গেছে, তাঁরা হলেন এ্যান্টোনিও ক্যাসালি, ফিলিপ্পো এ্যান্টেনিও ক্যালেগারি এবং রিমিনি।

ইতালীর বিখ্যাত বন্দর-শহর ভেনিসিএ শ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে কয়েকটি মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিলো বলে জানা গেছে। প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যজাহাজ ভেনিসএর বন্দরে এসে ভিড়তো। বিখ্যাত পর্যটক মার্কো পোলো এই ভেনিস নগরের বাসিন্দা ছিলেন। মার্কোপোলো চীনে গিয়েছিলেন এবং তিনিই চীনের সঙ্গে ইতালী তথা য়ুরোপের বাণিজ্যিক যোগসূত্র ঘনিষ্ঠ করে তোলেন। ব্যবসায়ীদের মারফত ভেনিসএ চৈনিক পোর্সিলেন সিরামিকপাত্রের আমদানী হয়েছিলো। চীনে মিঙ্ রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত পোর্সিলেনপাত্রের (মিঙ্ পোর্সিলেন নামে খ্যাত) গড়ন ও অলংকরণ ভেনিসএ নির্মিত মাইয়োলিকা পাত্রের গড়ন ও অলংকরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিলো। এ-ধরণের মাইয়োলিকা পাত্রগুলো 'এ্যাল্লা পোর্সেলানা' নামে আখ্যাত হয়ে থাকে। এই পাত্রগুলোতে চিত্রিত হয়েছে নানান্ ধরণের গাছের পাতা এবং ফুল। তাছাড়া কোনো কোনোটিতে দৃশ্যচিত্রও আঁকা হয়েছে। নীলাভ ছাই রঙএর মেজমণ্ডিত বিখ্যাত চৈনিক 'সেলাডন্' সিরামিকপাত্রের অনুকরণে কিছু কিছু মাইয়োলিকাপাত্রে ব্যবহৃত হয়েছে হালকা নীল রঙএর এনামেল অর্থবা ওভারগ্লেজ রঙ। এধরণের ওভার গ্লেজ রঙ ইতালীতে 'স্মাল্‌টিনো' নামে পরিচিত। ভেনিসএ নির্মিত কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকাপাত্র ও থালায় অলংকরণে জার্মান অলংকরণরীতির প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ ও অষ্টাদশ শ্রীষ্টীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে ভেনিসএ যে-মাইয়োলিকা শিল্পীরা কাজ করছিলেন—তাঁদের মধ্যে জেমিনিয়ানো কোজি-র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোজি যে-সিরামিক নির্মাণকেন্দ্রটি ভেনিস্‌এ স্থাপন করেছিলেন—তাতে পোর্সিলেনপাত্রও তৈরী হতো। ভেনিস্‌এ নির্মিত কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা থালায় য়ুরবিনো রীতির অলংকরণ দেখা যায়। যেসব শিল্পীরা এ-রীতির অলংকরণ করেছেন, বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁরা সম্ভবতঃ ক্যাস্টেল ডুরান্‌টে থেকে ভেনিস্‌এ এসেছিলেন।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে শিল্পী গিরোত্তানি বাত্তিস্তা এ্যান্টোনিবন্ ভেনিস্‌এর অদূরবর্তী নোভে শহরে একটি মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্র স্থাপন করেন। এই নির্মাণকেন্দ্রে অধিকাংশ মাইয়োলিকা পাত্র ও থালা 'রোকোকো'-রীতিতে অলংকৃত করা হতো। ইতালীয়ান 'রোকোকো' কথাটির অর্থ পাথরের কাজ (rock work); ইংরেজী rock শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। রোকোকো-

রীতির চিত্রাঙ্কনে সাধারণতঃ অঙ্কিত হয়েছে পাখর ও ঝিনুক। অবশ্য পাখর ও ঝিনুক-এর সঙ্গে থাকে জল।

ভেনিস্‌এর নিকটবর্তী অপর যে-শহরটিতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্র ছিলো—সে-শহরটির নাম ব্যাসানো। ব্যাসানোতে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মাইয়োলিকা নির্মিত হতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। কিন্তু এখানে নির্মিত কোনো মাইয়োলিকা পাত্র অথবা থালা অদ্যাবধি নিশ্চিতরূপে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

সেক্‌স্‌পীয়রের 'মার্চেন্ট অব্ ভেনিস্'এর পাঠকদের কাছে ভেনিস্‌এর নাম যেমন পরিচিত, তেমনই পরিচিত পাডুয়া শহরের নাম। এই পাডুয়া শহরে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে সিরামিক নির্মাণকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এই কেন্দ্রে কিছু কিছু মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালায় 'গ্রাফিটো' পদ্ধতিতে অলংকরণ করা হয়েছিলো। সিরামিক পাত্র অথবা থালায় সাদা অথবা রঙীন স্লেজ শুকিয়ে গেলে ওই স্লেজএর ওপর আঁচড় কেটে অলংকরণ করবার পদ্ধতির নাম 'গ্রাফিটো'। গ্রাফিটো পদ্ধতিতে অলংকরণের পর সিরামিকপাত্র অথবা থালা যথোপযুক্ত উত্তাপে চুল্লীতে পোড়ালে আঁচড় কাটা রেখাগুলোতে স্লেজ তুলে দেবার ফলে মাটির (যে-ধরণের মাটিতে সিরামিক্‌স্ তৈরী করা হয়েছে) আসল রঙটি ফুটে ওঠে। সবুজ এবং বেগুনি রঙএর স্লেজযুক্ত কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালা এখানে নির্মিত হয়েছিলো। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে পাডুয়াতে 'ইস্‌টোরিয়াটো' রীতিতে কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা থালা চিত্রিত হয়েছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তবে এ-সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। ইস্‌টোরিয়াটো রীতির চিত্রকে দৃশ্যচিত্র অথবা কোনো কাহিনীর বর্ণনামূলক চিত্র বলা যেতে পারে। সপ্তদশ খৃষ্টীয় শতকে পাডুয়াতে 'ইস্‌নিক্' রীতির চিত্রিত মাইয়োলিকা নির্মিত হতো বলে জানা যায়।

নেপল্‌স্‌এর নিকটবর্তী ক্যাষ্টেলি-তে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে অন্ততঃপক্ষে পঁয়ত্রিশটি সিরামিক নির্মাণকেন্দ্রের অস্তিত্ব ছিলো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতকে এখানে নির্মিত ইস্‌রিয়াটো রীতিতে অলংকৃত যে-মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালা পাওয়া গেছে—তাতে যে-রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সে-রঙ অপেক্ষাকৃত হালকা নেড্‌এর। ১৬৭০ থেকে ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী বছরগুলোতে 'ফ্র' পদবীধারী এক শিল্পীপরিবার ক্যাষ্টেলি-র প্রধানতম মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। এই শিল্পীপরিবারের হাতে বেশ কিছুসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর অলংকরণযুক্ত মাইয়োলিকা পাত্র এবং থালা সৃষ্টি হয়েছিলো।

ফ্লাভোনা শহরে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে কয়েকটি মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্র ছিলো। চীনের বিখ্যাত নীল রঙএ অলংকৃত পোর্সিলেনএর অনুকরণে এসব কেন্দ্রে মাইয়োলিকা পাত্র ও থালায় অলংকরণ করা হতো। এছাড়া সমকালীন রৌপ্যনির্মিত পাত্র ও থালায় 'রিলিফ্' অর্থাৎ জমি থেকে উঁচু রেখায় অলংকরণ করবার পদ্ধতিতে এখানে কিছুসংখ্যক মাইয়োলিক পাত্র ও থালায় অলংকরণ করা হয়েছিলো। এখানে গোড়ার দিকে নির্মিত

অধিকাংশ মাইয়োলিকায় একটি মাত্র রঙএ অলংকরণ চোখে পড়লেও পরবর্তীকালে—অর্থাৎ অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে একাধিক রঙএর ব্যবহার দেখা যায়।

ফাভেনা-র নিকটবর্তী এ্যাল্‌বিসোলা-তে খৃষ্টীয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যেসব মাইয়োলিকা নির্মিত হয়েছিলো—সেগুলো ফাভেনার নির্মিত মাইয়োলিকার সঙ্গে নিকট-সাদৃশ্যযুক্ত হওয়ার আলাদাভাবে চিহ্নিত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি। এ্যাল্‌বিসোলা-র বিখ্যাত সিরামিকশিল্পীদ্বয়ের নাম হলো ডোমেনিকো, ব্যাপ্‌টিস্টা এবং অগাস্টিন্ কন্‌রেড্।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবরে নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সম্পন্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে জপুজামণ্ডটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে জয়যুক্ত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সম্পাদক

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

আমরা মনে করি

- কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে।
- সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।
- কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যেই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমগ্র ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ৫৮১৮/৮০

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

WANTED
SALES AGENTS
For
HANDLOOM CORPORATION OF INDIA

MEERUT CITY (U. P.)
EARN Rs. 500/- PER MONTH

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা **ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী** এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। **গীতাধ্যান** (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। **গৌরাঙ্গকথা** (১ম—৩য় ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৫·০০ ৩য়-২·০০
৩। **চণ্ডীচিন্তা** ৪·০০
৪। **উদ্ধব-সন্দেশ** ৫·০০
৫। **শ্রীমদ্ভাগবতম** ১০ম স্কন্ধ (২য়-৭ম) ২২·৫০
৬। **মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ** ২·০০
৭। **উপনিষদ্-ভাবনা** (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—
১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্ব্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্ব্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫১)
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রাদাসপল্লী কলিকাতা-৭০০ ০২৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২২·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহ ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২০·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৪·০০	বাংলার ঋষি	৬·৫০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিদুষী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-700014

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

হাসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,

1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রঃপুত এই কবচ ধারণে পরীক্ষায় পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—কুণ্ডা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET.
CALCUTTA-700006

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট মূল্যে-অল্প-নিশ্চয়তায় প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র ব্রহ্মভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

জ্যোতির্বাণী

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয়

মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক : শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী

সাংখ্যাদিতীর্থ, দর্শনাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, রাজ্যপাল-অনুমোদিত সদস্য।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রধান জ্যোতিষী।

এই পত্রিকার প্রতি মাসে বিস্তৃত ব্যক্তিগত রাশিফল থাকে। বেদ, দর্শন, তন্ত্র, জ্যোতিষ ও ধর্ম-সম্পর্কীয় আলোচনা থাকে।

প্রতি সংখ্যা ২ টা:। ২০·০০টাকা পাঠাইয়া বর্ষিক গ্রাহক হইলে ডাক-ব্যয় লাগে না।

৬/১, বিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৫৫-৫১১৫

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4·00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year. June 1980
VOL. IV

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (প্রাইস) প্রাঃ লিঃ
২৫৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৫৫০২৯৭, ৫২৬৬৫২, ৫৫১২৫২
Cable:"Cookmepore","Queenspice"
Telex:021 2591 A/B"Cook"
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
8, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6 Duff Street, Calcutta-700006
ICE Rs. 1·50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১·৫০টাকা

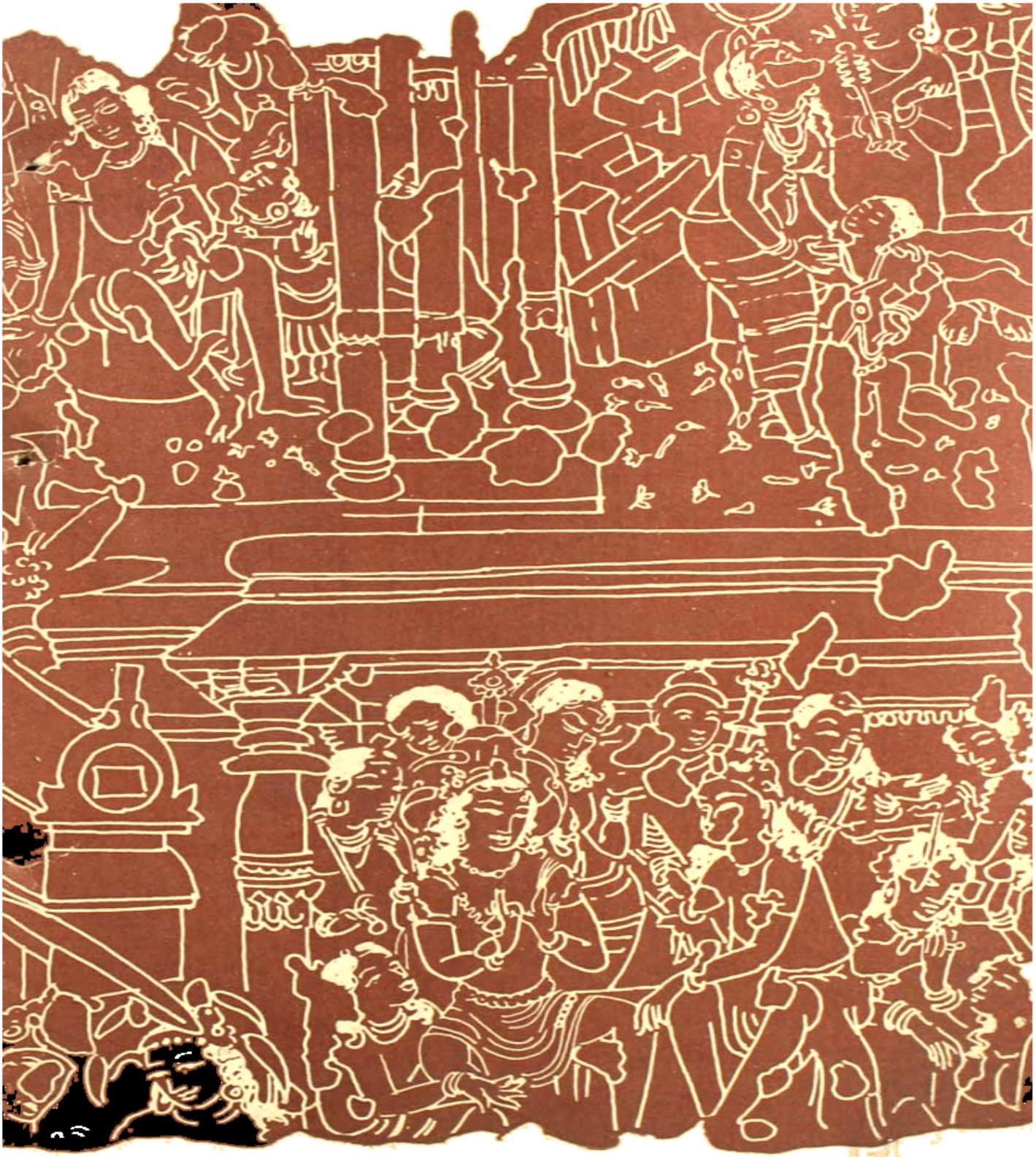

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহ-সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
পঞ্চম সংখ্যা
আষাঢ়
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্ধাং ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রদাসপল্লী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,১৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২২·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	৫·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২০·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	৮·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৪·০০	বাংলার ঋষি	৬·৫০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৩·০০
		বাংলার বিদুষী	৪·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	১৮·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ-	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৬০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬

সাধারণ পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

Space Donated by :—

A WELLWISHER

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
'JECI' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৬, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

কেশগুম্ফে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

আষাঢ়, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন সোধার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এটি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস পৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

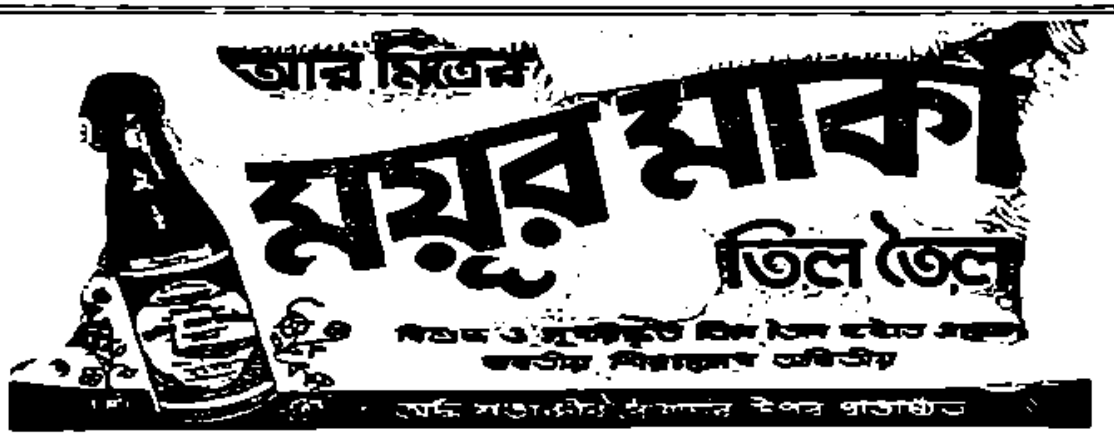

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

আষাঢ়, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	২১৯	
২।	কেশব কালী মেনেছিলো	২২৬	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৩০	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের কুলগুরু	২৩২	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২৩৭	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬।	পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা —স্বামী অভেদানন্দ	২৪১	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৭।	বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা	২৪৪	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৮।	ভারতাত্মা-স্বামী বিবেকানন্দ	২৪৭	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৯।	নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয়	২৫১	শিবানন্দ তীর্থনাথ
১০।	শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ স্মরণিকা	২৫৪	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ
১১।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম উপন্যাস' কি 'তত্ত্বমূলক'	২৫৭	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১২।	হিমালয়ের পথে পথে—বদ্রীনাথ	২৬০	শ্রীবিশ্বজিৎ দাস
১৩।	পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা	২৬৩	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৪।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	২৬৫	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৫।	গ্রন্থ-সমালোচনা	২৬৮	

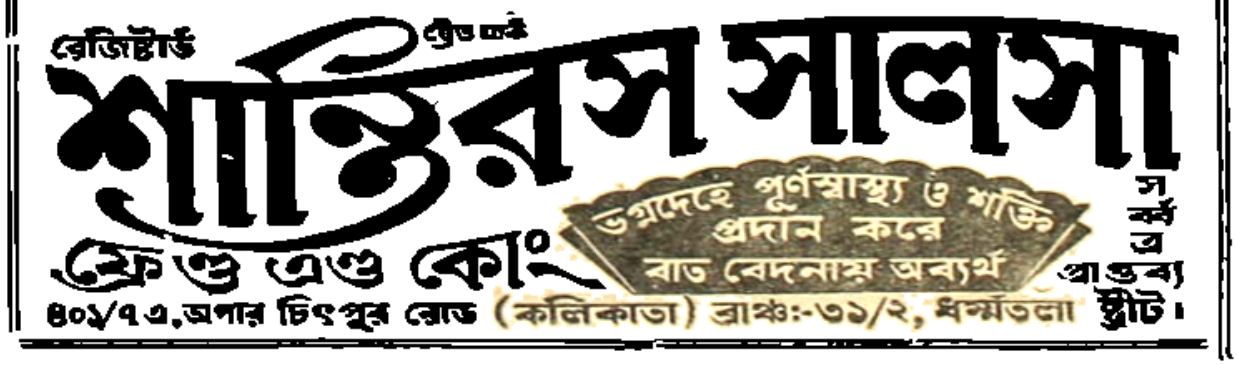

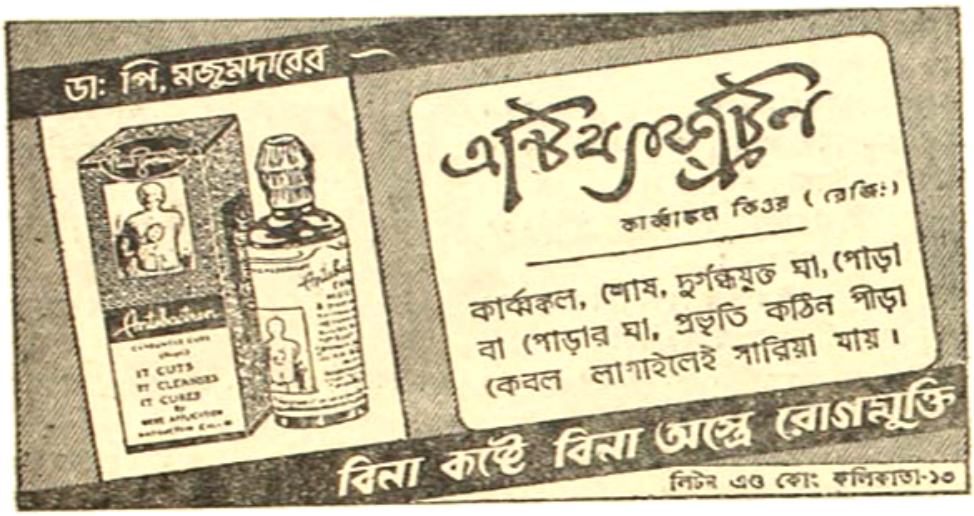

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR ATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

87, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

বিয়াল্লিশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা | আষাঢ় ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ ॥

(দ্বিতীয়াংশ)

অদ্বৈতবেদান্তে শক্তিকে গুণ, বিশেষণ, ঐশ্বর্য প্রভৃতি বলা হয়েছে, এবং প্রকৃতিকে অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অসৎ বা তমঃ প্রভৃতি বলা হয়েছে ('অসৎ' এখানে সৎ বা ব্যক্ত নয়—অব্যক্ত)। তাছাড়া শক্তি অবিদ্যা, মায়া প্রভৃতি নামেও পরিচিত—যদিও আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী পদ্মপাদ প্রভৃতি বিবরণমতাবলম্বীরা অবিদ্যা ও মায়ার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন না। কিন্তু 'ভামতী'-কার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি অবিদ্যা ও মায়ার মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন। আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "অবিদ্যানাম্নী পরমেশশক্তিঃ" প্রভৃতি, তেমনি শ্বেতাশ্বতর-উপনিষদে বলা হয়েছে: 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ"। অবিদ্যা ঈশ্বরের শক্তি বা গুণ, আবার মায়াও ঈশ্বরের শক্তি বা গুণ, কেননা মায়াকে আশ্রয় ক'রে থাকেন বলেই ঈশ্বর বা মহেশ্বর 'মায়িন' অর্থে মায়াশ্রয়ী বা মায়ারূপ গুণ ও উপাধিযুক্ত—'মায়িনন্তু মহেশ্বরঃ'।

এই মহেশ্বর উপনিষদের, কিন্তু মায়া-উপাধিযুক্ত বা মায়াশ্রয়ী হলেও ঈশ্বর মায়াধীশ বা মায়ার অধীশ্বর। 'মহেশ্বর'-শব্দটির অর্থ তন্ত্রশাস্ত্রে একটু ভিন্ন—যদিও সমান অর্থের প্রকাশক (লয়কর্তারূপে)—যেমন বলি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তন্ত্রের মহা বা পরম+ঈশ্বর মহেশ্বর প্রধান বা superior এজন্য যে, পরমবীজময়ী বা সকল প্রাণী ও পদার্থের কারণসংস্কাররূপ বীজ

(সৃষ্টির বীজ) মহেশ্বর-শিবে নিহিত থাকে। নিহিত থাকে বলতে মহান্ ঈশ্বর বা মহেশ্বরের শিরে (বা কপালে) অর্ধচন্দ্ররূপে সৃষ্টিবীজ থাকে। অর্ধচন্দ্রের অন্য নাম অমাকলা, চন্দ্রকলা বা শশীকলা। অর্ধকলা অব্যক্ত বা অব্যাকৃত-প্রকৃতি অথবা মহাপ্রকৃতির রূপ। অব্যক্ত মহাপ্রকৃতিই অমাকলা বা শশীকলা। শশীকলা বা অর্ধচন্দ্র সর্ববীজময়ী বা সৃষ্টিবীজময়ী—অব্যক্ত আকারে থাকেন, যার ব্যক্ত বা প্রকাশ হলেই হয় সৃষ্টি—বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি। তন্ত্রে চন্দ্রকলা-প্রকৃতিকে 'মাং' বলে। মাংয়ের পর বিন্দু বা ব্রহ্ম। বিন্দু দেশ-কাল-কারণহীন পরমোত্তীর্ণ সত্তা বলতে মায়াতীত তুরীয়-ব্রহ্মসত্তা। সত্তা সৎ বা সদ্রূপ-ব্রহ্মের প্রকাশক। তন্ত্রের বিন্দু ও অদ্বৈতবেদান্তের নাম-রূপহীন ও দেশ-কালহীন মায়ারহিত সর্বাতীত অথচ সর্বানুস্যূত ব্যাপকসত্তা ব্রহ্ম এক ও অভেদ। বিরূপে ও বিকাশে সর্বত্র তাই ভেদ, কিন্তু স্বরূপে ও পরমসত্তায় অভেদ। এ'প্রসঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'সব শিয়ালের এক রা'। 'রা' বলতে রব বা শব্দ অর্থাৎ মতবাদ।

বেদান্ত বলতে অদ্বৈতবেদান্ত পরব্রহ্মকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে : বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, ঈশ্বর ও তুরীয়। তুরীয়ের নাম চতুর্থ। তুরীয় বা চতুর্থ এজন্য (১) বিরাট+(২) হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম+(৩) ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম পরমেশ্বর—এই তিনটিও ব্রহ্মসত্তা। এদের মধ্যে বিরাট বা বিরাটব্রহ্ম স্থূলসৃষ্টির অভিমানী। 'বিরাট' বলতে বিশ্বচরাচর—যেটি সৃষ্টিরূপ (স্থূলসৃষ্টি) কার্য। কার্য হলেই তার কারণ থাকে। সুতরাং বিরাট বা বিশ্বচরাচরের কারণ হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্মা। হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মার প্রকৃত নাম 'কার্যব্রহ্ম', সুতরাং এরও একটি কারণ আছে—যার নাম মায়াধীশ ঈশ্বর বা পরমেশ্বর। এই ঈশ্বর বা পরমেশ্বরকে 'কারণব্রহ্ম' বলে। পুনরায় ঈশ্বর বা পরমেশ্বরেরও একটি কারণ বা কারণসত্তা (সত্তা এজন্য বলে যে, এর অস্তিত্ব সর্বকালের)—যার নাম 'মহাকারণ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : 'কারণের পর মহাকারণ'। মহাকারণ হ'ল সকল কারণের অতীত কারণ বলতে সকলের আধার ও অধিষ্ঠান—Ground বা Background। প্রকৃতপক্ষে বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকারণরূপী ব্রহ্ম তাঁর আধার বা অধিষ্ঠান নন, সেজন্য তাঁকে নিরাধার বা নিরধিষ্ঠান-ব্রহ্ম বলে—Causless Cause ও Groundless Ground। অথবা তিনি চিন্মাত্রসত্তা বা Existence-বিশেষ। কিন্তু তিনি কোন নামের, অভিধানের, গুণের দ্বারা নির্দিষ্ট নন। কথাগুলি অবশ্য হেয়ালীর মতো শোনালেও হেয়ালী তত্ত্বানুভূতির বা ব্রহ্মোপলব্ধির বা সমাধির দিক থেকে নয়।

অদ্বৈতবেদান্তের মুকুটমণি আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য-উপনিষদের কারিকার (২৩-৩১) সর্বগুণাতীত ও সর্বপরমসত্তা ব্রহ্মের পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

'যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ।
তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং মন স্বপ্নে ন সংশয়ঃ।
অদ্বয়ং চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ॥
মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্।
মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে॥'

মন নিয়েই সৃষ্টি বা সংসার। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণে[১] মনকেই সৃষ্টি ও বিশ্বচরাচরের কারণ বলা হয়েছে। আচার্য গৌড়পাদ সেকথাই বলেছেন এবং আচার্য শঙ্কর এক-একবার 'চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্' ব'লে সেকথাই বলেছেন। গৌড়পাদের কারিকার মর্ম হ'ল মন ও মনের কার্যরূপ চিন্তা আছে বলেই সৃষ্টি বা বিশ্ববৈচিত্র্য আছে, নচেৎ গাঢ়নিদ্রায় সুষুপ্তিতে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্প-বৃত্তি বা কার্য যখন থাকে না তখন জগৎ ও জগতের বিকাশ আছে কি-না সেকথা কিছুই বুঝতে ও জানতে পারে না শুধু মানুষ কেন—সকল প্রাণীই। সৃষ্টি বা বিশ্ববিকাশই দ্বৈতপ্রকাশ; অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকাশ (সত্তা) ও জগতের বিকাশ (সত্তা) দুটি ভিন্ন ভিন্ন—এক নয়। সেজন্য আচার্য শঙ্কর ঐ কারিকার (২৯-৩১) ভাষ্যে বলেছেন: "মনসো হি অমনীভাবে নিরুদ্ধে[২] বিবেকদর্শনাভাস্তবৈরাগ্যাভ্যাং রজ্জ্বামিব সর্পে লয়ংগতে বা সুষুপ্তে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যত ইতি অভাবাৎ সিদ্ধং দ্বৈতস্যাসত্ত্বমিত্যর্থঃ"। গাঢ়নিদ্রায় সুষুপ্তিতে বাইরের (বাহ্যসংসারের) জ্ঞান বা সংজ্ঞা থাকে না ব'লে মানুষ ও কোন প্রাণীই কোন জিনিস আছে কি-না তা বুঝতে পারে না। আচার্য শঙ্কর সেকথাই বলেছেন যে, সুষুপ্তির অবস্থায় বাইরের সংসারের জ্ঞান না থাকায় গ্রাহ্যের অভাবে গ্রহণও হয় না—"অমনস্ত্বাৎ তদা যাতি গ্রাহ্যাভাবে তদগ্রহণম্'। গ্রহণকর্তা থাকলে তবেই কোন বস্তুকে গ্রহণ ও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। সেজন্য 'মনোদৃশ্যমিদং দ্বৈতং যৎকিঞ্চিৎ সচরাচরম্'—চর ও অচর—চেতন ও অচেতন সকল বস্তুই মনে থাকে বলেই 'আছে' বা 'অস্তি' বলে বোঝা যায়, নইলে আছে বা না আছে এ'সবের সন্ধান দেবে কে? বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ ঠিক একথাই বলেছে যে, তখন 'ন কং পশ্যেৎ, ন কং জিঘ্রেৎ···' প্রভৃতি। সুষুপ্তিতে ও সমাধির অবস্থায় বাইরের জ্ঞান থাকে না, কারণ জ্ঞানরূপ আত্মার তখন সমগ্রজ্ঞানই কেন্দ্রীভূত (concentrated) হয়, সুতরাং আত্মাভিন্ন কোন ভিন্ন বস্তুই তখন থাকে না ব'লে কে কাকে দেখবে, কে কোন্ জিনিস গ্রহণ করবে? তাই মাণ্ডুক্যের ১।১৭-১৮ কারিকায় বলা হয়েছে দড়িতে যে সাপের অধ্যাসরূপ ভুলজ্ঞান হয়, অর্থাৎ দড়িকে যে সাপ বলে মনে হয় তা বিবেক অর্থাৎ বুদ্ধি দড়ি থেকে সাপকে পৃথক বা ভিন্ন বলে গ্রহণ করতে না পারার জন্য সম্ভব হয় এবং ঐ বিবেকবিহীন জ্ঞানই ভুলজ্ঞান বা ভ্রম। ঠিক তেমনি ব্রহ্মবস্তুকেই আমরা জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্য ব'লে দেখি—যে দেখার নাম ভুল দেখা, আর ভুল দেখার জন্য হয় ভুলজ্ঞান বা ভ্রম। এই ভুলজ্ঞান, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমকে আচার্য শঙ্কর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যোপক্রমনিকায় 'মিথ্যাপ্রত্যয়' ('মিথ্যাপ্রত্যয়ত্বাৎ') বলেছেন। প্রত্যয় বলতে জ্ঞান।

১। গৌড়পাদকারিকা, যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ, অষ্টাবক্রসংহিতা ও বৌদ্ধযোগাচারীদের ঠিক এক মত না হলেও সমযোগীয়, কেননা এরা ব্রহ্ম ও বাস্তব-জগতের পৃথক সত্তা স্বীকার করে না। এদের মধ্যে বিজ্ঞান বা ব্রহ্মই একমাত্র পরমসত্তা, আর সৃষ্টি, জীব, সংসার এ'সকল মায়ার বা অজ্ঞানের জন্য দ্বৈতসৃষ্টি।

২। এখানে 'নিরুদ্ধ'-শব্দ ব্যবহার করেছেন অবি পতঞ্জলির 'সমাধিঃ' শব্দ বা অর্থকে স্মরণ ক'রে—'যোগশ্চিত্তবৃত্তি: নিরোধঃ'। ব্যাস ভাষ্যে বলেছেন: 'নিরোধঃ সমাধিঃ'।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের নাম বিবর্তজ্ঞান বা অজ্ঞান। এই জগদ্‌ভ্রম-রূপ মিথ্যাজ্ঞানও হয় সত্যজ্ঞান ব্রহ্মরূপ আধারের বা অধিষ্ঠানের ওপর ; অর্থাৎ যখন কোন মিথ্যাজ্ঞান (false knowledge) হয় তখন সত্যবস্তুতেই মিথ্যাকে সত্য ব'লে জ্ঞান হয়। বিবেকজ্ঞান বলতে সৎ থেকে অসৎকে পৃথক করার জ্ঞান এবং এই জ্ঞান না থাকার জন্যই ভুলজ্ঞান হয়। যেমন ঝিনুকের চাকচিক্যগুণ ও রূপোর চাকচিক্যগুণ একরকমের হওয়ায় আমরা ঝিনুককে ভ্রমে রূপো বলে ভাবি ও গ্রহণ করি, তেমনি জগদ্‌ভ্রম বা ব্রহ্মকে জগৎ ব'লে মনে করি ভুলে বা ভুলজ্ঞানে। কিন্তু ভুল বা ভুলজ্ঞান যখন চলে যায় (দূর হয়) তখনই সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়। তেমনি অজ্ঞান চলে গেলে (দূর হলে) জ্ঞানরূপ ব্রহ্মের স্বতঃই প্রকাশ হয়। মাণ্ডুক্যকারিকায় তাই আচার্য গৌড়পাদ বলেছেন—

'নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ততে।
রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্মবিনিশ্চয়ঃ।' ১৮

এ'প্রসঙ্গে আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "তথা 'নেতি নেতি' ইতি সর্বসংসারধর্মশূন্যা প্রতিপাদক-শাস্ত্রজনিতবিজ্ঞানসূর্য্যালোককৃতাত্মবিনিশ্চয়ঃ 'আত্মৈবেদং সর্বম্ - এক এবাদ্বয়ম্‌ই'।" সেজন্য জ্ঞান বা বিজ্ঞানরূপ সূর্যের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হয় এবং অদ্বয় বা একমাত্র সৎ বা সত্য ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়। এজন্য গৌড়পাদ বলেছেন : "পরমার্থসদ্বিজ্ঞানমাত্রবিশেষং' (৩০)—বিশেষজ্ঞান বিজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি হলে তবেই 'ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যা' এবং শক্তি ও শক্তিমান এক ও অভেদ—এই সত্যজ্ঞানের প্রকাশ হয়, অন্যথা হয় অনুমান, বিচার ও বিতণ্ডা।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-বাক্যের সিদ্ধান্ত সগুণব্রহ্মরূপ ঈশ্বরে নিষ্পত্তি হ'লেও ঐ বাক্যের যথার্থ বা নিঃসন্দিগ্ধ অর্থ ও মর্ম বোঝার জন্য অদ্বৈতবেদান্তের অভিপ্রায় ভালভাবে জানা দরকার এবং সেজন্য ঐ প্রসঙ্গে পুনরায় অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনাই করি এখানে সহজ-সরলভাবে।

অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে শক্তিও গুণ, কর্ম, কার্য, বিশেষণ প্রভৃতি। বিকাশও সেদিক থেকে গুণ, বিশেষণ কিংবা বিকার। বিকাশের অর্থ আমরা দু'রকমভাবে বুঝি : (১) এক থেকে দুইয়ের বা বহুর বিকাশ বা সৃষ্টি, আর (২) অব্যক্ত থেকে ব্যক্তরূপের বিকাশ। অব্যক্তকে বীজ বা কারণ বলে, আর কার্য কারণের প্রকাশ বা সৃষ্টি। 'একোঽহং বহু স্যাম' এবং 'তদৈক্ষত বহু স্যাম' বা 'অসতঃসজ্জায়তে' প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সেকথাই প্রমাণ করে। তারা প্রমাণ করে সৎকার্যবাদ—সৃষ্টির পূর্বে সৎ ছিল বা সৎ অর্থে অব্যক্ত ছিল, তা থেকে দুই বা বহু অর্থে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত সত্তার প্রকাশ হ'ল। মোটকথা দুই, বহু কিংবা ব্যক্তের প্রকাশ অদ্বৈতমতই প্রমাণ করে অদ্বয়সত্তার পরিপ্রেক্ষিতে। তবে একের ও অব্যক্তের প্রকাশে যে দ্বৈত বা দুই বা বহুর সৃষ্টি হয় একথা অবিসংবাদী সত্য। কিন্তু একের ও অব্যক্তের সঙ্গে দু'য়ের বা বহুর এবং ব্যক্তের একটি নিবিড় সম্পর্ক যে পাওয়া যায় সেকথাও সত্য। কথা এই যে, শক্তি ও শক্তিমান উভয়ে অবিনাভাবে বা অভিন্নভাবে অথবা বিশিষ্টভাবে (অঙ্গাঙ্গীভাবে) সম্পর্কিত কি-না তা বিচারের বিষয়, কেননা শক্তি একদিক থেকে উপাধি, বিশেষণ বা গুণ

এবং শক্তিমান বিশেষ বা গুণী, এবং সেদিক থেকে 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ' একথা অদ্বৈততত্ত্বের প্রকাশক বা বিশিষ্টাদ্বৈততত্ত্বের দ্যোতক সেকথাই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচারের ও উপলব্ধির বিষয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "তোমরা কোন রকমে বিশ্বাস করবে না যে, ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি আর শক্তিমান অভেদ। কিন্তু একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বললে দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ২০৪)। "একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই" বলতে অগ্নি ও অগ্নির দাহিকাশক্তি অভিন্নসত্তাযুক্ত—এক ও অভেদ, কেননা শক্তিমান অগ্নির সঙ্গে দাহিকাশক্তির অবিনাভাবসম্পর্ক এবং এই দু'টিকে নিয়ে তবে 'অগ্নি'-শব্দের অখণ্ডতা ও সার্থকতা সিদ্ধ হয়। অগ্নির দহন করার শক্তি দাহিকাশক্তি যে অগ্নির শক্তি বা গুণ একথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা থেকে বোঝা যায়। কিন্তু শক্তি শক্তিমান ছাড়া থাকে না এবং শক্তি যে অগ্নির আভ্যন্তরিক গুণ একথাও ঠিক। শক্তির কর্মের ও গুণের সার্থকতা হ'ল কোন-কিছুকে পৃথক করা—যেমন বিভাজনকারী গুণ বা ইংরাজী ক্যাটিগরি (Category)। গুণ গুণীকে নির্দেশ করে, আবার বিভাগও করে। তাছাড়া গুণের বা বিশেষণের কাজ বা সার্থকতাই হ'ল তাই। যেমন একটি লাল (বর্ণের) ফুল। লালবর্ণ ও ফুল পরস্পরে অভিন্ন ঠিক, কিন্তু ঐ বর্ণ আবার অপরাপর বর্ণের ফুল থেকে লালফুলকে পৃথক (divide) করে। তেমনি সগুণ ও নির্গুণ একদিক থেকে ব্রহ্মের গুণরূপে নির্দিষ্ট এজন্য যে, ব্রহ্ম গুণের অন্তর্ভুক্ত—কি অতীত তা বোঝানোর জন্য। তেমনি আকার ও নিরাকার। এগুলি গুণীর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, উপাধি বা প্রকৃতির নির্দেশক এবং নির্দেশক হলেই গুণ বা উপাধি—যা সীমিত করে বা একটিকে অন্য শ্রেণীতে নির্দিষ্ট বা অন্তর্ভুক্ত করে গুণীকে। সেজন্য সর্বগুণাতীত অতিক্রান্ত বা তুরীয় বিশুদ্ধব্রহ্মে কোন-কিছু গুণের, উপাধির ও সীমার আরোপ ও কল্পনা করা সমীচীন নয়, কেননা তাহলেই সর্বাতীত ব্রহ্মকে সীমার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও নির্দিষ্ট কিংবা ভাগ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের—"ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি আর শক্তিমান অভেদ"—এই বাণীর বা উপদেশের মধ্যে শক্তিমান ব্রহ্ম যে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর সেকথা বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। কিন্তু নির্গুণ ও সর্বাতীত (তুরীয়) ব্রহ্মে শক্তিরূপ বিশেষণের বা উপাধির (limiting adjunct-এর) কোন কল্পনাই করা যায় না সেকথা বলেছি, কেননা তাতে ক'রে সর্বাতীত ব্রহ্মসত্তাকে অখণ্ড আবার বিকৃত বলতে সীমাযুক্তই করা হয়।

আচার্য বাদরায়ণ-ব্যাসের 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ১।১।২ ব্রহ্মসূত্রের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর স্পষ্টই বলেছেন : "যস্মাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি—তৎ ব্রহ্মেতি বাক্যশেষঃ"। ব্রহ্ম এখানে কারণব্রহ্ম ঈশ্বর অর্থাৎ শক্তিরূপ গুণযুক্ত সগুণব্রহ্ম—যিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গীতার 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্…' (৪।৬) শ্লোকের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে গূঢ়ার্থদীপিকায় বলেছেন : "… সর্বভাসকঃ সর্বকারণমায়াবিষ্ঠানত্বেন সর্বভূতেশ্বরোঽপি সন্নহং প্রকৃতিং…"।[৩] গীতায় শ্রীকৃষ্ণও সে কথা

৩। এ'সম্বন্ধে পরে বিস্তৃত ও বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে।

বলেছেন : 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়'—অর্থাৎ 'স্বান্ প্রকৃতিম্' (ত্রিগুণাত্মিকাম্)-এর অর্থ শুদ্ধসত্ত্বগুণসম্পন্ন মায়াযুক্ত আমিই অর্থাৎ 'আমার স্বরূপ'—সগুণ-ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম—গুণাতীত নির্গুণব্রহ্ম নন, কেননা নির্গুণে বা গুণাতীত তুরীয় ও বিশুদ্ধ-ব্রহ্মে মায়া, গুণ বা প্রকৃতির কল্পনাই করা যায় না। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিসম্পন্ন যে সগুণব্রহ্মের গুণ নির্দেশ করা হয়েছে তাতে আচার্য শঙ্কর বলেছেন - 'ইতি কারণনির্দেশঃ' (সৃষ্টিকারণের নির্দেশ)। তৈত্তিরীয়-উপনিষদেও (৩।১) বলা হয়েছে : 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে···' প্রভৃতি ; কিংবা তৈত্তিরীয়ে ৩।৬ শ্লোকেও 'আনন্দাৎ এব খল্বিমানি ভূতানি···' প্রভৃতি। 'আনন্দ' এখানে সগুণব্রহ্ম—'তৎবিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্ম ইতি'। তবে মনে রাখা উচিত যে, সগুণব্রহ্মের নির্দেশ থাকলেও নির্গুণব্রহ্মসত্তার কথা স্বতঃই মনে পড়ে—যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই"। অদ্বৈতবেদান্তের পঞ্চদশীবৃদ্ধিযুক্ত সাধক বিচার করতে করতে সগুণব্রহ্মে (কারণব্রহ্মে) উপনীত হলেই নির্গুণব্রহ্মে (মহাকারণব্রহ্মে) বা সর্বগুণাতীত বিশুদ্ধব্রহ্মে স্বতঃই উপনীত হন। নির্গুণব্রহ্মের অর্থই সর্বোপরম বা সর্বাতীত অর্থাৎ সগুণ-নির্গুণের দ্বৈত-অদ্বৈতের অতীত ব্রহ্ম—যাকে আচার্য শঙ্কর 'দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্'-ব্রহ্ম বলে স্বীকার করেছেন।

এ'প্রসঙ্গে জ্ঞানের, যোগের ও ভক্তির দিক থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যা বলেছেন সেগুলি-সম্বন্ধে উল্লেখ করা প্রয়োজন পূর্বোক্ত আলোচনার বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করার জন্য। শ্রীশ্রীকথামৃতে (১মভাগে ১৩৮৬ সালের সংস্করণ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী প্রীম উল্লেখ করেছেন—

[এক ঈশ্বর—তাঁর ভিন্ন ভিন্ন নাম—জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত]

"জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে।

"একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে তার নাম পূজারী, যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি-বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে—ব্রহ্ম এ'নয়—ও'নয় ; জীব নয়, জগৎ নয়। এইরূপ বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ; নাম-রূপ এ'সব স্বপ্নবৎ : ব্রহ্ম কি যে—তা মুখে বলা যায় না ; তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নাই"।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ক'রেই এই মন্তব্য করেছেন : 'ব্রহ্ম কি যে—তা মুখে বলা যায় না', কারণ তিনি 'অবাঙ্মনসগোচরম্ —বাক্য ও মনের অগোচর,[৪] সুতরাং ভাষা দিয়ে ব্রহ্মসম্বন্ধে মানুষ বলবে কি ক'রে, আর মন দিয়েই তাঁকে যথার্থভাবে চিন্তা করবে কি ক'রে ? মায়া যেমন অনির্বচনীয়া, ব্রহ্মও তেমনি

৪। উপনিষৎ বলেছে : (১) 'মনসা ন মনুতে'।
(২) 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠ উঃ)।

অনির্বাচ্য। তারপর দ্বিতীয় কথা—'তিনি যে ব্যক্তি (Personal God) তাও বলবার যো নাই',—যো নাই কেননা প্রকৃতপক্ষে Personal God মায়ার ও উপাধির সীমার মধ্যে। তাছাড়া তিনি Impersonal-ও। আবার তিনি Personal এবং Impersonal—আকার ও নিরাকারের—সগুণ ও নির্গুণের অতীত বা বাইরে। অথচ ব্যক্তি বা মনুষ্যরূপে তিনি অবতীর্ণ হন।* আবার সর্বগুণাতীত নৈর্ব্যক্তিক-রূপেও তাঁকে নির্বাচন করা যায়,—আবার যায় না। সুতরাং এক নিঃশ্বাসে ব্রহ্মকে সাকার ঈশ্বর বলাও কঠিন, কারণ সত্যকারভাবে ব্যাপকচৈতন্যসত্তা ব্রহ্ম সকল নাম-রূপ ও নির্বচনের অতীত অর্থাৎ বাইরে।

শ্রীম শ্রীশ্রীকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসম্বন্ধে পুনরায় বলেছেন: "জ্ঞানীরা ঐরূপ বলে—যেমন বেদান্তবাদীরা (বলতে অদ্বৈতবেদান্তবাদীরা)। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই (সাকার-নিরাকার—সগুণ-নির্গুণ—লীলা-নিত্য প্রভৃতি) লয়। • • • উত্তম ভক্ত বলে—তিনি (ব্রহ্ম বা ঈশ্বর) নিজে এই চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—জীব-জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ যে চিনি খায়, চিনি হ'তে ভালবাসে না" (সর্বাতীত বা সর্বোপরমসত্তা ব্রহ্মের সঙ্গে তাঁরা এক বা অভেদ হ'তে চান না। তাঁরা চান ব্রহ্মের সকল রূপ, সকল নাম, সকল ঐশ্বর্য)।

"যোগীও পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে, উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ।···"

"কিন্তু একই বস্তু, নামভেদমাত্র। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১মভাগ; ১৩৮৬ সাল, পৃঃ ৪০)।

পুনরায় শ্রীশ্রীকথামৃতে (১মভাগ, ১৩৮৬ সাল, পৃঃ ৪১) শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—

"শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জীব-জগৎ—এ'সব শক্তির (মায়ার) খেলা। বিচার করতে গেলে এ'সব স্বপ্নবৎ (কেননা পারমার্থিক-নিত্যসত্তা এ'সবের নাই)। ব্রহ্মই বস্তু (অর্থে নিত্য ও সত্য), আর সব অবস্তু (অর্থে অনিত্য ও মিথ্যা)। শক্তিও স্বপ্নবৎ অবস্তু (অনিত্য)।

"কিন্তু হাজার বিচার করো—সমাধিস্থ নাহলে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই···।"

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। একটিকে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়, যেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মানলেই দাহিকাশক্তি মানতে হয়, দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে সূর্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না।

"তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না"।

---

*। 'দেহবানিব জাত ইব'।

তারপর আছে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার ও সমন্বয়-দৃষ্টির প্রকাশে এক ও বৈচিত্র্যের মধ্যে—অখণ্ড ও খণ্ডের মধ্যে ঐকান্তাবনের কথা। ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মদৃষ্টি যাদের মধ্যে পরিসিদ্ধ—তাঁদের চিন্তা সীমার ও খণ্ডের সঙ্কীর্ণতা বিলুপ্ত হয়ে অসীমে ও অখণ্ডে একাকার হয়। ব্রহ্ম সগুণ—কি নির্গুণ, ব্রহ্ম সাকার—কি নিরাকার—এ সকল দ্বৈতজগতের বিচার তাঁদের মধ্যে স্থান পায় না। তাঁদের দৃষ্টি সর্বত্র চৈতন্যরূপে প্রসারিত। কাজেই বুদ্ধির বিচার তাঁদের মধ্যে বিলুপ্ত হয় বোধির চিরসমুজ্জ্বল অনির্বাণ আলোকে। সেজন্য সর্বসমন্বয়ী অখণ্ডদৃষ্টির সাধক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথাই উদ্ধৃত ক'রে বলি—

"আদ্যাশক্তি লীলাময়ী—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। **কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী।** একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এইকথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন তিনি এইসব কাজ করেন তখন তাঁকে **কালী** বলি—**শক্তি** বলি। একই ব্যক্তি (সত্তা)—নাম-রূপভেদ" (**শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত**, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪২)। এরপর তিনি উদাহরণ দিয়েছেন, একই জলকে কেউ পানি বলে, কেউ ওয়াটার বলে, কেউ এ্যাকোয়া বলে, কিন্তু একই জল। তেমনি একই ঈশ্বর—তাঁকে কেউ বলে ঈশ্বর, কেউ বলে গড্, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্রহ্ম, কেউ বলে কালী, কেউ বলে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা প্রভৃতি"।

(ক্রমশঃ)

●

॥ কেশব কালী মেনেছিলো ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

ঈশ্বরের নামে দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া চাই। নাম মাহাত্ম্যের জোর কত? তিনি কেশব প্রভৃতি শ্রোতাদের হৃদয়-জমিতে নামের বারিসিঞ্চন করেন—তাঁদের উপহার দেন রামপ্রসাদের দৃঢ় প্রত্যয়:

"আমি দুর্গা দুর্গা বলে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী॥

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সাধন জীবনে প্রার্থনা করেছিলেন শুধু ভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। ভক্তিপথ ধরে গেলে ব্রহ্মজ্ঞানও হয়। রামপ্রসাদের গানের সুরে ও ভাবে তিনি শ্রোতার মনে গেঁথে দেন,

"আয় মন বেড়াতে যাবি
কালীকল্পতরুমূলে রে (মন) চারি ফল কুড়ায়ে পাবি।"

সংসারেও ঈশ্বর লাভ হয়। উদাহরণ জনকরাজা। ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিলাভ হলে এই সংসারই মনে হয় মজার লুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি। কি করে জনকরাজা হওয়া যায়, তার পথও বলে দেন। বিবেকবৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। বিবেকবৈরাগ্য হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। এইটি বোধ। - সেসঙ্গে প্রয়োজন, অত্যধিক প্রয়োজন ঈশ্বরেতে অনুরাগ। ঈশ্বরের উপর টান ভালোবাসা। আদর্শ হচ্ছে গোপীদের কৃষ্ণের উপর টান। একটি গান গেয়ে তিনি ভাবটি ফুটিয়ে তোলেন,

"বংশী বাজিল ঐ বিপিনে
(আমার তো না গেলে নয়) (শ্যাম পথে দাঁড়ায়ে আছে)
তোরা যাবি কি না যাবি বল গো।"

ভাবাবেগে দেখা দিল গায়কের চোখে জল। শ্রোতাদের চোখ করে ছলছল। শ্রীরামকৃষ্ণ যেন আবদার করে বলেন কেশবকে, "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো, এই টানটুকু নাও, ভগবানের জন্য কিসে ঐরূপ ব্যাকুলতা হয় চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।"

জাহাজে চড়ে গঙ্গাবক্ষে চলেছিলেন কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি ধর্মবীরগণ। যদিও তাঁদের অনেকেই বাহাদুরী কাঠ তাঁরা চলেছিলেন রামকৃষ্ণ-জাহাজে চেপে। চলেছিলেন পবিত্র সলিলা গঙ্গা বেয়ে। জাহাজ গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই সুদক্ষ কাপ্তেন শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতাদের রসসিক্ত মনের পটে এঁকে দেন যুগবাণী "ভক্তি-যোগই যুগধর্ম। তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরি নাম কর। মায়ের নাম গুন গান কর। তোমরা ধন্য। তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মত তোমরা জগৎ স্বপ্নবৎ বলো না। ওরূপ ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও। তোমরা ভক্ত। তোমরা ঈশ্বরকে ব্যক্তি বল। এও বেশ, তোমরা ভক্ত। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে অবশ্য পাবে।"

প্রথম সাক্ষাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের ভাবের দুর্গের উপর কামান দেগেছিলেন। সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তোমরা নাকি শক্তি মান না?" একটু পরেই নিজমুখে বলতে থাকেন, 'শক্তি না জানলে ব্রহ্মকে জানবার যো নাই, সে যে অভেদ। যেমন আগুন আর দাহিকাশক্তি। একটা ভাবলে আর একটা ভাবতেই হয়।...তেমনি ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তি অভেদ। সৃষ্টির বিকাশ যখন করেন, তখন তাঁকে শক্তি ভাবা যায়—আদ্যাশক্তি, মা আনন্দময়ী। আবার যখন নিষ্ক্রিয় তখন ব্রহ্ম। তা সেই সচ্চিদানন্দময়ীকে মা আনন্দময়ী, মা কালী, মা দুর্গা ভক্তের যার যেমন ইচ্ছা তাই বলে ডাকে।...সোনার আতা দেখলে যেমন আসল আতা মনে পড়ে তেমনি মাটির মা কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা কালী, মা আনন্দময়ীর উদয় হয়।" শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমানন্দে বিস্ফুরিত অঙ্গকান্তি। তাঁর প্রাণমাতানো মধুর কণ্ঠের এই মরমী বাণী ব্রাহ্মনেতার হৃদয়-জমিতে নূতন ফসলের বীজ বপন করে।

প্রথম সাক্ষাতের দিন বিদায় নেবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন, "তোমারই ল্যাজ খসেছে।" মানুষের অবিদ্যারূপ ল্যাজ খসে গেলে সে সংসারেও থাকতে পারে আবার সচ্চিদানন্দ সাগরেও যেতে পারে।"[৩]

৩। শুদ্ধসত্ত্ব বসু : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, পৃঃ ১৩২

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতেন, "মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে। চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল।" ব্রাহ্মভক্ত কেশবের মন শ্যামাপদস্থিত নীলকমলের দিকে আকৃষ্ট হয়। কেশব-মধুপ নীলকমলের মধু পান করে তৃপ্তি পান। শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যের মৌতাতে তীব্র আকর্ষণ বোধ করেন কেশবচন্দ্র। তাঁর ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা ঘোষণা করে, "এই স্বার্থপর সংসারে, তাঁহার মত একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই।" (১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৭ সাল)। আবার কয়েকদিন পরেই লেখেন, "তাঁহার ধর্মপ্রসঙ্গ চিরকালই নব নব।"

মাষ্টারমশাই মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের মূল্যায়নে শ্রীরামকৃষ্ণাধারে জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্যের মিলন ঘটেছিল। ওপরে সহজাবস্থা। গম্ভীরাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর দিয়ে কত ভাবের জাহাজ চলে গেছে, তবু তিনি সহজ। অনেকেই বুঝতে পারে না, কিন্তু সকলেই আকর্ষণ বোধ করে।

স্কুলকলেজে না পড়ে শুধুমাত্র অনুরাগ ও আন্তরিকতার বলে একজন মানুষ বিস্ময়কর জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী হয়েছেন দেখে নবশিক্ষিতদের তাক্ লেগে যায়। এদিকে ধর্মপ্রাণ কেশবচন্দ্র তাঁর ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখে মোহিত হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা স্বীকার করে, "এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহারো জীবনে দেখা যায় না।···বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাবদর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়।"

স্বভাবতই মূর্তিপূজারী দক্ষিণেশ্বরের 'পাগলাবামুন' শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ব্রাহ্মনেতাদের মাখামাখি কৌতূহল, সন্দেহ ও নবজিজ্ঞাসার সূচনা করে। ব্রাহ্মগণ নিজেদের সমর্থনে পত্রপত্রিকায় যা বলতে চান, জনসাধারণকে জানাতে চান, তার সারকথা এরূপ :

The Indian Mirror, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ লেখে, "Though a true Hindu he is said to sympathesize heartily with the Brahmos of the advanced schools."

১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৭৭ "মিরর" আবার লেখে, "Ramkrishna Paramhansa, a Hindu devotee of a very unusual type, who has sympathy with our movement."

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ "পরমহংসের উক্তি" শীর্ষক ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করে। 'ধর্মতত্ত্ব' পত্র (১৬ই ভাদ্র, ১৮০৮ শক) হতে জানা যায়, "পরমহংসদেব সময় সময় যে সকল তত্ত্বকথা বলিয়াছেন তাহার অনেকগুলি আচার্যদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন'। কেশব বলেছিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, এঁকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না, যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিষ গ্লাস-কেসে রাখতে হয়।"

এদিকে অধ্যাত্মবিজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণের বিচারে কেশবচন্দ্র 'দৈবী মানুষ'। তিনি বলেছিলেন কেশবের 'ফাতনায় মাছ খেয়েছে', 'তাঁর ল্যাজ খসেছে', 'কেশব সেন কি সরল ছিল'? "কেশব এত পণ্ডিত···কত লোকে তাকে মানত, সে কিন্তু এখানে যখন আসত শুধু পায়ে; সাধু

দর্শন করতে হলে কিছু আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত, একেবারে অভিমানশূন্য।... "কেশবের কথা আলাদা। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তাঁর সব জুটিয়ে দেন।..." "কেশবের যোগভোগ, সংসারে থেকে ঈশ্বরের দিকে মন আছে।" এসকল মন্তব্য হতে কেশবের ব্যক্তিত্ব ও অধ্যাত্ম-সত্তা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎপর্যপূর্ণ মূল্যায়ন বুঝতে হবে।

হিন্দুধর্ম ও সমাজের বৃহৎ পটভূমিকায় ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা করে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন, "রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম-ভাবনা দেবেন্দ্রনাথ হইতে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত অদলবদল হইয়া একটি তথাকথিত হিন্দুব্যতিরিক্ত রূপ পরিগ্রহ করে।"[৪] অপরপক্ষে সুপণ্ডিত J. N. Farquhar সিদ্ধান্ত করেছেন, "The frequently repeated assertion that Brahmaism is the essence of all religions is without any basis. The Brahma system is drawn from Hinduism & Christianity."[৫]

এদিকে সাম্প্রদায়িক ঘাতপ্রতিঘাতের সংঘর্ষে কাহিল "কেশবচন্দ্র ১৮৬৮ খ্রীঃ হতে নিজের বাড়ীতে ভক্তদের নিয়ে খোল করতালসহ ব্রহ্মনাম সংকীর্তন চালু করেন। নগরকীর্তনও প্রবর্তিত হয়। সংবাদপত্রে নেড়ানেড়ীর দল বলিয়া চর্চা উঠিল" (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ পৃঃ ২৪৭)।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মন মুখ এক করা। সেসময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "কেশবকে বললাম, 'তোমরা হরিনাম করো, কলিতে তাঁর নামগুণ কীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হরিনাম ধরলেন।" (কঃ ৪।১৫।৪) নামগুণ-কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হ'ল শ্রদ্ধান্বিত সাধুসঙ্গ।

সদ্গুণের মহিমা অপরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "আমি একবার মিউজিয়মে গিছলুম, তা দেখালে ইট পাথর হয়ে গেছে। আনোয়ার পাথর হয়ে গেছে। দেখলে সঙ্গের গুণ কি।"

(কঃ ৪।১৫।১)

সদ্গুণ—বিশেষতঃ সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বুঝিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন শিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের মহোৎসবে, "এক ভাঁড় জল যদি আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শুকিয়ে যাবে। কিন্তু গঙ্গাজলের ভিতর যদি ঐ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো তাহলে শুকুবে না।" (কঃ ৪।পরিশিষ্ট)। কেশবচন্দ্রের সমাজ সংস্কারের বিশাল ব্যাপক কর্মসূচী, ব্রাহ্মদলের সংরক্ষণ ও পুষ্টি সাধন ইত্যাদি ব্যাপারে জড়িত থাকা সত্ত্বেও তাঁর ঈশ্বরপ্রাণিত মনবুদ্ধির ভাঁড় শ্রীরামকৃষ্ণরূপ গঙ্গাজলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখার ফলে ক্রমেই ঈশ্বররসে-রসসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

●

৪। যোগেশচন্দ্র বাগল : বাংলার নব জাগরণের কথা, (১৯৭০) পৃঃ ৭৮

৫। Encyclopedia of Religion & Ethics, Vol. II, p. 823

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ জীবনকথায় লিখিয়াছেন : 'তীর্থযাত্রা শেষ করিয়া বরাহনগর-মঠে যখন পৌঁছিয়াছি তখন সকল গুরুভাই আমাকে দেখিয়া আনন্দ করিতে করিতে জড়াইয়া ধরিল। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) মহারাজ আর কালীপ্রসাদ দুইজনের চক্ষেই আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল ; দুইজন দুইজনকে দেখিয়া আনন্দ করিতে লাগিল। শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) জিজ্ঞাসা করিল : 'কোথাছিলে কালী ভাই ?' আমি বলিয়াছিলাম : 'আমি তীর্থভ্রমণে ছিলাম'। এই কথা শুনিয়া শশী মহারাজ একান্ত আনন্দের সহিত বলিয়াছিল যে, সে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরাত্রিক, সেবা প্রভৃতি লইয়াই দিবারাত্রি কাটাইতেছে। শ্রীশ্রীগুরু-মহারাজই তাহার ধ্যান ও জ্ঞান। শুনিয়া কালিপ্রসাদ বলেন : 'শশী, আমাদের মধ্যে তুমিই যথার্থ ভাগ্যবান। তোমার উপর শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণা'। যাহাহউক কালী-প্রসাদকে দেখিয়া বরাহনগর-মঠের গুরুভাই সকলে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল। সকলে আনন্দসহকারে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। নিরঞ্জন মহারাজ ও তারকদাদা আসিয়া অতীতের শ্রীশ্রীঠাকুরের সংস্পর্শের কথা স্মরণ করিতে করিতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল'।

আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিবারই কথা ! অতীতের স্মৃতিপূর্ণ সেই আনন্দের দিনগুলির কথা শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদের স্মৃতিপটে চিরদিনই জাগরূক থাকিবে। কথাই তাই যে, অতীতের সেই স্মৃতি কি ভুলিবার জিনিস। শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সন্তান, শিষ্য ও ভক্তগণ আনন্দের হাট সৃষ্টি করিয়াছিল এবং সেই স্মৃতিকথার কিছু কিছু ভক্তপ্রবর অক্ষয় কুমার সেন তাঁহার 'শ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' ও 'শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা'—গ্রন্থদুটিতে এবং শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে অপরূপভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—যে স্মৃতিকাহিনীসমূহকে অবলম্বন করিয়া আজ বহু চিন্তাশীল লেখক-লেখিকা বিভিন্নভাবে শ্রীরামকৃষ্ণচরিত রচনা করিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহ ও ভালবাসা তাঁহার সন্তান, শিষ্য ও ভক্তগণের উপর যে কত গভীর ছিল তাহা শ্রীরামকৃষ্ণসন্তানদের লিখিত কাহিনী হইতে বিশেষভাবে বুঝিতে পারা যায়। আর এই কথা অতীব সত্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদের প্রায় সকলেই দক্ষিণেশ্বর-মহাতীর্থে উপনীত হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মসাধনা অর্থাৎ বিচিত্র ধরনের সাধনা তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করেন নাই বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত প্রায় দুই বৎসর বা তাহার কিছু অধিককাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া এবং দক্ষিণেশ্বরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে, কলিকাতায় ও কলিকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার্থিব ও মাধুর্যপূর্ণ লীলা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাহাছাড়া দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ছোট খাটটিতে

তখন সর্বদাই আনন্দের হাট বসিয়া থাকিত। কত রকম প্রকৃতির সাধক, ভক্ত, সমাজসেবক, লেখক, বক্তা, অভিনেতা ও অভিনেত্রী প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপার্ষদদের অনেকেই সেই সময়ে উপস্থিত থাকিয়া বিচিত্র প্রসঙ্গ, কথাবার্তা, আলোচনা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবসমাধি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিতেন এবং তাঁহাদের স্মৃতিসমূহ হৃদয়ে বহন করিতেন। ঐ সকল স্মৃতি বা স্মৃতিকথা চারণ করাই ছিল তাঁহাদিগের জীবনের সকল সময়ের সামগ্রী এবং সেই স্মৃতিসামগ্রী জাগরূক ছিল তাঁহাদিগের জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। সেইজন্য বলি যে, পরবর্তীকালে তাঁহাদিগের প্রেমমূর্তি আচার্যদেবের অন্তর্ধানের পরেও ঐ অতীতের স্মৃতিচারণাই তাঁহাদিগের জীবনধারাকে উজ্জ্বল ও আনন্দপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

যাহাই হউক, কালীপ্রসাদ যখন কাশী হইতে বরাহনগর-মঠে উপস্থিত হইলেন তখন ঐ মঠের অবস্থা একান্তভাবে অসচ্ছলতাপূর্ণ ছিল। কোনদিন কোন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার জন্য কিছু দিলে তবেই ভোগ দেওয়া হইত এবং যাহা পাঠাইতেন তাহাতে সকল গুরুভাইদের কোনরকমে একবেলা চলিয়া যাইত। শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যত দুঃখ-কষ্ট হোক, দিবারাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, আরাত্রিক, সেবা প্রভৃতি কার্য লইয়াই আপন মনে আত্মভোলা হইয়া থাকিতেন, আর পূর্বেই বলেছি যে, তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন সবই ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসেবা এবং তাহা করিতে পারিলেই তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া যাইত এবং তিনি আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেন।

বলিতে গেলে বহুদিন পরে কালীপ্রসাদ বরাহনগর-মঠে লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে সকলের মনই আনন্দে সর্বদা পূর্ণ হইয়া থাকিত। অবশ্য ঐ সময়ে কলিকাতার বহুস্থান হইতে বহু ভক্ত প্রায়ই বরাহনগর-মঠে আসিতেন এবং কালীপ্রসাদ তাঁহাদিগের সহিত কখনও শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন, আবার কোনদিন বা নিজে ধ্যান-ধারণা করিয়াই কাটাইয়া দিতেন। মনের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যতাই আসল কথা। প্রেমময় আচার্যদেবের আনন্দপূর্ণ স্মৃতি তাঁহার ও সকল গুরুভাইদের জীবনকে সর্বদাই প্রদীপ্ত করিয়া রাখিত। তবে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দ) অদর্শন তাঁহাদিগের মনকে ব্যাকুল করিত এবং আরও ব্যাকুল করিত অতীতের সেই দক্ষিণেশ্বর-তপোবনের বিদ্যোজ্জ্বল বিচিত্র ঘটনার স্মৃতি। তবে সকল দুঃখ ও অভাবঅনটনের মাঝেও তাঁহারা সকলেই অন্তরে জানিতেন যে, প্রেমময় গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহাদিগের সঙ্গে ছায়ার মতো রহিয়াছেন, সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন, জীবনের সকল সময়ে জাগ্রত প্রেরণা দান করিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই ধরনের কথাই বহুবার তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, সম্পদে-বিপদে—সুখে-দুঃখে সর্বদাই তিনি তাঁহার সন্তানদিগের পশ্চাতে থাকিবেন। তাঁহার সন্তানগণও তাহা অন্তরে সর্বদাই অনুভব করিতেন।

●

॥ জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের কুলগুরু ॥

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে মাতৃসাধনা সমগ্র অধ্যাত্মজগতে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি করে পৃথিবীর এক বিপুল কল্যাণ সাধিত করল, ধর্মবোধ এবং ধর্মচেতনার এক নতুন সংজ্ঞার সৃষ্টি করে মানুষকে পূর্ণতা, সফলতা, সার্থকতার সন্ধান দিল, অসংখ্য দ্বিধা-সংশয়-অস্পষ্টতার নাগপাশ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে গভীর প্রত্যয়ে প্রদীপ্ত এক আলোকোজ্জ্বল মানসিকতায় সমুদ্ভাসিত করে তুলল সেই মাতৃসাধনার সর্বপ্রথম যিনি ঋত্বিকের ভূমিকা নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনবৃত্তে তিনি এক অবশ্য স্মরণীয় নাম। তান্ত্রিকাচার্য সাধক শিরোমণি কেনারাম ভট্টাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দীক্ষাদাতাই শুধু নন, বংশের কুলগুরুও।[১] সে দিক দিয়েও তিনি এক বিশেষ উল্লেখের অধিকারী।

বাংলা ১২৪৯ সালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অগ্রজ রামকুমারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম পদার্পণ করলেন এবং পরে সেখানে রাধাগোবিন্দের মন্দিরে পূজারী হিসেবে নিযুক্ত হলেন। রামকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে শেখাতে লাগলেন চণ্ডীপাঠ, কালীমাতা ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজার বিধিনিয়ম, বিস্তীর্ণ অনুশাসনের রীতিনীতি। শ্রীরামকৃষ্ণ অচিরেই শিখে ফেললেন সবপূজাবিধি। কিন্তু রীতিপদ্ধতি যতই বিশুদ্ধ হোক, দীক্ষাগ্রহণ না করলে শক্তিপূজায় প্রকৃষ্ট অধিকার হয় না জেনে শ্রীরামকৃষ্ণ দীক্ষিত হতে কৃতসংকল্প হলেন। সহোদরের সৎ সংকল্পে সাগ্রহে সম্মতিদান করে রামকুমার বৈঠকখানা বাজারে উপস্থিত হলেন তাঁদের কুলগুরু কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে। কেনারাম দীক্ষার দিন স্থির করে দিলেন।

সাধক জীবনের পরম সম্পদ ইষ্টমন্ত্র লাভ হবে, তাই আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমানন্দে বিভোর। শিষ্যের পারমার্থিক কল্যাণ-কামনায় আচার্য কেনারাম যখন দক্ষিণেশ্বরে এসে বিধি অনুরূপ পূজার্চনাদি শেষ করে মন্ত্রদান মানসে তাঁকে তাঁর আসন-সমীপে উপবিষ্ট হতে আদেশ করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের মুখমণ্ডল তখন এক অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল এবং দিব্য ভাবাবেশে তখনি তাঁর বাহ্য-চৈতন্য বিলুপ্ত হয়ে গেল। শক্তিমন্ত্রের এরকম প্রত্যক্ষ প্রভাব, আদানের এরূপ আশ্চর্য পরিণাম পূর্বে কখনও কেনারামের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তাই তাঁর বিস্মিত-নেত্র একাগ্র হয়ে শিষ্যের মুখমণ্ডলে নিবিষ্ট হয়ে রইল এবং শ্রীরামকৃষ্ণ পুনঃ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হলে তিনি হৃদয়ের কপাট উন্মুক্ত করে অজস্র শুভাশীর্বচনে তাঁকে অভিষিক্ত করলেন। এটা হল বাংলা ১২৬২ সালের কথা।

১২৭৮ সালে শ্রীমা সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে আগমন করলেন। তখন থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশানুসারে তাঁর সাধন-জীবন ক্রমশঃ গভীরতর হয়েছিল এবং ঐতিহাসিকের মতে, ১২৬২ সাল থেকে ১২৭৮ সাল—এই ১৬ বৎসরের মধ্যে কেনারামের জীবনেও নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। তিনি এই সময়ের মধ্যেই নানা তীর্থ এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন।

১। কালীপদ ভট্টাচার্যের 'ঘাটাল ব্রাহ্মণ কুল তত্ত্ব' গ্রন্থ।

তীর্থদর্শনবাসনা তাঁর মনে সর্বদাই জাগরূক ছিল। তাঁর হৃদয়ে ত্যাগ-বৈরাগ্য উদিত হলে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে 'স্বামী পূর্ণানন্দ'রূপে আবির্ভূত হন।

গৈরিকধারী সন্ন্যাসীবেশ, মোটাসোটা, শান্ত, বৃদ্ধ অথচ সুপুরুষ কেনারাম ওরফে স্বামী পূর্ণানন্দ মহাকালীর দর্শন ইচ্ছায় একসময় দেশে ফিরলেন। শ্রীমা সারদাদেবীও বোধহয় তাঁরই প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য করে অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি আসনে উপবেশন করলেন। এক অনির্বচনীয় অপূর্বভাবে তাঁর বুক দুর্ দুর্ করে কাঁপতে লাগল। অনন্তর গুরুদেব তাঁর পদ্মহস্ত শিষ্যার মস্তকে স্থাপন করলেন এবং তাঁকে কয়েকটি গুহ্য কথা জিজ্ঞেস করলেন। শিষ্যা শ্রীমা ওই বিষয়ে উত্তরও দান করলেন যথাসাধ্য। গুরু তাঁর কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করলেন মহাবীজমন্ত্র। শিষ্যাও উচ্চারণ করলেন তিনবার। অনন্তর সাধনা সম্বন্ধে সামান্য উপদেশ প্রদান করে স্থির হয়ে অনিমেষ নয়নে শিষ্যার নয়নপানে কিছুক্ষণ কাটালেন গুরু। শিষ্যার মন এখন স্তব্ধ। একাগ্র এক অনির্বচনীয়ভাবে তিনি স্থির হয়ে রইলেন। এভাবে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন রামেশ্বর কন্যা লক্ষ্মীদেবীকেও।

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য্য ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত ও উচ্চাঙ্গের সাধক। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দীক্ষাদাতা ছিলেন কিন্তু প্রকৃত কুলগুরু ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে জীবনী-রচয়িতাগণ তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন নি। বর্তমানকালের কোন ঐতিহাসিক বা গবেষকও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসেননি। শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীপার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখাৎ শ্রীবৈদ্যনাথ লাহা মহাশয় বহুবার শুনেছিলেন 'কেনারামই আমাদের কুলগুরু'। কেনারাম ভট্টাচার্য্যের কন্যার নাতবৌ শ্রীমতী জয়ন্তীদেবীর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের কুলগুরু বংশ, তাই দক্ষিণেশ্বরের ওরা বার্ষিকী পাঠাতেন, খোঁজখবর রাখতেন। মা সারদাও আমাদের বাড়ীতে এসেছেন'। বাংলার এই অসাধারণ মহামানবের পরিচয় সম্বন্ধে যতদূর তথ্য সংগ্রহ করা গেছে, এখানে সেটুকুই আলোচিত হল।

আনুমানিক বাংলা ১১৯৬-৯৮ সালের কোনোসময়ে ভট্টাচার্য্য কেনারাম জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মভূমি কামারপুকুরের তিন মাইল উত্তরে বেলাই গ্রামের ভট্টাচার্য্য পাড়ায় তাঁর পৈতৃক বাসস্থান ছিল।[১] এ যাবৎ কেনারামের জন্মস্থান কোথায় ছিল তা জানার বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়নি। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এই স্থানটিই নাকি তাঁর পুণ্যজন্মভূমি। বাল্যকাল থেকেই কেনারামের জীবনে ধর্মস্পৃহা ও বৈরাগ্যের আভাস পাওয়া যেত। তিনি আপনমনে দেবপূজাদিতে নিত্যরত থাকতেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন ৺কালীভক্ত। নিষ্ঠাবান পরিবারে জাত বালক কেনারাম বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রসাধনাদিতে রত হন এবং উপনয়নের পরে স্বপাক ভোজন, গীতা-উপনিষৎ পাঠ এবং পূজা ও ধ্যানাদিতে মনোনিবেশ করেন।

কেনারাম ভট্টাচার্য্যের জীবনের অনেকখানিই অতিবাহিত হয়েছিল বেলাই ভট্টাচার্য্য-পাড়ায়। সে সময় এখানটি ভট্টাচার্য্যপাড়া ছিল না। কেনারাম ও অন্যান্য ভট্টাচার্যদের বসবাসের

১। 'কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থ।

জন্যেই এই নামকরণ। স্থানটি ছিল সংস্কৃত-সংস্কৃতির পীঠস্থান। এখানে বাদশ শিবালয় এবং বাইশটি চতুষ্পাঠী ছিল। পণ্ডিতেরা বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন। পণ্ডিতদের মধ্যে গদাধর তর্কালংকার, যদুনাথ সার্বভৌম, তারানাথ কাব্যরত্ন, সূর্যকান্ত বিদ্যারত্ন, অবিনাশ তর্করত্ন, বৈদ্যনাথ বিদ্যারত্ন প্রমুখ তৎকালীন বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতদের এখানে বাস ছিল। পণ্ডিতাগ্রগণ্য গদাধর তর্কালংকার ছিলেন কেনারামের নিকট আত্মীয়। তিনি লেখাপড়া শেখেননি বটে, তবে সিদ্ধিলাভ করে অপ্রত্যাশিতভাবে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন এবং বহু বড় বড় পণ্ডিতদের তিনি পরাজিত করতেন। তিনি সম্ভবতঃ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের সমসাময়িক ছিলেন। কেনারাম এখানকার চতুষ্পাঠীগুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং এই সময়ই তিনি জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সম্ভবতঃ ১২০০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর বাসস্থানের সন্নিকটে পঞ্চমুণ্ডবেদীর উপর মহাকালীমাতার মূর্তিসহ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

গদাধর ও কেনারামের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও খ্যাতি কি ধরনের ছিল, সে সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। তখনকার দিনে এদেশে শুধুমাত্র রাজাদেরই লড়াই হত না। বড় বড় পণ্ডিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা নিয়ে লড়াই করতেন। তাতে বড়-ছোট নির্ণীত হত। কেনারাম ও অগ্রজ গদাধরের খ্যাতি শুনে বর্ধমান রাজসভা থেকে জনৈক পণ্ডিতবর এলেন ভট্টাচার্যপাড়ায়। বহু পণ্ডিতকে শাস্ত্র ব্যাখ্যায় হারিয়ে ওঁরা দিগ্বিজয়ী হয়েছেন, এবার এঁদেরকে জয় করতে পারলেই ওঁদের সম্মান আরও বাড়বে। তাই ওঁদের সভায় এঁদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে এলেন। বাদশ শিবালয়ে শিবের মাথায় মাথায় জবাফুল দেখে পণ্ডিতদ্বয় একেবারে হতবাক। 'মন্দিরে কে পূজা করে'? প্রথমজনের গুরুগম্ভীর প্রশ্ন। উত্তর এল, 'গদাধর পণ্ডিত আর কেনারাম ভট্টাচার্য'। পণ্ডিতদ্বয় উত্তেজিত অবস্থায় বললেন, 'আমরা ওঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। শিবকে জবা দিয়ে পূজা চলে না, তা বলিব'। লোকটি গদাধরের অন্ধপরিচর্যাকারী। সে বললে, ক্যানে চলে নে পণ্ডিতমশাই? এখেনে গঙ্গাদেবীকে পূজো করা হয়েচে, শিবকে তো লয়। শিবের মাথায় গঙ্গা যে'। পণ্ডিতদ্বয় তো একেবারে স্তব্ধ, বিস্মিত। ভাবতেই পারলেন না, মূর্খ লোকটির যদি এত বিদ্যে, তাহলে এখানকার পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য কতখানি। তাই ভীত, লজ্জিত ওঁরা সাক্ষাৎ না করেই চম্পট দিলেন।

সম্ভবতঃ এই ঘটনার কিছুকাল পরেই অজ্ঞাত কারণে কেনারাম বৈঠকখানা বাজারে চলে আসেন। অনুমান এরই মধ্যে অগ্রজ গদাধর দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পুত্রদ্বয় হরচূড়ামণি ও সুরেন্দ্র চতুষ্পাঠীগুলি পরিচালনা করতেন। কিন্তু এঁদেরও লোকান্তরে চতুষ্পাঠী-গুলি উঠে যায়। শিবালয়গুলিও সংরক্ষণের অভাবে ধ্বংস হয়। কয়েক বৎসর আগে কিছু স্থানে খননের ফলে বেশ কয়েকটি শিবলিঙ্গের সন্ধান মিলেছিল। মূর্তিগুলি সুপ্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যে তাঁর বাল্য বন্ধুদের সঙ্গে বেলাই গ্রামের গুরুবাড়ীতে বেড়াতে আসতেন এবং মা'কে নির্নিমেষনেত্রে তাকিয়ে দেখতেন। এইসময় তাঁর কালীমূর্তি দর্শনের একটা

আকুলতা ছিল। মুখে অস্ফুট ভাবের সমাবেশ হয়ে উঠত। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বলতেন, 'মা! তুই হাসছিস্? আমাকে দেখে হাসছিস? মা'। ভাবাবেশে নীরব হয়ে যেতেন।[৩] বলাবাহুল্য, শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যের দিব্যোন্মাদকালে সারা কামারপুকুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এছাড়া দ্বিতীয় কোনো কালীমন্দির ছিল না, আজও নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক মহাত্মা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় তাঁর অতীষ্টদেব কেনারাম ভট্টাচার্যের বাড়ীতে আসতেন। একবার কুলগুরু-বাড়ী থেকে ফেরার পথে তিনি অতি আশ্চর্য উপায়ে রঘুবীর শিলামূর্তিটি লাভ করেছিলেন।[৪] ঘটনাটি একাধিক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে বটে, কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে কুলগুরু কেনারামের বাড়ী থেকে ক্ষুদিরামের গৃহপ্রত্যাবর্তনের ইতিহাসটি যে বর্তমান, তা কারো বোধহয় জানা ছিল না। রামকুমারও এখানে আসতেন। সম্ভবতঃ তিনি এখানকার চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কালে কুলগুরু কেনারামের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন।[৫]

কেনারাম কোনোসময়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বটে কিন্তু একমাত্র কন্যার জনক ছিলেন। গ্রাম ছেড়ে এসে তিনি কলকাতার বৈঠকখানা বাজারে একটি ভাড়া বাড়ীতে বাস করতেন। তিনি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমনির দেবালয় দর্শনে আসতেন।[৬] এই সময়ই রামকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করান, পরে শ্রীমা সারদাদেবীও দীক্ষিত হন। এখানে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন—জীবনীতে আছে, শ্রীসারদাদেবী স্বামী পূর্ণানন্দের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু দীর্ঘদিনের গবেষণায় জেনেছি, কেনারাম ভট্টাচার্যই পরবর্তীকালে পূর্ণাভিষিক্ত হয়ে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে শ্রীমা সারদাদেবী ও অন্যান্যদের দীক্ষিত করেছিলেন।

মন্ত্রদাতা গুরু এক, তবে উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যেতে পারে—এ বিষয়টি শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সময়ে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলে বুঝিয়ে বলতেন। শ্রীমা সারদাদেবীও তাঁর ভক্তদের মন্ত্রদীক্ষিত করবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করতেন, তাঁদের কুলগুরু আছেন কিনা? এক ভক্তকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে মন্ত্র দিলে কুলগুরু চটে যাবেন, কুলগুরু চটলে আমার মেয়েরই তো অমঙ্গল হবে, বাবা। তুমি আমাকে গুরু জ্ঞান কর।[৭] বলাই বাহুল্য,

---

৪। ১৩৭০ সালে প্রকাশিত শ্রীতারাপদ চট্টরাজের প্রচারপত্র।

৫। 'কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থ।

৬। লীলাপ্রসঙ্গে পাওয়া যায়, রামকুমার শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। মন্ত্রদাতা গুরু এক এবং কুলগুরু বংশে দীক্ষা নেওয়াটাই হল রীতি। সুতরাং নিশ্চিত করা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জনক ক্ষুদিরাম ও অগ্রজ রামকুমার কোনসময়ে এই তান্ত্রিকের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। স্বামী সারদানন্দজীও তাই লিখেছেন, 'ঠাকুর আপন পরিবারবর্গের প্রত্যেককে এক সময়ে বিষ্ণুমন্ত্রে ও শক্তিমন্ত্রে উভয় মন্ত্রেই দীক্ষা গ্রহণ করিয়েছিলেন'।

৬। লীলাপ্রসঙ্গ থেকে জানা যায়, দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁর যাতায়াত ছিল এবং মথুরবাবু প্রমুখ সকলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে ইনি পূর্বপরিচিত ছিলেন।

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদাদেবী' গ্রন্থ।

দীক্ষাদাতা গুরু সম্বন্ধে শ্রীমার উদার দৃষ্টি এবং দীক্ষাদান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট উক্তি থেকে নিঃসংশয়ে এটা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম দীক্ষাদাতা ও কুলগুরু ছেড়ে অপর এক তান্ত্রিকের কাছে দীক্ষা নেন নি।

কেনারাম ভট্টাচার্যাই যে স্বামী পূর্ণানন্দ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারি আরো কয়েকটি কারণে। সম্প্রতি একটি প্রাচীন পুঁথির এক কোণে পাওয়া গেছে পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য ওরফে কেনারামের নাম। অনুমান এটি কেনারামের স্বহস্তে লিখিত। এটি উদ্ধার করেছেন বেলাই গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-কুলগুরু প্রতিষ্ঠিত মহাকালী মন্দিরের পূজারী ও কেনারামের জ্ঞাতি শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নব্বই পঁচানব্বই বছর আগেকার বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা দেখেছেন, শ্রীমা সারদাদেবী পায়ে হেঁটে বেলাই গ্রামে গুরু বাড়ীতে আসতেন, কালীমাতার পূজা দিতেন নিয়মিত মুড়কি-বাতাসা দিয়ে। কেনারামের কন্যার নাতবৌ শ্রীমতী জয়ন্তীদেবীর মুখ থেকে শুনেছি, তিনি কতবার শ্রীমার সঙ্গে গল্প করেছেন এই মন্দিরে বসে। এখানেও অনুমিত হয় স্বামী পূর্ণানন্দই কেনারাম এবং তিনিই কুলগুরু।

কেনারাম শ্রীমা সারদাদেবীকে দীক্ষাদানের পর সম্ভবতঃ বেশীদিন জীবিত ছিলেন না। তাই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীকারগণ তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানার অবকাশ পান নি। লীলাপ্রসঙ্গে আছে, 'শ্রীযুত কেনারাম ভট্টাচার্য্য ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না। কারণ ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই'।

শ্রীরামকৃষ্ণের ৺ষোড়শী পূজার পূর্বে কিংবা পরে অর্থাৎ বাংলা ১২৭৯-৮০ সাল নাগাদ কেনারাম লোকান্তরিত হন বলে অনেকের অনুমান। কেনারাম অপুত্রক ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর কন্যার বংশধররা আজও বর্তমান। বর্তমান সেই ঐতিহ্যময়ী মহাকালীমন্দিরটিও। অনুমান করা হয়, মহাকালী-মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে একদা কেনারামের বসতবাটী বিদ্যমান ছিল। খুবই পরিতাপের বিষয়, কেনারামের বৈঠকখানা বাজারের ভাড়াবাড়ী ও বেলাই গ্রামের বসতবাটীর আজও কেউই সন্ধান নেন নি। একদিকে যেমন পর্যটকদের কাছে এই দুটি স্থান ও মন্দির অজ্ঞাত রয়ে গেল, তেমনি অপরদিকে শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতেও আচার্য্য কেনারাম ভট্টাচার্য্য তর্কালংকার যথাযথের জন্যে উপেক্ষিত হয়ে রইলেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

(তিন)

লীলাবার্তা :

[ঠাকুরের সঙ্গীত ও সমাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণদেব কথাপ্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আরও বহু তত্ত্ব-কথা শোনান এবং সেই সমস্ত প্রসঙ্গে নানা মনোহর উপমারও অবতারণা করেন। অধিকন্তু তিনি সেই সমস্ত তত্ত্বালাপন-কালে বিদ্যাসাগরকে সেই সেই ভাবানুরূপ অনেকগুলি সঙ্গীতও শোনান এবং সেগুলির বিশেষ বিশেষ কলির গূঢ় মর্মও বিশ্লেষণ করেন। সেই সঙ্গীতগুলি—

(১) কে জানে কালী কেমন ?
ষড়্দর্শনে না পায় দরশন ।

(২) আমি দুর্গা দুর্গা ব'লে মা যদি মরি।
আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে,
জানা যাবে গো শঙ্করী ॥

(৩) মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে, ভক্তি-রসের রসিক ; সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥

(৪) ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
(ও সে) যেমন ভাব, তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয় ॥

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ঠাকুর তৃতীয় গানটি গাইতে গাইতে ভাবের প্রাবল্যে গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হন এবং ঐ মহোচ্চ অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ থাকেন।

এ-প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় 'কথামৃত'-কারের বিবৃতি—"গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন। হাত অঞ্জলিবদ্ধ। দেহ উন্নত ও স্থির। নেত্রদ্বয় স্পন্দহীন। সেই বেঞ্চের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া এই অদ্ভুত অবস্থা দেখিতেছেন। পণ্ডিত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টে দেখিতেছেন।"

"ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার সহাস্যে কথা কহিতেছেন।"

...

"সকলে অবাক্ ও নিস্তব্ধ হইয়া এইসকল কথা শুনিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ বাগ্‌বাদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের জিহ্বাতে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা কহিতেছেন।

[বিদ্যাসাগরকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন*]

"[ঠাকুরের] কথাবার্তা শুনিয়া সকলে আনন্দিত। সকলে একটু চুপ করিয়াছেন। ঠাকুর আবার বিদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কহিতেছেন।"

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।'

"বিদ্যাসাগর—'যাব বই কি। আপনি এলেন, আর আমি যাব না!'

"শ্রীরামকৃষ্ণ—'আমার কাছে? ছি! ছি!'

"বিদ্যাসাগর—সে কি! এমন কথা ব'ল্‌লেন কেন?- আমায় বুঝিয়ে দিন।'

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'আমরা জেলেডিঙ্গি (সকলের হাস্য)।' 'খাল, বিল, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়!' (সকলের হাস্য)।

"বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর হাসিতেছেন।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)—'তারমধ্যে এখন জাহাজও যেতে পারে।'

"বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)—'হাঁ, এটি বর্ষাকাল বটে।' (সকলের হাস্য)।

"মাষ্টার (স্বগতঃ)—'নবানুরাগের বর্ষা। নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ থাকে না বটে!"

[ঠাকুরের বিদায় গ্রহণ]

কথাবার্তায় দীর্ঘক্ষণ মহানন্দে অতিবাহিত হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা বাজলে, শ্রীশ্রীঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি গাত্রোত্থান ক'রলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং উপস্থিত অন্যান্য সকলে দণ্ডায়মান হন।

বিদ্যাসাগর তাঁকে গাড়িতে তুলে দেওয়ার জন্য হাতে বাতি নিয়ে স্বজনগণের সঙ্গে প্রস্তুত। কিন্তু তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ একইভাবে দণ্ডায়মান রয়েছেন। তিনি মূলমন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে ভাবস্থ হ'য়ে পড়েছেন।

"অহেতুক কৃপাসিন্ধু! বুঝি যাইবার সময়, মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা করিতেছেন!"

তারপর ঠাকুর জনৈক ভক্তের হাত ধ'রে ধীরে ধীরে অবতরণ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় হাতে আলো নিয়ে স্বজনগণের সঙ্গে তাঁকে পথ দেখিয়ে আগে আগে যান। ঠাকুর ফটকের নিকট উপস্থিত হ'লে ভক্তবর বলরাম বসু ঐ রাজপথে ভূলুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁকে প্রণাম করেন। সেখানে বলরামের সঙ্গে দু'একটি কথা ব'লে ঠাকুর ঘোড়াগাড়িতে ওঠেন।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় মৃদুস্বরে মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন,—'ভাড়া কি দিব?' মাষ্টার বিনীতভাবে জানান—'আজ্ঞা না, ও হ'য়ে গেছে।'

---

* বর্তমান উপনিবেশাধার যাবতীয় উপকরণ 'কথামৃত' (পরিশিষ্ট। ১ম খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত।

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে নমস্কার করেন। ঠাকুর সহাস্যবদনে একদৃষ্টে বিদ্যাসাগরকে দেখতে থাকেন। গাড়ি রওয়ানা হ'য়ে যায়।

"গাড়ি উত্তরাভিমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাইবে। এখনও সকলে [বিদ্যাসাগর প্রভৃতি] গাড়ির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বুঝি ভাবছেন, এ মহাপুরুষ কে? যিনি ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর যিনি জীবের ঘরে ঘরে ফিরছেন, আর ব'লছেন—ঈশ্বরকে ভালবাসাই জীবনের উদ্দেশ্য।"*

[সমকালীন পত্রিকার বিবরণী]

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরমহংসদেবের এই মিলনের সংবাদ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন 'The New Dispensation' (দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেস্‌ন) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সংবাদ বাংলা ভাবানুবাদসহ নিম্নে পরিবেশিত হ'ল :

Two Great Minds †

"The Venerable Paramhansa lately paid a visit to the eminent philanthropist and scholar, Vidyasagar. Why did he call? What earthly or unearthly advantage did that recluse expect from such a visit? His curiosity to see distinguished men is most ardent. He is ever asking his friends to show him great things, and in this he is at times most importunate.....

Curiosity alone, deep and impulsive, led the devotee of Dakhineswar to Vidyasagar's house in Calcutta. No prospect of earthly good actuated him.

Eminent sage, said the devotee, I come as a little muddy stream into the vast deep sea ['sagar'].

Yes, replied Vidyasagar, but you must remember, venerated sir; that the sea is full of salt water, and if a fresh water stream mixes with it, it too becomes salt, and loses all its sweetness.

It is not avidya sagar, which indeed is to be shunned, but Vidya sagar that draws me into its welcome waters;—was the rejoinder.

But the sea hath its dangers and perils, said Vidyasagar, and thousands of monsters hide themselves in its treacherous waters.

---

* 'কথামৃত'-এর। ১ম খণ্ড থেকে যাবতীয় বিবরণী পরিবেশিত।

† "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস" (১৯৭৪), পৃঃ ২৮-২৯ থেকে উদ্ধৃত।

Are there not pearls in the deep water of the sea? In search of those pearls I am here. The sea is famous for its hidden treasures. Great is your value, Vidyasagar. So said Paramhansa."

—The New Dispensation September 3, 1882

[দুই মহাত্মা]

ভক্তিভাজন পরমহংসদেব সম্প্রতি প্রখ্যাত জনহিতৈষী ও সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। কেন তাঁর এই সাক্ষাৎকার? সেই সর্বত্যাগী এ-হেন মিলনে পার্থিব কিংবা অপার্থিব কী লাভ আশা করেন? মহানুভবগণের প্রতি পরমহংসদেবের অন্তরে তীব্র অনুরাগ নিহিত, দেখা যায়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকারলাভের জন্য তাঁর ব্যগ্রতা প্রবলতম। বরাবরই তিনি তাঁর সুহৃদ্‌দের বিশিষ্ট জিনিসগুলি তাঁকে দেখানোর জন্য অনুরোধ ক'রে থাকেন। ইদানীংকালে ঐ বিষয়ে তিনি নিতান্তই ব্যগ্র।

কেবলমাত্র সেই গভীর ও আবেগপূর্ণ ব্যগ্রতাই দক্ষিণেশ্বরের ভাগবত পুরুষকে ক'লকাতায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে উপনীত হ'তে অগ্রবর্তী করে। বস্তুতঃ, কোনও ঐহিক সুযোগ-লাভের সম্ভাবনা তাঁকে ঐ কাজে প্রবৃত্ত করে নি।

ভাগবত পুরুষ (বিদ্যাসাগরকে) বলেন—ওগো বিখ্যাত পণ্ডিত। আমি কর্মনাক্ত এক ক্ষুদ্র প্রবাহিণী। আজ বিশাল গভীর সাগরে এসে মিলিত হ'লাম!

উত্তরে বিদ্যাসাগর বলেন—হাঁ, সম্মানীয় মহাশয়। কিন্তু আপনার অবশ্যই মনে আছে যে, সাগর লবণাক্ত জলে পরিপূর্ণ। এরসঙ্গে স্বচ্ছ স্রোতধারা এসে যদি মিলিত হয়, তা'হলে সেও লবণাক্ত হ'য়ে ওঠে এবং তার নিজের সমস্ত মাধুর্য হারিয়ে ফেলে।

প্রত্যুত্তরে ভাগবতপুরুষ বলেন—ওগো, এ অবিদ্যার সাগর নয়, যা অবশ্যই পরিহার্য। কিন্তু এযে বিদ্যার সাগর। এর সমাদরপূর্ণ জলরাশি আমাকে আকৃষ্ট ক'রে এখানে নিয়ে এসেছে।

বিদ্যাসাগর বলেন—কিন্তু সাগর যে মহা ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল। হাজার হাজার বিকটাকার জন্তু এর মারাত্মক জলে লুকিয়ে রয়েছে।

পরমহংসদেব বলেন—সাগরের অগাধ জলের তলদেশে কি মুক্তারাশি নেই? সেই সমস্ত মণি-মুক্তার সন্ধানে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি। সাগর তো তার গুপ্ত ধন-রত্নের জন্যই বিখ্যাত। ওগো, বিদ্যাসাগর। তোমার মহিমা বিশাল।—দি নিউ ডিস্‌পেন্‌সেসন্।

সেপ্টেম্বর ৩, ১৮৮২

ক্রমশঃ

॥ পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(তিন)

পরম শুদ্ধচৈতন্যের সঙ্গে মিলনই হচ্ছে বেদান্তের মূল রাগিণী। বেদান্ত ঘোষণা করে, ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই মানবজীবনের চরম পরিণতি। আমাদের ব্যক্তি-সত্তার এটাই হচ্ছে শেষ কথা। সত্যানুসন্ধানের এটাই চরম লক্ষ্য। এই একাত্মতা লাভের পর কী হয়, নীচের শ্লোকটিতে তা' বর্ণনা করা হয়েছে—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মানুষ যখন সেই একাত্মতায় পৌঁছায় তখন তা'র সমস্ত বাসনাগ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায়, চিরকালের জন্য সমস্ত সংশয় দূর হয়, সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা হয়, মানুষ তার সমস্ত কর্ম আর কর্মফল অতিক্রম করে।

কিন্তু কী ভাবে এমন একাত্মতা বা স্বাধীনতা লাভ করা যায়? এ সম্পর্কে বেদান্তের উত্তর হচ্ছে, ব্রহ্মকে যথাযথ জ্ঞাত হলেই, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলেই আমরা ব্রহ্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, আর তা'র ফলেই নিঃশর্ত স্বাধীনতা লাভ হয়। দিবালোকের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রাত্রির অন্ধকার দূর হয়, তেমনি জ্ঞানালোকের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাপ্রত্যয় দূরে চলে যায়।

বেদান্ত বলেছে, এই বিশ্বজগৎ হচ্ছে মায়ারই ব্যক্ত মূর্তি। জগতের ঘটনাবলী ব্রহ্মসমুদ্রের তথাকথিত তরঙ্গ ছাড়া আর কিছু নয়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমরা বেঁচে থাকি, বিচরণ করি,—ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সত্তা। এই নাম-রূপসমূহ মায়া বা অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নয়। নাম-রূপই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ—"নামরূপাদ্ধবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা"। বস্তুতঃ একমাত্র নামরূপের জন্যই ব্রহ্মকে বিভিন্ন বলে মনে হয়; কিন্তু আসলে ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং অদ্বিতীয়—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। পঞ্চদশীতেও আছে,—"নামরূপোপাধিমেদং বিনা নৈব সতো ভিদা।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম কখনও স্থান-কাল দ্বারা প্রভাবিত নয়। পরিবর্তনশীল প্রপঞ্চময় পৃথিবী মধ্যে ব্রহ্ম অপরিবর্তনীয়। পঞ্চদশীও বলেছে—

প্রবহত্যপি নীরেঽব স্থিরা প্রৌঢ়া শিলা যথা।
নামরূপাস্তথাদ্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নাস্তথা॥

কোনও তটিনী যেমন প্রকাণ্ড প্রস্তরকে স্থানচ্যুত করতে পারে না, ব্রহ্মও তেমনি নামরূপের পরিবর্তনের মধ্যে নির্বিকার থাকে। ব্রহ্মই হচ্ছে নামরূপের ভিত্তিভূমি। ব্রহ্মের সমর্থন ছাড়া নামরূপের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। পঞ্চদশীতে বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে—

নিশ্চিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ৎ।
সচ্চিদ্ঘনে তথা নানাজগদ্গর্ভমিদং বিয়ৎ॥

দর্পণে যেমন প্রতিটি বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তেমনি নামরূপধারী যাবতীয় বস্তু ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুকণা হচ্ছে নামরূপ দ্বারা বিকৃত ব্রহ্ম। বেদান্তে এই ব্রহ্মদর্শনকে বলা হয় সম্যগ্‌দর্শন। বিচার এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মোপলব্ধি দ্বারাই এই সম্যগ্‌দর্শন লাভ করা যায়। বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পঞ্চদশীতে বলা হয়েছে—

ব্রহ্ম যদ্যপি শাস্ত্রেষু প্রত্যক্‌ত্বেন বর্ণিতম্।
মহাবাক্যৈ স্তথাপ্যেতৎ দুর্বোধমবিচারিণঃ॥

যদিও মহাবাক্যগুলিতে,—অর্থাৎ বেদের সুমহান্ বাণীগুলিতে জীবকে ব্রহ্ম বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তথাপি যারা বিচার করে না,—বস্তু (জড়) ও চৈতন্যের যথার্থ বিশ্লেষণ করে না, তাদের পক্ষে এ জিনিস বুঝা খুব কঠিন।

এ সকল মহাবাক্য কী? সেগুলির অর্থই বা কী? বেদান্তের মূল ভাবসমূহ যে সকল বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে, সেগুলিকেই মহাবাক্য বলে। পঞ্চদশীতেও মহাবাক্য আছে। সেখানে সেগুলিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মহাবাক্য চারটি—

(১) তত্ত্বমসি,—তৎ মানে "তিনি" অর্থাৎ ব্রহ্ম এবং জীবকে বলা হয়েছে ত্বম্ অর্থাৎ "তুমি"। কাজেই তৎ-ত্বম্-অসি কথার অর্থ—তিনিই তুমি বা আত্মাই ব্রহ্ম।

(২) অহং ব্রহ্মাস্মি অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম।

(৩) অয়ং আত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ এই আত্মা বা জীবই ব্রহ্ম।

(৪) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম অর্থাৎ শুদ্ধ চৈতন্যই ব্রহ্ম।

পঞ্চদশীতে আছে—

যেনেক্ষতে শৃণোত্যুদ্যং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদূ বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥
চতুর্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্মবাপ্যিহ॥
পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্যতে॥
অতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যাপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরানুনাদ্যমা তাদৃকত্বং তদিতীর্যতে॥
শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুরূপং ত্বং পদেরিতম্।
একতা গৃহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥
স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বমস্যুক্তিস্তো মতম্।
অহংকারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥
দৃশ্যমানস্য সর্বস্য জগতস্তত্ত্বতীর্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥ সর্গ ৫, ১—৮

আমাদের বুদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত যে চৈতন্য বিদ্যমান, সেই চৈতন্যই আমাদের বাক্য, ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বাসনা প্রভৃতির উৎস। এ-কে প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে। পরমাত্মা বিভিন্ন প্রাণীর ভৌত দেহমধ্যে বিরাজমান থেকে তাদের হৃদয়বৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং আমার মধ্যেও পরমাত্মা আছে, আমার মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পরমচৈতন্যও বিদ্যমান। সুতরাং, আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি, পরমতত্ত্ব চৈতন্য ও প্রজ্ঞার সমন্বয়ই হচ্ছে ব্রহ্ম। পরমচৈতন্য প্রপঞ্চময় এই জগতের পরিচালনাধীন হয়ে ভৌত দেহমধ্যে সবকিছুর সাক্ষীরূপে বিরাজিত। যেহেতু সে ভৌতদেহের প্রপঞ্চময় পদার্থ দ্বারা পরিচালিত, সেজন্য তাকে আমরা আত্মা বলতে পারি। 'ব্রহ্ম' শব্দ দ্বারা নিত্য বিদ্যমান প্রধান আত্মাকে বুঝায়। 'অস্মি' শব্দ দ্বারা আমাদের ব্যক্তি-চৈতন্য ও প্রতিফলিত-চৈতন্য বুঝায়। সুতরাং ব্যক্তি-চৈতন্যকেই আত্মা বুঝায়। এ থেকে আমরা সহজেই সিদ্ধান্ত করতে পারি, যিনি প্রপঞ্চময় জগৎ অতিক্রম করেন, তিনিই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বে পরমাত্মা একাই বিরাজ করত। এখন সে সেই অবস্থাতেই বিদ্যমান। সুতরাং আমরা তাঁকে 'তৎ' বলতে পারি। আমাদের প্রতিফলিত চৈতন্যকে 'ত্বম্' বলা যায়। অতএব 'তৎ' ও 'ত্বম্' শব্দ দুটির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।—এইটি আমাদের জানতে হবে। প্রতিফলিত চৈতন্য স্বয়ংপ্রভ। এ-কে 'অয়ম্' বলা চলে। এই 'অয়ম্' বাসনা দ্বারা পরিচালিত হয় বলে 'অয়ম্'ও আত্মা হিসাবে পরিচিত। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে এই প্রতিফলিত চৈতন্যই আত্মা এবং 'অয়ম্' হিসাবে পরিচিত। ব্রহ্মই সবকিছুর উৎস, অর্থাৎ ভিত্তিভূমি। তিনি স্বয়ংপ্রভ। সুতরাং আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

সূত্রাকারে লিখিত মহাকাব্যগুলির মধ্যেই বেদান্ত দর্শনের মূল সত্য বিধৃত হয়েছে। পঞ্চদশীতে আরও আছে—

দেহাত্মাত্মত্ববিভ্রান্তৌ জাগ্রতাং ন হঠাৎ পুমান্।
ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীত্বতঃ॥

যতকাল আমাদের মধ্যে দেহাত্মভ্রান্তি থাকবে, অর্থাৎ আমরা এই দেহকেই আত্মা বলে ভুল করব, ততকাল আমাদের পক্ষে আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভূতি অসম্ভব। কেবলমাত্র বিচার দ্বারাই আমরা এই ভ্রান্তি বা অসত্য জ্ঞানের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি। পঞ্চদশীর শিক্ষা অনুযায়ী আমরা জানতে পারি যে সম্যগ্‌দর্শনলাভের প্রধান উপায়ই হচ্ছে বিচার। পঞ্চদশী বলেছে—

সদা বিচারয়েত্তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।
জীবভাবজগদ্ভাববাধে* স্বাত্মৈবশিষ্যতে॥

●

* "বাধ" শব্দটি দ্বারা প্রতিটি বস্তুর নশ্বরতা জেনে তাদের "মিথ্যা প্রতিপাদন" বুঝায়, জ্ঞানহীনতা" বা "তাদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিস্মরণ" বুঝায় না—"নাপ্রতোষিতমোহাদঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।" এই যদি হয়, তবে মানুষ গভীর সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছার মুক্তি লাভ করবে—"নো চেৎ সুষুপ্তিমূর্চ্ছাদেঃ মুচ্যতে জন্তুতো জন্ম।" কিন্তু গভীর সুষুপ্তির মূর্চ্ছার অসত্য জ্ঞান অথবা জ্ঞানের অভাব সংশোধন হয় না।

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ স্বামীজীর আরও কিছু মন্তব্য ॥

ব্যাপক মিলনের যুগ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা কয়েকটি জাতির ইতিহাস আলোচনা করে দেখিয়েছি কৃষিজীবী ও যাযাবর জাতির সংস্পর্শে কি-ধরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজী কি বলেছিলেন তা-ও আমরা দেখেছি। আমাদের আলোচ্য বিষয়—সমাজ-বিকাশের ধারা। মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন ও ভারতের কৃষিজীবী সমাজে নব্যপ্রস্তর যুগে আলাদা আলাদা ভাবেই সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে পরস্পরের মধ্যে খানিকটা আদান-প্রদান হয়েছিল ঠিকই তবে মূল কথাটা হলো এই সমাজগুলির বিকাশ ঘটেছিল নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে। সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত হলো যাযাবর জাতিগুলির আক্রমণে। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর একটি মন্তব্য ইঙ্গিতসূচক—"গরীব নিম্নজাতিদের মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ যখন থেকে হতে লাগলো, তখন থেকেই ইউরোপ উঠতে লাগলো।"[৩২] আমরা দেখেছি, ব্যাপক মিলনের যুগে ইওরোপের ভূমিকা ছিল নগণ্য, সে-যুগে প্রাধান্য ছিল এশিয়ারই। ইওরোপে এই মিলন শুরু হয় অনেক পরে। তাহলেও স্বামীজীর এই মন্তব্য প্রাচীন এশিয়ার আলোচ্য যুগেও সত্য। বস্তুত, অসভ্য যাযাবর জাতি যখন সভ্য কৃষিজীবী সমাজের সংস্পর্শে এসে উন্নত সভ্যতা গ্রহণ করলো তখন থেকেই সমাজের মধ্যে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা গেল। এইভাবেই ইতিহাস ও সমাজ তার স্থানীয় সত্তা থেকে মুক্তি পেয়ে আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করলো।

বিভিন্ন জাতির ভাবধারার সংমিশ্রণে ধর্মচিন্তা কিভাবে বিবর্তিত হয় তার একটি সুন্দর চিত্র স্বামীজী এঁকেছেন 'পরিব্রাজক' বইটিতে। ইহুদী ধর্মের কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"সমস্ত সেমিটিক জাতিদের ধর্ম অবান্তরভেদে প্রায় এক রকমই ছিল। বাবিলি, য়াহুদি, ফিনিক ও পরবর্তী আরবদের একই প্রকার উপাসনা ছিল। প্রায় সকল দেবতারই নাম 'মোলখ' (যে শব্দটি বাঙলা ভাষাতে মালিক, মুলুক ইত্যাদি রূপে এখনও রয়েছে) অথবা 'বাল', তবে অবান্তরভেদ ছিল। কারু কারু মতে—এ 'আলাৎ' দেবতা পরে আরবদিগের আল্লা হলেন। এই সকল দেবতার পূজার মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক ও জঘন্য ব্যাপারও ছিল [যেমন পুত্রকে বলি দেওয়া, কামচর্চা ইত্যাদি]।·· [ইহুদীদের] বাইবেলের মধ্যে মূল কথাগুলি 'বাবিল' জাতির। বাবিলদের সৃষ্টিবর্ণনা, জলপ্লাবনবর্ণনা অনেকস্থলে বাইবেল গ্রন্থে সমগ্র গৃহীত। তার উপর পারসী বাদশারা যখন আসিয়া মাইনরের উপর রাজত্ব করতেন, সেই সময় অনেক 'পারসী'

৩২। বাণী ও রচনা ৩ : ১১৭-১৮।

মত য়াহুদীদের মধ্যে প্রবেশ করে। বাইবেলের প্রাচীন ভাগের মতে এই জগৎই সব—আত্মা বা পরলোক নাই। নবীনভাগে পারসীদের পরলোকবাদ, মৃতের পুনরুত্থান ইত্যাদি দৃষ্ট হয়; এবং শয়তানবাদটি একেবারে পারসীদের। য়াহুদীদের ধর্মের প্রধান অঙ্গ 'য়াভে' নামক 'মোলখের' পূজা। এই নামটি কিন্তু য়াহুদী ভাষার নয়, কারু কারু মতে ঐটি মিশরী শব্দ। য়াহুদীরা 'য়াভে' এ নাম উচ্চারণ করত না, তার স্থানে 'আদুনোই' বলত। যখন য়াহুদীরা ইস্রেল ও ইফ্রেম দুই শাখায় বিভক্ত হল, তখন দুই দেশে দুটি প্রধান মন্দির নির্মিত হল। জেরুসালেমে ইস্রেলদের যে মন্দির নির্মিত হল তাতে 'য়াভে' দেবতার একটি নরনারী সংযোগমূর্তি এক সিন্দুকের মধ্যে রক্ষিত হত। দ্বারদেশে একটি বৃহৎ পুংচিহ্ন স্তম্ভ ছিল। ইফ্রেমে 'য়াভে' দেবতা—সোনামোড়া বৃষের মূর্তিতে পূজিত হতেন।...ক্রমে য়াহুদীদের মধ্যে একদল লোকের প্রাদুর্ভাব হল; তাঁরা গীত বা নৃত্যের দ্বারা আপনাদের মধ্যে দেবতার আবেশ করতেন। এদের নাম নবী বা Prophet। এদের মধ্যে অনেকে ইরানীদের সংসর্গে মূর্তিপূজা, পুত্রবলি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির বিপক্ষ হয়ে পড়ল। ক্রমে বলির জায়গায় হল 'সুন্নত'; বেশ্যাবৃত্তি, মূর্তি আদি ক্রমে উঠে গেল; ক্রমে ঐ নবী-সম্প্রদায়ের মধ্য হতে ক্রিশ্চান ধর্মের সৃষ্টি হল।"[৩৩]

বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংমিশ্রণে মানুষের চেহারা, চরিত্র, সভ্যতা, ধর্মীয় স্বভাব, ভাষা ইত্যাদি কিভাবে বিবর্তিত হয় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী লিখেছেন—"যে দেশকে এখন তুর্কীস্থান বলে, পশ্চিমে হিমালয় ও হিন্দুকোশ পর্বতের উত্তরে স্থিত সেই দেশই এক তুর্কী জাতির আদি নিবাসভূমি। ঐ দেশের তুর্কী নাম 'চাগওই'। দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, বর্তমান পারস্য-রাজবংশ, কনস্টান্টিনোপলপতি তুর্কবংশ ও হঙ্গারিয়ান জাতি—সকলেই সেই 'চাগওই' দেশ হতে ক্রমে ভারতবর্ষ আরম্ভ করে ইউরোপ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করেছে...। এই তুর্কীরা বহুকাল পূর্বে অবশ্য অসভ্য ছিল। ভেড়া ঘোড়া গরুর পাল সঙ্গে, স্ত্রীপুত্র ডেরা-ডাণ্ডা সমেত, যেখানে পশুপালের চরবার উপযোগী ঘাস পেত, সেইখানে তাঁবু গেড়ে কিছুদিন বাস করত। ঘাস জল সেখানকার ফুরিয়ে গেলে অন্যত্র চলে যেত। এখনও এই জাতির অনেক বংশ মধ্য-এশিয়াতে এই ভাবেই বাস করে। মোগল প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার জাতিদের সহিত এদের ভাষাগত সম্পূর্ণ ঐক্য—আকৃতিগত কিছু তফাত, মাথার গড়নে ও হনুর উচ্চতায় তুর্কের মুখ মোগলের সমাকার, কিন্তু তুর্কের নাক খাঁদা নয়, অপিচ সুদীর্ঘ চোখ সোজা এবং বড়, কিন্তু মোগলদের মতো দুই চোখের মাঝে ব্যবধান অনেকটা বেশী। অনুমান হয় যে, বহু কাল হতে এই তুর্কী জাতির মধ্যে আর্য এবং সেমিটিক রক্ত প্রবেশ লাভ করেছে; সনাতন কাল হতে এই তুরস্ক জাতি বড়ই যুদ্ধপ্রিয়। আর এই জাতির সহিত সংকৃতভাষী, গান্ধারী ও ইরানীর মিশ্রণে—আফগান, খিলিজি, হাজারা, বরকজাই, ইউসাফজাই প্রভৃতি যুদ্ধপ্রিয়, সদা রণোন্মত্ত, ভারতবর্ষের নিগ্রহকারী জাতিসকলের উৎপত্তি। অতি প্রাচীন কালে এই জাতি বারংবার ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশসকল জয় করে বড় বড় রাজ্য

৩৩। ঐ ৫ : ১১৫-১৬।

সংস্থাপন করেছিল। তখন এরা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, অথবা ভারতবর্ষ দখল করবার পর বৌদ্ধ হয়ে যেত। কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক নামক তিনি প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা আছে; এই কনিষ্কই 'মহাযান' নামে উত্তরাম্নায় বৌদ্ধধর্মের সংস্থাপক।"[৩৪]

"এই তুরস্কদের ভাষা অবশ্যই তাদের চেহারার মতো বহু মিশ্রিত হয়ে গেছে, বিশেষতঃ যে সকল দল মাতৃভূমি চাগওই হতে যত দূরে গিয়ে পড়েছে, তাদের ভাষা তত মিশ্রিত হয়ে গেছে।"[৩৫]

"কুতুবউদ্দীন থেকে মোগল বাদশাই পর্যন্ত ও-সব তাতার—যে জাত তিব্বতি, সেই জাত; কেবল হয়েছেন মুসলমান, আর হিঁদু পার্শী যে করে বদলেছেন চাকামুখ। ও সেই প্রাচীন অসুরবংশ।...এ অসুর জাত কস্মিন্ কালে বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে না, জানে মাত্র লড়াই। ও রক্ত না মিশলে যুদ্ধবীর্য বড় হয় না। উত্তর ইউরোপ, বিশেষ রুশের প্রবল যুদ্ধবীর্য—সেই তাতার। রুশ তিন হিস্সে তাতার রক্ত।"[৩৬]

"প্রাচীনকালে এই চাগওই-তুরস্কের দুই দল ছিল। এক দলের নাম 'সাদা-ভেড়ার' দল, আর এক দলের নাম 'কালো-ভেড়ার' দল। দুই দলই জন্মভূমি কাশ্মীরের উত্তর ভাগ হতে ভেড়া চরাতে চরাতে ও দেশ লুটপাট করতে করতে ক্রমে কাস্পিয়ান হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হল। সাদা-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করলে এবং ধ্বংসাবিশিষ্ট রোম রাজ্যের এক টুকরা নিয়ে হঙ্গারি নামক রাজ্য স্থাপন করলে। কালো-ভেড়ারা কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে ক্রমে পারস্যের পশ্চিমভাগ অধিকার করে, ককেশাস পর্বত উল্লঙ্ঘন করে, ক্রমে আর্মিনিয়া-মিনর প্রভৃতি আরবদের রাজ্য দখল করে বসল;...অতি প্রাচীনকালে এই তুরস্ক জাতি বড় সাপের পূজা করত।...তারপর এরা বৌদ্ধ হয়ে যায়; পরে যখন যে দেশ জয় করত, প্রায় সেই দেশের ধর্মই গ্রহণ করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে...সাদা-ভেড়ারা ক্রিশ্চানদের জয় করে ক্রিশ্চান হয়ে গেল, কালো-ভেড়ারা মুসলমানদের জয় করে মুসলমান হয়ে গেল। তবে এদের ক্রিশ্চানী বা মুসলমানীতে—অনুসন্ধান করলে—নাগপূজার স্তর এবং বৌদ্ধ স্তর এখনও পাওয়া যায়।"[৩৭]

●

৩৪। ঐ ৬ : ১৫৪-৬।
৩৫। ঐ ৬ : ১৫৭।
৩৬। ঐ ৬ : ২০৭।
৩৭। ঐ ৬ : ১৫৭-৫৮।

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(তিন)

যে বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা—সর্বনাশা বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতির দাপটে তা বুঝবার মানসিকতাও আজ প্রায় অবসিত আমাদের মধ্যে। আত্মা-ঈশ্বর-ভগবান-ধর্ম-দর্শন মোক্ষ-পাপপুণ্য প্রভৃতি শব্দাবলী সম্পর্কে পর্যন্ত আমাদের একালের অত্যাধুনিক আঁতেলদের একধরনের অদ্ভুত অ্যালার্জি আছে, অসুস্থ একধরনের বিচিত্র মানসিকতা। যে কথা আগেই বলেছি তার কারণ ঐ একই পরধর্ম-গ্রহণের ভয়াবহ পরিণাম। ক্রিস্‌মাস বা ইংরেজী নববর্ষের সন্ধ্যায় মেম-সাহেবের কোমর ধরে নাচার অনুকরণ এবং মদ্যপান প্রভৃতি আনুষঙ্গিক প্রসাদ বা পথ্যে আমাদের পূর্ণ রুচি আছে এবং এইসব পরানুকরণের অভ্যাসকে আমরা প্রগতির মানদণ্ড বলে ঘোষণা করতেও পরাঙ্মুখ নই, কিন্তু আমাদের নিজেদের পূজা-পার্বণ, রীতি-নীতি জীবনপদ্ধতির প্রতিই যত অনীহা এবং সমস্ত প্রচলিত পৈত্রিক ধ্যানধারণা ও কর্মপদ্ধতিকে আমরা কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিতে চাই। এবং এভাবেই আমরা ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছি। পিলোপনেশিয়ান ওয়ারে কোন্ পক্ষে কত সৈন্য ক্ষয় হয়েছিল, স্পার্টান কনস্টিটিউশনের কোন্ ধারায় কী আছে—আমাদের কণ্ঠস্থ। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—অক্ষৌহিনী বস্তুটি কী? রামায়ণ-মহাভারতে কারা যুদ্ধ করেছিলেন পরস্পরের বিরুদ্ধে? কী প্রসঙ্গ নিয়ে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল? কী গভীরতর অর্থদ্যোতনায়,—মানবিক কোন্ আদর্শের উপস্থাপনায় সার্থক আমাদের মহাকাব্য? কিংবা দুখানা উপনিষদের নাম বলুন—কিংবা বেদব্যাস কে ছিলেন? আমাদের মধ্যে অনেকেই দিতে পারবেন না যথার্থ সদুত্তর। এবং সবচেয়ে সর্বনাশের ব্যাপার এই যে—এই বলতে না পারাটাকেই আধুনিকতা ও প্রগতি বলে মনে করতে শিখেছি। একালে কোথাও কোনো সাহেব-বংশ-অবতংশ মারা গেলে দুই মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে সেই বিদেহীর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু বছরে একটি দিন পিতৃপক্ষে তর্পণ করাটাকে আমরা "সেকেলে" অন্ধ কুসংস্কার বলে বর্জন করতে শিখেছি। অপরূপ নয়নরোচন এই সুন্দর পৃথিবীর মাটিতে, এই নীল আকাশের নীচে যাদের জন্য দাঁড়িয়ে আছি—জীবন নামক এই আশ্চর্য নাটকে—নানা কুশীলবের ভূমিকা নিয়ে আনন্দে বেঁচে আছি, সেই পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি দিনও পালন করতে আমাদের ধার-করা আধুনিকতায় মোহে বা পড়ে। এঁদের কথা মনে রেখেই স্বামীজী বলেছিলেন, "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাস্কর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে।" ...এঁদেরই আহ্বান করে বলেছেন, "ভুলিও না নীচ জাতি—মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল

ভারতবাসী আমার ভাই। তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ—।" কিন্তু কে কার কথা শোনে। যে কোন সাধু-সন্ন্যাসী কী বলে গেছেন অমনি তাই মানতে হবে কী তার মানে আছে। তার চেয়ে বিদেশী সাহেব-বাবাদের কথা অনেক বেশী বেদবাক্য আমাদের কাছে। কারণ "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দেই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনীমাত্র।...রক্তরঙ্গে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না।...তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহিতেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।...এরূপ অবস্থায় বিদেশকে স্বদেশের স্থানে বসাইতে আমাদের মনে দ্বিধামাত্র হয় না। ভারতবর্ষের অগৌরবে আমাদের প্রাণান্তকর লজ্জাবোধ হইতে পারে না। আমরা অনায়াসেই বলিয়া থাকি—পূর্বে আমাদের কিছুই ছিল না এবং এখন আমাদিগকে অশনবসন আচার-ব্যবহার সমস্তই বিদেশীর কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে।" অথচ একথাও তো আমাদের অজ্ঞাত নয়—"কৃপাপাত্র হয়ে কি বা ফল ?" কিংবা "ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ" ? কিন্তু তবু অধম ভিক্ষুকের ভূমিকায় কৃপাপাত্র হয়েই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দাঁড়িয়ে আছি বিদেশীদের দ্বারে।

তা নাহলে কে কোথায় কবে কী প্রসঙ্গে উচ্চারণ করে গেছে "Religion came from fear"। অমনি আমরা সবাই তা অভ্রান্ত আর্ষ-বাক্যরূপে মাথায় করে তুলে নিয়েছি বিনা বিচারে, বিনা বিতর্কে। অথচ আমরা কিন্তু বোধশীল মানুষ। আমাদের একটা বিশিষ্ট ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আছে। ইতিহাসের একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে ভারতবর্ষ তার নতুনরূপে সমুত্তীর্ণ হয়েছে। তবু আমরা আজ প্রভুদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে হাস্যকর নির্লজ্জতায় ঘোষণা করছি ধর্ম পরিত্যাজ্য। এবং আশ্চর্য, সমস্ত উত্তরাধিকার বিস্মৃত হয়ে, প্রভুদের অনুসরণ করে তাদের মত পশ্চাচরণে উদ্যম হয়ে উঠেছি। ঘরে বাইরে আবশ্যক রীতি-নীতি এবং জঞ্জালের নিয়মকে গ্রহণ করতে এগিয়ে চলার নামে পশ্চাতে ফিরে চলেছি। ধর্ম পরিত্যাজ্য—কেননা তা ভয় থেকে এসেছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে মানুষের মত চিন্তা করলেই দেখা যাবে—মানবসভ্যতার যা কিছু উৎকৃষ্ট উপাদান, উজ্জ্বল আবিষ্কার ও উত্তরাধিকার—তার সমস্তটাই আমরা পেয়েছি ভয় থেকে অভয়ের পথে অভিযাত্রায়, অমোঘ অথচ দুঃসাধ্য উত্তরণে। ক্ষুধার ভয় থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পেয়েছি খাদ্য—রচনা করেছি কৃষিসম্ভার, শস্য ও ফল-ফসলের নানা আয়োজন। বিরুদ্ধ নিসর্গের আক্রমণের ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাবার প্রয়োজনেই মানুষ একদা রচনা করেছে গৃহ-পরিধি, নানা ধরনের বাস-গৃহ—পর্ণ-কুটীর থেকে অট্টালিকা। তীব্র তীক্ষ্ণ শীতাতপের ভয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য আবিষ্কার করেছি বস্ত্র, নানা ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ। ব্যাধির আক্রমণের ভয় থেকে মুক্তির জন্য খুঁজে বের করেছি,

আবিষ্কার করেছি নানারকম ওষধি ও ওষুধ। পথ-পরিক্রমার ক্লান্তির ভয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে একদিন মানুষ আবিষ্কার করেছে চাকার এবং নানাধরনের চক্রযান। এরকমভাবেই অন্ধকারের ভয় থেকে বাঁচার জন্য উত্তীর্ণ হয়েছি একদিন আমরা আলোর অঙ্গনে। জীবন রচনার নানা দায়-দায়িত্বে এমনি করেই মানুষ যুক্ত হয়েছে সমষ্টিগতভাবে। মর্ত্যকে স্বর্গ করে গড়ে তুলবার সাধনায় এপথ ধরেই মানুষ নিজেকে আত্মসমর্পিত করেছে। এমনি করেই অনিশ্চয়তার ভয়, মৃত্যুর ভয়, ব্যাধির ভয়, প্রাকৃতিক রোষ ও দুর্বিপাকের ভয়—এবং এই মর্ত্যের মাটিতে আরো নানারকমের বিপরীত তরঙ্গের আক্রমণের ভয় থেকে নিজেদের মুক্ত করার প্রয়োজনেই তো মানবসভ্যতার বিচিত্র আত্মপ্রকাশ ও অগ্রগতি। কিন্তু ধর্ম ছাড়া সভ্যতার আর কোনো ফসলই তো বর্জনের প্রশ্ন ওঠেনি। আসলে ব্যাপারটা হল ইউরোপের অন্ধ অনুকরণের ফল। বিদেশী শিক্ষার বিষময় পরিণাম। অথচ ইউরোপের "religion" আর আমাদের ধর্ম কিন্তু এক জিনিস নয়। অনেকে আবার বলে থাকেন যে ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত অধর্ম সংঘটিত হয়েছে এমন আর কিছুতেই হয়নি। ধর্ম নিয়ে লোক ব্যবসা করেছে, ধর্মের নামে পৃথিবীতে বহু অন্যায় অপকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব ধর্ম আর নয়। ধর্ম পরিত্যাজ্য। কিন্তু এ যুক্তিও বালভাষিত, অর্থহীন। আসলে যেহেতু সাহেব-বাবারা বলেছে অতএব বিনা বিধায় মাথা পেতে মেনে নিয়েছি। অন্ধথার মাথা ঠিক থাকলে, প্রকৃতিস্থ থাকলে বোঝা যেত এই যুক্তিতর্ক ছেলেমানুষী অর্থহীন, প্রগল্‌ভ বাচালতা মাত্র। কারণ, পৃথিবীতে শুধু ধর্মকে নিয়েই মাত্র নয়, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান-রাজনীতি সব নিয়েই দেশে দেশে বহু অনর্থ ঘটেছে। বহু পাপ, বহু অপরাধ এবং অন্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে রাজনীতি নিয়ে যে হীনতম অমানবিক কর্মের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে তার তো কোনো তুলনাই হয় না। কিন্তু তাই বলে রাজনীতি তো আমরা ত্যাগ করছি না। করার কথাই উঠছে না। শুধু তবে ধর্মের বেলায়ই পরিত্যাগের বা বর্জনের প্রশ্ন আসে কেন? আসে, কেননা ধর্ম সম্পর্কে আমাদের যথার্থ কোনো ধারণাই নেই। কিংবা যা আছে তা ইউরোপীয় জীবনের অন্ধ অনুকরণে কিছু "undigested" এবং "unassimilated" ভ্রান্ত ধারণা। এই অজ্ঞানতা থেকেই নানা ভুল-ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা বহু ব্যাপারে অকারণ শুরু মেনে নিই ইউরোপকে। এক থেকে নয় এবং শূন্যের আবিষ্কার ভারতীয় মনীষার আশ্চর্য অবদান। অথচ আমরা একে অ্যারাবিক নিউম্যারালস্ বলেই অভিহিত করে এসেছি চিরকাল ইউরোপীয় বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে। আসলে এই আশ্চর্য দশমিক সংখ্যাতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেছিল ইউরোপীয়েরা—আরবীয় স্বার্থবাহদের মাধ্যমে। তাই এর নাম হয়ে গেল অ্যারাবিক নিউম্যারালস্। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম পঠন-পাঠনের যুগেরও অনেক আগে স্যার উইলিয়ম জোনস্ যখন আমাদের সংস্কৃত ভাষার ঐশ্বর্যদীপ্ত মহিমার কথা ঘোষণা করলেন এবং সমস্ত ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠ ভাষাসমূহেরও জননী বলে চিহ্নিত করলেন তখনই আমরা শ্রদ্ধা করতে শিখলাম নিজেদের ভাষাকে। সাহেবদের মুখ থেকে শুনলেই আমরা সবকিছু মেনে নিতে অভ্যস্ত। এবং এ-ব্যাধি আরো মারাত্মক হয়ে বর্তমানে আমাদের গ্রাস করেছে।

আমাদের মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় অ্যাটমিক মতবাদের প্রবক্তা কে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া যাবে—"ডালটন"। কিন্তু যদি পুনর্বার প্রশ্ন করা হয়—পৃথিবীতে অণু-তত্ত্বের প্রথম আবিষ্কর্তা কে? আমরা ঐ ডালটন বা অটোজ্ঞানের নাম পর্যন্ত বলতে সক্ষম হব। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের পরম প্রবক্তা মহান বৈজ্ঞানিক বোধদীপ্ত ঋষি কণাদের নাম আমরা কোনোদিন শুনিওনি। আমাদের বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থাই এমন করে বিরচিত করা হয়েছে যাতে আমাদের কোনো উত্তরাধিকার, সভ্যতা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের ছেলেমেয়েদের কোনোক্রমেই সংযোগ না ঘটে। যেমন করেই হোক নানা কায়দায় ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের চাকচিক্য ও জলুস দিয়ে আমাদের চোখ ভোলাবার নানা প্রক্রিয়া। এবং এতদিনে তাদের সেই ফাঁদে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিয়েছি আমরা। তাই ধর্ম সম্পর্কেও এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের মধ্যে এত প্রচলিত। অথচ ধর্ম শব্দটি কোত্থেকে এসেছে,—কী করে নিষ্পন্ন হয়েছে—সেকথা চিন্তা করলেই কিন্তু ধরা পড়ে ধর্ম শব্দটির যথার্থ মানে। যা আমাদের ধারণ করে আছে এবং যা ধারণ করে বেঁচে আছি আমরা—তাই তো যথার্থ ধর্ম। জীবনের ধর্ম ও মানবধর্ম একই ব্যাপার। তবে সে জীবন ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরের একক জীবনযাপন নয়, বহুর সঙ্গে যোগে যুক্ত হয়ে মহত্তর পূর্ণায়ত যৌথ জীবন রচনার প্রতিশ্রুতি। সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সার্বিক কল্যাণবোধে উদ্দীপ্ত মাথা উঁচু করে মানুষের মত বেঁচে থাকার যে আয়োজন ও সাধনা—তারই নাম ধর্ম। স্বামীজী তো স্পষ্ট করেই বললেন, "মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব আছে তা প্রকাশ করাই ধর্ম। তার কর্ষণাই ধর্ম।" আরো বললেন, "ধর্ম যদি মানুষের সর্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে তবে উহার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। উহা কতকগুলি ব্যক্তির ভাবকল্পনা মাত্র।" তাই স্বামীজীর মতে হিন্দুধর্ম মানেই মানবধর্ম—সর্বজনীন-ধর্ম—জীবনধর্ম—পরিপূর্ণরূপে দেহে-মনে-আত্মায় একসঙ্গে সকলের সুস্থসবল সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকার ধর্ম। এই ধর্মকে অস্বীকার করে কোনো মহৎ মানবিক কর্ম-প্রয়াস, জীবন-সংগঠন বা জাতীয় উন্নতি বা সার্থক জীবন-যোজনা সত্য হয়ে উঠতে পারে না—বিশেষ করে ভারতবর্ষের মত ধর্মের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে।

●

॥ নবদ্বীপলীলায় মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় ॥

শিবানন্দ তীর্থনাথ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের মত কবিকর্ণপুরও এই নাটকাভিনয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। অভিনয় এতখানি মনোজ্ঞ ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল যে তা দেখে প্রেমভক্তি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে পড়েছেন। অভিনেতা ও অভিনেয় চরিত্রের একাত্মতা লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়ে তিনি বলেছেন, আহা কি চিত্র। ইনি সেই ভগবান, এঁর অসাধ্য কিছুই নেই। যেহেতু —সেই বিশ্বম্ভর, যিনি নিজ অংশে মোহিনীরূপে দেবারিগণকে মোহিত করেছিলেন, আত্মারাম-মহেশ্বর শ্রীশঙ্করকেও প্রলুব্ধ করেছিলেন, তাঁর কাছে এটা কিছুই আশ্চর্য নয় যে কৃষ্ণাবতার হয়েও নিজ দেহে আজ তিনি রাধাকৃতি ধারণ করেছেন।···এঁকেও তো যথার্থ রাধাসখী ললিতা বলে বোধ হচ্ছে, দ্বিজ গদাধর পণ্ডিতের কোনও লক্ষণই তো এঁতে নেই।··· আহা ইনিও তো সাক্ষাৎ যোগমায়া···জরতীবেশে প্রবেশ করেছেন নিত্যানন্দের কোনও চিহ্নই তো নেই··· ।

"প্রেমভক্তিঃ। (নির্বর্ণ্য) অহো চিত্রম্! স এবায়ং দেবঃ, নাস্ত কিমপ্যশক্যম্। যতঃ,—

মোহিন্যেষ বভূবঃ সঃ স্বকলয়া দেবদ্বিষো মোহয়ন্নাত্মা-
রামমহীশ্বরেশ্বরমপি শ্রীশঙ্করং লোভয়ন্।
তস্যাশ্চর্যমিদং ন কিঞ্চিদপি যৎ কৃষ্ণাবতারোঽপি সন
শ্রীরাধাকৃতিমগ্রহীৎ স্বরভুবা দেবঃ স বিশ্বম্ভরঃ॥

··· ··· ···

(পুনরুপাত্তোঽবলোক্য)

ইয়মপি ললিতৈব রাধিকাদী, ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।

··· ··· ···

(পুনরুপাত্তোঽবলোক্য) অহো ইয়মপি যোগমায়া···জরতীবেশাং বিধায় প্রতিষ্ঠা নেয়ং নিত্যানন্দতনুঃ··· ।[৫৩]

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, কবিকর্ণপুর মহাপ্রভুর প্রিয় সহচর গদাধর পণ্ডিতকে সখী ললিতার ভূমিকাভিনেতা বলেছেন। কিন্তু এই উক্তি অন্য সমর্থিত নয়। বৃন্দাবন দাসের মতে, পূর্বেই বলেছি, গদাধর রমার ভূমিকায় এবং তাঁর সখী সুপ্রভাতের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ব্রহ্মানন্দ।

কবিকর্ণপুর এই অভিনয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন, এখানে তা' উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই অভিনয় দেখে প্রেমভক্তি মৈত্রীকে বলেছেন, কৃতি সমাজে বা রসিকসমাজে

৪৯। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্কঃ, পৃঃ ১০০।

৫০। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োঽঙ্কঃ, পৃঃ ১২৪-২৫।

রসোপলব্ধির এই রীতিই প্রসিদ্ধ যে লৌকিক দৃশ্যকাব্য অভিনয়কালে সামাজিকদেরই বা দর্শকদেরই রসোপলব্ধি হয়ে থাকে, নটদের নয়। কিন্তু অলৌকিক এইসব অভিনয়ে কোনও বিরোধ থাকতে পারে না, উভয়পক্ষই রস আস্বাদন করে।

"প্রেমভক্তিঃ।...

সামাজিকানাং হি রসো নটানাং, নৈবৈতি পন্থাঃ ক্বচিদ্ প্রসিদ্ধঃ।
ইত্থোভয়ত্বে রসবিপ্লবেদা—, মলৌকিকে বস্তুনি কো বিরোধঃ ?"[৫১]

বস্তুত, নট ও দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। সাধারণত নটেরা অভিনয়কালে অভিনয়-রসের দ্বারা আবিষ্ট হন না, কেবলমাত্র দর্শকেরাই আবিষ্ট হয়ে থাকেন। কিন্তু এইসব অভিনয় স্থলে অভিনেতারা ভাবাবেগে এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েন যে নট ও দর্শকদের চিরাচরিত পার্থক্যের কথা ভুলে যান। তখন একদিকে যেমন তিনি নটরূপে অভিনয় করেন, অন্যদিকে তেমনি দর্শকরূপে নাট্যরস আস্বাদন করেন। সেইজন্য ভাবাবেগ প্রধান ভক্তিরসাপ্লুত মহাপ্রভুর নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে কবিকর্ণপুরের এই উক্তি অত্যন্ত সার্থক ও যথাযথ হয়েছে।

গ্রন্থত্রয়ে বর্ণিত অভিনীত নাটকের নাম, কাহিনী ও চরিত্রগুলি সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে, মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাস কেউই নাটকের নাম বলেন নি। বৃন্দাবন দাসের আলোচ্য প্রসঙ্গে পূর্বে যে অভিনয় নাটকের নামের উল্লেখ করেছি, তা' অভিনয়ের বর্ণনা দেখে অনুমিত হয়েছে মাত্র। আবার উভয়ের বর্ণিত অভিনয়-কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই; সামান্য কিছু অনৈক্য লক্ষিত হলেও দুটি বর্ণনাই যে মূলত এক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু কবিকর্ণপুরের রচনায় নাটকের নাম, কাহিনী ও চরিত্রলিপি সম্বন্ধে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে পূর্ববর্তী গ্রন্থ-দুটির বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এই বৈসাদৃশ্য এত বিরাট ও ব্যাপক যে গ্রন্থ তিনটির বর্ণনাকে কোনক্রমেই পরস্পর মেলান সম্ভবপর নয়। নাটকের নাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থ দুটিতে স্পষ্টভাবে কিছু বলা না হলেও কবিকর্ণপুরের রচনায় কোনও অস্পষ্টতা নেই, পরিষ্কারভাবে তিনি এর উল্লেখ করেছেন। অভিনয়ের সূচনায় পারিপার্শ্বিক সূত্রধারকে বললেন, এখন কোন্ নাটকের অভিনয় হবে, আদেশ করুন। সূত্রধার উত্তর দিলেন, দেবী যোগমায়ার দ্বারা বৃন্দাভাবে রাধামুকুন্দের যে দানলীলা সম্পাদিত হয়েছিল, তাই আজ অভিনয় করা হোক।

"পারিপার্শ্বিকঃ। এবঞ্চেৎ কঃ প্রয়োগোঽনুষ্ঠাতব্যস্তদপ্যনুজ্ঞায়তাম্।
সূত্রধারঃ। গৃহীত্বা ভরতীভাবং যা দেব্যা যোগমায়য়া।
সম্পাদ্যতে দানলীলা সৈব রাধামুকুন্দয়োঃ।"[৫২]

সূত্রধারের এই উক্তিতে অভিনেয় নাটকের নাম যে দানলীলা, তা' সুস্পষ্টভাবে প্রথমেই প্রকাশ পেয়েছে।

৫১। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্", তৃতীয়োল্লাস, পৃঃ ১৭০।

৫২। "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ম্ নাটকম্" তৃতীয়োল্লাস পৃষ্ঠা ১০১।

অভিনীত নাটকের নামের মত কাহিনীরও বৈশাদৃশ্য দেখা যায়। মুরারি গুপ্তের কাব্যে লক্ষ্মীর রূপসজ্জায় সজ্জিত মহাপ্রভুর মাতৃভাবের অভিনয়ের প্রাধান্য দেখান হয়েছে; বৃন্দাবন দাসের কাব্যে এর সঙ্গে প্রথম দিকে যুক্ত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক রুক্মিণী হরণ বৃত্তান্ত। কিন্তু কবিকর্ণপুরের গ্রন্থে নাটকের কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক, পূর্বেই উল্লেখ করেছি, দানলীলা। কাহিনী স্বাভাবিকভাবেই যে নামের অনুকূল হবে, এইটাই প্রত্যাশিত। এখানেও তাই হয়েছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভক্তিরসাশ্রিত দানলীলার কাহিনীকেই তৃতীয় অঙ্ক জুড়ে সবিস্তারে বিবৃত করেছেন গ্রন্থকার।

অভিনীত নাটকের নাম ও কাহিনী পৃথক হওয়ার ফলে অভিনয় চরিত্রলিপি সম্বন্ধে মুরারি গুপ্ত ও বৃন্দাবন দাসের সঙ্গে কবিকর্ণপুরের বর্ণনার পার্থক্য দেখা যায়। বর্ণনা তিনটির মধ্যে কোনও কোনও অভিনেয় চরিত্রের নামের মিল থাকলেও অমিলও বড় কম নয়। কাহিনীর অনুরোধে কবিকর্ণপুর সূত্রধার, নারদ, স্নাতক, বিদূষক, শ্রীরাধা, ভরতী চরিত্রের সঙ্গে নতুন করে শ্রীকৃষ্ণ, সুবল, শ্রীদাম, সুদাম, ললিতা প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সপার্ষদ অভিনয়লীলার বিস্তৃত বর্ণনাগুলি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতেও বাংলাদেশে বাংলানাটক ও তার অভিনয়ের ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু এই সময়কার কোনও বাংলা নাটক পাওয়া যায় নি। সেইজন্য তৎকালীন নাটক সম্বন্ধে কোনকিছু বলবার উপায় নেই। তবে অব্যবহিত পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃহৎবঙ্গে নেপাল আসাম প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন রাগরাগিণীশ্রয়ী সুরতাললয়প্রধান গেয় ও নৃত্যবহুল যে বাংলা সঙ্গীতনাটকগুলি পাওয়া যায়, তা' থেকে এই সময়কার নাটক সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে। অভিনয়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়, মহাপ্রভুর অভিনীত নাটকও ছিল সঙ্গীতপ্রধান ও নৃত্যবহুল। সেইজন্য পরবর্তীকালের সঙ্গীতনাটকগুলির মত এই নাটকটিও সঙ্গীতনাটক ছিল বলে মনে হয়। তবে সঙ্গীত ও নৃত্যের প্রাচুর্য থাকলেও বিভিন্ন চরিত্রের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্য দিয়ে নাটকীয় গতি যে অনেকখানি তুঙ্গে উঠেছিল এবং তা' দর্শকমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, তার প্রমাণও নিহিত রয়েছে অভিনয় বর্ণনার মাঝে। এখানে লক্ষণীয়, এই নাটকেও সংস্কৃতদৃশ্যকাব্যের প্রভাব পড়েছে। এই প্রভাব একদিকে যেমন এসেছে নাটকের আঙ্গিকগত (Form) দিক থেকে, যেমন নাট্যকাহিনী বিবৃতির পূর্বে নান্দীপাঠ ও নান্দ্যন্তে সূত্রধার প্রভৃতিতে; অন্যদিকে তেমনি এসেছে চরিত্রচিত্রণে (Characterization), যেমন বিদূষক প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টিতে। মধ্যযুগীয় আখ্যায়িকা কাব্যের সঙ্গে এই নাটকটির কাহিনীগত (Plot) মিল রয়েছে। আখ্যায়িকা কাব্যের মত এই নাটকের কাহিনীও চয়ন করা হয়েছে সংস্কৃত প্রাচীন পুরাণ থেকে।

পরিশেষে রঙ্গমঞ্চ (Theatre) ও অভিনয় সামগ্রী (Stage-Properties) সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। অভিনয়ের বর্ণনাগুলিতে কোনও নেপথ্য পট (Scene) বা সম্মুখ যবনিকার (Curtain) উল্লেখ নেই, রঙ্গভূমি (Stage) ও রঙ্গপীঠ (Auditorium) কেমন ছিল তাও জানা যায় না। তবে রঙ্গভূমি ও রঙ্গপীঠকে যে শুদ্ধরাটের অন্তর্গত

কথিবার (বর্তমান কাঠিবার বা কাঠিয়াবার) প্রদেশের প্রসিদ্ধ চন্দ্রাতপ দিয়ে ঘিরে রেখা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর নিকটে এই চন্দ্রাতপ যে অপরিচিত ছিল না, অভিনয় বর্ণনায় তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে পৃথক সাজঘর (Make-up Room) তখন বর্তমান ছিল। অভিনেতৃদের অঙ্গসজ্জারও (Dress and Make-up) বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। এরজন্য চরিত্রানুযায়ী নানাপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ, শঙ্খ, কাঁচুলী, কঙ্কন, দাড়ি, গোঁফ, লাঠি, কুপাসন,] বীণা, কমণ্ডলু, নূপুর, পাগড়ি প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছিল। (সমাপ্ত)

●

॥ শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দ স্মরণিকা ॥

শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ

শ্রীশ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ চরণাশ্রয়প্রাপ্ত (৫ই ডিসেম্বর '৮০, ২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ সাল) স্বামী দয়ানন্দজীকে স্মরণ করার কালে, অতীত কালের কাহিনী স্মৃতিতে উদিত হয়। এই ত্যাগব্রতী সাধু দয়ানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিমলচন্দ্র বসু। জন্ম, ভাগীরথীধারা প্রবাহিত নদীয়া শান্তিপুরের নিকটবর্তী বাগ-আঁচড়া গ্রামে। সাড়ে চারশ বছর আগে নদীয়া-নবদ্বীপ নগরের জগন্নাথ মিশ্রের দুই পুত্র ভগবানলাভের জন্য সংসার ত্যাগ করেছিলেন। অনুরূপ কাহিনী আধুনিক কালে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে।

শান্তিপুর-বাগআঁচড়া নিবাসী শ্রীহরিপ্রসাদ বসু ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ভগবৎ-ভাবের জীবনের প্রভাব, গঙ্গাতীরস্থ হরিদ্বারের ভোলানন্দ গিরিমহারাজের কৃপালাভ। বংশে সন্ন্যাসীর কৃপায় হরিপ্রসাদের দুই পুত্রসন্তানই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রথম পুত্র নির্মলচন্দ্র গৃহত্যাগ করে ভাগীরথীতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরে লীলাকারী শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারায় অবগাহন করলেন। শ্রীমা-সারদা সে সময়ে দেবীশরীরে অবস্থিতা, নির্মলচন্দ্র তাঁর পদতলে ত্যাগমন্ত্রের দীক্ষা নেলেন। আর ১৯১৬ সনে, স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর পদতলে সন্ন্যাস গ্রহণ করে হলেন স্বামী মাধবানন্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ তাঁকে বিশ্বস্রষ্টার চরণে মিলিত হবার বাসনাকে বিস্মিত করেনি। ঐ মাধবানন্দজী, ত্যাগ-তপস্যায় জীবনব্রত যাপন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে লোকান্তর প্রাপ্ত হন ১৯৬৫ সনে।

বসু পরিবারের হরিপ্রসাদ আর তাঁর ধর্মনিষ্ঠাবতী পত্নী বিন্দুবাসিনীর অশ্রুবিন্দুও দ্বিতীয় পুত্র বিমলচন্দ্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেনি। অগ্রজের মতোই অনুজ বিমলচন্দ্রও "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ভগবানের এই বাণী, অনুসরণ করলেন। গর্ভধারিণী বিন্দুবাসিনীর কোলে যে শিশুর জন্ম ১৮৯২ সনে, সেই বিমলচন্দ্রই তেইশ বছর বয়সে, অগ্রজের অনুসরণ করে পরমাপ্রকৃতি সারদাদেবীর পদাশ্রয় গ্রহণ করলেন ১৯১৫ সনে, আর শ্রীরামকৃষ্ণ

সঙ্ঘের সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের জীবে প্রেম আর সেবাকর্মের আদর্শ-পতাকা বহনকারী-রূপে জীবনের জয়যাত্রা সুরু করলেন।

ইতিমধ্যে কলেজে (প্রেসিডেন্সী কলেজ M.Sc.) পড়ার কালেই মা-সারদার কাছ থেকে যে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন, সে কাহিনী প্রচারবিহীন।

পিতার বিত্ত স্নেহ আর জননীর অশ্রুধারা যেমন সেকালের নদীয়া লীলায় দুই পুত্রকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারেনি, এ কালেও নদীয়া-শান্তিপুরের বসুবংশের দুই পুত্রকে সংসারী করতে পারেনি।

অগ্রজের ত্যাগ ভিত্তিক্ষা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শরণাগতি বিশেষভাবে স্মরণীয় হলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা অনুজ স্বামী দয়ানন্দজীকেই স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করব।

স্বামী দয়ানন্দের পৈত্রিক নিবাস শান্তিপুরে হলেও, তাঁর পড়াশুনা শুরু হয় পিতার কর্মস্থল বোলপুরে। তারপরে উত্তর ছাত্ররূপে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার কালে ছেলেধরা মাষ্টারের (শ্রীম) হাতে পড়েন। তাঁরই প্রেরণায় ভাগীরথীতীরস্থ বেলুড়মঠে যাতায়াত করে সংগলাভ করেন, তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, আর অপরাপর রামকৃষ্ণ সন্তান, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতির।

সঙ্ঘের নিয়মানুসারে বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারী বিমলচৈতন্য সঙ্ঘগুরু স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর কৃপায় হলেন স্বামী দয়ানন্দ।

তিনি, স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত বেলুড়মঠের সেবাধর্ম (work is worship) ব্রতে দীক্ষিত বিভিন্ন স্থানে, সেবাকার্য পরিচালনা করেন। আর রামকৃষ্ণ মঠ পরিচালিত উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদনাও করেছিলেন কিছুকাল। স্বামী প্রেমানন্দজীর সঙ্গে, তরুণ সাধক দয়ানন্দজীও পূর্ববঙ্গে রামকৃষ্ণভাব প্রচারে গিয়েছিলেন। তারপরে দয়ানন্দজীর হিমালয়ে তপস্যা চলে দীর্ঘকাল।

আমরা ঐ কর্মযোগী দয়ানন্দজীকে ১৩২৬ সনে একদিন দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম বেলুড়মঠে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীর পদপ্রান্তে। সেদিন স্বামী শিবানন্দ কর্মযোগী দয়ানন্দকে বলেছিলেন—দেখো দয়ানন্দ, ঠাকুরের আদর্শ আর স্বামীজীর বেদান্তের বাণী প্রচারের জন্য তোমাকে আমেরিকায় যেতে হবে…।

তরুণ তাপস দয়ানন্দ বিনীতভাবে মঠাধ্যক্ষ মহাপুরুষ শিবানন্দজীর পদতলে নিবেদন করলেন—মহারাজ, আমার তো কোন যোগ্যতাই নেই, ওদেশে গিয়ে আমি কি করব।

স্বামী শিবানন্দ আশীর্বাদ বর্ষণ করে বললেন—ঠাকুর স্বামীজীর কাজের যোগ্যতা তাঁদের কৃপাতেই হবে। আর তোমার উপর তো শ্রীমায়ের কৃপা বর্ষিত হয়ে আছে…।

সেদিনের সেই সাদাসিদে তপস্যাদীপ্ত সৌম্য মানুষটি স্বামী শিবানন্দের আদেশ শিরে ধারণ করে আমেরিকায় যাত্রা করেন আর সে দেশে মাত্র পাঁচবছর সঙ্ঘের কাজ পরিচালনা করেন। তাঁর মনটি কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা—জীবে দয়া করার তুমি কে…জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে…। পাশ্চাত্য দেশে গিয়ে তিনি সে দেশের শিশু ও প্রসূতি পরিচর্যার অনুপম

ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে ১৯৩১ সনে যখন স্বদেশে ফিরে এলেন, তখন তাঁর অন্তর শিশু আর প্রসূতি পরিচর্যার সুমঙ্গল কর্মকে সেবাব্রতে রূপদানে নিযুক্ত করলেন।

স্বদেশে ফিরে এসে ১৯৩১ সনে সঙ্ঘগুরুর পদপ্রান্তে নিবেদন করলেন শিশু ও মাতৃমঙ্গল কর্মপ্রচেষ্টার শুভ সঙ্কল্প। ১৯৩২ সনে ভবানীপুরে একটি সামান্য ভাড়া বাড়ীতে গড়তে আরম্ভ করলেন, "রামকৃষ্ণ মিশন শিশুমঙ্গল"। ঐ প্রতিষ্ঠানটির সর্বপ্রকার উন্নয়ন কর্ম হল কর্মযোগী দয়ানন্দের ধ্যান-ধারণা আর তপস্যা।

গুরু কৃপায় এই কর্মের মধ্যে স্বামী দয়ানন্দ রূপান্তরিত হলেন সত্যিকারের "সেবানন্দে"। প্রসূতি আর প্রসূতকে সেবাই হল তাঁর কর্মব্রত। এই শিশুমঙ্গল ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটিই ক্রমে সর্বজনের সেবার বৃহৎ প্রতিষ্ঠান "রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠান"। দক্ষিণ কলিকাতার শরৎ বসু রোডে।

ইতিমধ্যে স্বামী দয়ানন্দের অগ্রজ স্বামী মাধবানন্দ (পূর্বোক্ত নির্মল) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে সেবাদর্শে উৎসর্গীকৃত জীবনদীপ নির্বাপিত হয় ১৯৬৫ সনে। আমরা যতদূর জানতে পেরেছি, তখন ঐ সঙ্ঘগুরুর দায়িত্বপূর্ণ পদের যোগ্য নায়করূপে তাঁকে বরণ করার চেষ্টাকে তিনি বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবকরূপেই সঙ্ঘের কাজে বার্ধক্যের দেহটিকে ঐ সেবা কাজেই নিযুক্ত রাখেন।

ইতিমধ্যে সেবা প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতির জন্য গুজরাটের প্রচারবিহীন, দানশীল ব্যক্তি চল্লিশ লক্ষ টাকা ঐ প্রতিষ্ঠানকে দান করে ধন্য হন। সে দান গ্রহণ করেন স্বামী দয়ানন্দ বিগত ২৭শে ডিসেম্বর '৭৭ সনে। সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপুরুষ তখন কর্মভার থেকে অবসর গ্রহণ করেও প্রতিষ্ঠানের সেবকরূপেও তথায় ছিলেন। দাতা (শ্রীনন্দলাল তাঁতিয়া) স্বামী দয়ানন্দজীর করকমলে দান অর্পণ করেন। পরদিন ঐ মহৎ অনুষ্ঠান "প্রেষ্ঠদান" শিরোনামায় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয় : "রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে সম্প্রতি এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শ্রীনন্দলাল তাঁতিয়া তাঁর পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে স্বামী দয়ানন্দজীর হাতে চল্লিশ লক্ষ টাকার দুটি চেক অর্পণ করেন। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য প্রধান অতিথিরূপে ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহাধ্যক্ষ স্বামী ভূতেশানন্দজী সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন…।" সেবাপ্রতিষ্ঠান চারকোটি টাকা ব্যয়ে একটি রিসার্চ সেন্টার, শিশু হাসপাতাল, ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছেন…।

গুরুকৃপাধন্য, আর্ত সেবায় উৎসর্গীকৃতজীবন স্বামী দয়ানন্দ ঐ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন জুন মাসের ৫ তারিখে।

স্বামী দয়ানন্দের গুরুস্থান বেলুড়মঠে গঙ্গাতীরে তাঁর দেহের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় ৬ই জুন ১৯৮০ সনে।

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক' ।।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(পাঁচ)

'সীতারামে'র শ্রীর সঙ্গে 'দেবী চৌধুরাণী'র প্রফুল্ল চরিত্রের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। উভয়েই বিবাহের পর স্বামী পরিত্যক্তা, পিতৃগৃহে আশ্রিতা, উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রী পরিত্যাগের জন্য স্বামী দায়ী নহেন, দায়ী শ্বশুর। এক ক্ষেত্রে জননীর অপবাদের জন্য কন্যা এবং আর এক ক্ষেত্রে কোষ্ঠীর ফল বিচার করিয়া কন্যা; উভয় ক্ষেত্রেই শ্বশুরের আদেশে পুত্রবধূ পরিত্যক্তা হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই উপযাচিকা হইয়া বধূ শ্বশুরগৃহে আসিয়াছে। তবে এক ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে দারিদ্র্যের তাড়নায়, আর এক ক্ষেত্রে বিপদে পড়িয়া। উভয় ক্ষেত্রেই মাতৃবিয়োগের পর কন্যা নিরাশ্রিতা হইয়া গৃহচ্যুত তবে এক ক্ষেত্রে বলপূর্বক, আর এক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায়।

দুইটি ক্ষেত্রেই যে শ্বশুরের অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও, পরিত্যক্তা বধূ বিনা আমন্ত্রণে শ্বশুর গৃহে আসিতে সাহস পাইয়াছিল, তাহার কারণ ইহাদের উভয়েরই স্বামীর প্রতি প্রেম সত্য ছিল। প্রফুল্ল যে শ্বশুরগৃহে আসিবার জন্য মায়ের কাছে এত জেদ ধরিয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র তাহার ঘোরপোষের জন্য নহে, তাহার মধ্যে স্বামীর প্রতি তাহার বিশ্বাস এবং প্রেমের ভাব যে সক্রিয় ছিল, তাহা গোপন ছিল না। শ্রীরও যে বিপদের মুহূর্তে স্বামীর কথাই মনে হইল, তাহার কারণ, স্বামীর সান্নিধ্য হইতে শ্বশুরের আদেশে অন্যায় ভাবে বঞ্চিতা হইয়াও স্বামীর প্রতি তাহার প্রেম এবং বিশ্বাস অটুট ছিল। যে-সমাজের কথা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, সেই সমাজের নারীদিগের প্রেম-স্বপ্ন একান্তভাবে দাম্পত্য-জীবনভিত্তিক ছিল, স্বামী যখন অনভিপ্রেত কিংবা অধিকারের বহির্ভূত হইয়া পড়িত, তখন স্বামীর একটা আদর্শ তাহার সম্মুখে ফুটিয়া উঠিত। প্রফুল্ল এবং শ্রীরও তাহাই হইয়াছিল। তাই প্রফুল্লের মনে মনে এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে স্বামী তাহাকে দেখিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, সেইজন্য কেবলমাত্র 'ভাত-কাপড়ের দাবী' লইয়া সে শ্বশুরগৃহে যায় নাই, তাই সেখানে গিয়া প্রফুল্ল স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা করাইয়া দিবার জন্য সাগর-বৌকে অনুরোধ করিল। ইহাই তাহার মায়ের সঙ্গে এত জেদ করিয়া শ্বশুরবাড়ী যাইবার প্রকৃত কারণ ছিল। বহুদিনের অদর্শন সত্ত্বেও শ্রীর যখন গঙ্গারামকে লইয়া এক কঠিন বিপদ দেখা দিল, তখন সেও স্বামীর প্রতি তাহার প্রেমের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াই সীতারামের সম্মুখে গিয়া আবির্ভূতা হইল, সে স্বামীর প্রতি অভিমান করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার অভিমান সে বিসর্জনও দিতে পারিল না।

প্রফুল্ল কিংবা শ্রীর এই আচরণের মধ্যে অবাস্তবতা কিছু নাই। শ্রীর মনে সীতারামের প্রতি অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রেমের কোনও লাঘব হয় নাই, তাহাতে স্বামীর প্রতি তাহার কোনও অবিশ্বাসও সৃষ্টি হয় নাই। প্রেম যেখানে সত্য সেখানে অভিমান ও অভিযোগ কার্যকর হইতে পারে না।

স্বামীর প্রতি শ্রীর অভিমানের কারণ ব্রজেশ্বরের উপর প্রফুল্লের অভিমানের কারণ হইতে গুরুতর। প্রফুল্ল জানিত, কি কারণে শ্বশুর তাহাকে স্বামী-গৃহে যাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু শ্রী তাহা জানিতও না। সীতারাম পিতার মৃত্যুর পরও তাহাকে সেকথা জানায় নাই। সীতারাম শ্রীর কোষ্ঠীর বিচারের উপর নির্ভর করিয়া 'প্রিয়' অর্থে স্বামী বিবেচনা করিয়া 'প্রিয়প্রাণহন্ত্রী' শ্রীর নিকট হইতে কাপুরুষের মত নিজের প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে যে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়াছিলেন, তাহাও মনে হইতে পারে না। স্বভাবতঃ পরোপকারী এবং পরদুঃখকাতররূপেই তাহাকে কাহিনীর সূচনায় পরিচায়িত করা হইয়াছে। তবে শ্রীর প্রতি সীতারামের ঔদাসীন্যের কারণ, পূর্বে বলিয়াছি, সীতারামের রূপমোহ—নন্দা ও রমার রূপে তাহার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।

গঙ্গারামকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া সীতারাম শ্রীকে লইয়া সঙ্কটে পড়িলেন।

সীতারাম বলিলেন, 'শ্রী, তুমি এখন কোথায় যাইবে ?'

শ্রী। আমার স্থান কোথায় ?

সীতা। কেন, তোমার ঘর বাড়ী ?

শ্রী। সেখানে কে আছে ? এখন সেখানে আমাকে কে রক্ষা করিবে ?

সীতা। তবে তুমি কোথা যাইতে ইচ্ছা কর ?

শ্রী। কোথাও নয়।

শ্রীর এই উত্তরের ভিতর দিয়া তাহার মনের ইচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে, সে সীতারামের নিকটেই থাকিতে চাহে, অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় তাহা সে প্রকাশ করিতে পারিতেছে না, নিতান্ত স্বাভাবিক নারীমনের বাস্তব অভিমানবোধ তাহাকে সেখানে আসিয়া বাধা দিতেছে।

সীতারাম যেন কিছু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। তিনি বলিলেন, 'এইখানে থাকিবে ? এ যে মাঠ। এখানে তোমার মঙ্গল নাই।'

ইহা যে মাঠ, তাহা শ্রীকে বুঝাইয়া দিতে হয় না, এখানে যে বাস করা যায় না, করিলে তাহার মঙ্গল নাই, সে কথাও বলা বাহুল্য মাত্র। সীতারাম তাহাকে শ্যামপুর যাইতে বলিলেন, সেখানে গঙ্গারামের বাড়ীঘর হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

শ্রী জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে কার সঙ্গে যাইব ?

সীতা। আমি কোনও লোক তোমার সঙ্গে দিব।

শ্রী। এমন লোক কাহাকে সঙ্গে দিবে যে, দুরন্ত সিপাহীদিগের হাত হইতে আমাকে রক্ষা করিবে? সীতারামের প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে যে শেষ কথাটির দিকে সুকৌশলে শ্রী অগ্রসর হইতেছিল; সীতারামের মুখ দিয়া এখন তাহা বাহির হইয়া আসিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'সীতারাম কিছুক্ষণ ভাবিলেন; বলিলেন, 'চল, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছি।'

শ্রী যেন সীতারামের মুখ হইতে এই কথাটি বাহির হইবারই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এই কথা শুনিবামাত্র তাহার মধ্যে নারীমনের স্বাভাবিক অভিমান জাগিয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'শ্রী সহসা উঠিয়া বসিল। উন্মুখী হইয়া স্থির নেত্রে সীতারামের মুখপানে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, 'এতদিন পরে এ কথা কেন?'

কি কারণে যে সীতারাম তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা শ্রী জানিত না, জানিত না বলিয়াই সীতারামের প্রতি তাহার অভিমান অন্তরের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তথাপি তাহার প্রতি তাহার প্রেম অক্ষুণ্ণ ছিল। সেই প্রেমের শক্তিতেই আজ বিপদের দিন সীতারামের শরণাপন্ন হইয়াছিল। সীতারামের প্রতি তাহার প্রেমের বিশ্বাসে সে মনে করিয়াছিল যে তিনি তাহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহাতে সীতারামের প্রতি তাহার অভিমান দূর হয় নাই। শ্রীর চরিত্রে বহির্মুখী অন্যান্য যে সকল গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার অন্তরাল দিয়া যে একটি স্বাভাবিক নারীমন অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল, এখানে তাহার পরিচয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তারপর সীতারামের মুখ হইতে যখন তাহাকে সীতারামের পরিত্যাগের কারণ বা নিজের কোষ্ঠীর ফল শুনিতে পাইল, তখন পিতার উপদেশ অমান্য করিয়া যখন সীতারাম শ্রীকে গ্রহণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল, তখনও সীতারামকে পরিত্যাগ করিয়া যে শ্রী নিরুদ্দিষ্ট হইয়া গেল, ভারতীয় স্ত্রী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার করিলে তাহার মধ্যেও কিছুমাত্র অবাস্তবতা আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। শ্রী বলিয়াছিল, 'গণকঠাকুর যাই বলুন, স্বামী ভিন্ন স্ত্রীলোকের আর কেহই প্রিয় নহে। সহবাস থাকুক বা না থাকুক, স্বামীই স্ত্রীর প্রিয়। তুমি আমার চিরপ্রিয় এ কথা লুকান আর উচিত নহে।' বিশেষতঃ স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর আর কেহ প্রিয় আছে, কোনো স্ত্রীই তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। তারপর শ্রী বলিল, 'আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।' বলিয়া শ্রী চলিয়া গেল, 'অন্ধকারে সে কোথায় মিলাইল, সীতারাম আর দেখিতে পাইল না।'

॥ হিমালয়ের পথে পথে—বদ্রীনাথ ॥

শ্রীবিশ্বজিৎ দাস

পাহাড়ে ওঠা যেমন বিপদজনক, নামা বোধহয় তার চেয়েও বেশী। বিশেষ করে সে রাস্তা যদি খাড়া হয়। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। অনেকেই গৌরীকুণ্ড পৌঁছে সেখানে রয়ে গেলেন। পথের সহযাত্রীরা আমাকেও অনুরোধ করছিলেন গৌরীকুণ্ডে থেকে যেতে। কিন্তু আজ গৌরীকুণ্ডে থাকলে আগামীকাল আমার পক্ষে বদ্রীনাথের বাস ধরা অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলি।

আরও কিছুটা এগোনোর পর দেখি সামনের রাস্তায় কাদা বড্ড বেশী। আর এক বৃদ্ধা হাতে একটি থলে নিয়ে এক-পা বাড়াচ্ছেন আবার পিছিয়ে আসছেন। কিছুতেই এগিয়ে যাবার মত সাহস অর্জন করতে পারছেন না। অনেকেই এদৃশ্য দেখেও নির্বিবাদে তাঁকে এড়িয়ে চলে যাচ্ছে। থমকে দাঁড়ালাম আমি।

জোর করে বুড়ীর হাত থেকে থলে কেড়ে নিলাম। শক্ত হাতে তাঁর কম্পমান হাতখানা চেপে ধরে বললাম—'আসুন আমার সঙ্গে।' অত্যন্ত মন্থরগতিতে আমরা সেই বিপজ্জনক পথ যে কিভাবে পেরিয়ে এলাম আজও তা ভাবতে বিস্ময় লাগে। প্রতিমুহূর্তেই পিছলে পড়ে যাবার ভয় ছিল। শোনপ্রয়াগে পৌঁছে বৃদ্ধার কি আনন্দ। বললেন—'বাবা আজ তুমি যদি না থাকতে তাহলে কি করে যে এখানে এসে পৌঁছতাম জানি নে। কেদার দর্শন করে আমার যা পুণ্য হয়েছে সব তোমার।' বললাম—'ঘাড়ে আর পুণ্যের বোঝা চাপাবেন না দিদিমা, তাহলে পথ চলতে বড় কষ্ট হবে। আর সাহায্যের কথা বলছেন! একই পথের যাত্রী আমরা। একে অপরের সাহায্য ছাড়া লক্ষ্যে পৌঁছবো কি করে?' মনে পড়ে গেল মিঃ নেপীর সাহায্যের কথা।

আজকের মত শোনপ্রয়াগেই বিশ্রাম করতে হচ্ছে। বৃদ্ধার বিশেষ অনুরোধে তাঁর আতিথ্যই গ্রহণ করেছি। আমার জন্য চটিওলাকে গরম পুরী আর তরকারীর হুকুম দিয়েছেন তিনি।

* * *

চলেছি বদ্রীনাথের পথে। শোনপ্রয়াগ থেকেই সরাসরি বদ্রীনাথ যাবার বাস মিলেছে। শোনপ্রয়াগ থেকে মন্দাকিনীর ধারা অনুসরণ করে নেমে আসতে হবে রুদ্রপ্রয়াগ। আবার সেখান থেকে অলকানন্দার ধারাকে সঙ্গী করে উঠে যেতে হবে বদ্রীনাথের পথে প্রায় সাড়ে দশহাজার ফুট উঁচুতে। ঋষিকেশ থেকেও সরাসরি রুদ্রপ্রয়াগ হয়ে বদ্রীনাথ যাওয়া যায়।

বাস এগিয়ে চলেছে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ ছাড়িয়ে যোশীমঠের দিকে। রুদ্রপ্রয়াগ মনে পড়লেই সেই জিম করবেটের কাহিনী মনে পড়ে। মনে পড়ে সেদিনের রুদ্রপ্রয়াগ আর আজকের রুদ্রপ্রয়াগে কত তফাৎ। সেদিন মানুষখেকো চিতার ভয়ে কেউ বিকেলের পর ওপথে যেতে সাহস করতো না। আর আজ সেখানে হাজার আলোর রোশনাই; লক্ষ মানুষের চীৎকারে প্রয়াগের গর্জন মিলিয়ে যাবার উপক্রম।

ছুটে চলেছে বাস। পিপুলকোটি এসে পৌঁছতেই সেই ইনভেকশন্ নেবার সার্টিফিকেট দেখাতে হোলো। কিভাবে জানিনা উত্তরপ্রদেশের একদল যাত্রী ইন্‌জেক্‌শন্ না নিয়েই বাসে উঠে পড়েছিল। সুই নিতে তাদের বড় ভয়। ইয়া সব তাগড়াই চেহারা নিয়ে তাদের কান্না দেখলে সত্যিই হাসি পায়। কিন্তু না নিয়েও উপায় নেই।

যোশীমঠ। ভগবান শঙ্করের একটি মঠ আছে এখানে। কিন্তু দেখবার সময় নেই। কারণ বাস এখানে দাঁড়াবে অত্যন্ত অল্পসময় এবং তার ওপরেও চারিদিকে আজ প্রচণ্ড ভীড়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন এখানে। দূরে তাঁর হেলিকপটারটিকেও দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং দেখা হ'ল না শঙ্করাচার্য্যের একটি বৃহৎ মঠ।

ঠাণ্ডা বাড়ছে। মাঝে মাঝে বাসের রাস্তার পাশেই বরফের দেয়াল পড়ছে। দক্ষ হাতে ড্রাইভার সমস্ত বাধা অতিক্রম করে বাসকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। পথও অত্যন্ত খাড়াই। বাসের মধ্যে বেশকিছু যাত্রীর অবস্থা এই যাত্রায় অত্যন্ত কাহিল হয়ে পড়েছে। অনর্গল বমি করে চলেছে তারা। আমার কাছেও আর এ্যাভোমিন ট্যাবলেট নেই। যা ছিল সবই বিলিয়ে দিয়েছি।

একসময় বাস এসে থামলো এক বিশাল উপত্যকায়। সন্ধ্যার আলো তখন চারদিক রাঙিয়ে দিয়েছে। বদ্রীনাথ। অদূরেই দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের চূড়া। কেদারনাথের মত এপথে হাঁটার কষ্ট নেই। তারফলে দুর্গমপথ সুগম হয়েছে ঠিকই, কিন্তু হারিয়ে গেছে সেই পথচলার আনন্দ, দুর্গমতীর্থের দেবতাকে দর্শন করার আর্তি।

ছোটখাটো একটা শহরই গড়ে উঠেছে বদ্রীনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে। ধর্মশালা, হোটেল, লজ কোন কিছুরই আজ অভাব নেই।

অস্তমিতসূর্যের আভায় ঝলমল করে উঠছে ঐ দূরের নীলকণ্ঠ পাহাড়। ওরই ওপারে কেদারনাথ মাত্র ৬ মাইল দূরত্বে। কিন্তু সে পথের দুর্গমতাকে মানুষ আজও জয় করতে পারেনি। তাই আজও বহু দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে তবেই কেদারনাথ থেকে বদ্রীনাথে আসতে হচ্ছে।

• • •

ধরমশালার কোলাহলেই ঘুম ভেঙেছে। ভোর হতে না হতেই সকলে চলেছেন ব্রহ্মকপোল তীর্থে।

আমিও বেরিয়ে পড়ি। এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। মন্দিরের পশ্চিমে চিরতুষারাচ্ছন্ন নীলকণ্ঠ পর্বত (২১,০০০ ফুট); উত্তরকোণে প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে নারায়ণ পর্বত; পূর্বদিকে মন্দর ও নর পর্বত। কথিত আছে যে এই নাকি সেই গন্ধমাদন পর্বত। (মতান্তরে গন্ধমাদন পর্বত অন্যত্র অবস্থিত)।

দশাননের শক্তিশেলে আহত হয়ে লক্ষ্মণ যখন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন তখন বিভীষণের নির্দেশে বীরহনুমান এই গন্ধমাদন পর্বতে আসেন মৃতসঞ্জীবনী বিশল্যকরণীর সন্ধানে। কিন্তু বহু অন্বেষণেও যখন বিশল্যকরণী চিনতে পারলেন না তখন হনুমান এই সমগ্র পর্বতটিকেই লঙ্কায় বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় রামেশ্বরের একটি পর্বতকে দেখিয়ে সেখানকার পাণ্ডারা দাবী করে যে 'এই সেই গন্ধমাদন পর্বত।'

তর্কের মধ্যে যেতে চাই না; কিন্তু তথ্যের দিক থেকেও বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে বুল মহাকাব্যেই। হনুমান হিমালয় থেকে গন্ধমাদন বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তিনি আবার তা যথাস্থানে স্থাপন করে গিয়েছিলেন কিনা সে কথা কোথাও বলা নেই।

যাই হোক। ফিরে আসি বদ্রীনাথের কথায়। মানুষের যোগবল যখন কমে যেতে লাগল তখন জগৎগুরু শঙ্করাচার্য মানুষের কল্যাণ কামনায় নারায়ণ পর্বতে তপস্যায় মগ্ন হন। সেখানেই তিনি ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। এবং তাঁরই নির্দেশে তিনি নারদকুণ্ডে আসেন। নারদকুণ্ডে অবগাহন করে শঙ্করাচার্য যে মূর্তিটি পেলেন সেটিই বদ্রীনাথজীর মূর্তি। শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। অতঃপর তিনিই এটিকে মন্দিরে স্থাপন করেন এবং আজও তা সেখানেই পূজিত হচ্ছে।

মন্দিরে পাণ্ডার উপদ্রব কম; দর্শনেরও কোন অসুবিধে নেই। কিন্তু মালার ভারে চাপা পড়েছেন বদ্রী বিশাল। তার ওপর পুরোহিত মশাই মূর্তির সামনে ঘুর ঘুর করছেন। যেন মূর্তির সর্বসত্ত্ব তাঁরই; অন্য কারুর ভালো করে দর্শনেরও অধিকার নেই। তবুও সামান্য প্রদীপের আলোতেই দর্শন করি বদ্রীনাথজীকে। প্রার্থনা করি—'তুমি আমাকে শক্তি দাও, অভয় দাও, জীবনে সঠিক পথে আমায় চালনা করে আমার সহায় হও।'

মন্দির থেকে বেরিয়ে তপ্তকুণ্ডে এলাম। স্থানীয় লোকেরা বলে ব্রহ্মক্ষেত্র। কুণ্ডের জল অত্যন্ত গরম; তবু আস্তে আস্তে নেমে পড়লাম। আঃ। তারপর সে কি আরাম! সমস্ত ক্লেশ, ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেল। পুরাণ অনুযায়ী এখানে স্নান, গুপ্তদান ও ভোজ্যদান বিধেয়। অনেকেই সেই কার্যে লিপ্ত। তবে গুপ্তদানের চেয়ে প্রকাশ্য দানেই তাঁদের আগ্রহ বেশী। স্কন্দপুরাণে বলেছে—বদ্রীনাথে নিজের এবং পূর্বপুরুষগণের উদ্ধার কামনায় শুদ্ধাচারে থেকে ভগবানের প্রতি ভক্তি, গো, ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসীর সেবায় রত থেকে সৎপাত্রে দান, পাঠ, পূজা, কীর্তন করতে পারলেই মনঃকামনা সিদ্ধ হয়। কিন্তু সৎপাত্র আর দেখলাম কই? ভস্ম গায়ে মেখে দিগম্বর হলেই সাধু হয় না; আয়েস করে গাঁজায় টান মারলেই ঈশ্বর উপলব্ধি হয় না। আসলে এসব ভারতীয় সাধুর দল ছাই মাখে তার কারণ ছাই হ'ল ভারতীয় Thermolactyl; গায়ে মা দিয়ে গেঞ্জী তৈরী হয়। এই ছাই শীতে দেহ গরম রাখে, রক্ত চলাচলে সাহায্য করে আর গরমের সময় দেহকে ঘামতে দেয় না।

অনেকক্ষণ স্নান হয়ে গেছে। জল গরম হলেও বেশীক্ষণ থাকা উচিৎ নয়। তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। জামাকাপড় বদলে ব্রহ্মকপাল তীর্থের দিকে এগোই।

এগোতে গিয়েই বাধা পাই? এত ভীড় কেন? উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এসেছেন একটি ধর্মশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে। তীর্থযাত্রীরা এখন তাই দেখতেই ব্যস্ত। ভীড় ঠেলে গিয়ে পৌঁছই ব্রহ্মকপাল তীর্থে। ঋষিগঙ্গা আর অলকানন্দার এই পুণ্যসঙ্গমস্থলে বহু তীর্থযাত্রী তর্পণ ও পিণ্ডদান করছেন।

এবার ফিরতে হয়।

ফিরতি পথে দেখি বহিঃক্ষেত্রে ভীড় বেড়েছে। লাইন পড়েছে বদ্রীনাথজীউর মন্দিরে। প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে। বদ্রীনাথজীর স্নান, নির্বাণ, দর্শন, বেদপাঠ, সহস্র নামাবলী কীর্তন, বালাভোগ, শৃঙ্গারবেশ, আরতি ও ভোগ হয়। বিকেল চারটে থেকে ৮টা পর্যন্ত আবার দর্শন। তারই মধ্যে সাড়ে সাতটায় সন্ধ্যা-আরতি। রাত্রি ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত শৃঙ্গার উত্তোলন, সহস্র নামাবলী কীর্তন, ভোগ এবং শয়ন আরতি। সাধারণতঃ কালীপুজোর পনেরোদিন পরে মন্দির বন্ধ হয়, এবং বৈশাখমাসের শেষের দিকে শুভদিন দেখে আবার মন্দির খোলা হয়।

বদ্রীনাথের এত জনকোলাহল আর ভালো লাগছিল না। তাই বিকেলবেলাই রওনা হলাম গোবিন্দঘাটের পথে। গোবিন্দঘাট এখান থেকে তেইশ কিলোমিটার পথ। বাস এসে যখন দাঁড়ালো গোবিন্দঘাটে তখন সন্ধ্যার বেণী উন্মুক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নীল আকাশের আর পাহাড়ের কোলে।

।। পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা ।।

শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

(দুই)

উটি শহর থেকে বেশ দূরে নীলগিরির বিভিন্ন উপত্যকায় টোডাদের গ্রামগুলি। চারটি অথবা পাঁচটি বিচিত্র আকারের কুঁড়েঘর, একটি মহিষ থাকার জন্য প্রশস্ত ঘেরা জায়গা এবং গ্রাম থেকে সামান্য দূরে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কুঁড়েঘর নিয়ে টোডামণ্ড বা টোডাগ্রাম। গ্রাম থেকে সামান্য দূরের কুঁড়েঘরটি কোন কোন গ্রামে পাথরের পাঁচিলে ঘেরা থাকে। কোথাও বা বেতের ছড় দিয়ে ঘেরা থাকে। ঐ ঘরটিকে বলা হয় টেরিরি বা দুধ রাখার ঘর। টোডাদের কুঁড়েঘরগুলি দূর থেকে মনে হয় একটি পিপার অর্ধেক কেটে মাটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। একটি পিপাকে উপর থেকে নীচে সমভাগে ভাগ করলে যে আকার পাওয়া যায়, ঠিক সেরূপ দেখতে টোডাদের কুঁড়ে ঘর। অনেকটা অর্ধ চন্দ্রের মত। কুঁড়েঘরের চাল ছাওয়া হয় এক প্রকার শুকনো লম্বা আকারের ঘাস ও বেতের ছড়ের সাহায্যে। ঘরে একটিমাত্র দরজা। দরজাটি মাত্র আড়াই ফুট উঁচু ও দুই ফুট চওড়া। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে যাওয়া আসা করতে হয়। দরজা থেকে কিছুটা উপরে দেওয়ালে একটি ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা সমকোণের খোলা জায়গা আছে। সেইটাই টোডা-ঘরের জানালা। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া যাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য ঐরূপ ঘর এবং ঘরের দরজা ও জানালার নির্মাণ পরিকল্পনা। ঘরের মধ্যে বেশ গুমোট, হাওয়া চলাচলের কোন ব্যবস্থা নেই। ঘরের একপাশে উনন, সেখানে প্রায় সর্বক্ষণ আগুন জ্বলে। আগুনের তাপ ঘরের ভিতর যথেষ্ট গরম রাখে। অপর একপাশে লম্বা উঁচু প্রশস্ত জায়গা, মহিষের চামড়ার চাকা, সেখানে সবাই একত্রে শয়ন করে। আর একপাশে থাকে কিছু জ্বালানী কাঠ, নানা আকারের বাসনপত্র, খাদ্যাদি। ঘরের ঠিক মাঝখানে মেঝেতে একটি বড় গর্ত থাকে, সেখানে মেয়েরা শস্য শুকিয়ে নেয়।

দীর্ঘদেহী টোডা পুরুষদের আকৃতি, পোষাক-পরিচ্ছদ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক পুরুষের উন্নত নাক, সুন্দর চোখ, মাথায় ঘন কালো চুল, মুখভর্তি দাড়ি, ঝকঝকে সাদা মুক্তোর মত দাঁত, পরনে দক্ষিণভারতীয় পদ্ধতিতে লুঙ্গির মত সাদা কাপড় ও রঙিন সুতোয় এমব্রয়ডারি করা সাদা গায়ের চাদর। এতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আদিবাসী সারা ভারতে আর কোথাও দেখিনি। টোডা মেয়েরাও যথেষ্ট লম্বা। সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। মেয়েদের মাথার চুলের পরিচর্যার বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। এরা খোঁপা বাঁধে না। দীর্ঘ চুলের গুচ্ছ ১১।১২টি ভাগে ভাগ করে মাখন ও জল সহযোগে পাকিয়ে দড়ির মত ঝুলিয়ে দেয়। মাখনের জন্য পাকানো চুল কখনও খুলে যায় না। মেয়েদের হাতে পায়ে উল্কির কাজ থাকে। প্রথম সন্তান হবার পর মেয়েদের গায়ে উল্কি দেওয়া হয়। হাতের উল্কি এমনভাবে দেওয়া হয়, হঠাৎ দেখলে মনে হয় বেশ বাহারি গয়না পরে আছে। মেয়েদেরও গায়ে থাকে রঙিন সুতোয় কাজ-করা সাদা চাদর। টোডা মেয়েদের সৌন্দর্য সাধারণত নির্ভর করে তাদের পায়ের গঠনের উপর।

টোডা-সমাজে দ্রৌপদী-বিবাহপ্রথা আজও প্রচলিত আছে। দক্ষিণ ভারতের আর কোন আদিবাসীদের মধ্যে দ্রৌপদী-বিবাহপ্রথা অর্থাৎ কোন নারীর বিবাহের পর তার স্বামীর ভাইয়েরাও স্বামীরূপে গণ্য হওয়ার প্রথা আর কোথাও নেই। একমাত্র টোডা সমাজেই নারীর বহু-পতি প্রথার প্রচলন আছে। টোডা-নারীর বহু-পতি সম্বন্ধে এক সহজ ব্যাখ্যা শুনেছিলাম তাদের জীবনীচিত্র তোলার সময়ে। তাদের শাস্ত্রমতে টোডা-নারী মৃতদেহের ন্যায় অপবিত্র। কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে টোডা নারীর উপস্থিতি বা কোন মহিষের দেহ স্পর্শ করা তার পক্ষে শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মহিষের দুধ দোহা, মাখন তোলা, ঘি তৈরি করা এবং সারাদিন ধরে মহিষদের দেখাশুনা করা কেবলমাত্র পুরুষদেরই কাজ। দৈনন্দিন জীবনে নারীর কাজ অতি সীমিত। সন্তান পালন করা, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, রান্না করা এবং সূচিশিল্প করা নারীদের কাজ। টোডা সমাজপতিরা অতীতে নারীকে সাংসারিক কাজকর্মে অতি অল্প সময় ব্যয় করতে দেখে এবং আলস্যে সময় কাটাতে দেখে তারা স্থির করে ঘরে ঘরে প্রতি পুরুষের জন্য একজন করে স্ত্রী রাখার কোন প্রয়োজন নেই। এটা শুধুমাত্র বিলাসিতা। একজন স্ত্রী একটি পরিবারের সব কয়জন ভাইদের পক্ষে যথেষ্ট। এতে একটি পরিবারের মধ্যে থাকবে প্রেম, প্রীতি, আন্তরিকতা, অর্থনৈতিক সমতা এবং সর্বোপরি সীমিত সন্তান সংখ্যা। সমাজপতিরা তখন থেকে তাদের সমাজে বহুভর্তা প্রথা প্রচলন করে। সেইসঙ্গে চালু হয় প্রথম নবজাত কন্যা হত্যা। সমাজে নারীর সংখ্যা সীমিত রাখার উদ্দেশ্যে নবজাত প্রথম কন্যাকে ফেলে আসা হতো মহিষদের খোঁয়াড়ে। মহিষদের খুরের পেষণে নবজাত শিশুর মৃত্যু ঘটতো। আমার দোভাষী আরও জানায়, উটি শহর থেকে মহীশূর যাবার পথে ১৫।১৬ কিঃ মিঃ পথ যাবার পর পড়ে মুকের্তি পাহাড়। টোডাদের কাছে মুকের্তি পাহাড় অতি পবিত্র স্থান। ইহাই ওদের কাছে স্বর্গের প্রবেশ পথ। নবজাত প্রথম কন্যাকে মুকের্তি পাহাড়ের চূড়াতে ফেলে আসা হতো। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নবজাতিকার মর্মান্তিকভাবে নির্বাণ ঘটতো। ইংরেজ আগমনের পর আইন করে শিশু হত্যা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

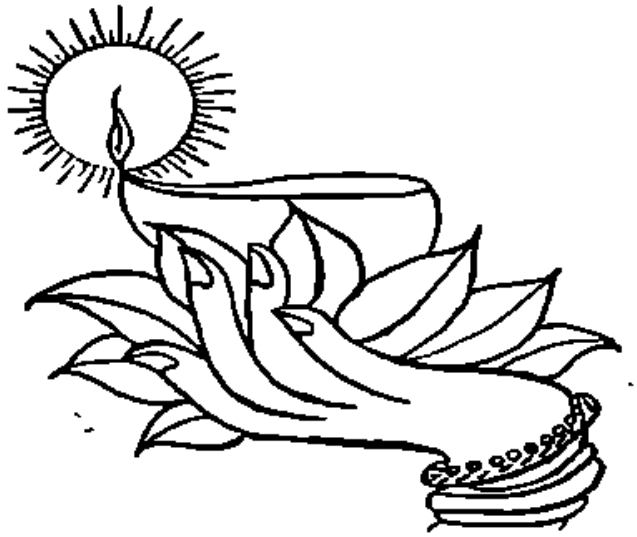

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

য়ুরোপীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক : মাইয়োলিকা প্রসঙ্গে

(আট)

মিলান শহরের প্রাচীনতম যে মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্রটির কথা জানা গেছে—সেটি ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কোনো সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফেলিস্ ফেরিসি। ফেরিসি একজন সুদক্ষ সিরামিকনির্মাতা ও চিত্রকর ছিলেন। কিন্তু তাঁর কাজে স্বকীয়তার প্রকাশ বিশেষ চোখে পড়ে না। এই শিল্পী অনুকরণেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি চীনা ও জাপানী পোর্সিলেনপাত্রের অলংকরণের অনুকরণে কিছু সংখ্যক মাইয়োলিকাপাত্রে অলংকরণ করেছিলেন। প্যাসকেল রুবাটি নামে আর একজন শিল্পী ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মিলান-এ একটি মাইয়োলিকানির্মাণ-কেন্দ্র স্থাপন করেন। ইনিও চৈনিক অলংকৃত পোর্সিলেনপাত্রের অনুকরণে মাইয়োলিকাপাত্র এবং থালায় ওভারগ্লেজ রঙএ অলংকরণ করতেন।

টিউরিন্ শহরের পিড্‌মন্ট অঞ্চলে ষোড়শ খ্রীষ্টীয় শতকে নির্মিত একটি মাইয়োলিকাপাত্র 'মিউজিয়ো সিভিকো' সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। পাত্রটিতে লেখা রয়েছে ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে পিড্‌মন্ট-এ ডি. মার্শেলো নামে এক শিল্পী মাইয়োলিকা তৈরীর একটি কেন্দ্র স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মার্শেলো-র ভ্রাতুষ্পুত্র জিয়ান্নো জিয়াসিন্টো রোসেটি ওই মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্রটি পরিচালনা করতেন। ফ্রান্সের মাউসটিয়ার্স শহরে তৈরী মাইয়োলিকার অনুকরণে এখানে কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা নির্মিত হয়েছিলো। অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের শেষের দিকে এই কেন্দ্রে নির্মিত যেসব মাইয়োলিকা এযাবত পাওয়া গেছে—সেগুলোর অধিকাংশই 'রোকোকো' রীতিতে অলংকৃত হয়েছে। কিছু কিছু মাইয়োলিকাপাত্রে কিনুকের নকশার অনুকরণে অলংকরণও দেখা যায়।

লম্বার্ডি প্রদেশের লোডি শহরে অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে যে-কয়টি মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্র ছিলো—সেগুলোতে নির্মিত যেসব মাইয়োলিকাপাত্র এবং থালা পাওয়া গেছে, তাতে স্বাভাবের

ছাপ বিশেষ চোখে পড়েনা। ফরাসীদেশের 'কায়েনস্' নামে পরিচিত সিরামিকস্‌এর অলংকরণের অনুকরণে উল্লিখিত মাইয়োলিকাপাত্রে এবং থালায় অলংকরণ করা হয়েছে।

সিসিলি দ্বীপের পালেরমো শহরে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে যে-কয়টি মাইয়োলিকানির্মাণকেন্দ্র ছিলো—সেগুলোতে নির্মিত যেসব মাইয়োলিকাপাত্র এবং থালার নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাতে পূর্বে উল্লিখিত কাস্টেল ডুরান্টে-র নির্মাণকেন্দ্রে নির্মিত ও অলংকৃত মাইয়োলিকার অলংকরণ-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

আনুমানিক পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতকের শেষের দিক থেকে অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত ইতালীতে নির্মিত মাইয়োলিকার যে-প্রসঙ্গ আলোচিত হলো—তা ইতালীয় রেনেশাঁ-রই অন্যতম ফসল। এই রেনেশাঁ অথবা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের পশ্চাদপটে—তৎকালীন ইতালীর রাজশক্তি এবং অর্থনৈতিক শক্তি ক্রিয়াশীল ছিলো। বাইজেন্টিয়ান্ সাম্রাজ্যের পতন হবার পর সমগ্র ইতালীতে প্রকৃতপক্ষে কোনো কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অস্তিত্ব ছিলোনা। ফ্লোরেন্স, ভেনিস্, জেনোয়া, সিয়েনা এবং আরও কয়েকটি প্রধান শহরকে কেন্দ্র করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল-গুলোতে শাসন চালাতেন কয়েকটি ধনী ও অভিজাত পরিবার। এই পরিবারগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির নানান্ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগেই থাকতো। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো ছিলোই, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিলো আভিজাত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও। আভিজাত্য প্রকাশের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইতালীর প্রায় প্রতিটি ধনী পরিবারই শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলো নিজেদের সংগ্রহে রাখতে চাইতেন। প্রধানতঃ এই কারণেই তাঁরা শিল্পকলা তথা শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কোনো কোনো ধনী পরিবার অবশ্য প্রকৃতই শিল্পরসিক ছিলো। এমনই একটি পরিবারের নাম 'মেডিসি'। শিল্পকলার প্রতি প্রকৃত আগ্রহ অথবা আভিজাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা—এর যেটিই কারণ হোকনা কেন, ওই ধনী ও অভিজাত পরিবার-গুলোর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই ইতালীয় শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। উল্লিখিত দুশো বছরে ইতালীতে কয়েকজন প্রতিভাবান চিত্রকর এবং ভাস্করের আবির্ভাবও হয়েছিলো যেন শিল্পকলার পুনরুজ্জীবনের প্রয়োজনেই। এই চিত্রকরদের মধ্যে ছিলেন মাজাচ্চো, পাওলো, উচেল্লো, আন্দ্রেয়া ডেল্ কাস্টাগ্‌নো, বার্ডোভিনেত্তি, আন্টোনিও, পোলাইয়ুওলো, ভেরোচ্চিও এবং পিয়াইরো ডেলা ফ্রান্‌চেস্‌কা। ইতালীর জগদ্বিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্করদের মধ্যে ফ্রা এঞ্জেলিকো, বোটিচেল্লি, মান্টেনিয়া, বেলিনি, লেওনার্দো দা ভিন্‌চি, রাফায়েল এবং মিকেলাঞ্জেলো এ-সময়েই জন্মেছিলেন। শিল্প ঐতিহাসিক এভিথ্ টোমোরি ওই সময়ের চিত্রকর এবং ভাস্করদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'During this period, artists began to assert their individuality. In contrast to medieval anonymity, individual artists now became more important'.

উল্লিখিত সময়ে প্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় ইতালীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আর্থিক সঙ্গতিও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যায়। ইতালী থেকে যেসব পণ্য বিদেশের বাজারে চালান যেতো—তার মধ্যে অন্যতম ছিলো চিত্রিত ও অলংকৃত মাইয়োলিকা। স্বদেশের

অর্থশালী ও অভিজাতমহলে শিল্পকলার অন্যতম নিদর্শনরূপে চিত্রিত ও অলংকৃত মাইয়োলিকার চাহিদাও ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠ্‌ছিলো। উচ্চমানের শিল্পিত মাইয়োলিকার যেসব নিদর্শন এ সময়ে ইতালীতে নির্মিত হয়েছিলো, তার মধ্যে কিছুসংখ্যক নিদর্শনেরই সঠিক নির্মাণকাল এযাবত নির্ধারিত হয়েছে। এসব নিদর্শনের মধ্যে আছে চিত্রিত ও অলংকৃত পাত্র, থালা এবং টালি।

ষোড়শ-অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে নির্মিত বলে চিহ্নিত ইতালীয়ান শিল্পিত মাইয়োলিকার নিদর্শনগুলো সমগ্রভাবে পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে এটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে যে, তৎকালীন মাইয়োলিকাশিল্পীরা পাত্রের গড়ণের তুলনায় চিত্রাঙ্কণের প্রতিই যেন বেশিমাত্রায় মনোযোগী ছিলেন। অবশ্য সেসময়ে ইতালীয়ান দেয়ালচিত্র এবং তৈলচিত্রের চূড়ান্ত বিকাশের পরিমণ্ডলে মাইয়োলিকাশিল্পীদের চিত্রকলার প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব হয়তো অনিবার্যই ছিলো। এই কারণেই স্পেনীয় মাইয়োলিকার লাস্‌চারঅলংকরণের মতো ইতালীয়ান মাইয়োলিকার লাস্‌চারঅলংকরণ বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি। ইতালীয় মাইয়োলিকাশিল্পীদের অলংকরণের তুলনায় দৃশ্যচিত্র এবং কাহিনীচিত্র অঙ্কণের দিকে ঝোঁক বেশিমাত্রায় থাকার ফলে তাঁরা লাস্‌চার-এর চাইতে সিরামিকরঙ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। লাস্‌চারএর তুলনায় সিরামিক-রঙএর বর্ণালী (Shade)-র সংখ্যা বেশি; তাছাড়া ছায়াতপের পরিস্ফুটনে সিরামিকরঙ ব্যবহার করাও সুবিধাজনক। প্রয়োজনে সিরামিকরঙ পুরু অথবা পাতলা করে লাগানো চলে, লাস্‌চার সেভাবে লাগানো সম্ভব নয়।

দৃশ্যচিত্রণ এবং কাহিনীচিত্রণে ইতালীয়ান মাইয়োলিকাশিল্পীরা অতুলনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু গড়ণের দিকে ততোটা মনোযোগী না হবার ফলে মাইয়োলিকাপাত্রগুলোকে প্রায় একই ধরণের—অর্থাৎ বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়। ইতালীয়ান দেয়ালচিত্র এবং ইজেল-চিত্রে দেয়াল, কাঠ অথবা ক্যানভাস্‌এর সমতলক্ষেত্রের ওপর অঙ্কিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিত (perspective) যেভাবে দেখানো হয়েছে, সিরামিকপাত্র এবং থালার উত্তল-অবতলক্ষেত্রে চিত্রিত বিষয়বস্তুর পরিপ্রেক্ষিত সেভাবেই দেখাবার চেষ্টা করেছেন ইতালীয় মাইয়োলিকা-শিল্পীরা। এর ফলে পাত্র ও থালায় চিত্রিত মনুষ্যমূর্তি, জীবজন্তু অথবা গাছপালার আকৃতি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে সামঞ্জস্যহীন এবং বিকৃতরূপ। তাছাড়া অতিরিক্ত বাস্তবানুগতা এবং অলংকরণের বাহুল্য যে ইতালীয় শিল্পিত মাইয়োলিকার শিল্পরসকে ক্ষুণ্ন করেছে—একথাও স্বীকার করতে হয়। সম্ভবতঃ এসব কারণেই উনবিংশ খ্রীষ্টীয় শতকের সেই সুপরিচিত রুপদী শিল্পকলা বনাম ব্যবহারিক শিল্পকলার বিতর্কে উল্লিখিত শিল্পিত মাইয়োলিকার নিদর্শনগুলো 'Lessor art' অথবা 'Minor art' নামে অভিহিত হয়েছিলো। সে-বিতর্কের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কোনো মত প্রকাশ না করেও একথা অবশ্যই বলা চলে যে, ইতালীর সাংস্কৃতিক বিবর্তনের মূল্য নির্ধারণে ষোড়শ-অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকে নির্মিত ইতালীয়ান শিল্পিত মাইয়োলিকার নিদর্শনগুলো অতি মূল্যবান নমুনারূপেই বিবেচিত হবে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ—দীলিপকুমার মুখোপাধ্যায়। মণ্ডল বুক হাউস। ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯ প্রথম প্রকাশ ১৩৮৬। দাম কুড়ি টাকা। পৃষ্ঠা—২৭২।

—সঙ্গীতসেবী শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত "সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ" ক্রমবর্ধমান-রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ সাহিত্যে এক মৌলিক, গবেষণামূলক সংযোজন। নিরলস অধ্যয়ন, কঠোর পরিশ্রম ও অসীম ধৈর্যের ফসল এই গ্রন্থ। বিদ্বৎসমাজের সর্বত্র যে এই গ্রন্থ সমাদৃত হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সঙ্গীতের জগতে শ্রীরামকৃষ্ণের অবাধ আধ্যাত্মিক বিচরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা লেখক তুলে ধরেছেন নিপুণভাবে, দরদের সঙ্গে। অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে তিনি উপস্থাপন করেছেন ভাবান শ্রীরামকৃষ্ণকে গায়করূপে, শ্রোতারূপে, সমালোচকরূপে, গুণগ্রাহীরূপে, তাত্ত্বিকরূপে, ভাবুকরূপে। মোট দশটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে বিবিধ বিষয় যথা, শ্রীরামকৃষ্ণের গীত গানের শ্রোতৃবৃন্দ, বিবিধ গানের প্রসঙ্গ, গীত গানের প্রকারভেদ, তাঁর গান শিক্ষার কথা, তাঁর পার্ষদবৃন্দের গান, তাঁর পাওয়া শেষ গান প্রভৃতি। রামকৃষ্ণজীবনের সঙ্গীত-বিষয়ক বহু তথ্যবহুল ঘটনা লেখক পরিবেশন করেছেন এবং তাদের উৎসগ্রন্থাদির সন্ধানও দিয়েছেন যথাযথভাবে। নিরলস প্রচেষ্টা ও অনুসন্ধানের ফলে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণের গীত গানগুলির পরিসংখ্যানভিত্তিক বিবরণ দিতেও সক্ষম হয়েছেন। সামগ্রিক বিচারে গ্রন্থটি রামকৃষ্ণসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে।

উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অসংখ্য কুসংস্কার, গোড়ামী, ধর্মান্ধতা, সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতায় ভরা ভরাক্রান্ত সমাজে তিনি এলেন ধর্মসংস্থাপক-রূপে—নিয়ে এলেন সত্যের বাণী। তাঁর জীবন ও কথামৃত নূতন পথের সন্ধান দিল। লোকশিক্ষার জন্য তিনি বেছে নিলেন সঙ্গীতকে। তাঁর গান মানুষের প্রাণে জাগাল ধর্ম-পিপাসা, জটিল অনুভূতিগ্রাহ্য অধ্যাত্মবিষয়কে তিনি গানে ও কথায় উদ্ভাসিত করলেন, মানব-জীবনের পরমপ্রেয় আত্মজ্ঞান লাভ করার পথনির্দেশ দিলেন···অধ্যাত্ম বিষয়ের ভাব অনুসারে সঙ্গীত পরিবেশনায় তিনি ছিলেন অনন্য। কখনো ব্যাখ্যা, কখনো বর্ণনা, কখনো বা টীকাস্বরূপ ছিল তাঁর সঙ্গীত। বিষয়বস্তুর বিস্তারে তার প্রাণ স্ফূর্তিলাভ করে—গানে। তাঁর নন্দন সত্তায় এই এক পরমপ্রকাশ। কথার তুল্য অনর্গল উৎসারিত গীতধারা। সুর ও বাণীর সম্মিলনে তাঁর বক্তব্যের পূর্ণতা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে সঙ্গীতের এই দিকগুলি নিয়ে আলোচনার এক প্রশংসনীয় প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু পরিসংখ্যানের প্রাচুর্য ও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রয়োজনীয় ঘটনার সমাবেশ গ্রন্থটির অকারণ আয়তন বৃদ্ধি করেছে। সমগ্র আলোচনা, তত্ত্ব ও দর্শনভিত্তিক না হয়ে অনেকটা সাংবাদিকের সংবাদ পরিবেশনের কৌশলে উপস্থাপিত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বিবিধ অধ্যাত্ম প্রসঙ্গের অবতারণায় কিভাবে সঙ্গীত নির্বাচন ও পরিবেশন করতেন—তার

প্রয়োগশৈলী বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বিবিধ সঙ্গীতের শ্রেণী অনুসারে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত হলে আলোচনার গভীরতা বৃদ্ধি পেত এবং গ্রন্থটি রামকৃষ্ণসাহিত্যে এক অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারত। আশাকরি, আগামী সংস্করণে লেখক এব্যাপারে মনোযোগ দেবেন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ, মুদ্রণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কাজ একথায় সুন্দর।

"বিবেক ভারতী"—প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র। সম্পাদক—ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, প্রকাশক—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র চৌধুরী, প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ। পোঃ ইটাচুনা, জিলা—হুগলী। শ্রীরামকৃষ্ণ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৮৬।

—শ্রীরামকৃষ্ণবিবেকানন্দের ভাবাদর্শে পরিচালিত পত্রপত্রিকা দেশ ও জাতির অশেষ কল্যাণসাধনের ক্ষমতা রাখে, এই ক্ষুদ্র ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি তাহার ব্যতিক্রম নয়। পরন্তু অধ্যাপক ঘোষের মত সুযোগ্য ব্যক্তির সম্পাদনায় পত্রিকাটি এক অনবদ্য আধ্যাত্ম ভাবমাধুর্য্য লাভ করিয়াছে। ত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের রচনায় পত্রিকাটি পুষ্ট। সমাজের সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণীর ও সকল বয়সের মানুষ এই পত্রিকা নিয়মিত পাঠে প্রকৃত সুখ ও শান্তির সন্ধান পাইবেন। বিশেষতঃ বর্তমানের বিক্ষুব্ধ যুবসম্প্রদায় এই পত্রিকা পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা রাখি। পত্রিকাটির বহুল প্রচার কামনা করি।

"উত্তরসূরি"—কাব্যকেন্দ্রিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্য। কার্যালয় ৯বি/৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৭০০০৫০। বৈশাখ—আষাঢ়, ১৩৮৬।

—'উত্তরসূরি'র বর্তমান সংখ্যাটি পড়ে বেশ ভালো লাগল। একটি নির্খুঁত কাব্যকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক পত্রিকা। বর্তমান সংখ্যায় রয়েছে কবি বিষ্ণু দে-কে কেন্দ্র করে সুধীন্দ্র নাথ সম্বন্ধে মূল্যবান প্রবন্ধ "পত্রদর্পণে সুধীন্দ্রনাথ ও কিছু প্রাসঙ্গিকতা"। অত্যন্ত তথ্যবহুল গবেষণামূলক সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীঅরুণ ভট্টাচার্যের কবিতাবলী নিঃসন্দেহে মনোগ্রাহী, আধুনিক ও রুচিশীল, অন্যান্য রচনাগুলিও সুন্দর সুখপাঠ্য। বিদ্বৎসমাজে পত্রিকাটি সমাদৃত। সাধারণ্যে ইহার বহুল প্রচার কাম্য।

তপন কুমার পাঁ

●

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

With the Compliments of :—

TATA STEEL

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-700014

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6. DUFF STREET.
CALCUTTA-700006

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র ভদ্রস্থায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

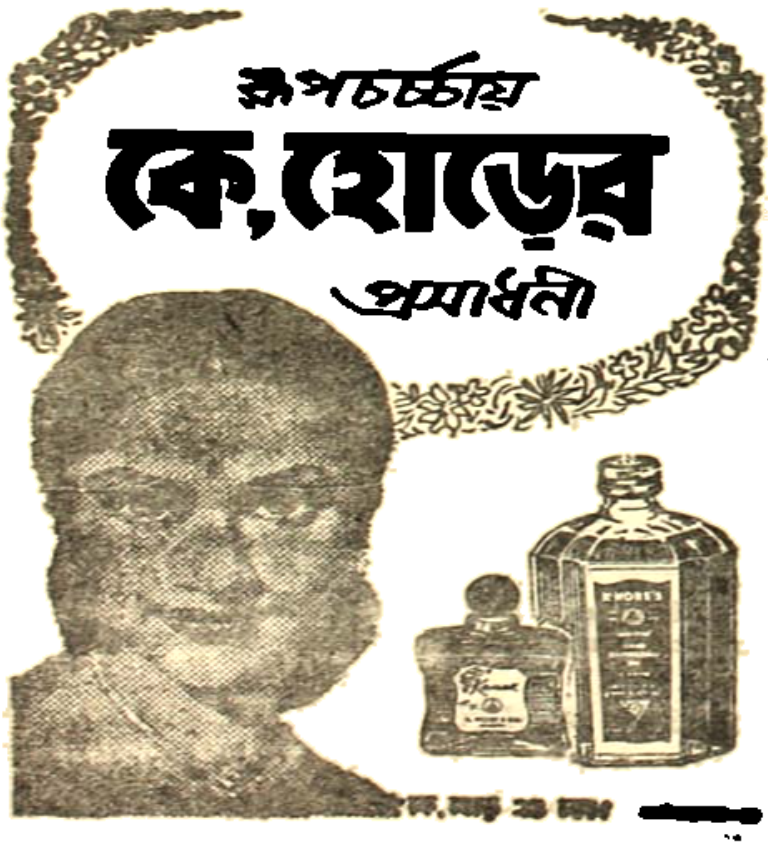

জ্যোতির্বাণী

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্যোতিষ সম্পর্কীয় মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক : শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী

সাংখ্যাদিতীর্থ, দর্শনাচার্য, বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের, রাজ্যপাল-অনুমোদিত সদস্য।

ডাইরেক্টরী পঞ্জিকার প্রধান জ্যোতিষী।

এই পত্রিকায় প্রতি মাসে বিস্তৃত ব্যক্তিগত রাশিফল থাকে। বেদ, দর্শন, ওঝা, জ্যোতিষ ও ধর্ম-সম্পর্কীয় আলোচনা থাকে।

প্রতি সংখ্যা ২ টাঃ। ২০·০০টাকা পাঠাইয়া বার্ষিক গ্রাহক হইলে ডাক-ব্যয় লাগে না।

৬/১, হিন্দু পালিত লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬
ফোন : ৫৫-৫১১৫

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1200)
19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year, July 1980
VOL. V

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

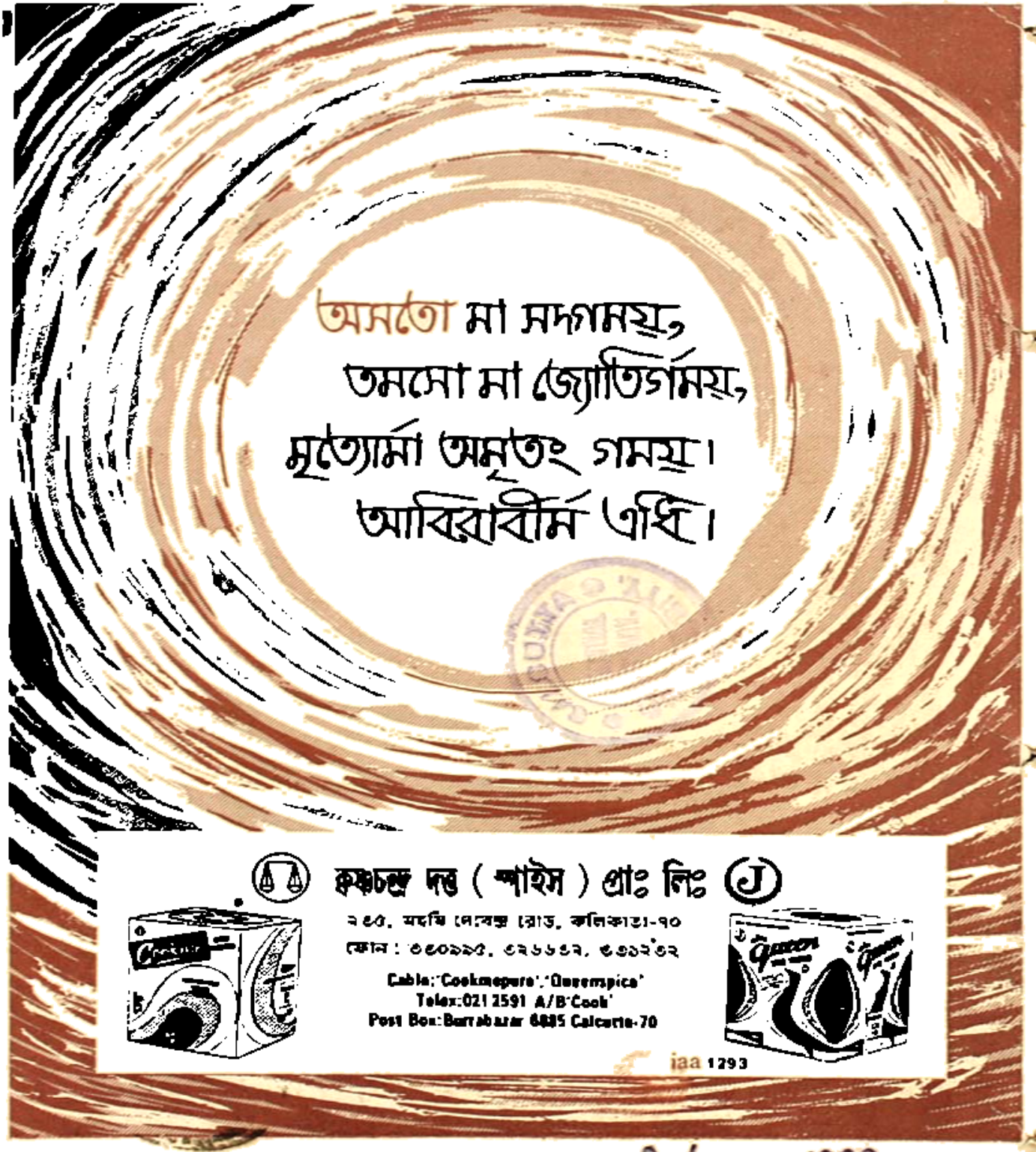

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৫০২৯৩, ৩২৬৬৩, ৩৩১৩২
Cable:'Cookmepure','Oneempice'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70
iaa 1293

24 JUL 1980

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
8, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-700006
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012

IICE Rs. 1·50
মূল্য ১·৫০টাকা

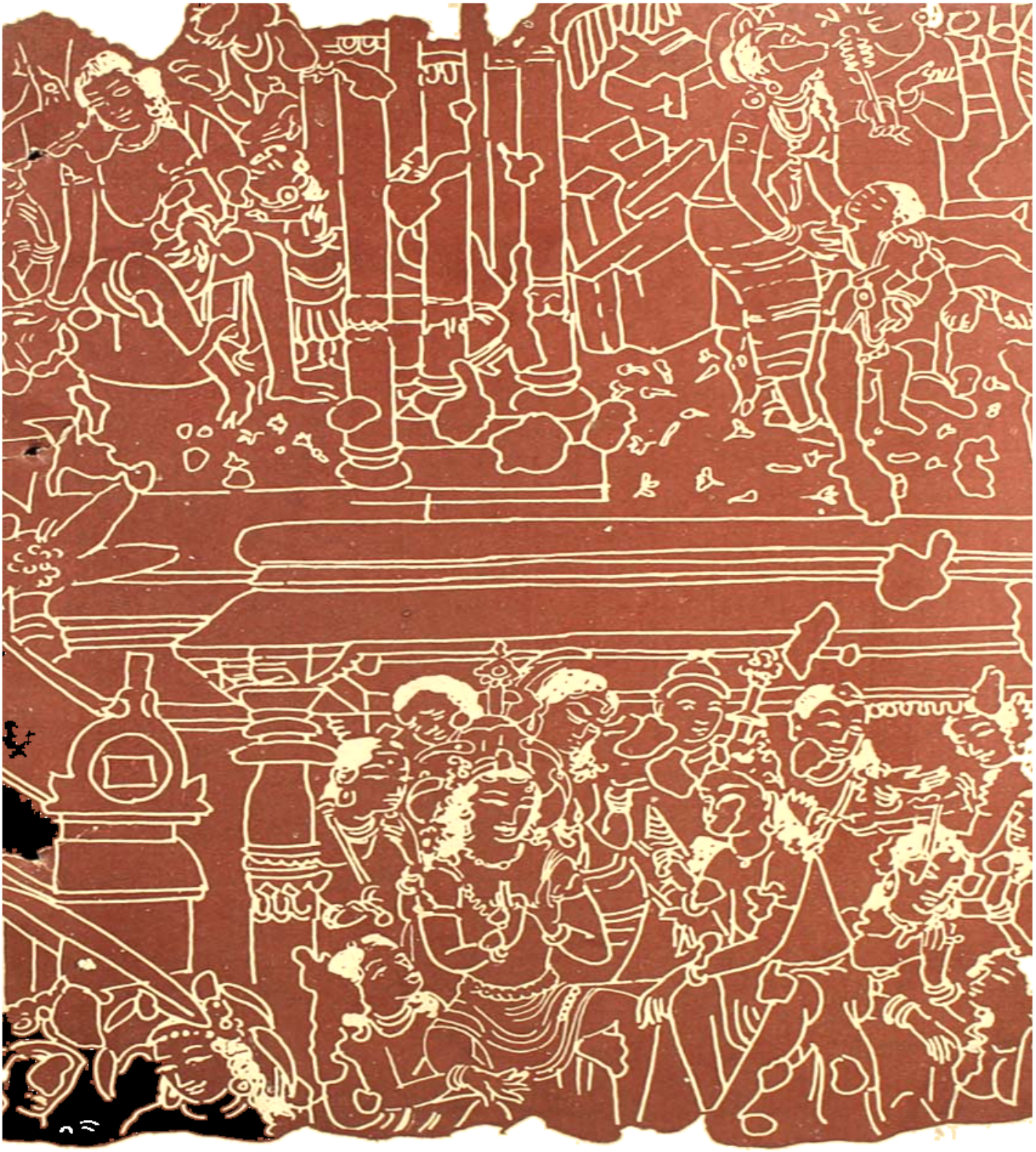

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
ষষ্ঠ সংখ্যা
শ্রাবণ
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্ধাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-০০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

ফুলালের তালমিছরী

প্রস্তুতকারক
শ্রীহরিপদ দত্ত এণ্ড কোং
৮, বেনাচিতি লেন, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-৫৮৩৯

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধ

ভাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৪

ফোন : ৪২-৮৪২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

Space Donated by :—

A WELLWISHER

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন ৫৫-২৫৪৯ । ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JECT' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.B. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলি. ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিখ্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৪৭, ফোন : ৪৫-১৮০০

শ্রাবণ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এ'টি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবতগীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্. বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

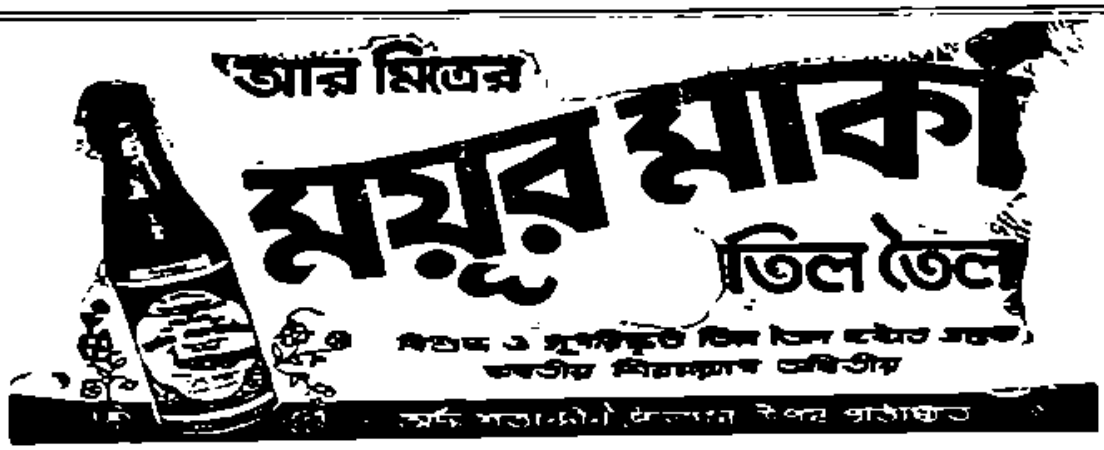

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

শ্রাবণ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	২৭১	
২।	কেশব কালী মেনেছিলো	২৮৪	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা	২৮৯	শ্রীভূপতি চট্টোপাধ্যায়
৪।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	২৯১	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৫।	শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাঙ্গনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	২৯৩	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
৬।	পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা —স্বামী অভেদানন্দ	২৯৮	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৭।	রামমোহন ও বাঙলার নবা সংস্কৃতি	৩০০	শ্রীরণজিৎকুমার সেন
৮।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	৩০৫	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৯।	বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা	৩১০	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
১০।	ভারতাত্মা-স্বামী বিবেকানন্দ	৩১২	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
১১।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম উপন্যাস' কি 'তত্ত্বমূলক'	৩১৭	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১২।	পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা	৩২০	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১৩।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৩২৩	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৪।	সংঘবার্তা	৩২৬	

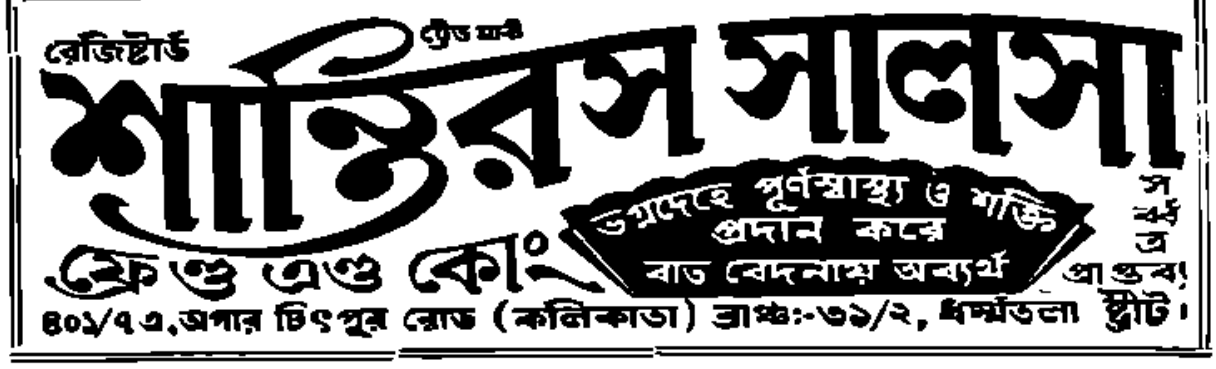

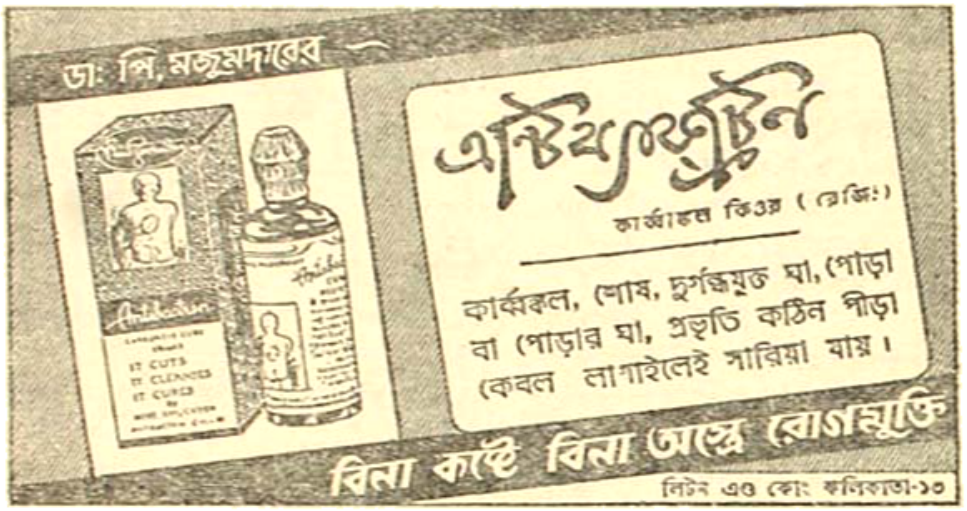

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Rd. Office :

87, Baniyl Subhas Road

Calcutta-1

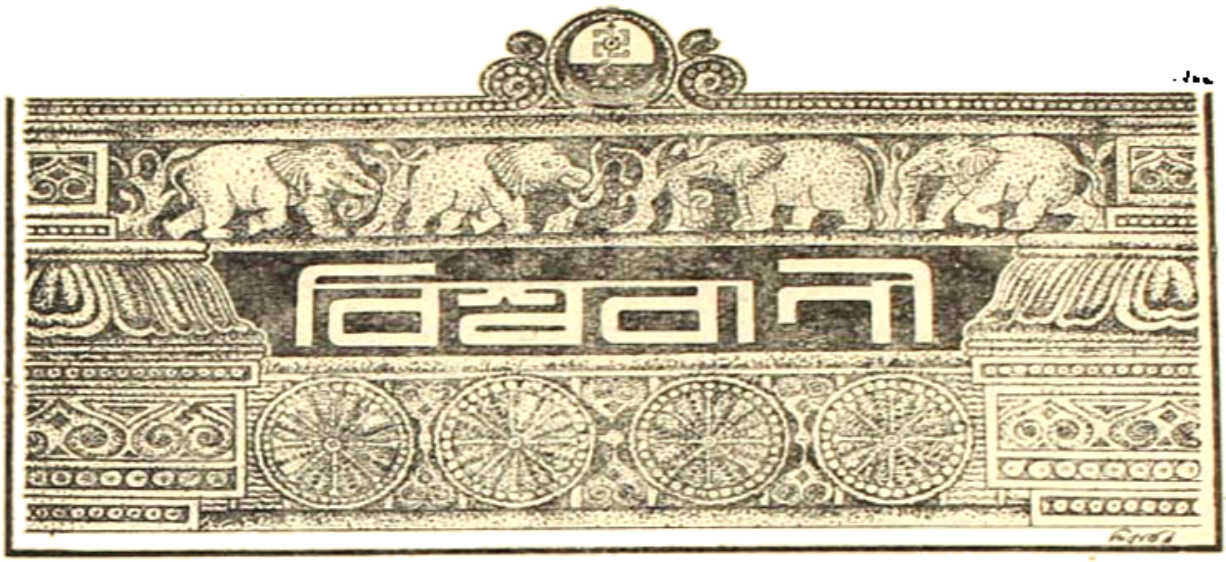

বিয়াল্লিশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা | শ্রাবণ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি আর শক্তিমান অভেদ ॥

(তৃতীয়াংশ)

পূর্বে গৌড়পাদকারিকামতে ব্রহ্ম ও জগৎ-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করেছি। এখানেও যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের মতে ব্রহ্ম ও জগৎ-সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেবার চেষ্টা করবো, কেননা সকল যুগের বা সময়ের শাস্ত্রকারগণ ও শাস্ত্রসকল ব্রহ্ম বা ঈশ্বর, জীব ও জগতের সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মনির্বাণ বা মুক্তির আলোচনা করেছেন—যদিও সকলের মতকে ও দৃষ্টিভঙ্গীকে ঠিক একরকম বা সমান বলা যায় না। তবে যথার্থ-উপলব্ধির ও চরমসিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ক্ষেত্র অবশ্য এক।

'যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ'-কার একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান ছাড়া জীব-জগৎ ও কোন-কিছুর সত্তাই স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে জগৎ ও বিশ্বরচনা বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশকুসুমের মতো মিথ্যা বা অলীক, আর সত্য একমাত্র ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান। উৎপত্তিপ্রকরণে (৭ম সর্গ) বশিষ্ঠদেব যখন বলেছেন—

যথা বন্ধ্যাসুতোনাস্তি যথা নাস্তি মরৌ জলম্।
যথা নাস্তি নভোবৃক্ষস্তথা নাস্তি জগদ্ভ্রমঃ ॥
যদিদং দৃশ্যতে রাম তদ্ব্রহ্মৈব নিরাময়ম্।

ব্রহ্মের সত্তাই একমাত্র গ্রাহ্য, জগতের সত্তা নাই, সুতরাং ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমও মিথ্যা (অসৎ)। শ্রীরামচন্দ্র তখন বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, জগতের সত্তা যদি না থাকে (অসৎ হয়),

তবে আমরা যে জগতের বাস্তব রূপ ও দৃশ্য দেখি তারা মহাপ্রলয়ের সময় তাহলে কোথায় থাকে ? এর উত্তরে বশিষ্ঠদেব বলেন—

কুত্র যাস্যতি কীদৃগ্ বা বন্ধ্যাপুত্রঃ ক গচ্ছতি।
ক যাতি কুত্র যাস্যতি বদ বা ব্যোমকাননম্ ॥

প্রশ্ন হ'ল : 'যত্ত ইদমিখং ভাস্বরং স্ফুটতরং দৃশ্যং প্রত্যক্ষাদিসূচীকৃতং জগৎ মহাপ্রলয়সমাপ্তৌ ক ইব তিষ্ঠতি'।

উত্তর হ'ল : 'সর্বপদার্থানুৎপত্তিকালে যদি পৃথক্সত্তয়া কুতশ্চিদাগমনং তাৎ তর্হি তস্য প্রলয়েঽন্যত্র গমনং তস্য স্থিতিশ্চ স্যাৎ তবেব তাবৎ বন্ধ্যাপুত্রবদস্য নাস্তীতি'।

বশিষ্ঠদেব পুনরায় উত্তরে বলেন—

বন্ধ্যাপুত্রব্যোমবনে যথা নষ্টঃ কদাচন।
জগদাস্থবিলং দৃশ্যং তথা নাস্তি কদাচন ॥
ন চোৎপন্নং ন চ ধ্বংসি যৎ কিলাদৌ ন বিদ্যতে।
উৎপত্তিঃ কীদৃশী তস্য নাশশঙ্কা কা কথা ॥

• • •

যদিদং দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ সর্বৈবাস্মনি সংস্থিতম্।
নাস্তমেতি ন চোদেতি জগৎ কিঞ্চিৎ কদাচন ॥
যথা দ্রবত্বং সলিলে স্পন্দনং পবনে যথা।
যথা প্রকাশ আভাসো ব্রহ্মৈব ত্রিজগৎ তথা ॥
যথাপূরমিবাম্ভোধাবিদমেব স্বয়ম্বিদঃ।
তথা জগদিবাভাতি স্বাত্মৈব পরমাত্মনি ॥

এর টীকাকার বলেছেন : 'সর্বাত্মকাত্মরূপং ইদং বহির্নিস্তিমিতমনঃ স্বস্যাবলোকনপ্রকারাস্পদত্বস্য মনোমননপ্রকারাস্পদং কৃত্বা স্বয়মেবোদেতি বিলীয়তে চ। উদয়বিলয়ভাবেন আত্মা বিভাবাত ইত্যর্থঃ'।

যোগবাশিষ্ঠকার বৌদ্ধযোগাচারী বিজ্ঞানবাদীদের মতো বিজ্ঞানই (মানুষের মধ্যে, বাইরে নয়) স্বীকার করেন। তাঁরা বিজ্ঞানের বহির্বিকাশ স্বীকার করেন না, এজন্য বিজ্ঞান বা মনের বহির্বিকাশকে মিথ্যা স্বপ্নতুল্য বলেন। ইংরাজীতে এই বিষয়ী-বিজ্ঞানের নাম subjective idealism—যা solipsism-এর নামান্তর[১] আচার্য গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত অনেকটা তাই। গৌড়পাদ পারমার্থিকসত্তাসম্পন্ন ব্রহ্মসত্তারই একমাত্র সত্যতা স্বীকার করেন, আর শূন্যবাদী নাগার্জুনও প্রকারান্তরে বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদী (subjective Idealist)—যদিও তাঁর বিষয়ী নির্বিষয়-শূন্যতায় পর্যবসিত বলা যায়। আচার্য শঙ্কর কিন্তু যোগবাশিষ্ঠের সিদ্ধান্ত স্বীকার

১। *Solipsist* : 'a person who claims that only he himself exists really; all other persons and all things are merely ideas in his own mind'—Vide A History of Modern Philosophy, p. 625.

করেন নি, তাছাড়া 'বোধবাসিষ্ঠরামায়ণ'-গ্রন্থরূপে তাঁর সময়ে রচিতই হয়নি। যোগবাসিষ্ঠরামায়ণ শঙ্করের অনেক পরবর্তী গ্রন্থ, তাই আচার্য শঙ্করের কোন ভাষ্যে ও গ্রন্থেই যোগবাসিষ্ঠরামায়ণের কথা বা প্রসঙ্গ নাই। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে আচার্য শঙ্করের নামে 'চলাচলং ভাতি মনোবিলাসম্' —কথাটি পাওয়া যায়, কিন্তু তার অর্থ মনের বাইরে জগতের সত্তা বা অস্তিত্ব নাই নয়, তার অর্থ মানুষ তার মনের বিলাসরূপ বাসনা-কামনা দিয়েই সংসারের বিচিত্র ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে। আচার্য শঙ্কর তিনটি সত্তা স্বীকার করেছেন—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক।[২] পারমার্থিকসত্তাই ত্রৈকালিক অর্থে বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ এই তিনকালস্থায়ী, আর ব্যবহারিকসত্তা পারমার্থিকসত্তারূপ শাশ্বত-ব্রহ্মসত্তার প্রত্যক্ষ বা প্রত্যক্ষোপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহারিকভাবে থাকে, কিন্তু ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হলে ব্যবহারিকসত্তা বাধিত হয় বলতে ব্যবহারিকসত্তাই পারমার্থিকসত্তার রূপান্তরিত হয়, আর প্রাতীতিকসত্তা (apparent existence) ব্যবহারিকসত্তা দিয়েই বাধিত বা নষ্ট হয়। যদিও আচার্য শঙ্কর গৌড়পাদের শিষ্য অদ্বৈতবাদী গোবিন্দপাদের সাক্ষাৎশিষ্য, তবুও শঙ্কর গৌড়পাদের বিষয়ী-বিজ্ঞানবাদরূপ পারমার্থিকসত্তামাত্রই গ্রহণ করেন নি, তিনি বিষয়-বিজ্ঞানরূপ (Objective Idealism) ব্যবহারিকসত্তা স্বীকার করেছেন জগদ্ব্যবহারের (সংসারে কার্যনির্বাহের) জন্য।

আসলে কথা এই যে, শঙ্করের মতে নাম-রূপাত্মক জগতের ব্যবহারিকসত্তা সাময়িক স্বীকার করা হয়, কিন্তু বিজ্ঞানবাদীদের মতে ব্যবহারিকসত্তা অস্বীকার করা হয়। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধযোগাচারীরা বলেন যে, ব্যবহারিক (আপাতিক) সকল পদার্থই বিজ্ঞানের আকারবিশেষ। বাইরে অর্থাৎ বাহ্যজগতে তাদের কোন অস্তিত্ব বা সত্তা নাই, বাইরে তারা প্রতীত হলেও তাদের প্রতীতি ভ্রমপূর্ণ—সত্য নয়, এবং বাইরে তাদের যথার্থসত্তা নাই বলে ভ্রমপূর্ণ এবং ঐ ভ্রম নিরধিষ্ঠানক, কেননা বিজ্ঞান (মনের idea) মানুষের আন্তর বস্তু এবং ঐ বিজ্ঞানই একমাত্র সৎ বা সত্তাযুক্ত, সুতরাং বহিঃপ্রতীয়মান ভ্রম নিরধিষ্ঠান বলতে ঐ ভ্রমের অধিষ্ঠান (background) সম্পূর্ণ কল্পিত, আর ঐ কল্পিত অধিষ্ঠানেই আন্তরবস্তু বিজ্ঞানের আকার বা (idea) আরোপমাত্র। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তমতে ভ্রম নিরধিষ্ঠানক নয়, ভ্রমের একটি অধিষ্ঠান থাকেই—যেমন দড়িতে সর্পভ্রমের অধিষ্ঠান বা আধার দড়ি, তেমনি অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রহ্মে জীব-জগতের ভ্রমের আধার বা অধিষ্ঠান ব্রহ্মই, এজন্য ভ্রম (মৃষাভ্রম) দূর হলে অধিষ্ঠান-ব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র প্রতীত হয়। সুতরাং ব্রহ্মে বা ব্রহ্মচৈতন্যে বিশ্বপ্রপঞ্চকে অধ্যাস হয় (শঙ্করের অধ্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য) এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের বা জীবজগতের আধার কিংবা অধিষ্ঠান সদ্বস্তু ব্রহ্মই, আর তাহলেই নাম-রূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানেই অধ্যস্ত। অধ্যস্ত বলতে ভ্রমে আমরা ব্রহ্মকে জগৎ বলে দেখি। অধ্যাসের অর্থই তাই যে, অজ্ঞানের আবরণ সত্য নয় এবং সত্য নয় বলেই অজ্ঞান-আবরণের অপসারণে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়—যেমন মেঘরূপ আবরণ সরে গেলে সূর্য প্রকাশিত হয়।

২। অনেকে 'মূল্যসত্তা' নামে আর একটি সত্তা স্বীকার করেন— যদিও সেই সত্তা কোথাকিছুই প্রতীত হয় না।

অদ্বৈতবেদান্তের মতে যতক্ষণ না ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি হয় ততক্ষণই ব্যবহারিক প্রতীতিরূপ প্রমা বা জ্ঞান হয়, অথচ সেই জ্ঞান যথার্থজ্ঞান নয়। বেদান্তপরিভাষাকার সেজন্য বলেছেন—

দেহাত্ম প্রত্যয়ো যদ্বৎ প্রমাণত্বেন কল্পিতঃ।
লৌকিকং তদ্বদেবেদং প্রমাণং ত্বাত্মনিশ্চয়াৎ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতবাদ এ'থেকে একটু বিচিত্র ও অভিনব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীকে (ভক্তকে) বলেছেন : "এরই নাম মায়া। মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বোধ হয়। সৎ অর্থাৎ যিনি নিত্য—পরব্রহ্ম। অসৎ—সংসার অনিত্য।"...

"যতক্ষণ মায়ার ভিতর আছ, যতক্ষণ মায়ামেঘ রয়েছে, ততক্ষণ জ্ঞানসূর্য কাজ করে না। মায়া-ঘর ছেড়ে বাহিরে এসে দাঁড়ালে (কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগের পর) তবে জ্ঞানসূর্য অবিদ্যা নাশ করে। ঘরের ভিতরে আগুনসকাঁচে কাগজ পুড়ে না, ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালে রোদটি কাছে পড়ে তখন কাগজ পুড়ে যায়" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ১০৬)।

পুনরায় 'সব চিন্ময় দর্শন'-আলোচনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব মণিকে (শ্রীম-কে) উদ্দেশ ক'রে বলেছেন : "জগৎ মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। তাঁকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন।

"আমার মা (শ্রীশ্রীভবতারিণী) দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব (জীব-জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব) হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়। প্রতিমা চিন্ময়। বেদী চিন্ময়। কোশা-কুশী চিন্ময়। চৌকাট চিন্ময়। মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়। ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দরসে। কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্টলোককে দেখলাম, কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর (ঈশ্বরের) শক্তি জলজল করছে দেখলাম।

"তাইতো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম—মা-ই সব হয়েছেন—বিড়াল পর্যন্ত।...তাঁকে (ঈশ্বরকে) লাভ করলে এইগুলি ঠিক (প্রত্যক্ষভাবে) দেখা যায়—তিনিই (ঈশ্বরই) জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।.....বিচার ক'রে একরকম দেখা যায়, আর তিনি (ঈশ্বর) যখন দেখিয়ে দেন, তখন আর এক রকম দেখা যায়" (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩১-৩৩)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই সার্বিক ও সর্বাশ্রয়ী চিন্ময়দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যায়, সকল দার্শনিকদের সিদ্ধান্তই ঠিক। তবে জগৎ মিথ্যা বা অসৎ—এ'তত্ত্ব ব্রহ্মানুভূতি ছাড়া কেবল বিচারে হয়, তবে ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মানুভূতির পর দেখা যায় যে, এক ও অখণ্ড ব্রহ্মই দুই বা বিচিত্র ও খণ্ডরূপ—জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সব-কিছুই হয়েছেন, ব্রহ্মছাড়া কোন-কিছুরই অস্তিত্ব নাই। একটি জ্ঞান, আর একটি বিজ্ঞান বা বিশেষজ্ঞান।

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'-বাক্যের মধ্যে শক্তিমান বলতে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ' কথাই বলেছেন, কেননা ঈশ্বরই সর্ববীজময়ী প্রকৃতি বা

নিজশক্তি মায়ার সাহায্য নিয়ে ('মায়াবিম্বং বশীকৃত্য') বিশ্বসৃষ্টি করেন। ব্রহ্মসূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সেই অভিপ্রায়ই স্বীকার করে। আচার্য শঙ্কর ঐ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলেছেন : " 'অস্য' জগতঃ নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-নিমিত্ত-ক্রিয়া-ফলাশ্রয়স্য মনসা অপি অচিন্ত্য-রচনারূপস্য 'জন্মস্থিতিভঙ্গং' 'যতঃ' সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি 'তদব্রহ্ম' ইতি বাক্যশেষঃ"। 'তদ্‌ব্রহ্ম'—তা-ই ব্রহ্ম। অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুর পরিচয় তাঁর ঐ নিজশক্তিজাত সৃষ্টি-আদি ফলশ্রুতি বা কার্য থেকেই দেওয়া হ'ল। 'ভামতী'-ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র ঐ সূত্রভাষ্যে যথাযথ অর্থ বা ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন : আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরসৃষ্ট জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্যের পক্ষে চারটি বিশেষণের উল্লেখ করেছেন—

১ম—নামরূপাভ্যাং ব্যাকৃতস্য,
২য়—অনেককর্তৃভোক্তৃসংযুক্তস্য,
৩য়—প্রতিনিয়তদেশকালনিমিত্তক্রিয়াফলাশ্রয়স্য,
৪র্থ—মনসাঽপি অচিন্ত্যরচনারূপস্য।

এবং আচার্য শঙ্কর পরিশেষে বলেছেন : "এতৎ এব অনুমানং সংসারিব্যতিরিক্তেশ্বরাস্তিত্বাদি-সাধনং মন্যন্তে ঈশ্বরকারণিনঃ"। অতএব সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই (সগুণব্রহ্ম) যে জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়ের কারণ, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

আচার্য শঙ্কর ১।১।২ সূত্রের ভাষ্যে পুনরায় বলেছেন : "বেদান্তবাক্যানি হি সূত্রে: উদাহৃত্য বিচার্যন্তে। বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননিবর্ত্ত্যা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, ন অনুমানাদিপ্রমাণান্তর-নিবর্ত্ত্যা…"। কথা এই যে, জন্ম-স্থিতি-লয়ের কারণ সগুণব্রহ্মের অথবা ব্রহ্মস্বরূপের অবগতির (জ্ঞানের) জন্য প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিই প্রমাণ, তবে অনুমান তার সহায়করূপে একেবারে পরিত্যাজ্য নয়। কিন্তু আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মজ্ঞানবিষয়ে অনুমানকে (প্রমাণকে) সত্যকারভাবে স্বীকার করেন নি, তিনি বলেছেন যে, 'শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ' (বৃহঃ উঃ ২।৪।৫) প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য ও বেদান্তবাক্য ('তত্ত্বমসি') প্রভৃতির অর্থবিচার থেকেই ব্রহ্মের যথার্থজ্ঞান লাভ করা যায়, সুতরাং অনুমান এখানে নিরর্থক—"বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননিবর্ত্ত্যা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, ন অনুমানাদিপ্রমাণান্তরনিবর্ত্ত্যা"।

এ'কথার উত্তরে বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বীরা আপত্তি ক'রে বলেন—একথা ঠিক যে, বেদান্তবাক্যের বিচার, মনন ও নিদিধ্যাসন থেকে (ব্রহ্মের) শাব্দবোধ হয়, সুতরাং অবিদ্যানিবৃত্তিরূপ মোক্ষলাভও হয়, কিন্তু ঐ শাব্দবোধরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্বরূপভূত বা যথার্থব্রহ্মজ্ঞান নয়, ঐটি বৃত্তিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। ঐ বৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণের পরিণতিবিশেষ বা অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকার-বৃত্তিবিশেষ।[৩] কিন্তু ঐ আপত্তি খণ্ডন ক'রে কোন কোন অদ্বৈতবাদী বলেন যে, ঐ ব্রহ্মজ্ঞান বৃত্তিজ্ঞান নয়, বরং ঐ জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপতা বা ব্রহ্মের যথার্থজ্ঞান। কথা এই যে, বেদান্তবাক্যের

৩। আচার্য পদ্মপাদ চতুঃসূত্রীভাষ্যে একথা (ব্রহ্মবৃত্তি) স্বীকার করেছেন। বিচারে বৃত্তিজ্ঞান প্রথম হয় ও তারপরে ব্রহ্মের যথার্থজ্ঞান হয়।

শ্রবণে, মননে ও নিদিধ্যাসনে অন্তঃকরণের মূলকারণ যে অজ্ঞান বা অবিদ্যা—তার বিলয় হয়। সুতরাং 'অধ্যবসান'-শব্দের অর্থ এখানে - ব্রহ্মের নিশ্চয় বা যথার্থজ্ঞান। 'ভামতী'-তাতে এজন্য বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন যে, বেদান্তবাক্যের বিচারে সমূল-অবিদ্যার নাশ হয়। ভামতীকারের এই অভিপ্রায় স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ক'রে 'কল্পতরু'-কার বলেছেন যে, নির্বিকল্প-সমাধিতে লয় ও বিক্ষেপ দুটি বিঘ্ন দূর হ'লে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হয়, এজন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ সেক্ষেত্রে থাকা প্রয়োজন। 'ভামতী'-কার আচার্য বাচস্পতিমিশ্র সে'প্রসঙ্গে বলেছেন: "বিচারস্তু অধ্যবসানং সবাসনাবিদ্যাক্ষয়োজ্জেদম্। ততঃ হি ব্রহ্মাবগতেঃ নিবৃত্তিঃ আবির্ভাবঃ। তৎ কিং ব্রহ্মনি শব্দাৎ ক্বতে ন মানান্তরম্ অনুসরণীয়ম্, তথা চ কুতঃ মননঃ, কুতশ্চ তদনুভবঃ সাক্ষাৎকারঃ ?—ইত্যত আহ—'সৎসু তু বেদান্তবাক্যেষু' ইতি"। কথা এই যে, পূর্বপক্ষরূপে অন্যান্য দার্শনিকরা বলেন যে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রে জন্ম-স্থিতি-লয়-রূপ-বিশেষণ দিয়ে ঈশ্বরের বা ব্রহ্মের (ব্রহ্মসত্তার) অনুমানের ছলে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্ণয় করা হয়েছে। অনুমান (প্রমাণ) সেই বিষয়ে (ব্রহ্মের স্বরূপনির্ধারণবিষয়ে) উৎকৃষ্ট নয়, সুতরাং তাই যদি হয় তবে অনুমান-ছাড়া ব্রহ্মসত্তানির্ধারণে আরও অনেক প্রমাণ গ্রহণ করা যেতে পারে ? বাচস্পতিমিশ্র প্রকারান্তরে তাই বলেছেন যে, বেদ অর্থে শব্দপ্রমাণই ব্রহ্মসত্তার নির্ধারণে প্রকৃষ্ট প্রমাণ; অর্থাৎ ব্রহ্ম বেদৈকগম্য। বেদ (এবং উপনিষদ্রূপ শ্রুতিও) ব্রহ্মবিষয়ে যা বলে, তাই মনন ও নিদিধ্যাসনের সাহায্যে ব্রহ্মসত্তার নির্ণয়ের ও সাক্ষাৎকারের পক্ষে সুখসাধ্য। 'ভামতী'-র টীকা 'কল্পতরু'-র অভিমত যে, যাঁরা 'বেদজ্ঞ' নন, তাঁরা সেই বৃহৎ-ব্রহ্মকে মনন করতে পারেন না—'ন অবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তম্'। 'কল্পতরু'-টীকাকার বলেন যে, তবে যদি বেদের অনুকূল তর্ক অর্থাৎ অনুমানপ্রমাণ প্রয়োজন হয় তাহলে অনুমানকে গ্রহণ করায় আপত্তি নাই। সেজন্যই আচার্য শঙ্কর বলেছেন: "বাক্যার্থবিচারণাধ্যবসাননিবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মাবগতিঃ, ন অনুমানাদি-প্রমাণান্তরনিবৃত্ত্যা",—অর্থাৎ বেদান্তবাক্যার্থের যে বিচার বা বিচারণা—সেই বিচার থেকে যে অধ্যবসান (জ্ঞান) হয় তা থেকেই 'ব্রহ্মাবগতেঃ নিবৃত্তিঃ আবির্ভাবঃ'। এখানে সিদ্ধান্ত এই যে, মনন ও নিদিধ্যাসনের সঙ্গে শাব্দবোধের সাহায্যেই সমূল-অবিদ্যানিবৃত্তি হয় ও তারপর ব্রহ্মাবগতি বা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। তবে মনন ও নিদিধ্যাসনসহ যে শাব্দজ্ঞান হয় তা ব্রহ্মের স্বরূপভূত জ্ঞান নয়, তা বৃত্তিরূপ ব্রহ্মজ্ঞান। বৃত্তিরূপ জ্ঞান অন্তঃকরণের ফল বা পরিণতিবিশেষ, বা অন্তঃকরণেরই ব্রহ্মকারতাবিশেষ। কিন্তু পূর্বেই বলেছি এই যে, ঐ বৃত্তিরূপ জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান থেকে অবিদ্যানিবৃত্তির পর যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—যাকে ব্রহ্মের স্বরূপভূতজ্ঞান বা ব্রহ্মস্বরূপতা বলে, তা ঠিক বৃত্তিজ্ঞান নয়, কেননা তখন বা সেইকালে অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণের মূলকারণ অবিদ্যা ও অজ্ঞান কোনটাই থাকে না (বরং বলা যায় তখন অবিদ্যা বিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যায় বা ব্রহ্মজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, transformed into pure consciousness)। ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র এজন্য 'অধ্যবসান'-শব্দের অর্থ করেছেন—'সমূলঅবিদ্যাবন্ধের বিনাশ হয়'। 'কল্পতরু'-টীকাকারের অভিপ্রায়ও তাই, কেননা টীকাকার অমলানন্দ সরস্বতী বলেছেন যে, নির্বিকল্পসমাধির সময়ে লয় ও বিক্ষেপরূপ দুটি সমাধির বিঘ্ন (কথায়) দূর হলে

ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হয় এবং সেজন্য এ'বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টির ও আত্মসমাহিত ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে। কল্পতরুকার বলেছেন : "এবং চাবিদ্যানিবৃত্তিনির্বর্ত্যাদ্বোক্তরবগতিশব্দঃ স্বরূপাবগতিপর ইত্যুপাত্তুক্তং ভবতি"।

সুতরাং আলোচনার পর এ'সম্বন্ধে বাচস্পতিমিশ্রের অভিমতসম্পর্কে বলা যায় ভামতীকারের মতে আচার্য শঙ্করের অভিপ্রায় যে, তিনি 'বৃত্তিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য শব্দকে মুখ্যকারণ বলেন, আর 'মনন'-স্থানীয় অনুমান ও অর্থাপত্তিপ্রভৃতি প্রমাণগুলি ঐ মননের সহকারী। পরে নিদিধ্যাসনের সাহায্যে চিত্ত একাগ্র হ'লে অন্তঃকরণ ব্রহ্মাকার (বৃত্তি) ধারণ করে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির দ্বারাই ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অর্থে অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভব হয়। এই প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষজ্ঞানের পরই সমূল-অবিদ্যার নাশ হয় ও পরে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ (আবরণভঙ্গ) হয়।

অবিদ্যার নাশ হ'লে বিদ্যারূপ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ হয়। আবরণভঙ্গ ও প্রকাশ-সম্বন্ধে আলঙ্কার ও রস-শাস্ত্রের প্রবক্তারাও (রসাদ্বৈতবাদীরাও) স্বীকার করেন। বিশেষ ক'রে সম্রাট সাহজাহানের সভাপণ্ডিত কবিরাজ জগন্নাথ তাঁর 'রসগঙ্গাধর' প্রভৃতি গ্রন্থে 'ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ' (নির্ণয়সাগর সংস্করণ, পৃঃ ২৩) ব'লে রসের নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর 'আসফবিলাস'-গ্রন্থে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন : "সর্বভৌম শ্রীসাহজাহান-প্রসাদাধিগত-পণ্ডিতরাজ পদবী-বিরাজিতেন·····জগন্নাথেন", অর্থাৎ 'পণ্ডিতরাজ'-উপাধি সম্রাট সাহজাহান তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি একজন বিদগ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন।[৪] তিনি 'রসগঙ্গাধরে' বলেছেন : "বস্তুতস্তু ব্যক্ষ্যমান শ্রুতিস্বরূপেন ('রসো বৈ সঃ') রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ। সর্বথৈব চাস্যা বিশিষ্টাস্মনো বিশেষণঃ বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায় নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বঞ্চ সিদ্ধম্"। 'ভগ্নাবরণ' বলতে চিত্তবৃত্তিরূপ রসচর্বণাদ্বারা অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ ও চিদ্রূপ ব্রহ্মের প্রকাশ। অদ্বৈতবেদান্তীদের মতেও 'আবরণভঙ্গ'-ই (অজ্ঞানাবরণের ভঙ্গ বা নাশই) চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও সেকথা স্বীকার করেছেন।

পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ আরও বলেছেন : "চর্বণা চাস্য চিদ্গতাবরণভঙ্গ এব প্রাতস্কা, তদাকারান্তঃকরণবৃত্তির্বা। ইয়ং চ পরমব্রহ্মাস্বাদাত্মসমাধেরবিলক্ষণা। বিভাবাদিবিষয়সংবলিত-চিদানন্দালম্বনত্বাৎ"। তিনি পুনরায় বলেছেন : "আনন্দস্য রসাত্মরূপেণ (ন তু বিষয়তয়া) প্রতীতে। তথা নির্বিকল্পকসমাধাবানন্দাকারকচিৎবৃত্তেরভাবমভিধায় সমাধিপদেন সবিকল্পক-সমাধেরেব গ্রহণমিত্যভিধানমসমঞ্জসম্, আনন্দাত্মচৈতন্যস্য নির্বীজসমাধাবপি সর্বানুভবত্বাৎ। অতএব রসাস্বাদস্য ব্রহ্মস্বাদসহোদরত্বং সঙ্গচ্ছতে * * আনন্দরসচৈতন্যানাং তাদাত্ম্যেন বিষয়বিষয়িভাবাসম্ভবাৎ স্বরূপার্থ এব (ন তু প্রাচুর্যার্থে) ময়টোঽত্র বিধানৌচিত্যাৎ"। অবশ্য

৪। একটি গানের নিদর্শন—

'গঙ্গা ত্রিবেণী তীর্থনা মহাতীর্থ যানি সঙ্গমতে মিল সাগর।
···জগন্নাথ-কবিরাজে সহবেদ গাওয়ে গাওয়ে
হরষ হরষ পরশ সুখ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিতাই গৌর'।

প্রথমে সবীজ বা সবিকল্পসমাধি ও পরে নির্বীজ বা নির্বিকল্পসমাধিতে রসচৈতন্যের আস্বাদন বলতে স্বরূপোপলব্ধি সার্থক হয়। সেজন্য উপসংহারে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলেছেন: "ইত্থং চাত্তিনবগুপ্ত-মম্মটভট্টাদিগ্রন্থসারভূতেন ভগ্নাবরণাচিদ্বিশিষ্টা রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবো রস ইতি স্থিতম্। * * বস্তুতস্তু বক্ষ্যমানশ্রুতিস্মারকেন **রত্যাদ্যবচ্ছিন্না ভগ্নাবরণা চিদেব রস**।"। এজন্য তিনি রসের নিত্যত্ব ও স্বপ্রকাশত্বের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "সর্বথৈব চাস্যা বিশিষ্টাস্বাদো বিশেষেণং বিশেষ্যং বা চিদংশমাদায়। নিত্যত্বং স্বপ্রকাশত্বং চ সিদ্ধম্"। এই চিদানন্দরূপ পরব্রহ্মের আস্বাদন বা উপলব্ধি সমাধিতে ব্রহ্মোপলব্ধিরই সমান—'সমাধাবপি তদ্ভানে কিং মানমিতি পর্যনুযোগস্য তুল্যত্বাৎ'। 'সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্' —ইত্যাদি শব্দোঽস্তি তত্র মানমিতি চেৎ। অস্তি যদ্যপি 'রসো বৈ সঃ' 'রস হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি' ইত্যাদিশ্রুতিঃ, **সকল সহৃদয়প্রত্যক্ষং চেতি প্রমাণদ্বয়ম্**"।

এভাবেই বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 'সাহিত্যদর্পণে' ও মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ন'-গ্রন্থে বলেছেন: 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ'। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অনুরূপভাবেই বলেছেন: "অপরোক্ষ-সুখালঘনত্বাচ্চাপরোক্ষাত্মিকা"; অর্থাৎ "বরং দ্বিতীয়পক্ষে তদাকারচিত্তবৃত্ত্যাত্মিকা রসচর্বণো-পযুক্তা, সা শব্দব্যাপারভাব্যত্বাচ্ছাব্দো, অপরোক্ষসুখালঘনত্বাচ্চাপরোক্ষাত্মিকা"। কথা এই যে রসচর্বণাদ্বারা শাব্দবোধ হয়ে তারপর প্রত্যক্ষ হয়। এখানে অদ্বৈতবেদান্তের অনুযায়ী 'তত্ত্বমসি'-বাক্য-অনুসারে 'তৎ' বা ব্রহ্ম ও 'ত্বং' বা জীব—'জীবই ব্রহ্ম' এই জ্ঞান পরিশুদ্ধ হয়ে রসচৈতন্যের উপলব্ধি হয়। এই অভিমত বা সিদ্ধান্ত অবশ্য সহৃদয় ও সামাজিক সাহিত্যিকদের, কেননা সহৃদয়-কাব্যরসিক ও সাহিত্যসেবীরা বলেন যে, রসচর্বণায় প্রত্যক্ষ ও শব্দজন্য প্রত্যক্ষ-দু'টিই একসঙ্গে হয়। এই রস বা রসচৈতন্য 'লোকোত্তরচমৎকারপ্রাণঃ'। অদ্বৈতবেদান্তীদের সিদ্ধান্তে রসপ্রতীতি ও রসানুভূতি চৈতন্যঘনব্রহ্মেরই প্রতীতি ও অনুভূতি। অনুভূতিকর্ম ও অনুভাবক এখানে ভিন্ন নয়—'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি'-শ্রুতিরই সমপর্যায়ভুক্ত। এটিকে রসাদ্বৈতবাদ বলা সঙ্গত। বেদান্তেও ব্রহ্মকে নিরবচ্ছিন্ন 'একরস' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ডক্টর ভি. রাঘবন তাঁর *Bhoja's Sringāra-prakāśa* (2nd ed. 1963) গ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের 'ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ'-বিবৃতির উল্লেখ ক'রে সেই প্রসঙ্গে ভট্টনায়ক, ভরত, শার্ঙ্গদেব, টীকাকার কল্লিনাথ, মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতির নামোল্লেখ করেছেন। পণ্ডিতরাজ-সম্পর্কে ডক্টর রাঘবন বলেছেন: "Says Jagannatha: ভগ্নাবরণা চিদেব রসঃ'। The appeal of poetry exactly Atmānanda-Rasa or Brahmānanda-Rasa, but *comparable* to it. Bhatta-Nāyaka in the passage quoted above, says 'পরব্রহ্মাস্বাদসবিধেন'। The *Sangita-Ratnakara* of Sārangadeva says: (VII. 1266): 'ব্রহ্মসংবিদ্‌বিসদৃশী···সংবিদ্' and Kallinath comments upon it: 'নানারত্যাদি···ব্রহ্মসংবিদো বৈসাদৃশ্যমুক্তম্ অংশাস্তরৈঃ সচ্চিদানন্দরূপৈঃ তৎসাদৃশ্যমপ্যাহ'।

"Bhoja admitted this *ānandarasa* as the highest *kāvyarasa*, but Madhusudana Sarasvati differs from it, and he said in the *Bhaktirasāyana*:

'অতো ন সর্বেষু রসেষু তুল্যসুখানুভবঃ'। কিন্তু তথাপি তিনি বলেছেন: 'Brahman is considered as পরমানন্দরস"।

কথা এই যে, কাব্য ও সাহিত্যের যে অলৌকিক রস ও রসাস্বাদ, তাই ব্রহ্মানন্দরস রমাণুভূতির ক্ষেত্রে। চরমাণুভূতির দৃষ্টি নিয়ে শুধু পণ্ডিতরাজ জগন্নাথই নন, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, মধুসূদন সরস্বতী সকলেই রসকে ব্রহ্মের বা ব্রহ্মানন্দরসের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যিনি যথার্থ রসিক ও সামাজিক, তিনি কাব্যরস, সাহিত্যরস, নাটকরস—সকল-কিছু রসে ও রসানুভূতিতে ব্রহ্মাস্বাদের অনুভূতি স্বীকার করেন। ডক্টর রাঘবন সত্যই বলেছেন: "Madhusudan Sarasvati explains Rasa according to the Vedanta, where Brahman is considered as Paramānanda-Svarupa". অবশ্য তৈত্তিরীয়-উপনিষদে (৩।৬) 'আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' প্রভৃতি সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার 'আনন্দ' আনন্দরসস্বরূপব্রহ্মই।

তবে অপরাপর বেদান্তাচার্যেরা স্বীকার করেন যে, শব্দই ('তত্ত্বমসি') ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সৃষ্টি করে, আর সেই অপরোক্ষজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিবন্ধক নষ্ট হ'লে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ হয়। ফলে উভয় মতেই (ভামতী ও অন্যান্য মতে) অনুমান প্রভৃতি প্রমাণগুলি বেদান্তস্বরূপ শব্দপ্রমাণের (বেদান্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসম্পর্কে যে বাক্য বা শব্দ বলে তার) সহায়ক বা সহকারী হয়, স্বাধীনভাবে তারা বৃত্তিরূপ নিশ্চয়াত্মক-ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ করতে পারে না।[২] বৃহদারণ্যক-উপনিষদের (২।৪।৫) বাণীও তাই—'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'। 'রত্নপ্রভা'-কার অমলানন্দ সরস্বতী স্পষ্টভাবে বলেছেন: "কিং চ মুমুক্ষোঃ ব্রহ্মাবগতিঃ অভিষ্টা যদর্থম্ অস্য শাস্ত্রস্য আরম্ভঃ, সা চ ন অনুমানাৎ, 'তং তু উপনিষদম্' ইতি শ্রুতেঃ"। আচার্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে স্পষ্টভাবে সেকথাই বলেছেন: 'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূতবস্তুবিষয়ত্বাৎ'। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের জ্ঞান এক ও অভিন্ন। এই ব্রহ্মজ্ঞান সর্বকালেই অবাধিতভাবে হয় এবং এই ব্রহ্মজ্ঞান কোন প্রমাণসাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ নয়, একমাত্র প্রত্যক্ষ-অনুভূতি দিয়েই এই স্বাধীন স্বতন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানকে জানা ও অনুভব করা যায়।

এখন প্রশ্ন এই যে, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—জন্মাদি বা সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি কার্যের দ্বারা বিশেষিত ব্রহ্মকে (সগুণব্রহ্ম-ঈশ্বরকে) জানা যায় এবং সগুণের উপলক্ষিত নির্গুণব্রহ্মের স্বরূপও তখন জানা যায় অর্থে সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করা যায়।

বিশ্বসৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিকরা (Scientists) যেমন এ্যাটম (Atom) থেকে আরম্ভ ক'রে চরমে কসমিক এনার্জি (Cosmic Energy) প্রভৃতি উদ্ভাবন করেছেন,[৩] তেমনি অদ্বৈতবেদান্তীরা বিশ্বসৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ব্রহ্মের

২। এ'সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি।

৩। বিশ্বসৃষ্টিসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ও সিদ্ধান্ত ঠিক পরিনিষ্ঠিত ও স্বচ্ছ নয়, কেননা সংশয় ও বাদানুবাদের ঘন্দ ওঁদের মধ্যে এখনো কাটেনি। অবশ্য বৈজ্ঞানিক আইনিস্টাইন, জিন্স, এডিংটন, হোয়াইটহেড, স্যালিভান, হাইজেনবর্গ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকরা ধর্মদৃষ্টি নিয়ে ঈশ্বরের কিছু কিছু প্রসঙ্গের উত্থাপন করলেও তা ধর্মশাস্ত্র যেভাবে গ্রহণ করেছে—ঠিক সেরূপ নয়। এ. এন. হোয়াইটহেড *Religion*

আবিষ্কার করেছেন ও বলেছেন। ব্রহ্মই মূলকারণ, উৎস ও অধিষ্ঠান। আবার ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপের নির্ধারণ করতে গিয়েও তেমনি কারণাতীত সর্বাতীত মহৎ, ব্যাপক ও সর্ববিস্তারী এক মহাচৈতন্যের সত্তা আবিষ্কার করেছেন বেদান্তীরা। তবে যে ব্রহ্মসত্তারূপ ব্যাপকচৈতন্য থেকে বিশ্বসৃষ্টি সম্ভব হয় —তা অব্যাকৃতিরূপ সত্ত্ব-রজঃ-তমো-গুণাত্মিকা মহাপ্রকৃতিসম্পন্ন সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর। আচার্য শঙ্কর ও অদ্বৈতবেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকার এই সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে নির্গুণ-বিশুদ্ধ-ব্রহ্মসত্তারও সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন। 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণম্'-গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য অদ্বৈতানন্দ-যতি 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন : "যচ্চ সত্যজ্ঞানানন্দাদি পদার্থেষু ধর্মিভূতমবগম্যতে, স এব ব্রহ্মশব্দবিশেষ্যভূতোঽর্থঃ জন্মাদিসূত্রেণ প্রতিজ্ঞায়তে",—অর্থাৎ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপ বিশেষণে বিশেষিত (সগুণ) ব্রহ্মই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসৃষ্টির উৎস বা কারণ। অদ্বৈতানন্দ পূর্বপক্ষের আশঙ্কা ক'রে পুনরায় বলেছেন : "জগৎকারণত্বং ব্রহ্মলক্ষণং ন সম্ভবতি নির্বিশেষস্য তস্য জগৎকারণত্বাসম্ভবাৎ."—অর্থাৎ ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ, সুতরাং জন্মাদি বিশেষণ সেই নির্বিশেষব্রহ্মে থাকতে পারে না, সুতরাং নির্গুণব্রহ্ম জগৎকারণ নন। এর উত্তরে তিনি বলেছেন : "সত্যজ্ঞানানন্দাদিষু অভিন্নস্য সর্বধর্মবিনির্মুক্তস্য ধর্মিণোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ।...যজ্জগন্মাদিকারণং ব্রহ্ম, তৎ সত্যজ্ঞানানন্দাত্মকমিত্যেবংরূপেণ প্রবৃত্তায়াঃ শ্রুতেঃ কারণত্বসত্যত্বাদিরূপোপেক্ষিতাবিধেয়ভাবচ্ছেদ-কানেকধর্মসংসৃষ্টতয়া ব্রহ্মবোধিকায়াস্তৎসকলধর্মবিনির্মুক্তধর্মিমাত্রবোধকত্বাসম্ভবাৎ...". সত্য-জ্ঞান-আনন্দ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বিশেষিত (বিশেষণযুক্ত) ক'রে নির্গুণব্রহ্মকে যেমন সগুণরূপে প্রতিভাত করা হয়, তেমনি জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাদি বিশেষণে বিশেষিত ক'রে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে বিশ্বসৃষ্টির সম্ভাবনাকে প্রমাণ করা হয়। স্বামী অদ্বৈতানন্দ 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণ'-গ্রন্থে পুনরায় বলেছেন : 'ইহ তু সত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মণি ব্রহ্মপদোপাত্তস্য ব্রহ্মত্বস্য সংসর্গোঽপি ন ভাসতে।...এবং

In the Making (1926)-গ্রন্থে যদিও বলেছেন : "Thus God is the one systematic, complete fact, which is the antecedent of ground conditioning every creative act" (p. 139), কিংবা "He is the finding element in the world" (p. 141), তাহলেও বিভিন্ন দর্শনসিদ্ধান্তের সঙ্গে এ'সকল কথার ঠিক সামঞ্জস্য নাই। বৈজ্ঞানিক জ্যাড-গ্রাফ যদিও *Where the Science is going on*-গ্রন্থে দর্শনের সঙ্গে বিজ্ঞানের মিতালী চেয়েছেন, কিংবা বৈজ্ঞানিক স্যর আর্থার এডিংটন তাঁর (1) *The Nature of the Physical World*-গ্রন্থে (p. 337), কিংবা (2) *The Philosophy of Physical Science* (1939)-গ্রন্থে বলেছেন : (1) 'The philosophic trend of modern scientific thought differs markedly from the views of thirty years ago...." প্রভৃতি ; (2) It (scientific epistemology) is a field in which philosophy and physics overlap", কিন্তু তবুও C. E. M. Joad-এর ভাষায় বলা যায় (vide *Philosophical Aspects of Moon Science*), কিংবা Errol E. Harris-এর ভাষায় বলা যায় (vide *The Foundations of Metaphysics in Science* এবং *Nature, Mind and Modern Science* (195-)—'have in recent, years, been repudiated as pseudo problems'. বৈজ্ঞানিক জ্যাবস ভবিষ্যতের যুগে নূতন এক দর্শন বা দর্শনদৃষ্টির উদ্ভব আশা করেন—'a new philosophy of nature as the self-manifestation of the concrete universal...worked out in detail on the basis of scientific discovery, must be one of the tasks of future speculation'.

জগজ্জন্মাদিকারণত্বং 'যতো বা' ইত্যাদি বাক্যপ্রসিদ্ধং ব্রহ্মলক্ষণং নোক্তস্বরূপেণ বিরুধ্যতে।... এবমারোপিতেন জগজ্জন্মাদিকারণত্বেন ব্রহ্ম লক্ষ্যতে। আরোপিতেঽপি তস্য ব্রহ্মণ্যেবাসাধারণত্বাৎ। ...অতএব জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়কারণত্বং ব্রহ্মলক্ষণত্বেন নির্দিশ্যতে"। সুতরাং সগুণ-ব্রহ্মেরই জগৎকারণত্ব সিদ্ধ হয়।

জগৎকারণ সগুণব্রহ্মের লক্ষণ এবং এই লক্ষণের দ্বারা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের নির্গুণ কেন—সগুণ-নির্গুণের অতীত নির্বিশেষ-ব্রহ্মস্বরূপেরও উপলব্ধি করতে মানুষ সক্ষম হয়। ব্রহ্মাবগতিতে বা ব্রহ্মজ্ঞানে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় ও মানুষ সংসারপাশ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাব ও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করে। ব্রহ্মসূত্রে যে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' (১।১।১) সূত্রের অবতারণা করা হয়েছে, সেই অবতারণার অর্থ ব্রহ্মাবগতির জন্য—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তু মোক্ষরূপপুরুষার্থাবসানায় স্বপ্রমেয়ন্তে ব্রহ্মণোঽপ্রতিবন্ধসাক্ষাৎকারপর্যবসানা" (ব্রহ্মবিদ্যাভরণম্, পৃঃ ৮৬)। সুতরাং পরিশেষে 'ব্রহ্মবিদ্যাভরণম্'-কার স্বামী অদ্বৈতানন্দ বলেছেন : "তত্র চ সত্যাদিবাক্যৈকবাক্যতয়া যজ্জগজ্জন্মাদিকা সর্বজ্ঞত্বাদিগুণগণোপবৃংহিতম্"—সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরই বিশ্বসৃষ্টির কারণ—একথা বোঝানোর জন্য (একথা পূর্বে বলেছি)। তাছাড়া বিশ্বসৃষ্টি ঈশ্বরের খেলা ও লীলা।

'যন্মাদ্বা যতঃ'—জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের সার্থকতা অদ্বৈতবেদান্তে অধিকারী মায়াতীত তুরীয় (বিশুদ্ধ) ব্রহ্মে অযুক্ত, সুতরাং মায়াসবলিত সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরে ঐ বিশেষণ বা জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ-উপাধির সংগতি হ'তে পারে। ভারতীর্থ বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বিবরণপ্রস্থান 'পঞ্চপাদিকা'-র 'বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ'-গ্রন্থে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রের (১।১।১) অবতারণা ক'রে মায়াতীত তুরীয়-ব্রহ্মে জন্মাদিলক্ষণ প্রযোজ্য—কি প্রযোজ্য নয়—সে'কথাই বিচার করেছেন। তাঁর বক্তব্য হ'ল : "নহ্যজ্ঞাতে স্বরূপে লক্ষণং জ্ঞাতে বা। নাজ্ঞাতে কিমস্য লক্ষণস্য লক্ষণমিতি জিজ্ঞাসাঽনুদয়াৎ।...বৈয়র্থ্যাৎ"। তাহলে জন্মাদিলক্ষণ বিফল ও অপ্রয়োজনীয় কি ?—এ' প্রশ্নের উত্তরে বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : "অত্র ক্রমঃ—

জগজ্জন্মাদিস্থিতিধ্বংসা যতঃ সিধ্যন্তি কারণাৎ।
তৎস্বরূপতটস্থাভ্যাং লক্ষণাভ্যাং প্রদর্শ্যতে ॥

...তত্র তাবজ্জন্মাদিকারণত্বং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণত্বেঽপ্যবিরুদ্ধম্। শুদ্ধব্রহ্মণস্তু তটস্থ-লক্ষণম্। স্বরূপলক্ষণস্তু তস্য সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিষু প্রসিদ্ধম্, ন চোক্তলক্ষণ-ভ্রান্তিব্যাপ্তিঃ।...যদ্যপ্যনাদৌ সংসারে ন জন্মনো বস্তুত আদিত্বং তথাপি জনিত্বা স্থিত্বা প্রলীয়তে ইতি ব্যবহারিকীং লোকপ্রসিদ্ধিং উপজীব্য 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইতি শ্রুতৌ জন্মন আদিত্বনির্দেশস্তমুপজীব্যায়ং সৌত্রোঽপি নির্দেশ উপপন্নঃ"।

বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর পুনরায় বলেছেন : "শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপাভাবেঽপি মায়াবিশিষ্টকারণব্রহ্ম-সম্ভবিত্বাৎ। যতঃ ইত্যনেন হি সূত্রপদেন কারণমেব নির্দিশ্যতে, ন তু শুদ্ধম্।...তথা ব্রহ্মণোঽপি কারণত্বমৌপাধিকো ধর্মো লক্ষণাক্ষিপ্তো। তদ্বিরূপকস্য জন্মাদের্লক্ষণত্বে কা তব হানিঃ"।

সুতরাং সৃষ্টিশ্রুতি ব্রহ্মে উপপন্ন বা উপযুক্ত-এর কারণ দেখিয়ে পুনরায় বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : "অস্মদ্মতে তু মানান্তরানবকাশাদ্বৈতৈকরসব্রহ্মাবগমায় মহাবাক্যপ্রবৃত্তিঃ। সৃষ্টিশ্রুতিস্তু—

'অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিষ্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যতে।
নাস্তত্র কারণাৎ কার্যং ন চেতত্র ক তদ্ভবেৎ'।

ইতি ন্যায়েনাদ্বৈতৈকরসবস্তুপ্রতিপাদনায়েতি ন বৈয়র্থ্যং কিঞ্চিৎ"। অর্থাৎ সৃষ্টিশ্রুতি অদ্বৈতৈকরস-স্বরূপ ব্রহ্মে (তুরীয় মায়াতীত ব্রহ্মেও) ব্যর্থ নয়, কেননা তখন ব্রহ্ম বা তুরীয়-ব্রহ্ম মায়াসম্বন্ধী হ'লে মায়াধীশ সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরই বোঝায় এবং তা থেকে তুরীয়-ব্রহ্মও উপলক্ষিত হন, ও তাতে ক্ষতি নাই।

"'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনন্তু মহেশ্বরং' 'মম মায়া দুরত্যয়া'-ইতি শ্রুতি-স্মৃতি অনির্বচনীয়—মায়াত্মকত্বং সৃষ্টের্নিশ্চিতং।.....অস্তিচাত্র প্রপঞ্চ ব্রহ্মণোর্বাস্তবসম্বন্ধা-ভাবেঽপ্যধ্যাসিকস্তাদাত্ম্যসম্বন্ধঃ, অতঃ প্রপঞ্চজন্মাদিকারণত্বেন তটস্থেন জিজ্ঞাস্যবিশুদ্ধব্রহ্মস্বরূপং নির্বিঘ্নমুপলক্ষ্যতে। .....তত্র বদ্ধো মুক্তো নিত্যসিদ্ধশ্চেতি ত্রিবিধো জীবপদার্থঃ"।

সুতরাং ব্রহ্মের যে কারণত্ব ও সর্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণ—এই বিশেষণ শুদ্ধব্রহ্মে অসম্ভব—"যঃ সর্বজ্ঞ ইতি শ্রুতেঃ। ন চ স্বরূপলক্ষণত্বাসম্ভবঃ। লক্ষণাভিধানাবসরে সর্বজ্ঞত্বেন সর্বপ্রকাশকত্বোপ-লক্ষিতশুদ্ধচৈতন্যমাত্রস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। তদেবং জন্মস্থিতিনাশাদ্যবিকারব্রহ্মকারণস্য ব্রহ্মণঃ সূত্র এব স্বরূপলক্ষণমপি সিদ্ধম্"। আসলে জন্মস্থিতিভঙ্গ স্বরূপলক্ষণ নয়, অর্থাৎ শুদ্ধ মায়াতীত ব্রহ্মের নয়, এটি তটস্থলক্ষণ এবং তটস্থলক্ষণে মায়োপহিত সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরকেই বোঝায়। মায়াশ্রয়ী ব্রহ্ম অবয়বযুক্ত, আর মায়াতীত ব্রহ্ম (শুদ্ধ) নিরবয়ব—"কূটস্থ (শুদ্ধ)-ব্রহ্মণো নিরবয়বত্বাৎ উপপন্নম্"। নিরবয়ব-ব্রহ্মের পরিণাম ও বিকার নাই। কিন্তু মায়োপাধিযুক্ত সাবয়ব-সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরের লোকত পরিণাম ও বিকার দেখা যায়, যেমন 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—সৃষ্টি ক'রে সৃষ্টিরূপ ধারণ করলেন তিনি।

অতএব এখানে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরই অস্মাদিমায়াশক্তির ('মম মায়া') সামানাধিকরণ্য (সমান-অধিকরণের) লক্ষণাক্রান্ত একথা বেশ বোঝা যায়। সামানাধিকরণ্যের ভাব থেকে আমরা সহজেই অবিনাভাবাক্রান্ত লক্ষণে উপনীত হ'তে পারি, অর্থাৎ মায়াশক্তি ও মায়াশক্তির অধিকারী ঈশ্বর সমসত্তাক বা একই সত্তাযুক্ত এজন্য যে, মায়াশক্তি বিশ্বসৃষ্টির প্রকৃত কারণ হলেও মায়াশক্তিমান ঈশ্বরই প্রধানত সৃষ্টিকারী নামে অভিহিত,—অর্থাৎ 'ঈশ্বরই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা' —একথা সকলে বলে থাকি। তাই এখানে শক্তিমান ও শক্তি অভেদ ও সমসত্তাযুক্ত—যদিও ঈশ্বরের অধীনেই মায়া নিয়ন্ত্রিত হয় এবং ঈশ্বর মায়াধীশ বা মায়ার অধীশ্বর। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই অর্থেই শক্তিমান ও শক্তি অভিন্ন বা অভেদ, কিংবা ব্রহ্ম (সগুণব্রহ্ম) ঈশ্বর ও মায়াশক্তি এক ও অভিন্ন বলেছেন। তবে অদ্বৈতবেদান্তের বিচারে 'মায়া'-উপাধিও ঈশ্বরের ঔপচারিক ও লোকব্যবহারক্ষেত্রে ব্যবহৃত। স্বগুণব্রহ্ম স্বরূপে ও চরমসিদ্ধান্তে নির্গুণব্রহ্মই। এজন্য বা এ' দৃষ্টি নিয়েই অদ্বৈতবেদান্তী ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : "শুদ্ধব্রহ্মসম্বন্ধাভাবেঽপি মায়াবিশিষ্টকারণব্রহ্মসম্বন্ধিত্বাৎ। যত ইত্যনেন হি সূত্রপাদেন কারণমেব নির্দেক্ষ্যতে, ন তু

তদ্বম্ ।···তথা ব্রহ্মণোঽপি কারণত্বমৌপাধিকো ধর্মো লক্ষণান্তঃপাতী। তদ্ভিন্নতয়া তস্য স্বরূপলক্ষণত্বে কা তব হানিঃ ?"। কথা এই যে, কারণত্বরূপ—ঔপাধিক ধর্ম, তাও ব্রহ্মের লক্ষণরূপে স্বীকার করা হয় এবং জন্মাদি গুণযুক্ত লক্ষণ স্বীকার করলে শুদ্ধব্রহ্মস্বরূপের কোন হানি অর্থাৎ বৈলক্ষণ্য হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত ও বক্তব্যও তাই। তিনি 'ব্রহ্ম ও মায়া অভেদ' বলতে মায়াবিম্বসহিত[৭] ঈশ্বর ও তাঁর মহাপ্রকৃতিরূপ গুণ মায়ার মধ্যে কোন ভেদ নাই বলেছেন। কারণ ও তার কার্য অভেদ, কেননা কারণই কার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং পরিশেষে কারণেই কার্য বিলয় হয়। সাংখ্যকার কপিলের অভিমত তাই, তবে কপিল ও শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য এই : মুনি কপিল প্রকৃতিকে জড়া বলেছেন, আর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিকে অজড়া চৈতন্যময়ী বলেছেন, কারণ চিতিশক্তির প্রকাশ চৈতন্যই হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'ব্রহ্ম ও মায়া অভেদ'-বাক্যটি ব্রহ্ম ও মায়া বা ব্রহ্ম ও শক্তির অভেদভাবের লক্ষণ—যেমন অভেদ অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি, সূর্য ও তার কিরণ, মণি ও তার জ্যোতিঃ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন যে, যেমন কিরণকে ছেড়ে সূর্যকে ভাবা যায় না, জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে চিন্তা করা যায় না, তেমনি মায়া বা শক্তিকে ছেড়ে মায়িন বা শক্তিমানকে চিন্তা করা যায় না। গুণ ও গুণী এখানে অভেদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টভঙ্গী নিয়েই সগুণব্রহ্ম মায়িন অথচ মায়ার অধীশ্বর ঈশ্বরকে গুণ বা মায়া থেকে অভিন্ন চিন্তা করেছেন—যেমন অদ্বৈতবেদান্তীরা গুণসম্পন্ন বা বিশেষিত ঈশ্বরকে মায়ারূপ বিশেষণ থেকে প্রকারান্তরে অভিন্ন বলেন। 'প্রকারান্তরে অভিন্ন' বলার উদ্দেশ্য এই যে, মায়া-ছাড়া মায়িন থাকেন না এবং মায়ার অধীশ্বর হলেও মায়াযুক্ত[৮] হয়েই ঈশ্বর মায়িনরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মায়াবিরোধী নির্গুণব্রহ্মও স্বীকার করেছেন ও বলেছেন যে, 'নেতি নেতি'—'ইহা নয়, ইহা নয়' ক'রে নির্বিশেষ-ব্রহ্মে উপনীত হওয়া যায়। নির্গুণ ও নির্বিশেষ-ব্রহ্ম শেষের কথা। সৃষ্টি ও বিকাশের জগতে সগুণ ও সবিশেষ-ব্রহ্ম—ঈশ্বর। ইনিই পরমেশ্বর ও তৃতীয়োপাধিক-ব্রহ্ম।

(ক্রমশঃ)

●

৭। পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর বলেছেন : 'মায়াবিম্বং বশীকৃত্য···'.

৮। 'প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য'—গীতা ৪।৬

কেশব কালী মেনেছিলো

স্বামী প্রভানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীরামকৃষ্ণের মাধুর্য বর্ষণকারী সঙ্গীত, কীর্তনের আসরে ভাবোদ্দীপক আখর, গানের ভাবে প্রেমোন্মাদে নৃত্য, কখনও বা ভাবের গভীরে ভাবসমাধিতে লীনপ্রায় সত্তা সকলকে বিস্মিত করে। বাহ্যদশায় জগন্মাতার রাশ-ঠেলে-দেওয়া ভাবপুষ্ট অমৃতবর্ষণকারী কথামৃতরূপে উৎসারিত হয়। সরল মর্মস্পর্শী সুরে সহজ বাণীতে। 'বসে বসে খাওয়া' শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরেন —

"তবে সেই সে পরমানন্দ
কালী ছাড়া নাম না শুনে কানে
সন্ধ্যাপূজা কিছু না মানে,
যা করেন কালী সেই সে জানে।"

মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই জানেন, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হচ্ছে, "ঘুম ভেঙেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি"।

সর্ববিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আচার আচরণ নজিরের জন্য। তিনি বলতেন, "ধর্মরাজ্যেও সেইরূপ। মহাজনদের কথায় বিশ্বাস করে ও ভক্তির চার ফেলে, মন ছিপে, প্রাণ কাঁটায় নাম বেটন দিয়ে বসে থাকতে হয়"।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলতেন, "যদিও সকল ধর্মের মধ্যে এক ঈশ্বরের কথাই লেখা আছে, তবে প্রত্যেক ধর্মে ঈশ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন দেখায় কেন? ঈশ্বর এক কিন্তু তাঁর ভাব বিভিন্ন। যেমন বাটীর কর্তা এক ব্যক্তি কিন্তু তিনি কাহারও পিতা, কাহারও ভ্রাতা এবং কাহারও পতি। ভাব ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ব্যক্তি এক। ঈশ্বর সেই রকম।...ঈশ্বরও সেই রকম এক হইয়াও দেশ ভেদে ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়েছেন"।[৬]

ঠাকুর বলতেন কাঁচপোকা আরশোলাকে ধরলে আরশোলার বর্ণটা ঠিক কাঁচপোকার গায়ের রঙের মত হয়ে যায়। ঠাকুর যাকে ধরতেন ঠাকুরের ভাব ও আদর্শ তাতে অনুস্যূত হয়ে যেতো। তার ধর্মচেতনার বিপুল পরিবর্তন উপস্থিত হতো। তার আধ্যাত্মিক জীবনের আমূল সংস্কার হয়ে যেতো।

প্রতিমা উপাসনা সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের ঘোর আপত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের বুঝিয়ে বলেন, "বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমাপূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়"। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত আরোপ করতেন। বলতেন, "প্রতিমায় (ভগবানের) আবির্ভাব হতে গেলে তিনটি জিনিষের দরকার। প্রথম—পূজারীর

৫। সুরেশচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, ৭৬ সং, পৃঃ ৯২।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ, ঐ, পৃঃ ১৪৯।

ভক্তি, দ্বিতীয় প্রতিমা সুন্দর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। পূজার সময় প্রতিমাকে কাঠ-মাটি বলে জ্ঞান করলে কাঠ-মাটিরই পূজা হয়। ঈশ্বরবোধ থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়"।[৭]

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গগুণে ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ওপর বিভিন্ন বিচিত্র প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হল, এবং সে সকলের মধ্যেই একটি সাধারণ ভাব বিশেষ লক্ষণীয়। The New Dispensation (১৮৮২ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই তাং) লেখে, "He has a strange attraction for every class of Brahmas, who flock to enjoy his communion wherever he goes".

'পরিচারিকা' ভাদ্র ১২৯৩ সালে লেখে, "ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের মাতৃভাব বিশেষরূপে পরমহংসের জীবনের প্রভাবেই সঞ্চারিত হয়"।

ধর্মতত্ত্ব পত্রিকা, ১৬ই ভাদ্র ১৮০৮ শকাব্দের সংখ্যায় বলে, "তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) উপাস্য দেবতা সাকার নিরাকার মিশ্রিত ছিল। তিনি কালী ও মা বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেন ও মত্ত হইতেন। জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমি হস্তনির্মিত খড় ও মাটির কালী মানি না। আমার কালী চিন্ময়ী, আমার মা ঘন সচ্চিদানন্দ। যাহা বৃহৎ ও গভীর তাহাই কাল বর্ণ, সুবিস্তৃত আকাশ কাল বর্ণ, সুগভীর সমুদ্র কাল বর্ণ। আমার কালী অনন্ত সর্বব্যাপিনী চিচ্ছক্তি"।

ধর্মতত্ত্ব, ১লা আশ্বিন, ১৮০৮ শক সংখ্যায় লেখে, "পরমহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব ব্রাহ্মসমাজে সঞ্চারিত হয়। সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকট শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটি পরমহংস হইতেই আচার্যদেব বিশেষভাবে প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রাহ্মধর্ম শুষ্ক তর্ক ও জ্ঞানের ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে সরস করিয়া তোলে"।

"সখা" পত্রিকা (১৮০৮; নভেম্বর) লেখে, "কেশবচন্দ্র তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন।...ঈশ্বরকে মা বলিয়া ডাকা ও সেরূপ সাধন করা কেশবচন্দ্র সেন পরমহংস মহাশয়ের নিকট হইতেই প্রথম শিক্ষা করেন ও ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করেন"।

নববিধানাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'কেশবচরিত'-গ্রন্থে লেখেন, "ব্রাহ্মসমাজে এক্ষণে ভক্তিলীলাবিলাস ও মাতৃভাবের প্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহার প্রধান সহায় পরমহংস রামকৃষ্ণ। ...মাতৃভাবের সাধন, সহজ প্রচলিত ভাষায় উপাসনা প্রার্থনা ইদানীং তিনি (কেশবচন্দ্র) যাহা করিতেন তাহা যে উক্ত মহাত্মার সহিত যোগের ফল একথা অনেকেই জানেন"।

কেশবের বৃহৎ-জীবনী-লেখক উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় স্বীকার করেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে "যোগ বৈরাগ্যাচরণ ও মাতৃভাব" কেশবচন্দ্রের মনকে অধিকার করেছিল।

মোহিত কেশবকে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ধর্মচেতনার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, কালীবাড়ীর নহবতের বাজনার মত "কেবল একজন পোঁ করছে, আর একজন নানা সুরের লহরী তুলে কত রাগ-রাগিণীর আলাপ করছে। আমারও ঐ ভাব, আমার সাত ফোঁকর থাকতে

৭। উদ্বোধন, ১৩৩১, চৈত্র, পৃঃ ১৫৭।

শুধু কেন পৌ করব—কেন শুধু সোহং সোহং করব। আমি সাত কোকরে নানা রাগরাগিণী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব। শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য, মধুর সবভাবে তাঁকে ডাকব—আনন্দ করব, বিলাস করব। (ক। ৫। পরি। ৮৬) শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক বিপুল ঐশ্বর্য কেশবকে অভিভূত করেছিল, তাঁর চিরচরিত বিশ্বাসের মধ্যে নূতন অনুসন্ধান সুরু হয়েছিল।

মূর্তিপূজার ঘোর দ্বেষী প্রতাপচন্দ্র কেশবচন্দ্র-বিনন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচেতনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যেন হোচট্ খেয়ে পড়েছেন। তিনি লিখেছেন, "He worships Shiva, he worships Kali, he worships Rama, he worships Krishna, and is a confirmed advocate of Vedantist doctrines. He is an idolator and is yet a faithful and most devoted mediator of the perfections of the one, formless, infinite Deity whom he terms '*Akhanda Satchidananda*' ".

প্রাগুক্ত সমস্ত কয়টি অভিমতই কেশবপন্থীদের। পৌত্তলিক শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মজগতে বিশেষতঃ ব্রাহ্মনেতাদের ধর্মভাবনায় একটি মহাবিস্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্ম সৌরভে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন রসিক কেশবচন্দ্র। হেমন্তের শিশিরকণার মত ধীরে নীরবে অথচ নিশ্চিত ধারায় পরিবর্তিত হতে থাকে তাঁর অধ্যাত্মজীবনের ভাব ও আদর্শ।

১৮০৩ শক, ২০শে আষাঢ়, রবিবারে 'ভক্ত ও প্রেম' শীর্ষক ভাষণে কেশবচন্দ্র বলেন, "অপ্রেমিক ভীরু পৌত্তলিকতার ভয়ে পৌত্তলিকতার মধ্যে যে সকল সত্য, পুণ্য, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব রহিয়াছে সে সমস্তই পরিত্যাগ করিল।…প্রেমিক সাহসী ব্রাহ্মেরা…ভীরুতা ত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকদের মধ্যেও ঈশ্বরের সকল ঐশ্বর্য আছে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ও ভক্তির সহিত সে সমস্ত গ্রহণ করেন।…অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম এইরূপে পৌত্তলিকতার ভয়ে নাস্তিকতা ও মিথ্যা কল্পনার পথ অবলম্বন করে। অল্পবিশ্বাসীর এইরূপ অধোগতি দেখিয়া আমরা হাত সম্বরণ করিব না দম্ভ সম্বরণ করিব" ? ব্রহ্মকে ও তাঁর ঐশ্বর্যকে সর্ববস্তুতে দেখতে শেখেন ব্রাহ্মসাধক কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম—সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া দুই আমি দেখি না"। তিনি আরও বলতেন মেয়েরা পুতুল খেলে ততদিন, যতদিন না বিয়ে হয়। বিয়ের পর পুতুলগুলি পেটরায় তুলে রাখে। তেমনি ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হলে সাধকের আর প্রতিমাপূজার দরকার হয় না।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৮৮৪ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারী। বয়স মাত্র ৪৬ বৎসর। দেহত্যাগের কয়েকদিন পরে সত্যবাক্ শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে শুনতে পাই, "কেশব সেন খুব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে গেল। ইদানীং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসেছিল দলবল নিয়ে। আমার একলা একলা আসার ইচ্ছা ছিল"। (ক। ৫। ১৫। ৪)

কেশবচন্দ্রের দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের মন্তব্যও লক্ষণীয়। তিনি বলেছিলেন, "কেশব এখন কালী মানেন—চিন্ময়ী কালী—আদ্যাশক্তি। আর মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন" (ক। ৫। ১৩। ৩)। শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দেন যে, ব্রাহ্মভক্তগণ সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন। সেই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচারণ হ'তে জানতে পারি তাঁর কাছ হতেই কেশব প্রভৃতি নেতারা ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখেছিলেন, অহেতুকী ভক্তির ধারণা করেছিলেন, বুঝেছিলেন যে সকলেই নিরাকার পূজার অধিকারী নয় এবং অধিকাংশ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সাকার পূজার প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন ব্রাহ্ম মাত্রই প্রতিমাবিদ্বেষী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের ভাব রক্ষা করে বলতেন, "তোমাদের পক্ষে মূর্তি নয়, ভাব। তোমরা টানটুকু নেবে, যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান, ভালবাসা। সাকারবাদীরা যেমন মা কালী, মা দুর্গার পূজা করে 'মা মা' বলে কত ডাকে ভালবাসে, সেই ভাবটি তোমরা নেবে, মূর্তি নাই বা মানলে"। (ক। ৪। ৫। ১)

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে জগজ্জননীর সহজ সরল খাঁটি সম্বন্ধ। তিনি ঘরোয়া সম্পর্কে বুঝিয়ে বলেন, "মা—কি মা? জগতের মা। যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। যিনি তাঁর ছেলেদের সর্বদা রক্ষা করছেন, পালন করছেন। আর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—যে যা চায় তাই দেন। ঠিক ছেলে মা ছাড়া থাকতে পারে না। তার মা সব জানে। ছেলে যায়-দায় বেড়ায়, অতশত জানে না"। (ক। ৫। ১০। ৩)

শ্রীরামকৃষ্ণ কালীতত্ত্বের সামূহিক রূপ তুলে ধরেছিলেন কেশবের নিকট। তিনি বলেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি;…দুধ কেমন? না ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্য ছেড়ে লীলা, লীলা ছেড়ে নিত্য ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তারই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ করছেন না, ওই কথা যখন ভাবি, তখন তাকে ব্রহ্ম বলে কই"।

শ্রীরামকৃষ্ণ সরাসরি বলেছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবের নিকট, "তুমি আদ্যাশক্তিকে মানো। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। বলতে গেলেই দুটো। কেশব কালী মেনেছিল"। (ক। ১। ৬। ২।)

শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীকার গুরুদাস বর্মণ মনোরম একটি চিত্র পরিবেশন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হৃদয়কে নিয়ে গিয়েছেন কেশবচন্দ্রের বাড়ী। শ্রীরামকৃষ্ণের উৎফুল্লবদনে ধর্মপ্রসঙ্গের ফোয়ারা ছোটে। ধর্মপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন: "কিন্তু তোমরা যে অবতার মান না, তার কি"? কেশব হাসেন, বলেন: 'মশাই, আমরা তো মানতে চাই নি, আপনি তা বলে ছাড়েন কৈ? আপনি যে মানিয়ে নিচ্ছেন"।

শ্রীরামকৃষ্ণ: "তা তুমি সাকার মূর্তিকে কাঠ-মাটি মনে করো না। সচ্চিদানন্দঘন বলে জ্ঞান কর। যেমন এই জল জমে বরফ হয়, সেই রকম মনে করবে, তাহলে আর কোন গোলযোগ হবে না, বুঝলে"?

জীবনীকার কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে লিখেছেন, "তাঁহার নিরাকার উপাসনা ক্রমে সাকারে পরিণত হইয়া কেবল 'মা 'মা' বলিয়া তিনি প্রকৃত সন্তানভাবে ভগবানকে ডাকিতে শিখিয়াছেন,

উপাসনা মন্দিরে মা, সংবাদপত্রে মা, বক্তৃতায় মা। এখন কেশব রামকৃষ্ণদেবের উপদেশ শিরোধার্য করিয়া সর্বত্র মাকে প্রচার করিতেছেন। তাহার ফলও প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন—তাঁহার বক্তৃতায় শক্তির উন্মেষ হইয়াছে তাঁহার বক্তৃতাকালে শ্রোতৃবর্গ মনে করেন, কেশব সেন মা আনন্দময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়াই বক্তৃতা দিতেছেন"।

কেশবচন্দ্রের হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর রূপক ব্যাখ্যা এবং ব্যক্তিগত ধর্মসাধনায় যেরূপ সগুণ ব্রহ্মবাদ, অবতারবাদ, আদেশবাদ ও তদনুযায়ী ধর্মসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন, "তাহাতে রামমোহন যেমন সিদ্ধান্তের দিক হইতে, কেশবচন্দ্র তেমনি সাধনের দিক হইতে মূর্তিপূজাকে রূপকভাবে অনেকটা স্বীকারই করিয়া গিয়াছেন"।[৮]

ধর্ম-বিজ্ঞানের জাগ্রতশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখ-নিঃসৃত ঈশ্বরে প্রীতি, অনুরাগ, উন্মাদনা কেশবচন্দ্রকে প্রভাবিত করেছিল। শুধু তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের শিখিয়েছিলেন অহৈতুকী ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজমুখে বলেছেন, "কেশব সেন অহৈতুকী ভক্তি জানত না—কোন কামনা নেই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি"। (ক। ৫। ১৬। ৪)

স্বামী সারদানন্দ বলেন যে, কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে নববিধানের ঘনীভূত মূর্তি জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। শুধু কি তাই? কেশব নিজের বাড়ীতে যেখানে যেখানে শয়ন, ভোজনাদি করতেন সেগুলি দেখিয়ে শেষে উপাসনা ঘরে নিয়ে যান। শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সরল প্রাণে এ ঘটনা বলে ফেলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে।

রাজেন্দ্রনাথ মিত্রকে বলেছিলেন "ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহাভাবের লক্ষণ এ প্রদেশে চৈতন্যের ছিল এবং বিজাতীয়দের মধ্যে ঈশার মহাভাব হইত। পরমহংসদেবের এইভাব হয়, এজন্য অনেকে তাঁহাকে চৈতন্যাবতার বলিয়া মনে করেন"। চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবে যে অভ্যুদয় দেশবাসীকে জাগরিত করেছিল তার পুনরভ্যুদয় ঘটেছিল রামকৃষ্ণবিগ্রহকে অবলম্বন করে। এবং কেশবচন্দ্রের প্রতিভা এই ঐতিহাসিক সত্যকে চিনতে সক্ষম হয়েছিল।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে মোকামাতে প্রার্থনা সভায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আলোচ্য বিষয় ছিল "Reconciliation of the Vedas and the Puranas in the present dispensation of the Brahmo Samaj".[৯] কয়েকদিন পরে ১৯শে আশ্বিন ১৮০১ তাং মঙ্গলবার ব্রাহ্মমন্দিরে ব্রহ্মানন্দ উপদেশ দেন। সেদিনকার বিষয়বস্তু ছিল "ঈশ্বরের মাতৃভাব"। তিনি তাঁর ধর্মজীবনকে নবালোকে ব্যাখ্যা করেন, "ধর্মজীবনের বাল্যাবস্থায় মানুষ উপাসনা করতে জানে না। কেবল ঈশ্বরকে ডাকে, ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় প্রার্থনা করে।... ধর্মশিশুর প্রার্থনাই একমাত্র অবলম্বন।...ভাষার প্রথম পরিচয় 'মা' বলিয়া ডাকা। পূর্ণ যোগী, পূর্ণ ভক্তও মার চরণে নমস্কার করেন। মা অপেক্ষা মিষ্টতর শব্দ নাই।···সর্বাগ্রে শিশু জানিল মা আছেন।···শিশুর পরমধন একমাত্র মা। শেষে বিদেশ থেকে ফিরিয়া আসিয়া সেই বৃদ্ধ এই সার বুঝিল, সেই শিশুবেলা যাহা আঁকিয়াছি তিনিই সত্য। এই বলিয়া যার নাম সাধন

৮। স্বামী বিবেকানন্দ ও আধুনিক ভারতবর্ষ, ঐ, পৃঃ ১০৫-৬।
৯। Dr. P. S. Basu: Life & Works of Brahmananda Keshav. p. 366.

করিতে লাগিল। দয়াময় নাম অপেক্ষা মা নাম মিষ্টতর।···দুর্গাপূজার অন্য কোন অর্থ নাই। সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম মা রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহা যদি বঙ্গদেশ বুঝিত তাহা হইলে আজ সমস্ত দেশ যথার্থ জীবন্ত মার চরণে লুটাইয়া পড়িত।...কবে যথার্থ মার নামে বঙ্গদেশ প্রেমার্দ্র হইবে? মাতৃহীন বঙ্গদেশ তুমি কি তোমার মাকে চিনিবে না? তোমার মা তোমাকে সৌভাগ্য দিবার জন্য ব্যস্ত। ব্রাহ্মগণ কবে তোমরা মার ভক্ত হইবে?...মার মত আর কেহ নাই, বৃথা কেন যাও ভাই অন্য ঠাঁই? সকলে বলে পুরুষের অপেক্ষা নারীর রূপ অধিক। সেইরূপ ঈশ্বরের পিতার ভাব অপেক্ষা তাহার মাতার ভাব অধিক সুন্দর। অতএব মার প্রেমে বশীভূত হইয়া দয়াময় ঈশ্বরকে দয়াময়ী ঈশ্বরী জানিয়া যেন আমরা তাঁহার শ্রীচরণতলে বাস করি"।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র মা-কালীর কোন বিশেষরূপকে মানেন নি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণে স্ফুরিত কালীশক্তিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। শুধু কি তাই? শ্রীরামকৃষ্ণের অবয়বে স্ফুরিত কালীশক্তির নব নব রূপ ও ভাব বিকাশই কেশবচন্দ্রের জীবনের শেষ অধ্যায়কে বিচিত্রভাবে বর্ণাঢ্য করেছিল।

॥ জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা ॥*

শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন-মহাকাব্যে তাঁর জননীসদৃশা ধাত্রীমাতা শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়ার ভূমিকা অত্যন্ত স্মরণযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এই পরম পুণ্যশীলা রমণীর নামগন্ধও সূত্রাপি মেলে না। শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়া ছিলেন মহাভাগ্যবতী। তিনিই প্রথম বিশ্বস্রষ্টা মহামানবের নাড়ীচ্ছেদন কার্য্য সমাধা করে তাঁর সমস্ত ক্লেদ দূরীভূত করে নবজাতককে কোলে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন শিশু গদাধরের ধাত্রীমাতা। অথচ তিনি নিকৃষ্ট কুলে জন্মেছেন বলেই হোক কিংবা অজ্ঞাত কারণে তাঁর নাম কোনও শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীতে উল্লেখিত হয়নি।

মহাত্মা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 'দেরে' গ্রাম ছেড়ে কামারপুকুরে এসে বসবাস করবার পর শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়া ওঁদের গৃহে ধাত্রীর কাজে নিযুক্তা হন। ধাত্রী হিসেবে ভৈরবীর যথেষ্ট নামডাক ছিল সে-সময়। ধাইয়ের কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। উপদেবতা প্রভৃতির উপদ্রব নিবারণ এবং তজ্জনিত পীড়াদির প্রশমনের মন্ত্র-তন্ত্র ও ঝাড়ফুঁক তুক-তাকেও তাঁর জুড়ি ছিল না।

সে-সময় সূতিকাগার অতি নিকৃষ্টস্থানে নির্বাচিত হত এবং শিশুর নাড়ীচ্ছেদন কার্য্য হিন্দুর নিকৃষ্ট জাতি কেওড়া ওরফে হাড়িজাতির রমণী দ্বারা সম্পাদিত হত। সকলের ধারণা এরকম ছিল, প্রসবের পূর্বে অন্য উচ্চ হিন্দুজাতির স্ত্রী প্রসূতিকে ধরতে পারে এবং সেবাশুশ্রূষাদি করতে পারে। প্রসবের পূর্বে ধাত্রীকে যদপি ডেকে আনা হয়, তাহলে প্রসূতির সুপ্রসব হয় না অর্থাৎ প্রসূতি বিশেষ কষ্ট পায়। তাই ক্ষুদিরামও শ্রীমতী চন্দ্রমণিদেবীর প্রসবকালে শ্রীমতী ধনীকামারনীকে প্রসূতির শুশ্রূষাদির জন্য থাকার ব্যবস্থা করেন। তারপর গদাধরের ভূমিষ্ঠ হবার সংবাদ পেয়ে ক্ষুদিরাম হৃষলালগঞ্জে যান এবং ভৈরবীকে ডেকে আনেন। শিশুর

*প্রবন্ধটির তথ্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে —স

নাড়ীচ্ছেদন যিনি করে থাকেন শিশুরা তাঁকে ধাত্রীমাতা বা পল্লীভাষায় ধাইমা বলে থাকে। বলাবাহুল্য, গদাধরও একটু বড় হয়ে ভৈরবীকে 'ধাইমা' বলে সম্বোধন করতেন।

ভৈরবী এসে নবজাতকের নাড়ীচ্ছেদন করেন কাঁচা বাঁশের তৈরী চেরাটি বা চিল্‌কে দিয়ে। তারপর পাঁচ-পাঁচদিন তিনি শিশু গদাধরকে কোলে নিয়ে বসেছেন, সোয়াতীকে দু'বেলা আগুনের সাঁক দিয়েছেন, নোংরা কাঁথা-কাপড় পরিষ্কার করেছেন, মন্ত্র পড়ে সাদা সরিষার আতুর-ঘর, ঢেঁকিশালা মন্ত্র-বন্ধন করেছেন। কড়ি, ফুল, তালপত্র, দোয়াত, কলম, নৈবেদ্য ও চারটি শরের তীর দিয়ে সেটেরা পূজা করেছেন। শিশুকে চোখে চোখে রেখেছেন। তারপর আরও এসেছেন, কোলে করেছেন একুশায়, অন্নপ্রাশনে, যজ্ঞসূত্রধারণের দিনগুলিতে। আরও কতদিন কতবার তিনি এই শিশুমুখ চুম্বন করেছেন—সে হিসাব কে রাখে!

শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়া শিশু গদাধরের প্রকৃতই যে ধাত্রীমাতা ছিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পৌত্র শ্রীযুক্ত পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তি থেকে—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধাত্রীমা ভৈরবী কেউরাণীর জীবনী আজ পর্যন্ত কোন পুস্তকে প্রকাশ হয় না। পূর্বে যাঁহারা রামকৃষ্ণদেবের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ধাত্রী ভৈরবীর সন্ধান করেন না। কিম্বা নীচ জাতিয়া রমণী বলিয়া ভৈরবীকে এড়াইয়া পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অতি সত্য কথা যে, এখনও আমাদের গৃহে ধাত্রীর কার্য্য ভৈরবীর বংশধরের রমণীগণ করিয়া থাকেন।'*

বাংলা ১২১৩-১৪ সালের কোনো সময়ে শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়ার জন্ম হয়। ভৈরবীরা কামারপুকুরের পশ্চি সুখলালগঞ্জে বসবাস করতেন। বাল্যকাল থেকেই ভৈরবীর জীবনে ধর্মস্পৃহা ও বৈরাগ্যের আভাস পাওয়া যেত। বালিকা আপনমনে দেবপূজাদিতে রত থাকতেন। ভৈরবীর বিবাহের পর স্বামী কুচিল কেওড়ার সঙ্গে দিনমজুর খেটে তিনি অতিকষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতেন। কুচিলের পুত্র বিকু এবং তৎপুত্র কুঞ্জ। কুঞ্জের চার পুত্র শুবেণ (মৃত্যু ১৯৭০), রামহরি, শ্রীহরি (মৃত্যু ১৯৬৭) ও বলরাম। শ্রীহরির চার পুত্র দুঃখীরাম (মৃত্যু ১৯৪৩), মিলন, শীতল ও কবিরাজ। শুবেণ ও শ্রীহরির বংশধররা আজও কামারপুকুরের পশ্চি সুখলালগঞ্জ ও অমরপুরে বসবাস করছেন। এঁদের সাম্প্রতিক কৌলিক উপাধি 'মালিক'। এঁরা জাতিতে হাঁড়ি, বৃত্তিতে দিনমজুর। মেয়েরা আজও এই অঞ্চলে ধাত্রীর কাজ করেন।

শ্রীমতী ভৈরবী কেওড়া অতি বৃদ্ধা বয়সে অর্থাৎ বাংলা ১৩০২-৩ সালের নিকটবর্তী কোনো সময়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। ভৈরবীর মৃত্যুর পূর্বেই স্বামী কুচিল কেওড়া লোকান্তরিত হয়েছিলেন। পরিতাপের বিষয়, আজ পর্যন্ত পরম পুণ্যশীলা ভৈরবীর ভাগ্যে কোনও অনুগ্রহই জোটেনি। তাঁর বাসভূমিতে আজও কোনও ক্ষুদ্র মন্দির নির্মিত হয়নি। কখনো কোনো ঐতিহাসিক বা গবেষক তাঁর ভিটায় পদার্পণ করেন না। কোনো পুণ্যার্থী তাঁর নামে কপালে হাত ঠেকান না। আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মভূমি কামারপুকুরের অধিবাসীরাই যেন তাঁর নামটি ভুলতে বসেছেন। ●

---

*শ্রীযুক্ত পার্বতীনাথ চট্টোপাধ্যায় কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ লাহা মহাশয়কে ৮-৯-১৯৩৬ তারিখের একটি পত্রে লিখেছিলেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

বরানগর-মঠে কিছুদিন থাকিবার পর কালীপ্রসাদ বিশেষভাবে নরেন্দ্রনাথের (স্বামী বিবেকানন্দের) অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন ও পুনরায় পদব্রজে ভারত-পরিভ্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। পূর্বে সন্ন্যাসীসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথা ছিল সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবার পূর্বে বা পরে ত্যাগব্রতী বিভিন্ন দেশ ও তীর্থ পরিভ্রমণ করিবেন। তীর্থভ্রমণ করার উদ্দেশ্য বিভিন্ন পবিত্র সাধু-সন্ন্যাসী-অধ্যুষিত স্থানে বাস করিয়া তপস্যাদি করা। ধ্যান-ধারণা ও অধ্যাত্মসাধনাই সাধু-সন্ন্যাসীদের জীবনে প্রধান ব্রত। সেইজন্য তাঁহারা তীর্থভ্রমণাদিকে জীবনসাধনার অন্যতম কর্তব্যকর্ম বলিয়া মনে করিতেন।

সেইজন্য কালীপ্রসাদ বরানগর হইতে একেবারে প্রত্যূষে উঠিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন এবং সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন সমগ্র আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল ও ঝড়-বৃষ্টি হইতেছিল। কিন্তু কালীপ্রসাদ তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মনে শক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইয়া বালি-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে কপর্দকমাত্রও ছিল না, সেইজন্য গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া তিনি হাসিমুখে গয়াভিমুখে রওনা হইলেন এবং চারিদিন পরে গয়াতীর্থে উপস্থিত হইলেন। গয়ার ফল্গুনদীতে স্নান সমাপন করিয়া বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিলেন। কিন্তু গয়াতে থাকা তাঁহার সংকল্প ছিল না, সেইজন্য পুনরায় তিনি কাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনবরত শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা অন্তরে লইয়া কালীপ্রসাদ ক্রমে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

পবিত্র কাশীধামে উপস্থিত হইয়া কালীপ্রসাদ গঙ্গায় স্নান সমাপন করিলেন এবং কিছু মাধুকরী করিয়া আহারের পর পুনরায় পথ চলিতে চলিতে প্রয়াগ ও এলাহাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রয়াগসঙ্গমে স্নান করিয়া তিনি নিকটবর্তী একটি গ্রামে মাধুকরী করিয়া আহার সম্পন্ন করিলেন এবং বৈকালে পুনরায় পূর্বের মতো পথ চলিতে লাগিলেন। পথ চলিতে চলিতে কালীপ্রসাদ প্রথমে আগ্রায় ও পরে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। দিল্লীতে মাত্র দুই-একদিন থাকিয়া আবার চলিলেন জয়পুর, উদয়পুর, খেতড়ি, আবু, গিরণার প্রভৃতি স্থান ও তীর্থ-অভিমুখে। ক্রমে নর্মদানদী অতিক্রম করিয়া তিনি জুনাগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন। তখন তাঁহার মন গুরুভ্রাতা বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একান্তভাবে আকুল ও বিচলিত। তিনি পূর্বের ন্যায়ই চলিতে লাগিলেন এবং চলিতে চলিতে উপস্থিত হইলেন পোরবন্দরে। তথায় শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ্ নামে একজন ভদ্রলোকের বাড়ীতে তিনি অতিথি হইলেন। ঐস্থানে তিনি শুনিতে পাইলেন যে, কিছুদিন পূর্বে 'সচ্চিদানন্দ' নামে একজন বাঙ্গালী-সন্ন্যাসী এই পোরবন্দরে আসিয়াছিলেন। কিন্তু কালীপ্রসাদ তখন জানিতেন না যে,

নরেন্দ্রনাথই 'সচ্চিদানন্দ' এই ছদ্মনাম লইয়া তীর্থভ্রমণ করিতেছেন। তবে বহু পরে তিনি জানিতে পারেন যে, এই ছদ্মনাম লইয়াই গুজরাট ও কচ্ছদেশে নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন তীর্থস্থান ও অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

যাহাহউক সঠিক সংবাদ পাইয়া কালীপ্রসাদ মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন হয়তো বা কোথাও নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে। কালীপ্রসাদ অবশ্য পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাঙেরই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুইদিন তাঁহার বাড়ীতে অতিবাহিত করিলেন।

পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ সংস্কৃতভাষায় ও বিশেষভাবে বেদান্তশাস্ত্রের উপর অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। একদিন পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ বেদান্তবিষয়ে কালীপ্রসাদের সহিত আলোচনা করিতে অতিশয় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ কিছুদিন কালীপ্রসাদকে তাঁহার বাড়ীতে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। কালীপ্রসাদ তাঁর সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। তাহাছাড়া সেই সম্মত হওয়ার পিছনে আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল যে, শঙ্কর পাণ্ডুরাঙের বাড়ীতে থাকিতে থাকিতে যদি স্বামী বিবেকানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইটিই প্রকৃতপক্ষে কালীপ্রসাদের অন্তরের ইচ্ছা। নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কালীপ্রসাদ সত্যই উতলা হইয়া পড়েন। শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ ইতিমধ্যে প্রায় দুইদিনের মধ্যে প্রতিদিনই কালীপ্রসাদের সহিত কিছু-না-কিছু শাস্ত্র আলোচনা করিতেন এবং সেই আলোচনার মধ্য দিয়া কালীপ্রসাদেরও দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। উল্লেখযোগ্য যে, শঙ্কর পাণ্ডুরাঙ ঐ সময়ে 'অথর্ববেদ' সংকলন করিয়া ছাপাইতেছিলেন। শাস্ত্রালোচনায় কালীপ্রসাদের বিচারপদ্ধতি ও প্রখর বুদ্ধি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতজী বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। দুইদিন অতিবাহিত হইবার পর কালীপ্রসাদ শঙ্কর পাণ্ডুরাঙের নিকট বিদায়ের অনুমতি চাহিলে পণ্ডিতজী বারবার তাঁহাকে আরও দুই-চারিদিন তাঁহার বাটীতে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে থাকেন। কিন্তু কালীপ্রসাদ আর থাকিতে সম্মত হইলেন না, কারণ তাঁহার গুরুভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের সহিত তখনও সাক্ষাৎ হইল না। সুতরাং পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন ও তিনি জুনাগড়ের দিকে যাত্রা করিলেন।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাজনে : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

লীলাচিত্র অনুধ্যান :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশেষ আগ্রহসহকারে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দেখতে যান এবং এঁকে দর্শন করে পরম আহ্লাদিত হন। সেদিন (৭ই আগষ্ট, ১৮৮২ খ্রীঃ) তিনি এঁর সান্নিধ্যে প্রায় পাঁচঘন্টা আনন্দে কাটান এবং ঐ অবসরে বিবিধ তত্ত্বালাপন ও নানা সরস কথোপকথন করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ঠাকুর এঁকে সেই সেই ভাবানুরূপ কতকগুলি মনোহর সঙ্গীতও শোনান এবং নিজে কয়েকবার উচ্চ আধ্যাত্মিক আবেশে নিমগ্ন হন। তিনি সর্বসমক্ষে বিদ্যাসাগরের মহানুভবতার সুখ্যাতি করেন এবং এঁর আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এঁকে উপদেশও দেন। পরিশেষে, তিনি এঁকে দক্ষিণেশ্বরে আগমনের জন্য সাদর আহ্বান জানান এবং বিদায়গ্রহণের সময় এঁর মঙ্গলার্থ নিবিষ্টভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ ও প্রার্থনা করেন।

পক্ষান্তরে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐদিন পরমহংসদেবকে নিজ ভবনে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে অভ্যর্থনা জানান। তিনি পানীয়জল চাইলে, ইনি সুস্বাদু মিষ্টান্নসহ তা সযত্নে নিবেদন করেন। তাঁর দীর্ঘক্ষণব্যাপী তত্ত্বালোচনায় ইনি, আগাগোড়া গভীর মনোযোগ দেন ও আহ্লাদিত হন। সেই আলোচনায় বিদ্যাসাগর সাগ্রহে অংশগ্রহণও করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথায়* যৌক্তিকতা ইনি প্রথমে খুঁজে পান না, কিন্তু পরক্ষণেই তা মীমাংসিত হ'য়ে যায়। ব্রহ্মবিষয়ক তাঁর একটি উক্তি† এঁকে পরম আহ্লাদিত ও চমৎকৃত করে। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার জন্য প্রীতিপূর্ণ আমন্ত্রণ জানালে ইনি ঐবিষয়ে সাগ্রহে নিজ সম্মতি দেন। তাঁর বিদায়কালে ইনি নিজে আলো ধরে তাঁকে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে সযত্নে গাড়ির কাছে এগিয়ে নিয়ে যান এবং মাষ্টারকে গাড়িভাড়ার কথাও জিজ্ঞাসা করেন। অবশেষে, ঠাকুরের গাড়ি রওয়ানা হ'য়ে গেলে, ইনি তাঁর গাড়ির দিকে বহুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। তাঁর প্রতি এঁর বিনয়-নম্র-আচরণ ও নিষ্টতাপূর্ণ কথাবার্তা উপস্থিত সকলেরই মুগ্ধদৃষ্টি আকৃষ্ট করে।

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ :

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে মিলনের পরে পরমহংসদেব ভক্তগণের নিকট প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন সময়ে এঁর কথা বলেন। 'কথামৃত' গ্রন্থে সেগুলি কিছু কিছু ইতস্ততঃ লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। তাঁর সেই সমস্ত উক্তি এখানে বিষয়ানুক্রমে পরিবেশিত হ'ল।

[ভেতরের বস্তুর সন্ধান পান নি]

"ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত, কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ ক'রছে—কিন্তু অন্তরে কি আছে, তা জানে না ; অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন,—

---

* শক্তিবিশেষ—বিভিন্ন আধারে শক্তির তারতম্য।

† ব্রহ্ম অনুদ্দিষ্ট। কি বস্তু, মুখে বলা যায় না।

জানতে পারলে সব কাজ ছেড়ে, ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়। ··অন্তরে কি আছে, জানবার জন্য একটু সাধন চাই।"—কথামৃত-৩য় ।২।১।১৯ [দক্ষিণেশ্বর। ২৬শে আগষ্ট, ১৮৮২ খ্রীঃ]।

"সাধনা চাই—শুধু শাস্ত্র পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে—অনেক পড়া আছে; কিন্তু অন্তরে কি আছে, দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে কি হবে? ধারণা কই? পাঁজিতে বিশ আড়া জল [এর কথা আছে]; কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না।"—কথামৃত-৩য় ।১৬।১।১৮২ [রামের বাটী। ২৩শে মে, ১৮৮৫ খ্রীঃ]।

[শক্তিবিশেষ মানতে চান নি]

"যা কিছু দেখছ, সব তাঁর [ঈশ্বরের] শক্তি। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কিছু করবার জো নাই। তবে একটি কথা আছে, তাঁর শক্তি সবস্থানে সমান নয়। বিদ্যাসাগর ব'লেছিল, 'ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন?' আমি ব'ললুম, 'শক্তি কম বেশী যদি না দিয়ে থাকেন, তোমায় আমরা দেখতে এসেছি কেন? তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে?' তবে দাঁড়ালো যে, ঈশ্বর বিরূপে সর্বভূতে আছেন; কেবল শক্তিবিশেষ।"—কথামৃত-২য় ।৪।১।৩৯ [সুরেন্দ্রের বাটী। ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীঃ]।

"তিনি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন। কোনখানে একটা প্রদীপ জ্বলছে, কোনখানে একটা মশাল জ্বলছে। বিদ্যাসাগরের এক কথায় তাঁকে চিনেছি, কতদূর বুদ্ধির দৌড়। যখন ব'ললুম শক্তিবিশেষ, তখন বিদ্যাসাগর ব'ললে, মহাশয়। তবে কি তিনি কারুকে বেশী, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?'

"আমি অমনি বললুম, 'তা দিয়েছেন বৈকি। শক্তি বেশী না হ'লে, তোমার এত নাম হবে কেন? তোমার বিদ্যা, তোমার দয়া এইসব শুনে তো আমরা এসেছি। তোমার তো দুটো শিং বেরোয় নাই।'

"বিদ্যাসাগরের এত বিদ্যা, এত নাম কিন্তু কাঁচা কথা ব'লে ফেললে, 'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' কি জানো, জালে প্রথম প্রথম বড় বড় মাছ পড়ে—রুই, কাতলা। তারপর জেলেরা পাঁকটা পা দিয়ে ঘেঁটে দেয়। তখন চুনো-পুঁটি, পাঁকাল এইসব মাছ বেরোয়,—একটু দেখতে দেখতে ধরা পড়ে। ঈশ্বরকে না জানলে ক্রমশঃ ভিতরের চুনো-পুঁটি বেরিয়ে পড়ে। শুধু পণ্ডিত হ'লে কি হবে?"—কথামৃত-২য় ।৮।২।৬৪ [দক্ষিণেশ্বর। ১৫ই জুন, ১৮৮৩ খ্রীঃ]।

"তবে শক্তিবিশেষ। তিনিই সব হ'য়েছেন বটে, কিন্তু কোনখানে বেশী শক্তির প্রকাশ, কোনখানে কম শক্তির প্রকাশ।

"বিদ্যাসাগর ব'লেছিল,—'তা ঈশ্বর কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?' আমি ব'ললুম,—'তা যদি না হ'তো, তাহ'লে একজন লোক পঞ্চাশজন লোককে হারিয়ে

দের কেমন ক'রে, আর তোমাকেই বা আমরা দেখতে এসেছি কেন' ?"—কথামৃত-২য় ।১০।৩।৭৩ [কমলকুটীর । ২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ] ।

●

"সদরওয়ালা—মহাশয় । তাঁর কৃপা কি একজনের উপর বেশী, আর একজনের উপর কম ? তা হ'লে যে, ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় ।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি । ঘোড়াটাও টা আর সরাটাও টা । তুমি যা ব'লছো, ঈশ্বর বিদ্যাসাগর ঐ কথা ব'লেছিল । ব'লেছিল,—'মহাশয় । তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি দিয়েছেন, কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?' আমি ব'ল্লাম,—বিভূরূপে তিনি সকলের ভিতর আছেন—আমার ভিতরেও যেমনি, পিপড়েটির ভিতরও তেমনি । কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে । যদি সকলেই সমান হবে, তবে ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নাম শুনে তোমায় আমরা কেন দেখতে এসেছি । তোমার কি দুটো শিং বেরিয়েছে । তা নয় । তুমি দয়ালু, তুমি পণ্ডিত, এইসব গুণ তোমার অপরের চেয়ে আছে, তাই তোমার এত নাম ।' দেখ না, এমন লোক আছে, যে একলা একশো লোককে হারাতে পারে ; আবার এমন আছে, একজনের ভয়ে পালায় ।

"যদি শক্তিবিশেষ না হয়, লোকে কেশবকে এত মান্‌তো কেন ?

"গীতায় আছে, যাকে অনেকে গণে মানে—তা বিদ্যায় জন্যই হউক, বা গাওনা বাজনার জন্যই হউক, বা লেক্‌চার (Lecture) দেবার জন্যই হউক, বা আর কিছুর জন্যই হউক—নিশ্চিত জেন যে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শক্তি আছে ।"*—কথামৃত ১ম।১২।৩।১৭৭ [সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ । ১৯শে অক্টোবর, ১৮৮৪ খ্রীঃ] ।

"সকল লোকের শক্তি কি সমান হতে পারে ? বিভূরূপে তিনি সর্বভূতে এক হয়ে আছেন বটে, কিন্তু শক্তিবিশেষ ।

"বিদ্যাসাগরও ঐ কথা বলেছিল,—'তিনি কি কারুকে বেশী শক্তি, কারুকে কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন ?' তখন আমি ব'ললাম,—'যদি শক্তি ভিন্ন না হয়, তা হ'লে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি ? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে' ?"—কথামৃত-৩য় ।১৮।৩।২১৪ [নন্দ বসুর ভবন । ২৫শে জুলাই, ১৮৮৫ খ্রীঃ] ।

[ব্রহ্মের কথা শুনে আনন্দ]

"আমি বিদ্যাসাগরকে ব'লেছিলাম—সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই । অর্থাৎ ব্রহ্ম কি, কেউ মুখে ব'লতে পারে নাই । মুখে ব'ললেই জিনিসটা এঁটো হয় । বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারি খুসি ।"—কথামৃত-৪র্থ।৫।২।৫২-৫৩ [সিঁথির ব্রাহ্মসমাজ । ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ খ্রীঃ]

---

* যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ।—গীতা-১০ম।৪১

ভাবানুবাদ—যাহা যাহা কিছু ঐশ্বর্যশালী, লক্ষ্মীযুক্ত, অথবা অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন ; তাহা তাহাই আমার বিশেষ শক্তির অংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে ।

"ব্রহ্ম যে কি বস্তু মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়েছে (অর্থাৎ মুখে বলা হয়েছে),—কিন্তু ব্রহ্ম কি ? কেউ মুখে বলতে পারে নাই। তাই উচ্ছিষ্ট হয় নাই। এ কথাটি বিদ্যাসাগরকে ব'লেছিলাম। বিদ্যাসাগর শুনে ভারি খুসি।"—কথামৃত-৪র্থ।৭।২।৩৭ [দক্ষিণেশ্বর। ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ]।

[সত্যরক্ষা ক'রলেন না]

"বিদ্যাসাগর সত্য কথা কয় না কেন ?

"সত্যবচন, পরস্ত্রী মাতৃসমান। এইসে হরি না মিলে তুলসী ঝুটজবান।" সত্যতে থাকলে তবে ভগবানকে পাওয়া যায়। বিদ্যাসাগর সেদিন ব'ললে, এখানে আসবে ; কিন্তু এলো না।

"পণ্ডিত আর সাধু অনেক তফাত। শুধু পণ্ডিত যে, তার কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন হরিপাদপদ্মে। পণ্ডিত বলে এক আর করে এক।"—কথামৃত-২য়। ৯।১।৬৫-৬৬ [দক্ষিণেশ্বর। ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ]

"এইরকম আছে যে, সত্যকথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট ক'রে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়। আমি এই ভেবে, যদিও কখন ব'লে ফেলি যে, যাবে যাব ; যদি যাবে নাও পায় তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে ক'রে কাউতলার দিকে যাই। তার এই—পাছে সত্যের আঁট যায়।

"শিবনাথকে* দেখ্‌লে আমার আনন্দ হয়,···তবে শিবনাথের একটা ভারি দোষ আছে—কথার ঠিক নাই। আমায় ব'লেছিল যে, একবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে) যাবে, কিন্তু যায় নাই ; আর কোন খবরও পাঠায় নাই।"—কথামৃত-১ম। ৮।১।১২১ [মণি মল্লিকের বাটী। ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ]।

[আর দু'একবার দেখা দরকার]

"আর দু'-একবার ঈশ্বর বিদ্যাসাগরকে দেখার প্রয়োজন। চলচ্চিত্র একবার মোটামুটি এঁকে নিয়ে তারপর বসে রঙ্ ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দো'মেটে, তারপর খড়ি, তারপর রঙ—পরে পরে ক'রতে হয়।"—কথামৃত-৩য়। ২।১।১৯ [দক্ষিণেশ্বর। ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খ্রীঃ]।

[ঈশ্বরের লীলা-খেলা অবোধ্য]

"সুখ-দুঃখের কথা হইতেছে। ঈশ্বর এত দুঃখ কেন ক'রেছেন ?

"মাষ্টার—বিদ্যাসাগর অভিমান ক'রে বলেন,—ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার। দেখ জেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরম্ভ ক'রলে, তখন অনেক লোককে বন্দী ক'রলে। ক্রমে ক্রমে প্রায় একলক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপতিরা এসে ব'ল্‌লে—মহাশয়। এদের খাওয়াবে কে ? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। তখন জেঙ্গিস খাঁ ব'ল্‌লেন তা হ'লে কি করা যায় ;

* ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী।

ওদের সব বধ করা। তাই কচাকচ্ ক'রে কাটবার হুকুম হ'য়ে গেল। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। তা তিনি থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন উপকার হ'ল না।

"শ্রীরামকৃষ্ণ—ঈশ্বরের কার্য কি বুঝা যায়, তিনি কি উদ্দেশ্যে কি করেন? তিনি সৃষ্টি-পালন-সংহার—সবই ক'রছেন। তিনি কেন সংহার ক'রছেন, আমরা কি বুঝতে পারি? আমি বলি—মা, আমার বোঝাবারও দরকার নাই; তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ-জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তি লাভ। আর সব মা জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি; কত গাছ, কত জাল, কত কোটী পাতা—এসব ব'সে ব'সে হিসাব করার আমার কি দরকার! আমি আম খাই, গাছ পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই।"—কথামৃত-৫ম। ৩।২।৩৫-৩৬ [দক্ষিণেশ্বর। ডিসেম্বর, ১৮৮২ খ্রীঃ]।

বিদ্যাসাগরের স্কুলে শ্রীরামকৃষ্ণ :

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন ঘোড়াগাড়ি ক'রে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগরের স্কুলের দ্বারদেশে উপস্থিত হন। তখন বেলা প্রায় তিনটা হবে। তিনি আসেন দক্ষিণেশ্বর থেকে। সঙ্গে শ্রীমান্ রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) এবং আরও দু'-একজন ভক্ত। সেই দিনটি ছিল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর বুধবার।

ঠাকুর ঐ স্কুল থেকে কথামৃত-কার মাষ্টার মহাশয়কে* তাঁর গাড়িতে তুলে নেন এবং সেখান থেকে তাঁদের সঙ্গে গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দেখতে যান।

উপসংহার :

বিদ্যাসাগর ও শ্রীরামকৃষ্ণের মিলন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন এই সদাত্মার সঙ্গে বহুক্ষণ ঈশ্বরীয় তত্ত্ব আলাপন করেন। 'কথামৃত' গ্রন্থে ঠাকুরের সেদিনের যে সমস্ত উপদেশ র'য়েছে, সেগুলির যৎসামান্যই এই নিবন্ধে পরিবেশিত হ'য়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিতেও বিদ্যাসাগরসহ ঠাকুরের মিলনসংবাদ এবং উভয়ের কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণী রয়েছে। কিন্তু সেগুলি কথামৃতেরই অনুরূপ। সেজন্য এই নিবন্ধে ঐগুলি পরিবেশনে বিরত রইলাম।

●

* 'কথামৃত'-কার ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তুলেস লেন এতিন্যুতে বর্তমানে যেখানে বিদ্যাসাগর স্কুল অবস্থিত, সেই রাস্তার ঠিক তার বিপরীত দিকে তখন ঐ স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

॥ পঞ্চদশীর দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(চার)

আগেই বলা হয়েছে, যুক্তি, তর্ক বা বিচারের মাধ্যমে আমরা (আত্মা সম্পর্কে) যথার্থ জ্ঞানলাভ করতে পারি,—এই জ্ঞান আমাদের বিভ্রান্তিরূপ অন্ধকার দূর করে। সুতরাং, বিচার দ্বারাই আমাদের জগতের স্বরূপ নির্ণয় করা উচিত। কারণ, বিচার দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে, সেই জ্ঞান একবার স্থায়ী হলে তা'কে আর কোনমতেই উৎখাত করা যায় না। এই জ্ঞান যাবতীয় বিভ্রান্তি নাশ করে। এই জ্ঞানের সাহায্যেই এ-জন্মেই ঈশ্বর-অনুভূতি লাভ করা যায়,—বিগত জীবনের কর্মফলও অতিক্রম করা যায়। সুতরাং, বিচার হচ্ছে শক্ত কাড়াই করবার যন্ত্রের মত,—যতক্ষণ না প্রকৃত জ্ঞানের দানা দেখা যায়, ততক্ষণ তার কাজ চলবে। পঞ্চদশীতেও আছে—

অনেকজন্মতজ্জনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি।
বিচারেণ বিনষ্টায়াং মায়ায়াং শিষ্যতে স্বয়ম্ ॥

'জগতে বহুজন্ম উপাসনায় অতিবাহিত করার পর মানুষ বিচারের পথ, যথার্থ জ্ঞানের পথ অনুসরণ করে। বিচার দ্বারা সর্বপ্রথম জ্ঞানের অভাব বিলুপ্ত হয়, তারপর শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয়'। অদ্বৈত ব্রহ্মের উপর দ্বৈতের আর দুঃখের মিথ্যা আরোপণকেই বন্ধন বলে। ব্রহ্ম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানই হচ্ছে মুক্তি বা উপলব্ধি। পঞ্চদশীতে আরও বলা হয়েছে যে, যথার্থ জ্ঞানের অভাবই বন্ধনের কারণ, আর শুধুমাত্র বিচার দ্বারাই এ বন্ধন হতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং, কে জীব এবং কে পরমাত্মা (ব্রহ্ম), সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই সিদ্ধান্তে আসা কর্তব্য—

অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদ্বয়স্যক্ত দুঃখিতা।
বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতির্মুক্তিরিতীর্যতে ॥
অবিচারকৃতো বন্ধো বিচারেণ নিবর্ততে।
তস্মাজ্জীব পরাত্মানৌ সর্বদৈব বিচারয়েৎ ॥

কিন্তু, যারা বুদ্ধিবৃত্তিতে তেমন উন্নত নয় যে এরকম বিচারে সক্ষম হবে, পঞ্চদশী তাদের ক্ষেত্রে বলেছে—

যো বিচারং ন লভ্যতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্।

'যে বিচারে সক্ষম নয়, সে অবশ্যই অন্তরে ব্রহ্মকে ধ্যান করবে'।—এই ধ্যানের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—

আত্মোপদেশং বিধিবচ্ছ্রদ্ধাতুরবিচারয়ন্।
নিদধ্যাৎ প্রত্যগাত্মৈক্যনন্যবৃত্ত্যাত্মধীঃ ॥

"কৃতবিদ্যের বাক্যে বিশ্বাস করে অন্তর্গত শিষ্যের উচিত বহির্বিষয় থেকে তার মনকে বিচ্ছিন্ন করা, আর অন্য কোন চিন্তায় মনকে বিচলিত না করে নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করতে সচেষ্ট হওয়া। এ ধরণের ধ্যান তার আত্মার ভ্রান্ত জ্ঞানকে ধীরে ধীরে নির্মূল করবে"। আর, যখন নিত্য ধ্যানের ফলে "আমার আত্মাই এই দেহ", "এই দেহ নিয়ে আমি জন্মেছি" ও "এই দেহের সঙ্গেই আমার মৃত্যু হবে" ইত্যাদি ধরণের ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর হবে, তখনই অবিভাজ্য আত্মা তার পরিপূর্ণতায় শিষ্যের বোধগম্য হবে।

যিনিই এ অনুভূতি লাভ করবেন, তিনিই তাঁর বর্তমান জীবনেই নিত্যকালের জন্য মুক্ত হয়ে যাবেন। তিনি ব্রহ্মের সাথে এক হয়ে যাবেন। আর কখনও তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। তখন তিনি তাঁর মনের, দেহের, এমন কি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষী হিসাবে কর্ম করেন। সুতরাং পঞ্চদশী বলেছে—

বিদ্যায়াং সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্।
প্রাপ্য তিষ্ঠতি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জনাৎ॥

* * *

নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ংপ্রভে।
অদ্বৈতে ত্রিপুটি নাস্তি ভূমানন্দোঽনুচ্যতে॥

ধ্যানে নিখুঁত হলে পরে যে কেউ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। আবার ব্রহ্মজ্ঞানে নিখুঁত হলে যে কেউ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। তখন উপলব্ধিসম্পন্ন যে কেউ বাস্তবের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। অজ্ঞানতার জন্যই মানুষ তার নিজের আর ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য অনুভব করে। কিন্তু যথার্থ জ্ঞান লাভের পরে উপলব্ধিসম্পন্ন আত্মা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করেন না। পার্থক্যবোধ দূর করতে সক্ষম হবার পর যে কেউ ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ জ্যোতি উপলব্ধি করেন। আর তখনই ত্রিপুটী, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, সম্পর্ক —সব লোপ পায়। ঐ চরম অবস্থাকে বলা যেতে পারে ভূমানন্দ, অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ও চিরন্তন শান্তি। যে ভাগ্যবান্ মানুষ এই অধিচেতন অবস্থা লাভ করেন, তাঁকে বলা চলে জীবন্মুক্ত, অর্থাৎ তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করেছেন। পঞ্চদশীতে জীবন্মুক্তের মানসিক অবস্থা বর্ণনায় আছে—

কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।
তূষ্ণীমেবং স্বমনসা মন্যতেঽসৌ নিরন্তরম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্মি।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষেঽদ্য।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং স্বস্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি॥

ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং কর্তব্যং মে ন বিদ্যতে কিঞ্চিৎ।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং প্রাপ্তব্যং সর্বমদ্যসম্পন্নম্ ॥
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ত্বৎপ্রেম্নৈ কোপমাঽভূল্লোকে।
ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ॥

অর্থাৎ জীবন্মুক্ত চিন্তা করেন ও বলেন,—"আমি সেই পরমাত্মাকে জেনেছি, সেজন্য আমি সুখী ; সর্বশ্রেষ্ঠ পরম সুখ আমি উপভোগ করছি, সেজন্য আমি সুখী ; জাগতিক বন্ধন হইতে আমি মুক্তি লাভ করেছি, বিভ্রান্তির পাশ হতেও আমি মুক্ত হতে পেরেছি,—সেজন্য আমি সুখী। কারও কাছে আমার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যে পরম প্রাপ্তির জন্য আমি এতকাল তপস্যা করেছি,—সেই পরম প্রাপ্তি আমার আয়ত্ত হয়েছে, সেজন্য আমি সুখী। মহান্ স্বর্গসুখ আমি উপভোগ করেছি, সেজন্য সুখীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী সুখী।"

●

॥ রামমোহন ও বাঙলার নব্য সংস্কৃতি ॥

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

বাঙালীর মননশীলতা, ধর্মীয় বিশ্বাস, লৌকিক চর্চা ও জীবনচর্যার মধ্যে হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের দিকটি বড় হ'য়ে উঠলেও তার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার নানাস্তরে ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির ফলে এমন বহু অনাচার ও কুসংস্কারের আবর্জনা জমা হয়েছিল—যা এদেশীয় মানুষদের অগ্রযাত্রাকে পুরোপুরি ব্যাহতই করছিল। মোঘলসম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তাঁর উদার মনোভাবের ফলে এদেশীয় ব্যক্তি ও সমাজচেতনার এক নবীন উন্মেষ দেখা দিলেও বাঙালী তার এতকালের ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামিকে কাটিয়ে উঠতে পারলো না। বহুবিবাহ, সতীদাহ বা সহমরণ, পৌত্তলিক প্রথা ও বহুদেবতার বিশ্বাস প্রমুখ নানা কুপ্রথা তখনো ধর্মের আচরণে এদেশীয় মনোবৃত্তিতে অব্যাহত থাকতে দেখা গেল। সম্রাট আকবরই সর্বপ্রথম চেষ্টা করলেন সহমরণপ্রথা রহিত ক'রে হিন্দুনারীর জীবন রক্ষা করতে। কিন্তু হিন্দুধর্মের ধ্বজাবাহীদের মনে এই নিয়ে পাছে আঘাত লাগে ভেবে তিনি এসম্পর্কে কঠোর হ'তে পারেন নি। এ'দেশে ইংরাজশাসন স্থাপিত হবার পর মিশনারি পাদ্রীরা এবং লর্ড ওয়েলেসলী এপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন, কিন্তু আকবরের ন্যায় তাঁরাও এসম্পর্কে কঠোরতার আশ্রয় নিতে সাহসী হননি। রামমোহন এলেন এপ্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিয়ে।

বাংলার রেনেসাঁ বলতে সার্বভৌম সংস্কারের যে পরিচয় আমরা পাই, তার গোড়াপত্তন রামমোহন থেকেই। জাতীয় নবযুগের প্রবর্তক তিনি। ধর্ম, সমাজসংস্কার, রাজনীতিক-সংস্কার, ইংরেজি শিক্ষার প্রচার, সতীদাহ নিবারণ, বহুবিবাহ প্রথার নিবারণ চেষ্টা—সবকিছুর মূলেই তিনি। আবহমানকাল ধ'রে যারা হিন্দুজাতির মনোরাজ্যে অবাধে রাজত্ব ক'রে

এসেছেন—শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়, মানবিক বুৎপত্তি ও চরিত্রের অনন্য মহনীয়তায় রামমোহন তাঁদের পরাজিত ক'রে নবীন ধর্মের জয়ধ্বজা ওড়ালেন। আধুনিক ভাবধারার তিনিই প্রযোজক। পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে ভারতীয় ভাবধারার সমন্বয়সাধনের পথ রচনা করলেন তিনি। চিন্তায় ও কর্মে সার্বভৌমিকতা—এ একমাত্র তাঁর মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি যদিও জাতীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন, তথাপি জাতীয় ধর্ম ও আচার-ব্যবহার বর্জনের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। এদেশে তখনো আন্তর্জাতিক রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়নি, আলোচনাও মুখর হয়ে ওঠেনি। এদিক থেকেও রামমোহনই পথপ্রদর্শক। ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার-সম্পর্কিত আইন পরিবর্তন, জুরী প্রথার প্রবর্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন শুরু করেন।

ভারতবর্ষীয় ধর্মের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়—প্রথম বেদের পূর্বভাগ—কর্মকাণ্ড, তারপর বেদান্ত ও পাতঞ্জল—জ্ঞান ও উপাসনাকাণ্ড, তারপর পুরাণ—অবতারবাদ ও ভক্তিকাণ্ড। তৎপর গীতা। এতে কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়। শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যে এই স্তরভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রেও একথার পরিচয় আছে। বৈষ্ণবদের মতে—কর্মের পর জ্ঞান, জ্ঞানের পর ভক্তি। এর মধ্যে বৌদ্ধধর্মও এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে। মুসলমান ও হিন্দুধর্মের সংঘর্ষণে ভারতবর্ষে অনেকগুলি উদারমতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে, যেমন—গুরু নানক ও কবীরের ধর্ম। এঁদের মধ্যে সার্বভৌম ধর্মের ভাব প্রকাশ পায়। রামমোহন বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান এবং মুসলিম শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন ক'রে শাস্ত্রগুলির পারস্পরিক তুলনা করলেন এবং এসম্পর্কে একটা সাধারণ মীমাংসায় উপনীত হলেন। সমস্ত ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ক'রে তিনি দেখলেন—মানবমনে একটি সাধারণ ধর্মভাব আছে। এজগতের আদি ও অন্ত কি এবং তা কি কি নিয়মে শাসিত হচ্ছে, এই গূঢ় রহস্যের উপর মানুষের ধর্মভাব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। পৃথিবী জুড়ে এক সার্বভৌম ধর্ম কাজ ক'রে চলেছে। রামমোহনের মতে—'ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বই প্রকৃত ধর্ম'। এই ধর্মের ভিত্তিতেই তিনি 'সার্বভৌমিক ধর্ম-সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি জাতীয়ভাবে ধর্মসংস্কারকার্য ক'রে গেছেন। বেদ, কোরাণ ও বাইবেলের ধর্মশাস্ত্রের মূলে আছে একেশ্বরবাদ। রামমোহন সেই একেশ্বরবাদকেই গ্রহণ করেন। বাংলায় নতুন ক'রে তিনি বেদান্তচর্চার সূত্রপাত ক'রে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সাংস্কৃতিক সভা স্থাপন করেন। শ্রীরামপুরে তখন পাদরী মার্শম্যান ও কেরী বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী। রামমোহন নিজের জীবনে এক স্বতন্ত্র ভাবধারার মানুষ হওয়ায় এবং ধর্মীয় শাস্ত্রের নানা নতুন ব্যাখ্যার সৃষ্টি করায় একদিকে তিনি যেমন হিন্দু পণ্ডিতদের বিরাগভাজন হলেন, অন্যদিকে তেম্‌নি বাইবেল সম্বন্ধে তাঁর বুদ্ধির ত্রুটী দর্শিয়ে মার্শম্যান ও কেরী তাঁদের 'ফ্রেণ্ড্‌ অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মন্তব্য করলেন। রামমোহন তার জবাব দিতে দেরী করেননি। এই বাদানুবাদের ফলে শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যার উপর তাঁর এক-একখানি গ্রন্থ তৈরী হ'য়ে গেল।

'আত্মীয় সভা'র পর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামমোহন একটি নতুন সভার প্রচলন করলেন, নাম 'ইউনিটারিয়ান কমিটি'। কিন্তু এ সভার কার্যকারিতাও খুব বেশীকাল স্থায়ী না হওয়ায় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কতিপয় বন্ধুর সহযোগিতায় তিনি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিপূর্বে ১৮২২ খৃষ্টাব্দে 'অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল' নামে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ও তিনি স্থাপন করেন। ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের বহুমুখী প্রতিভা নিয়েই তিনি জন্মেছিলেন, এবং সেই বহুমুখী প্রতিভা বাস্তবে রূপায়িত ক'রতে দেরী হলো না। ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা বাঙালীর মানসিক উৎকর্ষবিধানের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু একথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইংরেজ-শাসন ও ইংরেজি মনোভাবের প্রভাবে এদেশের লোক হয়তো ক্রমে খৃষ্টান হ'য়ে যাবে। দেশের চিত্তকে সেই মনোভাবের সম্ভাবনা থেকে মুক্ত করলো তাঁর প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম—যা হিন্দুধর্মেরই সারাংশ মাত্র। এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন: 'তখন অন্ধকারের কাল, বিপ্রহরা রজনীর কাল। বঙ্গভূমি নিবিড়ান্ধকারাবৃত অরণ্যাকীর্ণ ছিল; ভ্রষ্টাচারের পিশাচসকল তাহাতে রাজত্ব করিত। তিনি একা শতসহস্র শত্রু দ্বারা আবৃত হইয়া কুঠারহস্তে সেই ঘোর অবিদ্যারণ্য সমভূম করিয়া দেশোদ্ধারণে প্রবৃত্ত হইলেন,...যে সময়ে তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি ভিন্ন আর কেহই ব্রাহ্মধর্মকে এ সংসারে আনিতে পারিত না।' হিন্দুত্বের মহত্ত্বের দিক উল্লেখ করতে গিয়ে রামমোহন স্পষ্টই বলেছেন: 'It is well-known to the whole world that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and denomination'.

কিন্তু হিন্দুদের যেখানে ভ্রম, যেখানে তার ভ্রষ্টাচারের পৈশাচিকতা, সেখানে তিনি তাকে ক্ষমা করতে পারেননি। তিনি সমাজকে আঘাত করার পরিবর্তে বরং পরিশোধন করেছেন। তা সমাজমানসেরই পরিশোধন। সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজি ও বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা ক'রে তিনি দেশের সর্বত্র বিনামূল্যে বিতরণ করেন। নানাবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহকারে তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, সহমরণ অপেক্ষা ব্রহ্মচর্য শ্রেষ্ঠ। এই রচনাসমূহের দ্বারা সারা দেশের চিত্তে তিনি এমনভাবে নাড়া দেন যে, গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই পুস্তকগুলি সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে রামমোহনের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং তার ফলস্বরূপ ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইনবলে ভারতভূমি থেকে তিনি এই কুপ্রথা বিদূরিত ক'রে দেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেও রামমোহনের আন্দোলন কম কার্যকরী হয়নি। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং হিন্দুর বহুবিবাহ প্রথা ও পণপ্রথার বিরুদ্ধেও তিনি সক্রিয় আন্দোলন গ'ড়ে তুলে হিন্দুনারীর দায়াধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট কর্মসূচী নির্ধারিত করেন। বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ রামমোহন বেদশিক্ষার জন্য ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে একটি বেদ-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁর যত্ন যথেষ্ট ছিল। একাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন ডেভিড হেয়ার এবং স্যার এডোয়ার্ড

হাইড ইস্ট্। রামমোহন-রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়, যথা: তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদীন (ফারসী ও আরবী), বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, তলবকার উপনিষৎ, ঈশোপনিষৎ, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার, ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, কঠোপনিষৎ, মাণ্ডুক্যোপনিষৎ, গোস্বামীর সহিত বিচার, সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, কবিতাকারের সহিত বিচার, মৃত্যুঞ্জয় শাস্ত্রীর সহিত বিচার, ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিসনারী সম্বাদ, চারি-প্রশ্নের উত্তর, প্রার্থনাপত্র, পাদরী ও শিষ্য সংবাদ, গুরুপাদুকা, পথ্যপ্রদান, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ, কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার, বজ্রসূচী, গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং, ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মসঙ্গীত, অনুষ্ঠান, সহমরণ বিষয়, গৌড়ীয় ব্যাকরণ, ক্ষুদ্রপত্রী ও আত্মাত্মবিবেক। এতদ্ব্যতীত ইংরেজি গ্রন্থাদি। এছাড়া তিনি কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করেন, যথা: ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি, সম্বাদ কৌমুদী ও ফারসীভাষায় মীরাৎ-উল-আখ্বার। আরবী-ফারসী, সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি ভাষার এমন অপূর্ব বাগ্‌বৈদগ্ধ্যপূর্ণ প্রকাশ বাঙলার মাটিতে এক অভিনব ও অনুপম রূপ নিয়ে দেখা দিল। রামমোহনের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে 'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'-গ্রন্থে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন: 'রামমোহন রায় রচিত যে কয়েকখানি বাঙলা পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ ও পৌত্তলিক মতাবলম্বী প্রাচীন ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের সহিত বিচার। ঐসকল বিচারে তিনি নিজের নানা শাস্ত্রবিষয়ক প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য প্রভৃতি ভূরি ভূরি সদ্‌গুণের একশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। নিবিষ্টচিত্তে সেই সকল অধ্যয়ন করিলে চমৎকৃত ও তাঁহার প্রতি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে হয়।'

গদ্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেন। বলতে গেলে এসঙ্গীতের তিনিই প্রথম স্রষ্টা। বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপ যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে, রামমোহনের সঙ্গীতাবলী সেইভাবেই রচিত। ব্রহ্মের নিরাকারত্ব, নামরূপাতীত ও ত্রৈগুণ্যাতীত ভাব, সর্বব্যাপিত্ব, দ্বৈতভাববর্জন ও অদ্বৈতভাব দৃঢ়ীকরণ, সংসারের অনিত্যতা, শম, দম, তিতিক্ষা ও বৈরাগ্য-সাধন—এসবই এই সঙ্গীতের আধার। যেমন—

'মন যাঁরে নাহি পায়, নয়নে কেমনে পাবে ?
সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাহার বর্ণনে রয় শ্রুতি স্তব্ধভাবে।
ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য, এইমাত্র নিতান্ত জানিবে।'

আবার—

'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্তে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে শমন ভয়,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।'

এই দু'টি গানের পরিচয়ই এখানে যথেষ্ট।

অনেকে রামমোহনকে বাঙলা গদ্যের জনক ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে পর্তুগীজ রোমান-ক্যাথলিক যাজকসম্প্রদায় ও ইংরেজ প্রোটেস্টাণ্ট্ যাজক-সম্প্রদায় এদেশে নিজেদের কাজের প্রয়োজনের তাগিদে প্রথম বাংলা গদ্য রচনায় অগ্রসর হন। পর্তুগীজ মিশনারিদের 'ব্রাহ্মণ রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' এবং 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের একটি আঞ্চলিক গদ্যরীতির পরিচয় দেয় মাত্র। পরে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র ক'রে নতুন ক'রে বাংলা গদ্যের সৃষ্টি হয়। তার পুরোধা ছিলেন উইলিয়াম কেরী। এ সময়ে যাঁরা গদ্য রচনায় হাত দেন, তাঁদের মধ্যে উইলিয়াম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় ও হরপ্রসাদ রায় প্রধান। তাঁদের গদ্য ভাবপ্রকাশের একটা উপায় মাত্রই ছিল, সাহিত্যবাচ্য বা উচ্চশ্রেণীর শিল্পধর্মী ছিল না। রামমোহনের বিতর্কমূলক গদ্য রচনায় প্রথম সেই সাহিত্য ও শিল্পের স্পর্শ ঘটলো। তিনি তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত শব্দকে সহজ বাঙলায় প্রকাশ ক'রে জনসাধারণের সহজ পঠন-পাঠন অভ্যাসকে আরও দৃঢ় ও বিস্তৃত ক'রে তোলেন। অন্যদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনানুযায়ী বলা যায়: 'বাঙলা গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধ রচনার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাঙলা গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি একদিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেম্‌নি অন্যদিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষার প্রকাশভঙ্গীর দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মতো এবিষয়ে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন।'

রামমোহন আবির্ভূত হ'য়ে শুধু যে তাঁর নিজের কালের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সভ্যতাকেই কীর্তিগাথায় গেঁথে রেখে গেলেন, তা নয়, এ সম্পর্কে বাঙলায় তিনি উত্তরকালের পথ রচনা ক'রে গেলেন; বাঙলার রেনেসাঁ যুগের তিনি প্রবর্তক। তাঁর মধ্যে এদেশের মানুষ এমন এক মোহমুক্ত বুদ্ধির অবারিত আশ্রয় খুঁজে পেলো—যেখানে সকল ধর্মের সকল মানুষের মিলনতীর্থ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: 'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়, আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।'

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(ষোল)

সাহিত্যের সহিতত্ব বিচিত্রভাবে লীলায়িত বিভিন্ন ভাব ও উপাদানকে নিয়ে।[১] লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের (ইংরাজীসাহিত্য) অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় এবারকোম্বি (Prof. Lascelles Abercrombie, M.A., 1931) ইংরাজীসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি-সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গ্রন্থকার (সাহিত্যকার) ও পাঠকের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সহানুভূতি-সম্পর্কে বিশেষভাবে বলেছেন। তাঁর অভিমতে সাহিত্য কেবলই কোন বিষয়কে প্রকাশ করাতেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু প্রকাশিত বিষয়কে গ্রহণ করাতে ও বিতরণ করাতেও তার সীমা নির্ধারিত থাকলেও সাহিত্য গ্রন্থকার বা সাহিত্যকারের মনোভাবকে প্রকাশ করার জন্যই আগ্রহশীল এবং সাহিত্যকারের অন্তরে বাস্তব-অভিব্যক্তি প্রকাশের দায়িত্বই সাহিত্যে অধিক। অবশ্যই সাহিত্যকারের আন্তর-ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণ করে সাহিত্য। অধ্যাপক এবারকোম্বি বলেছেন: "Literature exists not only in expressing a thing, it equally exists in the receiving of the thing expressed....To regard literature as the expression of its author's mind (or mood or temperature) emphasizes the subjective element in it, and thus leads ultimately to romanticism, in which what the author felt, is the important thing".

তবে সাহিত্যে শিল্পসৃষ্টির পক্ষে যদিও শব্দ বা শব্দসম্ভারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তবুও ভাষাকেই ভাবের প্রধান বাহকরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দ ও শব্দচয়ন সাহিত্যের সহিতত্ব-সম্পদকে প্রাণবান করলেও শব্দসৃষ্ট ভাষাই প্রধানভাবে সাহিত্যকারের অন্তরের ভাবকে পাঠক-পাঠিকাদের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সেজন্য অধ্যাপক এবারকোম্বির বক্তব্য হ'ল: "We require a word that will include both these aspects or equal terms, and the simple word *communication* will give us exactly what we want. For, evidently, whatever else literature may be communication it must be; no communication, no literature... Though we are apt to speak as if the mere existence of a piece of language could constitute literary art, we must always remember the language is only the medium of the art. *The art consists in the*

১। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'-র (৮৯-তম বর্ষ, সংখ্যা ২য়-৩য়, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৯০) শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য-লিখিত 'বাংলা সাহিত্যতত্ত্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধে 'কবিমানস'-আলোচনায় (পৃ: ৩৪-) সাহিত্যের সহিতত্ব-সম্পর্কে যে মূল্যবান বক্তব্য করেছেন তা উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধেয় শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন: "সাহিত্যের ব্যুৎপত্তি সহিতত্ব থেকে। শব্দার্থের সহিতত্বই সাহিত্য। কিন্তু মানুষের শব্দ এবং অর্থ নিত্যসম্পৃক্ত। কাজেই শব্দার্থের সহিতত্বমাত্রই সাহিত্য নয়। এই সহিতত্ব যখন সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আনন্দনিষ্যন্দী হয় তখনই তা হয় সাহিত্য। শব্দার্থের সহিতত্বে যিনি সৌন্দর্য ও আনন্দের সৃষ্টি করেন, তিনিই সাহিত্যিক, তিনিই কবি। এই অর্থে রস-সাহিত্যের স্রষ্টামাত্রকেই সম্প্রসারিত অর্থে বলা যেতে পারে কবি"।

communication established between author and reader (or, of course, hearer). Clearly, then, what are meant by literature, will be given by the *kind* of communication which their arts sets up".

মোটকথা সাহিত্যের আসল সহিতত্ব সার্থক ও প্রাণবান হয় লেখক ও পাঠকের মধ্যে পারস্পারিক সহানুভূতির ভাব থেকে—যে সহানুভূতি লেখকের অন্তরের প্রসুপ্ত ভাব ও মৌন ভাষাকে বাস্তবের রূপায়িত ক'রে মুখর ও জীবন্ত করে পাঠক-পাঠিকার অন্তরে। তাহলেই কথা এই যে, লেখক ও পাঠক ভাবের বিস্তার ও গ্রহণক্ষেত্র দু'টি দিকের ও তাদের ব্যবধানের মধ্যে মিলন সাধন করে, আর তাদের মধ্যবর্তী (middle) বস্তু বা উপাদন হ'ল ভাষা। অধ্যাপক এবারকোম্বি সেই সম্পর্কে বলেছেন : "When we speak of the art of literature, then, we imply the existence of a series of *three terms* : the two extremes are author and reader, the middle term is language. That is what it means to say, literature is *communication*. But we need not banish the words *expression* and *representation* (or *limitation* which contains the same notation as the latter word)". পুনরায় অধ্যাপক বলেছেন লেখকের অন্তরে ভাব (mood or sentiment) যখনই সৃষ্টি হয় তখনই তার প্রচার বা সম্প্রসারণও সার্থক হয় পাঠক-পাঠিকার মধ্যে, নচেৎ সাহিত্যরূপ শিল্পসৃষ্টির সার্থকতা হয় বিফলতায় পর্যবসিত—"that expression has achieved a form *commercial* to another mind, and that representation has arrived by being *communicated* from another mind". সাহিত্য ও তার সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকৃতি বা স্বভাবই তাই।

পূর্বে সাহিত্যে ভাষার-সহযোগিতা ও সংস্পর্শ-সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ভাষা একটি প্রতীক (symbol) এবং তা ভাবেরই বাহক। সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে ভাবেরই স্রষ্টা—যদিও এই সৃষ্টিকর্ম ও সৃষ্টিসামর্থ্য ঠিক ভাষার মধ্যেই থাকে না। আসলে লেখকের অন্তরের ভাব ও ভাবের অভিব্যক্তি জাগ্রত ও মুখর হয় প্রতীকের আকারে ভাষার মধ্য দিয়ে এবং সেই প্রদীপ্ত ও প্রাণবান ভাষা পাঠক-পাঠিকার মধ্যে সৃষ্টি করে অনুরূপ ভাব ও ভাবের অভিব্যক্তি, আর তখনই উভয়ের ভাব ও ভাবের অভিব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি হয় সাহিত্যরূপ একটি মিলন পারস্পরিক-সহানুভূতি ও সমবেদনার আবেগ (inspiration) ও মনোবৃত্তিকে নিয়ে। অধ্যাপক এবারকোম্বি বলেছেন : "For language, in literature, must always be symbolic...The author's experience must be translated into such symbolic equivalence in language that the symbol may be translated back again by the reader into a similar experience : in both cases, the experience being imagined".

তবে মনে রাখতে হবে যে, সাহিত্যের এই ভাষারূপ মাধ্যম বা সহায়কও (medium) সীমিত, কেননা সাহিত্যের, বা সাহিত্যশিল্পের পরিধি সকল সীমাকে উত্তীর্ণ হয়ে অসীম ও অনন্ত সম্ভবনায় ও অনুভূতির এক মাধুর্য সৃষ্টি করে এবং সেই সম্ভবনা ও মাধুর্যকে কোন ভাষা দিয়ে সত্যই সীমাবদ্ধ করা যায় না। অনন্ত এর ভাবসম্পদ এবং অপার্থিব ঐ সম্পদের অনুভূতি।

তাই একদিক থেকে বলা যায় যে, সাহিত্য বহু অজানাকেই জানিয়ে দেয় সেই অবর্ণনীয় এক আনন্দানুভূতির স্পর্শ দিয়ে। কবিতাও তাই। কবিতাও কাব্যের সহযাত্রী হয়ে অতীত ও অনাগত অজানাকে করে আনন্দময় ও জ্ঞানের সীমাভুক্ত। কিন্তু এখানেও ঐ এককথা ও রহস্যময় তত্ত্ব যে, লেখক ও পাঠক-পাঠিকার মধ্যে এক ভাবের আদানপ্রদান ও সম্প্রসারণ সৃষ্টি হয় এবং সেই ভাবের আদানপ্রদান ও সাম্প্রসারণের ফলশ্রুতি হ'ল সাহিত্যের 'সহিতত্ব' পারস্পরিক অন্তরের আদানপ্রদান, সহানুভূতি বা সমবেদনা ও আনন্দসৃষ্টিকে নিয়ে। সেজন্য অধ্যাপক এবারকোম্বি স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন : "An author may be tempted *to invent* new syllables, which, to him, may exactly express his mind, but the *invention* will have nothing to do with the art of literature unless there liberties unmistakably *represent his mind to his readers*, which they are not very likely to do".

সুতরাং লেখক, সাহিত্যিকার, কাব্যরচয়িতা, নাট্যকার, সঙ্গীতরচয়িতা—এই সকলের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন ভাব ও রসানুভূতি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের মূর্ত-আবেগ ও চেতনাময়ী অভিব্যক্তি—যেগুলি পরিস্ফুটভাবে যদি পৌঁছে দিতে না পারে শ্রোতা ও দর্শকসাধারণের মধ্যে, তবে সৃষ্টিকৌশল ও সৃষ্টিকর্ম হয় অসার্থক। এজন্য সাহিত্য ও সাহিত্যসৃষ্টিসম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক এবারকোম্বি পুনরায় বলেছেন : "Literary art, therefore, will always be in some degree *suggestion*" বা প্রেরণা এবং সেই *suggestion* বা প্রেরণা "is to make the power of suggestion in language as commanding, as far-reaching, as vivid, as subtle, as possible". কাব্যে, কবিতায়, নাটকে ও সঙ্গীতে ও সঙ্গীতের রচনার ক্ষেত্রেও ঐ এককথা।

নাট্যশাস্ত্রে মুনি ভরত (৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—২০০ খ্রীষ্টাব্দ) অনুরূপ কথাই বলেছেন নাটক-অভিনয়ের ক্ষেত্রে অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের উদ্দেশ্যে (নাট্যশাস্ত্র, কাশী-সংস্করণ, একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা আচার্য ভরত অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের ভাষার উচ্চারণে এবং রস ও ভাব-সৃষ্টির দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখে অভিনয় করতে বলেছেন। তিনি বলেছেন এমনইভাবে কথার বা সংলাপের উচ্চারণ করা উচিত—যাতে ক'রে নাটকের প্রতিটি সংলাপ মঞ্চের সুদূর পর্যন্ত শ্রোতাদের কর্ণে পৌঁছে দিতে পারে। তাছাড়া নাটকের সকল সৃষ্টিই হয় সামগ্রিকতার (fullness and wholeness) ভাবে পূর্ণ। এজন্য ভাষা সাহিত্যাদি সকল শিল্পে স্থান অধিকার করে সত্য, কিন্তু ভাষা সৃষ্টি করে ভাবের ব্যঞ্জনা : "There is first *syllabic* sound—the quality of the vowels and consonants in distinct syllables, or in sequences of syllables, brought out by contrast or by repetition...Secondry, there is the *rhythm* of language, the *quality* of the sound of syllables, but the undulation of the *degree* of sounds in whole sentences...Rhythm is,- no doubt, the most valuable use in literary art of the sound of word, since for the most part it is rhythm which conveys the *emotional atmosphere*, without which experience could not live".

বিশেষ ক'রে সংস্কৃত সাহিত্যে, কাব্যে ও সঙ্গীতে শব্দের উচ্চারণে ও ভাষার প্রকাশভঙ্গীর বিশেষ উপযোগিতা দেখা যায়। স্বরবর্ণের ও ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ ও উচ্চারণভঙ্গীতে ভাষার সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং ঐ সৌন্দর্য প্রাণময় হয় রসের ও ভাবের বাহকরূপে। ভারতীয় শক্তিশাস্ত্র ও বিশেষভাবে তন্ত্রসাহিত্য স্বরবর্ণকে শক্তি ও ব্যঞ্জনবর্ণকে শিব-রূপে কল্পনা করে, কেননা স্বরবর্ণরূপ শক্তির লীলাচঞ্চল নৃত্যের সার্থক রূপায়ণ ছাড়া শবরূপ শিব ব্যঞ্জনবর্ণ ম্লান ও পঙ্গু হয় এবং সেজন্য সংস্কৃতভাষা অর্থপূর্ণ ও ভাবব্যঞ্জক হয় শক্তি ও শিবের—স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পারস্পরিক সার্থকমিলনে।

বাঙলা, ইংরাজী ও অপরাপর ভাষার সাহিত্যক্ষেত্রেও ঐ একথা। যাইহোক অধ্যাপক এবারকোম্বি পরিশেষে বলেছেন সাহিত্যের মতো সকল শিল্পের উদ্দেশ্য ও সার্থকতাই হবে সার্থকভাবে সৃষ্টি করা, প্রকাশ করা ও ভাবের সম্প্রসারণ করা, ভাবের ঐক্য বা মিলনসাধন করা এবং এই সকল কর্মই সাহিত্যে ও সকল শিল্পকর্মে যথার্থ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে এবং সুন্দরের উপাসনাকে লীলাচঞ্চল ও সার্থক করে। তাছাড়া সাহিত্যকর্মরূপে, অথবা সাহিত্যসৃষ্টির গোষ্ঠিভুক্ত কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সমালোচনা, রচনা এবং এই জাতীয় সকল সৃষ্টির সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা তখনই সম্পন্ন বা সার্থক হয় যখনই সেগুলি অখণ্ড ধারণার ও অনুভূতির সমষ্টিরূপ মানুষের চেতনায়, ধারণার ও সংবেদনের ভাণ্ডারে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়। অধ্যাপক এবারকোম্বি একথাই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: "In a work of literature—poem, novel, essay, or whatever it may be, so long as it truly is literature—nothing happens that does not somehow contribute to the form of the work as a whole, to the finally unified impression of all the sequence of impressions it has given us".

উইলিয়াম হেনরী হাডসনও তাঁর *An Introduction to the Study of Literature* (London, 1930)-গ্রন্থে ঐ একই কথা অন্যভাবে বলেছেন যে, ভাষার মাধ্যমে জীবনানুভূতির বিকাশকেই সাহিত্য বলে: "It is thus fundamentally an expression of life through the medium of language", সাহিত্য জীবনানুভূতির যথার্থ বিকাশ এজন্য যে, সাহিত্যের পিছনে যে পরমএষণা বা ইচ্ছা লুক্কায়িত থাকে, সেই এষণাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে:

(ক) আমাদের আত্মার অভিব্যক্তির ইচ্ছা;

(খ) মানুষের প্রতি মানুষের স্বার্থের ধারণা ও তাদের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ;

(গ) বাস্তব জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ও ধারণা, অর্থাৎ যে জগতের মধ্যে আমরা বাস করি সেই সম্বন্ধে এবং সঙ্গে সঙ্গে কল্পনাজগতের প্রতি আমাদের থাকার ও বাঁচার ধারণা; আর—

(ঘ) বাস্তব প্রকৃতি ও বিশ্বের প্রতি আমাদের অন্তরের আকর্ষণ, আকুতি ও ভালবাসা।

সমাজবাসী মানুষের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, সহানুভূতি ও ভালবাসা থাকে বলেই আমরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী, সুখ-দুঃখ, ঘাত-প্রতিঘাত, অশ্রু-আনন্দ সকল-

কিছুই লক্ষ্য করি এবং তাদের সকলকে নিয়েই রচনা করি আমাদের সাহিত্য, কাব্য, নাটক, চিন্তাকর্ষরূপে বিচিত্র সাহিত্যিক সম্ভারের রচনা—যেগুলির অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে মানুষেরই চিন্তার ও জীবনের ক্ষেত্রে এক জাগ্রত প্রেরণা। সেজন্যই সাহিত্যের বা সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে প্রধানত লক্ষ্য করি আমরা—

প্রথম—চিন্তা যা বৌদ্ধিক উপাদানরূপে পরিগণিত ;

দ্বিতীয়—ভাব, রস ও আবেগের উপাদান ও তাদের অনুভূতি—যেগুলি প্রেরণা জোগায় আমাদের রচনাসৃষ্টির পথে ;

তৃতীয়—কল্পনা—যা সাহায্য করে লেখকের বা রচয়িতার নবনবউন্মেষশালিনী প্রতিভার প্রকাশকে ;

চতুর্থ—সাহিত্য, কাব্য, নাটক, সঙ্গীত প্রভৃতি সার্থক হয় তাদের সৃষ্টির উপাদান ভাষা ও রচনাশৈলী আনন্দের প্রলেপকে নিয়ে।

সেজন্য লক্ষ্য করি যে, কোন জাতির সাহিত্যের ইতিবৃত্ত হ'ল তার বুদ্ধি ও প্রতিভার বিকাশের কাহিনী এবং তার মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের প্রতিফলন। অধ্যাপক হাডসন বলেছেন : "History deals mainly with the externals of a people's civilisation, portrays the outward manner of their existence, and tells us what they did or failed to do in the practical work of the world. But it is to their literature that we must turn if we would understand their mental and moral characteristics, realise what they sought and achieved in the world of inner activity, and follow through the stages of their changing fortunes the ebb and flow of the forces which fed their emotional energies and shaped their intellectual and spiritual life". মোটকথা সাহিত্যের সম্পদের যেচাকেনা মানুষের সমাজ, মানুষের হৃদয় ও মানুষের চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকলেও বিশ্বের বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সমন্বয়সাধন করা ও অধ্যাত্মজীবনের অনুভূতির ও আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করাই তার প্রধান কর্ম ও উদ্দেশ্য। বিশ্বের বহির্লোক ও অন্তর্লোকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা ও পাঠক-পাঠিকাকে তার শাশ্বত আনন্দরসের সাগরে অবগাহন করানোই হ'ল সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি বিশ্বের প্রধান লক্ষ্য।

আমরা বিশেষভাবে প্রথমে ইংরাজী সাহিত্যের চিন্তাশীল মনীষীদের অভিমতের কথাই কিছুটা আলোচনা করলাম এখানে এবং পরে ভারতীয় সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে বিদগ্ধ সাহিত্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাজশেখর-প্রণীত 'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে আলোচিত সাহিত্যতত্ত্বের উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ববিদ্দের মধ্যে পণ্ডিত আই.এ. রিচার্ডসের অভিমত এ'প্রসঙ্গে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাছাড়া গ্রন্থের রিচার্ডস-লিখিত *Principles of Literary Criticism, Meaning of Meaning* প্রভৃতি গ্রন্থ ইংরাজী সাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্রে যেমন উল্লেখযোগ্য, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে পণ্ডিত রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' অতুলনীয়।

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

একই ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে কি-রকম বিপরীত ভাবদর্শের পরিচয় দেয় সে-সম্বন্ধে স্বামীজী সুন্দর একটি তুলনামূলক চিত্র উপহার দিয়েছেন। "বহুকাল পরে (তুরস্ক জাতির) অধিকাংশই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং বৌদ্ধধর্মের মধ্য-এশিয়াস্থ গান্ধার, কাবুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান কেন্দ্রসকল একেবারে উৎসন্ন করে দেয়। মুসলমান হওয়ার পূর্বে এরা যখন যে দেশ জয় করত, সে দেশের সভ্যতা বিদ্যা গ্রহণ করত; এবং অন্যান্য দেশের বিদ্যাবুদ্ধি আকর্ষণ করে সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করত। কিন্তু মুসলমান হয়ে পর্যন্ত এদের যুদ্ধপ্রিয়তাটুকুই কেবল বর্তমান; বিদ্যা ও সভ্যতার নামগন্ধ নাই, বরং যে দেশ জয় করে, সে দেশের সভ্যতা ক্রমে ক্রমে নিভে যায়। বর্তমান আফগান, গান্ধার প্রভৃতি দেশের স্থানে স্থানে তাদের বৌদ্ধ পূর্বপুরুষদের নির্মিত অপূর্ব স্তূপ, মঠ, মন্দির, বিরাট মূর্তিসকল বিদ্যমান। তুর্কী-মিশ্রণ ও মুসলমান হবার ফলে সে সকল মন্দিরাদি প্রায় ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আধুনিক আফগান প্রভৃতি এমন অসভ্য বুর্গ হয়ে গেছে যে, সে সকল প্রাচীন স্থাপত্য নকল করা দূরে থাকুক, জিন প্রভৃতি অপদেবতাদের নির্মিত বলে বিশ্বাস করে এবং মানুষের যে অতবড় কারখানা করা সাধ্য নয়, তা স্থির ধারণা করেছে।...কেবল ভারতবর্ষের মোগল বাদশারা এ নিয়মের বহির্ভূত ছিল;—সেটা বোধ হয় হিন্দু ভাব ও রক্ত-সংমিশ্রণের ফল।"[৩৮] "এদিকে মুর নামক মুসলমান জাতি স্পেন (Spain) দেশে অতি সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে, নানাবিদ্যার চর্চা করলে, ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হল; ইতালি, ফ্রান্স, সুদূর ইংলণ্ড হতে বিদ্যার্থী বিদ্যা শিখতে এল; রাজা-রাজড়ার ছেলেরা যুদ্ধবিদ্যা আচার কায়দা সভ্যতা শিখতে এল। বাড়ী ঘর দোর মন্দির সব নূতন ঢঙে বনতে লাগলো।"[৩৯]

স্বামীজীর এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, একই ধর্ম বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিপরীত চরিত্রের সৃষ্টি করতে পারে—তাতার-মুসলমানেরা যেখানে বিদ্যা-বুদ্ধি-সভ্যতার বিশেষ উৎসাহী ছিলনা সেখানে মুর-মুসলমানেরা এই সবেতেই উন্নত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। আবার খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত হয়েও ফরাসী ও ইংরেজদের চারিত্রিক ভিন্নতা লক্ষণীয়। স্বামীজীর ভাষায়—"রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড।...ফরাসীরে পিষে দাও, কথা নেই; দেশশুদ্ধকে টেনে নিয়ে জোর করে সেপাই কর, আপত্তি নেই; কিন্তু যেই সে স্বাধীনতার উপর হাত কেউ দিয়েছে, অমনি সমস্ত জাতি উন্মাদবৎ প্রতিঘাত করবে।...

৩৮। ঐ ৬ : ১৭৯-৭।

৩৯। ঐ ৬ : ২৩৮।

ইংরেজ-চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি, আদান-প্রদান প্রধান; যথাভাগ ন্যায়বিভাগ—ইংরেজের আসল কথা। রাজা, কুলীনজাতি-অধিকার, ইংরেজ ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করে; কেবল যদি গাঁট থেকে পয়সাটি বার করতে হয় তো তার হিসেব চাইবে।···রাজা (প্রথম চার্লস) জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে (১৬৪২ খৃষ্টাব্দে) মহাবিপ্লব উপস্থিত করালেন; (প্রজারা ১৬৪৯ সালে) রাজাকে মেরে ফেললে।"[৪০] "এই (১৯০০ সালে) সুয়েজ খাল ফরাসীদের হাতে। যদিও খাল-কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার এখন ইংরেজদের, তথাপি সমস্ত কার্য ফরাসীরা করে—এটি রাজনৈতিক মীমাংসা।"[৪১]

জাতিভেদে ধর্মীয় স্বভাবের বৈচিত্র্য দেখা যায়, ধর্মের প্রভাব যে সমাজে নেই তা নয়। এ-কথা আমরা আগে আলোচনা করেছি। তাছাড়া, ভারতীয় ও ইহুদী জাতির ইতিহাসে দেখা যায় বিদেশীদের শত অত্যাচার সত্ত্বেও এই দু'টি জাতি যে টিঁকে আছে তার কারণ তাদের ধর্মবোধ। ১৫-১-১৮৯৭ তারিখে কলম্বো শহরে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন[৪২] তাতে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে প্রাচীন আসিরিয়, ব্যাবিলোনীয়, গ্রীক ও রোমান সভ্যতা মহাকালের বুকে হারিয়ে গেলেও ভারতীয় সভ্যতা আজ বেঁচে রয়েছে তার প্রাণদায়ী ধারা নিয়ে। এবং এই দীর্ঘস্থায়ী অস্তিত্বের কারণ ভারতীয়দের উদার ও গতিশীল হিন্দুধর্ম।[৪৩]

গ্রীক ও রোমান সাম্রাজ্যের প্রসঙ্গে স্বামীজী লিখেছেন, "আসিরা মাইনর হতে একদল অসভ্য মানুষ সন্নিকট দ্বীপপুঞ্জে উদয় হল, ইউরোপের সন্নিকট-স্থান অধিকার করলে, নিজেদের বুদ্ধি আর প্রাচীন মিসরের সাহায্যে এক অপূর্ব সভ্যতা সৃষ্টি করলে; তাদের আমরা বলি যবন, ইউরোপীরা বলে গ্রীক। পরে ইতালিতে রোমক (Romans) নামক অন্য এক বর্বর জাতি ইট্রস্কান্ (Etruscans) নামক এক সভ্য জাতিকে পরাভূত করে, তাদের বুদ্ধিবিদ্যা সংগ্রহ করে নিজেরা সভ্য হল। ক্রমে রোমকেরা চারিদিক অধিকার করলে;·· কালবশে রোম ঐশ্বর্যবিলাসপরতায় দুর্বল হতে লাগল; সেই সময় আবার জম্বুদ্বীপ অসুরবাহিনী ইউরোপের উপর নিক্ষেপ করলে। অসুর-তাড়নায় উত্তর-ইউরোপী বর্বর (জাতিগুলি) রোমসাম্রাজ্যের উপর পড়ল। রোম উৎসন্ন হয়ে গেল। জম্বুদ্বীপের তাড়ায় ইউরোপের বর্বর আর ইউরোপের ধ্বংসাবশিষ্ট রোমক-গ্রীক মিলে এক অভিনব জাতির সৃষ্টি হল।"[৪৪]

●

৪০। ঐ ৬: ১৭৯।

৪১। ঐ ৬: ১০৭।

৪২। বাণী ও রচনা ৪-র খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

৪৩। এই প্রসঙ্গে 'বিশ্ববাণী'র আষাঢ় ১৩৯১ সংখ্যায় প্রকাশিত মৎপ্রণীত "বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনার ভূমিকা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৪৪। বাণী ও রচনা ৬: ২০৫।

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(চার)

ধর্মছাড়া তো মানুষ বাঁচতেই পারে না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা যেতে পারে: "প্রাচ্য সভ্যতার কলেবর ধর্ম।" ধর্ম বলিতে রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র; তাহার মধ্যে যথাযোগ্যভাবে রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। তাহাকে আঘাত করিলে সমস্ত দেশ ব্যথিত হইয়া উঠে; কারণ সমাজেই তাহার মর্মস্থান, তাহার জীবনীশক্তির অন্য কোনো আশ্রয় নাই।" এই জীবন ও মহাজীবন-পরিব্যাপ্ত ধর্ম সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, "হাতের জীবন, পায়ের জীবন, মাথার জীবন, উদরের জীবন যেমন আলাদা নয়,—বিশ্বাসের ধর্ম, আচরণের ধর্ম, রবিবারের ধর্ম, অপর ছয়দিনের ধর্ম, গির্জার ধর্ম এবং গৃহের ধর্মে ভারতবর্ষ ভেদ ঘটাইয়া দেয় নাই। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তাহার মূল মাটির ভিতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে;...ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।" এই ধর্মের ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের ভূতভবিষ্যৎ বর্তমান বিধৃত। এই ধর্মই ভারতবর্ষের এবং সমগ্র ভারতবাসীর ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করছে। ধর্মই ভারতের মেরুদণ্ড। অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ আবার লিখেছেন, "পলিটিক্স এবং নেশন কথাটা যেমন ইউরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। ... তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ য়ুরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এজন্য ধর্মকে ইংরাজি রিলিজনরূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময় ভুল করিয়া বসি।" এবং মজার কথা এই ভুল করাটাই বর্তমানে স্বধর্মভ্রষ্ট জাতির একটা নির্বোধ অন্ধ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ এবং স্বামীজীর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা থেকে আমরা অনায়াসেই বলতে পারি—মানুষের মনুষ্যধর্মের ঘটনা ও নিদিধ্যাসনার নামই ধর্ম। বহুজনসুখায় জগদ্ধিতায় জীবনরচনা ও প্রসারণার প্রয়াস ও তপস্যার নামই ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে একালের ভাষায় বলেছেন, "বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যবিধান"। এই বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য বিধানের নামই ধর্ম। দেহে-মনে-আত্মায় মানুষের হয়ে ওঠার (life becoming) সাধনাই ধর্ম। কিন্তু এই ধর্ম বা ঠাকুর-স্বামীজীর প্রবর্তিত জীবসেবার যে ধর্ম ও সাধনা—তার সঙ্গে কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনের হিউম্যানিজম্ বা খ্রীষ্টানদের দয়াধর্মের ও হিদেন-উদ্ধারের কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সামান্যতম যোগসূত্রও নেই। ইউরোপের প্রত্যবাদ (positivism) বা উপযোগবাদে (utilitarianism) মানবকল্যাণের কথা স্বীকৃত বটে, কিন্তু সে-কল্যাণ কিন্তু কেবল খেয়ে পরে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার কল্যাণ। এবং এ কল্যাণবাদ আবার কোনো স্থির প্রত্যয়ী দার্শনিকচিন্তা বা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। মানুষের কল্যাণ করব—কিন্তু কেন করব সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশ নেই ইউরোপীয় হিউম্যানিজম্ তত্ত্বের পশ্চাতে।

একজন সমালোচক এ' প্রসঙ্গে তাই যথার্থই বলেছেন, "সেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র বা সমাজশক্তি হস্তগত করে বহুজনের কল্যাণ সাধনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে কল্যাণ-সাধনার মূল কারণটি কিছু অস্পষ্ট। নরকে নরোত্তমে পরিণত করা ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু নরোত্তম নারায়ণে উন্নীত না হলে মানবজীবনের মৌলিক তাৎপর্য বোঝা যাবে না। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতচেতনাকে এই দৃষ্টি দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। এইজন্য কোঁত, মিল, জেরেমি-টেলর প্রভৃতির তুলনায় স্বামীজীর সাধনরীতি ও ক্রিয়া-পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। মানুষকে অর্থ-নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রশাসনগত অধিকার দিলেই তার একান্ত কল্যাণ করা যায় না, তার অন্নবস্ত্রের সুব্যবস্থা করলেই সব সমস্যার সমাধান হয় না। তার মধ্যে অন্তর্লীন বৃহৎ সত্তার উদ্বোধন, ক্ষুদ্রতম অণুকে বৃহত্তমের সমপর্যায়ে উপলব্ধি, কারণ প্রকৃতির দিক থেকে দুইই এক। ভারতবর্ষের এই অদ্বৈতবাদ স্বামীজী নতুনভাবে জাগিয়ে তোলেন। মুমূর্ষু ভারতের বাঁচবার একমাত্র পথ এই অদ্বয়বাদ—বা অদ্বয়বোধ, যা মানব-কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বামীজী বর্তমান ভারতের কানে সেই মহামন্ত্র জপ করেছিলেন।"

এই পর্যন্ত পড়ে কেউ যেন মনে না করেন যে স্বামীজীর ধর্মে ইহ-জীবনের কোনো মূল্য স্বীকৃত নেই। কিংবা যে ভারতচেতনার তিনি পরম প্রবক্তা সেখানে এই দৃশ্যমান জগৎ-জীবনকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। মোটেই তা নয়। বরং ঠিক তার উল্টো। স্বামীজী তো স্পষ্টই বললেন, "যে ধর্মে মানুষকে সুখী করে না তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে Dyspepsia-প্রসূত রোগ বলিয়া জানিবে।" বললেন, "So long a single dog in my country is without food my whole religion is to feed it" যে ধর্ম বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, আর্তের মুখে হাসি ফোটাতে পারে না—তেমন ধর্ম স্বামীজী কোনোদিনই আকাঙ্খা করেন নি। বরং তাঁর ধর্ম সেই দরিদ্র, দুঃখী-নির্যাতিত-নিরন্ন দুঃস্থ ক্ষুধার্ত মানুষের সেবার ধর্ম। এ'প্রসঙ্গে তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব অসাধারণ আর্ষোক্তিটি মনে পড়ে। "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" আরো গুছিয়ে সূত্রাকারে এই কথাই তিনি অন্য ভাষায় প্রকাশ করলেন, "বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বোঝায়, তখন বীচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বীচি, খোলা সব নিতে হবে। যারই শাঁস, তারই বীচি, তারই খোলা। যারই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ সংসার উড়িয়ে দেই না। তাহলে যে ওজনে কম পড়বে।" রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত এই নববেদান্তই ভারত-সাধনার একালের রূপান্তর এবং সর্বজনগ্রাহ্য জীবনভাষ্য। এই পরিপূর্ণ জীবনবোধ—এই সমগ্রের সাধনাই একালের একক অভিষ্ট বলে বিঘোষিত এবং স্বীকৃত সহজতম পন্থা। উপনিষদ বললেন, "এই বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত সর্বত্রই তিনি—এই এক পরমের অপূর্ব অধিবাসনায় বিশ্বসংসার অবিরাম হয়ে উঠছে।" সকলকে নিয়েই যে সর্বেশ্বর। অতএব "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা—যা গৃধঃ

কৃত্ত সিন্ধনম্।" ত্যাগের দ্বারা ভোগকে পরিশুদ্ধ করে নাও। অপরের ধনে হাত দিও না। সমন্বয়ের সন্ধানী, পূর্বের পূজারী ভারতবর্ষ চিরকালই একথা বলে গেছে—"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে, সম্ভূতিমুপাসতে। ততো ভূয় ইবতে তমো য উ সম্ভূত্যাংরতা।" অদৃশ্য অবাক-মানসকে অস্বীকার করে যাঁরা শুধুমাত্র প্রকৃতি ভজনা করেন, তাঁরা অন্ধকারে প্রবিষ্ট হন আর যাঁরা 'ইহ'-কে অস্বীকার করে কেবলমাত্র 'পর'কে নিয়েই থাকেন তাঁরা অধিকতর অন্ধকারের অতলে নিক্ষিপ্ত হন। অর্থাৎ "যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, তাই আমি নিত্য লীলা সবই লই।"—এই হল নতুন যুগের ঘোষণা। এই ব্যক্ত তো সেই অব্যক্তেরই অন্য রূপ, রূপান্তর। অতএব ব্যক্তকে অস্বীকার করব কেমন করে? এই বিশ্বাসে অন্তর থেকেই তো নির্বিকল্প সমাধিতে লীন হতে ইচ্ছুক পরম যোগী-শিষ্যকে ভর্ৎসনা করে গুরু বলেন, "এই বুঝি তোমার পৌরুষ, এই বুঝি তোমার আত্মগৌরব, এই বুঝি বীরত্ব। তুমি জগতের আর সকলকে দেখিয়া নিজের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়াছ।" বলেন, "তোর মন এত ছোট যে, তুই জগতের ভাবনা না ভাবিয়া নিজের মুক্তির জন্যই এমন অস্থির।" এই আশ্চর্য গুরু আশ্চর্য শিষ্যই স্বামী বিবেকানন্দ। ইহ-পর, লৌকিক-আধ্যাত্মিক—এই দুই নিয়েই সমগ্র জীবন। এবং এই সমগ্র জীবনের পূর্ণাহুতির নবজীবনবাদই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-আন্দোলনের এবং শাশ্বত ভারতেরও মহান ছন্দবিজয়ী মঙ্গল-সুসমাচার। "আধুনিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ভাষায় যে তত্ত্বটিকে গতিতত্ত্ব ও স্থিতিতত্ত্বের সমন্বয় বলা যাইতে পারে—তাহাই ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ভাষায় ব্রহ্ম ও জগৎ—শিব ও শক্তির অদ্বৈততত্ত্ব।" এই গতি ও স্থিতিকে, ব্রহ্ম ও জগৎকে একই দেশে ও কালে অভেদরূপে দেখাই ভারতের সাধনা ও বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে ভারতবর্ষের মৌল অবদান। Centripetal ও Centrifugal force এর কেন্দ্রাতিগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির সমন্বয়ে ও ভারসাম্যেই যে কোন বস্তুর অস্তিত্ব বা স্থিতি সম্ভব হয়। ব্যক্তি ও সমষ্টি-জীবনের স্থিতি-পরিপুষ্টিও ব্রহ্ম ও জগতের এই বিপরীত ও সমন্বিত বোধের উপরই প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাই আমাদের এই ভূখণ্ডে জীবন ও জীবনাতীতের সাধনা একই সঙ্গে চলে। এর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কোনো বিরোধ নেই। অদ্বৈতবোধির সাধনায় পরম সিদ্ধি লাভ করেও তাই স্বামীজী বলতে পারেন, "May I be born again and again and suffer thousands of miseries so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all souls and above all, my God the wicked, my God the miserable, my God the poor of all races, of all species, is the special object of my worship." "নিখিল আত্মার সমষ্টিরূপে যে ভগবান বিদ্যমান এবং একমাত্র যে ভগবানে আমি বিশ্বাসী, সেই ভগবানের পূজার জন্য যেন আমি বার বার জন্মগ্রহণ করি এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করি।" ভারতাত্মার এই মহত্তম বোধে প্রতিষ্ঠ হয়েই স্বদেশ ও স্বজাতির দিকে তাকিয়ে এমন বেদনার্ত -কণ্ঠে বলতে পারলেন "যে ধর্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন করিতে পারে না অথবা অনাথ শিশুর মুখে একমুঠো খাবার দিতে পারে না

আমি সে ধর্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না।" বললেন, "আমি সমগ্র ভারতবর্ষ ঘুরিয়াছি.. ...সর্বত্রই আমি জনসাধারণের ভয়াবহ দুঃখ-দারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিয়া আকুল হইয়াছি, চোখের জল বাধা মানে নাই। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, প্রথমে ইহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর না করিয়া ইহাদিগকে ধর্মের কথা শোনাইয়া কোনো লাভ নাই।" "তুমি যদি নিজের মুক্তি খোঁজ, তবে তুমি নরকে যাইবে। তোমাকে খুঁজিতে হইবে অপরের মুক্তি।···যদি অপরের জন্য কাজ করিয়া তোমাকে নরকে যাইতে হয়, তবে নিজের মুক্তি খুঁজিয়া স্বর্গে যাইবার অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী।" বললেন, "ঈশ্বরলাভের জন্য তুমি কোথায় যাইবে : এই দীন, দরিদ্র ও দুর্বল ইহারা সকলেই কি ঈশ্বর নহে ? প্রথমে তাহাদেরই পূজা কর না কেন ? গঙ্গাতীরে কূপ খননের কি প্রয়োজন ?" "একমাত্র জাগ্রত দেবতা হইলেন আমার জাতি ; সর্বত্রই তাঁহার হস্ত, তাঁহার পদ, তাঁহার কর্ণ প্রসারিত রহিয়াছে ; তিনি সকল কিছুকেই আচ্ছন্ন করিয়া আছেন। অন্যান্য সকল দেবতারা ঘুমাইতেছেন। যে বিরাট ভগবান আমাদের চতুর্দিকে রহিয়াছেন, তাঁহার পূজা না করিয়া আমরা কি অর্থহীন দেবতার পিছনে ছুটিব ?···আমাদের চতুর্দিকে যাঁহারা আছেন—সেই বিরাটের পূজাই আমাদের প্রথম পূজা হইবে।" যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মবিদের কাছে এই জগৎ-জীবনও পরম সত্যরূপেই প্রতিভাত। বাস্তব-জীবনের এই দৃশ্যমান জগতের—দুঃখ-ব্যথা-দারিদ্র্য-যন্ত্রণা-মায়ামাত্র নয়। পরন্তু সমস্ত মানুষ, সমস্ত প্রাণ সেই বিশ্বপ্রাণেরই রূপ। সেরূপেই তাঁকে সেবা করা। পূজা করা এ যুগের যুগধর্ম। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন, মানবাত্মার সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই শেষতম কৃত্য হলেও সবার আগে মানুষকে মানুষের মত খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে এই মর্ত্যের মাটিতে পা রেখে দাঁড়াতে হবে। স্বাধিকারে ও স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। নর-কে আগে নরোত্তম হতে হবে—তারপর নারায়ণ হবার সাধনা। সে তো শেষ কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিতে, 'অদ্বৈতভাব শেষ কথারে, শেষ কথা, ঈশ্বরপ্রেমের চরম পরিণতিতে ; সর্বশেষে উহা সাধন-জীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—জানিবি সকল মতেরই ইহা শেষ কথা এবং যত মত তত পথ।"

ছবির উপমা দিলে ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হবে। প্রত্যেক ছবিরই একটা অংশে থাকে অঙ্কিত বিষয়বস্তু (Contents), বাকীটা relief বা অবকাশ। এই অবকাশ-অংশে কোনো কিছু আঁকা থাকে না। হাল্কা নীল, কিংবা ধূসর বা আবছা কোনো রঙ লাগানো খানিকটা অংশ ফাঁকা থেকে যায় সব ছবিতেই। এই অবকাশ বা আকাশ নিয়েই ছবির সমগ্রতা বা পূর্ণতা। ঠিক তেমনি আমাদের জীবনেরও একটা অংশ থাকে প্রত্যহের বাস্তব-জীবনের সঙ্গে যুক্ত ও সম্পৃক্ত পাড়ার সহজ বাসিন্দা পরিচিত মানুষ। ঘৃত-লবণ-তৈল-তণ্ডুলের লেন-দেন ও সমস্যা নিয়ে সে ব্যস্ত। কিন্তু তাতে জীবন পূর্ণতার ঐক্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে না—, জীবন সন্ধান পায় না পরমা শান্তির। আর একটা মন সমস্ত বস্তু-বৈভব সঞ্চয়ের পরও—প্রাচুর্যের মাঝখানে থেকেও হাহাকার করে ওঠে !

'আমার কিসের ব্যথা যদি জানতেম' বলে গান গেয়ে ওঠে। মানুষের কাছে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখই কেবলমাত্র সত্য নয়, আধ্যাত্মিক দুঃখের উপশমের জন্যও তার ভাবনার অন্ত নেই—প্রয়াসের শেষ নেই। "লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া রাখনু, তবু হিয়া জুড়োনো না গেল"। "অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময়—আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে"। খ্যাতি-চিত্ত ঐশ্বর্য-সুখের মাঝখানে থেকেও কেন একালের বিশ্ববিশ্রুত অভিনেত্রী ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন - কে বলবে! কেন আজন্ম বিলাস-ব্যসনে লালিত পালিত হয়েও, অগাধ ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েও সমস্ত বিলাস ব্যসন, বস্তুসম্ভার পরিত্যাগ করে, সমাজ, সংসার, আত্মীয়-পরিজন, স্বজন-বন্ধু সব ছেড়ে নগ্ন পায়ে নগ্ন গাত্রে হিপি হয়ে দেশে দেশে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায় সমকালের ইয়াংকি যুবকেরা? নিশ্চয়ই কোথাও একটা অভাববোধ রয়ে গেছে—অপ্রাপ্তির অব্যক্ত কোনো পুঞ্জীভূত দুঃখ-বেদনা। কিছু একটা সে খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু পায় না। এই না-পাওয়ার কান্না জমাট বেঁধে থেকে যায় মানুষের মনে মনে। হৃদয়ের অন্তরালে। ভারতদর্শনের প্রবক্তারা মানব-জীবনের এই চিরন্তন নিষ্ঠুর সত্যটাকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং পেরেছিলেন বলেই ইহ ও পরকে, জীবন ও জীবনাতীতকে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন প্রত্যহের এই বরবোধিমূলে। অতৃপ্ত মানুষকে এমন একটা কিছু সঞ্জীবনীর সন্ধান দিতে পেরেছিলেন তাঁরা যেখানে আমাদের সমস্ত চাওয়া-পাওয়া মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এমন একটি "সবপেয়েছির" দেশের সন্ধান দিতে পেরেছিলেন যেখানে মানুষের সমগ্র দেহ-মন পরা-প্রাপ্তির উজ্জ্বল অঙ্গীকারে, পূর্ণতার পরিপ্লাবী হয়ে উঠতে পেরেছিল। সেই এক-এর অভিমুখে অভিযাত্রা সার্থক হয়েছিল বলেই এমন দিব্যকণ্ঠে তাঁরা বলতে পেরেছিলেন, "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥"—যে আলোর অধিকার অর্জন করে সমস্ত বিশ্বপৃথিবী আলোকিত সমস্বরে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে সেই আলোর মহিমা ঘোষণা করে তাঁরা বললেন "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং / নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেবভান্তমনুভবতি সর্বং / তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥"—সমস্ত আঁধারের পরপারে আদিত্যবর্ণ সেই মহান পুরুষকে হৃদয়ে উপলব্ধি করার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তখন জাগতিক কোনো অতৃপ্তিই তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। তখন তিনি মৃত্যুঞ্জয়। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ / আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। / তমেব বিদিত্বাঽতি মৃত্যুমেতি / নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়॥" ভারতাত্মার এই মহত্তম বিঘোষণা চিরকালের অতৃপ্ত মানুষের জন্য। ক্ষুদ্র অহম্-বোধের গণ্ডী থেকে—বিশ্বচৈতন্যবোধে, সর্বাত্মি তত্ত্বের উদ্ধারনে উত্তরণই জীবনের শেষ কথা।

●

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাস কি 'তন্ত্রমূলক' ।।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(ছয়)

আগেই বলিয়াছি, ভারতীয় হিন্দু নারীর প্রণয়-জীবন একান্তভাবে দাম্পত্যপ্রেম-কেন্দ্রিক। বঙ্কিমচন্দ্র যে-সমাজের কথা লিখিয়াছেন, সেই সমাজে নারী জীবনের ইহাই একমাত্র আদর্শ ছিল। সুতরাং শ্রীর চরিত্রও সেই দৃষ্টিকোণ হইতেই বিচার করিতে হইবে। পাশ্চাত্ত্য সমাজ-জীবনের নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিচার করিতে গেলেই এখানে শ্রীর চরিত্রকে অবাস্তব বলিয়া মনে হইবে।

সীতারামকে দীর্ঘদিন চোখে না দেখিয়াও কিংবা তাহার সঙ্গে দীর্ঘকাল কোনও সহবাস না করিয়াও শ্রীর প্রেম সীতারামের প্রতি অম্লান ছিল। ভারতীয় সনাতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ সমাজ-জীবনে তাহার কোনও ব্যতিক্রম হইবার উপায় ছিল না। সেইজন্য এই সমাজে নারীর প্রণয়-স্বপ্ন, তাহা ব্যর্থই হউক কিংবা সার্থকই হউক, তাহাকে বাদ দিয়া কিছুতেই অন্যকে আশ্রয় করিতে পারিত না।

কোষ্ঠীর ফলাফলের প্রতি বিশ্বাসও এই জাতির জন্মগত সংস্কার, সেখানে অবিশ্বাস করিবারও কিছু ছিল না। বিশেষতঃ যেখানে শ্রীর সীতারামের প্রতি প্রেম সত্য, সেখানে তাহাকে কোনওরূপ সম্ভাব্য বিপদ হইতে মুক্ত রাখাই তাহার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। কোষ্ঠীর ফলাফল মিথ্যাই হউক, কিংবা সত্যই হউক নিজের স্বার্থে এই বিষয়ে কোনও ঝুঁকি লইবার দায়িত্ব শ্রীর মত চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করিতে পারিল না। এখানে ভাগ্যের মধ্য দিয়াই শ্রীর স্বামীপ্রেম শতগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রী সন্ন্যাসী-রূপিণী জয়ন্তীর সঙ্গিনী হইয়া তীর্থের পথে যাত্রা করিলেও সে কদাচ সন্ন্যাসিনী নহে। যে সম্যক্‌রূপে ভগবানে ন্যস্ত, সেই সন্ন্যাসী, কিন্তু শ্রী কদাচ তাহা নহে। জয়ন্তী যখন শ্রীকে স্বামী ছাড়া অন্য কিছুতে মন দিয়া জীবন কাটাইতে বলিল, তখন শ্রী তাহার উত্তরে বলিল,

শ্রী। কিসে মন দিব ?

জয়ন্তী। এত বড় জগৎ কিছুই কি মন দিবার নাই ?

শ্রী। পাপে ?

জয়ন্তী। না পুণ্যে।

শ্রী। স্ত্রীলোকের একমাত্র পুণ্য স্বামীসেবা। যখন তাই ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছি—তখন আমার আবার পুণ্য কি আছে ?

জয়ন্তী। স্বামীর একজন স্বামী আছেন।

শ্রী। তিনি স্বামীর স্বামী—আমার নন। আমার স্বামীই আমার স্বামী—আর কেহ নহে।

জয়ন্তী। যিনি তোমার স্বামীর স্বামী, তিনি তোমারও স্বামী, কেননা, তিনি সকলের স্বামী।

শ্রী। আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।

জয়ন্তী। জানিবে? জানিলে এত দুঃখ থাকিবে না।

শ্রী। না, স্বামী ছাড়িয়া আমি ঈশ্বরও চাহিনা। আমার স্বামীকে আমি ত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমার যে দুঃখ, আর ঈশ্বর পাইলে আমার যে সুখ, ইহার মধ্যে স্বামীবিরহ দুঃখই আমি ভালবাসি।

যে ঈশ্বর জানে না, জানিতে চাহে না, পার্থিব সম্পর্কিত স্বামীকেই মাত্র জানে, মিলনে হোক, বিচ্ছেদে হোক, যে তাহারই ধ্যানজ্ঞানে জীবন-যাপন করিয়া জীবনের চরম সার্থকতার সন্ধান করিতে চাহে, সে আর যাহাই হোক না কেন, সন্ন্যাসীনী নহে। শ্রীও সন্ন্যাসিনী নহে, সন্ন্যাসিনীর চরিত্রই বাস্তব জীবনের স্পর্শমুক্ত চরিত্র, শ্রীর চরিত্র অবাস্তব চরিত্র নহে। তাহার সঙ্গে স্বামীর সাহচর্য নাই, তথাপি স্বামীর একটি ভাবমূর্তি তাহার অন্তরের সিংহাসন অধিকার করিয়া আছে, তাহা লইয়াই তাহার সুখ-দুঃখের জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর লাভ করিলে তাহার যে সুখ তাহা অপেক্ষা তাহার স্বামীবিরহ দুঃখে বেশী সুখ। শ্রী স্বামীবিরহ দুঃখই ভালবাসে। এই ভালবাসার উপাদানেই ভারতীয় নারী চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। নতুবা সহস্র সহস্র বাল্য-বিধবা সমাজে জীবন-ধারণ করিবার শক্তি পাইত না।

শ্রীর সংস্পর্শে আসিয়া জয়ন্তীর সন্ন্যাসিনীর বেশও ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িতে লাগিল। জয়ন্তী যদি মনে করিয়া থাকে যে সে ঈশ্বরে সমর্পিত-প্রাণা হইয়া সকল সংস্কার হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে, তবে তাহা যে কত ভুল তাহা শ্রীর সাহচর্যে তাহার মধ্যে প্রকাশ পাইল। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসেও প্রফুল্লর সাহচর্যে যেমন নিশির সন্ন্যাসিনীর সকল আবরণ খসিয়া পড়িয়াছিল, এখানেও শ্রীর সাহচর্যে জয়ন্তীর তাহাই হইল, সন্ন্যাসিনীর আবরণ ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতেও বাস্তব নারীরূপ ফুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

শ্রীর মুখ হইতে তাহার পূর্ব জীবন-বৃত্তান্ত শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু ছলছল করিল। তাহার সন্ন্যাসিনীর আচরণকে ব্যর্থ করিয়া তাহার মধ্যে নারীসত্তা আত্মপ্রকাশ করিল। তথাপি সে শ্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সঙ্গে তাঁর ত দেখা সাক্ষাৎ নাই বলিলেও হয়, এত ভালবাসিলে কিসে?' অর্থাৎ জয়ন্তীর বিশ্বাস কেবলমাত্র দেখা-সাক্ষাৎ ব্যতীত ভালবাসা জন্মিতে পারে না। শ্রী তাহার উত্তরে বলিল, 'তুমি ঈশ্বর ভালবাস—কদিন ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে?' তাহার উত্তরে জয়ন্তী যখন বলিল, 'আমি ঈশ্বরকে রাত্রিদিন মনে মনে ভাবি', শ্রী তাহার উত্তরে বলিল, 'যে দিন বালিকা বয়সে তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছিলেন সে-দিন হইতে আমিও তাঁহাকে রাত্রিদিন ভাবিয়াছিলাম।'

জয়ন্তীর পূর্বজীবন-বৃত্তান্ত উপন্যাসের মধ্যে নাই, কিন্তু তাহাও যে একটা কিছু শ্রীর মতই ছিল এবং সে-সংস্কার এখনও যে তাহার মনের মধ্যে কাঁটার মত বিঁধিত, জয়ন্তীর আচরণ হইতে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'শ্রী তাহার স্বামী-কর্তৃক বালো পরিত্যক্তা হইয়া তাহার কথা যে রাত্রিদিন ভাবিত, ইহা শুনিয়া জয়ন্তী 'রোমাঞ্চ কলেবর হইয়া উঠিল।' এখানে জয়ন্তীর সন্ন্যাসিনীর আবরণ খসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহা সে শ্রীকে বুঝিতে দিল না। শ্রী যেমন তাহার জীবনের সকল কথাই জয়ন্তীকে খুলিয়া বলিয়াছে, জয়ন্তী নিজের কথা কখনও শ্রীর নিকট বলিতে যায় নাই। সেইজন্য আপাতদৃষ্টিতে তাহার সন্ন্যাসিনীর রূপ শ্রী অপেক্ষা কঠিনতর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যাইবে, উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে কোনও পার্থক্য নাই। ইহারা কেহই নিজেদের নিকে জয় করিতে পারে নাই।

স্বামী সঙ্গে একত্র ঘর-সংসার করা এবং না করা শ্রীর পক্ষে দুই-ই সমান। এমন কি, করিবার মধ্যে স্বামীভক্তি যতখানি রক্ষা পাইতে পারে, না করিবার মধ্যে তাহা অপেক্ষা আরও বেশি রক্ষা পায়। শ্রী বলিল, 'যদি একত্র ঘর-সংসার করিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমনটা ঘটিত না। মানুষ মাত্রেরই দোষগুণ আছে। তাঁরও দোষগুণ থাকিতে পারে। না থাকিলেও আমার দোষে আমি তাঁর দোষ দেখিতাম। কখন না কখন কথান্তর, মন ভার, অকৌশল ঘটিত। তা হইলে এ আগুন এত জ্বলিত না, কেবল মনে মনে দেবতা গড়িয়া তাঁকে আমি এত বৎসর পূজা করিয়াছি।'

বহু বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটির ভিতর দিয়া এই কথাটিই আধুনিক ভঙ্গিতে দুই আধুনিক চরিত্রের সম্পর্কে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে অবাস্তবতা বলিতে কিছু নাই। ঠাকুর দেবতা ভগবান সম্পর্কে শ্রীর বিশ্বাস তাঁহার এই উক্তিতে আরও স্পষ্ট হইয়াছে, সে জয়ন্তীকে বলিতেছে, 'ঠাকুর প্রণাম করিতে গিয়া কখনও মনে হয় নাই যে, ঠাকুর প্রণাম করিতেছি, মাথার কাছে তাঁরই পাদপদ্ম দেখিয়াছি। তারপর, জয়ন্তী, তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ডাকিলেন, তবু ছাড়িয়া আসিয়াছি। শ্রী আর কথা কহিতে পারিল না। মুখে অঞ্চল চাপিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিল।'

'জয়ন্তীরও চক্ষু ছলছল করিল।' বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন, 'এমন সন্ন্যাসিনী কি সন্ন্যাসিনী ?' শ্রী কিংবা জয়ন্তী কেহই সন্ন্যাসিনী নহে। সুতরাং ইহাদিগকে অবাস্তব চরিত্র বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই। সে-কথা কাহিনীর শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্র আরও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

●

।। পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা ।।

শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

(তিন)

টোডা-গ্রামের দুধ রাখার ঘর অর্থাৎ টেরিয়ি অতি পবিত্র ঘর এবং ঐ ঘরটি টোডাদের মন্দির। কোন দেবদেবীর মূর্তি ঐ ঘরে থাকে না। মন্দিরের একজন পোল্‌অল্‌ অর্থাৎ পুরোহিত থাকে। পুরোহিত কঠোর সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে। কোন নারীর সঙ্গে কথা বলাও তার কাছে নিষিদ্ধ। দুধ রাখার ঘর এবং পুরোহিত সম্বন্ধে টোডারা কোন প্রকার অতীত দিনের ইতিহাস জানে না। তারা জানতেও উৎসুক নয়। তারা এইটুকু জানে যে প্রথম সৃষ্ট হয় তাদের দেশ। তারপর মহিষ, তারপর টোডারা এবং যেদিন থেকে টোডা জাতির উৎপত্তি তখন থেকেই টেরিয়ির প্রবর্তন ও পোল্‌অলের আগমন। পোল্‌অল্‌ প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় গ্রামবাসী ও মন্দিরের আর্থিক উন্নতির জন্য মন্দিরের মধ্যে প্রদীপ জেলে প্রার্থনা জানায়। তার নিজের বেশ কিছু সংখ্যক দুগ্ধবতী মহিষ থাকে। সেই মহিষগুলির দুধ থেকে যথেষ্ট অর্থ রোজগার হয়। সমস্ত অর্থ মন্দিরের উন্নতির জন্য এবং আরও মহিষ কেনার জন্য সে ব্যয় করে। মহিষগুলির মধ্যে কয়েকটি পবিত্র-মহিষ হিসাবে চিহ্নিত করা থাকে পারলৌকিক কাজের জন্য। এই মন্দিরে কোন টোডা নারীর প্রবেশাধিকার নেই। এমন কি, ঐ ঘরের কাছেও যাওয়া নিষিদ্ধ। যে মহিষগুলি পবিত্র মহিষ হিসাবে চিহ্নিত থাকে, তাদের দুধ, মাখন ও ঘি কোন টোডা-নারী স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। গ্রামের কোন মানুষ পবিত্র-মহিষের দুধ দোহন করে না। কেবলমাত্র পুরোহিতই প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ মহিষদের দুধ দোহন করে, সেই দুধ থেকে ঘি তৈরি করে মন্দিরের প্রদীপ জ্বালানো হয়ে থাকে। পুরোহিত মন্দিরেই থাকে। বহুজনের মধ্যে তাকে সহজেই চেনা যায় তার কালো চাদর দেখে। একমাত্র কালো চাদর সে সবসময়ে গায়ে জড়িয়ে থাকে। টোডারা দুধ দোহন করে সূর্যোদয়ের আগে ও সূর্যাস্তের পরে। মাখন তোলা হয় কেবলমাত্র সূর্যাস্তের পর। এইরূপ সময়-নিরূপণের কারণ সম্বন্ধে গোভাবী সুস্পষ্টরূপে কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

সমগ্র টোডা জাতি দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত। একটি তার্দহার্স ও অপরটি তেইভিল্‌থ্‌। তার্দহার্স গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা তেইভিল্‌থ্‌ গোষ্ঠীর চেয়ে উচ্চে। এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে কখনও বিবাহ হয় না। তার্দহার্স ও তেইভিল্‌থ্‌ গোষ্ঠী দুইটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে। একটি গোষ্ঠীর অন্তরগত ভিন্ন-গোত্রের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ হয়ে থাকে। তার্দহার্সের এগারটি গোত্র ও তেইভিল্‌থ্‌-এর পাঁচটি গোত্র। শিশু-বিবাহ টোডা-সমাজে আজও প্রচলিত আছে। তিন বছর বয়সের আগে মামার কিম্বা পিসির ছেলের সঙ্গে অথবা মামার সঙ্গে টোডা মেয়ের বিবাহ হয়ে থাকে। টোডা-সমাজে শিশুবিবাহ ধর্মের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক আছে। ওদের বিশ্বাস নারী ও পুরুষ যদি বিবাহিত না হয় তবে দেবতার কোন কাজই তার পক্ষে করা সম্ভব নয়। অবিবাহিত কারুর মৃত্যু হলে, ওদের ধারণা, তার আত্মা

কখনো নিষ্কৃতি পায় না। তাকে নীলগিরি অঞ্চলে চিরকাল ঘুরে বেড়াতে হয়। সেইজন্য কোন টোডা-শিশু যখন মারা যায়, এমন কি কয়েকদিন বা কয়েকমাস বয়সে, মৃত অবস্থায় তার বিবাহ দিয়ে দেওয়া হয় অন্তরবর্তী গোষ্ঠীর কোন ছেলের বা মেয়ের সঙ্গে। তিন বছর বয়সের আগে মেয়ের বিবাহ হবার পর যৌবনাবস্থা পর্যন্ত পিতামাতার সঙ্গেই বসবাস করে। বয়ঃসন্ধির পর সে যায় স্বামীর ঘরে এবং স্বামী ও তার ভাইদের সঙ্গে সহবাস করে। প্রথম যখন মেয়েটি গর্ভবতী হয় তখন তার সাত মাস অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গর্ভস্থিত শিশুর পিতৃপরিচয় সমাধান করা হয়। অনুষ্ঠানটির নাম 'পুরথুটপিমি' অর্থাৎ তীর ও ধনুক। দুইদিন ধরে চলে এই তীর ও ধনুক অনুষ্ঠান। টোডা সমাজে এই তীর ও ধনুক অনুষ্ঠান বিলুপ্তির প্রায় শেষ ধাপে এসে পৌঁছেছে, আপন আত্মীয়স্বজন, বাডাগা, কোটা এবং উটি শহরের বিভিন্ন মহাজনদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো তৎসহ নানান্ ব্যয়-বাহুল্যের জন্য এই অনুষ্ঠান আজকাল কদাচিৎ অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী দেবীকা শিলজেন নামে এক টোডা মহিলা, যাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় ছিল, উটি থেকে আমাকে টেলিগ্রাম করে এক আসন্ন তীর ও ধনুক অনুষ্ঠানের খবর দেন এবং ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানান। সঙ্গে সঙ্গে উটি চলে যাই এবং তীর ও ধনুক অনুষ্ঠানটি দেখার পূর্ণ সুযোগ পাই। শ্রীমতী দেবীকা শিলজেনের পরিচয় এখানে দেওয়া প্রয়োজন। তিনি উচ্চশিক্ষিতা এবং বহুদিন ইংলণ্ডে ছিলেন। সেখানে তিনি ধাত্রীবিদ্যা শেখেন এবং উটিতে ফিরে সমগ্র টোডা জাতিকে সেবা করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকারের অধীনে একজন ডাক্তার, একটি মেডিক্যাল ভ্যান, নানান ওষুধপত্র নিয়ে নীলগিরির সর্বত্র টোডাদের চিকিৎসা করে থাকেন। যদিও তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন তবুও তাঁর প্রতি টোডাদের অসীম শ্রদ্ধা। টোডাদের প্রায় সব অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকেন, টোডা মেয়েদের মত চুলের বিন্যাস ও পোষাক পরেন।

উটি থেকে প্রায় কুড়ি কিঃ মিঃ দূরে এক গ্রামে শ্রীমতী দেবীকার সঙ্গে তাঁর মেডিক্যাল ভ্যানে চলে যাই তীর ও ধনুক অনুষ্ঠানের চিত্রগ্রহণ করতে। গ্রামে পৌঁছে দেখি প্রায় দুশো টোডা নারী ও পুরুষের বৃহৎ সমাবেশ। সবারই দেহে একটি করে পুতকুশী অর্থাৎ রঙীন সুতায় এমব্রয়ডারী করা সাদা চাদর। মেয়েদের গলায় হাতে নানান অলঙ্কার। টোডা পুরুষেরা সারিবদ্ধ হয়ে মাটিতে বসে আছে এবং কিছু দূরে টোডা মেয়েরাও পাশাপাশি বসে। যে ছেলেটি যে মেয়ের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ছোট তীর ও ধনুক দেবে, তারা দুজনে জ্যেষ্ঠদের প্রণাম করছে। প্রণাম করার পদ্ধতি বড় বিচিত্র। যে প্রণাম করে সে প্রণম্যর সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়ায় এবং জ্যেষ্ঠ ধীরে ধীরে প্রথমে ডান পা পরে বাঁ পা তুলে তার মাথায় ঠেকায়। পুরুষেরা জীবনে মাত্র এই একবারই জ্যেষ্ঠর কাছে মাথা নীচু করে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ভিন্ন নিয়ম। বিভিন্ন সমাবেশে বয়োঃজ্যেষ্ঠদের সঙ্গে দেখা হলে মেয়েরা তাদের প্রণাম করবে। নানান ছোট-খাট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথম দিনটি চলে যায়। দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ছেলের পক্ষের কয়েকজন পুরুষ একটি গাছের তলার দিকে প্রায় চার ইঞ্চি সমবাহুর তিন কোণা একটি গর্ত তৈরি করে। মস্ত গাছটি। টোডা ভাষায় গাছটির নাম

কিরাজ। নানান অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় দিনের শেষে মেয়েটি ঐ গাছের তলায় এসে গর্তের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে। দূরের জঙ্গলে ছেলেটি গাছের সরু ডাল দিয়ে তৈরি একটি প্রতীক তীর ও ধনুক নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে যতক্ষণ না প্রদীপটিকে জ্বালানো হচ্ছে। বৃষ্টির জন্য প্রদীপ জ্বালাতে যথেষ্ট দেরী হয়। প্রদীপটি মেয়েকেই জ্বালাতে হয়। কেউ তাকে সাহায্য করতে পারবে না, প্রদীপটি জ্বালানোর পরই ছেলেকে জানানো হয় তীর ও ধনুক নিয়ে চলে আসতে। সে এসে তার গোত্রের নাম তিনবার উচ্চারণ করে মেয়ের হাতে তীর ও ধনুকটি দেয়। মেয়েটি ঐ তীর ও ধনুক নিয়ে পূর্বোক্ত কিরাজ গাছের তলায় রেখে দেয়। এইখানেই তীর ও ধনুক অনুষ্ঠানের শেষ হয়। তারপর উপস্থিত সমস্ত নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো হয়। টোডারা নিরামিষাশী। নিরামিষ আহারই সবাইকে পরিবেশন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মূল বক্তব্য হল মেয়েটি তার শিশুকালের বিবাহিত স্বামী ও তার অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে সহবাস করে আসছিল। কার দ্বারা সে গর্ভবতী হয়েছে, তা তার জানা নেই। গর্ভবতী হবার পর সাত মাস অন্তঃসত্ত্বার সময় শুক্লপক্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে সে ঐ প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে তার গর্ভস্থিত সন্তানের আইনসঙ্গত পিতৃত্বের অধিকার চায়। গর্ভস্থিত ঐ শিশুর সঙ্গে ছেলেটির জৈব সম্পর্ক হয়তো নেই, কিন্তু তীর ও ধনুক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পিতৃত্বের দায়িত্ব সে গ্রহণ করে।

টোডা জীবনচিত্রের এই অংশটি মূল ছবির পাঁচ বছর পরে তোলা। অবশ্য শ্রীমতী দেবীকার কাছে খবর পাই যে গত পাঁচ বছরে সমগ্র টোডা সমাজে কোথাও পুরুটপিথি অনুষ্ঠান হয়নি ব্যয়-বাহুল্যের জন্য, যদিও বেশ কয়েক ঘরে প্রথম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে।

বিবাহ বিচ্ছেদ টোডা সমাজে আছে। প্রকাশ্য সভায় বিবাহ বিচ্ছেদের মীমাংসা করা হয়। স্বামী ও তার ভাইদের সঙ্গে যে রমণী এতদিন ঘর করে এলো, সেই রমণী যখন বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য আবেদন জানায়, তখন স্বামী ক্ষতিপূরণ দাবী করে। ঐ রমণীকে যে বা যারা বিবাহ করে সে বা তারা ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুইটি অথবা তিনটি মহিষও চাওয়া হয়। রমণীর বয়স্ক সন্তানাদি থাকলে তাদের রেখে আসে এবং কোলের শিশু থাকলে সঙ্গে নিয়ে যায়। ঐ শিশু যখন বড় হয়, তখন সে তার জন্মদাতা পিতার বাড়িতে চলে যায় যেহেতু তার জন্মদাতা ভিন্ন গোত্রভুক্ত।

টোডাদের মধ্যে আছে সর্বপ্রধান টোডা কাউন্সিল্ বা নোইম। নোইমের আদেশ কোন টোডা অমান্য করে না। প্রত্যেক গোত্রের মধ্যে ছোট ছোট কাউন্সিল আছে। ছোট কাউন্সিল ভিন্ন-গোত্রের মধ্যের ঝগড়া-বিবাদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ইত্যাদির বিচার নিষ্পত্তি করে থাকে, যদি কোন পক্ষ মনে করে ছোট কাউন্সিলে তার সুবিচার হয়নি, তবে সে নোইমের কাছে পেশ করে তার আবেদন। নোইম সমগ্র টোডা অধিবাসীর বিচার সভা। এর সভ্য বিভিন্ন গোত্র থেকে মনোনীত হয়। তার্দহার্স গোষ্ঠীর বিভিন্ন গোত্র থেকে চারজন সভ্য নির্বাচিত হয়। তেইভিল্‌থ্ গোষ্ঠীর থাকে দুইটি আসন। সাধারণতঃ বয়োজ্যেষ্ঠরা নোইমের সভ্য মনোনীত হয়।

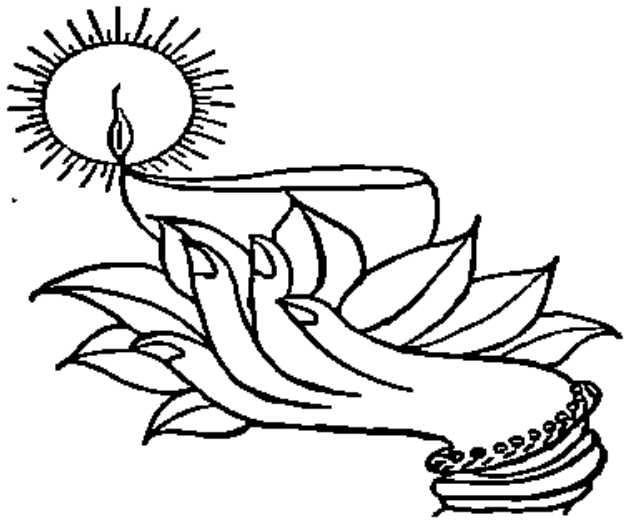

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(নয়)

শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যমরূপে সিরামিক্‌স্‌এর প্রাচীনত্ব সুবিদিত। ইতিপূর্বে 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশিত ধারাবাহিক রচনা 'শিল্পিত সিরামিক্‌স্' এবং অন্যান্য কয়েকটি নিবন্ধে সিরামিক্‌স্‌এর ইতিহাস, নন্দনতত্ত্ব ও প্রযুক্তি বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে।

শিল্পকলার মাধ্যমরূপে সিরামিক্‌স্‌এর প্রসঙ্গ আলোচনায় যে-দিকটি আপাততঃ প্রাথমিক-ভাবে বিবেচিত হচ্ছে, তা হলো সিরামিক্‌স্‌এর প্রাযুক্তিক দিক্—অর্থাৎ, উপকরণ, যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণপদ্ধতি। সিরামিক্‌স্‌এর উপকরণ বিভিন্ন ধরনের মাটি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা প্রাগুক্ত শিল্পিত সিরামিক্‌স্'এ করা হয়েছে। আলোচ্য বিষয়ের প্রস্তাবনার সংক্ষেপে পূর্বপ্রসঙ্গের কিছু পুনরুল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাযুক্তিক শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী প্রধানতঃ যে-দুই শ্রেণীর মাটিতে সিরামিকপাত্র, টালি, ভাস্কর্য, পুতুল ইত্যাদি সুপ্রাচীনকাল থেকে এযাবৎ তৈরী হয়ে আসছে—তার একটি হলো সাধারণ মাটি (common clay)—পোড়াবার পর যা লাল রঙ ধারণ করে (red burning clay); এবং অপরটি হলো কোয়ার্টজ, ফেল্‌স্‌পার জাতীয় প্রস্তরচূর্ণ ও খনিজ মাটি কেওলিন অথবা কাচার ক্লে-র মিশ্রণে তৈরী মাটির মণ্ড—যা পোড়াবার পর ধারণ করে সাদা রঙ (white burning clay)। কেওলিনএর খনি চীনদেশে সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় এবং ওই দেশের সিরামিকশিল্পীরা নাকি দু'শো খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও আগে ফেল্‌স্‌পারজাতীয় প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে কেওলিনএর মিশ্রণে সাদা রঙএর সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে সক্ষম হন। এ-ধরনের সিরামিক্‌স্‌ই সম্ভবতঃ পোর্সিলেনএর আদিরূপ।

কেওলিন আবিষ্কৃত হবার আগে লাল পোড়ামাটির সিরামিক্‌স্ নির্মাণের সূচনাকাল—অর্থাৎ প্রায় দশ বারো হাজার বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিরামিক্‌স্ নির্মিত হয়েছে

নদী, পুকুর, জলা জমি ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত সাধারণ মাটিতে। সাধারণ মাটিতে সিরামিক-নির্মাণের এই আদিম ধারাটি এখনও বিভিন্ন দেশের গ্রামীন কুম্ভকারদের নির্মিত মৃৎপাত্রের মধ্যে প্রবাহিত রয়েছে। প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে আনুমানিক তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে মৃৎশিল্পীরা সর্বপ্রথম কুম্ভকারের চাক্ (potters' wheel)-এর ব্যবহার সুরু করে। চাক্‌এর আবিষ্কার যে মৃৎপাত্রের দ্রুত উৎপাদনে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলো—তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে চাক্ আবিষ্কারের প্রায় আট দশ হাজার বছর আগে—অর্থাৎ, নব্যপ্রস্তর যুগের সুরুতে মানুষ যখন চাষ আবাদ করে শস্য উৎপাদন করতে শিখলো, তখন থেকেই নাকি মৃৎশিল্পের সূচনা হয়েছিলো। সম্ভবতঃ খাদ্যশস্য, পানীয় ইত্যাদি সংরক্ষণের তাগিদেই সে-যুগের মানুষ মৃৎপাত্র তৈরী করতে সুরু করে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠির লৌকিক উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মৃৎপাত্র, পুতুল ইত্যাদি তৈরী করা সুরু হলো। নৃতাত্ত্বিকদের মতে আদিম যুগে মেয়েরা—অর্থাৎ কৃষকদের পত্নী এবং কন্যারাই নাকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব মৃৎপাত্র ও পুতুল তৈরী করতো। এখনও আদিম মানবগোষ্ঠির মেয়েরাই প্রধানতঃ মৃৎশিল্পের মুখ্য কারিগর।

বিজ্ঞানী বোউরি (Bourry) সিরামিক্‌স্‌কে দুটো মুখ্য শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। একটি শ্রেণী হলো Permeable—যা আগুনে পোড়াবার পর সরন্ধ্র ও জলশোষক থেকে যায়; অপর শ্রেণীটি হলো Impermeable—যা আগুনে পোড়াবার পর হয়ে ওঠে রন্ধ্রহীন ও অশোষক। সরন্ধ্র শ্রেণীর সিরামিক্‌স্‌এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সাধারণ মাটিতে তৈরী ইট, হাড়ি, কলসী, ঘরের আচ্ছাদনে ব্যবহৃত টালি ইত্যাদি—এগুলোতে কাঁচীয় আবরণ অর্থাৎ গ্লেজ (glaze) লাগানো হয় না। এই শ্রেণীর সিরামিক্‌স্ 'টেরাকোটা' (terracotta) নামেও পরিচিত। রন্ধ্রহীন সিরামিক্‌স্‌এর মধ্যে রয়েছে আর্দেনঅয়্যার, ষ্টোন্‌অয়্যার, পোর্সিলেন এবং রিফ্র্যাক্টোরিজ্। এর মধ্যে আর্দেনঅয়্যার এবং রিফ্র্যাক্টোরিজ্ সিরামিক্‌স্ প্রস্তরচূর্ণের গুণ এবং মিশ্রণের অনুপাত অনুযায়ী আগুনে পোড়াবার পর লাল এবং সাদা দুই রকম রঙই ধারণ করে। ষ্টোন্‌অয়্যার আগুনে পোড়াবার পর সাধারণতঃ হালকা বাদামি এবং পোর্সিলেন আগুনে পোড়াবার পর সাদা রঙের হয়ে থাকে। প্রস্তরচূর্ণ এবং খনিজ মাটিতে লৌহকণার মিশ্রণ কমবেশি পরিমাণে থাকার জন্যেই ওই প্রস্তরচূর্ণ এবং খনিজ মাটির মিশ্রণে তৈরী মাটির মত আগুনে পোড়াবার পর লাল, বাদামি কিংবা সাদা হয়ে ওঠে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কোয়ার্টজ, ফেল্‌স্‌পার এবং কেওলিন-এ লৌহকণার অস্তিত্ব প্রায় থাকে না বললেই চলে।

সাধারণ মাটিতে লৌহকণার পরিমাণ বেশিমাত্রায় থাকে বলেই ওই মাটি পোড়াবার পর লাল রঙ ধারণ করে। নদী এবং পুকুরের ধার থেকে সংগৃহীত মাটি বড়ো আকারের সিমেন্টনির্মিত চৌবাচ্চায় অথবা জমিতে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে ভেজা অবস্থায় কমপক্ষে অন্ততঃ তিন থেকে চার মাস রেখে দিতে হয়। সূর্যের আলো কিংবা তাপে ওই ভেজা মাটি যাতে শুকিয়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মাটির নমনীয়তা (plasticity) বাড়িয়ে তোলবার জন্যে এটি করতে হয়। এই প্রক্রিয়াটির নাম 'এজিং' (ageing)। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে জানা গেছে, মাটিতে সাধারণ অবস্থায় যেসব বীজাণু থাকে—এজিংএর ফলে

সেই বীজাণুর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় এবং মাটিতে বীজাণুর সংখ্যাবৃদ্ধিই নাকি মাটির নমনীয়তা-বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

এজিংএর পর ওই মাটি জমির ওপর রেখে পায়ের সাহায্যে মাখা ও ঠাসা (Kneading) হয়। মাটির পরিমাণ অল্প হলে দু'হাতের সাহায্যে এই কাজটি করা যায়। বড়ো বড়ো সিরামিক-উৎপাদনকেন্দ্রে মাটির এই মাখা ও ঠেসে নেওয়ার কাজ 'পাগ্ মিল্' (pug mill) নামে পরিচিত একটি যন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। পাগ্ মিল্ যন্ত্রটি দেখতে বড়ো আকারের নলের মতো ; কয়েকটি ভাগে একসঙ্গে জোড়া থাকে। প্রয়োজনমতো জোড়া খুলে পাগ্ মিলের ভেতরটা পরিষ্কার করা যায়। যন্ত্রটির একটি মুখে গর্ত করা থাকে—সেই গর্তে মাটি পুরে দেওয়া হয়। যন্ত্রের অপর মুখটি থাকে ছুঁচালো ; মাটি ঠাসা এবং মাখা হয়ে যাবার পর ছুঁচালো মুখটি দিয়ে মাটি বেরিয়ে আসে। ভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবে বসানো পাগ্ মিলের ভেতরে একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটি লোহার রড্এ কয়েকটি ব্লেড্ লাগানো থাকে। এই ব্লেড্গুলো এমন একটি কোণ করে বসানো থাকে যাতে ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে রড্টি ঘোরালে পাগ্ মিলের ভেতরে পুরে দেওয়া মাটি ব্লেড্গুলোর ঘূর্ণনে ছোটো ছোটো টুকরোয় কাটা হয়ে যায়। ব্লেড্গুলোর ঘূর্ণনে পাগ্ মিলের ভেতরে যে-বায়ুচাপের সৃষ্টি হয়—তাতে মাটির টুকরোগুলো ছুঁচালো মুখের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। ছুঁচালো মুখটির ভেতর দিকে একটি খোপের মধ্যে মাটির টুকরোগুলো এসে জমা হয় এবং খোপের ভেতর একটি যন্ত্রের সাহায্যে মাটির টুকরোগুলোর পেষণ এবং মিশ্রণ হতে থাকে। খোপটির সঙ্গে যুক্ত একটি বায়ুশোষক পাম্প (vacum pump) পেষাই করা মিশ্রিত মাটি থেকে বায়ুবুদ্বুদ (air bubble) শোষণ করে নেয়। মাটির পেষণ এবং মিশ্রণের মতো মাটিকে বায়ুবুদ্বুদশূন্য (de-airing) করাও একান্ত প্রয়োজন। কারণ বায়ুবুদ্বুদমুক্ত না-করা মাটিতে তৈরী সিরামিক্স্ আগুনে পোড়ালে মাটির ওই বুদ্বুদ উত্তাপে ফেটে গিয়ে সিরামিক্স্এর গায়ে ছোটো গর্ত অথবা চিড়এর সৃষ্টি করতে পারে। পাগ্ মিলের ভেতরে পেষণ, মিশ্রণ এবং বায়ুবুদ্বুদমুক্ত হবার পর নমনীয় মাটি ছুঁচালো মুখটি দিয়ে গোল স্তম্ভের আকারে বেড়িয়ে আসে। পাগ্ মিল থেকে মাটির এই বেরিয়ে আসাকে একটি টুথ্পেষ্টের টিউব থেকে পেষ্ট বেরিয়ে আসার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। চাক্ অথবা 'জলি জিগার' (Jolley jigger) যন্ত্রে সিরামিক্স্ তৈরী করার জন্যে সাধারণ মাটিকে এভাবে কাজের উপযোগী করে নিতে হয়।

দিবাকর সেনরায়

●

॥ সংঘবার্তা ॥

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠে 'লেকচার-হল্' এবং ঐ হলের দ্বিতীয়তলে লাইব্রেরীর জন্য একটি প্রশস্ত হল্ এবার নূতনভাবে নির্মিত হ'তে চলেছে। বর্তমানে নবনির্মিত পূজামণ্ডপ-সংলগ্ন যে লাইব্রেরী (গ্রন্থাগার) আছে তা ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় নানান দিক দিয়ে আমরা অসুবিধা অনুভব করছি। সেজন্য 'লেকচার-হল'-এর উপরে (দ্বিতল) একটি প্রশস্ত পুস্তকাগার তৈরী করার কাজে আমরা হাত দিয়েছি। নীচে বক্তৃতাগার ও দ্বিতলে প্রশস্ত পুস্তকাগারটি নির্মাণ করতে আনুমানিক দুই লক্ষেরও অধিক টাকার প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠের কল্যাণকামী শিষ্য ও ভক্ত যাঁরা—তাঁদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ তাঁরা যেভাবে পূজামণ্ডপটি নির্মাণ করতে মুক্তহস্তে দান করেছেন—এবারও ঐ দান বা সাহায্যলাভ করতে আমরা আশা করি। কেননা আমাদের একান্ত বিশ্বাস যে, তাঁদের সকলের আন্তরিক সহায়তা ও সহানুভূতি বেদান্ত মঠের প্রসারতাকে ত্বরান্বিত করবে। ইতি—

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা

স্বীকৃতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

	দাতার নাম		টাকা
৭৬০।	শ্রীইন্দুবিকাশ ঘোষ, পো: বুড়িখালি, জেলা হাওড়া, পিন্ ৭১১৩১০	...	২০০·০০
৭৬১।	শ্রীঅমিয়প্রসাদ দাস, ৭১এ, শম্ভুবাবু লেন, কলিকাতা-৭০০০১৪	...	২০১·০০
৭৬২।	শ্রীশ্বেতা ও সৌমা চন্দ্র, C/o শ্রীমতি সন্ধ্যা চন্দ্র, গ্রাম গাইঘাটা পো: ঝাড়গ্রাম, জেলা মেদিনীপুর	...	১০১·০০
৭৬৩।	শ্রীসমরকুমার সেন, ৬৮বি, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা	...	১০১·০০
৭৬৪।	শ্রীসোমনাথ মিত্র, ২৬৭, যশোহর রোড, ফ্ল্যাট ৩, কলিকাতা-৭০০০২৮	...	১০১·০০
৭৬৫।	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩৬/৩, বেচারাম চ্যাটার্জী লেন, কলি-৭০০০৩৪	...	১০০·০০
৭৬৬।	শ্রীচণ্ডীচরণ সাধুখাঁ, ৬১, অরবিন্দ সরণী, কলিকাতা-৭০০০১৫	...	১০০·০০
৭৬৭।	জনৈক ভক্ত	...	৫১·০০
৭৬৮।	শ্রীমতী কিরণময়ী গুঁই, C/o শ্রীঅজিতকুমার গুঁই, ২২৫/বি, রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০০১৯	...	৫০·০০
৭৬৯।	শ্রীখগেন্দ্রনাথ সাহা, ৩২, ক্রাইপার বাই লেন, (সাউথ) পো: কোন্নগর, জেলা হুগলী	...	৫০·০০
৭৭০।	শ্রীবিভূতিভূষণ সেনগুপ্ত, ১/৩এ, বিডন রো, কলিকাতা-৭০০০০৬	...	১০·০০
৭৭১।	শ্রীমতী কুন্তরাণী রায়চৌধুরী, ২৫বি, ভামানন্দ রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫	...	১০·০০
৭৭২।	শ্রীযোগবিলাস মুখার্জী, ৭/১বি, কুণ্ডু রোড, কলিকাতা-৭০০০২৫	...	১০·০০
৭৭৩।	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চৌধুরী, শান্তিনগর, পো: মদনপুর, জেলা নদীয়া	...	৫·০০
৭৭৪।	শ্রীমতী গীতা বিশ্বাস, মনিরামপুর দেপাড়া, পো: ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা	...	৫·০০
৭৭৫।	শ্রীপদ্মচরণ বিশ্বাস, গ্রাম আদাস, পো: কুয়ানপোল, জেলা কটক	...	৫·০০
৭৭৬।	স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, পো: বেলুড় মঠ, জেলা হাওড়া	...	৫·০০
৭৭৭।	শ্রীপঞ্চানোপাল ঘোষ, ভারত মেডিকেল হল, পো: রায়গঞ্জ, জেলা ধানবাদ	...	৪·০০

স্বাধীনতা-দিবসের পতাকায় আন্দোলিত হোক জাতীয় সংহতির প্রতিশ্রুতি গণতন্ত্রের শপথ

আজ থেকে ৩৩ বছর আগে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট এই দেশের আকাশে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই আন্দোলিত পতাকার সামনে রক্ত ও স্বেদে কঠোর, উত্তাল জনতা স্বপ্ন দেখেছিল এক সংহত ভারতবর্ষের; শপথ নিয়েছিল গণতান্ত্রিক সমাজ ও মেহনতী মানুষের শোষণ মুক্ত স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার, সমাজতন্ত্রের।

সুদীর্ঘ ৩৩ বছরের ইতিহাসে সেই স্বপ্ন, সেই শাণিত শপথ বারে বারে বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বিদেশী চক্র ও তারই স্বার্থবহ দেশীয় চক্র অবিচ্ছিন্ন আঘাত হেনেছে ভারতের সংহতির উপর, কখনও সাম্প্রদায়িকতার শাণিত অস্ত্রে, কখনও বা প্রাদেশিকতার হিংস্র আক্রমণে। আবার এই আঘাত ভয়ংকর ও নৃশংস হয়ে উঠেছে মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে। ১৯৮০ সাল সেই হীন চক্রান্তেরই এক রক্তাক্ত অধ্যায়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের পার্বত্যভূমিতে এই চক্রের পদচারণা। পশ্চিমবঙ্গেও তার অশুভ ছায়া। উত্তর-পূর্ব ভারতের জাগ্রত গণতান্ত্রিক জনমতকে ধ্বংস করে বিচ্ছিন্নতাবাদকে লালন করার জঘন্য ষড়যন্ত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার এই ঘনায়মান ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। মেহনতী মানুষের সরকার, জাতীয় সংহতী ও গণতন্ত্রের শত্রু এই বিচ্ছিন্নতাবাদের মোকাবেলায় অতন্দ্র। গ্রাম-গঞ্জের খেত-খামারে, শহরের কলকারখানায়—মেহনতী মানুষের কাঁধে কাঁধ দিয়ে, অনেক সংগ্রাম ও রক্তের মূল্যে অর্জিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে অটুট রাখতে, গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রতিহত করতে, সমাজের দুর্বল ও অনুন্নত শ্রেণীর অধিকারকে প্রসারিত করতে বদ্ধপরিকর।

গত তিন বছরের শাসনে বামফ্রন্ট সরকার তার অতি সীমিত শক্তি নিয়েই এই উপলব্ধ সত্যকেই রূপায়িত করার প্রাণপাত চেষ্টা করেছে। গ্রামীণ দরিদ্রশ্রেণীর স্বাধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় এসেছে গণতন্ত্রের বিস্তৃতি। কলকারখানার মেহনতী মানুষকে দিয়েছে সংঘবদ্ধ সংগ্রামের অধিকার। দীনতম কুটিরেও প্রসারিত করতে চেয়েছে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার সুযোগ। বিচিত্র বহুবর্ণ ভাষা, সংস্কৃতির আলোকিত দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে উত্তরের পার্বত্য ভূমি থেকে সমুদ্র-মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমিতে। এক নতুন পথে যাত্রা শুরু হয়েছে।

দরিদ্রশ্রেণীর জন্য আরও অনেক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে তাঁদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মর্যাদাময় প্রতিষ্ঠার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তিই তো জাতীয় সংহতির বনিয়াদ; তার প্রতিরোধের প্রাচীরেই তো গণতন্ত্রের শত্রু বিচ্ছিন্নতাবাদের চূড়ান্ত পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের বনিয়াদ সেই সংঘবদ্ধ শক্তির প্রতিশ্রুতিই ১৫ই আগষ্টের উত্তোলিত পতাকায় আন্দোলিত হোক।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ১১৩৭১/৮০

মানসিক প্রাশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন।

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

'পিয়ারলেস ভবন'

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

মোট সম্পদ—১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক
থেকে
সর্বাধিক ও করমুক্ত সুদ

এবং ১১,০০০-এরও বেশি নগদ পুরস্কার

প্রথম পুরস্কার—১,০০,০০০ টাকা

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্ক দেশের বৃহত্তম ও প্রাচীনতম সঞ্চয় ব্যাঙ্ক। প্রায় ৪.২৬ কোটি নরনারী এই ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা স্থাপন করেছেন। ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ১,৬৯৫ কোটি টাকার ওপর।

এক নাগাড়ে ৬ মাস, জমার খাতায় ন্যূনপক্ষে ২০০ টাকা থাকলে, বছরে দু'বার দু'টি ড্র-এ পুরস্কার লাভের সুযোগ পাওয়া যাবে। এযাবত এক লক্ষের ওপর লোক পুরস্কার পেয়েছেন।

বিশেষ আকর্ষণ

- মাত্র ৫ টাকা দিয়ে অ্যাকাউন্ট বা জমার খাতা খোলা যায়।
- সম্পূর্ণ করমুক্ত ৫.৫% সুদ পাওয়া যায়।
- আপনাদের জন্যে ১,২৯,০০০ ডাকঘর ছাড়াও বহু ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর আছে—এক ডাকঘর থেকে অন্য ডাকঘরে খাতা স্থানান্তরিত করা যায়।
- গ্রামের ডাকঘরে টাকা জমা দিয়ে শহরে বড় বা উপ-ডাকঘরে টাকা তুলুন অথবা উল্টোটাও করতে পারেন।
- যখন খুশী তখন বিনা ঝঞ্ঝাটে টাকা তুলুন।
- প্রায় ২৩,০০০ ডাকঘরে চেকের সুবিধা রয়েছে—অন্য জায়গার ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাঙ্কের চেকের জন্য কোনও আদায় দিতে হয় না।
- আইডেনটিটী কার্ড-এর দরুন সনাক্তকরণে ঝঞ্ঝাট হয় না।
- অ্যাকাউন্ট বা জমার খাতা সিকিউরিটী হিসাবে বাঁধা দেওয়া যেতে পারে।
- যে কোনও ব্যক্তিকে মনোনয়ন করার সুবিধা আছে।

যে কোনও ডাকঘরে আজই আপনার অ্যাকাউন্ট খুলুন

জাতীয় সঞ্চয়ন্ত্র সংস্থা
পোস্ট বক্স ৯৬, নাগপুর-৪৪০০০১

davp 80/107

"তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর
বাসযোগ্য করে যাবো আমি
নবজাতকের কাছে
এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার"

এ আমাদেরও অঙ্গীকার
হিন্দুস্তান ফার্টিলাইজার
কর্পোরেশন লিমিটেড
বিপণন বিভাগ

হাসিখুশি শিশু জাতির গৌরব

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.
23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-700014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6. DUFF STREET.

CALCUTTA-700006

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :
SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত এই কবচ ধারণে পরীক্ষায় পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—কুতা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

ফোন : ৪২-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্রদাসপল্লী কলিকাতা-৭০০ ০২৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫, ৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৪ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী ৫·০০

বীরত্বে বাঙালী ৪·০০

বিজ্ঞানে বাঙালী ৮·০০

বাংলার ঋষি ৬·৫০

বাংলার মনীষী ৩·০০

বাংলার বিদুষী ৩·০০

ব্যবহারিক লক্ষকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

একটা দেশ ঐক্যবদ্ধ থাকে কী ভাবে ?

[illegible]

আমাদের
স্বাধীনতার
৩৩তম
বার্ষিকী উপলক্ষ্যে
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথাগুলি স্মরণ করুন। তিনি বলেছিলেন—
"ভারত না বাঁচলে কেউ কি বাঁচবে ?"
আমাদের লক্ষ্য মাত্র একটি
এক শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল ভারত গঠন

আসুন আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাই

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৪২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
৩। শ্রীশ্রীচরিসা মন্দির
পো: নবদ্বীপ, নদীয়া

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes	
How To Be A Yogi		and its Guide Book	300·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Ideal of Education	3·00	The Steps Towards Perfection	2·00
India and Her People	12·00	The Vedanta Philosophy	
Life Beyond Death	16·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Memoirs of Ramakrishna	12·00	True Psychology	16·00
My Life Story	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
Mystery of Death	18·00	Yoga Psychology	16·00
Path of Relization		Yoga : Theory & Practice	10·00
Philosophy and Religion		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples. Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Published by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year, August 1980
VOL. VI

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

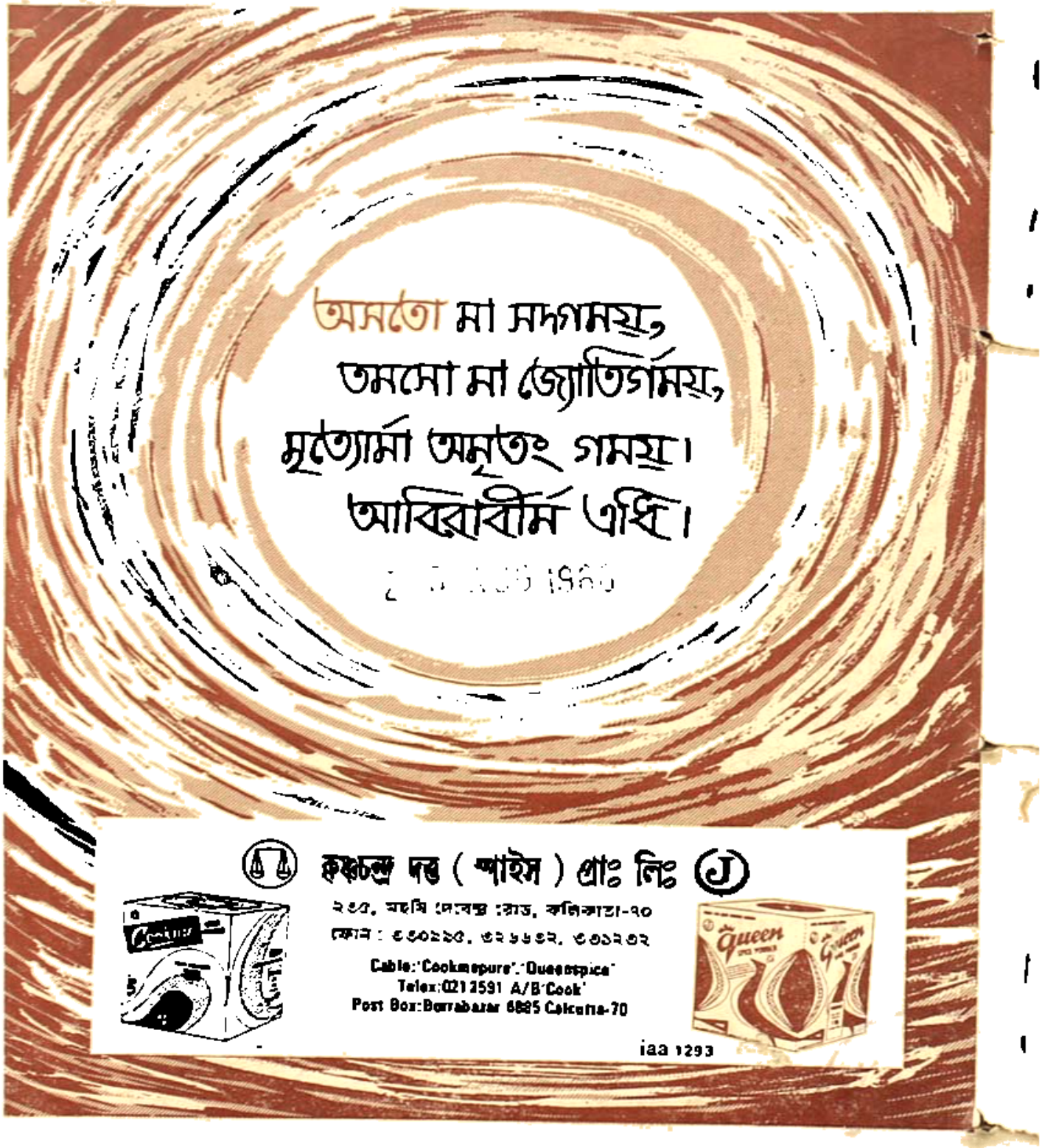

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (প্রাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০২২৩, ৩২৬৬৩২, ৩৩১২৩২
Cable:'Cookmepure','Queenspice'
Telex:0212591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6825 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-700006
tICE Rs. 1·50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১·৫০টাকা

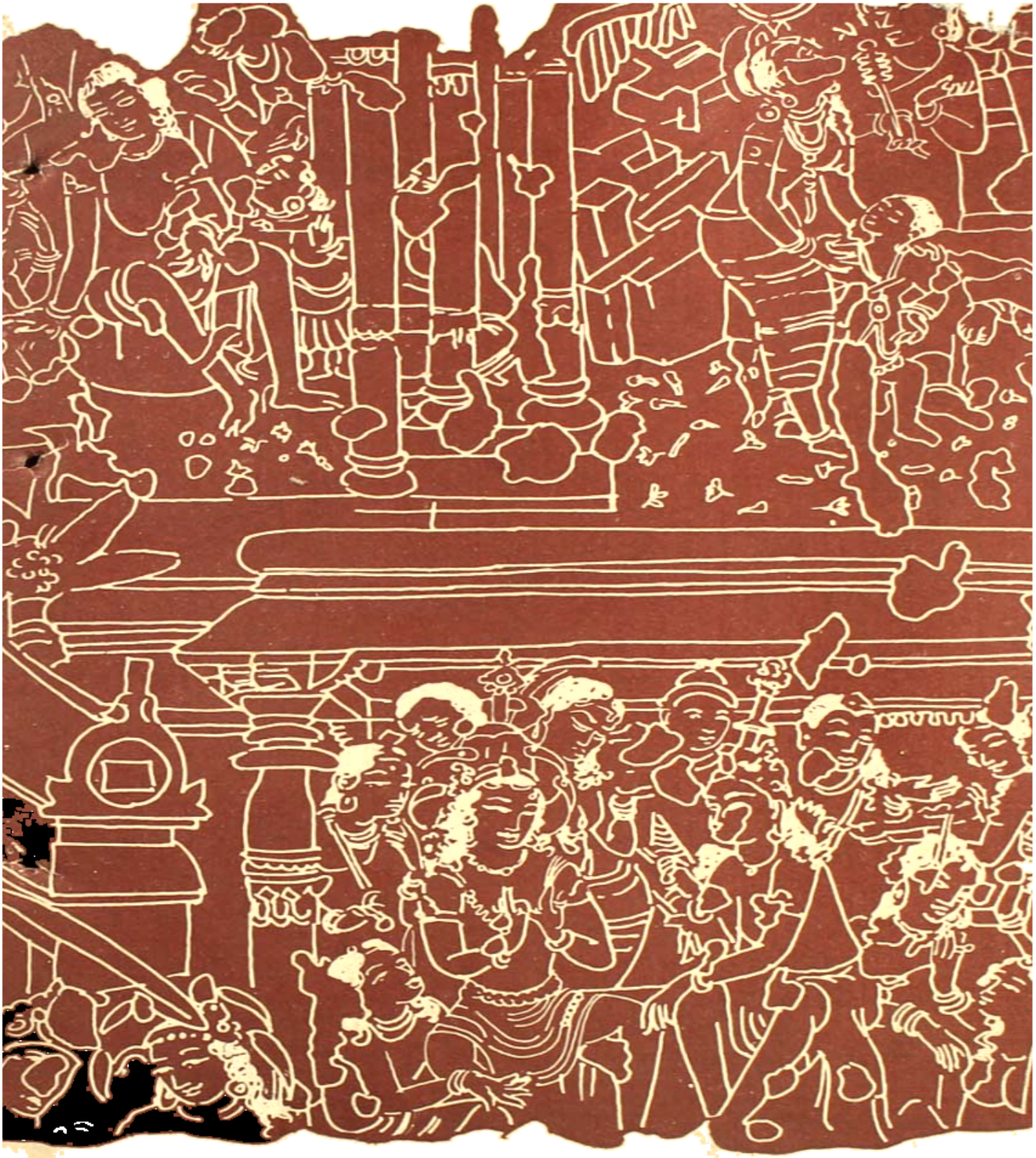

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিশ্ববাণী

বিয়াল্লিশ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১২ সংখ্যা অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani. Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·০০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০

ফোন : ৫২-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিপ্লবী অরবিন্দ সরণী (কলিকাতা-৭০০ ০০৯)

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ ৩/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদে টীকা ভাষ্য-সহজ ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৫·০০

বীরত্বে বাঙ্গালী ৪·০০

বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ৮·০০

বাংলার ঋষি ৬·৫০

বাংলার মনীষী ৩·০০

বাংলার বিদুষী ৪·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ভাক্ত সেনেক্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্‌স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্ম্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর
—কুষ্ঠ—

সর্ব্বাধুনিকসমাযুক্ত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

এসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫১)

শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা। (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF
"JICO" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.B. BOX NO. 1013, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলি: ৬

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধ্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

ভাদ্র, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন সোন্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এ'টি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্, বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street, Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

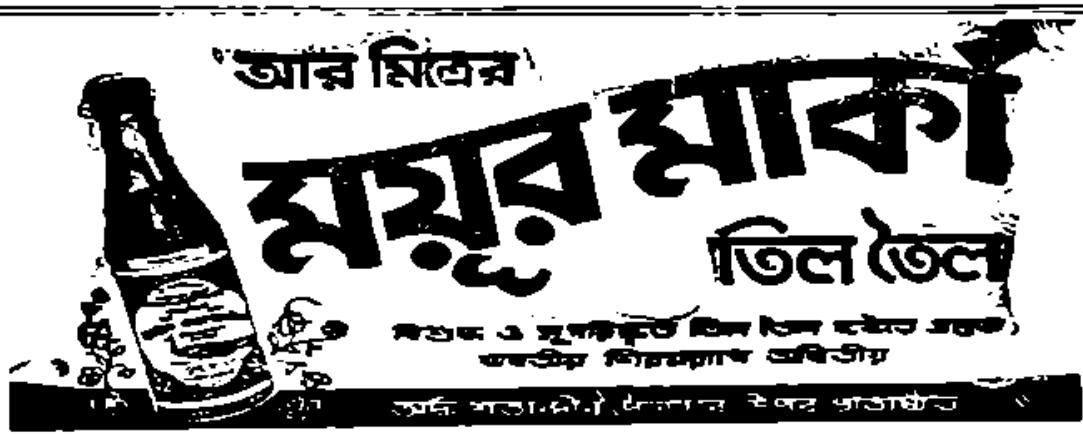

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

ভাদ্র, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	শ্রীমদভেদানন্দ স্তুতি	৩২৭	স্বামী জীবনানন্দ
২।	বাণী ও বিচার	৩২৯	
৩।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৩৩৩	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৪।	তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	৩৩৪	ডক্টর নিরঞ্জনচরণ চক্রবর্তী
৫।	ভারতাত্মা-স্বামী বিবেকানন্দ	৩৫৩	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৬।	সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	৩৫৭	স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
৭।	বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস কি 'তত্ত্বমূলক'	৩৬০	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৮।	কালীদাসসাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ-পারাবত শুক-সারি-প্রসঙ্গ	৩৬৩	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
৯।	পরলোকবিশ্বাসী নীলগিরির টোডা	৩৬৫	শ্রীসুশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৩৬৯	
১১।	স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র	৩৭২	

বেনারসী সিল্ক সাড়ী পোষাক

শৈলালাল মণিলাল স্টোর্স

১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট -কলি-১২

(বসুমতী ভবনের পাশে)

বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানা হোসিয়ারী

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্বত্র প্রাপ্তব্য

৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) ব্রাঞ্চ:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট

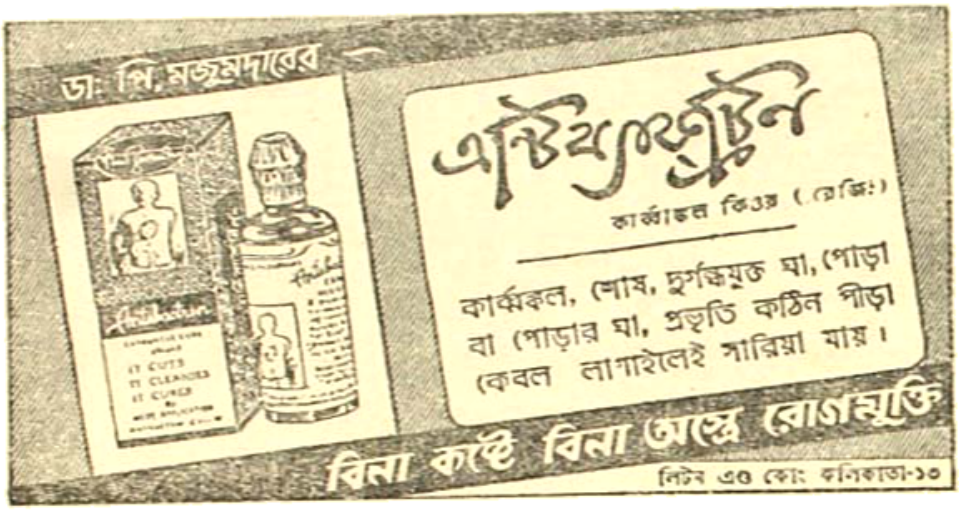

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

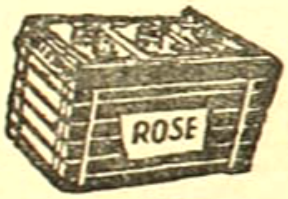

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

Economic

Manufactured by :

ECONOMIC HOMEO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

87, Netaji Subhas [illegible]

Calcutta-1

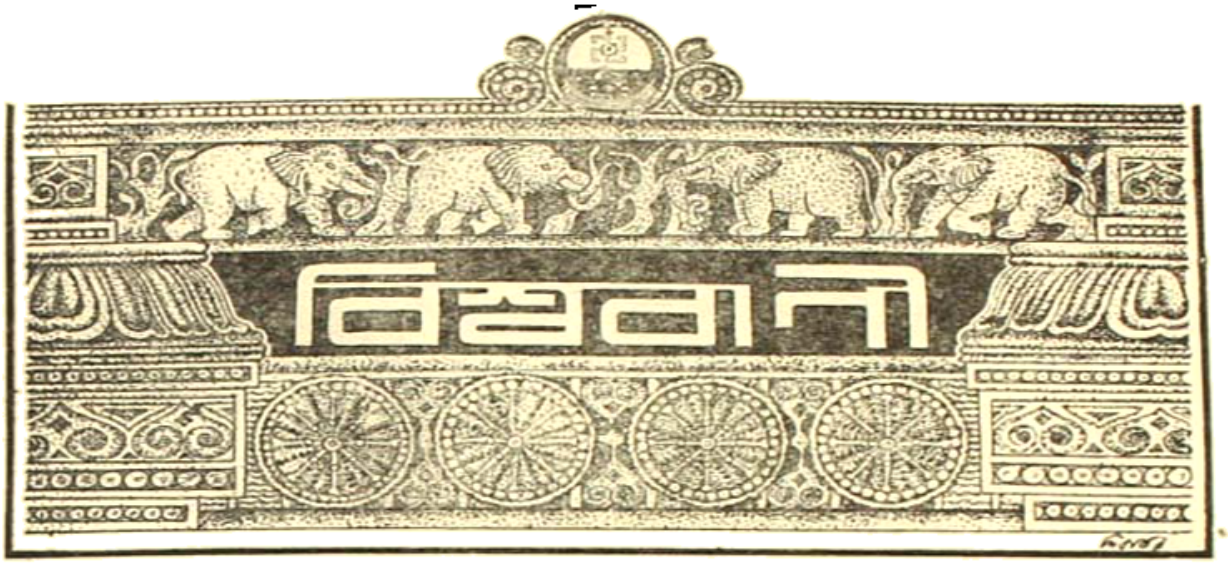

বিয়াল্লিশ বর্ষ | সপ্তম সংখ্যা | ভাদ্র ১৩৮৭

॥ শ্রীমদভেদানন্দস্তুতিঃ ॥

[ভাবানুবাদসমেতা]

স্বামী জীবনানন্দ

অভেদানন্দং বিজ্ঞবরযুবতিং শান্তদান্তং
সদা প্রাতর্ধ্যায়েদ্ বিমলমনসি শ্রীমহান্তম্ ।
মুনিং শাস্ত্রজ্ঞাতং বিপুলমতি বেদান্তসিংহং
প্রচারজ্ঞানজ্ঞং নিখিলজনকল্যাণকামম্ ॥ ১

সুপূজ্য অভেদানন্দ শমদমগুণযুত জ্ঞানী যতিবর
শাস্ত্রে সুনিষ্ণাত শুদ্ধ বেদান্তকেশরী হিতকর্মপর,
সবার মঙ্গলকামী সুভাবপ্রচারে সতত নিরত
বিমল হৃদয়েষ্যের সুকল্যাণব্রত প্রাতঃকালে নিত্য ।

অভেদানন্দোবৈ স জয়তু পৃথিব্যাং যতিবর-
স্তপস্বী কালী যো দৃঢ়সহনশীলঃ সুবিমলঃ ।
প্রচারে বিজ্ঞানী স্বগুরুযুগবাণীসুকথকঃ
সুধীর্বেদান্তজ্ঞো যুগপরমচিন্তামহিমবিৎ ॥ ২

জয়তু অভেদানন্দ ভবে যতিবর
কাশী-ভস্মী প্রখ্যাত সদ্গুরুপ্রবর,
সুবিজ্ঞ বেদান্তবিদ্ সুবিমলচিত্ত
রামকৃষ্ণ-যুগবাণী প্রচারে নিয়ত।

ভিন্নেষু নিত্যং ভূবি যেন দৃষ্টং
জ্ঞানৈক ভেদেষু মহৎ সুলক্ষম্।
কণ্ঠে সুবৃংহেচ্চ সরস্বতী বৈ
নমামি নিত্যং তমহং মহান্তম্। ৩

অনিত্য বস্তুতে যিনি সত্যদ্রষ্টা যতি
নানা ভেদে একজ্ঞান যাঁর মহামতি,
সতত সুকণ্ঠে যাঁর দেবী সরস্বতী
প্রণিপাত পদে তাঁর শ্রদ্ধাভরে নিতি।

যঃ শুদ্ধসত্ত্বঃ পরমাধিকারী
শ্রীরামকৃষ্ণস্য কৃপাং স লেভে।
অভেদ-আনন্দমহং প্রপৌমি
জ্ঞানে স্থিতং তং পরমং মহান্তম্। ৪

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপালব্ধ যতি
অধিকারী ব'লে যাঁর জগতে খ্যাতি,
অভেদে আনন্দ তাঁর জ্ঞানী মহামতি
যোগীশ অভেদানন্দে প্রণিপাত নিতি।

বেদান্তভাবনিষ্কাতমভেদানন্দসংজ্ঞিতম্।
প্রণমামি সদা ভক্ত্যা সমজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতম্। ৫

অভেদানন্দ আখ্যাত সমজ্ঞানে স্থিত
যোগিবর পদে মোর প্রণিপাত নিত্য।

ইতি শ্রীমদভেদানন্দস্তুতি জীবানন্দস্বামিনা কৃতা।

●

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(চতুর্থাংশ)

একথা ঠিক যে, সগুণব্রহ্মের সাধনা থেকেই সাধক ক্রমশ নির্গুণব্রহ্মে উপনীত হন, কেননা সগুণে ও নির্গুণে বিরোধ কেবল নামে, গুণে, বিশেষণে ও উপাধিতে, কিন্তু স্বরূপে, চিদংশে বা চৈতন্যসত্তায় উভয়ে এক ও অভিন্ন—যেমন অভিন্ন তুরীয়চৈতন্যের সঙ্গে ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এ'সকল ভূমি বা চৈতন্যসত্তার বা চিদংশে। অধ্যাসবিচারপ্রকরণে বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর 'বিবেরণপ্রেমেয়সংগ্রহ'-গ্রন্থে এ'সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দিয়েছেন। তিনি সূক্ষ্মবিচারদৃষ্টি নিয়ে স্পষ্টভাবে বলেছেন : "আরোপিতরূপেণাধিষ্ঠানোপপত্তেঃ। আরোপোঽপি নাধিষ্ঠানস্বরূপ-প্রাপ্তস্য সম্ভবতীতি চেৎ, ন দৃষ্টবাক্যেরদ্বিতীয়ত্বপ্রতিপত্তয়ে নিষেধ্যসমর্পকৈঃ প্রাপিতত্বাৎ তস্মাৎ নিষ্প্রপঞ্চব্রহ্ম প্রমিতৌ ন কশ্চিদ্বিরোধঃ"।

॥ সমন্বয়ী-দৃষ্টিভঙ্গী ॥

এ'সম্বন্ধে 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়'-গ্রন্থে (পৃঃ ৮৪-৮৫) ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্ক-বেদান্ততীর্থের সমন্বয়বিচারশৈলীর উল্লেখ ক'রে বলি : "শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রে সগুণব্রহ্মের বিচারার্থতা স্বীকার করেছেন। নির্গুণব্রহ্মের বিচারার্থতার দ্বারা সগুণব্রহ্মের বিচারও সূচিত হইয়াছে। প্রথম সূত্রের 'অস্তি তাবৎ ব্রহ্ম নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতঞ্চ। 'ব্রহ্ম'-শব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়ো অর্থাঃ প্রতীয়ন্তে'—এই ভাষ্যে ভাষ্যকার নির্গুণ ও সগুণ-ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রে বিচার্য প্রতিপাদক 'ব্রহ্ম'-শব্দ নির্গুণ ও সগুণ উভয়প্রতিপাদক বলিয়া সূচিত করিয়াছেন"।

"নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিসমন্বিত ব্রহ্ম সগুণ। ব্রহ্ম-শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ সগুণব্রহ্ম এবং নির্গুণব্রহ্ম উভয়ই হইবে—ইহাই ভাষ্যকারের (শঙ্করের) অভিপ্রায়। 'ব্রহ্ম'-শব্দের অবয়বসামর্থ্যদ্বারা ঐ অর্থগুলি কিরূপে পাওয়া যায় তাহা আচার্য পদ্মপাদ 'পঞ্চপাদিকা'-গ্রন্থে বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-শব্দ হইতেই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিসমন্বিত বস্তু জানা যায়।...এজন্য ব্রহ্ম অর্থে বৃহৎ ; সর্বতোভাবে পূর্ণবস্তুই বৃহৎ : দেশ-কাল বা বস্তুকৃত অবচ্ছেদপ্রযুক্ত অল্পতা যাহাতে নাই, তাহাই বৃহৎ বা ব্রহ্ম-শব্দের অবয়ব-সামর্থ্যলভ্য অর্থ।...সগুণ ও নির্গুণ এই উভয় ব্রহ্মই বিচার্য বলিয়া প্রতিজ্ঞা প্রদর্শন করায় এই প্রতিজ্ঞার অনুকূলেই 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'—এই জন্মাদি দ্বিতীয়সূত্রে এবং ভাষ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জগতের 'অভিন্ননিমিত্তোপাদানত্বরূপ জগৎকারণত্ব'-ধর্মটি বিশেষণ হইলে সগুণব্রহ্মের লক্ষণ হয় এবং উপলক্ষণ হইলে বিশুদ্ধ-নির্গুণব্রহ্মের লক্ষণ হয়—ইহাই জন্মাদিসূত্রে বলা হইয়াছে।...শাস্ত্রযোনিত্বসূত্রের দ্বিতীয় বর্ণকে উভয়বিধ ব্রহ্ম যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেখানো

হইয়াছে তাহার উপপাদনের জন্য ৪র্থ 'সমন্বয়' (তত্তু সমন্বয়াৎ)-সূত্রে সগুণ ও নির্গুণ-সাধারণ ব্রহ্মে বেদান্তবাক্যসমূহের তাৎপর্য অন্বয় দেখানো হইয়াছে"।

এ'সম্পর্কে সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন সগুণপ্রতিপাদক 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি সমস্ত বেদান্তবাক্যই নির্গুণব্রহ্মে অন্বগত হয়, সুতরাং সগুণব্রহ্মে সমন্বগত বেদান্তবাক্যগুলি নির্গুণব্রহ্মসমন্বয়ের বিরোধী নয়, বরং সগুণের প্রতিপাদক বেদান্তবাক্য নির্গুণেরও প্রতিপাদক, একটি বাক্যের উভয় ব্রহ্মে (সগুণে ও নির্গুণে) তাৎপর্যবিরুদ্ধ নয়। সংক্ষেপশারীরককার বলেছেন—

'সত্যাসত্যবপুস্তত্ত্বাদি সগুণং ব্রহ্মাস্ত বিদ্যা তথা,
তদ্বৎ তদ্বিষয়স্য বেদবচসস্তাৎপর্যমেবংবিধম্।
তেনাবান্তরমস্য বেদবচসস্তাৎপর্যমন্যাদৃশং
চান্তর্নির্গুণবস্তুতত্ত্ববিষয়ং সঙ্কীর্ত্যতে ভাগশঃ।'

—(১ম অঃ ৪৬৪ শ্লোক)

কথাও এই যে, সংক্ষেপশারীরককার বলেছেন নির্গুণব্রহ্মে গুণসংসর্গ অধ্যস্ত ব'লে ব্রহ্মের সগুণাবস্থায়ও নির্গুণস্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না। আসলে নির্গুণব্রহ্মে গুণসংসর্গ বা গুণ কল্পিত হলেই নির্গুণব্রহ্মই সগুণব্রহ্মরূপে পরিচিত হন। এজন্য সগুণব্রহ্মকে সত্যাসত্যশরীর বলা যায়। সেজন্য উভয় (সগুণ ও নির্গুণ) ব্রহ্মে যে বাক্যভেদ দেখা যায়, তার কারণ সগুণব্রহ্মে অবান্তর-তাৎপর্য ও নির্গুণব্রহ্মে চরম বা মহাতাৎপর্য—এই বাক্যভেদ হয়, কিন্তু বাক্যভেদথাকে ব্রহ্মের স্বরূপসত্তায় কোন ভেদ সৃষ্টি হয় না।

সুতরাং জীব-জগৎকে অপেক্ষা ক'রে শাস্ত্রে সোপাধিক, সাকার ও সগুণব্রহ্ম কল্পনা করা হয় মুক্তি ও ব্রহ্মের সর্বাত্মকতা-উপলব্ধির জন্য, আবার মায়ানির্মুক্ত ব্রহ্মসত্তাপক্ষে নিরুপাধিক, নিরাকার ও নির্গুণব্রহ্ম কল্পিত হয়েছে। আসলে সমস্তই কল্পনা, নচেৎ ব্রহ্ম সগুণ নন, নির্গুণও নন; সোপাধি নন, নিরুপাধিকও নন, তিনি সর্বকালে সর্বদেশে সর্বগত ও সর্বাত্মক-চৈতন্য। এ'জন্য অদ্বৈতবেদান্তের অভিপ্রায় যে, ব্রহ্মের ধর্ম-ধর্মী-সম্বন্ধও কাল্পনিক। তবে কল্পনার মধ্য দিয়েই সাধককে বাস্তবসত্যতায় উপনীত হতে হয়। যোগে ষট্‌চক্রসাধনায়, তন্ত্রে কুণ্ডলিনীর জাগরণে, বেদান্তে জীবের ব্রহ্মসত্তায় উত্তরণে—সকল বিষয়েই প্রথমে কল্পনার সাহায্য নিয়ে সাধনা, তারপর সিদ্ধিলাভ অর্থে কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়ণের সার্থকতা।

ঠিক সেভাবে ব্রহ্ম বা বৃহৎ ও ব্যাপক-চৈতন্য নির্ধর্মক হলেও বিচারক্ষেত্রে ও ব্যবহার-দশায় নির্ধর্মক-ব্রহ্মে ধর্মের আরোপ করা হয় যথার্থতত্ত্ব বা স্বরূপতত্ত্বকে বোধে বোধরূপে উপলব্ধি করার জন্য। সেজন্য নির্ধর্মক-ব্রহ্মে কল্যাণগুণ কল্পিত বা আরোপিত হয় এবং ঐ কল্পিত বা আরোপিত কল্যাণাদি গুণই তখন ব্রহ্মের ধর্ম বা ব্রহ্মলিঙ্গ (সগুণব্রহ্মচিহ্ন)। বিশুদ্ধ গুণাতীত বা মায়াতীত ব্রহ্ম তেমনই কল্যাণাদি গুণে উপহিত হয়েই (যেমন লালফুলের লালরঙ্ বর্ণহীন স্ফটিকে উপহিত হয়) সগুণ ও সবিশেষ-ব্রহ্মরূপে দহরবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যা প্রভৃতিতে উপাস্যরূপে পরিগণিত হন। সেজন্য উপাস্য সগুণ ও সবিশেষ-ব্রহ্মের গুণ বা ধর্মই নির্গুণ ও নির্বিশেষ-

ব্রহ্মের নিরূপণ ও প্রতিপত্তির উপায়রূপে নির্গুণ-নির্বিশেষ-প্রকরণেও নির্দিষ্ট হয়েছে। সেজন্যই নির্গুণ, নির্বিশেষ ও সর্বাতীত ব্রহ্মচৈতন্যকে সগুণ, সবিশেষ ও সর্বানুস্যূত ব্রহ্মচৈতন্য বলে গ্রহণ করলেও ব্রহ্মস্বরূপতার কোন হানি বা বৈলক্ষণ্য হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের ফল প্রতিপাদন করার জন্য তাই শাঙ্করভাষ্যে সগুণ-সবিশেষ-ব্রহ্মের আলোচনা স্বীকার করা হয়েছে। অদ্বৈতবাদের প্রাচীন আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যকারিকায় সুস্পষ্টভাবে সেজন্য বলেছেন যে, সগুণাত্মক দ্বৈতভাব ও দ্বৈতবাদগুলি পরস্পরবিরোধীরূপে আপাতপ্রতীয়মান হলেও স্বরূপদৃষ্টিতে তাদের অদ্বৈতভাব ও অদ্বৈতবাদের সঙ্গে কোন বিরোধ নাই।[১] গৌড়পাদ বলেছেন—

'স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্।
পরস্পরং বিরুধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুধ্যতে'॥

॥ ভাস্কররায় ও তাঁর সমন্বয়ী-দৃষ্টি ॥

আচার্য ভাস্কররায়-প্রণীত 'বরিবস্যারহস্যম্'-গ্রন্থের 'প্রকাশ'-ব্যাখ্যায় ধর্মী ও ধর্ম—শক্তিমান ও শক্তির অভিন্নতাপ্রতিপাদক বিচারশৈলীর কথা মনে পড়ে। 'কথমিব তস্মিন্‌জ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতমুচ্যতে'—এই প্রতিজ্ঞার ভাষ্যে ভাস্কররায় বলেছেন : 'অত এবৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং শ্রুতাবুক্তং কথং সঙ্গচ্ছত ইতি সাশঙ্ক্যাহ—কথমেতি। অথবা বিবর্তবাদং বেদান্তিসম্মতং পরিণাম-বাদী তান্ত্রিকো দূষয়তি—কথমেবেতি।...অত্রেয়ং তান্ত্রিকপ্রক্রিয়া—'ইচ্ছামি' 'জানামি' ইত্যাদা-বুত্তমপুরুষান্তভাসমানং স্ফুরণাত্মনি জ্ঞানমেব প্রকাশাভিধং ব্রহ্ম। তচ্চ সর্বজ্ঞসর্বেশ্বরত্বসর্বকর্তৃত্ব-পূর্ণত্বব্যাপকত্বাদিশক্তিসংবলিতম্। তস্য চানন্দরূপাংশ এব স্ফুরণং পরাহন্তা বিমর্শঃ পরা ললিতা ভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদিপদৈর্ব্যবহ্রিয়তে।...'বাচারম্ভণং বিকারঃ' (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৬।১।৪) ইত্যাদিশ্রুতীনাং তত্রৈব স্বারস্যাচ্চ। শক্তিশক্তিমতোরুপাদানোপাদেয়য়োরত্যন্তমভেদঃ, ন পুনরো-পনিষদাদিবদ্ভেদাভেদৌ। অতএব 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ উঃ ৩।১৪।১) ইতি সামানাধি-করণ্যমভেদে, ন পুনর্বাধায়াম্। অদ্বৈতশ্রুতয়ঃ সর্বা অপ্যেতদভিপ্রায়িকা এবাবিরুদ্ধাঃ। সর্ব-প্রমাণমূর্ধন্যত্বাদ্ভ্যা তদনুসারিতয়ৈবাদ্বৈতে কথিতে তদ্বিরুদ্ধত্বেন ভাসমানঃ কার্যকারণোর্ভেদাংশ এব কল্পিত আত্তাং ন পুনঃ সর্বোঽপি প্রপঞ্চঃ।...তচ্চ শ্রুতেরপি পরিণামবাদ এব সংমতঃ সিধ্যতি। ভগবতা ব্যাসেনাপি 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' (ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৩) ইত্যস্মিন্নধিকরণে একবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞাং মৃদ্ঘটনখনিকৃন্তনাদিদৃষ্টান্তম্ 'বহুস্যাং প্রজায়েয়' (তৈঃ উপঃ ২।৬) ইত্যভিধ্যোপদেশাদিকং চানুসন্ধানেন পরিণামবাদ এবাভিমতে...। ভাষ্য-কারৈরপি তত্র বিবর্তবাদানুসারেণ ব্যাচক্ষাণৈরপি সৌন্দর্যলহর্যাম্ 'মনস্তং ব্যোম্ ত্বম্' ইতি শ্লোকে 'ত্বয়ি পরিণতায়াম্', ইতি স্বাভিমতঃ পরিণামবাদ এব সূচীকৃতঃ"।[২]

এখানে দেখা যায় যে, আচার্য ভাস্কররায় দার্শনিক অপ্পয়দীক্ষিতের মতের অনুসারী হয়ে বিবর্তবাদের প্রসঙ্গে সৃষ্টিশ্রুতিকে পরিণামবাদের পক্ষে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

১। দ্রষ্টব্য যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ : 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২। 'বরিবস্যারহস্যম্' (আড়েয়ার সংস্করণ), পৃঃ ৪-৬।

কিন্তু পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী 'বরিবস্যারহস্য'-গ্রন্থের মুখবন্ধে (Introduction) এ'সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বলেছেন : "According to that doctrine, the one attributeless *Brahman* assumed two forms by Its own inherent power of Māyā. These two forms are styled respectively *Dharma* and *Dharmin*. The form *Dharma* is divided itself into male and female. The female form is the consort (Devi) of the Supreme Siva (*Dharmin*). The male form viz. Vishnu became the material (Upādāna) cause of the universe...". এ'প্রসঙ্গে, পণ্ডিত কৃষ্ণস্বামী শাস্ত্রী মন্তব্য ক'রে বলেছেন যে, ভাস্কররায় পরিপূর্ণভাবে অদ্বৈতমতেরই সমর্থক, কিন্তু অনেকে তাঁকে পরিণামবাদী তান্ত্রিক মতানুযায়ী বলে ব্যাখ্যা করেন : 'Yet, in the face of this direct testimony, it is strange to find that a view prevails to...that Bhāskararāya's attitude toward the Advaita-vāda was not altogether sympathetic'. এজন্য শাস্ত্রী মহাশয় অদ্বৈতবাদের পক্ষে তিনটি যুক্তির মধ্যে তৃতীয়টিতে বলেছেন যে, আচার্য শঙ্কর ২।১।১৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে প্রথমে পরিণামবাদ ও পরে বিবর্তবাদের দিগ্‌দর্শন করেছেন। ঠিক তেমনইভাবে সংক্ষেপশারীরকার সর্বজ্ঞাত্মমুনির উদাহরণ দিয়ে বলেছেন : "Categorically declares that in the Vedanta system the Parināma-vāda is but the necessary stepping stone, which naturally leads to the central doctrine of Advaitavāda". ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ অনুরূপভাবেই 'সংক্ষেপশারীরক'-গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে সর্বজ্ঞাত্মমুনির অভিমত উল্লেখ করে বলেছেন : "আরুহ্য ভূমিমধরামিতরাধিরোঢ়ুং শক্যেতি ...", অর্থাৎ যদিও বেদান্তে পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ এই উভয়ই গ্রহণ করা হয়, তথাপি পরিণামবাদ বিবর্তবাদেরই পূর্বভূমিস্বরূপ স্বীকার করা হয়। সংক্ষেপশারীরকের ২।৬১ শ্লোকে তাই বলা হয়েছে—

'বিবর্তবাদস্তু হি পূর্বভূমির্বেদান্তবাদে পরিণামবাদঃ।
ব্যবস্থিতেঽস্মিন্ পরিণামবাদে স্বয়ং সমায়াতি বিবর্তবাদঃ'।

অবশ্য এ'সকল কথা ও যুক্তি সমন্বয়বাদীরাই বলেন ও প্রদর্শন করেন। এ'সম্বন্ধে যুক্তি এই যে, ব্রহ্মসূত্রকার বাদরায়ণ-ব্যাস নিজেই 'ভোক্ত্রাপত্তেঃ' ইত্যাদি সূত্রদ্বারা পরিণামবাদে ভেদের উল্লেখ ক'রে বিবর্তবাদে তার নিষেধ করেছেন। এজন্য পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদের পৌর্বাপর্যও স্বীকার করেন বহু অদ্বৈতবাদী দার্শনিক। সর্বজ্ঞাত্মমুনি এ'সম্পর্কে সে'কথাই বলেছেন : 'উপায়মাতিষ্ঠতি পূর্বমুচ্চৈরুপেয়মাপ্তুং জনতা যথৈব। শ্রুতিমুনীন্দ্রশ্চ বিবর্তসিদ্ধৈ বিকারবাদং বদতস্তথৈব' (২।৬২)। সুতরাং সমন্বয়বাদীদের অভিমত যে, ব্রহ্মপরিণামবাদ ব্রহ্মবিবর্তবাদের বিরোধী নয়, বরং অনুকূল। তাই বলি যে, তত্ত্বজ্ঞানশিরোমণি আচার্য ভাস্কররায়কেও অনেকে মনে করেন দ্বৈতবাদী, কিন্তু পরিণামবাদকে গ্রহণ ক'রে তিনি পরে পরিণামবাদের সাহায্যে অদ্বৈতবাদ বা অদ্বৈতসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমন্বয়ী-দৃষ্টি ॥

এ'প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বোধহয় অসমীচীন ও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্ম ও সকল সম্প্রদায়-মতে সাধনা করলেও চরমসিদ্ধান্তরূপে অদ্বৈতমতকেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলতেন : 'অদ্বৈতমত সব শেষের কথা'। কিন্তু তাহলেও উল্লেখ করি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব সকল ধর্মমতের সাধনা ও সিদ্ধান্তকেই সমান শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন ও বলতেন সেগুলি ঈশ্বরলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ, সকল পথই একই চরমলক্ষ্যে উপনীত করায়। সুতরাং পরিণামবাদ—কি বিবর্তবাদ, দ্বৈতমত, বিশিষ্টাদ্বৈতমত, কিংবা অদ্বৈতমত—সকল বাদ, বিশ্বাস ও সাধনপদ্ধতিই শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আদরণীয় ও বরণীয় ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তন্ত্রসাধনার সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীকে দর্শন করেছিলেন। ভাবচক্ষে, অথবা বলা যায় বাস্তবচক্ষেই সকল-কিছু তিনি দর্শন করতেন এবং সেই সময়ে তাঁর মধ্যে বিচিত্র রকমের অনুভূতি হ'ত। গ্রন্থের স্বামী সারদানন্দ মহারাজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে (প্রথম ভাগ, পৃঃ ২১৪-২১৫) লিখেছেন : "ঠাকুর এইকালে (তন্ত্রসাধনকালে) দশভূজা হইতে দ্বিভূজা-পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা হয় না।...তিনি বলিতেন : 'ষোড়শী বা ত্রিপুরমূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম'।"

এই ষোড়শী বা ত্রিপুরমূর্তি, ললিতা বা শ্রীবিদ্যার দর্শন হয়েছিল স্বীয় পত্নী শ্রীশ্রীসারদা-দেবীকে ষোড়শীরূপে পূজা করার সময়ে। দেবী ষোড়শীই ত্রিপুরসুন্দরী দক্ষিণীতন্ত্রপদ্ধতিতে। তিনি আবার মহাশক্তিস্বরূপিণী দক্ষিণাকালী বঙ্গদেশীয় তন্ত্রশাস্ত্রে। শ্রীবিদ্যা, ষোড়শী বা ত্রিপুরসুন্দরী ও দক্ষিণাকালীর মধ্যে কেবল রূপভেদ ও ধ্যানভেদ, নচেৎ একই দেবী কল্যাণদায়িণী ও মুক্তিস্বরূপিণী দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরে বঙ্গদেশে।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন : "সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে। আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস।...ঠাকুর পূজায় বসিলেন।...সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারিদ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন : 'হে বালে, হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর...' (শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩৬৫-৩৬৭)।

দেবী ষোড়শীই ললিতা, ত্রিপুরসুন্দরী বা শ্রীবিদ্যা। 'আনন্দলহরী' বা 'সৌন্দর্যলহরী'-স্তোত্র আচার্য শঙ্কর-রচিত এবং তার টীকা রচনা করেছেন শ্রীমদ্‌চ্যুতানন্দ ও শ্রীমল্লক্ষ্মীধর। আচার্য শঙ্কর বলেছেন—

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণ,
স্মরো হংস শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
... ... অমী হৃল্লেখাভিস্তিসৃভিরবসানেষু ঘটিতা
ভজন্তে বর্ণাস্তে তব জননী নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ।

টীকাকার লক্ষ্মীধর এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেছেন—

'ত্রিখণ্ডো মাতৃকামন্ত্রঃ সোমসূর্যানলাত্মকঃ' ।

ত্রিখণ্ড অর্থে সোম বা চন্দ্র, সূর্য ও অনল বা অগ্নি। মাতৃকামন্ত্রের এই তিনখণ্ড বা তিনটি ভাগ। সোম ও সূর্যের মধ্যে বিষ্ণুগ্রন্থিরূপ ভুবনেশ্বরীবীজ এবং এখানেই একাক্ষর চন্দ্রকলা বা চন্দ্রকলাখণ্ড : "অত্র শিবঃ শক্তিরিত্যাদিপরাঃ···। তথাহি ত্রিপুরসুন্দরীমন্ত্রস্য ষোড়শবর্ণাঃ।···সা চ পরা কলা চিদেকরসা। তস্যাঃ ছায়া বিশুদ্ধিচক্রে ষোড়শারে কলাত্মতয়া ভ্রমতীতি রহস্যম্···ষোড়শী-কলানাম—শকার-রেফ-ঈকার-বিন্দ্বাত্মা (বিষ্ণু-অন্তঃ) মন্ত্রঃ। এতস্যৈব বীজস্য নাম শ্রীবিদ্যা ইতি। ···তাশ্চ ষোড়শনিত্যাঃ শুক্লপ্রতিপদমারভ্য পৌর্ণমাস্যন্ততিথিরূপাঃ। কৃষ্ণপক্ষপ্রতিপদমারভ্য অমাবস্যান্ত-তিথিরূপাঃ এতা এব চন্দ্রকলাভিধানাঃ"। এভাবে প্রতিটি কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আছেন। যেমন "প্রতিপদি ত্রিপুরসুন্দরী-কলা ধ্যেয়া। দ্বিতীয়ায়াং কামেশ্বরী কলা।···সর্বাসু তিথিষু চিদ্রূপাখ্যা কলা ষোড়শী উপাস্যা। প্রতিপদি যা ত্রিপুরসুন্দরী কথিতা, সা চিদ্রূপাত্মিকা···"।

টীকাকার লক্ষ্মীধরের ও অচ্যুতানন্দের মতেও দেবী ষোড়শী একাক্ষরী ও নিত্যকলা। এই ষোড়শীদেবীই শ্রীবিদ্যা ও ত্রিপুরসুন্দরী। 'ত্রিপুর' অর্থে কামকলা বা কুলকুণ্ডলিনী থেকে ১ম, ২য় ও ৩য় বিচ্ছুরিত কলা বা নাদ পরা পশ্যন্তী ও মধ্যমা। এ'তিনটি পাদ (ত্রিপাদ) সূক্ষ্মতমা (পরা), সূক্ষ্মতরা (পশ্যন্তী) ও সূক্ষ্মা (মধ্যমা) অমৃতলোকে বা স্বর্গলোকে (দেহমধ্যে) অবস্থিত —'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। মর্ত্যে স্থূলনাদ বৈখরী। আচার্য ভাস্কররায় 'বরিবস্যারহস্য'-গ্রন্থে বলেছেন (পূর্বেও উল্লেখ করেছি) : "তস্য চানন্দরূপাংশ এব স্ফুরণং পরাহন্তা বিমর্শ পরা ললিতা ভট্টারিকা ত্রিপুরসুন্দরীত্যাদিপদৈর্ব্যবহ্রিয়তে"।

মোটকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীয় অসামান্যা ও অলোকসামান্যা পত্নী শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে যে ষোড়শী, শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরী মহাশক্তিরূপে অমাবস্যাতিথিতে পূজা করেছিলেন, তা থেকে মহাশক্তি ও মহাশিব—শক্তি ও ব্রহ্ম—শক্তি ও শক্তিমান—মায়া ও ব্রহ্ম (সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর) যে এক ও অভিন্ন একথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয়। তন্ত্রের পরিণামবাদ ও অদ্বৈত বেদান্তের বিবর্তবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার পরিপূরক ও পরমসহকারী, তবে বাদে বা মতবাদেই কেবল পৃথক ও দ্বৈত, কিন্তু চরমানুভূতিতে অপৃথক ও অদ্বৈত। আসলে দৃষ্টিভেদই মতানৈক্যের কারণ, অনুভূতির ক্ষেত্রে 'সব শিয়ালের এক রা'।

॥ ব্রহ্মের কারণত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব ॥

'ভামতী'-ভাষ্যের কল্পতরু-টীকাকার রামানন্দ সরস্বতী তাঁর 'বিষয়োপন্যাস'-গ্রন্থে ব্রহ্মের জন্মাদি-অধিকরণপ্রসঙ্গে লিখেছেন : "(পূর্বপক্ষ) নন্বু কিং ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণং ? ন চ যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তে কারণাদিকং ভবতি তদ্ব্রহ্মেতি ভাষ্যাৎ সর্বজ্ঞত্বং সর্বশক্তিত্বং বা স্বরূপমিতি বাচ্যম্।[৩]···অদ্রোচ্যতে। ব্রহ্মমাত্রে সামান্যে মিলিত্বা জগদুপাদানে ইত্যেকং মতম্···"। এখানে

৩। 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে সদানন্দ-যোগীন্দ্রসরস্বতী ঈশ্বরসম্পর্কে বলেছেন : "ঈশ্বরং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্টো-পাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্বজ্ঞত্ব-সর্বেশ্বরত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণবৎ অব্যক্তম্ অন্তর্যামী জগৎকারণম্ ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে, সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' (মুঃ উঃ ১।১।৯) ইতি শ্রুতেঃ"।

'ব্রহ্মমাত্রে জগদ্‌যোনী মায়া শক্ত্যাশ্রয়া' প্রভৃতি বিচারে বিভিন্ন দার্শনিকের মতবাদের উল্লেখ করা হয়েছে।

আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ'-গ্রন্থে জগৎকারণ ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরসম্পর্কে বিচার ক'রে ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্র, সংক্ষেপশারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকটার্থকার প্রভৃতির মতে ঈশ্বরের ঐ কারণত্ব ও সর্বজ্ঞতা-রূপ বিশেষণের বা উপাধির যৌক্তিকতাসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। বেদান্তস্মৃতিমঞ্জরীকারের 'জগৎকর্তৃত্ব ও সর্বজ্ঞত্ব'-রূপ সিদ্ধান্ত—'জগৎকর্তৃত্বসংসিদ্ধং সর্বজ্ঞত্বং সমর্থিতম্, ঈশ্বরস্য শাস্ত্রযোনিত্বাৎ…' বাক্যের উপর মন্তব্য ক'রে আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন: "অনেনৈব নিখিলপ্রপঞ্চরচনাকর্তৃভাবেনাঽর্থসিদ্ধং সর্বজ্ঞত্বং ব্রহ্মণঃ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) ইত্যধিকরণে বেদকর্তৃত্বেনাঽপি সমর্থিতম্। অথ কথং ব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্বং সঙ্গচ্ছতে। জীবাদন্তঃ-করণাভাবেনজ্ঞাতৃত্বস্যৈবাঽযোগাৎ?" অর্থাৎ জীবের যেমন অন্তঃকরণরূপ উপাধি থাকে, ঈশ্বরের তা কিন্তু নাই। তবে কীভাবে ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ—এ'কথা সঙ্গত হ'তে পারে? তার উত্তরে অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন: "অত্র সর্ববস্তুবিষয়সকলপ্রাণিধীবাসনাপরম্পরাজ্ঞানোপাধিক ঈশ্বরঃ। অতস্তস্য সর্ববিষয়বাসনাসাক্ষিতয়া সর্বজ্ঞত্বমিতি ভারতীতীর্থাদিপক্ষঃ প্রাগেব দর্শিতঃ। …সৃষ্টেঃ প্রাঙ্ মায়ায়াঃ সৃজ্যমাননিখিলপদার্থস্ফুরণরূপেণ জীবাদৃষ্টানুরোধেন বিবর্তমানত্বাৎ তৎসাক্ষিতয়া তদুপাধিকস্য ব্রহ্মণোঽপি তৎসাধকত্বসিদ্ধেঃ অনাগতবস্তুবিষয়বিজ্ঞানোপপত্তিরিতি সর্বজ্ঞত্বং সমর্থয়ন্তে"। অর্থাৎ নিখিল জীবের অদৃষ্ট ও জন্মবীজরূপ সংস্কারকে ধার ক'রে (সাহায্য নিয়ে) ব্রহ্ম (মায়াশবলিত সগুণব্রহ্ম) বিশ্ব ও জীব সৃষ্টি করেন। এ'সকল মতে ও বিচারে আলোকপাত করেছেন সর্বজ্ঞাত্মমুনি, ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুণীশ্বর, ব্রহ্মসিদ্ধিকার, ইষ্টসিদ্ধিকার, ব্রহ্মবিদ্যাভরণকার, মধুসূদন-সরস্বতী এবং আরও অনেকে। এ'সম্বন্ধে অপ্পয়দীক্ষিত 'বেদান্ত-কৌমুদী'-কারের সিদ্ধান্তের কথাও উল্লেখ ক'রে ব্রহ্মের সগুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম উপলক্ষিত নির্গুণব্রহ্মের কারণত্ব ও সর্বজ্ঞত্বোপচারও স্বীকার করেছেন। কিন্তু কৌমুদীকার বলেছেন: 'সর্ববিষয়জ্ঞানাত্মকমেব ব্রহ্ম, ন তু সর্বজ্ঞানকর্তৃত্বরূপং জ্ঞাতৃত্বমিতি';—অর্থাৎ কৌমুদীকারের মতে ঈশ্বরের জ্ঞাতৃত্ব না হয়ে জ্ঞানরূপত্বই সিদ্ধ হয় এবং ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর বলেছেন: 'জীবলিঙ্গ-মিত্যুক্তং ভাষ্যকারৈঃ। 'য সর্বজ্ঞঃ' ইত্যাদিশ্রুতিরপি তস্য (ঈশ্বরস্য) জ্ঞানরূপত্বাভিপ্রায়েণৈব যোজনীয়েতি'। কিন্তু আচার্য বাচস্পতিমিশ্র কৌমুদীকারের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন ক'রে ঈশ্বরকে 'সর্বজ্ঞত্ব'-বিশেষণ অর্থাৎ উপাধিযুক্ত বলেছেন। আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত তাঁর 'সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ'-গ্রন্থে বাচস্পতিমিশ্রের এ' কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "যদ্যপি ব্রহ্মস্বরূপচৈতন্যেনৈব স্বসংসৃষ্টসর্বাব-ভাসকত্ব্, তথাপি তস্য স্বরূপেণাঽকার্যত্বেঽপি দৃক্তাবচ্ছিন্নরূপেণ তু ব্রহ্মকার্যত্বাৎ। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ' ইতি জ্ঞানজনন- কর্তৃত্বশ্রুতেরপি ন কশ্চিদ্বিরোধ ইতি আচার্যবাচস্পতিমিশ্রাঃ"।

এ'সম্বন্ধে 'বালবোধিনী'-টীকাকার আপোদেব বলেছেন: 'অতঃ অজ্ঞানসমষ্টিঃ ঈশ্বরোপাধিঃ ইত্যর্থঃ'।

'বিষমনোরঞ্জনী'-টীকাকার রামভদ্র বলেছেন: 'পরমার্থত ব্রহ্ম অসঙ্গ ও মায়োত্তীর্ণ হলেও অধ্যাসজন্য বা মায়াজন্য সগুণব্রহ্মরূপে জগৎ ও সর্বজীবপ্রপঞ্চ নামে পরিচিত হন: 'পরমার্থতঃ অসঙ্গস্যাপি চৈতন্যস্য আধ্যাসিকসম্বন্ধসম্বন্ধাজ্ঞানদ্বারা সর্বাবভাসকত্বেন সর্বমর্যাদাধারকসত্তাস্ফূর্তত্বেন সর্বজীব-প্রবর্তকত্বেন চ লব্ধসর্বজ্ঞত্বাদিগুণকস্য…ভবতি'।

এ'সম্পর্কে কল্পতরুকার ও বিবরণোপন্যাসকার (একই) রামানন্দ সরস্বতীর বিচার যুক্তিসঙ্গত। তিনি 'বিবরণোপন্যাস'-গ্রন্থে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের অর্থ করতে গিয়ে দুটি প্রশ্নের উপস্থাপনা করেছেন : (১) একটি—মায়াই বিশ্বসৃষ্টির কারণ কি-না, (২) অন্যটি—ব্রহ্মই জগৎসৃষ্টির কারণ কি-না ? রামানন্দ সরস্বতী বলেছেন : "জন্মাদ্যস্য যতঃ। ব্রহ্মণি লক্ষণাভাবাৎ নিঃস্বরূপব্রহ্মবিচারো ন সম্ভবতীত্যাক্ষেপসঙ্গত্যাঽস্যাধিকরণস্য প্রবৃত্তিঃ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধলক্ষণবিচারাত্মকত্বাৎশ্রুতিসঙ্গতিঃ।...জন্মস্থিতিভঙ্গনিরূপিতং কারণত্ব-ত্রয়ং মিলিতমেবাদ্বিতীয়ব্রহ্মণো লক্ষণমিতি জ্ঞাপনার্থমিতি ক্রমঃ। প্রত্যেকং লক্ষণত্বে জন্ম-কারণাদঙ্গস্যেব স্থিতিকারণমিতি কারণস্য সত্যত্বজ্ঞানাৎ জগৎকারণানুবাদেন তত্ত্বমেতি ব্রহ্মত্ব-প্রতিপাদনমশক্যং স্যাদতঃ কারণস্য ব্রহ্মত্বানুকূললক্ষণসিদ্ধ্যর্থং যুক্ত এব সমাহারলিঙ্গনির্দেশঃ।..."

তিনি পুনরায় বলেছেন : "...ন চ মায়ায়া উপাদানত্বে ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ইয়তে ইতি কারণত্বং বিরুদ্ধমিতি বাচ্যম্"।...'ইন্দ্র'-শব্দে এখানে মঘবন-ইন্দ্র নন, ইন্দ্র ব্রহ্ম অর্থে সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর —যিনি মায়ার সাহায্যে বিশ্ববৈচিত্র্যের রূপ ধারণ করেন। সেজন্য সৃষ্টিপ্রক্রিয়া থাকায় জগৎকারণ ঈশ্বর বা ব্রহ্মই (সগুণব্রহ্মই) সিদ্ধ হয়। তিনি পুনরায় বলেছেন : "মায়া প্রজ্ঞা চ সংবিৎ চেতি বুদ্ধিপর্যায়েষ্বপি মায়াশব্দস্মরণাৎ। এতেন মায়াং তু ব্রহ্মস্বরূপ প্রজ্ঞাপ্রকৃতিং বিদ্যাদিতি শ্রুত্যর্থং ইতি ব্রহ্মৈবোপাদানমিতি নিরস্তম্। মায়িনং তু মহেশ্বরমিতি শ্রুতেশ্চ ন চৈতন্যং মায়া প্রকৃতৌ শক্তিশব্দঃ পরতন্ত্র্যোক্তৌ ন বিরুধ্যতে। অতএব শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ সত্য-মায়াশক্ত্যভিন্নং ব্রহ্মৈবোপাদানমিতি নাতিব্যাপ্তিরিতি নিরস্তম্।...অতোপাদানত্বস্য তুল্যত্বেঽপি চিদানন্দস্বরূপলক্ষণান্মায়াতো ব্রহ্মণো ভেদজ্ঞানম্"। পুনরায় এ'সম্বন্ধে প্রশ্ন যে, ব্রহ্ম বা মায়া বা সাংখ্যের প্রধান বিশ্বকারণ কিনা ? সেজন্য বলেছেন—"ব্রহ্ম মায়েতি—"

'ব্রহ্মমায়ে জগদ্‌যোনী মায়া শক্ত্যথবা মহৎ।
তস্যা যোনিস্তু মায়ৈব ব্রহ্মাধিষ্ঠানমিষ্যতে॥'

কিন্তু ব্রহ্ম নিজে নির্বিকার রূপ বা ভাব পরিত্যাগ না করেও—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা'—বিবর্তরূপে 'বিশ্বরূপ' ধারণ করেন—বলেছে গীতা ৪।৭—

'ব্রহ্মরূপাপরিত্যাগাদ্বিবর্তো জগদিষ্যতে।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়েঽসঙ্গে পরিণামো ন যুজ্যতে॥'

এ'ভাবে বিভিন্ন (জগৎকারণত্বসম্বন্ধে) বিচারের পর আচার্য রামানন্দ সরস্বতী কারিকায় বলেছেন যে, স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ ব্রহ্মই জগৎকারণ—

'যজ্জগৎকারণং তদ্ধি স্বপ্রকাশমনন্তকম্।
অনন্দরূপং ব্রহ্মেতি (পঞ্চমে বর্ণকে স্থিতম্)॥'

আচার্য রামানন্দ সরস্বতীর বক্তব্য যে, আনন্দরূপ ব্রহ্মই (সগুণ মায়াশবলিত ব্রহ্ম) ঈশ্বরই কারণ একথা শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়ও তাই।

মোটকথা : বিভিন্ন অদ্বৈতাচার্যদের বিচারপ্রণালী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত ভিন্ন ভিন্ন হলেও ব্রহ্ম যে জগৎ বা জীবজগৎ সৃষ্টি করেন, পালন করেন ও লয় বা ধ্বংস করেন বলতে

জন্মস্থিতিভঙ্গের কর্তা বা নিয়ন্তা—একথা স্বীকার করেছেন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই ১।১।২ ব্রহ্মসূত্রের উক্তি সমর্থন ক'রে। তবে নির্গুণ, সর্বাতীত বা মায়াতীত ব্রহ্মে ঐ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য উপপন্ন অর্থাৎ সঙ্গত হয় না, সুতরাং যে ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করেন, তিনি মূলাপ্রকৃতি বা মায়ার সাহায্যে এ'সকল কার্য করেন এবং তিনি মায়াশবলিত সগুণব্রহ্ম ঈশ্বর।[৪] তবে পারমার্থিকদৃষ্টির দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, সগুণব্রহ্মও নির্গুণব্রহ্মেরই অভিন্ন সত্তা, কিংবা বলা যায়, সগুণ-নির্গুণ-উপাধিদুটির অতীত বিশুদ্ধব্রহ্মচৈতন্যসত্তা—যিনি মহাচৈতন্যরূপে সর্বাবভাসক ও সর্বানুস্যূত, আবার সকল-কিছুর অতীত হয়েও সকল-কিছু, কেননা ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর সব অবস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক একথাই বলেছেন: 'তিনি (ব্রহ্ম) সকল-কিছুর অতীত কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে বোঝা যায় যে, এক ব্রহ্মই জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়ে আছেন, কেননা তাঁর সত্তা ব্যতিরেকে কোন-কিছুরই সত্তা নাই'।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতোই 'কল্পতরু'-টীকাকার ও 'বিবরণোপন্যাস'-(একই) গ্রন্থকার আচার্য রামানন্দ সরস্বতী 'অতএব শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ' প্রভৃতি ব'লে শক্তি ও শক্তিমান অর্থাৎ মায়াশক্তি ও ব্রহ্মের অভেদসত্তার কথা স্বীকার করেছেন। শক্তিমান ব্রহ্ম বলতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরকেই লক্ষ্য করেছেন, কেননা সর্বাতীত ও সর্বোপরম নির্গুণব্রহ্মে বা তুরীয়চৈতন্যে সাধারণভাবে মায়াসাহিত্যের কথা কল্পনা করা যায় না—যদিও আমরা বলেছি যে, চৈতন্যাংশে ও অনুস্যূতাংশে তুরীয়চৈতন্যের সঙ্গে অপরাপর চৈতন্যের মোটেই বিরোধ নাই, একমাত্র উপাধিভেদেই তাদের ভেদের প্রতীতি, কেননা উপাধির অর্থই সীমিত বা বিভাগ করা।

তবে অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টিবিষয়ে বা বৈচিত্র্যের কল্পনায় ঈশ্বরে বা সগুণব্রহ্মে শক্তিকল্পনা যুক্তিসঙ্গতই, সেজন্য উপনিষদে বলা হয়েছে: 'অবিদ্যানাম্নী পরমেশশক্তিঃ'। মায়া বা অবিদ্যা পরমেশ্বরের নিজেরই শক্তি। গীতার ৪।৬ শ্লোকেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই তত্ত্বের আভাস দিয়ে বলেছেন: 'সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া'। শ্রীধরস্বামী 'সম্ভবামি'-ক্রিয়ার অর্থ করেছেন: 'সম্যগ্‌প্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্যাদিশক্তৈব ভবামি। বিশুদ্ধোর্জিতসত্ত্বমূর্ত্যা স্বেচ্ছয়া

৪। (ক) 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্' (২।১।৩৩) সূত্রের ভাষ্যে: "ন চেয়ং পরমার্থবিষয়া সৃষ্টিশ্রুতিঃ, অবিদ্যাকল্পিতনামরূপব্যবহারগোচরত্বাৎ ব্রহ্মাত্মজীবপ্রতিপাদনপরত্বাচ্চেতোঽপি ন প্রস্তর্তব্যম্"—শঙ্করভাষ্য।

(খ) "উৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামপি···একত্বপ্রতিপাদনপরত্বাৎ। মৃদাদিদৃষ্টান্তৈর্হি সতোব্রহ্মণ একান্ত সত্যত্বম্, বিকারস্য অসত্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তোঽপ্যুৎপত্ত্যাদয়ো নোৎপত্ত্যাদিমত্বং ত্বধিতুমর্হন্তি।···এবমুৎপত্ত্যাদিশ্রুতীনামৈকাত্ম্যাবগমপরত্বাৎ নানেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ"। অর্থাৎ 'ন অনেকশক্তিযোগো ব্রহ্মণঃ'—ব্রহ্ম অনেক বা বিচিত্র শক্তিসম্পন্ন নন—একথা নির্গুণব্রহ্মকে উপলক্ষ্য ক'রে বলা হয়েছে, সগুণব্রহ্মকে নয়, কেননা নির্গুণব্রহ্ম নিত্যতৃপ্ত ও আপ্তকাম, সুতরাং তৃপ্ত ও স্বাধীন-স্বতন্ত্র না হলে তবে বিকারের ও বিচ্যুতির সম্ভাবনা। তাছাড়া সগুণব্রহ্ম নির্গুণেরই স্থিতরূপ হলেও মায়াসাথী, সুতরাং বিকৃতি ও বিবর্তনরূপ সৃষ্টি মায়াসম্বন্ধী সগুণব্রহ্মেই সম্ভব। শঙ্করের সিদ্ধান্তও তাই। সৃষ্টিশ্রুতি বা সৃষ্টিপরশ্রুতিবাক্য তাই ব্যবহারিকদৃষ্টির দিক থেকে সার্থক, পারমার্থিকদৃষ্টির দিক থেকে নয়।

অবতরামীত্যর্থঃ'। সেজন্য কর্মপারতন্ত্র্যরহিত মায়াধীশ ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম দেহদেহীভাবগ্রহণ ক'রে ('দেহবানিব') পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন (বিকারী ভবতি—'জাত ইব')। ঈশ্বরশক্তি মায়া বা অবিদ্যা[৫] অঘটনঘটনপটিয়সী ঈশ্বরশক্তি—যে শক্তি সর্ববীজময়ী অব্যক্তা-মহাপ্রকৃতি। এই মহাপ্রকৃতিরূপ মায়াশক্তির প্রভাবে ঈশ্বর বিশ্বসৃষ্টি করেন বলেই তিনি সগুণ বা সত্তাদিগুণযুক্ত ব্রহ্ম। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বক্তব্যও তাই 'শক্তিমান'-শব্দ ব্যবহার করার জন্য। পূর্বেই বলেছি যে, অদ্বৈতবেদান্তে সগুণব্রহ্মে ও নির্গুণব্রহ্মে গুণ থাকার ও না-থাকার জন্য নামে ও উপাধিতে পৃথক বলে অনুভূত হলেও অখণ্ডব্রহ্মের তাঁরা এপীঠ ও ওপীঠ—যেমন বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর (১ম, ২য়, ৩য় চৈতন্য)। উপাধিভেদে নাম-রূপে ও প্রতীয়মান সত্তারূপে তাঁরা পৃথক পৃথক ব'লে মনে হলেও চতুর্থ বা তুরীয় মায়োত্তীর্ণ ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে বস্তুত পৃথক নয়, কেননা বিশুদ্ধব্রহ্ম ঐ তিনটি উপাধিযুক্ত সত্তার মধ্যে এক ও অভিন্নভাবে অনুস্যূত-নিরপেক্ষ-সত্তা, আর অন্য তিনটি ব্রহ্মসত্তা উপাধিযুক্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবও মায়ার দুটি রূপ বা বিকাশের কথাও বলতেন এবং সে' দুটি রূপ বা বিকাশ হ'ল অবিদ্যা-মায়া ও বিদ্যা-মায়া—এক মায়ারই রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনানুভূতি ছিল একটু ভিন্ন রকমের, কেননা ভারতীয় দর্শনের সকল সাধনার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেও কোনটিকে তিনি বর্জন করেন নি, বরং সকলকেই অখণ্ড-অনুভূতিসূত্রে গ্রথিত ক'রে তাদের অপ্রাকৃত দিব্যান্তরে ও দিব্যমহিমায় উন্নীত ও মহিমান্বিত করেছিলেন। সেজন্যই বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ছিল সকল সাধনার অতীত হয়েও সকল সাধনার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত।

সঙ্ঘের স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ তাঁর সুচিন্তিত গ্রন্থ *Ramakrishna and Spiritual Renaissance*-গ্রন্থে এ'কথাই একটু ভিন্নভাবে প্রকাশ ক'রে লিখেছেন: "But Ramakrishna's outlook was different. Of course, he knew perfectly well, as much as his *guru*, that the universe was merely an appearance, beneath which lay the permanent substratum of the Reality. Yet instead of slighting this appearance like a traditional *jnáni*, he was all love and devotion towards it, perceiving in it a mysterious and majestic expression of Divinity. In and through everything about him he would feel the eternal presence of absolute Consciousness.

৫। মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন বিশেষ ক'রে 'ভামতী'-সম্প্রদায়ের (আচার্য বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি) বেদান্তীরা এবং আচার্য রামানুজ ও রামানুজ-প্রবর্তিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা, কিন্তু আচার্য শঙ্কর নিজে এবং 'বিবরণ'-সম্প্রদায়ের (আচার্য পদ্মপাদ প্রভৃতি) মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন না।

এ'সম্বন্ধে মায়া ও অবিদ্যায় আশ্রিত ঈশ্বর ও জীব-সম্বন্ধে 'সিদ্ধান্তলেশকার'-অপ্পয়দীক্ষিতের মতবাদ দ্রষ্টব্য।

What he would realize there, on the hights of the transcendental plane he would observe here, down below and all about him, under a mysterious garb of names and forms. Before his penetrating vision this garb appeared to be a perfectly transparent sheath, through which he saw like daylight the glory and splendour of the divine Immanence. And the mighty weaver of this wonderful garb, Miyā, was no other than his divine Mother Kali" (p. 85).

এই কালীই আদ্যাশক্তি মহামায়া—যিনি আবার শ্রীশ্রীচণ্ডীর 'যোগমায়া'। প্রকৃতপক্ষে এই মায়ার দুটি বিকাশ—অবিদ্যা-মায়া ও বিদ্যা-মায়া—একটি যেন বন্ধন করে ও অপরটি বন্ধন মুক্ত ক'রে; একটি আলো-আধারি সত্তা অন্ধকারেরই নামান্তর ও অপরটি আলোক। শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ এ'প্রসঙ্গেও একটি নূতন ও স্বতন্ত্র দৃষ্টির দ্বার উন্মুক্ত ক'রে বলেছেন : "But Ramakrishna realized that after one had put *avidyá-máyá* to flight, perceived one's identity with the supreme Brahman, and come back to the world of appearance, Māyā would appear altogether in a new role" (পূর্বগ্রন্থ, পৃঃ ৮৬)। কথাও তাই যে, এই কালী বা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীশ্রীভবতারিণী ছিলেন বিশ্বব্যাপক চিতিশক্তি—যে শক্তি সগুণব্রহ্মরূপে, আবার নির্গুণব্রহ্মরূপে এক ও অখণ্ড সত্তার চিরদিনই বিধৃত ও মহিমান্বিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই সত্তাই প্রত্যক্ষ করতেন জীবনে সর্বদা।

তার কারণ আর কিছুই নয়, নির্বিকল্পসমাধির বা ব্রহ্মানুভূতির আলোকে পূর্ণস্নাত হয়ে মানুষ যখন জীবনানুভূতির এক নূতন ও অপার্থিব স্তরে উন্নীত হয়। তখন মায়া বন্ধনের পরিবর্তের মুক্তির রূপ নিয়ে দিব্যজ্ঞানীর কাছে উপনীত হয়। শ্রদ্ধেয় স্বামী নির্বেদানন্দজী তাই বলেছেন : "Though the cosmic appearance' persisted in their view, it certainly had lost both its original meaning and value. It was no longer a pasture-land for the senses, and there was nothing in it to blind their eyes. It was a glorious manifestation of the same Divinity that they had realized in the *nirvikalpasamádhi*... The transcendental appeared to be immanent in the realm of relative existence. It was this aspect of the appearence that Ramakrishna designated as *vidyá-máyá*. It was another phase in the play of the divine Mother, the releasing phase of Her wonderful game, in which she made the liberated souls Her blessed and conscious instruments for releasing other souls from bondage" (পূর্বগ্রন্থ পৃঃ ৮০-৮১)। এ'অবস্থাকেই সাধক রামপ্রসাদ মুখে প্রকাশ করেছিলেন : 'কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, আমি ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি'।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধারে ছিলেন সমদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রহ্মবিজ্ঞানী, আবার ব্রহ্মময়ী কালীর আদরের সন্তান, সেজন্য অদ্বৈতবেদান্তের অনুভূতিকে চরম ও পরম বস্তু বলে গ্রহণ করলেও দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শক্তিবিশিষ্ট-অদ্বৈত, শিবাদ্বৈত, শব্দাদ্বৈত, রসাদ্বৈত—এই যেকোন মত বা মতবাদের তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন না, কেননা তিনি প্রত্যক্ষানুভূতির দৃষ্টিতে বুঝেছিলেন ও বলতেন মত, সাধন প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পথ সেই একই চরমলক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং সেজন্য তিনি সকল ধর্মমতের ও ধর্মসাধনের প্রসঙ্গ তিনি করতেন জ্ঞানজিজ্ঞাসু মানুষকে ধর্মানুভূতির পথে উদ্বীত করার জন্য।

গ্রন্থের শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, প্রথম ভাগে (১৩৮৬, পৃঃ ২০১) শ্রীরামকৃষ্ণদেবপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন—

॥ রামানুজ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ॥

"শ্রীরামকৃষ্ণ। আবার দু'থাক না নামলে কথা কইতে পারি না (এটি তাঁর সমাধিভূমি থেকে নামার বা বুথানের কথা)।

বেদান্ত—শঙ্কর যা বুঝিয়েছেন, তাও আছে, আবার রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে।

নরেন্দ্র। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ কি ?

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে)—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আছে—রামানুজের মত কিনা জীবজগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম। সব জড়িয়ে একটি।

"যেমন একটি বেল। খোলা আলাদা, বীজ আলাদা, শাঁস আলাদা একজন করেছিল। বেলটি কত ওজনের জানবার দরকার হয়েছিল। এখন শুধু শাঁস ওজন করলে কি বেলের ওজন পাওয়া যায় ? খোলা, বীচি, শাঁস সব একসঙ্গে ওজন করতে হবে। প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসটিই সার পদার্থ বলে বোধ হয়। তারপর বিচার ক'রে দেখে—যে বস্তুর শাঁস—সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি। আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয়। জীব নেতি, জগৎ নেতি—এইরূপ বিচার করতে হয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু। তারপর অনুভব হয়—যার শাঁস, তারই খোলা, বীচি,—যা থেকে ব্রহ্ম বলছো, তাই থেকে জীব-জগৎ। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। তাই রামানুজ বলতেন—জীবজগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। এরই নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ"।[৬]

৬। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর *Memoirs of Ramakrishna*-গ্রন্থে জ্ঞানীভক্তদের প্রসঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "The Jnani-Bhaktas maintain, says Sri Ramakrishna, that the Brahman is not to be considered as apart from the world (*jiva*), but *Isvara*, *jiva* and *jagat* these three come from one. three is one and one is three. 'Let us take a Bel-fruit. Let the shell, the seeds and the kernel be kept separate. Now suppose someone wished to know the weight of the fruit...The shell, the seeds and the kernel are weighed with a view to get the real weight of the Bel-fruit"...Here Sri Ramakrishna has farely represented the doctrine of *vishista-dvaita*, ...Because Sri Ramakrishna fully knows that all men are not of same taste and

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি প্রথমে অদ্বৈতে, তারপর তুলনামূলকদৃষ্টিতে বিশিষ্টাদ্বৈতে। এজন্য তিনি গোটা একটি বেলের উদাহরণ দিয়েছেন (১) অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বিচার ক'রে: "প্রথমে খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসই সার পদার্থ···"। বেদান্তদর্শনও বলে—'ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু'। ব্রহ্মই এক ও অদ্বিতীয় চরমতত্ত্ব—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। নেতি নেতি—এই বেদান্তবিচারের কথাও শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "খোলা নয়, বীচি নয়, শাঁসই সার পদার্থ"। জীব নয়, জগৎ নয়, ব্রহ্মই সার পদার্থ। কিন্তু এই বিচারের পর যখন প্রত্যক্ষানুভূতিতে 'ব্রহ্মই সব হয়েছেন' দেখা ও বোঝা যায়—'সর্বমিদং ব্রহ্ম', তখনই আবার জ্ঞান হয় জীব-জগৎ-সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি কি তিনি বা ব্রহ্ম ছাড়া? তিনি বা ব্রহ্ম যদি সব-কিছু হন, তবে সব থেকে আর কোন্ জিনিস বাদ দেওয়া সম্ভব। সেজন্য ব্রহ্মজ্ঞানীর সর্বাতীত অথচ সর্বাত্মক ব্যাপকদৃষ্টিতে এ'ভাবই প্রতিভাত হয় যে, এক ব্রহ্মই জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, তিনি বা ব্রহ্মসত্তা ছাড়া আর কোন প্রাণীর ও পদার্থেরই সত্তা নাই।

ঠিক এই সর্বাত্মক ব্যাপক (all-pervading) দৃষ্টির নিদর্শনেই বেদান্তে বলা হয়েছে 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞানং ভবতি'। আমরা পূর্বে আচার্য ভাস্করায়-রচিত 'বরিবস্যারহস্য'-গ্রন্থের ভাষ্যে উল্লেখ করেছি: 'অত্র একৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং শ্রুতাবুক্তম্' প্রভৃতি; অর্থাৎ এই উক্তির উল্লেখ ক'রে ব্যাখ্যা করেছি বেদান্তে সমন্বয়ীদৃষ্টির উদাহরণ। প্রশ্ন তাই যে, একটির সম্যক্‌জ্ঞানে বিশ্বের সকল-কিছুরই জ্ঞান অধিগত হয়। একথা কিভাবে সম্ভব হয়? অদ্বৈত-বেদান্তীরা এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন সকল মৃত্তিকানির্মিত দ্রব্যের মূল-উপাদান মৃত্তিকাসম্বন্ধে জ্ঞান হ'লে মৃত্তিকানির্মিত সকল দ্রব্য যে মৃত্তিকা থেকেই সৃষ্ট একথা বোঝা যায়; কিংবা সমস্ত সুবর্ণনির্মিত অলংকার ও পাত্রাদির মূল-উপাদান সুবর্ণসম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান হলে সকল সুবর্ণনির্মিত অলংকার ও পাত্রাদি যে সুবর্ণ থেকেই প্রস্তুত তা বোঝা যায়। তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলসত্তা ব্রহ্মসম্বন্ধে সম্যক্‌জ্ঞান হলে বিশ্বের সকল-কিছু প্রাণীর ও পদার্থের প্রাণসত্তা যে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মচৈতন্য এই তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হয়। সেজন্য 'একস্মিন্ বিজ্ঞাতে' বলতে একমাত্র সত্তা নিত্য ও শাশ্বত ব্রহ্মবস্তুর সম্যক্‌জ্ঞানে বা উপলব্ধিতে বিশ্বের সকল প্রাণীর ও পদার্থের প্রাণসত্তাসম্বন্ধেই সম্যক্‌জ্ঞান হয় এবং এই জ্ঞানের উপলব্ধিতে আর কোন সন্দেহ বা সংশয় থাকে না। সাধিক বা সর্বানুভূতির রহস্যকথাই তাই।

এই সর্বানুভূতির আলোকে আলোকিত হয়েই সর্বসংশয়াতীত শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "নেতি নেতি-বিচারে ব্রহ্মদর্শন বা অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি হলে তারপর "বিচার ক'রে (সেই ব্রহ্মজ্ঞানী) দেখে (যথার্থভাবে প্রত্যক্ষ করে) যে বস্তুর শাঁস, সেই বস্তুরই খোলা আর বীচি"। তখন সমগ্র বেলটি ওজন ক'রে জ্ঞানী দেখে যে, বেল থেকে খোলা ও শাঁস

---

temperament,...Similarly Sri Ramakrishna has supported the faiths and doctrines of the Dvaitava'dins, Saktiva'dins, Yogins and others." আসলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জানতেন সকল ধর্মের লক্ষ্য এক, সেজন্য সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সমান উদার দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা ছিল। সুতরাং বিশিষ্টা-দ্বৈতমত তিনি উদাহরণপ্রসঙ্গেই বলতেন, কিন্তু নিজে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ছিলেন না, ছিলেন অদ্বৈতবাদী।

বাদ দিলে বেলের যথার্থ ওজনে কম পড়ে। তেমনি ব্রহ্ম থেকে জীব-জগৎ বাদ দিলে সমগ্র-সত্তাসম্পন্ন ব্রহ্মের ওজনে কম পড়ে, আর 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দৃষ্টি, সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আগে নেতি নেতি ক'রে যেতে হয় (নেতি নেতি বিচার, সিদ্ধান্ত নয়)—জীব নেতি (জীব ব্রহ্ম নয়), জগৎ নেতি (জগৎ ব্রহ্ম নয়, কিন্তু জীব-জগতের অতীত ব্রহ্ম) এরূপ বিচার করতে হয়। এই বিচারে পরিশেষে নির্দিষ্ট হয় "ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু"। এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ অনুভবের বা যথার্থ-উপলব্ধির কথা বলেছেন: "তারপর ('নেতি নেতি'-রূপ অদ্বৈতবেদান্তবিচারের পর) অনুভব হয় (বাস্তব-উপলব্ধি হয়)—যাঁর (যে বেলের) বাঁস, তারই (সেই বেলেরই) খোলা, বীচি"। তাই "যা থেকে (যে পরিশুদ্ধ বিচারের সিদ্ধান্ত থেকে) ব্রহ্ম বলছো (ব্রহ্ম—এই তত্ত্ব নির্ধারণ ও উপলব্ধি করে জ্ঞানী সাধক) তাই থেকে (সেই নিষ্কর্ষ উপলব্ধির সিদ্ধান্ত থেকেই উপলব্ধি করে সাধক) জীব-জগৎ (জীব ও জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া নয়)। যাঁর নিত্য, তাঁরই লীলা" (যিনি স্বরূপে তুরীয়সত্তা নিয়ে বিরাজমান, তিনিই বিরূপে বা লীলাকর্মে অবতীর্ণ হয়ে লীলা করেন। সুতরাং পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য প্রত্যক্ষ-উপলব্ধি থাকা ও না-থাকার মধ্যে,—জ্ঞানে ও অজ্ঞানে। যতক্ষণ বিচার, ততক্ষণ অজ্ঞানের রাজ্য, আর উপলব্ধি হলেই জ্ঞানের সমুন্নত উদার-ক্ষেত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাই বলেছেন জলে ও তরঙ্গে—সূর্যে ও সূর্যকিরণে—মণিতে ও মণির জ্যোতিতে তাই ভেদ ততক্ষণ—যতক্ষণ বিচার থাকে ও উপলব্ধি না হয়, উপলব্ধির পর দু'য়ের মধ্যে ভেদ নাম-রূপে ও নির্বচনে বা ভাষায়। ছাদে সিঁড়ি দিয়ে যতক্ষণ উঠা যায়, ততক্ষণই যথার্থবস্তু বা উপাদানসম্বন্ধে অজ্ঞান, কিন্তু ছাদে ওঠার পর যখন দেখা যায় যে-চুণ-সুরকির উপাদান দিয়ে সিঁড়ি তৈরী হয়েছে, সেই একই চুণ-সুরকির উপাদান দিয়ে ছাদও তৈরী হয়েছে। উপাদান বা মাল-মশলা একই, তবে সৃষ্টিকর্মে, দৃষ্টিভেদে ও নামে-রূপে সিঁড়ি ও ছাদ পৃথক বা ভিন্ন ভিন্ন ব'লে অনুভূত। এখানেই অদ্বৈতজ্ঞানে বিশিষ্টাদ্বৈতের মূল্যায়ন এবং পার্থক্য ও অপার্থক্যের সার্থকনির্ণয়।

●

॥ অন্তরঙ্গপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কালীপ্রসাদ ক্রমে জুনাগড়ে উপস্থিত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, সেখানে নবাবের প্রাসাদে একজন উচ্চ-ইংরাজীশিক্ষিত বাঙালী-সন্ন্যাসী অতিথি হইয়া রহিয়াছেন। কালীপ্রসাদের মনে মনে একটু অনুমান হইয়াছিল যে, নিশ্চয়ই এই বাঙালী-সন্ন্যাসী হইবেন স্বামী বিবেকানন্দ। কিন্তু তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, ঐ সন্ন্যাসীর নাম সচ্চিদানন্দ এবং তাঁহার অনুমানও ঠিক হইয়াছিল। তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া একেবারে নবাবের প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ব্রাহ্মণ মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাটী গুজরাটী ও একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। সেইখানে উপস্থিত হইয়া কালীপ্রসাদ দেখিলেন যে, স্বামী সচ্চিদানন্দই স্বামী বিবেকানন্দ। অকস্মাৎ কালীপ্রসাদকে দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। একটি আশ্চর্য ঘটনা সংঘটিত হইল যে, ঐ সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ পণ্ডিত ত্রিপাটীর সহিত অদ্বৈতবেদান্তের বিষয়বস্তু লইয়া বিচার ও আলোচনা করিতেছিলেন। কালীপ্রসাদকে সম্মুখে পাইয়া স্বামী বিবেকানন্দ আনন্দাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ত্রিপাটী মহাশয়ের সহিত কালীপ্রসাদের পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং ত্রিপাটী মহাশয়ও উঠিয়া কালীপ্রসাদকে নমস্কার করিয়া সাদরে বসিতে আহ্বান করিলেন। কালীপ্রসাদ তাঁহার অনুরোধে আসন গ্রহণ করিলেন। তখন স্বামী বিবেকানন্দ কালীপ্রসাদকে দেখাইয়া ত্রিপাটী মহাশয়কে বলিলেন : "ইনি অদ্বৈতবেদান্তী, আমার গুরুভ্রাতা। এবার ইনিই আপনার সঙ্গে শাস্ত্রবিচার করবেন"। কালীপ্রসাদ বিস্মিত হইলেন। তখন তাঁহার পরিশ্রান্ত শরীর। বহুদিন পরে নরেন্দ্রনাথের সন্ধান পাইয়া আনন্দে অধীর ও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোথায় দুই দণ্ড নরেন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিবেন—না নরেন্দ্রনাথই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বসিলেন ত্রিপাটী মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রবিচার করিবার জন্য। যাহাহউক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শিরোধার্য করিয়া কালীপ্রসাদ পণ্ডিতজীর সহিত সংস্কৃতভাষায় অদ্বৈতবেদান্তের কয়েকটি তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। ত্রিপাটী মহাশয় পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া কালীপ্রসাদকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং কালীপ্রসাদ একে একে তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। অনর্গলভাবে সংস্কৃতভাষায়ই উভয়ের মধ্যে বিচার চলিতেছিল। নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) বিস্ময়ে অথচ প্রসন্নমুখে কালীপ্রসাদের সকল সিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তর শুনিতেছিল। কালীপ্রসাদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিপূর্ণ ও শুনিবার মতো ছিল। পণ্ডিতজী কালীপ্রসাদের সহিত বিচারে একান্তভাবে আনন্দিত হইয়া করজোড়ে প্রথমে কালীপ্রসাদকে ও পরে স্বামী বিবেকানন্দকে নমস্কার করিলেন। নরেন্দ্রনাথ তখন আনন্দে অধীর, তাঁহার চক্ষুদুইটি উজ্জ্বল ও মুখ প্রসন্ন। গুরুভাইয়ের কৃতকার্যতায় তাঁহার মুখ তখন গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

বিচার শেষ হইলে নরেন্দ্রনাথের সহিত কালীপ্রসাদ অশ্রুপূর্ণ নয়নে পুনরায় আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী দুইজনের আহারের ব্যবস্থা করিলেন। দুইজনে

আহারের পর বিশ্রাম করিবার জন্য একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে আলাপ-আলোচনার আর শেষ নাই। পরে স্বামী বিবেকানন্দকে একা পাইয়া বরাহনগর-মঠে কতকগুলি ঘটনার কথা খুলিয়া বলিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ সকল কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদকে দৃঢ়তার সহিত বলিলেন: "ভাই, তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান। তোমাদের লইয়াই মঠ। তোমরা মঠে না গেলে মঠ আর কাহার জন্য?" কথা এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ কালীপ্রসাদের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কালীপ্রসাদ নানাকারণে বরাহনগর-মঠে আর প্রত্যাবর্তন করিবেন না। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের আশ্বাসবাণী শুনিয়া কালীপ্রসাদের চক্ষু অশ্রুতে ভারাক্রান্ত হইল। নরেন্দ্রনাথ পুনরায় কালীপ্রসাদকে কাছে লইয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের সেই স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ এবং একান্তভাবে প্রেরণা লাভ করিয়া কালীপ্রসাদ আনন্দিত হইলেন। কালীপ্রসাদ নরেন্দ্রনাথের কথায় নিজের মত পরিবর্তন করিয়া বরাহনগর-মঠে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিবেন বলিলেন। নরেন্দ্রনাথও তাহাতে আশ্বস্ত ও আনন্দ হইয়াছিলেন।

●

॥ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

ডক্টর নীরদবরণ চক্রবর্তী

(১)

'ধর্ম' শব্দের নানা অর্থ। চলন্তিকা অভিধানে এই শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ দেওয়া আছে। সৎকর্ম, সদাচার, পুণ্যকর্ম, কর্তব্যকর্ম (অহিংসা পরমোধর্ম), সমাজহিতকর বিধি, Law; সুনীতি, morality'(ধর্মসংগত)। পরম্পরাগত সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বা বিহিত কর্ম (হিন্দুধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম)। সাম্প্রদায়িক উপাসনাপদ্ধতি, সংস্কার, রীতিনীতি এবং ঈশ্বর পরকাল ইত্যাদি বিষয়ক মত, religion সাধনার মার্গ। স্বভাব, গুণ, শক্তি (পশু—, কাল—, যুগ—। যৌবনের, অগ্নির—)।

আমরা যখন 'তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব' কথাটির ব্যবহার করছি তখন ধর্ম বলতে রিলিজিয়ন (riligion) বোঝাচ্ছি। কিন্তু, 'রিলিজিয়ন' শব্দের অর্থও যে সহজবোধ্য, এমন নয়। কারণ, পণ্ডিতেরা 'রিলিজিয়ন' বলতে সকলেই এক অর্থ বোঝেননি। তাঁরা 'রিলিজিয়ন'-এর নানা লক্ষণ (definition) দিয়েছেন। এই সমস্ত লক্ষণ আলোচনার মধ্যে প্রবেশ না করে বলছি—স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন—'Religion is realisation'; স্বামী অভেদানন্দও এই বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একমত যে, ধর্ম মানে উপলব্ধি। কিসের উপলব্ধি? প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই যে দেবত্ব বর্তমান তার উপলব্ধি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেবত্ব প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত, এই প্রচ্ছন্ন বা সুপ্ত দেবত্বকে প্রকট বা জাগ্রত করাই ধর্ম। (Religion is the mani-

festation of divinty already in man).[১] ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণের কথা বলি, তার অর্থও এই যে, যে-শক্তি মেরুদণ্ডের নিম্নাংশে বা মূলাধারে নিদ্রিতা তাকে জাগ্রত করে সহস্রার চক্রে শিবের সঙ্গে যুক্ত করা। অর্থাৎ জীব-শক্তিকে শিব-শক্তির সঙ্গে মিলন ঘটানো নয় কি? আসলে কি এখানে জীবের শিবোপলব্ধিই বা দেবত্ব-উপলব্ধিই লক্ষ্য নয়? একে আত্মোপলব্ধিও বলা হয়। কারণ একটি বিশেষ দৃষ্টিতে আত্মাই শিব বা ব্রহ্ম।

'রিলিজিয়ন' শব্দটি এসেছে 'রিলিজিয়ার' (Seligere) শব্দ থেকে, যার অর্থ মিলন (bond)। সাধারণতঃ মিলনের ক্ষেত্রে আমরা অন্ততঃ দুটি জিনিষ প্রত্যাশা করি। অর্থাৎ, মিলন অন্ততঃ দুয়ের মিলন। এইক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে—আমরা ওপরে ধর্মের যে ব্যাখ্যা দিয়েছি, তাতে কোন্ দুয়ের মিলন উদ্দিষ্ট? জীবের সঙ্গে শিবের বা জীবের সঙ্গে দেবতার মিলন যে লক্ষ্য, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। জীব নিজের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করে, এইত ধর্ম। প্রথমতঃ জীব মনে করে সে শিব থেকে বিচ্ছিন্ন, এরই নাম বন্ধন। পরে সাধনা বা চেষ্টা করে সে বোঝে যে সে শিবের সঙ্গে যুক্ত। আমরা এই সাধনাকে বলি ধর্ম সাধনা। পারিভাষিক ভাবে আমরা একে যোগ বলি। যোগ বা জীবের সঙ্গে শিবের মিলন আমাদের লক্ষ্য, আবার যে-সাধনায় বা উপায়ে আমরা এই যোগ বা মিলন লাভ করি, তাও যোগ, এর নাম যোগসাধনা। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, রাজযোগ সবই যোগ।

যোগের যে দুটি কোটি—জীব ও শিব বা জীব ও ব্রহ্ম, তাদের সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সাধকেরা দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত এবং অদ্বৈত এই তিন রকমের উপলব্ধির কথাই বলেছেন। সাধকের রুচি ও প্রকৃতিভেদে এই তিন রকমের উপলব্ধির কোন একটি হয়, আবার কোন সাধক অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারবলে দ্বৈত থেকে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং বিশিষ্টাদ্বৈত থেকে অদ্বৈত উপলব্ধিতে উপনীত হন এবং এই উপলব্ধিতে ক্রমোন্নতির ইঙ্গিতও পান। যাঁরা দ্বৈতবাদী সাধক (যেমন মধ্বাচার্য) তাঁরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে দ্বৈতভাব উপলব্ধি করেও তাদের মিলনেই সাধক-জীবনের সার্থকতা অনুভব করেন। আবার রামানুজের মত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা জীবকে ব্রহ্মের অংশ মনে করে তাদের মধ্যে মিলনানন্দ উপভোগ করেন। শঙ্করের মত অদ্বৈতবাদী জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভিন্নতা উপলব্ধি করেন। এই সমস্তই ধর্মীয় উপলব্ধি।

ধর্মের উপলব্ধি প্রসঙ্গে আমরা যে জীব ও শিব বা জীব ও ব্রহ্মের মিলন বা যোগের কথা বলেছি, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, শিব বা ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম বলতে বিরাট বোঝায়; তাঁকে অসীম, অনন্ত বা ভূমা বলতে দোষ নেই। সীমিত দেহবিশিষ্ট মানুষের মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা, বিরাট ও ভূমার বীজ। এই সম্ভাবনাকে পূর্ণতার সম্ভাবনাও বলা যায়। পূর্ণতা, বিরাট ও ভূমা বলতে আমরা যা বুঝি তা-ই শিব বা ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা বোঝান হয়েছে। সাধক তাঁর রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে ব্রহ্মকে সাকার রূপেও কল্পনা করেন, আবার নিরাকার ভাবেও

১। 'Being and becoming divine are the meaning of realisation'—স্বামী অভেদানন্দ : Vedanta towards Religion. উদ্বোধন অফিস।

উপলব্ধি করেন। সাকার সাধনার ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ শিব বা সগুণ ব্রহ্মের কথা বলা হয় আর নিরাকার নির্বিকল্পক অনুভবের ক্ষেত্রে বলা হয় নির্গুণ ব্রহ্মের কথা। ভূমার লিঙ্গভেদ নেই বলে ভূমাকে ব্রহ্মও বলা যায়, শক্তিও বলা যায়। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, যেমন অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি অভিন্ন। যে অগ্নির দাহিকা শক্তি নেই তাকে অগ্নি বলা নিরর্থক, আবার অগ্নিকে আশ্রয় না করে দাহিকা শক্তি থাকতে পারেনা।

মানুষের বিরাটত্ব, ভূমাত্ব বা বিশ্বভাব উপলব্ধির নামই ধর্মোপলব্ধি। মানুষের এই সম্ভাবনা আছে বলেই তার মর্যাদা আছে। এই মর্যাদার জন্যই মানুষের পক্ষে যে কোন কাজ করা সাজেনা। সেজন্যই তার কর্তব্যের প্রশ্ন ওঠে। এ কর্তব্য স্বাভাবিকভাবেই সৎকর্ম বা সদাচার হ'বে। কারণ অসৎকর্ম বা অসদাচার মানুষের মর্যাদার প্রতিকূল। আবার এজন্যই মানুষের পক্ষে বিধির প্রাসঙ্গিকতা। মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বভাবের জন্য সমাজহিতকর বিধি সে অনুসরণ করে। মানুষের বিরাটত্ব সে ভুলে আছে বলেই এই বিরাটত্ব উপলব্ধির সাধনা তাকে করতে হয় এবং তার নামই ধর্মসাধনা। আবার মানুষের বিরাটত্বের সঙ্গে তার যোগই তার সাধ্য। ভূমাত্বই মানুষের স্বরূপ, কারণ, ভূমাত্ব বাদ দিয়ে মানুষ মানুষ হ'তে পারেনা। এই স্বরূপকে স্বভাবও বলা যায়। এই আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, ধর্ম শব্দের অভিধানে যে সমস্ত অর্থ দেওয়া আছে তা পরস্পর যুক্ত, অযুক্ত নয়।

মানুষের বিরাটত্বকে কখনও কখনও মূল্যের ভাষায়ও (in the language of values) প্রকাশ করা হয়। তখন বলা হয়, সত্য, শিব ও সুন্দর উপলব্ধির সাধনা করে মানুষ। এইখানেই তার বিরাটত্ব। সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনার নামই ধর্মসাধনা। যাকে ব্রহ্ম বা শিব বা শক্তি বলা হয়েছে তাকে সত্য, শিব ও সুন্দর ও বলা যায়। তাতে শব্দান্তর হ'বে, অর্থান্তর হবেনা।

এইভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করলে তার সঙ্গে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সদাচরণ বা নীতি, বিশ্বভাব বা ভালবাসা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থে চিন্তা প্রভৃতি যুক্ত হতে বাধ্য এবং ফলে মানুষের যা কিছু উচ্চভাব, আচার ও অনুশীলন সবই ধর্মশব্দবাচ্য হ'বে।

ধর্ম তর্ক, বিতর্ক বা আলোচনা নয়, ধর্ম উপলব্ধি ও অনুশীলনের ব্যাপার। জীবনের সঙ্গে তার যোগ। ধর্ম ও ধর্মজীবন সমার্থক বললে কোন দোষ হয়না। সেজন্যই যথার্থ ধার্মীক যারা তারা ধর্মজীবন যাপন করেন, তর্ক বিতর্কে তাদের বিশেষ উৎসাহ নেই। তবে ধর্মোপলব্ধির ভিত্তিমূলে কতগুলো বিশ্বাস, তত্ত্ব বা ধ্যানধারণা বর্তমান। এই বিশ্বাস বা তত্ত্ব বা ধ্যানধারণাকে ধর্মতত্ত্ব বলে। ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করা যায়, বিচার করা যায় এবং তা আলোচনার বিষয়। সাধারণতঃ রিলিজিয়ন (ধর্ম), থিয়লজি (ধর্মবিজ্ঞান বা ধর্মবিদ্যা) এবং ফিলসফি অফ রিলিজিয়ন (ধর্মদর্শন)—এর মধ্যে পার্থক্য করা হয়। ধর্ম একান্তভাবেই ব্যবহারিক, জীবন-নিষ্ঠ, উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারের ব্যাপার। ধর্মবিজ্ঞান বা ধর্মবিদ্যা কোন বিশেষ ধর্মের (যেমন খ্রীষ্টধর্মের) মূলে যে সমস্ত বিশ্বাস বর্তমান তা বিশ্লেষণ করে এবং যুক্তি দিয়ে সমর্থন করার চেষ্টা করে। ফলে বিভিন্ন ধর্মের সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মবিজ্ঞান (থিয়লজি) থাকা সম্ভব।

একটি বিশিষ্ট ধর্মমতকে সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই সাধারণতঃ ধর্মবিজ্ঞানের উদ্ভব। খ্রীষ্টান ধর্মবিজ্ঞানই (Christian theology) সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বাইবেল সৃষ্টিতত্ত্বে (Book of Genesis) বলা হয়েছে আদিতে কিছুই ছিলনা, ঈশ্বর বললেন, জল হোক, জল হ'ল। এই মত অভিব্যক্তিবাদের (The theory of Evolution) বিরোধী। খ্রীষ্টান ধর্মবিজ্ঞানীরা তাঁদের মত কিভাবে অভিব্যক্তিবাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমর্থন করা যায় তার চেষ্টা করেছেন। এই রকম অন্যান্য খ্রীষ্টধর্ম স্বীকৃত বিশ্বাসের প্রকৃতি আলোচনা এবং তা সমর্থনের প্রয়াস খ্রীষ্টান ধর্মবিজ্ঞানে লক্ষ্য করা যায়। এইদিক থেকে ধর্মবিজ্ঞানকে বিশেষভাবে উদ্দেশ্যমূলক বলা যায়. কোন বিশেষ ধর্মবিশ্বাসকে সমর্থন করাই এই উদ্দেশ্য। ধর্মদর্শন কোন বিশেষ ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমস্ত ধর্মেরই সাধারণতঃ স্বীকৃত কতগুলো বিশ্বাস কতটা যুক্তিযুক্ত তা নিয়ে খোলা মনে আলোচনা ধর্মদর্শনে করা হয়। কোন মতকে সমর্থন করার কোন পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এই আলোচনায় নেই। আলোচনা করতে করতে যা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে, তাই সমর্থন করা হ'বে, এই হচ্ছে ধর্মদর্শনের আদর্শ। ঈশ্বর কি? ঈশ্বরের গুণাবলী কি? ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ঈশ্বরের সঙ্গে জীব ও জগতের সম্বন্ধ কি? ধর্মীয় জ্ঞানের প্রকৃতি কি? জগতে যে অকল্যাণ বা অমঙ্গল (evil) দেখা যায় তার সঙ্গে করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সঙ্গত হয় কি? অকল্যাণ কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এই জাতীয় কতগুলো সমস্যা কোন পূর্ব-বিশ্বাস না নিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ করা এবং সমাধানের চেষ্টা করা ধর্মদর্শনের কাজ। যদিও আমরা আদর্শ হিসেবে ধর্মদর্শনের কি করণীয় তা বললাম, কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যাঁরা ধর্মদর্শন করেন তাঁরা তাঁদের পূর্ববিশ্বাসকেই সমর্থন করার চেষ্টা করেন। যেমন, খ্রীষ্টানহেগেল খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এই মতই প্রচার করেছেন।

ধর্মবিজ্ঞান এবং ধর্মদর্শন দুই-ই ধর্মতত্ত্বালোচনা। ধর্মীয় উপলব্ধির প্রকৃতি এবং সম্ভব-ক্ষেত্রে উপলব্ধ বিষয়ের প্রকৃতি নিয়েও তত্ত্বালোচনা সম্ভব। বিভিন্ন ধর্মমতের (যেমন খ্রীষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতির) মূল বিশ্বাস বা ধ্যানধারণার তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব, এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের উপলব্ধির তুলনামূলক আলোচনাও করা যেতে পারে। আমরা এই জাতীয় আলোচনাকেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বলেছি। এই আলোচনায় যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে জ্ঞান হয়, তেমনি আবার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা এবং সম্প্রীতি বৃদ্ধির ভিত্তি পাওয়া যায় তা আমাদের এই আলোচনা শেষ পর্যন্ত অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে।

পাশ্চাত্যে গ্নষ্টিকদের (Gnostics) মধ্যে প্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। গ্নষ্টিকরা 'Rational Theology' নাম দিয়ে তৎকালে প্রচলিত এবং পরিচিত বিভিন্ন ধর্মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছিলেন। এ হচ্ছে খ্রীষ্টজন্মের প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যেকার ব্যাপার। তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে নিও-প্লেটোনিষ্টরাও (Neo-Platonist) তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ধারা অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মই একমাত্র ধর্ম এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হ'ল। ফলে তখন

থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার আর কারও কোন উৎসাহ দেখা গেলনা। মধ্যযুগে পাশ্চাত্য দেশগুলোতে খ্রীষ্টধর্মের একচ্ছত্র প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা ছিল বলে কেউ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আগ্রহী ছিলনা। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনা পুনরারম্ভ হ'ল। স্যার এডোয়ার্ড টাইলর (Sir Edward Tylor) 'Researches into the Early History of Mankind'-গ্রন্থে এই আলোচনা সন্নিবেশ করেন।

(২)

আমাদের দেশে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায়। পারসী ভাষায় লেখা তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদুদ্দিন 'Tuhfat-ul-Muwahiduddin'-গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনামূলক আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেন, একেশ্বরবাদই সর্বধর্মের সার কথা, অন্য যা কিছু তা সবই দেশাচার, লোকাচার এবং বিভিন্ন সংস্কারের বিষময় ফল। এই গ্রন্থের ভূমিকা আরবীতে লেখা। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ এখনও পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তিনি 'The Discussions on Various Religions' নামে আর একটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থটি এখন আর পাওয়া যায়না। তবে শোনা যায় যে, এই গ্রন্থে রামমোহন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বাহ্য আচার অনুষ্ঠানের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন এবং ধর্মের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে সমস্ত ধর্মেরই মূলবাণী যে এক (একেশ্বরের স্বীকৃতি এবং তাঁর উপাসনা) এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করেই রামমোহন নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাকে সার্বজনীন ধর্ম (Universal Religion) রূপে প্রচার করেছিলেন। রামমোহনের মতে তিনি যে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার করেছিলেন তা সার্বজনীন ধর্ম এবং সমস্ত ধর্মের সার কথাই তিনি তাতে গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কোলেট রচিত রামমোহনের জীবনী থেকে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা যায়। রামমোহন ইংল্যাণ্ডে যাওয়ার প্রাক্কালে বাবু নন্দকিশোর বসুকে বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত ধর্মাবলম্বীরাই তাঁকে সধর্মী বলে মনে করবেন। মুসলমানেরা তাঁকে বলবেন মুসলমান, হিন্দুরা তাঁকে বলবেন বেদান্তী হিন্দু এবং খ্রীষ্টানেরা বলবেন খ্রীষ্টান।[২] আর একদিন তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ ধর্ম কোন্‌টি ? রামমোহন জবাবে বলেছিলেন, বিভিন্ন গরু যেমন একই রকম সাদা দুধ দেয়, তেমনি বিভিন্ন ধর্ম একই অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তাদের মত ভিন্ন, কিন্তু তাঁরা একই উদ্দেশ্যে ধাবিত হ'ন।[৩]

আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শ্রীরামকৃষ্ণের শততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত ধর্ম সম্মেলনে (Parliament of Religions) কোলকাতার সভাপতির ভাষণে রামমোহন, কেশবচন্দ্র এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শের একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনা আমাদের আলোচ্যক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক। স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের

২। Collet : Raja Rammohan Roy, edited by D. K. Biswas and P. C. Ganguly, (p. 369-70).

৩। উদ্ধৃত, ৩৩ পৃষ্ঠা।

অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদ। তাঁর প্রখ্যাত গুরুভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি সর্বধর্মসমন্বয় প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং বিভিন্ন ধর্মমত প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আচার্য শীলের মতে রামমোহন বিভিন্ন ধর্মমতের সারাংশ গ্রহণ করে এবং অসার অংশ পরিত্যাগ করে সর্বধর্মের সমন্বয় বা মিল প্রদর্শন করেছিলেন। বিভিন্ন ধর্মমত যদি হয় বিভিন্ন ফুল তবে রামমোহন এই সমস্ত ফুলের নির্যাস একেশ্বরবাদ, এমত প্রচার করেছিলেন। কিন্তু, ফুলের যে জীবন্তভাব নির্যাসে সে জীবন্তভাব নেই বলে, এই সমন্বয়েও জীবন নেই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন বিভিন্ন ধর্মপুষ্পবৃক্ষ থেকে বিভিন্ন পুষ্প আহরণ করে একটি সুন্দর ফুলের তোড়া তৈরী করেছিলেন। খ্রীষ্টান ধর্ম থেকে সমবেত প্রার্থনা, বাইবেল পাঠের মত বেদ উপনিষদ পাঠ, হিন্দুধর্মের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্র প্রভৃতি গ্রহণ করে তাদের সমাহারে কেশবচন্দ্র এক সমন্বিত ধর্ম (eclectic religian) প্রচার করেছিলেন। কিন্তু, বিভিন্ন ফুলের গাছ থেকে তুলে আনা ফুলে যেমন স্বাভাবিক বিকাশ আশা করা যায় না, এই ধর্মেও স্বাভাবিক বিকাশ ছিলনা। ফুলের তোড়া নানা রঙের ও গন্ধের মতই সমাহার হোক্ না কেন, তা শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। এই সমন্বিত ধর্মও প্রাণাভাবে বাঁচেনি। কিন্তু, শ্রীরামকৃষ্ণ যে ধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন তাতে রামমোহনের বিভিন্ন ধর্মমতের সারাংশ গ্রহণের চেষ্টা নেই, কেশবচন্দ্রের মত বিভিন্ন ধর্মমতকে যান্ত্রিকভাবে একত্র করার ইচ্ছাও নেই। তিনি বিভিন্ন ধর্মমতগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভিন্ন পুষ্পবৃক্ষ বলেই মনে করেছেন এবং এদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বিকাশ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যেই বিশ্ববাসীর মুক্তির সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে বিভিন্ন ধর্মগুলো একই গন্তব্যে পৌঁছাবার বিভিন্ন পথ। তাঁর বিখ্যাত কথা 'যত মত তত পথ'। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব; ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তাই যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেননা। সকলের পেট সমান নয়। কার জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন। কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌঁছান যায়'।[৪] বক্তব্য স্পষ্ট, ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তিনি আরও বলেন, 'জ্ঞানীরা যাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তরা তাঁকেই ভগবান বলে। একই ব্রাহ্মণ। যখন পূজা করে, তার নাম পূজারী; যখন রাঁধে তখন রাঁধুনি বামুন। যে জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে, সে নেতি নেতি এই বিচার করে। ব্রহ্ম, এনয়, জীব নয়, জগৎ নয়—বিচার করতে করতে যখন মন স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; নামরূপ এ স্বপ্নবৎ; ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায়না; তিনি যে ব্যক্তি তাও বলবার যো নেই। জ্ঞানীরা এরূপ বলে —যেমন বেদান্তবাদীরা[৫]। ভক্তেরা কিন্তু সব অবস্থাই লয়। জাগ্রত অবস্থাও সত্য বলে—

৪। কথামৃত ২।১৮।১।

জগৎকে স্বপ্নবৎ বলেনা। ভক্তেরা বলে, এই জগৎ ভগবানের ঐশ্বর্য। আকাশ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পর্বত, জীব, জন্তু এসব ঈশ্বর করেছেন। তাঁরই ঐশ্বর্য। তিনি অন্তরে হৃদয়মধ্যে আবার বাহিরে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনি নিজে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব*—জীব জগৎ হয়েছেন। ভক্তের সাধ সে চিনি খায়, চিনি হতে ভালবাসেনা। ভক্তের ভাব কিরূপ জান? হে ভগবান, 'তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস', 'তুমি মা, আমি তোমার সন্তান' আবার 'তুমি আমার সন্তান, আমি তোমার পিতা বা মাতা', 'তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ।' ভক্ত এমন কথা বলতে ইচ্ছা করেনা যে 'আমিই ব্রহ্ম'। যোগীও পরমাত্মাকে সাক্ষাৎকার করতে চেষ্টা করে। উদ্দেশ্য—জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ। যোগী বিষয় থেকে মন কুড়িয়ে লয় ও পরমাত্মাতে মন স্থির করতে চেষ্টা করে। তাই প্রথম অবস্থায় নির্জনে স্থির আসনে অনন্ত মন হয়ে ধ্যান চিন্তা করে। কিন্তু একই বস্তু। নাম ভেদমাত্র। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা, তিনিই ভগবান। ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, ভক্তের ভগবান।[৫]

শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলেন, "যেমন 'জল', 'water', 'পানি'। এক পুকুরে তিন চার ঘাট; একঘাটে হিন্দুরা জল খায়, তারা বলে 'জল'। একঘাটে মুসলমানেরা জল খায়, তারা বলে 'পানি'। আর একঘাটে ইংরেজেরা জল খায়, তারা বলে 'water'। তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ। তাঁকে কেউ বলছে 'আল্লা', কেউ 'God', কেউ বলছে 'ব্রহ্ম', কেউ 'কালী'; কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা"।[৬]

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে, শ্রীরামকৃষ্ণ রামমোহন বা কেশবচন্দ্রের মত পুঁথি পড়া পণ্ডিত ছিলেন না। রামমোহন বা কেশবচন্দ্র বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ চর্চা করে বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যদিও নিরক্ষর ছিলেন না, কারণ তাঁর সাক্ষর দেখতে পাওয়া যায় এবং কামারপুকুরে এখনও একটি পুঁথি তাঁর হাতে নকল করা বলে দেখান হয়, তবু তিনি শাস্ত্রপাঠ করে বিভিন্ন ধর্মমতের তুলনা করেননি। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে কোন বই লেখেননি, তিনি ভক্তদের যে সমস্ত উপদেশ দিতেন তা 'শ্রীম' কথামৃতে লিপিবদ্ধ করেছেন। আমরা কথামৃত পাঠ করে তাঁর বক্তব্য জানতে পারি। তাঁরই অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও তাঁর নিহিতার্থ বিষয়ে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের আর একজন অন্তরঙ্গপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ বিরচিত 'Memoirs of Ramakrishna' সমান প্রামাণ্য। অক্ষয়কুমার সেন বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'ও নির্ভরযোগ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ যা কিছু বলেছেন সবই তাঁর নিজের উপলব্ধির ভিত্তিতে। তিনি নিজেই বলেছেন—'আমার সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল,—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর—তাঁর কাছে সকলই আসছে, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে'।[৭]

* এখানে বেদান্তবাদী বলতে অদ্বৈতবাদী বোঝান হয়েছে।

৫। কথামৃত ১।১।৩।

৬। ঐ ১।১।৪।

৭। ঐ ৩।৩।১।

এডুইন এ, বার্ট (Edwin A. Burtt) তাঁর 'Types of Religious Phillosophy'-গ্রন্থে 'Method in Religious Phillosophy—The Role of Faith' অধ্যায়ে (৪৪৮—৪৫৮ পৃষ্ঠা), শাস্ত্র, উপলব্ধি, যুক্তি ও ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার পদ্ধতির (Authoritarian Method, Intuitive Method, Rationalist Method এবং Empirical Method) উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় জ্ঞানলাভের এইগুলো হ'ল বিভিন্ন পদ্ধতি। শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে ধর্মীয় জ্ঞানলাভ হতে পারে, একে বলে শাস্ত্র-পদ্ধতি Authoritarian Method। মিষ্টিক সাধক উপলব্ধির মধ্যে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তাকে বলে উপলব্ধির পদ্ধতি বা Intuitive Method আবার কেউ কেউ বিচারবুদ্ধি দিয়ে ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারেন, তাকে বলে যুক্তি-পদ্ধতি বা Rationalist Method, আর যদি ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতায় এই প্রসঙ্গে কিছু জানা যায় তবে তা হবে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার পদ্ধতি Empirical Method, আমাদের মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ যে পদ্ধতিতে সর্বধর্মসমন্বয়ের সত্য জেনেছিলেন তা হ'ল উপলব্ধির পদ্ধতি বা Intuitive Method. তিনি নিজ উপলব্ধিতেই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদদের অন্যতম স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর বাণী অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে চিকাগো ধর্মমহাসভায় 'শিবমহিম্নঃস্তোত্রম' থেকে বলেছিলেন—'রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব'। বিভিন্ন নদী যেমন ঋজু কুটিল নানা পথ দিয়ে একই সমুদ্রে মিলিত হয় তেমনি বিচিত্ররুচি মানুষেরও একই গম্যস্থান। বিভিন্ন রুচি অনুসারে মানুষ বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণ করে এবং সমস্ত ধর্মপথে অগ্রসর হয়েই অমৃতত্ব আস্বাদন হয়। স্বয়ং ভগবান গীতায় বলেছেন 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ' (হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে, আমি তাকে সেভাবেই অনুগ্রহ করি। মানুষ যে পথই অনুসরণ করুক না কেন, আমাতেই পৌছবে)। সেদিন বিবেকানন্দ আরও বলেছিলেন, খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হ'তে হবেনা, অথবা হিন্দু বা বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হ'তে হবেনা---প্রত্যেক ধর্ম স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুসারে বর্ধিত হ'বে। যা দরকার তা হ'ল সততা ও আন্তরিকতা। সৎ হিন্দু, সৎ বৌদ্ধ এবং সৎ খ্রীষ্টান সকলেই উন্নতচরিত্রের ব্যক্তি। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা থাকলে যে কোন ধর্মপথেই অমৃতত্বলাভ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'দেখ, অমৃত সাগরে যাবার অনন্ত পথ। যে কোন প্রকারে এ সাগরে পড়তে পারলেই হ'ল। মনে কর অমৃতের একটি কুণ্ড আছে। কোন রকমে এই অমৃত একটু মুখে পড়লেই অমর হ'বে ; তা তুমি নিজে ঝাঁপ দিয়েই পড় বা সিঁড়িতে আস্তে আস্তে নেমে একটু খাও, বা কেউ তোমাকে ধাক্কা মেরে ফেলেই দিক। একই ফল। একটু অমৃতের আস্বাদন করলেই অমর হবে'।[৮]

শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে বিভিন্ন ধর্মমত অমৃতত্বলাভের বিভিন্ন পথ। মানুষের রুচি, প্রকৃতি ভিন্ন। এই ভিন্নতা অনুসারেই মানুষ বিভিন্ন পথ অনুসরণ করে। তারা একই পথের যাত্রী

---

* প্রকৃতি, মন, অহঙ্কার, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এবং পঞ্চমহাভূত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

৮। কথামৃত ১।১১।৪।

না হলেও লক্ষ্য তাদের এক। নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যদি থাকে তবে সিদ্ধি বা লক্ষ্যপ্রাপ্তি তাদের পক্ষে অনিবার্য। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতের যে অবিরোধ প্রদর্শন করেছেন তা তাঁর 'সর্বধর্মসমন্বয়' নামে প্রসিদ্ধ। সমন্বয় বলতে এখানে সমুচ্চয় বা সমাহার বোঝান হয়নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভিন্ন ধর্মমতগুলোকে একত্র করে কোন নূতন ধর্ম প্রচার করার চেষ্টা করেননি। তাঁর বক্তব্য মোগল সম্রাট আকবর প্রচারিত দীন ইলাহি ধর্মমতের মত নয়। দীন ইলাহি ধর্মমতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মকে একত্র করার চেষ্টা ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে ও জগতে বৈচিত্র্য স্বীকার করেছেন। ধর্মজীবন ও মানুষের সাধারণ জীবনের বৈচিত্র্য বিচ্যুত নয়। তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন ধর্মমতে পথরূপে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে ঐক্য বর্তমান।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী অভেদানন্দ উভয়ই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথাই বিশেষ ভাবে বলেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন—'Unity in Variety is the plan of the Universe. We are all men and yet we are all distinct from one another...'.[৯] বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই এই জগতের পরিকল্পনার ভিত্তি। আমরা সকলেই মানুষ, কিন্তু আমরা একজন আর একজন থেকে ভিন্ন। তিনি আরও বলেন: 'What then do I mean by the ideal of a Universal Religion? I do not mean any one Universal Philosophy, or any one Universal Mythology, or any one Universal Ritual, held alike by all; for I know that this world must go on working, wheel within wheel, this intricate mass of machinery, most complex, most wonderful. What can we do then? We can make it run smoothly, we can lessen the friction, we can grease the wheels as it were. How? By recognising the natural necessity of variation. Just as we have recognised unity by our very nature, so we must also recognise variation. We must learn that truth may be expressed in a hundred thousand ways and that each of these ways is true as far as it goes. We must learn that the same thing can be viewed from a hundred different standpoints and yet be the samething'.[১০] সার্বজনীন ধর্মের আদর্শ বিভিন্ন ধর্মমতের বৈচিত্র্য স্বীকার করেই পেতে হ'বে। মনে রাখতে হ'বে, সত্য বিচিত্রভাবে প্রকাশিত হতে পারে এবং সব প্রকাশই সত্য। আমাদের শিখতে হবে যে, একই বস্তুকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যায়, কিন্তু সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই একই বস্তুকে দেখা যাচ্ছে।

৯। Selection from Swami Vivekananda: The Ideal of Universal Religion. ১৬২ পৃষ্ঠা।

১০। ঐ ১৬৩ পৃষ্ঠা।

স্বামী অভেদানন্দ 'Vedanta towards Religion'-গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ধর্মমতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'Where is the harmony? How can we find peace? Harmony and peace will come only by seeing the unity in variety religions.' বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সামঞ্জস্য ও শান্তিবিধান তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের উপলব্ধিতেই সম্ভব। তবে মনে রাখতে হ'বে, সত্য এক ও অদ্বিতীয়।

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(পাঁচ)

ইন্দ্রিয়ের অঞ্জলিতে সব সুখ আহরণ করা যায় না। কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়। "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"—"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি—তাহারই খানিক" পরশপাথরলোভী মনিকরের জীবন শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা করে। এবং এর নামই জীবন। বৃহত্তর অর্থেও। প্রত্যহের জীবনে এত প্রয়োজনীয় স্বর্ণ-শস্য-প্রজার-পশুর দায়ভাগ তাও মানুষকে ত্যাগ করে যেতে হয়। বস্তুর সমগ্র সঞ্চয় পিছনে ফেলে মানুষকে এগিয়ে যেতে হয় অন্য এক অনন্ত আনন্দের সন্ধানে। এবং এমনি করেই সর্বস্ব ত্যাগের মধ্য দিয়েই ছোট আমি রূপান্তরিত হয় বৃহৎ আমিতে। এবং এভাবেই জীবন থেকে জীবনাতীতের পথে শুরু হয় মানবাত্মার পথ-পরিক্রমা। "রণ রক্ত সকলতা সত্য, তবু শেষ সত্য নয়"—একালের আধুনিক কবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় ভারতবর্ষের শাশ্বত ঘোষণা। একমাত্র ক্ষুদ্র অহম্‌কে প্রসারিত বিশ্ব-অস্তিত্বে রূপান্তরিত করাই বেঁচে থাকার পথ মহা জীবনের পথ। ক্ষুদ্র খণ্ড অহম্‌বোধকে বিশ্বৈক্যবোধে মিলিয়ে দেয়া। এবং বলাবাহুল্য, প্রেমই হচ্ছে এ পথের একমাত্র পাথেয়। "হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন। ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল? দাও আর কিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল। অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিন্দুমাত্র, 'দাও, দাও' যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান।" বিশ্বের জন্য হৃদয় প্রসারিত করে—ভালোবাসার উদ্গতির (sublimation) পথেই পরম শান্তি লাভ সম্ভব। ভারতদর্শনে এই হল জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভের একমাত্র পথ। সেবাধর্ম ও ভালোবাসার কথা ইউরোপীয় দর্শনে এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মেও আছে। "Love thy neighbour"—একথা খ্রীষ্টধর্মেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত। কিন্তু কেন ভালোবাসব? Expansion is life and contraction is sin—তত্ত্ব হিসাবে একথা অনেকেরই জানা। কিন্তু এই expansion-এর—এই প্রসারিত ভালোবাসাকে হৃদয়ে

পালন করতে হবে কেন? কেন জীবনের অঙ্গীভূত বলে গ্রহণ করতে হবে? তার বৈজ্ঞানিক কারণ ভারতবর্ষ এবং বিশেষ করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ একালের উপযোগী করে প্রচার করে গেছেন। তুমি আমার স্বজন, দলের লোক; তোমার স্বার্থ আমার স্বার্থ এক। অতএব তোমাকে আমি নিশ্চয়ই ভালোবাসব। উত্তম কথা। কিন্তু কাল যখন মত-পার্থক্য হবে, আমার দল তুমি ত্যাগ করে যাবে, ঘটবে স্বার্থের সংঘাত—তখন কী হবে। বাস্তবের ঘটনা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে তখন আর এই ভালোবাসা বাঁচিয়ে রাখা যায় না। স্বার্থ বা তথাকথিত দলীয় চেতনার যূপকাষ্ঠে ভালোবাসা-প্রীতি-স্নেহ প্রভৃতি মানবিক উজ্জ্বল অনুভবগুলির ঘটে অপমৃত্যু। সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চেই শুধু নয়, জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানবিকতার সম্পূর্ণ নির্বাসন। একমাত্র সকলের মধ্যে সেই 'এক'-এর ঐক্য অনুভবের মধ্য দিয়ে—প্রতিটি হৃদয়ে সেই অখণ্ড অনন্ত পরম চেতনার অধিবাসনা মেনে নিলে—ভালোবাসাকে অতি সহজেই বিশ্বযোগে রূপান্তরণ সম্ভব হয়। সর্বত্রই সেই অখণ্ড অস্তির (supreme consciousness) আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করলে তখন আর বিভেদবোধ থাকে না। সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটে অবসান। এই ছোট আমি বা ক্ষুদ্র অস্মিতাকে প্রসারিত করে দেখলে তখন সকলেই আমার একান্ত আপন হয়ে যায়। সর্বত্র সকল হৃদয়ে তো আমারই প্রসারিত রূপ মাত্র। এই বৃহৎ বোধে অধিত হলে তখন সকলের জন্যই ভালোবাসাকে প্রসারিত করা যায়। কাকে দ্বেষ করব? কাকে মারব? সর্বত্রই তো আমারই প্রসারিত বিশ্বরূপ। এরই নাম কর্মে পরিণত বেদান্ত (practical Vedanta)। বনের বেদান্তকে ঘরে নিয়ে আসা। ভারতবর্ষের মাটিতে একদিন এই জীবন-সাধনা সত্য হয়ে উঠেছিল বলেই এখানে প্রত্যহের ব্যবহারিক জীবনেও মতান্তর মানে কোনো ক্ষেত্রেই মনান্তরের অস্তিত্ব ছিল না। অথচ আজ আমরা যখন ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে পরধর্মকেই স্বধর্ম বলে গ্রহণ করেছি, Politics এর বিশল্যকরণী দিয়েই সব সমস্যার সমাধানে উদ্যত হয়েছি,—তখন চারিদিকে চেয়ে দেখছি মতান্তর মানে আজ আর শুধু মনান্তর মাত্র নয়, একেবারে দেহান্তর ঘটে যাচ্ছে বিরুদ্ধপক্ষের, ভিন্ন মতাবলম্বীর। আমি যা ভেবেছি, আমি যা করেছি তাই একমাত্র সত্য—আর সব মিথ্যা, ভ্রান্ত এই অসহিষ্ণু মতবাদের উপরই আজকের জনসমাজ প্রতিষ্ঠিত। অথচ একথা কে না জানে পরমতসহিষ্ণুতা, পরধর্ম এবং অন্যের মতবাদের প্রসঙ্গে শ্রদ্ধা পোষণ করাই যথার্থ মানবধর্ম। মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিনা রক্তপাতে কোনো সমাধানে পৌঁছায়—পৌঁছাতে পারে। গায়ের জোরে কিংবা বন্দুকের নলের সাহায্যে জীবন সমস্যার সমাধানের পথ কখনোই মানবিক কৃত্য হতে পারেনা। ইতিহাস অন্ততঃ এই শিক্ষাই আমাদের দিয়েছে যে একমাত্র সহিষ্ণুতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মধ্য দিয়েই সভ্যতার ধারাবাহিকতা এগিয়ে চলেছে ক্ষুদ্র সত্য থেকে বৃহত্তর সত্যের অভিমুখে। ধনতন্ত্র হোক আর সমাজতন্ত্র হোক, আদর্শ মানবসমাজের যে কল্পনা করা হয়েছে সেখানে কিন্তু police face এর অস্তিত্ব নেই; মানুষের প্রতি মানুষের কল্যাণবোধ, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার উপরই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত সেই আদর্শ, সাম্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-সমাজ-ব্যবস্থা। বিশ্বরাষ্ট্র, বিশ্বশান্তি—

কিংবা বিশ্ব-মানব-সংহতি—যাই বলা যাক, সবারই পশ্চাতে কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকেই সবচেয়ে আগে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অথচ বাস্তবে কিন্তু দেশে বিদেশে আজ সম্পূর্ণ অন্য এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে সমগ্র মানবসমাজকে। ভারতবর্ষ কিন্তু তার সমাজে, রাষ্ট্রে, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জনসমাজে, কোথাও কোনো কারণে মানবিক মহৎ চেতনার উত্তরাধিকারকে বিসর্জন দেয় নি। সহযোগিতা-সহমর্মিতা, প্রীতি-প্রেম দিয়েই গড়ে উঠেছিল আমাদের দেশের সমন্বিত সমাজব্যবস্থা। তাই বৈদিক যুগ থেকে আমাদের কণ্ঠে মিলনের মহামন্ত্র উচ্চারিত। "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্। দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে॥ সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্। সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ সমানীব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥ সর্বত্র সকলের কাছে এই মহামিলনের ঐক্যসূত্রটি জ্ঞাত ছিল বলেই ভারতবর্ষ কারো প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করে না। শুধু পরমতসহিষ্ণুতা নয়, সকল মানুষকে সমানভাবে মানবিক মর্যাদায় গ্রহণ, এবং অপরের মত-পথের সঙ্গে নিজেদের মত-পথের পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনিময়ের জীবন-নীতি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে সহজাত এবং চিরকাল "এই দেবে আর নেবে মেলাবে মিলিবে"র বিশ্বৈক্যবোধ—বিশ্ব-সহযোগিতার আদর্শ সে গ্রহণ করে এসেছে। চিকাগো ধর্ম-সভার প্রথম দিনের বক্তৃতায়ই স্বামীজী শাশ্বত ভারতবর্ষের এই মহত্তম মানবিক আদর্শের কথা বিশ্ববাসীর কাছে ঘোষণা করলেন। "যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়া আসিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় ইংরেজী exclusion শব্দটি অনুবাদ করা যায় না, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলিয়া গৌরব বোধ করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়া আসিয়াছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি"। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পর অনেক বছর চলে গেছে। কিন্তু আজো পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদে আশ্রিত না হলে যেখানে থাকা সম্ভব নয়। এমন বহু দেশ আছে যেখানে বিশেষ একটি ধর্মাবলম্বী না হলে সে দেশে বসবাস করা সম্ভব নয়। খাওয়া পরার সুখসুবিধা এবং অন্যবিধ বস্তুসঞ্চয়ে এবং বিলাস উপকরণে সেসব দেশ যতই ঐশ্বর্যশালী হোক, সুস্থ সজ্ঞান মানবিকতার মানদণ্ডে ঐসব দেশের আদর্শ কখনো গ্রাহ্য হতে পারে না। যে tolerance ও acceptance এর কথা স্বামীজী বার বার বলেছেন তাছাড়া তো বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বরাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। বস্তুতঃ পক্ষে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত পরমতসহিষ্ণুতা ও পরধর্ম স্বীকৃতির সুসমাচারের উপরই আধুনিক বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের বনিয়াদ গড়ে উঠেছে, একথাটা এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের 'যত মত তত পথ' তত্ত্বের কথা বলছি—তাকেই বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘের foundation stone বলা যায়। এই বাণীখণ্ডটি কেবল ধর্ম বা অধ্যাত্ম জীবনের পথ প্রদর্শক মাত্র নয়—বিশ্ব-

মানবের পরম ঐক্যেরও মহান সনদ। এই কারণেই আচার্য বিনয় সরকার 'যত মত তত পথ'কে "one of the greatest democratic utterances" বলে উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে পরিপূর্ণ আলোচনা করা যাবে।

ভারতবর্ষের মাটিতে এই সহনশীলতা, পরমতসহিষ্ণুতা, নিরপেক্ষতা ন্যায়বিচার প্রভৃতি মানবিক গুণাবলীর যে এত উৎকর্ষ ও সর্বজনীন স্বীকৃতিলাভ ঘটেছিল তার কারণ আমাদের ভারতদর্শনে ঐ সর্বাস্তিবাদ। সর্বত্র, সকলের মধ্যে সেই এক-এর আবিষ্কার। অখণ্ড এক অদ্বয় চৈতন্যবোধের পরিব্যাপ্ত প্রসার লক্ষ্য করেছিলেন আমাদের দেশের প্রজ্ঞাবান ধ্যানী সাধকবৃন্দ এবং মেধাবী ঋষি-মুনি-ঋষিরা—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে। তাই সকলেই তাদের কাছে আপন জন। কেউ পর নয়। তাই জীবন ও জগৎ প্রসঙ্গে বিভিন্ন মতবাদ পোষণ করেও কখনো তাঁরা পরমতের প্রতি বৈরী ভাবাপন্ন হতে পারেন নি। কারণ তাঁরা এই মহত্তম সত্যে স্থিত ছিলেন: "য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ/নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো/ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" এই দার্শনিক উপলব্ধির শিকড়-সন্নিধি এত গভীরভাবে প্রোথিত ও পরিব্যাপ্ত ছিল জাতির মানসচৈতন্যের মর্মমূলে যে প্রভাবের জনজীবনেও ঘটেছিল তার অবাধ সংক্রমণ ও প্রতিফলন। এখানে শঙ্কর-মণ্ডনমিশ্র-উভয়ভারতীর বিশ্রুত কাহিনীটি উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। দ্বৈতবাদী গার্হস্থ্য ধর্মের পরম প্রবক্তা মহাপণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের খ্যাতি তখন ভারত-জোড়া। সন্ন্যাস ধর্মের পবিত্র প্রতিভূ অদ্বৈতবাদী শঙ্কর তখন বেরিয়েছেন ভারত-দিগ্বিজয়ে। বিজয়-প্রত্যাশায় দুজনের মধ্যে শুরু হল দার্শনিক তর্কযুদ্ধ। কিন্তু সমস্যা দাঁড়াল এই দুই মহাপণ্ডিতের তর্কযুদ্ধে বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করবেন কে? শেষপর্যন্ত মণ্ডন মিশ্রের বিদুষী ও সর্ব-শাস্ত্রবিদ্, সর্বকলা-পারঙ্গমা উভয়ভারতী আসীন হলেন বিচারকের সিংহাসনে। এবং সে ঐতিহাসিক বিচার-কাহিনীর কথা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পরম সম্পদ হয়ে আছে। স্বামী মণ্ডন মিশ্রের পরাজয় ঘোষণা করে উভয় ভারতী নেমে এলেন বিচারকের সিংহাসন ছেড়ে। এবং স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে অর্ধ পরাজয় স্বীকার করে আচার্য শঙ্করের সঙ্গে নিজেই শুরু করলেন আবার তর্কযুদ্ধ। এবং অতঃপর মণ্ডন-জায়া আজন্ম-তপস্বী আচার্য শঙ্করকে কামকলা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করে পরাভূত করলেন। এবং শঙ্কর সময় নিয়ে মানবজন্মের এক নতুন দিগন্ত প্রসঙ্গে জ্ঞানলাভ করতে বের হয়ে পড়লেন নবজন্মের সিংহদোরপথার অতিক্রম করে। এই উপলক্ষে রচিত হল বিখ্যাত "মোহ-মুদ্গর" কবিতা। সে সব অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু এই আশ্চর্য অঘটন একমাত্র ভারতবর্ষের মাটিতেই সম্ভব। এখানেই অদর্শনিষ্ঠ শাশ্বত ভারতবর্ষের যথার্থ আত্মপরিচয় উদ্ঘাটিত। বিচারকের সিংহাসনে বসেও স্বামীর পরাজয় স্ত্রী ঘোষণা করতে পারেন। নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী হয়েও শুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য নবজন্মে নন্দিত হয়ে গৃহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পরাঙ্মুখ হন না। এই যথার্থ চিরকালীন প্রজ্ঞা-পরিপ্লুত মহান ভারতবর্ষ। পরমতসহিষ্ণুতা, সহনশীলতা—ক্ষমা, ত্যাগ এবং নীতিবোধ—এ সবের ঘটনাই তো মানবধর্ম। পররাজ্য আক্রমণ করে,

পরদেশ লুণ্ঠন করে গায়ের জোরে সাম্রাজ্য বিস্তারের রাক্ষসবৃত্তি নয়। অন্যদেশের মানুষকে গায়ের জোরে কিংবা হীন ষড়যন্ত্রের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে নানা সুবিধে আদায়ের পৈশাচিক রাজনীতি আমাদের কাছে কখনো গ্রাহ্য বলে মনে হয় নি। জোর করে কোনো বিশেষ "ইজম্" চাপিয়ে দেবার অমানবিকতার প্রশ্রয় আমরা কখনো দিতে চাই না। বন্দুকের নল কখনো এদেশে শক্তির উৎস বলে স্বীকৃত হয়নি। কোনদিন হবেও না। এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে কলঙ্কিত সে দুর্দিন যেন কখনো না আসে।

আগেই বলেছি—ইউরোপীয় চিন্তাজগতেও মানবকল্যাণের কথা আছে, আছে মানবসেবা ও হিউম্যানিজ্‌ম-এর কথা। কিন্তু কেন মানুষকে ভালোবাসা, কেন তারজন্য কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হব—তার পশ্চাতে কোনো স্থির প্রত্যয় বা দার্শনিক কোনো ভিত্তিভূমির প্রতিষ্ঠা করতে পারা যায় নি। কিন্তু ভারতবর্ষ তার বেদান্ত, অদ্বৈতচিন্তা ও বিশ্বৈক্যবোধের মধ্য দিয়ে এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। এখানেই ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ভারতধর্মের লোকোত্তর প্রতিভা।

●

॥ সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

(সত্তের)

পণ্ডিত রাজশেখরের অভ্যুদয় ৮৮০-৯২০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রায় এ'সময়ের মধ্যেই (৮৫৭-৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধনের অভ্যুদয়। পণ্ডিত রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা' সোমদেব তাঁর 'যশস্তিলকচম্পু', সোঢ়ল 'উদয়সুন্দরীকথা' ও অভিনবগুপ্ত তাঁর 'অভিনবভারতীভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থে আনন্দবর্ধনের নামোল্লেখ করেছেন।

'কাব্যমীমাংসা'-গ্রন্থে (২য় অধ্যায়ে) পণ্ডিত রাজশেখর লিখেছেন : 'শব্দার্থয়োর্যথাবৎ-সহভাবেন বিদ্যা সাহিত্যবিদ্যা। উপবিদ্যাস্তু চতুঃষষ্টিঃ। তাশ্চ কলা বিদগ্ধবাদঃ। স আদ্যঃ কাব্যস্য'। মোটকথা শব্দ ও অর্থের যে যথাবৎ সহভাব বা সহিতত্ব—তার নাম সাহিত্য। মহাবাঙ্ময়ের একাংশ কাব্য এবং কাব্যমীমাংসা সেই কাব্যেরই মীমাংসা ও বিচার। আসলে বাঙ্ময়ের দু'টি ধারা—শাস্ত্র ও কাব্য। শাস্ত্র পাঠের উপযোগী ও শাস্ত্রের উপরই কাব্য নির্ভরশীল। শাস্ত্র পৌরুষেয় ও অপৌরুষের ভেদে দু'রকম। পৌরুষেয় বলতে মানুষের রচিত গ্রন্থ, আর বেদ ও উপনিষৎ প্রভৃতি অপৌরুষেয়। বেদ ও উপনিষৎ শ্রুতিপ্রস্থানের অন্তর্গত।

কাব্যরচনার ক্ষেত্র মহান্ ও পবিত্র, কেননা চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধির অবস্থা ছাড়া কান্ত-কোমল কাব্য রচনা করা অসম্ভব। আলঙ্কারিক বামন 'কাব্যালঙ্কার'-গ্রন্থে বলেছেন :

'চিত্তৈকাগ্র্যমবধানম্। অবহিতা চিত্তবর্ত্মী পদ্ধতি'। 'অবধান'-শব্দটি মনের একান্ত অভিনিবেশকে বোঝায়। অভিনিবেশ অনির্বচনীয়-বিষয়ের সম্পদ ও অলঙ্কার। সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি কলা বা বিদ্যা এজন্য অনির্বচনীয়।

ভামদেব ও বামন সাহিত্য ও কাব্য-রচনার ক্ষেত্রে চিত্তের একাগ্রতারূপ সমাধির প্রাধান্য দিয়েছেন। পণ্ডিত রাজশেখর বলেছেন: 'আভ্যন্তরীণ বা মানসিক প্রচেষ্টার নাম সমাধি। প্রচেষ্টা বা চেষ্টার নাম অভ্যাস। কবি পতঞ্জলি যোগদর্শনে অভ্যাসকে যত্ন ও চেষ্টা বলেছেন। চেষ্টারূপ অভ্যাস ও সমাধি 'শক্তি'-র নিয়ামক এবং এই শক্তির সাহচর্যেই কাব্য রচনা করা সম্ভব। শক্তি বলতে 'প্রতিভা'-শক্তি। কবি কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হন এবং কবিপ্রতিভা কবিত্বশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত মানুষেই বিকাশ লাভ করে।

পণ্ডিত রাজশেখর বলেছেন যে, যাহাদ্বারা শব্দ ও অর্থসমূহ, অলঙ্কার ও বচনবিন্যাস এবং এই ধরনের অপরাপর শক্তির বিকাশ লাভ করে তাকেই প্রতিভা বলে। প্রতিভা দু'রকম —কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। যে প্রতিভা কবির কাব্যরচনার সহায়ক তার নাম কারয়িত্রী-প্রতিভা। রাজশেখর বলেছেন: 'যা শব্দগ্রামমর্থসার্থমলঙ্কারতন্ত্রযুক্তিমার্গসন্দর্ভং তথাবিধমধিদ্রুদয়ং প্রতিভাসয়তি সা প্রতিভা'। কারয়িত্রীপ্রতিভা সহজা, আহার্যা ও উপদেশিকী ভেদে তিন রকম। পূর্বজন্মের সংস্কার থেকে প্রাপ্ত প্রতিভার নাম সহজা-প্রতিভা। এই প্রতিভা স্বভাবসিদ্ধ বা inborn। বর্তমান জন্মের সংস্কার থেকে আহার্যা-প্রতিভার সৃষ্টি হয়। আর মন্ত্র, শাস্ত্র প্রভৃতির উপদেশ থেকে সৃষ্ট প্রতিভার নাম ঔপদেশিকী—উপদেশজাত।

পুনরায় কাব্য ও সাহিত্য-রচনার ক্ষেত্রে ব্যুৎপত্তি ও কাব্যপাক দু'টি শব্দের বিশেষ তাৎপর্য আছে। বহু বিষয়ের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নাম ব্যুৎপত্তি। পণ্ডিত রাজশেখর বলেন: 'বহুজ্ঞতা ব্যুৎপত্তিঃ'। অন্য আলঙ্কারিক একথাই বলেন। কিন্তু আমার মতে (রাজশেখরের মতে) 'উচিতানুচিতবিবেকো ব্যুৎপত্তিঃ।...'ব্যুৎপত্তিঃ শ্রেয়সী' ইতি মঙ্গলঃ। সা হি কবেরশক্তিকৃতং দোষমশেষমাচ্ছাদয়তি'। রাজশেখর পুনরায় বলেছেন: 'প্রতিভাব্যুৎপত্তিমাংশ্চ কবিঃ কবিরিত্যুচ্যতে। স চ ত্রিধা। শাস্ত্রকবিঃ কাব্যকবিরুভয়কবিশ্চ'।

মোটকথা উচিত ও অনুচিতের বিচার করার যে শক্তি ও সামর্থ্য—তার নাম ব্যুৎপত্তি। আনন্দবর্ধন বলেন যে, প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তির মধ্যে প্রতিভা শ্রেষ্ঠ বা প্রধান। কবিপথে কবির অশক্তি বা অসামর্থ্য ব্যুৎপত্তির দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। যাযাবরীয় রাজশেখর বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে প্রতিভা ও ব্যুৎপত্তি পরস্পরে মিলিতভাবে কবির উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। যেমন লাবণ্য ছাড়া কেবল শরীরসৌষ্ঠব অসুন্দর বলে প্রতিভাত হয়, আবার শরীরের সৌষ্ঠব ছাড়া কেবলই লাবণ্য বা লাবণ্যগুণ শরীরের সৌন্দর্য সৃষ্টি করে না, এজন্য উভয়েরই সার্থকতা ও মূল্য আছে।

তারপর কবির শ্রেণীভেদ আছে। সাধারণ কবি শাস্ত্রকবি, কাব্যকবি ও উভয়কবি-ভেদে তিন রকম। তেমনি শাস্ত্রকবি প্রভৃতির মধ্যেও শ্রেণীভেদ আছে। তাছাড়া আছে অলঙ্কার-কবি (শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার) রসকবি, মার্গকবি, শাস্ত্রার্থকবি। তাছাড়া কবির আবার দশটি

অবস্থা : কাব্যবিদ্যাস্নাতক, ছন্দস-কবি, অস্তাপদেশী, সেবিতা, ঘটমান, মহাকবি, কবিরাজ, আবেশিক, অবিচ্ছেদী ও সংক্রামন্বিতা। এদের মধ্যে যিনি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় মহাকাব্য রচনা করতে সমর্থ—তিনি মহাকবি এবং একমাত্র তিনিই মহাকাব্য রচনা করেন।

এভাবে কাব্যের ও সাহিত্যের বিচারে যাযাবরজাতীয় রাজশেখর পদ ও বাক্যের বিচার, পাঠ-প্রতিষ্ঠা, কাব্যের বিষয় প্রভৃতির আলোচনা করেছেন। এ'প্রসঙ্গে রাজশেখর বৈদর্ভী, গৌড়ীয়া ও পাঞ্চালী তিনটি রীতির উল্লেখ এবং ব্যাখ্যাও করেছেন। তাছাড়া কাকু ও বক্রোক্তির প্রসঙ্গ আছে যদিও কাকু বক্রোক্তিরই নামান্তর। কাকু সাহিত্যে, কাব্যে ও সঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। 'কাকু'-র দ্বারা বক্তার অভিপ্রায়-অনুযায়ী উচ্চারণের ভঙ্গী প্রকাশ পায়। কাকু প্রধানত দু'রকম—সাকাঙ্ক্ষ ও নিরাকাঙ্ক্ষ। সাকাঙ্ক্ষ-কাকু পুনরায় তিন রকম—আক্ষেপগর্ভ, প্রশ্নগর্ভ ও বিতর্কগর্ভ। তেমনি নিরাকাঙ্ক্ষ-কাকু বিধি, উত্তর ও নির্ণয়স্বরূপভেদে তিন রকম।

মোটামুটি আঠারোটি অধ্যায় আছে কাব্যমীমাংসাগ্রন্থে। ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমানির্দেশসম্পর্কে পণ্ডিত রাজশেখরের জ্ঞানও অপরিসীম ছিল। সপ্তদশ অধ্যায়ে তিনি ভারতবর্ষের ভৌগলিক-সীমার পরিচয় দিয়েছেন। ইংরাজী সংস্করণের সম্পাদকদ্বয় মাননীয় দালাল ও পণ্ডিত শাস্ত্রী লিখেছেন : 'Rajashekara's fondness for geography is borne out by the numerous references to geographical names, mentioned in his works, and the ancient notions regarding world geography find a lucid expression in there productions'.

পণ্ডিত রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা ক্লাসিকাল কাব্য ও সাহিত্যের পথপ্রদর্শক। তাছাড়া সঙ্গীতে যে সাহিত্যের সহযোগ থাকে এবং সঙ্গীতের ভাব ও অর্থকে বোধগম্য ও সুসংযত করে—সেই সাহিত্যের গঠনপ্রণালী, উচ্চারণ ও প্রয়োগরীতি-সম্বন্ধেও রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা-গ্রন্থ যথেষ্ট আলোকসম্পাত করে। কিন্তু বিভিন্ন যুগান্তরে ও যুগপ্রবাহে সঙ্গীতের সাহিত্য বিভিন্নভাবে রচিত হয়েছে এবং সাহিত্যে সুর সংযোজিত হয়েছে। 'গীতগোবিন্দ' পদসাহিত্যে সঙ্গীতের ছন্দ ও সুরের সমাবেশ এবং গীতিপদ্ধতি শ্রুতিমাধুর্যের ও আনন্দানুভূতির শক্তি-সামর্থ্য সৃষ্টি করেছে। রসপিপাসু-বৈষ্ণবকবিগণের রচিত পদসাহিত্যের রচনা একটু ভিন্ন প্রকৃতির প্রত্যক্ষ-রসানুভূতিকে নিয়ে। তারা ঠিক একই রীতি, গতি ও রসসৌন্দর্য সৃষ্টি করেনি, বরং বলা যায় যে, 'গীতিগোবিন্দ'-পদগানের অপেক্ষা পরবর্তী বৈষ্ণবপদসাহিত্যের লালিত্য, মাধুর্য ও প্রকাশভঙ্গী আরও মধুর, রসময় ও প্রাণময়। বৈষ্ণবপদকর্তাগণের রচিত সঙ্গীতসাহিত্যের পরে আধুনিক কবি ও রচয়িতাগণের গানের কথায় ও ছন্দমাধুর্যের রচনায় আরও অনেক পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের প্রাচীন যুগের সংস্কৃত গীতিসাহিত্য অপেক্ষা মধ্যযুগের ধ্রুবপদসঙ্গীতের রচনা ও সাহিত্য আরও কিছুটা ভিন্ন, কেননা সেখানে বিভিন্ন ভাষার ছন্দমাধুর্যের চেয়ে সঙ্গীতের সাহিত্য ও সঙ্গীত—এই উভয়ের মিলনমাধুর্যের মধ্যে বেশ-কিছু স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন দেশের কাব্যকবিদের রচনায় ভক্তিভাবের মিশ্রণ গীতিসাহিত্যকে আরও

মহিমময় করেছে। বহু পরে বাঙলার গীতিকবিতার সমাবেশ সঙ্গীতসাহিত্যের রূপকে আরও একটু মাধুর্যময় করেছে এবং কবি রবীন্দ্রনাথের অবদান সঙ্গীতের সাহিত্যকে বিশ্বভাবেই সমুন্নত করেছে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা ও কবিদৃষ্টি সঙ্গীতের কথা সাহিত্যকে সঙ্গীতের সহপর্যায়েই উন্নীত করেছে। তাছাড়া বাঙলাদেশে কবি, যাত্রা, পাঁচালী, ঝুমুর প্রভৃতি সহজাত স্বচরিতাদের আঞ্চলিক সাহিত্যের ভাষা বিশেষ সমুন্নত না হলেও রসানুভূতির ক্ষেত্রকে বিশেষভাবে প্রসারিত করেছে।

●

।। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম'-উপন্যাস কি তত্ত্বমূলক ? ।।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

শ্রী যদি যথার্থই সন্ন্যাসিনী হইত তবে জয়ন্তীরই হউক কিংবা জ্যোতিষের বাক্যেই হউক, কদাচ দেশে ফিরিত না, শ্রী-র মনে সীতারাম ও সন্ন্যাস এই দুই বিষয়ে যে কোনও কঠিন দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছিল তাহাও নহে, সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষার জন্য শ্রী-র কোনও আগ্রহ ছিল না; জয়ন্তীর কথা উপলক্ষ মাত্র ছিল, দেশে ফিরিয়া আসিয়া সীতারামের সান্নিধ্য লাভ করিবার জন্য সর্বদাই তাহার মনে কামনা জাগিয়াছিল, সেইজন্য দীর্ঘ তীর্থবাসের পরও সন্ন্যাসের সংস্কার তাহার মনে দৃঢ়মূল হইতে পারিল না, যেখানে সীতারাম সেখানেই শ্রী ফিরিয়া আসিল।

জয়ন্তী শ্রীকে সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পরামর্শ দিল, রাজাকে রাজর্ষি করিবার উপদেশ দিল। কিন্তু শ্রী-র নিজের উপর বিশ্বাস নাই, সন্ন্যাসিনীর সংস্কারে অটুট দৃঢ়তা নাই, সেইজন্যই স্বীকার করিল, রাজাকে রাজর্ষি করিবার তাহার সাধ্য নাই। বলিল, 'আবার কি ডুবিয়া মরিব ?' তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার আশঙ্কা দেখা দিল। শ্রী এখনও তাহার নিজের মন বুঝিতে পারে নাই। জয়ন্তীকে বলিল, 'কিছুদিন এইখানে থাকিয়া আপনার মন বুঝিয়া দেখি। যদি দেখি আমার চিত্ত এখন অবশ, তবে সাক্ষাৎ না করিয়াই এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইব স্থির করিয়াছি।'

যাহার চিত্ত নিজ বশে নাই, সে কদাচ সন্ন্যাসিনী হইতে পারে না। অবচেতন-মনে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই সে তীর্থস্থান হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিল, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে তাহার চিত্তের দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিবে না, ইহাই তাহার আশঙ্কা হইল, কারণ, তাহার চিত্ত অবশ, নিজের বশে নহে। সেইজন্য সেই সাহস আর পাইল না। তথাপি সীতারামের দিকে তাহার চিত্ত অনবরত আকৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে শ্রী একদিন সীতারামের সম্মুখে আবির্ভূতা হইল।

মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন কামনা লইয়া সীতারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াও শ্রী জয়ন্তীর শিক্ষা-বশতঃ মুখে বলিতেছে, 'আমি সন্ন্যাসিনী, সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়াছি'। সীতারাম তাহাকে

বুঝাইয়া দিল, সে কর্ম পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে গঙ্গারামকে রক্ষা করিতে কিংবা তাহার সম্মুখে দেখা দিতে আসিত না। সুতরাং সে কর্মত্যাগ করিয়াছে এই উক্তি তাহার আত্ম প্রতারণা মাত্র।

'চিত্ত-বিশ্রামে' রাজার সঙ্গে শ্রী-র যে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত, তাহার মধ্য দিয়া শ্রী-র মনে হইত, 'আমি গৃহিনী, তাঁহার ধর্মপত্নী।' এই কথা সে জয়ন্তীর নিকট স্বীকার করিয়াছে। শুনিয়া জয়ন্তী তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে, 'তারি তো সন্ন্যাস সাজিয়াছ দেখিতেছি। যাহা জগদীশ্বরে সমর্পণ করিয়াছিলে, তাহা আবার কাড়িয়া লইয়াছ দেখিতেছি। আবার আপনার ভাবনাও ভাবিতে শিখিয়াছ দেখিতেছি। একে কি বলে সন্ন্যাস ?'

ভবানী পাঠকের শিক্ষায় প্রফুল্ল কোনও দিনই যেমন 'দেবী চৌধুরাণী' হইতে পারে নাই, জয়ন্তীর শিক্ষায়ও শ্রী কোনও দিনই সন্ন্যাসিনী হইতে পারে নাই। বাস্তব নারীসত্তা তাহার মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে তাহা সন্ন্যাসের শিক্ষা কিছুতেই আচ্ছন্ন করিয়া দিতে পারে নাই, মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া দিয়েছে মাত্র।

জয়ন্তী শ্রী-র সন্ন্যাস-ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য সীতারামের নিকট হইতে পলায়নের পরামর্শ দিল। কিন্তু শ্রী এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত, বলিল, 'আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন'। সীতারামের মঙ্গল তাহার কাম্য হইয়া উঠিল। শুধু রাজার আত্মঘাতী হওয়ার আশঙ্কাই নহে, নিজের কথাও ইহাতে আছে।

জয়ন্তী আবার তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিল : 'রাজা বাঁচিল মরিল, তাহাতে তোমার কি ? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা ? এই কি সন্ন্যাস ?' অবশেষে জয়ন্তীর প্ররোচনায় শ্রী 'চিত্তবিশ্রাম' হইতে পলাইয়া গেল, নিজের ইচ্ছায় কিংবা বিশ্বাসে নহে। তারপর শেষ দৃশ্যে সীতারামের পায়ের উপর আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়া বলিল : 'এই তোমার পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি—আমি আজ সন্ন্যাসিনী নহি, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে ? আমায় আবার গ্রহণ করিবে ?'

সীতারাম তাহাকে গ্রহণ করিলেন, বলিলেন : 'তুমিই আমার মহিষী'। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর রাজার সঙ্গে তাহার মহিষীর মিলন হইল। ইহাতে সন্ন্যাসিনীর কোনও স্থান নাই।

বেত্রাঘাতের দৃশ্যে যিনি শ্রীকে স্বয়ং সন্ন্যাসের শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই জয়ন্তী নিজের সন্ন্যাস ধর্ম রক্ষা করিতেই যে কতখানি অক্ষম হইয়াছিল, সেই কথা বঙ্কিমচন্দ্র অপূর্ব কৌশলে বর্ণনা করিয়াছিলেন। জয়ন্তীর সন্ন্যাস-জীবনের সমগ্র আদর্শের উপরে তাহার বাস্তব নারীসত্তা যে জয়লাভ করিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কোনও দিক হইতেই গোপন করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ইহা একটি শ্রেষ্ঠ অংশ—

'এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল তখন কোথা হইতে পাপ লজ্জা আসিয়া সেই ইন্দ্রিয় বিজয়িনী সুখ-দুঃখ বিবর্জিত জয়ন্তীকে অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী মস্তকে জানু পাতিয়া বসিল। তখন যুক্ত করে পবিত্রচিত্তে জয়ন্তী আত্মাকে সমাহিত করিয়া মনে মনে ডাকিতে লাগিল। "দীনবন্ধু। আজ রক্ষা কর। মনে করিয়াছিলাম,

বুঝি এ পৃথিবীর সকল সুখ-দুঃখকে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু দর্পহারী। আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর। নারীদেহ কেন দিয়াছিলে প্রভু? সব সুখ-দুঃখ বিসর্জন করা যায়, কিন্তু নারীদেহ থাকিতে লজ্জা বিসর্জন করা যায় না। তাই আজ কাতরে ডাকিতেছি, জগন্নাথ। আজ রক্ষা কর।"

যতক্ষণ জয়ন্তী জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলে, ততক্ষণ কসাই তাহার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছিল। দেখিয়া সমস্ত জনমণ্ডলী এককণ্ঠে হাহাকার করিতে লাগিল বলিতে লাগিল: "মহারাজ। এই পাপে তোমার সর্বনাশ হইবে—তোমার রাজ্য গেল।" রাজা কর্ণপাত করিলেন না। নিরুপায় জয়ন্তী আপনার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, ছাড়িতেছিল না। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। শ্রী থাকিলে বড় বিস্মিতা হইত। জয়ন্তীর চক্ষুতে আর কেহ কখনও জল দেখে নাই। জয়ন্তী রুধিরাক্তকৃত হস্তে আপনার অঞ্চল ধরিয়া ডাকিতেছিল, "জগন্নাথ রক্ষা কর।"

জয়ন্তীর 'চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল।' কারণ, তাহার বহির্মুখী সন্ন্যাসিনীর আচরণ কোনোদিন তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, অন্তরের মধ্যে সে চিরদিনই নারী—সন্ন্যাস তাহার অহঙ্কার মাত্র ছিল।

এই হিসাবে বলিতে গেলে শ্রী সীতারামেরও মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। সে বিবাহের পরই বালিকা বয়সে পরিত্যক্তা হইয়া ২০ বছর বয়সে রূপ যৌবনের ডালি লইয়া সীতারামের সম্মুখে আবির্ভূতা হইল। সীতারাম 'নন্দা' ও 'রমা'-কে পাইয়া তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে দেখা মাত্রই তাহার রূপ যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। গঙ্গারামের উদ্ধারের পর সীতারাম তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু শ্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিবার কারণ জানিতে পারিয়া সীতারামের সম্মুখ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহাতে সীতারাম অস্থির চিত্ত হইয়া দেশ-দেশান্তর ঘুরিয়া আসিয়া স্থির হইয়া পুনরায় রাজ্য গঠনে মন দিলেন। এমন সময় তীর্থ হইতে শ্রী সন্ন্যাসিনী বেশে আবার ফিরিয়া আসিল। সীতারাম পুনরায় তাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পালন করিতে অমনোযোগী হইলেন। রাজ্য রসাতলে যাইতে লাগিল। তারপর শত্রুর আক্রমণে তাহার পরাজয় ও মৃত্যু হইল। তাহার এই পরাজয় এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য শ্রী-ই দায়ী। সে যদি তীর্থ হইতে না ফিরিত, তবে সীতারামের এই পরিণাম হইত না। সুতরাং শ্রী কেবলমাত্র গঙ্গারামেরই বধের কারণ হয় নাই, সীতারামেরও অধঃপতন এবং শেষ-পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে গঙ্গারামকেও যেমন স্বহস্তে হত্যা করে নাই, সীতারামকেও সহস্তে হত্যা করে নাই। তাহার জীবনে দুইজনই প্রিয় ছিল, দুইজনই তাহার জন্য নিহত হইল।

●

॥ কালিদাসসাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—পারাবত শুক-সারি-প্রসঙ্গ ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

মহাকবি কালিদাস ভারত তথা বিশ্বের প্রকৃতিপ্রেমিক কবিগণের মধ্যে অন্যতম প্রধান একথা বলাবাহুল্য। তাঁহার কাব্যরাজ্যে বিবিধ পক্ষীর বিচিত্র পক্ষ-বিধুনন ও কলকলিত কূজন। তাহাদের মধ্যে আমাদের প্রিয়-পরিচিত পারাবত, শুক ও সারিকা বিদ্যমান।

কালিদাস কুমারসম্ভব মহাকাব্যের নবমসর্গে পারাবতবিহগের উল্লেখ করিলেন। শিব-শিবানীর সম্ভোগনিকেতনে এক পারাবত প্রবেশ করিয়া রতিকূজন অনুকরণ করিতেছিল। সেই পারাবত কবি-ভণিতিতে মন্থনমথিত সুধাহ্রদ হইতে সম্ভূত ফেনরাশির মতোশুভ্র।

এই পারাবত মায়াপারাবত, অগ্নি। পারাবতের অনুকরণধর্ম সেই মায়াপারাবতে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া পক্ষিরাজ্যের পারাবত করিয়া তুলিয়াছেন।

সুকান্তকান্তামণিতাম্রকায়ং
কূজন্তমাঘূর্ণিতরক্ত নেত্রম্।
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠম্
মুহুর্মুহুস্তুলিতকারুপুচ্ছম্ ॥ ৯/২

পারাবতটি প্রিয়ার মনোরম রতিকূজনের অনুকরণ করিয়াছিল। আঘূর্ণিতরক্তনয়নে সে কণ্ঠদেশ উন্নত ও সন্নত করিতেছিল। পারাবতটি ক্ষণে ক্ষণে তাহার সুন্দরপুচ্ছকে আনত করিতে করিতে কূজনে রত হইয়াছিল।

কালিদাস তাঁহার মেঘদূতকাব্যে যক্ষমুখে উজ্জয়িনীর বিবরণপ্রসঙ্গে সৌধচূড়ে রাত্রির সুপ্তপারাবতের উল্লেখ করিলেন—

'তাং কস্যাঞ্চিদ্‌ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং,
নীত্বা রাত্রিং চির বিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ'।
ঘুমিয়ে থাকে যেথায় মুখে
কপোতমিথুন যুগ্মমনে
কাটিয়ে দিও একটি নিশি
সেই ভবনের একটি কোণে
জড়িয়ে বুকে নিত্যলীলায়
ক্লান্ত তোমার তড়িৎপ্রিয়া। (নরেন দেব)

তুলনীয় :

সেথা নিশি দ্বিপ্রহরে
প্রণয়চাঞ্চল্য ভুলি ভবনশিখরে
সুপ্ত পারাবত। —রবীন্দ্রনাথ, মানসী, মেঘদূত।
কলরব ও কপোত পারাবতবায়ন শব্দ।

কালিদাসসাহিত্যে শুকপক্ষীরও স্থান হইয়াছে। অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথমাঙ্কে দেখি, মৃগয়াবিহারী রাজা দুষ্মন্ত আশ্রম-প্রবেশ-মুখে যে যে চিহ্ন দেখিয়া আশ্রমকে নিকটবর্তী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শুকাস্য-ভ্রষ্ট-কোটরের মুখ হইতে নিপতিত নীবারধান্যগুলি। 'নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ'। শুকগুলি তরুকোটরে বাস করে। নীবার-ধান্যচয় শুকমুখগলিত হইয়া তরুতলে বিছাইয়া পড়িয়া আছে।

বিক্রমোর্বশীয় নাটকের চতুর্থাঙ্কে একটি উপমায় কালিদাস শুকোদর কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। পুরূরবা প্রিয়া উর্বশীর স্তনাং শুককে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন—

ক্ষতব্যাঢ়রাগৈর্নয়নোদবিন্দুভিঃ
নিমগ্ননাভের্নিপতদ্ভিরঙ্কিতম্।
চ্যুতং কথা ভিন্নাতের্নসংশয়ং
শুকোদরশ্যামমিদং স্তনাং শুকম্॥

—গভীরনাভি উর্বশীর নয়নজলে ওষ্ঠরঞ্জনী মুছিয়া গিয়া সেই চিহ্ন উর্বশীর স্তনাবরণবাসে মুদ্রিত ছিল। নিশ্চয়ই রোষভরে চলিয়া যাইবার সময় তাহা খুলিয়া পড়িয়াছে। সেই স্তনবসন শুকবিহগের উদরদেশের মতো শ্যামবর্ণ।

উর্বশীর নিচোলবাস শুকোদরশ্যাম।

ঋতুসংহারে বসন্তের কিংশুক কবি কালিদাসের ভাষায় শুকমুখচ্ছবি। 'কিং কিংশুকৈঃ শুকমুখচ্ছবি ভির্নভিন্নং কিং কর্ণিকারকুসুমৈর্নকৃতং দদদ্ভিঃ'। রক্তিম কিংশুকে শুকমুখের প্রতিভাস। যেন শুকপাখীর মুখের ছবি কিংশুকের রক্তপত্রপুটে প্রস্ফুট।

কালিদাসকাব্যের পক্ষিরাজ্যে সারিকার কথাও আমাদের মনে পড়ে। সে কালিদাস-চিত্রিত বিহগজগতে সম্ভবতঃ একাকিনী। কিন্তু আভিজাত্য কম নয়। মেঘদূতকাব্যের বিলাসিনী যক্ষবধূর পালিতা সে। সেই সারিকা প্রভু-সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবতী, যক্ষ তাহাকে বড় আদর করে। বধূপ্রসঙ্গে বলিয়া দিতে গিয়া যক্ষমেঘকে সারিকার কথাও বলিয়াছে। মেঘ দেখিবে, যক্ষবধূ পূজার্চনায় রত, নয়তো যক্ষচিত্র অঙ্কন করিতেছে, কিংবা পিঞ্জরস্থা সারিকাকে প্রশ্ন করিতেছে—'সারিকে আমার প্রিয়ের কথা কি তোমার স্মরণ হয়, তুমি তাঁহার কতোই না আদরের'।

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-ব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পিঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্তুঃ স্মরসি রসিকে। ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥ উত্তরমেঘ ২৪॥

এই সারিকা মধুরভাষিণী।

হয়তো কভু শুধায় ডেকে
তার সারিকায়—'পিঞ্জরিকা
তোর মনে কি তাঁর কথা লো
পড়ছে এখন? হায় রসিকা!
তুই যে ছিলি বড়ই প্রিয়
প্রাণেশ্বরের, বলনা সারি,
মোর কাছে সে ফিরবে কবে?
আর যে আমি রইতে নারি'। (নবেন দেব)

তুলনায়: সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী: রবীন্দ্রনাথ: কল্পনা: প্রেরণা।
প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের শারিকারে: রবীন্দ্রনাথ: ক্ষণিকা: সেকাল।

কালিদাস-সাহিত্যে বিধৃত পারাবত, সারিকা কালিদাসের উত্তরসূরী রবীন্দ্রকাব্যে ছায়া ফেলিয়াছে।

।। পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা ।।

শ্রীসুশান্ত কুমার চট্টোপাধ্যায়

(চার)

বহু শতাব্দী ধরে টোডারা বিশ্বাস করে আসছে পরলোক একটি পৃথক জগৎ। যদিও পরলোককে তারা ভিন্ন জগৎ বলে জানে, তবু তাদের বিশ্বাস কোন টোডা মারা গেলে সে ইহজগতে যেভাবে জীবনযাপন করে গেল পরলোকেও সে সেইরূপ জীবনই যাপন করে। ইহলোকে টোডা পুরুষদের জীবন কেটে যায় মহিষ পালন করে। মহিষের দুধ দোহন করা, দুধ থেকে মাখন, ঘি তৈরি করা টোডাদের দৈনন্দিন কাজ। সেই টোডা যখন মারা যায় তখন তার সামাজিক পদমর্যাদা ও অর্থনৈতিক মান-বিচার করে গ্রামের পুরোহিত পারলৌকিক কাজের জন্য চিহ্নিত পবিত্র মহিষগুলি থেকে কয়েকটি মহিষ উৎসর্গ করে। ঐ মহিষগুলিকে বিচিত্র পদ্ধতিতে পরলোকে পাঠানো হয় মৃত ব্যক্তির সঙ্গে। আমার দেখা শবদাহ অনুষ্ঠানে বেশ শক্ত, বলিষ্ঠ, দুগ্ধবতী দুইটি মহিষকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। টোডাদের কোন পুরুষ যখন মারা যায় তখন তাকে সোমবার অথবা বৃহস্পতিবার দাহ করা হয়। টোডা নারী মারা গেলে মঙ্গলবার কিম্বা শনিবার দাহ করা হয়। ঐ দিনগুলি টোডা নারী ও পুরুষের মৃতদেহ দাহ করার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যপূর্ণ দিনরূপে চিহ্নিত। টোডা সমাজের মোট ষোলটি ভিন্ন-গোত্রের ষোলটি শ্মশান আছে। আবার একই গোত্রের দুইটি পৃথক শবদাহের জায়গা থাকে। একটি পুরুষদের জন্য ও অপরটি মেয়েদের জন্য। টোডারা নীলগিরির যে অঞ্চলগুলিতে বাস করে সেই স্থানগুলির গড় উচ্চতা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার ফুট। সারা বছর বেশ ঠাণ্ডা থাকে। মৃতদেহ দুই তিন দিন রাখলে কোন প্রকার বিকৃত হয় না ঠাণ্ডার জন্য। উটি থেকে প্রায় আঠার কিঃ মিঃ দূরে গভর্ণরসোলা নামে এক গ্রামের এক প্রৌঢ় মারা যায়। সেই খবর পেয়ে শ্রীমতী দেবীকা পিলজেন আমায় খবর দিয়ে যান এবং পরদিন সকাল আটটার মধ্যে গ্রামে যাতে পৌঁছতে পারি তার ব্যবস্থাও করে যান। লোকটি মারা যায় সোমবার সকালে। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হচ্ছে বৃহস্পতিবারে। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রাম থেকে বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ে এক প্রান্তে অপেক্ষা করতে থাকি। শ্রীমতী দেবীকাও এসে পড়েন। তিনি আসেন গ্রাম থেকে। আমার কাছে এসে আমাকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন আমি যেন কখনও তাঁর সঙ্গ ছেড়ে অন্য কোন দৃশ্যের ছবি তুলতে না যাই। তিনি জানান টোডারা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ, হয়তো শবানুগমন ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ানুষ্ঠানের ছবি নাও তুলতে দিতে পারে। গভর্ণরসোলা গ্রামে আগে দুইদিন ছবি তুলে গেছি। নীলগিরির বিভিন্ন অঞ্চলে গত একমাস ধরে টোডাদের জীবনচিত্র করার উদ্দেশ্যে ঘুরেছি। সেইসূত্রে বহু টোডার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সেই আশা নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। যদিও আমি মৃত্যু সর্বক্ষেত্রেই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণতার সৃষ্টি করে। শ্রীমতী দেবীকার সতর্কবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে যায় অরুণাচল

প্রদেশের এমন এক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের ছবি তোলার সময় শারীরিক নির্যাতনের কথা। সেখানে আদিবাসীদের সম্মতি না নিয়ে দলনেতার নির্দেশমত ছবি তুলেছিলাম। হঠাৎ কয়েকটি বড় পাথর প্রচণ্ড বেগে আমার দেহে এসে আঘাত করে। সেই আঘাতের জের বহুদিন পর্যন্ত ছিল। আদিবাসীদের মধ্যে সংস্কারাচ্ছন্ন বেশ কিছু মানুষ থাকে, যারা এইসব ক্ষেত্রের চিত্রগ্রহণ একেবারেই পছন্দ করে না।

শবানুগমন শুরু হয় বেলা প্রায় দশটার সময়। একটি সুসজ্জিত নতুন খাটে শবদেহসহ বিরাট এক জনতা শ্মশানের দিকে যাত্রা করে। শবযাত্রার আগে আছে একটি ব্যাণ্ড পার্টি। নানান ঐকতান তারা বাজাতে থাকে। একটি চলমান বাজারও আছে ঐ মিছিলে। বড়া, মোওা, মিষ্টি, কাঁঠালের কোয়া, পান, সিগারেট ইত্যাদি বিক্রি হতে দেখি। মৃতব্যক্তির গোত্রানুযায়ী শ্মশান গ্রাম থেকে প্রায় ১৬/১৭ কিঃ মিঃ পথ। সেখানে পৌঁছে সবাইকে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সহানুগমনের জন্য উৎসর্গীকৃত মহিষ দুইটি শ্মশানে গিয়ে পৌঁছে। গ্রামের পুরোহিত মহিষ দুইটি উৎসর্গ করার পরমুহূর্তেই উপস্থিত যুবকেরা মহিষের শিং ধরে ঝুলে পড়ে এবং মহিষদের পিছনে প্রচণ্ডভাবে বেত মারা হতে থাকে। প্রাণের ভয়ে মহিষ দুটি দৌড়তে আরম্ভ করে এবং শিং ধরে ঝুলে পড়া ছেলেরা তাদের শ্মশানের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। কিছুটা পথ গিয়ে মহিষ দুটি থমকে দাঁড়িয়ে যায়, প্রচণ্ড বেত্রাঘাতে আবার দৌড়তে থাকে। চার পাঁচজন সবল মানুষের ভারে মাথা তুলে দৌড়ানো মহিষদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মাথাটি সম্পূর্ণ ঝুলে থাকে। উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রায় ৭/৮ কিঃ মিঃ পথ মহিষ দুটিকে ঐভাবে তাড়িয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। গ্রাম থেকে ঐভাবে অতটা পথ তাড়িয়ে আনলে পথমধ্যেই মহিষ দুটির মৃত্যু ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্য শ্মশান থেকে নির্দিষ্ট একটি দূরত্ব রেখে মহিষ দুটিকে উৎসর্গ করা হয়। কোন টোডার মৃত্যু ঘটলে দূরদূরান্তের প্রায় সমস্ত টোডাদের খবর দেওয়া হয়। মোট টোডা জনসমষ্টির প্রায় ৫০/৬০ ভাগ নারী ও পুরুষ শবানুগমন করে। সেইজন্য হয়তো সপ্তাহের দুইটি দিন শবদাহের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

প্রত্যেক শ্মশানে একটি কুঁড়েঘর থাকে। ঐ ঘরটিকে শ্মশান-ঘর বলা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত মহিষ দুইটি এসে না পৌঁছয়, ততক্ষণ শ্মশান-ঘরের সামনে টোডা পুরুষেরা চক্রাকারে নাচতে থাকে এবং গান গাইতে থাকে। এই নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে মৃত লোকান্তরিত আত্মার প্রতি শেষ সম্মান দেখানো হয়। শ্মশান-ঘর থেকে বেশ কিছুটা দূরে মৃতদেহটি খাট থেকে নামিয়ে মাটিতে রেখে টোডা মেয়েরা পর্যায়ক্রমে মৃতদেহ ঘিরে বসে কাঁদতে থাকে। সেখান থেকে আরও কিছুটা দূরে ব্যাণ্ড পার্টি বাজনা বাজাতে থাকে। ব্যাণ্ড পার্টিতে মোট চারজন শিল্পী। প্রত্যেকেই নীলগিরির কোটা আদিবাসী। টোডাদের উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে বিশেষকরে অন্ত্যেষ্টিকালীন অনুষ্ঠানে কোটাদের সঙ্গীত পরিবেশন অপরিহার্য। তাছাড়া কোটারা এই অনুষ্ঠানে শস্য দেয়, কাপড় দেয়। পরিবর্তে তারা মৃত মহিষগুলি পায়। বহু মানুষের সমাবেশে সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটি বিরাট মেলার মত দেখায়। খ্রীষ্টান টোডারাও

(শতকরা ৪৫ ভাগ খ্রীষ্টান) এই অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। তারা আসে তাদের চিরাচরিত পোষাকে, কখনও প্যান্ট সার্ট পরে আসে না।

বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় উপত্যকার মধ্য দিয়ে মহিষ দুটিকে তাড়িয়ে নিয়ে টোডা যুবকেরা শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। শেষের দিকে মহিষ দুটি আর দৌড়তে পারে না। সামান্য কিছুটা পথ গিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। দুঃসহ শারীরিক পীড়নে ক্রমশঃ তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকে। চার পাঁচজন মানুষের ভারে ঝুলে পড়া মাথা মুহূর্তের জন্যও তুলতে পারে না। নিঃশ্বাসের প্রচণ্ড কষ্টে এবং রক্তচলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে মহিষ দুটির মৃত্যু ঘটে। শেষবার মাটিতে বসে পড়ে আর যখন উঠতে পারে না, তখন পুরোহিত একটি কুড়ুল নিয়ে মহিষ দুটির কাছে যায় এবং তাদের মাথার দুই শিংএর মধ্যবর্তী জায়গায় কুড়ুলের উল্টোদিক দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। আঘাতটি এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে রক্তপাত না হয়। কারণ রক্তপাত অশুভ চিহ্ন। তখনই টোডারা স্থির নিশ্চিত পৌঁছয়—মহিষ দুটির মৃত্যু ঘটেছে। এরপর মৃতদেহদুটি নিয়ে এসে তার মাথার সঙ্গে মৃত মহিষ দুটির মাথা ছুঁইয়ে দেয় এবং টোডাদের বিশ্বাস ঐ মুহূর্তে তিনটি আত্মা একত্রে ইহলোক ছেড়ে পরলোক চলে গেল। পরলোকে পৌঁছে ঐ ব্যক্তি মহিষ দুটিকে লালনপালন করবে, তাদের দুধ খাবে, দুগ্ধজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি খাবে এবং পরমসুখে সে পরলোকে বাস করবে।

মহিষ দুটির মাথায় কুড়ুলের উল্টোদিক দিয়ে আঘাত করার কিছু আগে কয়েকজন প্রবীণ টোডা আমার কাছে এসে অত্যন্ত রাগতভাবে এবং লাঠি উঁচিয়ে আমায় নানান্ কথা জিজ্ঞাসা করতে থাকে। তাদের বক্তব্য কিছুই বুঝি না। তাদের শান্ত করার চেষ্টা করি। কাছাকাছি কোথাও শ্রীমতী দেবীকাকে দেখি না। হয় আমি সরে এসেছি তাঁর কাছ থেকে, না হয় তিনি সরে গেছেন আত্মীয়স্বজন পরিবেশের মধ্যে। আন্দাজ করি প্রবীণেরা এই চিত্রগ্রহণ পছন্দ করছে না। এরইমধ্যে একজন টোডা আমার পিছন দিক থেকে আমার মাথায় লাঠির দ্বারা প্রচণ্ড আঘাত করে বসে। মুহূর্তে চারিদিক অন্ধকার হয়ে যায়। জ্ঞান হতে দেখি শ্রীমতী দেবীকা তার মেডিক্যাল ভ্যান থেকে ওষুধ এনে আমার সেবায় খুব ব্যস্ত এবং সেই টোডাদের খুব তিরস্কার করছেন। কিছুক্ষণ পর শ্রীমতী দেবীকাকে জিজ্ঞাসা করি—প্রবীণ টোডারা আমাকে মহিষদের সঙ্গে পরলোকে পাঠাতে চাইছিল কেন? তিনি জানান—এই চিত্রগ্রহণের প্রস্তাব ওরা প্রথমেই নাকচ করে দেয় কারণ ওদের বিশ্বাস অন্ত্যেষ্টিকালীন অনুষ্ঠানের ছবি তোলা হলে সমস্ত উপস্থিত মানুষের আত্মা ক্যামেরার মধ্যে আটকা পড়ে যায়। তারা আর নিষ্কৃতি পায় না। ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি আমাকে চিত্রগ্রহণের অনুমতি দেন। ঐ কয়েকজন প্রবীণ টোডা সমানে সুযোগ খুঁজছিল আমাকে আক্রমণ করার এবং সে সুযোগ তারা পেয়ে যায়। যাইহোক, টোডাদের ঐ অনুষ্ঠানে এই দুর্ঘটনার জন্য কিছুটা বিঘ্নিত ঘটে। দেখি বহু টোডা আমাকে ঘিরে নানান কথাবার্তা বলছে। মুভি-ক্যামেরাটি দেখি আমার পাশেই পড়ে রয়েছে অক্ষত অবস্থায়। তাকে ভাঙচুর করেনি। স্টীল ক্যামেরা দুটিও ঠিক আছে। ধীরে ধীরে উঠে বসি। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণাবোধ করি। সমস্ত মাথা ব্যাণ্ডেজে

বাধা। শ্রীমতী দেবীকা আমাকে তাঁর মেডিক্যাল ভ্যানে যেতে পীড়াপীড়ি করেন, কারণ গাড়ীর মধ্যে পীড়িত ব্যক্তির জন্য একটি বিছানা আছে। গাড়ীতে গিয়ে শুয়ে থাকতে বলেন। তাঁকে জানাই অনুষ্ঠানের শেষ অংশ আমাকে চিত্রগ্রহণ করতেই হবে অবশ্য তাঁর যদি আপত্তি না থাকে। তিনি জানান—এই মুহূর্তে তাঁর আপত্তি আছে। আমার কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা দরকার যেহেতু বেশ কিছুটা রক্তক্ষরণ হয়ে গেছে। তাঁর উপদেশ মত একটি গাছের তলায় বসে বিশ্রাম নিতে থাকি। দূর থেকেই মহিষের মাথায় কুড়ুলের আঘাত ও মাথা ছোঁয়ানোর দৃশ্য গ্রহণ করি। বেশ কিছুক্ষণ পর প্রায় সূর্যাস্তের সময় লক্ষ্য করি মাটিতে পড়ে থাকা মৃতদেহটি কয়েকজন ধরাধরি করে খাটের উপর উঠিয়ে রাখে। ব্যাণ্ড পার্টি শবদেহের কাছে এসে ব্যাণ্ড বাজাতে থাকে। ব্যাণ্ডের ঐকতান শোনার পর শ্রীমতী দেবীকা জানান এবার শবদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে এবং দাহ করা হবে। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াই। মাথার যন্ত্রণাবোধ কিছুটা কম মনে হয়। এগুতে থাকি শ্মশানের দিকে। শ্রীমতী দেবীকা আমার সঙ্গেই থাকেন। অল্প সামান্য পথ। চারিদিকে বড় বড় গাছ, মাঝখানে বেশ কিছুটা উন্মুক্ত জায়গা। ঐ জায়গাটি মৃত ব্যক্তির গোত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট শ্মশান। শ্মশানে পৌঁছে দেখি চিতা সাজানো আছে। খাটসমেত মৃতদেহটি চিতার কিছু দূরে রাখা হয়। আগে চিতায় আগুন দেওয়া হবে তারপর মৃতদেহ চিতায় চড়ানো হবে। দেশলাইয়ের সাহায্যে কখনো আগুন জ্বালানো হয় না। কিরাজ গাছের দুইটি খণ্ডের ঘর্ষণের সাহায্যে আগুন সৃষ্টি করে চিতায় আগুন দেওয়া হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে দেশলাই ব্যবহার চলে। যথেষ্ট সময় চলে যায় আগুন সৃষ্টি করতে। সারাদিন ধরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি থাকায় ভিজে কাঠে আগুন সৃষ্টি করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। একটি ছোট টুকরো কাপড়ে প্রথমে আগুন ধরিয়ে সেই জলন্ত কাপড়টি চিতার উপর রাখা হয়। অন্ত্যেষ্টিকালীন অনুষ্ঠানে টোডারা যখন আসে, তখন কিছুটা মাখন অবশ্যই সঙ্গে আনে। চিতায় আগুন রাখার পর টোডা পুরুষেরা এক এক করে এসে কিছুটা করে মাখন চিতায় দিয়ে যেতে থাকে। ঐ মাখন আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। আগুন সমস্ত চিতায় ছড়িয়ে খাট সমেত মৃতদেহটি চিতার উপর রাখা হয়। টোডা-নারীর মৃত্যুর পর মহিষ উৎসর্গ করা হয় না। পরলোকেও টোডা নারী মহিষের দেহ স্পর্শ করার অধিকার পায় না। শুনেছি ভারত সরকার এই নৃশংস মহিষ হত্যা আইন করে বন্ধ করে দিয়েছেন। পরলোককে টোডারা আজও গভীরভাবে বিশ্বাস করে থাকে। তাদের ধর্মের সঙ্গে এই বিশ্বাসের গভীর সংযোগ রয়ে গেছে। সরকার আইন করে শত শত বছরের এই বিশ্বাসকে উচ্ছেদ করে দিতে পারেন না। টোডারা এখন হয়তো তাদের পরলোকবাসী আত্মীয়স্বজনদের ইহলোক থেকেই প্রত্যহ মহিষের দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি অর্পণ করে থাকে।

●

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(দুই)

চাক্ অথবা কুম্ভকারের চাক্ (Potters' wheel)-এ সিরামিক্‌স্ তৈরীর প্রক্রিয়ার নাম 'থ্রোয়িং' (Throwing)। সাধারণতঃ চাক্ দু' ধরণের হয়ে থাকে। একধরণের চাক্ সিরামিকশিল্পী পায়ের সাহায্যে ঘুরিয়ে তাতে সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে পারে ও অন্য ধরণের চাক্ ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘোরানো হয়ে থাকে। আর এক ধরণের চাক্‌ও আছে—যেগুলো সহকারীর সাহায্যে ঘোরানো যায়; এগুলোতে চরকার মতো একটি হাতল লাগানো থাকে—যেটি ঘোরালে চাক্‌টিও ঘুরতে থাকে।

চাক্-এ যে-যন্ত্রাংশগুলো থাকে—তার মধ্যে রয়েছে প্রায় তিন ফুট লম্বা একটি লোহার দণ্ড, কাঠের একটি টেবিল, ছয় ইঞ্চি ও এক ফুট ব্যাসার্ধের দুটি নিরেট লোহার চাকা এবং একটি কাঠের ফ্রেম। লোহার দণ্ডটি কাঠের টেবিলের মাঝায় লোহার পাতের বন্ধনীতে এবং তলার দিকে একটি কাঠের পাটাতনে লোহার কলিকে যুক্ত থাকে। লৌহদণ্ডটির মাথায় ছয় ইঞ্চি ব্যাসার্ধের লোহার চাকা এবং তলার দিকে কাঠের পাটাতনের একটু ওপরে এক ফুট ব্যাসার্ধের লোহার চাকাটি স্ক্রু-র সাহায্যে আটকে রাখা হয়। তলার লোহার চাকার একটু ওপর থেকে একটি কাঠের তক্তা সামনের দিকে ঢালু করে বসানো থাকে। সিরামিকশিল্পী একটি টুলে বসে একটি পা ঢালু তক্তার ওপর রেখে অপর পায়ের সাহায্যে তলাকার লোহার চাকাটি ঘুরিয়ে দিলে ওপরের লোহার চাকাটিও ঘুরতে থাকে। তলাকার চাকাটি বড়ো আকারের ও ভারি ওজনের হওয়ায় ওই চাকাটি একবার পায়ের সাহায্যে ঘুরিয়ে দিলে চাকাটির ঘূর্ণনের গতিবেগ কিছু সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে। চাকাটির গতিবেগ, ইচ্ছে করলে, পায়ের সাহায্যেই বাড়ানো ও কমানো যায়। যে-কাঠের ফ্রেমএর কথা আগে বলা হয়েছে—সেই ফ্রেমটি টেবিলের ওপর লোহার চাকার চারপাশে বসানো থাকে।

যেসব উৎপাদনকেন্দ্রে অধিক সংখ্যায় সিরামিক্‌স্ নির্মিত হয়—সেসব উৎপাদনকেন্দ্রে ইলেকট্রিক মোটরচালিত চাক্ ব্যবহার করা হয়। পদচালিত চাক্‌এর তুলনায় ইলেকট্রিক মোটরচালিত চাক্-এর গতি নিয়ন্ত্রণ করা কিছুটা অসুবিধাজনক হলেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অধিক সংখ্যক সিরামিক্‌স্ তৈরীর প্রয়োজনে ইলেকট্রিক মোটরচালিত চাক্‌ই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

চাক্-এ সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে গেলে মাটির মণ্ড বেশি শক্ত হলে অথবা বেশি নরম হলে—অর্থাৎ মাটির মণ্ডে মিশ্রিত জলের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম অথবা বেশি হলে সেই মাটি দিয়ে চাক্-এ সিরামিক্‌স্ তৈরী করা সম্ভব নয়। যে-মাটির মণ্ড নমনীয় অথচ গঠনকালীন আকৃতি যথাযথ বজায় রাখবার প্রয়োজনে উপযুক্ত দৃঢ়তাসম্পন্ন—সে-মাটিতেই চাক্-এ সিরামিক্‌স্ তৈরী করা সম্ভব হতে পারে। খানিকটা মাটির তাল দু'হাতের সাহায্যে পাকিয়ে দড়ির আকার দিয়ে সেই মাটির দড়িটি অর্ধবৃত্তাকার করে বাঁকালে যদি সেটি কেটে অথবা ভেঙে না যায় এবং অর্ধবৃত্তটি যথাযথই থাকে, তবেই বোঝা যাবে যে, ওই মাটি চাকে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত নমনীয়তা ও দৃঢ়তাসম্পন্ন।

নদী, পুকুর ও জলা জমি থেকে সংগৃহীত সাধারণ মাটি থ্রোয়িংএর আগে—অর্থাৎ, চাকে ব্যবহারের আগে ভালো করে ঠেসে ও মেখে নেওয়া প্রয়োজন। মাটির পরিমাণ অল্প হলে সেই মাটির তালটি কমপক্ষে অন্ততঃ ২০/২৫ বার ছুরির সাহায্যে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে দু'হাত দিয়ে মেখে ও ঠেসে নিতে হবে। সেই মাটি কয়েকটি ছোটো বড়ো বল-এর আকারে ভেজা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে; এতে মাটির বলগুলো শুকিয়ে শক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে না।

চাক্-এ সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে গেলে কয়েকটি হাতিয়ার (tools)-এর প্রয়োজন। হাতিয়ারগুলো হলো—একটি মাঝারি সাইজের ছুরি, কাঠের তৈরী কয়েকটি মসৃণ 'চেরী', কাঠের হাতল লাগানো একটি সূচীমুখ ধাতব শলাকা, একগুটের মতো সরু তার এবং একটি ক্যালিপার্স (Calipers)। এছাড়া একটি বাটিতে জল এবং এক টুকরো স্পঞ্জ হাতের কাছে রাখা দরকার।

থ্রোয়িং সুরু করতে গেলে ভেজা মাটির বলটিকে চাক্-এর কেন্দ্রে সঠিকভাবে বসানো দরকার। গোলাকার চাক্-এর কেন্দ্রে মাটি বসানোর এই প্রক্রিয়াটিকে ইংরেজীতে বলা হয় 'সেন্টারিং' (Centering)। চাকটি জলে ভিজিয়ে নিলে ভেজা চাক্-এর ওপর মাটির বল প্রয়োজনে এদিক-ওদিকে সরিয়ে সেন্টারিং করা যেতে পারে। চাকটি ঘুরিয়ে দিলে মধ্যবিন্দুস্থিত মাটির বলটি যদি নিশ্চল (Still) দেখায়—তবেই বুঝতে হবে সেন্টারিং ঠিকমতো হয়েছে। মাটির বলএর সেন্টারিং যদি ঠিকমতো না হয়, তবে ওই মাটিতে তৈরী সিরামিক্‌স্ একদিকে হেলে পড়তে পারে।

থ্রোয়িংএ তৈরী সিরামিক্‌স্‌এর তলার বেধ (thickness) পরিধির বেধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন। কোনো সিরামিকপাত্র তৈরী করবার সময়ে ওই পাত্রটির ভেতরে

শিল্পীর হাত তলার দিকে কতোটা পর্যন্ত পৌঁছুলে পাত্রটির তলার বেধ যথোপযুক্ত রাখা সম্ভব হতে পারে—সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। শিল্পীর হাত পাত্রটির ভেতর দিকে তলায় যদি যথোপযুক্ত গভীরভাবে না পৌঁছায়, তবে পাত্রটির তলার বেধ প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত পুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেক্ষেত্রে পাত্রটির পরিধির দেয়ালের বেধএর সঙ্গে তলার বেধএর সামঞ্জস্যের অভাব হতে পারে। আবার শিল্পীর হাত যদি পাত্রটির ভেতরে তলার দিকে বেশি নেমে যায় ও তলার জমিতে হাতের চাপ পড়ে, তবে পাত্রটির তলার জমির বেধ পরিধির দেয়ালের বেধের তুলনায় পাতলা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তাই থ্রোয়িং করবার সময়ে, চাকে সিরামিক্স্ তৈরী করবার সময়ে পাত্রটির পরিধির দেয়ালের বেধ যখন যথোপযুক্ত হয়েছে বলে মনে হবে, তখন প্রান্তক্ষ সূচীমুখ ধাতব শলাকাটি পাত্রের ভেতরে ঢুকিয়ে তলার জমি ফুঁড়ে বেধের মাপ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

খাড়া নলাকৃতি সিরামিকপাত্র চাকএ তৈরী করতে হলে ভেজা মাটির বলটি চাকের ওপর সেন্টারিং করে ওই বলটির মাঝখানে দু' হাতের দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চাপে গর্ত করে নিতে হবে। চাকটি যখন ঘুরতে থাকবে, তখন শিল্পীর বাঁ হাতের আঙুলগুলো ওই গর্তের ভেতরের দেয়ালে যেমন চাপ দিতে থাকবে, তেমনই ডান হাতের আঙুলগুলো মাটির বলটির বাইরের দেয়ালে চাপ দিতে থাকবে। শিল্পীর দু' হাতের আঙুলগুলো যেমন একদিকে মাটির দেয়ালের ভেতরে ও বাইরে চাপের সৃষ্টি করবে, তেমনি অপরদিকে একটি ঊর্ধ্বমুখী টানেরও সৃষ্টি করবে। ঘূর্ণনের গতিতে চাকের ওপর মাটির বলটিও ঘুরতে থাকবে। ঘূর্ণনের এই গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে শিল্পীর দু' হাতের আঙুলের চাপ ও ঊর্ধ্বমুখী টান মাটির বলটি থেকে একটি খাড়া নলাকৃতি সিরামিকপাত্র সৃষ্টি করবে। অবিচ্ছি চাকএর ঘূর্ণনের গতির সঙ্গে সমতা রক্ষা করে মাটির ওপর দু' হাতের আঙুলের চাপ এবং ঊর্ধ্বমুখী টানের প্রক্রিয়াটি একমাত্র দীর্ঘদিন অনুশীলনের পরই আয়ত্ব করা সম্ভব হতে পারে।

বৈর্যশীল অনুশীলনে প্রাথমিক অসুবিধাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে একজন সিরামিক-শিল্পীর কাছে থ্রোয়িং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজক বলে মনে হবে। চাকএ যে কেবলমাত্র খাবারি ও ছোটো আকারের গোলাকৃতি সিরামিকপাত্র তৈরী করাই সম্ভব—তা নয়। বিভিন্ন অংশ আলাদা ভাবে চাকএ তৈরী করে সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে বড়ো আকারের ভাস্কর্যও তৈরী করা যায়। য়ুরোপ ও আমেরিকার যে কয়জন সিরামিকশিল্পী সমসাময়িককালে এ-পদ্ধতিতে ভাস্কর্য সৃষ্টি করে পৃথিবীব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন—তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যাচ্ছে। এঁরা হলেন, জাঁ ডারভেল, র‍্যাটি, এড্রিস্ একহার্ট, এন্টোনিও প্রিয়েটো, লে বিন্সলিঙ, পোর্টেনিয়ার, মারিয়া উইস্নার এবং রোজমেরি ট্রাইক্।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

॥ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র ॥

C/o Thakur Saheb Hari Singhji
Commander-in-Chief,
Chaudpole Gate,
Jeypore.

4-12-'95

My dear Badri Shah.

Your letter has duly reached us. Very sorry to learn the severe illness of Sadananda. We have not got any letter from him. Please let us know his address. We are now all right here. Swami Gangadhar is now at Khetri. Soon expected to come here. Tender our best love to all of your brothers, Chiranjee Lal and Dhamu. Please tell Chiranjee Lal to send per V.P.P. parcel two pounds of Tea (best quality) to Thakur Saheb Bhoor Singhjee. Our *Ashish* to Siddha Das. Swami Sivananda is now at Benares. Vivekanand Swami is now delivering his lectures in England. Perhaps you have heard about the report of his lecture, which was published in the "Observer".

May the blessings of Bhagavan Ramakrishna attend on you. My best love and good wishes to you.

Yours &c.
Avedananda.

(Continued in the same letter)

My dear Mohanlal,

How are you going on with your studies ? How far have you learnt of the *Vyakaran*. Does your Panditjee (Debi Dutt) remember us. Tell him to write a few lines to us. Tender our best love to him. My good wishes to you all.

Yours &c.
Avedananda.

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-700014

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।
১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪।

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সন্নিবেশ, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রঃপুত এই কবচ ধারণে পরীক্ষায় পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—মুঙ্গা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্যুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অনুন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET, CALCUTTA-700006

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and	
Philosophy and Religion		Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	.15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music
by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I – III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
42nd Year, September 1980
VOL. VII

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

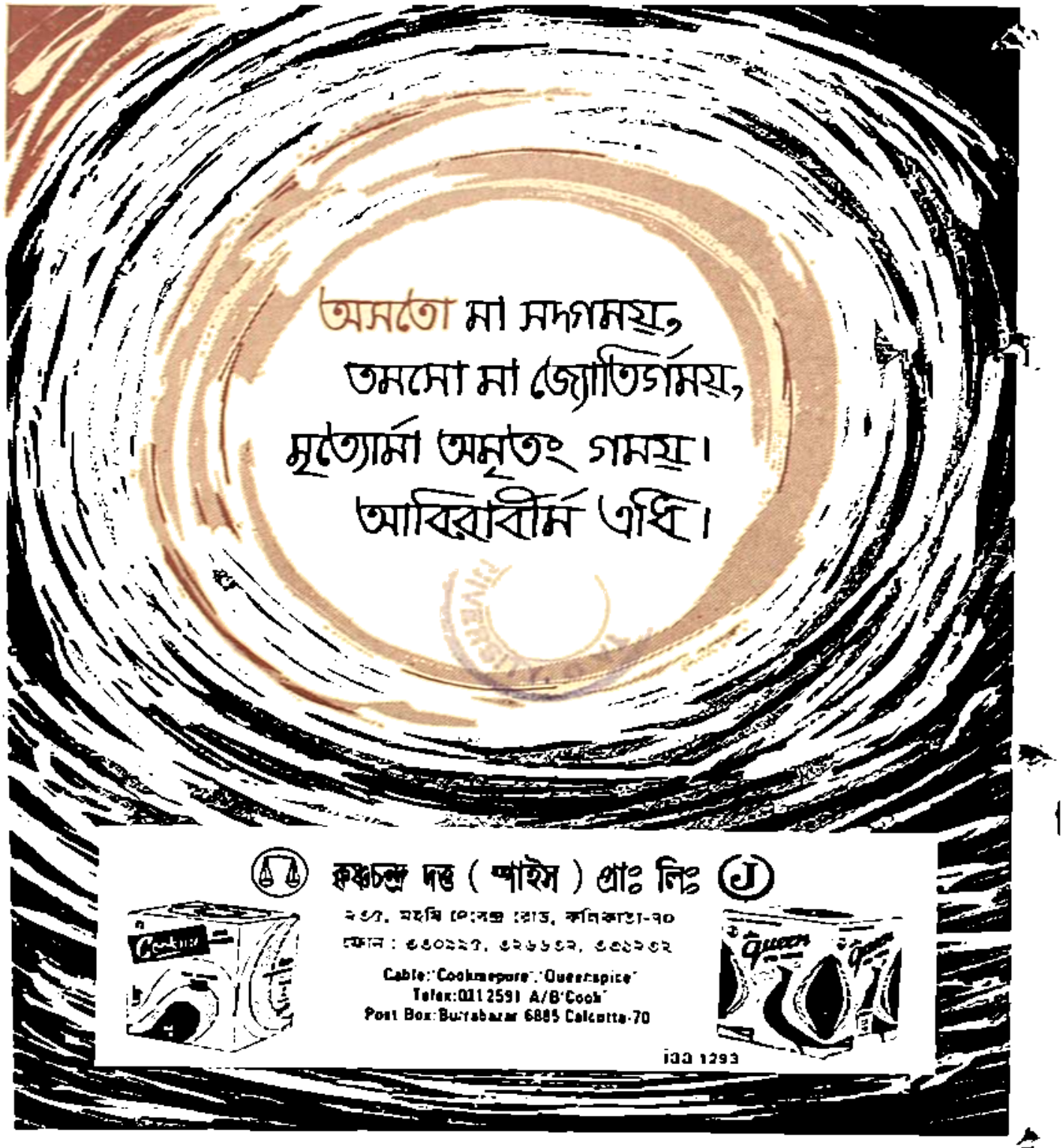

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
8, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-700006
ICE Rs. 1·50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১·৫০টাকা

সম্পাদক :
মী সদাত্মানন্দ
ী প্রজ্ঞানানন্দ
: সম্পাদক :
ন্তোষ ঘোষ

স্বামী সারদানন্দ
প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত পীঠ, কলিকাতা

বিয়াল্লিশবর্ষ
শারদীয়া সংখ্যা
আশ্বিন
১৩৮৭

P30403

আপনার জমা টাকার উপর আমরা
আকর্ষনীয় সুদ দিয়ে থাকি।

আমাদের নানা জমা প্রকল্পের সাহায্যে
আপনার সঞ্চয় বেড়ে উঠুক।

বিস্তৃত বিবরণ আমাদের নিকটতম
শাখা থেকে সংগ্রহ করুন।

বিকানীর ও জয়পুর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক
জনগণের ব্যাঙ্ক।

এর ভারতব্যাপী কিঞ্চিদাধিক ৪৮৬ শাখা
নিয়ত আপনার সেবায় রত।

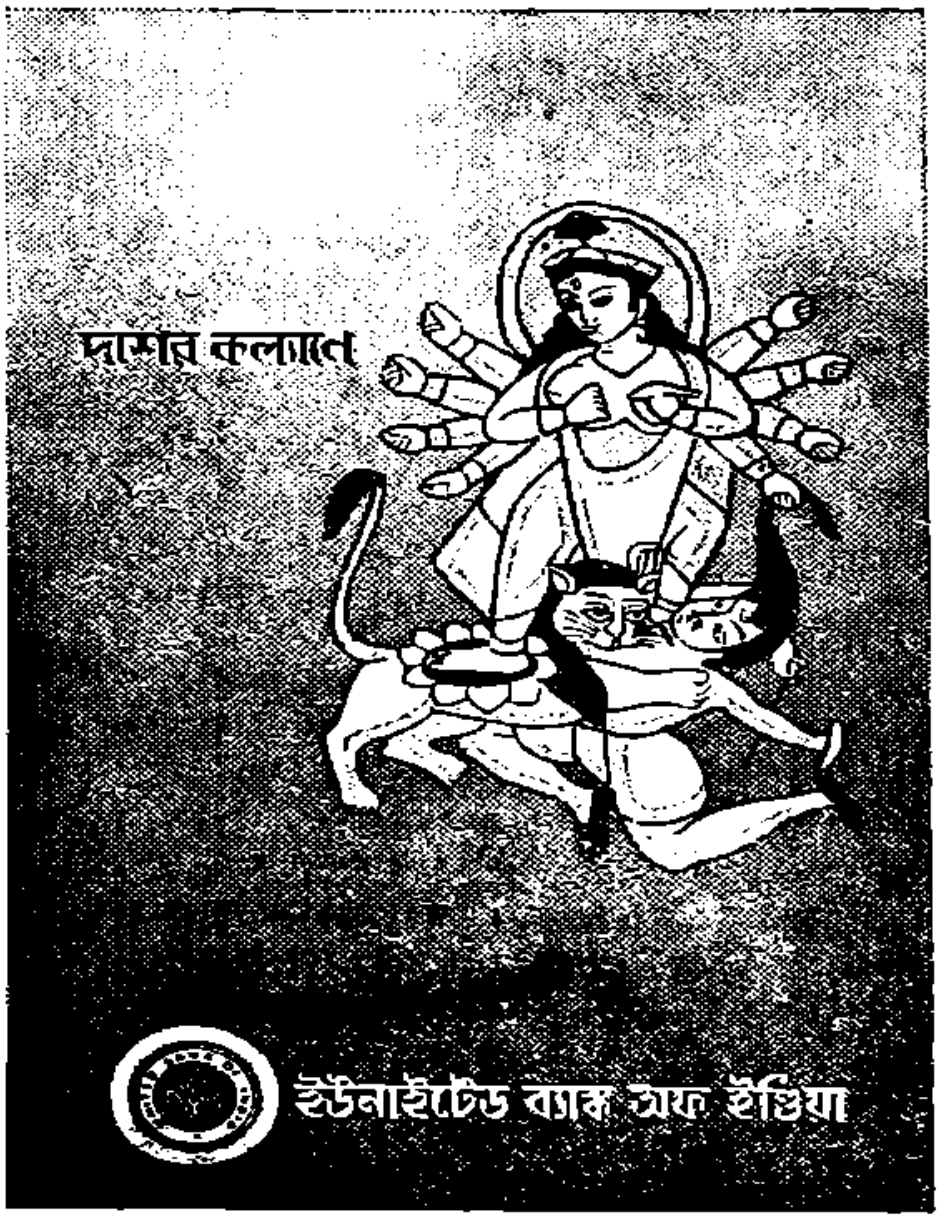
দুর্গার কল্যাণে
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে স্বামী বিবেকানন্দ	
মরণের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	হিন্দুনারী	৩·৫০
যোগশিক্ষা	১০·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	আত্মজ্ঞান	১০·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মবিকাশ	৬·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	কর্মবিজ্ঞান	
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০		

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্দ্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

রেজিষ্টার্ড ট্রেড মার্ক

শান্তিরস সালসা

ফ্রেণ্ড এণ্ড কোং

ভগ্নদেহে পূর্ণস্বাস্থ্য ও শক্তি প্রদান করে
বাত বেদনায় অব্যর্থ

সর্বত্র প্রাপ্তব্য

৪০১/৭এ, অপার চিৎপুর রোড (কলিকাতা) শাখা:-৩১/২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনস্

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৪-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৪

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯) ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JECT" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

"SANKHA"

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি: ৬

ফোন: ৩৩- ৩৭৯১

কেশগুচ্ছে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধ্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

ভারতের সর্ব্বৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠান

রাজ জ্যোতিষী মহোপাধ্যায় ডাঃ-হরিশচন্দ্র শাস্ত্রী প্রতিষ্ঠাতা ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত ডঃ এ, ভট্টাচার্য শাস্ত্রী পরিচালিত। এখানে হস্তরেখা বিচার, কোষ্ঠী বিচার, কোষ্ঠী প্রস্তুত প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্যোতিষকার্য অর্দ্ধশতাব্দীযাবৎ সঠিকভাবে করা হইতেছে। বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিষ্কৃতি প্রতিকার করা হয়।

ডঃ এ, ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী

হাউস অব এষ্ট্রোলজি (স্থাপিত ১৯৩০)

৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬

ফোন : ৪৭-৪৬১৩

সহকারী : ভট্টাচার্য অশেষ শাস্ত্রী

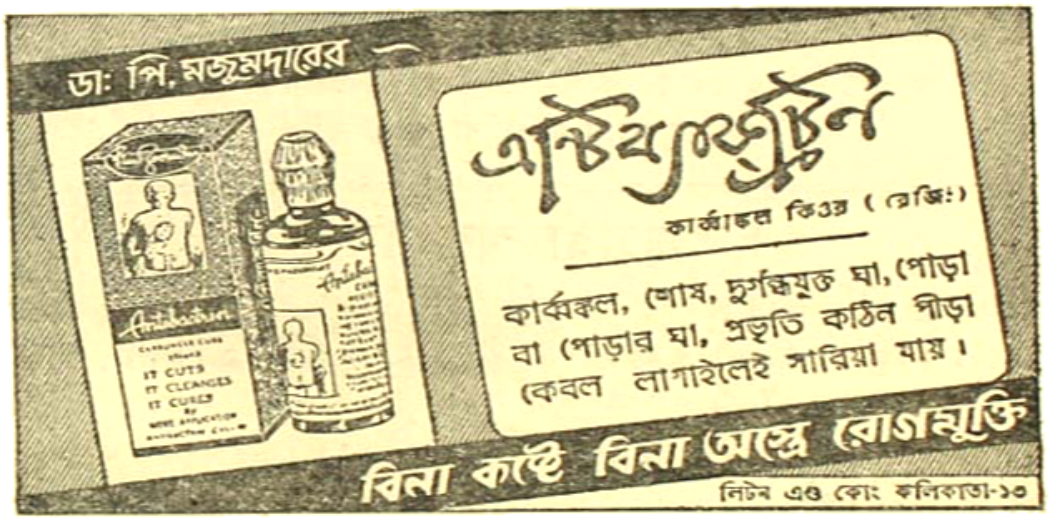

PHONE : 55-4520

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৪,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৫ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২২·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাব-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২০·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৪·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৫·০০

বীরত্বে বাঙ্গালী ৪·০০

বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ৮·০০

বাংলার ঋষি ৬·৫০

বাংলার মনীষী ৬·০০

বাংলার বিদুষী ৪·০০

ব্যবহারিক শব্দকোষ ১৮·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

আশ্বিন, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥
শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥
স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬
প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ
সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬
বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্. এস্. সি., এম্. বি. (কলি.), ডি. টি. এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

একটি বিশিষ্ট ধরনের গেঞ্জী

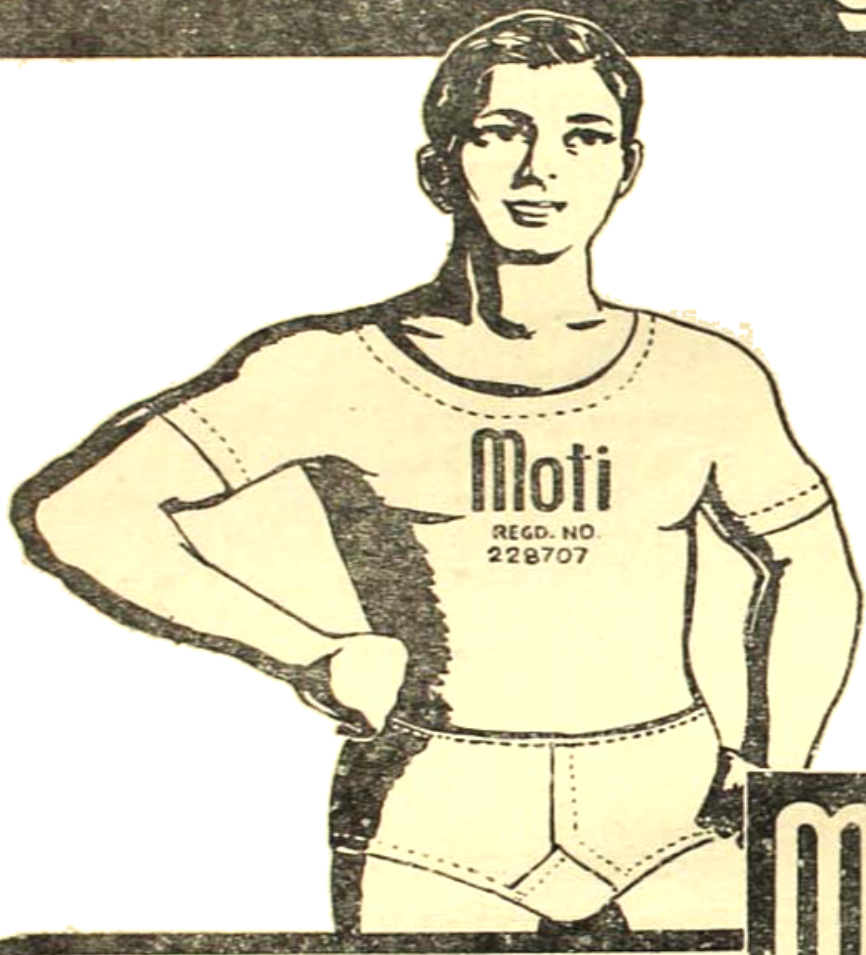

Moti
THE EAST END HOSIERY MILLS (P) LTD

মতী গেঞ্জী

রেজিঃ নং ২২৮৭০৭

প্রস্তুত কারক:
চেরী গ্রুপ

দি ইষ্ট এণ্ড হোসিয়ারী মিলস্ (প্রা-) লিঃ

১০০- রাজা দিনেন্দ্র ষ্ট্রীট ● কলিকাতা- ৬ ● ফোন ৩৫-৪৭৭২

বিশ্ববাণী

আশ্বিন, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	আগমনী	৩৭৩	
২।	বাণী ও বিচার	৩৭৫	
৩।	সেই চরণের পরশ যে চাই	৩৯৯	শ্রীশান্তশীল দাশ
৭।	রামকৃষ্ণস্মৃতির একটি ক্ষুদ্র কমল	৩৯৫	স্বামী প্রভানন্দ
৫।	আশ্বিনের গান	৪০১	শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত
৬।	মহতী বিনষ্টিঃ	৪০২	ডক্টর রমা চৌধুরী
৭।	বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে রামকাহিনী	৪০৬	অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী
৮।	প্রকৃতি, মানুষ ও অতিমানুষ	৪১২	শ্রীরণজিৎকুমার সেন
৯।	আদিকবি বাল্মীকি	৪১৭	ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

পশ্চিমবঙ্গে
মাঝারী ও বড় শিল্পস্থাপনের
পরিকল্পনা থাকলে আমাদের কাছে আসুন

নতুন শিল্পস্থাপন অথবা বর্তমান শিল্পের সম্প্রসারণ যদি করতে চান, সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা আপনাকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারি।

শিল্প নির্বাচন থেকে সুরু করে উৎসাহব্যঞ্জক নানারকম সরকারী অনুদান এবং সহজশর্তে ঋণ আমরা দিতে তো পারবই এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থাগুলির সাথেও আমরা আপনার যোগাযোগ স্থাপন করে দেব।

শিল্পায়নে সহায়তায় নির্ভরযোগ্য নাম

পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
২৩৫, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০১
টেলিফোন : ২২-৮৬৫০ (৭টি লাইন)

"শিরদার তো সরদার, মাথা নিতে পারো তো নেতা হবে।"

ভারতাত্মার মূর্ত বিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দকে যিনি ভাব-গুরুরূপে গ্রহণ ক'রে তাঁর অমোঘ বাণী নিজ জীবনে বহন করেছেন সকল নেতার নেতা সেই নেতাজীর সচিত্র পূর্ণজীবন-কাহিনী কার্টিজ কাগজে অফসেটে ছাপা বোর্ড বাঁধাই—

NETAJI—A PICTORIAL BIOGRAPHY—Rs. 50·00

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিবেকানন্দ চরিত ১৫·০০, ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

প্রফুল্লকুমার সরকার। শ্রীগৌরাঙ্গ ৬·০০, ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু ৪·০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা ৮·০০

সুভাষচন্দ্র বসু। তরুণের স্বপ্ন ১০·০০

শঙ্করী প্রসাদ বসু। নিবেদিতা লোকমাতা ৭০·০০, আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

সৌরীন্দ্র মিত্র। খ্যাতি অখ্যাতির নেপথ্যে ৪০·০০

কিশলয় ঠাকুর। পথের কবি ২০·০০

অমল দত্ত। ব্যক্তি মুক্তি সমাজ ৫·০০

অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সূর্য পথিক শ্রীঅরবিন্দ ৮·০০

শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদর্শে সংগীত ও নৃত্য ৫·০০

রাণী চন্দ। পথে ঘাটে ১৫·০০

পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়। মাধুরীলতার চিঠি ৫·০০

রাধারাণী দেবী। শরৎচন্দ্র : মানুষ এবং শিল্প ১৫·০০

ভিক্ষু বুদ্ধদেব ও মলয় দাশগুপ্ত। ফুলের বাগান ২০·০০

শিবকালী ভট্টাচার্য। চিরঞ্জীব বনৌষধি (তিন খণ্ডে) প্রতি খণ্ড ২৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

৪৫, বেনিয়াটোলা লেন ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১০।	মা অপর্ণার পদার্পণে	৪২৩	শ্রীহরধরঞ্জন কাব্যতীর্থ
১১।	শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	৪২৪	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১২।	অমৃতকণা	৪৩২	শ্রীঅজিতকান্তি সরকার
১৩।	রজনীকান্ত রচিত দু'একটি শাক্তগীতি প্রসঙ্গে	৪৩৩	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
১৪।	দুর্গার নানা নামে পশ্চিমবাঙলার গ্রামের নাম	৪৩৬	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫।	'রুক্মিনী'-দেবী-প্রসঙ্গে	৪৩৯	ত্রিপুরা বসু
১৬।	দক্ষিণের দাক্ষিণ্য	৪৪৪	সত্যেশ্বর অধিকারী
১৭।	দুর্গা বন্দনা	৪৫০	অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য
১৮।	সুরথ ও সমাধি	৪৫১	ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ

Space Donated By :—

ALLIED ABRASIVE & Co.

SERAMPORE

পড়বার মত বই

উপনিষদের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। সহজে উপনিষদগুলির পরিচয়, সামগ্রিক আলোচনা। [১০·০০]

তন্ত্রের কথা

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। তন্ত্রের তত্ত্ব ও চর্চার আলোচনা।
'বাঙালী ঘোর তান্ত্রিক'-কথাটার ব্যাখ্যা। [১০·০০]

সংস্কৃত নাটকের গল্প

শ্রীঅমিতা চক্রবর্তী কর্তৃক দশটি সেরা সংস্কৃত নাটকের গল্পরূপ। [৮·০০]

চীন-ভারত ও ভারত-চীন

পরিব্রাজকবৃন্দ

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত। চার বিরল মানচিত্র। [১০·০০]

কালিকট থেকে পলাশী

(১৪৯৮-১৭৫৭)

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী।
১০ মানচিত্র। [৬·৫০]

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী

কথাকোবিদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলার পল্লীর সহিত
রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র আবিষ্কারের প্রয়াস। [৪·৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

॥ শ্রেষ্ঠ সমালোচনা সাহিত্য ॥

ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত, এম. এ., ডি. ফিল.—**মধুসূদনের কবি-আত্মা ও কাব্যশিল্প** ২৫·০০
[পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ]

ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ, এম. এ., পি-এইচ. ডি.—**ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ** ২৫·০০

ডক্টর বৈদ্যনাথ শীল, এম. এ., ডি. ফিল.—**বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা** ২০·০০
[পরিবর্ধিত ৩য় সংস্করণ]

গুপ্তমন মাত্রা—গদ্যের সৌন্দর্য ১০·০০

ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস, এম. এ., ডি. লিট.—**বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ** ২০·০০

এ. কে. সরকার এ্যাণ্ড কোং

১/১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১২

রং

অক্ষয় কুমার লাহা

১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রাম : কলারম্যান ফোন : ২৩-২৭৬৫

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১৯।	হিমালয়ের পথে পথে — গাঙ্গোত্রী, গোমুখ	৪৫৬	শ্রীবিশ্বজিৎ দাস
২০।	ভাবনা	৪৬০	শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী
২১।	দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলায় ভাস্কর্য	৪৬১	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
২২।	জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা	৪৬৭	শ্রীআশুতোষ ঘোষ
২৩।	ভাষা সঙ্গীত	৪৭০	শ্রীসুরেশ চৌধুরী
২৪।	মহাকাশ অভিযান	৪৭১	শ্রীমতী চামেলী বসু
২৫।	হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট অঞ্চল	৪৭৬	শ্রীদিবাকর সেনরায়
২৬।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৪৮১	
২৭।	প্রতিবাদ	৪৮৪	

A. K. PRODUCTS

Distributors of :

INDIAN MINERALS & CHEMICALS

P-7 BELEGHATA MAIN ROAD,

CALCUTTA-10

Phone No. 35-5765 **Gram : CHALKDUST**

Puja Greetings :

BURN STANDARD COMPANY LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

★

10-C, HUNGERFORD STREET,

CALCUTTA-7000 017.

খাল-বিল-নদীর ভরা যৌবন।
শিশিরে ভেজা মাটিতে এখন পূজোর গন্ধ।
কাঠামো, খড়, মাটি ও ছাঁচ।
তার উপর তুলির রঙে আর ঘাগে অপরূপ প্রতিমা।
তার বোধনের আর কত দেরী ?

কলকাতাও এমনি এক অপরূপ প্রতিমা।
তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এই তিলোত্তমা।
তার চাল-চিত্র রচনায় আমরা দিন-রাত ব্যস্ত।
বোধনের আর দেরী নেই।

মেট্রো রেলওয়ে

আপনার বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কি স্কুলে যায় ?

সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যে ছেলেমেয়ের স্কুলের টাকা জোগাড় করার সমস্যাতেও তো আপনি চিন্তিত ছিলেন। এখন দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আপনি অন্ততঃ নিশ্চিন্ত। টানাপোড়েন সরকারেরও। টাকা নেই, সামর্থ্য সীমিত। তার মধ্যে দাঁড়িয়েও দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া অবৈতনিক করা হয়েছে এই কারণেই যাতে অল্প বিত্তবান পরিবারের অসংখ্য ছেলেমেয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হোন। আমরা এটিও নজর রাখছি যাতে শিক্ষকরা মাস পয়লায় মাইনে পাওয়ার ক্ষেত্রে খানিকটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। সমস্যা এখনও আছে অনেক। তবু আমরা চাই শিক্ষার আঙিনায় জনসাধারণের প্রবেশ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শারদোৎসবে

আমাদের আন্তরিক

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

গ্রহণ করুন।

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

১৬৫, শরৎ বসু রোড

কলিকাতা - ২৬

ফোন : ৫৫-৪৪৫৭

পি. রায় এণ্ড ব্রাদার্স

কোণারক ব্র্যাণ্ড সিমেণ্ট এজেণ্ট

সকল প্রকার রং, ইমারতী দ্রব্যের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

৫৬/৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মহাশক্তিস্বরূপিণী শ্রীশ্রীসারদাদেবী

বিয়াল্লিশ বর্ষ | শারদীয়া সংখ্যা | আশ্বিন ১৩৮৭

॥ আগমনী ॥

দেবি !

তব আগমনে আজি এ'বঙ্গে এল আনন্দের বান,
সহসা সবার ফুটাইলে হাসি পুলকে নাচালে প্রাণ।
হাসিতেছে আজি স্বাধীন প্রকৃতি তব শুভ-আগমনে,
সুমধুর সুরে আগমনী-গীতি গাহিছে বিহগগনে,
কুসুমকাননে ফুটিয়াছে ফুল লভিতে চরণ তব,
অলিগণও আজ আবাহন-ছলে গুঞ্জরিছে অভিনব !
নবীন শ্যামল দুর্বার দলে ফুটিয়া উঠেছে হাসি,
দূর নীলাকাশে হাসিছে চন্দ্রিমা হাসে তারকার রাশি।
পুলকে পাখীর কল-কাকলীতে মুখরিত দিগন্তর,
তরুণ অরুণ ছড়ায় কিরণ সারাপথ মনোহর।
পল্লীর কুটীর ধনী-দরিদ্র অনাথার অঙ্গন,
আজি ঝলমল হয়েছে উজ্জ্বল পেয়ে তব পরশন।
ক্রন্দাশ-ক্রন্দাশী অভাগা-অভাগী কত না বাধিত প্রাণ,
দুঃখ-কালিমা ভুলিয়া আজিকে গাহে তব জয়গান।
রাখাল বাজায় মিলন বাঁশরী নূতন সাজেতে সাজি,
খেয়াঘাটে মাঝি গায় নবসারি হয়বে মাতিয়া আজি।

তরঙ্গিনী তা'র কুলু কুলু তানে গাহে তব জয়গীতি,
ভক্তবৃন্দ করিছে কামনা—'হর মা ধরার ভার,
ঘুচাও জননি পলকে আসিয়া অশান্তি-অন্ধকার।
মানব-অসুরে ধ্বংস কর মা, সাধুরে কর মা ত্রাণ,—
এই মুহূর্ত্তে পাপেরলীলা কর মাগো অবসান।
মানব মনের কলুষিত ভাব নিমেষে কর মা দূর,
প্রীতি ও প্রেমেতে সবার অন্তর কর মাগো ভরপুর
হিংসা-দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-কলহ স্বার্থ অহংকার
বিভেদ-লড়াই—এই ধরণীর লও মাগো উপহার'।
এস দয়াময়ী দুর্গতিনাশিনী এস মাগো শুভক্ষণে,
নাশিয়া দুর্গতি শান্ত কর মা সন্তানসন্ততিগণে।

তন্ত্রসম্রাট রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীদ্বারকানাথ স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ, সামুদ্রিকরত্ন-কর্তৃক রচিত।

●

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(পঞ্চমাংশ)

॥ বিশিষ্টাদ্বৈতসম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

'ওজনে কম পড়ে'-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আমি সবই লই। তুরীয়, আবার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। আমি তিন অবস্থাই লই। ব্রহ্ম—আবার মায়া, জীব, জগৎ আমি সবই লই। সব না নিলে ওজনে কম পড়ে।

"একজন ভক্ত। ওজনে কেন কম পড়ে? (সকলের হাস্য)।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। ব্রহ্ম—জীব-জগৎবিশিষ্ট। প্রথম—নেতি নেতি করবার সময় জীব-জগৎকে ছেড়ে দিতে হয়। 'অহং'-বুদ্ধি যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনিই সব হয়েছেন—এই বোধ হয় না, তিনিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন—এ' অনুভব হয় না।

"বেলের সার বলতে গেলে শাঁসই বুঝায়, তখন বিচি আর খোলা ফেলে দিতে হয়। কিন্তু বেলটা কত ওজনে ছিল বলতে গেলে শুধু শাঁস ওজন করলে হবে না। ওজনের সময় শাঁস, বিচি, খোলা সব নিতে হবে। যাঁরই শাঁস, তাঁরই বিচি, তাঁরই খোলা" (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ১৩৮৬, পৃঃ ১৭১)।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বের মতোই সিদ্ধান্তের কথা বলেছেন: "তাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা"।

"তাই আমি নিত্য, লীলা সবই লই। মায়া বলে জগৎ-সংসার উড়িয়ে দিই না। তা হলে যে ওজনে কম পড়বে" (ঐ, পৃঃ ১৮০)।

পুনরায় ঈশ্বরদর্শন (God-vision)-প্রসঙ্গে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ ক'রে বলেছেন: "(মাষ্টারের প্রতি) আমি তাই দেখছি সাক্ষাৎ—আর কি বিচার করবো? আমি দেখছি—তিনিই (ব্রহ্মই বা মহাশক্তি কালীই) এই সব (জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব)[১] হয়েছেন। তিনিই জীব ও জগৎ হয়েছেন" (ঐ, পৃঃ ২০২)।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেখা বলতে চৈতন্য বা বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত মহাচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মসত্তার প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করা—'to see God face to face'. তিনি বিশ্বব্যাপী ব্রহ্মচৈতন্যের উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বিশ্বচৈতন্যকে জেনেছিলেন,—জেনেছিলেন পরিপূর্ণভাবে। এ'সম্বন্ধে তিনি বলেছেন: "তবে চৈতন্য না লাভ করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ?

১। চতুর্বিংশতিতত্ত্ব—সাংখ্য। 'চতুর্বিংশতিতত্ত্বাভিজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ'। 'ষড়্‌বিংশ ঈশ্বর ইতি পাতঞ্জলা ইতি'। পতঞ্জলি ঈশ্বরকে নিয়ে ২৬টি তত্ত্ব বলেছেন। 'পৌরাণিকাঃ প্রাহুস্ত্রিংশত্তত্ত্বানি'। 'ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্ববিত্যুক্তং সৈবাগমবিশারদৈঃ'। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সাধারণ্যে প্রচলিত ২৪টি তত্ত্বের কথাই বলেছেন।

যতক্ষণ না তাঁকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) লাভ করা যায়। শুধু মুখে হবে না। এই আমি দেখছি তিনি সব হয়েছেন (এটি শ্রীরামকৃষ্ণের নিজের অনুভূতি বা দেখা)।[২] তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায় " (ঐ, পৃঃ ২০২)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৯) শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী উদ্ধৃত ক'রে লিখেছেন : " = = যেন সচ্চিদানন্দ-সাগরে আত্মারূপ মীন ক্রীড়া করছে। তেমনি খুব বড় মাঠে দাঁড়ালে ঈশ্বরীয় ভাব হয়—যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে"। অনন্ত অসীম মহাচৈতন্যসাগরে প্রাণীমাত্রেই মীন বা মাছের মতো ভাসমান। প্রাণীমাত্রের অন্তরে ও বাইরে তাই কূলকিনারাহীন অসীম চিৎ বা ব্রহ্মচৈতন্যের সাগর। এই ব্রহ্ম-মহাসাগরকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জ্ঞানচক্ষে এবং উপলব্ধি করেছিলেন সীমাশূন্য একাকার, সেজন্য সম্ভব-অসম্ভব—প্রশ্নপর ও প্রশ্নাতীত বিশ্বসমস্যা ও ব্রহ্মতত্ত্বসমস্যার চিরসমাধান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ জীবনে।

এর পরের কথা আরও সুন্দর ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পূর্বপ্রসঙ্গের সূত্র ধরে পুনরায় বলেছেন : "চৈতন্য লাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়"। একথার অর্থ হ'ল ব্রহ্মানুভূতি হলে তবে ব্রহ্মবস্তু সত্যকারভাবে কি তা জানা ও বোঝা যায়। এ'সব কথাকে বা আলোচনাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিচার বলেছেন। সেজন্য শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় লিখেছেন : "বিচারান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারকে (শ্রীম-কে) বলিতেছেন—"। তিনি বলিতেছেন বিচারের স্বভাব ও রূপ কি এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচারে ও ধ্যানের সাহায্যে উপলব্ধিতে ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য কি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "দেখেছি—বিচার ক'রে এক রকম জানা যায়, আর তাঁকে ধ্যান ক'রে এক রকম জানা যায়"। অর্থাৎ ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মবস্তুকে দেখা, জানা বা উপলব্ধি করা দু'রকম ভাবে হয় : (১) এক রকম

২। "নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন : "কই কালীর ধ্যান তিন-চার দিন করলুম, কিছুই তো হলো না ?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন বলেছিলেন ধ্যান ক'রে একরকম জানা যায়—নরেন্দ্রনাথ তখন একথা বলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখন নিজের সর্বাত্মক-অনুভূতির কথা উল্লেখ ক'রে নরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন : "ক্রমে হবে। কালী আর কেউ নয়, যিনিই ব্রহ্ম—তিনিই কালী। কালী আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন ব্রহ্ম বলে কই।...যাঁকে তুমি ব্রহ্ম বলছো, তাঁকেই আমি কালী বলছি" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০২)। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুভূতির মধ্যে ব্রহ্ম ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই। একই ব্রহ্মসত্তাকে তিনি অবস্থাভেদে ব্রহ্ম বলেছেন, আবার শক্তি বা কালী বলেছেন। দৃষ্টিভেদ বলতে অনুভূতির ভেদে ব্রহ্ম, আবার কালী। কিন্তু একই বস্তু বা সত্তা। যেমন অগ্নি আর দাহিকাশক্তি।...ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। ওকেই (এক ব্রহ্মকেই) শক্তি, ওকেই কালী আমি বলি" (পৃঃ ২০৩)।

সাধারণত নেতি নেতি বিচার ক'রে ব্রহ্মানুভূতিতে জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সমস্তই একাকারে পরিণত হয়। আর সর্বানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতির পর জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সমস্তই এক ব্রহ্মসত্তা ছাড়া অন্য-কিছু বলে অনুভূত হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের এই অনুভূতি সর্বাত্মক-অনুভূতি। এই অনুভূতিতে বোধ হয়—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

—বিচার ক'রে বা বিচার করতে করতে বা বিচারের সময়ে সিদ্ধান্তে আসা এবং (২) আর এক রকম—বিচারসহ ধ্যানে বা ধ্যান করার পর। বিচারে মন থাকে বাস্তব জগতে—যদিও সে ক্ষণে ক্ষণে লক্ষ্যের দিকে যায়, আর ধ্যানে ধ্যেয়বস্তুনির্ধারণী হয় মনের বৃত্তি ও ঐ বৃত্তির থাকে লক্ষ্যে স্থিতি লাভ করার চেষ্টা বা প্রবৃত্তি। ধ্যেয়বস্তুবিধারণী মনোবৃত্তিই বিচার—সে বিচার স্থির বা নিশ্চয় করে জীবনের লক্ষ্য কি ও কোন্ বস্তু জীবনে প্রাপ্তব্য। তারপর সেই বৃত্তি বা মনোবৃত্তি লক্ষ্যে (ধ্যেয়বস্তুতে) কেন্দ্রীভূত হলেই হয় ধ্যান। এই ধ্যানের পূর্বে থাকে ধারণা। ধারণাও একটি মনোবৃত্তি—যাকে নিয়মিত বা সংযত ক'রে বিচার। বিচারসহ ধারণা সার্থক ও সফল হলে হয় ধ্যান এবং ধ্যানের পর হয় সমাধি—'যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ'। এই 'নিরোধঃ' অর্থে ভাষ্যকার ব্যাস বলেছেন: 'সমাধিঃ' ও বৃত্তিকার (রাজমার্তণ্ডবৃত্তি) ভোজ বলেছেন: 'স্বকারণে লয়ঃ'। বৃত্তিকার ভোজ বলেছেন: 'চিত্তস্য নির্মলসত্ত্বপরিণামরূপস্য যাঃ বৃত্তয়োঽঙ্গাঙ্গিভাবপরিণামরূপতায়াং নিরোধো বহির্মুখতয়া পরিণতিবিচ্ছেদাদন্তর্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন স্ব-স্বকারণে লয়ো যোগ ইত্যাখ্যায়তে।...একাগ্রে বহির্বৃত্তিনিরোধঃ। নিরুদ্ধে চ সর্বাসাং বৃত্তিনাং সংস্কারাণাং চ প্রবিলয় ইত্যনয়োরেব ভূম্যোর্যোগস্য সম্ভবঃ"। বিক্ষিপ্ত মনের বহির্বৃত্তির লোপ হলেই তা একটি অভিপ্রেত স্থানে, কেন্দ্রে বা বস্তুতে স্থির হয়। মনের এই স্থির অবস্থাকে বা স্থৈর্যকেই ব্যাস তাঁর ভাষ্যে সমাধি বা মহাপ্রশান্তির অবস্থা বলেছেন। এই ১।২ সূত্রের পরেই ১।৩ সূত্রে বলা হয়েছে: 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্'। 'দ্রষ্টুঃ পুরুষস্য তস্মিন কালে (নিরোধকালে) স্বরূপে চিন্মাত্ররূপতায়ামবস্থানং স্থিতির্ভবতি। ... গ্রাহ্যগ্রহণপরিণামাত্মাঃ বুদ্ধৌ চ আত্মনঃ স্বরূপেণাবস্থানং স্থিতির্ভবতি'। চিত্ত চঞ্চল অর্থে সংকল্প-বিকল্প-বৃত্তিযুক্ত হলে মন এবং বৃত্তিশূন্য হলেই চিতিস্বভাব শুদ্ধচৈতন্য। এজন্য মনের লয় বা মনের স্থৈর্য অর্থাৎ প্রশান্তি বলার চেয়ে রূপান্তর বলাই সমীচীন। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ রূপান্তর বা transformation-এর কথাই বলেছেন: 'The transformed state of mind in the pure consciousness or Chaitanya'. ভোজরাজের কথাও তাই যে, চিত্তের বা মনের নিরুদ্ধাবস্থা হলেই সর্বপ্রকার বৃত্তিরূপ সংস্কারের লয় হয়। এই সম্পূর্ণ লয়যুক্ত অবস্থার নাম বৃত্তিবিলীন সমাধি। 'সমাধি' বলতে প্রথমে সম্প্রজ্ঞাত, সবিচার, বা সবিতর্ক-সমাধি। তারপর অসম্প্রজ্ঞাত, নির্বিচার বা নির্বিতর্ক-সমাধি। এই নির্বিতর্কসমাধিই বেদান্তের নিদিধ্যাসনস্থানীয়। নিদিধ্যাসন সার্থক রূপ গ্রহণ করে মহাবাক্যের শ্রবণ ও মননের পর।[৩]

৩। আচার্য শঙ্কর ১।১।৪ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে 'শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (বৃহঃ উঃ ২।৪।৫) শ্রুতিবাক্যের প্রমাণ দিয়ে যদিও 'শ্রবণ'-কেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তবুও যেহেতু শ্রবণের অঙ্গ বা সহায়করূপে মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা বলা হয়েছে সেজন্য তিনি (শঙ্কর) বলেছেন: "ইতি শ্রবণোত্তরকালয়োঃ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ বিধিদর্শনাৎ"। অর্থাৎ যদিও একমাত্র শ্রবণের দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান-সাক্ষাৎকার সম্ভব তাহলেও বৃহদারণ্যকে (২।৪।৫) মনন ও নিদিধ্যাসনের বিধি থাকায় অঙ্গরূপেই গৃহীত হয়।

আচার্য শঙ্কর ঐ ভাষ্যে পরে বলেছেন: "শ্রবণাৎ পরাচীনয়োঃ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ দর্শনাৎ বিধিশেষত্বং ব্রহ্মণঃ, ন স্ব-স্বরূপপর্যবসায়িত্বং ইতি। ন অবগত্যর্থত্বাৎ মনননিদিধ্যাসনয়োঃ"। কথা এই

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের পরিচয় দিয়ে আচার্য পদ্মপাদ 'পঞ্চপাদিকা'-গ্রন্থে (Madras Govt. Oriental Series. 1958. p. 352) বলেছেন : "তথা চ শ্রবণং নাম আত্মাবগতয়ে বেদান্তবাক্যবিচারঃ শারীরকশ্রবণং চ। মননং যুক্তিনিষ্ঠবাক্যাপেক্ষিতদৃষ্টশ্রুতাদিদৃষ্টান্তজন্যস্থিতিলয়-বাচ্যত্বস্তুপত্বাদিযুক্ত্যর্থবাদানুসন্ধানং বাক্যার্থবিরোধ্যনুমানানুসন্ধানং চ। নিদিধ্যাসনং মনোপকৃঢ়হিতবাক্যার্থবিষয়ে স্থিরীভাবঃ"। এখানে আচার্য পদ্মপাদ (শঙ্করশিষ্য) যথার্থদর্শনের (অনুভূতির) কথা বলেছেন অপরোক্ষভাবে। তিনি বলেছেন : "দর্শনং পুনস্তত্র বাক্যার্থে স্থৈর্যাদ্বিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চাবভাসবিজ্ঞানধনৈকতানুভবঃ"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দর্শনের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "এই আমি দেখছি তিনিই সব হয়েছেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০২)। আচার্য পদ্মপাদ বলেছেন : 'তত্ত্বমসি-মহাবাক্যজাত স্থির ও এই রকম জ্ঞান বা বিজ্ঞান —যে বিজ্ঞানে সমস্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের অবভাস আর থাকে না, থাকে একমাত্র একরস অখণ্ড জ্ঞানসত্তার অনুভব বা উপলব্ধি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও পদ্মপাদের দর্শনাভিধানের মধ্যে প্রাতীতিক পার্থক্য হ'ল যেখানে পদ্মপাদ জ্ঞানে বা ব্রহ্মবিজ্ঞানে সমস্ত প্রপঞ্চের অবভাস ও ব্যবহারিক-প্রকাশকে নিষেধ করেছেন—সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিজ্ঞান, চেতন ও অবচেতন এবং ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সব-কিছু হয়েছেন। এই সব-হওয়ার নাম পূর্ণপ্রকাশ।[৪] ঈশোপনিষদের 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'—মন্ত্রটিই শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন বা প্রত্যক্ষানুভূতির প্রমাণ নির্দেশ করে। তবে এ'প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সর্বানুভূতিরূপ ব্রহ্মানুভূতির পর 'তিনিই সব হয়েছেন' বলেছেন সেখানে 'সব' বা সব-কিছু কিন্তু রামানুজের মতো ব্রহ্ম জীব (চিৎ), জগৎ (অচিৎ) ও ঈশ্বর একটি একটি একত্রে মিলে বা পরস্পর একত্রে থেকে সমবেতরূপ গ্রহণ করেছে—এ'কথা নয়। এই মতটি হেগেলীয় ও ব্রাডলেরও ব্রহ্মের সমন্বিত ও সামগ্রীক রূপ—যে রূপে সমস্ত-কিছুই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে থেকে ব্রহ্মের মধ্যে মিশে এক হয়ে থাকে ; কিংবা ব্রাডলের মতো transmuted alter ego (অবস্থান্তরিত) বা 'one unitary all-comprehensive, perfectly self-coherent whole' অর্থাৎ আত্মসঙ্গতি-

---

যে, শ্রবণ ও মননাদির (বিচার) দ্বারা প্রতিবন্ধক বিদূরিত হলে অন্তিম-শ্রবণের পর সেই বিচার্য ব্রহ্মই অপরোক্ষ হন। বিবরণ-মতাবলম্বীরা বলেন 'শ্রবণাৎ মুক্তিঃ'—শ্রবণ ও বিচারদ্বারাই মুক্তি বলতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়, আর যদি একান্তভাবে না হয় তবে শ্রবণের পর মনন ও নিদিধ্যাসন-বিধির প্রয়োগ বিধেয়।

'ভামতীপ্রস্থান'-টীকায় আচার্য বাচস্পতিমিশ্র-সম্মতী অনুরূপ কথাই বলেছেন : "শ্রবণং জ্ঞানকরণবেদান্ত বোধত্বাৎ প্রধানং, মনননিদিধ্যাসনয়োঃ প্রমেয়বোধত্বাৎ তদঙ্গত্বম্"। পুনরায় ভামতীটীকায় একথাই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু আচার্য বাচস্পতিমিশ্র একথা স্বীকার করেন না—সেকথা পূর্বে বলেছি।

৪। এটি এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে যে, ব্রহ্মানুভূতির দুটি প্রকাশস্তর কল্পনা করা হয় : (১) একটি ব্যষ্টি-অনুভূতি—'অহং ব্রহ্মাস্মি' (২) আর একটি সমষ্টি-অনুভূতি—'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। দুটি অনুভূতির মধ্যে কোন দেশের ও কালের ভেদ নাই। দুটি একই সঙ্গে (synultaneously) হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একথা সমষ্টি-অনুভূতির দিক থেকে বলেছেন : "তিনি (ব্রহ্মই) সব হয়েছেন"। তাছাড়া অনুভূতির আধার তিনটি স্তর—মন, বুদ্ধি ও বোধি—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন।

সম্পন্ন সর্বব্যাপক এক ও অদ্বিতীয় সত্তা নয়। ব্রাহ্মদের ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে বি-শাখাবিশিষ্ট বা দ্বৈতভাবযুক্ত ও তর্ক-বিতর্কসমন্বিত অখণ্ড সত্তা, কিন্তু বেদান্তের ও শ্রীরামকৃষ্ণের ব্রহ্ম সর্বতর্কাতীত সর্ববিকারাতীত অখণ্ড, একরস, ও একসত্তা।

॥ আচার্য রামানুজের বেদান্তমত ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেল ও তার শাঁস ও বিচির কথায় বেলের ওজনের সম্পর্কে রামানুজ-মতের কিছুটা পরিচয় দিয়েছেন সেকথা পূর্বে বলেছি। আচার্য রামানুজ বা বহু-রামানুজ জীব, জগৎ ও ঈশ্বর তিনটির সমবায়ে তাঁর ব্রহ্মের পূর্ণসত্তা স্বীকার করেন, এজন্য রামানুজের মতবাদকে বিশেষণ-বিশেষিত অদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও একথা ব্যবহারিকভাবে স্বীকার করেন এবং এ'সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অভিমত পূর্বে বেল, খোলা ও শাঁসের উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করেছি। বলেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব বেদান্তের বিভিন্ন মতবাদই স্বীকার করতেন। বিশিষ্টাদ্বৈত-বেদান্তমতের অর্থাৎ রামানুজের মতবাদের উল্লেখ তিনি উদাহরণস্বরূপেই করতেন, নচেৎ বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী থেকেও তিনি বিভিন্ন ধর্মমতের সাধনা করলেও অদ্বৈতমতেরই বিশেষভাবে অনুসারী ছিলেন।

মোটকথা শ্রীরামকৃষ্ণদেব আচার্য রামানুজের দর্শনমতের উল্লেখ করলেও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতমতবাদের সঙ্গে তাঁর মতের বহু পার্থক্য। রামানুজ জীব (জীবাত্মা), জড় (জগৎ) ও পুরুষোত্তমরূপ ঈশ্বর—তিনটি বস্তুতত্ত্বের কথা বলেছেন। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলদেব বিদ্যাভূষণ তিনটি তত্ত্বের পরিবর্তে পরিচয় দিয়েছেন ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি বস্তুতত্ত্বের—"ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালকর্মাণিপঞ্চতত্ত্বানি শ্রয়ন্তে"। রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে পুরুষোত্তম বলে স্বীকার ক'রে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। রামানুজের পুরুষোত্তম সগুণ ও সবিশেষ ঈশ্বর, সেজন্য রামানুজের মতে ঈশ্বর স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—চেতনাচেতনবিশিষ্ট ব্রহ্ম, অশেষকল্যাণগুণের আকর, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, স্বতঃপ্রকাশ ও বিশ্বচরাচরের একমাত্র নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতা। রামানুজ বলেছেন: "অতঃ সর্বং জ্ঞানং সত্যং সবিশেষবিষয়ং চ", কিংবা "ব্রহ্মশব্দেন স্বভাবতো নিরস্তনিখিলদোষোঽনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণঃ পুরুষোত্তমোঽভিধীয়তে" (শ্রীভাষ্য), কেননা নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কোন প্রমাণেরই গম্য নন—"নির্বিশেষবস্তুবাদিভিনির্বিশেষে বস্তুনি ইদং প্রমাণমিতি ন শক্যতে বক্তুম্। সবিশেষবস্তুবিষয়ত্বাৎ সর্বপ্রমাণম্"। সুতরাং সত্যসংকল্পত্ব, সর্বান্তরত্ব, সর্বাধারত্ব প্রভৃতি অশেষ গুণসকলের সম্পূর্ণভাবে অধিকারী রামানুজের ব্রহ্ম—"ইতি হেয়গুণান্ প্রতিষিধ্য সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ ইতি কল্যাণগুণান্ বিধত্তে। শ্রুতিরেবাত্র সামান্যেনাবগতং গুণনিষেধং হেয়গুণবিষয়ং ব্যবস্থাপয়তি"।

আচার্য রামানুজ 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের ভাষ্যে বলেছেন: "কিং পুনস্তদ্ ব্রহ্ম, যৎ জিজ্ঞাস্যমুচ্যতে, ইত্যত্রাহ 'জন্মাদি' ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ম্।···অস্য (অচিতস্য) অচিন্ত্যবিবিধবিচিত্রবচনস্যনিয়তদেশকালফলভোগব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তক্ষেত্রজ্ঞমিশ্রস্য জগতঃ 'যতঃ'

যস্মাৎ সর্বেশ্বরাৎ নিখিলহেয়প্রত্যনীকস্বরূপাৎ সত্যসঙ্কল্পাৎ জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণাৎ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ পরমকারুণিকাৎ পরস্মাৎ পুংসঃ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়াঃ প্রবর্তন্তে, তদ্ ব্রহ্মেতি সূত্রার্থঃ"। আচার্য রামানুজ প্রকারান্তরে সগুণব্রহ্মই যে জন্মাদি কর্মের কারণ ও কেন্দ্র সে'কথার আভাস দিয়েছেন। সেজন্য পুনরায় তিনি ১।১।২ সূত্রভাষ্যে বলেছেন: "জগদ্নিমিত্তোপাদানতা-ক্ষিপ্ত-সর্বজ্ঞত্ব-সত্যসঙ্কল্পত্ব-বিচিত্রশক্তিযোগাকারবত্ত্বেন প্রতিপন্নং ব্রহ্মেতি চ।* * * যে তু 'নির্বিশেষং বস্তুজিজ্ঞাস্যম্' ইতি বদন্তি। তন্মতে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ইত্যাদিসঙ্গতং স্যাৎ···ন নির্বিশেষবস্তুনি প্রমাণম্··"। আচার্য রামানুজের বক্তব্য এই যে, ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষ ও নির্গুণ হন, কোনরূপ ধর্মই (বিশেষণই) ব্রহ্মে না থাকে, তবে 'সাধ্য-ধর্মাব্যভিচারী' প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত কোন অনুমানই ব্রহ্মসম্বন্ধে করা সম্ভব হয় না, সেজন্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় প্রভৃতি কার্যের বিষয়ও তখন ব্রহ্ম নন এবং এ'সম্বন্ধে কোন অনুমানও অসম্ভব। সেজন্য সমস্ত কল্যাণগুণধর্মবিশিষ্ট সবিশেষ ও সগুণ-ব্রহ্মই বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতির কারণ এবং মায়াশক্তির প্রকাশ ও স্থিতি সগুণ-সবিশেষ-ব্রহ্মেই সম্ভব হয়।

আচার্য রামানুজ তাঁর 'বেদান্তসার'-গ্রন্থেও এ'সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা করেছেন 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের ব্যাখ্যায়। তিনি বলেছেন: "অতঃ সর্বদা চিদচিদ্বস্তু-শরীরকতয়া তদাত্মভূতমেব ব্রহ্ম। কদাচিদবিভক্তনামরূপচিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎকারণাবস্থম্; কদাচিচ্চ বিভক্তনামরূপচিদচিদ্বস্তুশরীরং তৎকার্যাবস্থং ব্রহ্ম। সর্বদা চিদচিদ্বস্তুশরীরকতয়া তদ্বিশিষ্টত্বেঽপি ব্রহ্মণঃ পরিণামিত্বাপুরুষার্থাশ্রয়ত্বে শরীরভূতচেতনাচেতনবস্তুগতে। আত্মভূতং ব্রহ্ম সর্বদা নিরস্তনিখিলদোষগন্ধানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়জ্ঞানানন্দাদ্যাত্মপরিমিতোদারগুণসাগরমব-তিষ্ঠত ইতি ব্রহ্মৈব জগন্নিমিত্তমুপাদানং চেতি 'যতো বা ইমানি' ইত্যাদি বাক্যং প্রতিপাদয়ত্যেবেতি জন্মাদ্যস্য যতস্তদ্ ব্রহ্মেতি"।

রামানুজ 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে পুনরায় উল্লেখ করেছেন: "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়' ইতি। তন্নামরূপবিভাগানর্হসূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুশরীরকতয়ৈবাবস্থিতং নামরূপবিভাগার্হস্থূলদশাপন্ন্যা বহুপ্রকারং স্যামিতৈক্ষত"। এখানে বলা হয়েছে যে, ব্রহ্মের শরীর দোষে ও গুণে সমলঙ্কৃত হলেও তিনি সকল কল্যাণগুণের আকর, সকল জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতির আশ্রয়, সেজন্য সকল দোষেরই সেখানে বিলয় হয়। সর্বগুণান্বিত বলে সর্বদোষের তিনি অতীত।

আচার্য রামানুজের দর্শনমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে মনে পড়ে ঋষি শ্রীঅরবিন্দের অভিমত। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ তাঁর *Synthesis of the Bhagavadgita*-গ্রন্থে ক্ষর ও অক্ষরের পর পুরুষোত্তম ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেছেন। এই পুরুষোত্তম বিচারদৃষ্টিতে সগুণ-ব্রহ্ম ছাড়া অন্য-কিছু নন। তিনি তাঁর *The Life Divine*-গ্রন্থের ১৭শ অধ্যায়ে 'The Progress to Knowledge—God, Man and Nature' (New York, The Greystone Press, 1949, p. 609) জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্মর তিনটি অপরিহার্য অংশ বা অবয়ব স্বীকার করেছেন—যে স্বীকৃতির আলোচনা রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদকেই বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঋষি শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন: "...Yet even this

Absolute he really affirms by itself and to the exclusion of the two other categories : for then he has only made a violent leap away from the problem he is here to solve, and he himself and the cosmos remain an inexplicable mystification or a purposeless mystery....An acceptance, a perception of the unity of these three categories is essential to the knowledge.....or the fundamental significances of existence".

এই ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ গ্রন্থের অনির্বাণ-অনূদিত 'দীপ্যজীবন' ('বিদ্যার পথে—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর' আলোচনা) থেকে কিছুটা উদ্ধৃত ক'রে বলি : "জীব, জগৎ ও ব্রহ্ম—এই তিনটি তত্ত্বের অন্বয়-সমন্বয়ের স্বীকৃতিতে ও অনুভবে পরাবিদ্যার সত্যরূপ ফোটে। এই পরম-ত্রিপুটীর একত্ব এবং অভঙ্গসমাহারের উপলব্ধিকে লক্ষ্য ক'রে মানুষের উপচীয়মান আত্মসংবিতের কমলদল উন্মিলিত হচ্ছে। এই মহাসামরস্যের দিব্যধামেই তাঁর পরমতৃপ্তি ও চরমপূর্ণতা।···আত্মবিদ্যা বিশ্ববিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার সম্যক-উপচয়ে যে ত্রিবিদ্যার অন্যোন্যসম্পৃচিত অদ্বৈতভাবনার মহাসঙ্গমতীর্থে উত্তীর্ণ হবে। এই সমগ্রবিজ্ঞানে তার পূর্ণাহুতি। যতক্ষণ সে আত্মা জগৎ ও ব্রহ্মের একদেশকে মাত্র জানবে ততক্ষণ তার সে অপূর্ণ জ্ঞান হতে ভেদের সৃষ্টি হবে। দৃষ্টির এই ন্যূনতা দূর হবে অন্বয়সমন্বয়ের উদারভূমিতে তিনটি তত্ত্বের সম্যক্-উপলব্ধিতে। তখনই তাদের সত্যের সমগ্ররূপ মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে—অপসৃত হবে অস্তিত্বের অনাদিরহস্যের যবনিকা।

"অবশ্য একথার এমন অর্থ নয় যে, ব্রহ্ম স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বয়ম্ভু তত্ত্ব নন। ব্রহ্ম আপনাতে আপনি আছেন—জীব কি জগৎকে আশ্রয় ক'রে নয়? অথচ জীব ও জগৎব্রহ্মকে ধরেই আছে—আপনাতে আপনি থাকবার সাধ্য তাদের নাই। ব্রহ্মসত্তার সঙ্গে জীব ও জগতের সত্তা এক হয়ে আছে—তাদের স্বরূপভাবের একমাত্র তাৎপর্য। কিন্তু তবু তারা (জীব ও জগৎ) ব্রহ্মশক্তির বিসৃষ্টি এবং তাঁর শাশ্বত সদ্‌ভাবে তাদের চিন্ময় তত্ত্বভাব কোন-না-কোন উপায়ে নিহিত আছে···" (পৃঃ ৬১১)। আচার্য রামানুজের জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—এই তিন তত্ত্ব-সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের মতবাদ প্রায় একই রকমের।

আচার্য রামানুজ প্রকৃতি ও কালকে দু'রকম জড়বস্তু বলেন, আর প্রকৃতি চতুর্বিংশত্যাত্মিকা, জীব বদ্ধ, মুক্ত ও নিত্য, জীব ও জগৎ ঈশ্বরের শরীর জীব ও ঈশ্বর নিত্য বিভু। জীব শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের নিত্যদাস, জীব জীবাত্মা এবং ঈশ্বরই আত্মা অর্থে পরমাত্মা।

॥ শঙ্কর ও রামানুজ-মতের তুলনা ॥

অদ্বৈতবেদান্তমতের সঙ্গে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের পার্থক্য যথেষ্ট সেকথা পূর্বে বলেছি।[৭] আচার্য শঙ্কর নির্বিশেষ ও জ্ঞানস্বরূপ নির্গুণ-ব্রহ্ম স্বীকার করেন এবং সগুণ-ব্রহ্ম

৭। আচার্য রামানুজের দর্শনমতের আলোচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক সুরীন্দ্রকুমার মৈত্র বলেন : "The system of Ramanuja rejects the Jaina doctrine of *anekāntavāda* and its theory of

মায়াশ্রিত, কিন্তু রামানুজ সবিশেষ ও আপেক্ষিক জ্ঞান স্বীকার করেন এবং সবিশেষত্ব অর্থে জ্ঞানের উপাধি বা গুণ। শঙ্করের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু রামানুজের মতে জ্ঞানের প্রকাশ ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করে, সেজন্য আপেক্ষিক। শঙ্করের মতে মায়া, অজ্ঞান ও অবিদ্যা এককথা, রামানুজের মতে মায়া ও অবিদ্যা বা অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন, কেননা মায়া ঈশ্বরাশ্রিত এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবাশ্রিত। অবশ্য বাচস্পতি মিশ্র মায়া ও অবিদ্যা কিংবা অজ্ঞানপক্ষে রামানুজের অনুযায়ী অভিমতই পোষণ করেন। শঙ্করের মতে জ্ঞান মুক্তির কারণ এবং রামানুজের মতে ভক্তিই মুক্তির কারণ, তবে জ্ঞান ভক্তির সহকারী হতে পারে—যেমন প্রেমাভক্তি, শুদ্ধাভক্তি বা জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি। শঙ্করের মতে জ্ঞান সেই জ্ঞান—যাতে আত্মা ও অনুভূতি অভিন্ন পদার্থ, কিন্তু রামানুজ একথা স্বীকার করেন না। রামানুজের মতে আত্মা ঈশ্বর এবং জ্ঞান ঈশ্বরের অধীন (ঈশ্বরের করুণার অধীন ?)। শঙ্করের মতে নির্বিশেষ-ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান নির্বিকল্পক, সুতরাং তা বিশেষ ও বিশেষণ সম্পর্কবিহীন এবং অতীন্দ্রিয়, কিন্তু রামানুজের মতে জাতি, গুণ ও ক্রিয়া এদের কোন-একটি বিশেষ ধর্মের সাহায্য না নিয়ে জ্ঞান প্রকাশিত হয় না, সুতরাং নির্বিকল্পক-জ্ঞান অসম্ভব এবং জ্ঞান আনন্দ ও প্রেমস্বরূপ ব'লে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তাছাড়া শঙ্কর বিবর্তবাদ স্বীকার করেন এবং রামানুজ পরিণামবাদী—জীবজগৎ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ঈশ্বরের নির্মিত বা সৃষ্ট। শঙ্কর বলেন যে, জীব ব্রহ্মেরই আভাস বা প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্মবিম্ব, রামানুজ বলেন সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর স্বপ্রকাশ ও নিত্যমুক্ত নন। তাছাড়া জীব ঈশ্বরের অংশ, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, সুতরাং জীবে ও ঈশ্বরে বা সগুণ-ব্রহ্মে পার্থক্য যথেষ্ট। শঙ্করের মতে জীব বা জীবাত্মা দ্রষ্টা-দর্শন-দৃশ্য এই ত্রিপুটিলয়ের পরে চিন্মাত্ররূপ সদ্‌ব্রহ্মেই লয় অর্থে ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু রামানুজের মতে অণুপরিমাণ ও অল্পজ্ঞ নিত্যদাস জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের কোনদিনই অভিন্নতা বা তাদাত্ম্য কল্পনাও করা যাবে না, সুতরাং মুক্তিদশায় জীব মাত্র ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ ক'রে সেবকরূপে নিত্যবিরাজ করে। শঙ্কর বলেন জীব বর্তমান জন্মেই অজ্ঞান দূর ক'রে জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করতে পারে এবং এই জীবন্মুক্তির অবস্থাই স্থিতপ্রজ্ঞ-ব্রহ্মজ্ঞানীর অবস্থা। রামানুজ একথা স্বীকার করেন না; তিনি বলেন জীবন্মুক্তিবাদ একটি কথামাত্র, কেননা জীব অজ্ঞানের ফলস্বরূপ এবং দেহপাতের পরই জীব বিদেহাবস্থায় মুক্তি লাভ করে। সুতরাং রামানুজের মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈত, কিন্তু একান্তপক্ষে দ্বৈতাবগাহী হওয়ার অসঙ্গত, সেজন্য শঙ্কর

---

sevenfold predication (*saptabhang-naya*). According to Ramanuja, there being only one principle really existent, the co-existence of existence, non-existence and other modes in a plurality of really existing things in an impossibility....There are three principles—*cit*, the conscious soul, *acit*, the non-intelligent world, and Is'vara or the Lord as the unity of the two....The identity of Brahman and the world of *cit* and *acit* is thus the identity of a substance and its attributes. The relation of Brahman and the world may thus be described as one of qualified identity or *vis'ista'dvaita*".—vide *Fundamental Questions of Indian Metaphysics and Logic* (Calcutta, 1950), pp. 98, 99, 108

অপরাপর দর্শনমতের মতো রামানুজমতেরও খণ্ডন করেছেন আবার রামানুজও নিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতির মতো শঙ্করের অদ্বৈতমতকে খণ্ডন করেছেন। মোটকথা আচার্য শঙ্কর জ্ঞানবাদী এবং আচার্য রামানুজ ভক্তিবাদী ও প্রপত্তিবাদী, সুতরাং দু'জনের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি ও মতবাদ কিন্তু অদ্বৈতজ্ঞানসেবী, উদার, অখণ্ড সমন্বয়ী ও অখণ্ড। তাই ব'লে রামানুজের ও রামানুজসম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতের কিংবা মাধবাচার্যের দ্বৈত প্রভৃতি মতের বিরোধী ছিলেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় ব্রহ্মের স্বরূপকে সত্য ও বাস্তব বলে গ্রহণ করেছিলেন দুটি বিভিন্ন দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে—যদিও তিনি জানতেন যে, দুটি রূপ বা বিকাশ একটি অখণ্ড সত্তারই। শ্রীরামকৃষ্ণের সত্যদৃষ্টির বা সত্যানুভূতির কথা স্বামী নির্বেদানন্দের ভাষায় প্রকাশ করলে বলা যায়: "With him the transcendental existence, instead of being merely a construction of philosophical speculation, mathematical abstraction or poetic imagination, became a tangible and living fact of experience through his frequent plunges in the ocean of nameless and formless Reality...He gave values to visions of the personal God, as glimpses of the same absolute Reality, seen through his extensive observations of numerous and distinct God-visions in the course of his search along the different paths of religion ..To his clear vision the difference between the personal God and the impersonal God was no more than that between ice and water, and the difference between the various forms of the personal God appeared like between the distinct forms of the same actor playing different roles" (vide *Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance*, pp 132-133).

॥ সমন্বয়াদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টি ছিল সমন্বয়াদর্শে, অথবা বলা যায়—একে, অখণ্ডে ও অদ্বৈতে। যেমন 'বহুরূপী'-জন্তুর বিচিত্র রঙ্ বা বর্ণ-ধারণের পিছনে ছিল একটিমাত্র জন্তু, প্রাণী অধিষ্ঠানরূপ বহুরূপী, তেমনি অধিষ্ঠানরূপে আছেন ব্রহ্ম মহাচৈতন্যরূপে এক ও অখণ্ড, কিন্তু দুই, বিচিত্র ও খণ্ডরূপে প্রতিভাত হন দৃষ্টিভেদে মাত্র।

ঠিক এই প্রসঙ্গের অবতারণা হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারের কলকাতার শ্যামপুকুরের বাটীতে (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ৫ম খণ্ড)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ডাক্তার মহেন্দ্র সরকারকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন—

"ডাক্তার। ধ্যান করলেই হলো।

"শ্রীরামকৃষ্ণ। সেকি কথা। আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচরকম ক'রে মাছ খাই। কখনও ঝোলে, কখনও অম্বলে, কখনও বা ভাজায়। আমি কখনও পুজো, কখনও

জপ, কখনও বা ধ্যান, কখনও বা তাঁর (ঈশ্বরের) নাম গুণগান করি, কখনও তাঁর নাম ক'রে নাচি।

"ডাক্তার। আমিও একঘেয়ে নই।

[অবতার না মানিলে কি দোষ আছে]

"শ্রীরামকৃষ্ণ। তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না। তাতে দোষ কি? ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়। আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁতে বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া—এই দুটি দরকার। মানুষ তো অজ্ঞানী, তার ভুল হতেই পারে। একসের ঘটিতে কি চারসের দুধ ধরে? তবে যে পথেই থাকো ব্যাকুল হয়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকা চাই। তিনি তো অন্তর্যামী, তিনি আন্তরিক ডাক শুনবেনই শুনবেন। 'ব্যাকুল হয়ে সাকারবাদীর পথেই যাও—আর নিরাকারবাদীর পথেই যাও, তাঁকে (ঈশ্বরকেই) পাবে'।

"মিছরীর রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্টি লাগবে। তোমার ছেলে অমৃতটি বেশ।

"ডাক্তার। সে তোমার চেলা।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে ডাক্তারের প্রতি)—আমার শালা চেলা নাই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের ছেলে, সকলেই ঈশ্বরের দাস। আমিও ঈশ্বরের ছেলে, আমিও ঈশ্বরের দাস।

"চাচা আপনা বাঁচা"।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ (১৩৮৬) পৃঃ ২২২

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপরিউক্ত কথা ও উপদেশ আচার্য শঙ্কর ও রামানুজের দর্শনমতের সমপোত্রীয় বলা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমন্বয়সাধন করেছেন ব'লে মনে হয়। রামানুজ জীব বা জীবাত্মাকে অণু, অংশ ও ক্ষুদ্র বলেছেন—যেকথা আচার্য শঙ্করের মতোই শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীকার করেন নি, কেননা জীব বা জীবাত্মা অবশ্য আত্মা বা ব্রহ্মই, মায়া বা অজ্ঞানের আবরণের জন্যই সে আত্মবিস্মৃত। রামানুজের মুক্তিস্বরূপের সঙ্গেও শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে একমত নন। তবে ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের প্রতি প্রপত্তি বা শরণাগতির ভাব শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামানুজের মতোই স্বীকার করেছেন। অজ্ঞান জীবাশ্রিত ও মায়া ঈশ্বরাশ্রিত—একথাও আচার্য শঙ্করের মতোই রামানুজের সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক স্বীকার করেন নি। তাই বলি যে, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সঙ্গে কথার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে দর্শনমত এবং ধর্মমত পাই তাতে একদিকে শঙ্করের ও অপরদিকে রামানুজের মতের মধ্যে মহাসমন্বয়ের ভাব লক্ষ্য করি। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—

(ক) "ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়। আবার সাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া যায়"।—একথা রামানুজের নয়, এবং শঙ্করের পুরোপুরি না হলেও শঙ্কর ঈশ্বর স্বীকার করেছেন ও ব্যবহারিক জগৎও স্বীকার করেছেন পারমার্থিক ব্রহ্মজ্ঞানের বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত।

(খ) "তাঁতে (ঈশ্বরে) বিশ্বাস থাকা আর শরণাগত হওয়া—এই দুটি দরকার"। একথা ও এই বিশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণের মতো রামানুজেরও।

(গ) "মানুষ তো অজ্ঞান, ভুল হতেই পারে"। একথা শঙ্কর ও রামানুজ দু'জনেই বিশ্বাস করতেন, সুতরাং এই তত্ত্বে বিশ্বাসী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শঙ্কর ও রামানুজের বিশ্বাস ও মতবাদকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদ শঙ্কর ও রামানুজের মতের সমন্বয়সাধন করেছে বলা যেতে পারে প্রকারান্তরে।

(ঘ) "মিছরীর রুটি দিকে ক'রেই খাও, আড় ক'রেই খাও, মিষ্টি লাগবে"। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এ'কথা অদ্বৈতবাদীরা এবং বিশেষভাবে শঙ্করও স্বীকার করেন, কেননা ব্রহ্ম মহাচৈতন্যরূপে ও সর্বাধাররূপে সর্বত্র ও সর্বরূপেই আছেন—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'। ব্রহ্মছাড়া বিশ্বচরাচরে কোন-কিছু সত্তাই নাই—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'।

শ্রীরামকৃষ্ণ 'শঙ্কর ও রামানুজের মতের মহাসমন্বয় সাধন করেছেন'—মন্তব্যকে কেউ যেন ভুল ক'রে মনে না করেন যে, তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ধর্ম ও দর্শনের দৃষ্টিরূপ মতবাদ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতের মিশ্রিত মতবাদ, সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজস্ব কোন দর্শনমত ছিল না। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সাধক যখন সকল ধর্ম ও দর্শন-মতবাদের উৎসপথে অথবা ঊর্ধে ব্রহ্মানুভূতির ক্ষেত্রে বিধৃত হন তখন তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে সকল মতবাদের সীমিত গণ্ডী চিরদিনের জন্য অবলুপ্ত হয়ে হয় একাকার ও সমরসসম্পন্ন। ঐ সমরসের সমতলে উপনীত হ'লে জীবনসিদ্ধ সাধক তখন দেখেন মতে ও পথেই কেবল বিরোধ ও বাদ-বিসম্বাদ, লক্ষ্যে 'সব শিয়ালের এক রা'। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশের শৈলী, পদ্ধতি বা ভঙ্গী লক্ষ্য করলে একথাই মনে হয় যে, পঞ্চস্তী-মন ও পঞ্চস্তী-বুদ্ধির উপরে পঞ্চস্তী-বোধি সর্বানুভূতির আলোকে চিরস্নাত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতের ও পথের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে এ'কথাই মনে হয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল চরমলক্ষ্যের দিকে, সেজন্য তাঁর ধর্মমতের ও দর্শনমতের মধ্যে পাই অসাম্প্রদায়িক উদার অখণ্ড এক সমধর্শনের ভাবমূর্তি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমদৃষ্টির ও সমতার দিব্যভাবস্নাত জীবনে মিলন ও ঐক্যের মহামন্ত্রের প্রতিধ্বনিই আমরা শুনিতে পাই সকল বিরোধ-বিচ্ছেদপূর্ণ এই বাস্তব-বিশ্বসমস্যার সকল স্তরেই। যেমন—শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেখানে **'সচ্চিদানন্দ ও সচ্চিদানন্দময়ী—ব্রহ্ম ও আদ্যাশক্তি অভেদ'**[৬]-বিষয় নিয়ে উপদেশ দিয়েছেন সমাগত ভক্তগণকে, সেখানে তিনি বলেছেন—

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জানতে চায়। ভক্তের ভগবান—ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ সর্বশক্তিমান ভগবান। কিন্তু বস্তুতঃ ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ; যিনি সচ্চিদানন্দ, তিনিই সচ্চিদানন্দময়ী—যেমন মণির

৬। অদ্বৈতানুভূতিই একমাত্র ক্ষেত্র যেখান থেকে দৃষ্টি প্রসারিত করলে সকল ধর্মের মূলতত্ত্বই যে এক ও অভিন্ন একথা বোঝা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনে এর প্রত্যক্ষ জলন্ত নিদর্শন দেখা যায়। স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "ঠাকুরের মনের স্বভাব আলোচনা করিতে যাইয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, নির্বিকল্পভূমিতে উঠিয়া অদ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপলব্ধিই মানবজীবনের চরমে আসিয়া

জ্যোতিঃ ও মণি। মণির জ্যোতিঃ বললেই মণি বুঝায়, মণি বললেই জ্যোতিঃ বুঝায়। মণি না ভাবলে মণির জ্যোতিঃ ভাবতে পারা যায় না, তেমনি মণির জ্যোতিঃ না ভাবলে মণি ভাবতে পারা যায় না" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০০)। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, এই ঐশ্বর্য-সৌন্দর্যময় বিশ্বসৃষ্টি আপনাপনিই মহিমময় স্রষ্টা ঈশ্বর বা ভগবানকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন গুণ গুণীতেই নিহিত থাকে, গুণ ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গুণী বলা যায় না, তেমনি বিশ্ববৈচিত্র্য যতই স্বপ্নবৎ ও মরীচিকাবৎ হোক না কেন—আপাতদৃষ্টিতে ও বাস্তবদৃষ্টিতে অনন্তসাধারণ অপার্থিব সৃষ্টিবৈচিত্র্যের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা ভগবানকেই মনে করিয়ে দেয়। তাই বিচারদৃষ্টি ও স্বরূপদৃষ্টির পার্থক্য অনস্বীকার্য। সেজন্য **নরেন্দ্রসঙ্গে জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয়-প্রসঙ্গে** শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাজরার একদেশী মনোভাবের সমালোচনা ক'রে যে বলেছেন—শ্রীম সেকথার উল্লেখ ক'রে বলেছেন : "ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জানেন—হাজরা বড় শুষ্ক-জ্ঞানবিচার করেন। বলেন—'জগৎ স্বপ্নবৎ, পূজা নৈবেদ্য—এ'সব মনের ভুল, কেবল স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করাই উদ্দেশ্য, আর 'আমিই সেই'।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে নরেন্দ্রনাথকে (বিবেকানন্দ) জিজ্ঞাসা করলেন : "কিগো, তোমাদের কি সব কথা হচ্ছে ?

"নরেন্দ্র (সহাস্যে) আমাদের কত কি কথা হচ্ছে—লম্বা লম্বা কথা।

"শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)। **কিন্তু শুদ্ধজ্ঞান আর শুদ্ধভক্তি এক।** শুদ্ধজ্ঞানও যেখানে, শুদ্ধভক্তিও সেখানে নিয়ে যায়। ভক্তিপথ বেশ সহজপথ"।

এরপর নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) বলেন : "আর কাজ নাই জ্ঞানবিচারে, সে মা পাগল ক'রে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১০১)। কথাই তাই যে, দিব্যানুভূতির অঞ্জনমাখা দৃষ্টি ও অনুভূতিময় সার্থকজীবন না হলে দর্শনদৃষ্টির বা দর্শনবিচারের ক্ষেত্রে ভেদবুদ্ধি ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই সর্বদাই ভেদদৃষ্টির বা শুষ্কবিচারের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

॥ পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদজ্ঞান ॥

শ্রীশ্রীকথামৃতের (১ম ভাগ, পৃঃ ১৬১-১৬২) নবম পরিচ্ছেদের আলোচনায় আছে—**'মা-কালী ব্রহ্ম—পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ'**। কথাই তাই যে, পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ ও সকল ভেদাভেদ নিয়ে বিচারের চির অবসান ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানেও ব্রাহ্মসমাজে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলেছেন—

"শ্রীরামকৃষ্ণ। **যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী** (মা আদ্যাশক্তি)। যখন নিষ্ক্রিয়—তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এই সব কাজ করেন তাঁকে শক্তি বলে কই।

উপস্থিত হয়। আমার ঐ ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন—'সব শিয়ালের এক রা', অর্থাৎ সকল শিয়ালই যেমন একভাবে শব্দ করে, তেমনি নির্বিকল্পভূমিতে যাহারাই উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ ভূমি হইতে দর্শন করিয়া জগৎকারণ ঈশ্বরসম্বন্ধে এককথাই বলিয়া গিয়াছেন" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, পৃঃ ১৯১)।

স্থির জল ব্রহ্মের উপমা ; জল হেলচে দুলচে শক্তি বা কালীর উপমা। কালী—কিনা যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন। কালী 'সাকার আকার নিরাকারা'।"

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও মাষ্টারকে লক্ষ্য ক'রে বলেছেন : "তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় ক'রে চিন্তা করলে তিনিই (আদ্যাশক্তি কালী বা কালী-ব্রহ্মই) জানিয়ে দেবেন তিনি কেমন" (জানাবেন তাঁর সত্যকারের স্বরূপ কি)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্নিগ্ধ-প্রসন্ন ও প্রশান্ত দৃষ্টি নিয়ে ঈশ্বরের অর্থাৎ ব্রহ্মের সাকার ও নিরাকার রূপ ও মূর্তিকে উপায় বা সহায়ক বলেছেন, লক্ষ্য বলেন নি। চরম ও পরম-লক্ষ্য বলেছেন আদ্যাশক্তি বা ঈশ্বরশক্তি কালীর বা কালী-ব্রহ্মের স্বরূপকে। সাধক রামপ্রসাদ শক্তিসাধনার চরমস্তরে উঠে সংশয়হীন চিত্তে স্বীকার করেছিলেন—'যিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার', 'যিনিই কালী বা শক্তি, তিনিই ব্রহ্ম'। রামপ্রসাদ বলেছিলেন —"কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম, আমি ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি"। ধর্ম ও অধর্ম ক্রিয়া ও আচার—যা মানুষের অদৃষ্ট সৃষ্টি করে, কিন্তু কালীতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব সকল আচার-অনুষ্ঠানের অতীত একমাত্র উপলব্ধির বস্তু।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পার হও, তবেই ব্রহ্মজ্ঞান—যা জীবনের চরমবস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (১ম ভাগ, পৃঃ ২৪৭-২৪৮) শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যবাণী হ'ল—

"দেখ—জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও, তবে তাঁকে (ঈশ্বরকে বা ব্রহ্মকে) জানতে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারও অজ্ঞান (এটি অর্থাৎ পাণ্ডিত্য শাস্ত্রজ্ঞান ও কেবল বিচার-বুদ্ধিজাত জ্ঞান)। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন—এর নিশ্চয়-বুদ্ধির নাম জ্ঞান" (নিশ্চয়-বুদ্ধি বলতে পশ্যন্তী-বুদ্ধি—intuitive knowledge. সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন —'ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্'—এটি উপলব্ধির বুদ্ধি বা জ্ঞান)। "তাঁকে বিশেষরূপে জানার নাম বিজ্ঞান"।

শ্রীরামকৃষ্ণের তত্ত্বদৃষ্টিতে বলার বিষয়—নানাজ্ঞান অজ্ঞান, আর এক জ্ঞান জ্ঞান, এবং ঈশ্বরের বিশেষ ও নিঃসন্দিগ্ধ প্রত্যক্ষজ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন বাস্তব ও জাগতিক জ্ঞান এবং অজ্ঞানও আপেক্ষিক। আবার জাগতিক জ্ঞান অজ্ঞানেরই নামান্তর। আপেক্ষিক জ্ঞান বলতে যার আলোর জ্ঞান থাকে, তার অন্ধকারের জ্ঞান বা বোধও থাকে ; যার মুক্তির জ্ঞান থাকে, তার বন্ধনের জ্ঞানও থাকে সেজন্য জাগতিক জ্ঞান ও অজ্ঞান আপেক্ষিক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন : "ব্রহ্ম জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, পাপ-পুণ্যের পার, ধর্মাধর্মের পার, শুচি-অশুচির পার" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৪৮)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন : ব্রহ্ম অবাঙ্‌মনসগোচরম্ "ব্রহ্ম কি জিনিস, মুখে বলা যায় না। একজন বলেছিল : 'সবই উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই'। এর মানে এই যে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, আর সব শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ হওয়াতে উচ্ছিষ্ট হয়েছে বলা যেতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম কি বস্তু কেউ এ'পর্যন্ত মুখে (ভাষা দিয়ে বা কথা দিয়ে) বলতে পারে না"।

॥ অদ্বৈতদৃষ্টিতে শক্তি ও শক্তিমানের বিচার ॥

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। যখন নিষ্ক্রিয়, তাকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি"। অবশ্য ব্রহ্ম ও শক্তি দু'টি পৃথক শব্দ হলেও শক্তি ব্রহ্মের বলতে সগুণ-ব্রহ্মের, কেননা নির্গুণ অথবা গুণাতীত ব্রহ্মে শক্তির কল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়। গুণ সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ। এই তিনটি গুণ প্রকৃতিতে (বীজময়ী মহাপ্রকৃতি অব্যাকৃতিতে) থাকে সুপ্তভাবে, ব্যক্তভাবে বা কার্যাকারে প্রকাশিত হলে গুণগুলি পৃথক পৃথকভাবে ক্রিয়াশীল হয়। ঋগ্বেদেও এই ত্রিগুণের কথা আছে—'লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণান্'। শুক্ল সত্ত্বগুণ, লোহিত রজোগুণ ও কৃষ্ণ তমোগুণ। প্রলয়ের পর প্রতিবারে বিশ্বসৃষ্টি করেন ঈশ্বর এই ত্রিগুণের সাহায্য নিয়ে—'সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা 'যথাপূর্বমকল্পয়ৎ'।

সৃষ্টি অনন্ত, তবে ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে সান্ত। অদ্বৈতবেদান্তেও সৃষ্টি স্বীকার করা হয়েছে অজ্ঞানের জগতে। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার সৃষ্টির সার্থকতা-সম্বন্ধে বলেছেন : "Empirically the world is a continuous process in evolution. the effect of the primal will to be Many. Brahman in association with Maya is conceived as the individualising dynamism manifesting itself in the creative power and evolving every element of existence out of itself. for its desire of becoming many indicates the potentiality of their existence in it. Vedantism is not dualism. Every atom of existence is conceived to be issuing out of the creative Energy. Vedantism regards the world process as issuing out of Brahman and again going into it. When the Samsara has run its full course. it again lapses into Brahman. The becoming is like a curve of existence. It issues out of Brahman and develops its full being with the amount of energy with which it starts, and finally through the contrary process of involution it comes to the point whence it has its orignial start. Vedantism describes the process as issuing out of bliss and finally passing into bliss. The intermediate stage of existence is described as the multiplication of this bliss-existence. The world is a movement of the spirit in itself. It is the cyclic movement of the divine consciousness in space and time. Its law is progression. it exists by movement, and it dissolves by the cessation of movement. It is the energy of active consciousness which by its own motion brings out all things from within. All these are real in consciousness, but only symbolic of Being. as the imaginings of a creative mind are faint

representations of itself, and yet are not quite real in comparison with this creative mind. Creation is, thus, not a making of something out of nothing, or of one thing out of another. It is the self-projection of Anandam into conditions of space and time. Brahman as the absolute transcends its expression in the world of relativity.

"In later Vedantism, the self-projection is described as not inherent in Brahman, but is ascribed to it in association with Maya. Brahman is transcendent and immanent, but its immanence is relative to its being supposed to be in intimate touch with Avidya, apart from which it is pure Sat without any thought of moving itself into becoming."—vide *The System of Vedantic Thought and Culture* (Calcutta 1925), pp 122-123.

॥ ব্রহ্মসম্বন্ধে বিভিন্ন কল্পনা ॥

অদ্বৈতবেদান্তে ব্রহ্মের কল্পনাও বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। প্রথমে সর্বাতীত অথচ সর্বাধার ব্রহ্ম—তুরীয় ব্রহ্ম; দ্বিতীয়—কারণব্রহ্ম ঈশ্বর—যিনি মায়াধীশ, তিনি আবার সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রিয়াত্মিকা গুণময়ী মায়ার সাহায্যে ঈশ্বর বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন; তৃতীয়—কার্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম—যিনি সঞ্চিত কারণবীজগুলিকে নিয়ে বাস্তব বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন নিজের তৎসংকল্প বা সৃষ্টির ইচ্ছার দ্বারা, এবং তৃতীয় - বিরাট-ব্রহ্ম—যিনি জড় বা বাস্তব বিশ্বচরাচররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কার্যে, নামে ও উপাধিতে একই ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও অনুস্যূত-মহাচৈতন্যরূপে সর্বাত্মাব্রহ্মই সকলের কারণ ও প্রতিষ্ঠা।

ব্রহ্ম ব্যাপকচৈতন্যরূপে এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু মায়াশক্তির প্রভাবে তিনি বহুরূপে ও বহুনামে অভিব্যক্ত হন—'রূপং রূপং বহুরূপো বভূব'; 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে'। বৈচিত্র্যই সৃষ্টি এবং এই সৃষ্টি সম্ভব ও সার্থক হয় ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির প্রভাবে। ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার আশ্রয় ব্রহ্মই এবং এই ব্রহ্ম সগুণ বা গুণযুক্ত ব্রহ্ম। আবার গুণাতীত নির্গুণব্রহ্মের কথাও বেদান্তে আছে। কিন্তু আসলে সগুণ-নির্গুণের অতীত বিশুদ্ধ ও উপাধি অর্থে নাম-রূপাতীত ব্রহ্মচৈতন্য-সত্তাই সকল-কিছুর কারণ ও আধার না হলেও সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিক থেকে তিনি সর্বকারণ ও সর্বাধার। বিশেষরূপ উপাধি মায়াই অবিকারী ব্রহ্মে বিকার বা বিভাগ সাধন ক'রে তাঁকে কার্য-কারণসূত্রে ও আধার-আধেয়ভাবে রূপায়িত করে। মায়াই সর্বরূপ ও সর্বনামাতীত ব্রহ্মচৈতন্যকে রূপে ও নামে অভিব্যক্ত করে।

কিন্তু এই মায়া কি? আচার্য শঙ্কর 'বিবেকচূড়ামণি'-গ্রন্থে মায়ার পরিচয় দিয়ে বলেছেন—

'অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্বমিদং প্রসূয়তে॥

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো মহাদ্ভুতাঽনির্বচনীয়রূপা ॥'

॥ শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তমত ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে একাদশ পরিচ্ছেদে 'শ্রীরামকৃষ্ণের বেদান্তমত'-আলোচনার প্রসঙ্গে মায়ার ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে: "মায়া কি? অব্যক্ত নামধেয় পরমেশ্বরের শক্তি। অনাদি অবিদ্যারূপিণী সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী মায়া সমগ্র বিশ্ব প্রসব করেন। জ্ঞানীরা কার্য দেখিয়া কারণরূপ এই মায়াশক্তির অনুমান করেন। মায়া সৎ নহে বা শশশৃঙ্গের মতো অসৎ বা অলীক নহে, আবার সদসৎও নহে। মায়া ভিন্ন (ব্রহ্ম থেকে পৃথক) নহে, অভিন্ন (ব্রহ্ম থেকে অপৃথক) নহে, আবার ভিন্নাভিন্ন (ব্রহ্ম থেকে একেবারে অভিন্ন) নহে। সেইরূপ সঙ্গ (ব্রহ্মের সঙ্গে সহস্থায়ী) নহে, অসঙ্গ (অসহস্থায়ী) নহে, আবার সঙ্গাসঙ্গ (ব্রহ্মের একবার সহচারী ও আর একবার অসহচারী) নহে। কিন্তু মায়া অভিনব অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপা। **শঙ্করের এই তত্ত্ব পরমহংসদেবও বিশ্বাস করতেন**"।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে (পৃঃ ৫৫) ব্রহ্ম ও মায়া-সম্বন্ধে বলেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণদেব সরলভাষায় উদাহরণদ্বারা ব্রহ্ম ও মায়ার গভীর তত্ত্বসকল আমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন: 'ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সগুণ। নির্গুণব্রহ্ম কেমন জানিস? যেমন সাপ স্থির হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আবার সেই সাপ যখন এঁকেবেঁকে চলেছে, তখন সগুণব্রহ্ম। নির্গুণব্রহ্ম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র। তাতে তরঙ্গ অথবা কোন ক্রিয়া নেই, অচল অটল ও সুমেরুবৎ। মায়াশক্তি ব্রহ্মে (সগুণব্রহ্ম ঈশ্বরে) যেন সুপ্তাবস্থায় লীন হয়ে থাকে। সেই অবস্থায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জীবজগৎ মহাপ্রলয়ে (অব্যক্তে বা প্রকৃতিতে) লীন হয়ে থাকে। মায়াশক্তি জাগ্রত হলে সেই সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রে তরঙ্গ হতে থাকে। সেই অবস্থাকে বেদান্তশাস্ত্রে সগুণব্রহ্ম বলা হয়েছে। তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বা প্রকৃতিতে গুণক্ষোভ (স্পন্দন) হয় এবং তখনই সৃষ্টিকর্ম আরম্ভ হয়। এই সগুণব্রহ্মই 'অর্ধনারীশ্বর' বা 'হরগৌরী' (অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক নারী) নামে শাস্ত্রে (বেদে ও পুরাণে) অভিহিত। **শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ধরনের বেদান্তজ্ঞান ও বেদান্তনিষ্ঠা ছিল অদ্ভুত**"।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন: "ব্রহ্ম 'নিজ' মায়াশক্তির প্রভাবেই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা সগুণ-ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান হন।...পরিদৃশ্যমান জগৎ ত্রিগুণময়ী মায়ার বিকারমাত্র। প্রকৃতিরই পরিণাম (বা বিকার) হয়, কিন্তু ব্রহ্ম অপরিণামী (অবিকারী ও অখণ্ড)। মায়ার দুই শক্তি—একটি আবরণ ও অপরটি বিক্ষেপ। আবরণশক্তি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্গুণ-ব্রহ্মকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে এবং বিক্ষেপশক্তিতে এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দুই বা বহুরূপে প্রতীয়মান হন। সেইভাব কোন এক সাধক তাঁহার গানে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—

'অমেকা প্রকৃতি ব্রহ্ম-আচ্ছাদিনী
মহামায়ারূপে ত্রিজগতমনোমোহিনী,
সৃজন-পালন-নিধনকারিণী'— ইত্যাদি।

"নির্গুণব্রহ্মে তিনটি গুণ (সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ) অব্যক্ত (বীজাকারে) থাকিলেও এক অখণ্ডসত্তাই খণ্ডরূপে প্রতীত হয়। সেইজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন—'এক জানিই জ্ঞান বা সত্য, বহু জ্ঞান অজ্ঞান, সুতরাং (বহুজ্ঞান) কাল্পনিক বা মিথ্যা'। এই একত্বের জ্ঞানকে তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) 'অদ্বৈতজ্ঞান' বলিতেন। আরও বলিতেন : 'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো' ; অর্থাৎ আগে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান লাভ, তারপর সেই জ্ঞান নিয়ে সংসার করলে অজ্ঞান আর মোহিত করতে পারে না ; 'আমি', 'আমার' জ্ঞান অজ্ঞান'। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন : 'মুক্তি তবে কবে—আমি যাবে যবে'। 'আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'। এই 'আমি' 'আমা'র-জ্ঞানই অজ্ঞান আর শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন : 'তুমি', 'তোমার'-জ্ঞানই জ্ঞান। কেননা 'আমি'-জ্ঞানে স্বার্থ থাকে, আর 'তুমি'-জ্ঞানে পরার্থ বা ত্যাগ। ত্যাগ বলতে বাসনাত্যাগ, মায়াত্যাগ, অজ্ঞানত্যাগ। 'আমি' মলে ঘুচিবে জঞ্জাল'—এই 'আমিই' অজ্ঞান—যা আত্মস্বরূপ ব্রহ্মকে জানতে দেয় না, আবৃত ক'রে রাখে। জঞ্জাল বলতে সংসার অর্থাৎ সংসারের ভোগবাসনা। শাস্ত্রে আছে : 'ভ্রান্তিবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ ভ্রান্তিমুক্তঃ সদাশিবঃ'। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে সংসারভ্রম হয়। ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অঘটনঘটনপটিয়সী মায়ার নাশ (রূপান্তর) হয়। যেমন রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান হইলে সর্পভ্রম দূর হয়, তেমনি সংসারে ও সর্বত্র (জীবে ও জগতে) ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান দূর হয়। সংসারে সংসারজ্ঞান, জীবে জীবজ্ঞানই অজ্ঞান, আর সংসারে ও জীবে ব্রহ্মজ্ঞান হলেই জ্ঞান"।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে মায়া ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে পুনরায় বলেছেন : "ব্রহ্ম নির্গুণ। তিনি দেশ, কাল, নিমিত্তের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও (সীমাবদ্ধ না হইয়াও) মায়ার বশে পরিচ্ছিন্নের (সীমাবদ্ধের) ন্যায় সগুণ-ঈশ্বর এবং জীবও জগদ্রূপে বিবর্তিত হন। বিবর্তিত হওয়ার অর্থ আপন রূপ ও স্বভাব ত্যাগ না করিয়াও ভিন্ন রূপে ও স্বভাবে প্রতিভাত হন। তিনিই (ব্রহ্মই) আবার মায়াকে আপন বশে রাখিয়া ইন্দ্রজাল দেখান—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (বৃহঃ উঃ ২।৫।১৯)। ইন্দ্র বলিতে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, কিন্তু মায়াশক্তির দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ বহুরূপ হইয়াছিলেন। জগতে আপনার রূপ প্রকাশের জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি নামরূপজনিত মিথ্যা-অভিমান-দ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হন। তিনিই মায়াধীন হইয়া জীব এবং মায়াধীশ হইয়া ঈশ্বর। বদ্ধজীব আত্মস্বরূপকে জানিলে অজ্ঞানের কার্য দূর হয় ও আপনাকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম হইতে অভিন্নজ্ঞানে কৃতকৃতার্থ হইয়া মোক্ষলাভ করে। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'—ব্রহ্মকে জানার নামই ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন : 'পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'। শুকাচার্য তোতাপুরী ব্রহ্মপুরুষ হইয়া যখন ব্রহ্ম-আলোচনায় ডুবিতেছিলেন তখন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলেন। মায়ার কি অসীম শক্তি"।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর প্রেমময় মহীয়ান আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই বলেছেন : "আদ্যাশক্তির সহায়ে অবতারলীলা। তাঁর (ঈশ্বরের) শক্তিতে অবতার। অবতার যে কাজ করেন সেইসব মায়ের (মহামায়ার) শক্তি। বাজীকর ঈশ্বর ও বাজীকরের খেলা

জীব-জগৎ। কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর তাঁর খেলা সব স্বপ্নের মতো। সুতরাং খেলা সত্য ও নিত্য নয়। যাঁর ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে সবটাই দেখে যে, ঈশ্বর (বাজীকর), জীব, জগৎ, মায়া—সবই। সবই তাঁর (বাজীকর ঈশ্বরের) বাজীখেলা। এদের অস্তিত্ব আছে, আবার নাই-ও। যতক্ষণ 'আমি' (অহং) আছে ততক্ষণ সবই আছে—খেলাও আছে। জ্ঞান দ্বারা বিচার করলে দেখা যায় কিছুই থাকে না, থাকে একমাত্র ব্রহ্ম। তখন নিজের 'আমি' পর্যন্ত বাজীকরের বাজী হয়ে দাঁড়ায়। যতক্ষণ এতটুকুও 'আমি' থাকে ততক্ষণ আদ্যাশক্তির এলাকা, ততক্ষণ আদ্যাশক্তির খেলা চলে। এই খেলার পরপারে ব্রহ্ম"।[৭]

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ অতি সহজ-সুন্দরভাবে তাঁহার প্রেমময় অলৌকিক আচার্যদেব শ্রীরামকৃষ্ণের 'বেদান্তমত'-সম্বন্ধে 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে (পৃঃ ৬১) আলোচনা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বেদান্তমতের নূতনত্ব কিছু না থাকলেও নূতন ও অভিনবই। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন: 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না থাকলে জগৎ মিথ্যা মনে হয়। তখন আমি, তুমি, ঘর-বাড়ী, পরিবার—এ'সবই মিথ্যা বলে জ্ঞান হয়। তাই আদ্যাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই জীব-জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন, সুতরাং জীব ও জগৎকে বাদ দেবে কেমন ক'রে? তাহলে সে ওজনে কম পড়বে। বেলের বিচি, শাঁস ও খোলা বাদ দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না"।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর '*Memoirs of Ramakrishna*'-গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশিষ্টাদ্বৈত-দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বে এ'প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি যে, অসাম্প্রদায়িক মহাসমন্বয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিশ্বের সকল মতকে ও বাদকেই ভিন্ন ভিন্ন বা বিচিত্র মত ও পথ বলে সমাদর করতেন, কেননা ঐ সকল মত ও পথই পরিশেষে এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয় ভগবানের বা ব্রহ্মের নিকট সাধকদের উপনীত করে। মত ও পথ বলতে ধর্মমত ও সাধনপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের চরমলক্ষ্য ও গন্তব্যস্থান এক ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান। সেজন্য কোন মত, মতবাদ বা সাধনপথই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট হেয় ছিল না, সকলকে তিনি সম্মান দিতেন তারা একই লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য।

'মায়া'-সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের মন্তব্য পূর্বে আলোচনা করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গপার্ষদরা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যলীলারূপ নরলীলা বা অবতারলীলার নিত্যসঙ্গী ও সহচর, তাঁরা জীবনে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন জ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ। জীবন্মুক্ত ছিলেন তাঁরা লৌকিক দৃষ্টিতে, সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিব্য ও অলৌকিক জীবন-লীলা ও অপার্থিব অনুভূতিসম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল প্রত্যক্ষ ও অবিসংবাদিত সত্য।

৭। স্বামী অভেদানন্দ: 'আমার জীবনকথা' (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত), পৃঃ ৪৫-৪৬

'মায়া'-প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ 'আমার জীবনকথা'-গ্রন্থে বলেছেন তাঁর অলৌকিক আচার্যদেবের কথাই এভাবে : "একদিন পরমহংসদেবকে একজন প্রশ্ন করলেন : 'জগৎ কি মিথ্যাই'। পরমহংসদেব বলিলেন : 'মিথ্যা কেন ? বিচারের কথা। প্রথমে নেতি নেতি বিচার করার সময়ে তিনি (ব্রহ্ম) জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব নন—এই বিচার করতে হয় এবং তাহলেই ঐসব স্বপ্নবৎ হয়ে যায়। তারপর অনুলোম-বিলোম-বিচার। তখন তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন বলে বোধ (অনুভূতি) হয়। 'আমি'-জ্ঞান যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জীব-জগৎ সবই থাকে। ঈশ্বরদর্শন বা ব্রহ্মজ্ঞান হলে তখন সব চিন্ময় (চৈতন্যময়) বলে বোধ (জ্ঞান) হয়। কালীঘরে গিয়ে দেখি—প্রতিমা (কালীপ্রতিমা বা শ্রীশ্রীভবতারিণীর মূর্তি) চিন্ময়, কোষাকুষি, চৌকাঠ, মার্বেলপাথর সমস্তই চিন্ময়। তখন বিড়াল-পর্যন্ত চিন্ময়ী মা-ই সব হয়েছেন এই জ্ঞান হয়"।

'নিত্য ও লীলা'-সম্বন্ধেও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিন্ময়-উপলব্ধির কথা উল্লেখ করে বলেছেন : "পরমহংসদেব বলতেন : 'যারই নিত্য, তারই লীলা। যেমন ছাদ আর সিঁড়ি। নিত্য সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তিনি নির্গুণ, আবার সগুণ দুই-ই। তিনি নিত্য ও লীলা। লীলা কিনা ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা, বিশ্বলীলা প্রভৃতি। নরলীলার অবতার। ঈশ্বরই মানুষ হয়ে লীলা করেন ও তিনিই অবতার। সেই চচ্চিদানন্দই বহুরূপে জীব হয়েছেন এবং তিনিই মানুষরূপে লীলা করছেন—এই বিশ্বাস হলে তবে পূর্ণজ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান) হয়। (ঈশ্বরের) নরলীলা কি রকম জান ?—যেমন বড় ছাদের জল নল দিয়ে হুড় হুড় করে পড়ছে। সেই সচ্চিদানন্দের শক্তি একটা প্রণালী (passage) অর্থাৎ নলের ভিতর দিয়ে আসছে" ('আমার জীবনকথা', পৃঃ ৬৪-৬৫)।

সাকার ও নিরাকার—সগুণ ও নির্গুণ-সম্বন্ধেও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐ এককথা—'যিনি নিরাকার, তিনিই সাকার', 'যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ'।

'নির্গুণ মেরা বাপ, সগুণ মাতারি।
কাকো নিন্দো, কাকো বন্দো,
দোনো পাল্লা ভারি॥'

বেদে যাকে নিরাকার বলেছে, উপনিষদে ও পুরাণে তাকেই সাকার বলেছেন। আসলে যিনি নিরাকার, তিনিই মায়াকে সঙ্গে নিয়ে সাকার। ঈশ্বরের সাকার রূপকেও এজন্য জানতে হয়। সাধক সেইরূপ চিন্তা বা ধ্যান করে—সেই রূপই (সাকার-রূপই) দর্শন করে। পরে অখণ্ড-সচ্চিদানন্দে (ঐ সাকার-রূপ) মিলিয়ে যায়। তখন সাকার নিরাকার এক হয়ে যায় —'সাকার আকার নিরাকারা'।[৮]

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন : "পরমহংসদেব নিজমুখে তাঁহার লীলাপার্ষদ ও অন্তরঙ্গভক্তদের নিকট তিনি যে 'পূর্ণ-অবতার' সেই কথা বলিতেন। তিনি বলিতেন :

৮। স্বামী অভেদানন্দ : 'আমার জীবনকথা', পৃঃ ৬৪-৬৫

P30401

'ভগবান অবতার হয়ে জীবকে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন। 'আমাকে তোমাদের কিরূপ মনে হয়' ? তিনি নিজেই উত্তর দিলেন : 'আমার বাবা গয়াতে গিয়েছিলেন। গদাধর (পূর্ণব্রহ্ম-নারায়ণ) তাঁকে (আমার বাবাকে) স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন : 'আমি তোমার সন্তান হয়ে জন্মগ্রহণ করবো'। বাবা স্বপ্নে বলেছিলেন : 'ঠাকুর আমি গরীব ব্রাহ্মণ, কেমন ক'রে আপনার সেবা করবো' ? গদাধর (নারায়ণ) স্বপ্নেই বলেছিলেন : 'তা হয়ে যাবে'। বুঝ্‌লি ? আমরা সকলে অবাক্ হয়ে তাঁর কথা শুনে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলাম। তিনি (শ্রীশ্রীঠাকুর) সহাস্যবদন"।[১]

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

●

॥ সেই চরণের পরশ যে চাই ॥

শান্তশীল দাশ

চরণ ছুঁয়ে করবো প্রণাম,
কোথায় তোমার চরণ যে পাই ;
এদিক ওদিক খুঁজে মরি
দেখি কোথাও চরণ যে নাই।

অন্ধকারে পথের পরে
নোয়াই মাথা ভক্তি ভরে ;
তোমার চরণ-ধূলা আছে
সেই মাটিতে, তাবি যে তাই।

অনেক অনেক বড়ো তুমি
তোমায় চোখে দেখা কি যায় ;
তোমার ছোট মূর্তিখানি
এ-মন আমার দেখতে যে চায়।

কোমল রাঙা চরণ দুটি
কবে বল উঠবে ফুটি।
দুই নয়নের সামনে আমার—
সেই চরণের পরশ যে চাই।

●

১। 'আমার জীবনকথা', পৃঃ ৩৮-৩৯

॥ রামকৃষ্ণস্মৃতির একটি ফুল্ল কমল ॥

স্বামী প্রভানন্দ

জগদারাধ্য ঈশ্বরাবতার নরলীলা সাঙ্গ করেছেন, জনসাধারণের দৃষ্টিপথ হতে অন্তর্হিত হয়েছেন, ভক্তগণের মধ্যে নিজের সত্তাকে মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ ভক্তদের হৃদয়দর্পণে তাঁর অবয়ব ও আদর্শ উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত। শ্রীরামকৃষ্ণকে ধ্যানধারণা করে ভক্তগণ রামকৃষ্ণময় হয়ে উঠেছেন। কেউবা চতুর্দিকে সবকিছুই দেখছেন রামকৃষ্ণময়। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : পারার হ্রদে সীসে অনেকদিন থাকলে সেটাও পারা হয়ে যায়। কুমুড়ে পোকা ভেবে ভেবে আরশুলা···শেষে কুমুড়ে পোকাই হয়ে যায়। ভক্তও তাঁকে ভেবে ভেবে অহংশূন্য হয়ে যায়। আবার দেখে 'তিনিই আমি' 'আমিই তিনি'। (ক ৪।১৭।১)

শ্রীরামকৃষ্ণের 'আত্মগোষ্ঠী' জোট বেঁধেছে বরাহনগরে, একটি পোড়ো বাড়ীতে। সাধন-ভজনের গভীরে ত্যাগী ভক্তেরা ডুব দিয়েছেন। তাঁদের চিত্ত অমৃতশীতল শান্তি প্রদানেচ্ছু, তাঁদের মুখলাবণ্য পবিত্রতায় আভামণ্ডিত—তাঁদের অন্তর্জ্যোতির আংশিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

তাপস কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ) তদানীন্তন মঠ-জীবন সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেছেন : আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সেই নির্দেশ স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রনাথকেই সকলের প্রধান করিয়া তাঁহার নির্দেশ অনুসারে চলিতাম এবং মঠে নিয়মিতভাবে ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, কীর্তনাদি করিয়া দিন অতিবাহিত করিতাম।···তখন সকলের জীবন অতিশয় দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইলেও[১] একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে জীবনে সহায় অবলম্বন করিয়া মনের আনন্দেই দিনযাপন করিতাম।"[২]

সেদিন ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী। শনিবার। শ্রীপঞ্চমী।

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় দেবী সরস্বতীর পূজা-আরাধনায় ছেলেবুড়ো পুরুষনারী মেতে উঠেছে। বাগবাজারে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতেও পূজার আয়োজন হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ গিরিশচন্দ্রের নিকটজন। তাঁরা আমন্ত্রিত হয়েছেন, অনেকেই গিরিশভবনে উপস্থিত হয়েছেন।

গিরিশভবন শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি-সৌরভে আমোদিত। গিরিশচন্দ্র বীরভক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণের অমোঘ কৃপাশক্তির অন্যতম নিদর্শন। শ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে নিজের মধ্যে সমুপস্থিত অবিলম্ব পরিবর্তন সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র লিখেছেন : আমার মন তখন আনন্দে পরিপ্লুত, যেন নূতন জীবন পাইয়াছি, পূর্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই, ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বরলাভ আমার অনায়াসসাধ্য, এইভাবে আচ্ছন্ন

১। বরাহনগর মঠের তদানীন্তন জীবনের অপর একটি দিকের উপর আলোকপাত করেছে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রাংশ। তিনি লিখেছেন : 'স্বাখাল, ঠাকুরের দেহত্যাগের পর মনে আছে, সকলে আমাদের ত্যাগ করে দিলে—হাবাতে মনে করে? কেবল বলরাম, সুরেন, মাষ্টার ও দুর্গাবাবু—এঁরা সকলে বিপদে আমাদের বন্ধু।'

২। আমার জীবনকথা, পৃঃ ১৫৬।

হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে স্বপনেও এই ভাব, পরম সাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোনও ভয় নাই।[৩]

অনুকূল পরিবেশে গোষ্ঠীর বিভিন্নজনের স্মৃতিমন্থন থেকে উদ্ভূত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের মোহারী বিচিত্র ভাবমূর্তি—বিশেষতঃ ভাবৈশ্বর্যে ভাস্বর তাঁর অকৈতব কৃপাঘন মূর্তিটি।

শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দময় সত্তায় রঙে রাঙানো অন্তরঙ্গ ভক্তগণের অন্তঃকরণ। স্মৃতিসূর্যের প্রভাতী আলোয় তাঁদের অধিকাংশের হৃদয় সরোবরে রামকৃষ্ণ-শতদল প্রস্ফুটিত, তার সৌরভে সৌন্দর্যে চারিদিক আমোদিত।

যাবার সময় তাপস বুড়োগোপাল (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) পরিবেশন করেন একটি মুগ্ধকরী কাহিনী। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : **আমি তোদের মা।**

দুরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণচরিত। তাঁর স্বমুখ-কথিত চিত্রকল্প সুস্পষ্টভাবে আভাস দেয় তাঁর অনন্তস্বতন্ত্র স্বরূপের। সে-ভাবনার অনুচিন্তনই সরলা মরমী ভক্তগণের সুধাসৃত। তার অনুরণন ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো গুন্ গুন্ করে ফিরছিল ভক্তদের স্মৃতিপুটে।

সেখানে উপস্থিত তাপস তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ)। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহধারণকালের মধ্যেই তিনি তিন তিনবার সমাধিসুখ লাভ করে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলেছিলেন : আমাদের সঙ্গে ঠাকুরের যে-ভাব ছিল, তাতে ঐশ্বর্যের ভাব একটুও ছিল না। আমরা আমাদের কথা বলছি—ঠাকুরকে সেভাবে দেখিনি—তিনিও ঐরূপ ভালবাসতেন না—কেউ অবতার, ভগবান, এসব বলে তিনি বিরক্ত হতেন। ওতে আপনবুদ্ধি যেন একটু কমই হয়। তুমি আমার মা, তুমি আমার বাপ, ভাই, সখা, বন্ধু—এরূপ ভাব এলে প্রেমের ভাব, ভালবাসার ভাব আসে।[৪] তারকনাথ উপহার দেন একটি সুন্দর চিত্রালঙ্কার। শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ)। তাঁর সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সাক্ষাৎ নারায়ণ, আমার জন্য দেহধারণ করে এসেছে। তাঁর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যরতি সুবিদিত। একদিনের ঘটনা। রাখালকে চোখ মেলে দেখতে দেখতে শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসারিত হয় বাৎসল্যরস। ভাবাতিশয্যে অঙ্গে পুলক দেখা দেয়। এরূপ আশ্চর্যময় ভাবাবস্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন।[৫] পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : **আমি কালী—মানুষ নই।**[৬]

এভাবে সংক্ষিপ্ত রূপবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবৈশ্বর্যের একটি দিক ফুটে ওঠে। এদিকে সুর-ভক্ত গিরিশচন্দ্র উপস্থাপিত করেন তাঁর অন্তঃকরণে লালিত-পালিত শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ সরল

৩। 'পরমহংসদেবের শিক্ষাদেব'। তত্ত্বমঞ্জরী, ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃঃ ৭০।

৪। উদ্বোধন, ১৫৪১, পৃঃ ৮৩।

৫। এর অনুরূপ একটি ঘটনার বর্ণনা পাই কথামৃতে (৩।১।৩), ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে।

৬। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর ধ্যানে-জ্ঞানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা-কালী সমার্থক। স্বামী বিবেকানন্দের মননালোকে শ্রীরামকৃষ্ণ মা-কালীর অবতার। (শঙ্করীপ্রসাদ বসু : লোকমাতা নিবেদিতা, পৃঃ ৩৯৮)। এ-ধরণের আরও প্রমাণ তুলে ধরা যেতে পারে।

ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিকট কৃপাবিগ্রহ বৈত নয়। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেছিলেন, 'তাঁহার ভৈরব, একহস্তে সুধাপাত্র, অপরহস্তে সুধাভাণ্ড লইয়া মায়ের মন্দিরে উপস্থিত।'[৭] শ্রীরামকৃষ্ণের চৈতন্যদীপ্ত সঙ্গ লাভ করেছিলেন মাত্র দেড় বছর। তিনি কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেছিলেন: মশাই, আপনার কথা আর কি বলব? আপনার দয়ায় আমি কি ছিলাম আর কি হয়েছি।[৮] তিনি একটি ভাবণে বলেছিলেন: তাঁকে মানা ভালবাসা পূজা করা কঠিন নয়, তাঁকে ভুলাই কঠিন।[৯] গিরিশচন্দ্র এখন বলেন: (পরমহংসদেব) আমায় বলেন, তোর কিছু করতে হবে না।

নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) বলেন গিরিশচন্দ্রকে: (আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে) আপনি কি ভাবেন?

গিরিশচন্দ্রের উত্তর লিখিত নেই। তিনি জানতেন, ত্যাগী তাপসেরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সমদীপ্তিতে উদ্দীপ্ত। তাঁরা যে সকল কঠোর সাধন-ভজন করছিলেন তার সবকিছুই শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছানুসারী। ইতিমধ্যে মাষ্টারমশাই (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) নরেন্দ্রনাথকে লক্ষ্য করে বলেন: উনিই (শ্রীরামকৃষ্ণ) তো তোমাদের শেখালেন।

মাষ্টারমশায়ের উক্তি নরেন্দ্রনাথের মননবীণার মূলতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তোলে। নরেন্দ্রনাথ গম্ভীরকণ্ঠে বলেন: I will hear only thee O Lord—not the preacher.[১০]

নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণই ধ্যানজ্ঞান—তিনিই জীবনাদর্শ ও তার শ্রেষ্ঠ প্রযুক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী তাঁদের কাছে বেদবাক্য। নরেন্দ্রনাথ বলেন: তিনি যা বলেছেন সব করতে হবে।

কয়েক সপ্তাহ পরে বরাহনগর মঠে বসে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন মাষ্টারমশাইকে: সাধন-টাধন যা আমরা করেছি, এসব তাঁর কথায়। কিন্তু strange এই যে রামবাবু এই সাধন নিয়ে খোঁটা দেন।···আমাদের তিনি সাধন করতে বলেছেন (ক ৩। পরি। ২)।

প্রেমপাথার শ্রীরামকৃষ্ণের অহৈতুকী ভালবাসার কথা ওঠে। নরেন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালবাসা যেন আঁকড়ে পাওয়া যায় না। নরেন্দ্র তাঁর একটি অভিজ্ঞতার বর্ণনা করেন। কাশীপুর বাগানবাটীর ঘটনা। নরেন্দ্রনাথ বলেন: রাত্রি দুটো—তিনি বাহ্যে গেছেন। তা আমায় গাড়ু এগিয়ে দিতে দিবেন না।[১১] তিনি হাততালি দিয়ে ইঙ্গিতে ডাকেন যোগীনকে।

৭। স্বামী গম্ভীরানন্দ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা, ২য় ভাগ, ৪র্থ সং, পৃঃ ২৬১।

৮। স্বামী নির্বেদানন্দ: রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব, পৃঃ ৯২।

৯। রামকৃষ্ণ মিশনের সপ্তদশ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ।

১০। "Let not Moses nor any of the Prophets speak to me, but do Thou rather speak to me O Lord God, who Inspirest and enlightenest all the Prophets, for Thou alone, without them, canst perfectly teach me: while they, without Thee are of no use" (Thomas A. Kempis: Imitation of Christ, St. Paul Publication No. 106, 3rd Edn, p. 131.)

১১। পরে নরেন্দ্র মাষ্টারমশাইকে বলেছিলেন: (আমায়) নারায়ণ বলতেন।···তাঁর ব্যামোর সময় শোচবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন না।

এবার দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার বলেন নিজের অভিজ্ঞতা। দক্ষিণেশ্বরে একদিনের ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ শৌচের জন্য পঞ্চবটী ছাড়িয়ে বাউতলার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। পিছনে চলেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর হাতে গাড়ু ও গামছা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখতে পেয়ে আপত্তি করেন, বলেন : রাখো, রাখো।[১২]

সঙ্গী নারায়ণকে[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : ওর (দেবেন্দ্রনাথের) সঙ্গে আমার আলাদা ভাব।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রসঙ্গান্তরে যান। তিনি বলেন রাখালচন্দ্রের তদানীন্তন ভাবদ্যোতক একটি উক্তি : রাখাল বলেছেন, সংসারে ঈশ্বরলাভ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী-ভক্তদের পুনঃ পুনঃ ভরসা দিয়ে বলেছেন যে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে পারলে সংসারে থেকেও ঈশ্বরলাভ সম্ভব। এখানে তাপস রাখালচন্দ্র তাঁর বৈরাগ্যবিধুর অন্তঃকরণকেই উদ্ঘাটিত করেছেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি বলেছিলেন সন্ন্যাসীনগরী বর্জনের কথা। তাঁর বিবিক্তি শীর্ষোন্নত, তাঁর প্রাণ আঁটুপাটু করছিল। চোখে মুখে ভাবে ব্যঞ্জনায় ফুটে উঠেছিল সেই আকুলতা। তিনি নর্মদার তীরে কঠোর সাধন-ভজনের কথা ভাবছিলেন।

এবার হরিপদ[১৪] উপস্থাপিত করেন রঙ্গরসে ভরা একটি মুগ্ধকরী কাহিনীর। বাগবাজার নিবাসী হরিপদ। "কুত্তার হরিপদ হরিপদ্মন"। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কখনও কখনও প্রহ্লাদ-চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা ইত্যাদি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলেছিলেন একটি ঘটনা। এক গভীর রাত্রে গিরিশচন্দ্র সুরাপান করে প্রায় বেহুস হয়ে পড়েছিলেন। দুই মাতাল বন্ধুকে নিয়ে তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে হাজির হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : গিরিশ আর তাঁর দুই মাতাল বন্ধু এসে হাজির। তখন রাত দুটো। দেখি তারা দুটোয় নাচ্‌ছে।

লোমহর্ষণকারী ঘটনা। বিস্তৃত বিবরণ হতে জানা যায় গিরিশচন্দ্র এক রাত্রে বরাঙ্গনাগৃহে বন্ধুদের সঙ্গে আমোদপ্রমোদে মত্ত। সেসময়ে তিনি হঠাৎ প্রাণে অনুভব করেন দক্ষিণেশ্বরের জন্য আকর্ষণ। ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে দুই মাতাল বন্ধুকে নিয়ে তিনি

১২। এই ঘটনার একটু বিশদ বিবরণ পাই 'ভক্তমালিকা'-গ্রন্থে। দেবেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের নজরে পড়লে তিনি জিব কেটে বলেন : এঁা। তুমি কেন নিয়ে এসেছ? তোমার সঙ্গে আমার ও-ভাব নয়।' অভিমানী দেবেন্দ্রনাথ ভাবেন, আমি কি এতই হীন যে গাড়ু-গামছা বইবারও অধিকারী নই? তিনি পঞ্চবটীমূলে বসে পড়েন, তাঁর চিত্ত বিষণ্ণতায় ভারাক্রান্ত। কিছুক্ষণ পরেই দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তিনি দেবেন্দ্রকে বলেন : দেখ, তোমায় কিছু করতে হবে না, তুমি সকালবেলা আর সন্ধ্যেবেলা হাততালি দিয়ে হরিনাম করো, তাহ'লেই হবে।...আর এখানে আনাগোনা করলে সব হয়ে যাবে।" (ভক্তমালিকা, ২ ভাগ, ২ সং, পৃঃ ৪৯৮)।

১৩। নারায়ণচন্দ্র সম্বন্ধে পুঁথিকার লিখেছেন : আসিলে নারায়ণচন্দ্র প্রভু নারায়ণ। পুলকে বিকল বপু না যায় বর্ণন॥ (পুঁথি, ৫ সং, পৃঃ ৪৮৮)।

১৪। কুরুকায় হরিপদ জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইজারা আছিল যাঁর প্রভুর চরণ॥ (পুঁথি, ১ম সং, পৃঃ ৪০৯)।

দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। গভীর রাত্রি। মন্দির উদ্যানের ফটক বন্ধ। গিরিশচন্দ্রের হাকডাক শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাইরে আসেন। মাতাল গিরিশের হাত ধরে তিনি আনন্দে হরিনাম ও নৃত্য করতে থাকেন। নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাস্পর্শে গিরিশচন্দ্র চিরকালের জন্য কেনা হয়ে যান। পরশমণির স্পর্শে সোনা হয় লোহা, মাতাল নাট্যশিল্পী হন 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসী' ভক্ত। পরবর্তীকালে একটি ভাষণে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন : আমি শাস্ত্রে ঈশ্বর কাহাকে বলে জানি না; কিন্তু এই ধারণাটা ছিল যে, আমি যেমন আমাকে ভালবাসি, তিনি যদি আমাকে সেইরূপ ভালবাসেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) আমাকে আমার মতো ভালবাসিতেন।...তিনি আমার অপেক্ষা আমায় অধিক ভালবাসিতেন।"[১৫]

বরাহনগর মঠের কথা ওঠে। মাষ্টারমশাই অন্যত্র মঠের বর্ণনা দিয়েছেন : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা একত্র হইয়াছেন। সুরেন্দ্রের সাধু-ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকিবার একটি বাসস্থান হইয়াছে। সেইস্থান আজ মঠে পরিণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা।...তিনি (নরেন্দ্র) নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ করিলেন্। বেদ পুরাণ তন্ত্রমতে মনের বেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। কখনও কখনও নির্জন বৃক্ষতলে, কখনও একাকী শ্মশান মধ্যে, কখনও গঙ্গাতীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপধ্যানে দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মিলিত হইয়া সংকীর্তনানন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। (ক ৩। পরি। ১) অন্তরঙ্গ ভক্তদের অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা সব কিছু সমর্পিত হয়েছিল এই সাধনভজনের মধ্যে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ঈশ্বরপ্রাণতায় রঞ্জিত মঠবাসীদের ভাবপুঞ্জ।

মাষ্টারমশাই গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : এদের বরাহনগরের আড্ডাটা Unique—এরকম কি পূর্বে কখনও হয়েছে ?

গিরিশচন্দ্র : কী ইংরেজী লেখাপড়া এদেশে চালু হবার পর ?

আলোচ্য প্রসঙ্গালোকে মননযোগ্য স্বামী বিবেকানন্দের একটি পত্রাংশ (১৮৯৪ খ্রী: লেখা) যীশু-খ্রীষ্টকে জেলে-মালায় ভগবান বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেললে; বুদ্ধকে বেনে-রাখাল তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—Nineteenth century-র শেষভাগে ইউনিভার্সিটির ভূত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।"[১৬] ঐতিহাসিক তথ্য হতে জানা যায় যে পূর্বে কখনও কোন অবতারপুরুষ তাঁর জীবদ্দশায় সর্বশ্রেণীর মানুষের এরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারেন নি।

'মধুরেণ সমর্পয়েৎ' নীতি অনুসরণ করেই যেন গিরিশচন্দ্র ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতিচর্চা সমাপ্ত করেন একটি মধুর কাহিনী দিয়ে। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। শ্যামাপূজার সন্ধ্যাকালে ভক্তদের

১৫। ২৮শে জুলাই, ১৮৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

১৬। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৭৬।

পূজাগ্রহণের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বরাভয়করা মা-কালীর রূপ ও ভাব ধারণ করেছিলেন। একটি প্রশ্নের উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলেছিলেন : তিনি শ্যামপুকুরের বাটীতে ফুলনৈবেদ্য সমস্ত চারি দিকে সাজাইয়া বসিয়া আছেন। আমাকে বলিলেন, আজ মার দিন অমনি করিয়া বসিতে হয়। আমার কি মনে হইল, আমি 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া সেই চন্দন ও ফুল তাঁহার চরণে দিলাম এবং উপস্থিত সকলেই সেইরূপ করিল, তাঁহার ভাবসমাধি হইয়া গেল এবং হাত বরাভয়রূপে স্থির হইল।[১৭] এই ঘটনার উল্লেখপূর্বক গিরিশচন্দ্র তখন বলেন : কালীভাবে (আবিষ্ট হয়ে) তিনি আমাকে আগে ফুল দিতে বললেন।

পরদিন রবিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। মাষ্টারমশাই ছুটির দিনে উপস্থিত হয়েছেন বরাহনগর মঠে। সেখানে এসেছেন দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর মামা হরিশ মুস্তাফি।[১৮]

বরাহনগর মঠ ভগবৎ-চিন্তার তপোভূমি। রামকৃষ্ণ-কল্পতরুর শাখাপল্লব বিস্তার করেছে সেখানে। সেই কল্পতরুর মূলে ভক্তদের ভীড় হতে থাকে।

সেখানে উপস্থিত ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের একটি গ্রুপফটো তোলা হয়। বলাবাহুল্য, কোন গৃহীভক্তের উৎসাহে ও ব্যয়ে দুর্লভ এই আলোকচিত্রটি গৃহীত হয়। ভক্তটি সম্ভবতঃ হরিশ মুস্তাফী। বৈরাগ্যাভরণে ভূষিত তাপসদের এই চিত্রে তদানীন্তন মঠ-জীবনের একটি প্রোজ্জ্বল ভাবমূর্তি প্রকটিত।

১৭। রামকৃষ্ণ মিশনের ৭ম সভাপতি গিরিশচন্দ্রের ভাষণ ও প্রেরণায়।

১৮। মাষ্টারমহাশয় অফিসে উচ্চপদে কাজ করতেন। কল্পতরুদিবসে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে 'দেবেন-বাড়িতে কৃপা করিলেন নাম।'

আলোকচিত্রে বাম হতে ডাইনে দাঁড়িয়ে আছেন তারকনাথ (স্বামী শিবানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ), বাবুরাম (স্বামী প্রেমানন্দ), দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সারদাপ্রসন্ন (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) ও হরিশ মুস্তাফি। এবং সম্মুখের সারিতে নীচে বসে আছেন নিরঞ্জন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) শরৎ (স্বামী সারদানন্দ), রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ও কালীপ্রসাদ (স্বামী অভেদানন্দ)। (আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)।

আলোকচিত্র গ্রহণের পর ভজনকীর্তনের আসর বসে। অনুমান হয় সংকীর্তনানন্দের সঙ্গে নৃত্যও জমে উঠেছিল।[১৯]

●

॥ আশ্বিনের গান ॥

(বাউল দাদরা)

শ্রীবিনয়ভূষণ দাশগুপ্ত

পূব গগনের মেঘ সরেছে
　　বাদল ঝরার দিন গিয়েছে
　　আশ্বিনী দিন এল রে ভাই
　　আশ্বিনী দিন এল।

মন বিবাগী আনন্দে আজ
　　নয়ন তোমার মেল রে ভাই
　　নয়ন দুটি মেল।

নীল-সরসীর শিহরণে
লাগল দোলা কমল বনে
শাপ্‌লা ফুলের দলগুলি আজ
　　আলোয় ছোঁয়া পেল রে ভাই
　　আলোয় ছোঁয়া পেল।

কাশ-কেশরে লাগল দোলা
　　বাতুর পরশ লেগে
বিহঙ্গেরা মেল্‌ল ডানা
　　ধবল মেঘে মেঘে।

পথিক বাউল একতারাতে
গান ধরেছে শারদ প্রাতে
তার সাথে আজ উদাসী মন
　　সুর মিলিয়ে ফেল রে ভাই
　　সুর মিলিয়ে ফেল।

বিশ্বময়ীর আগমনে
গান গেয়ে যাই আপন মনে
আনন্দেরি দিন এল আজ
　　দুঃখ ঘুচে গেল রে ভাই
　　দুঃখ ঘুচে গেল।

●

১৯। এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর পূজনীয় মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ১৭৪-৭৫।

॥ মহতী বিনষ্টিঃ ॥

ডক্টর রমা চৌধুরী

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।
ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকদমৃতা ভবন্তি॥" (কেনোপনিষৎ ২।২।৫)

"যদি এই জীবনে ব্রহ্মলাভ হয়,
তবে হয় লাভ সত্য সতত।
যদি এই জীবনে ব্রহ্মলাভ না হয়,
তবে হয় মহান্ বিনাশ নিয়ত॥
অতএব, জ্ঞানিগণী সকলে
চরাচরে করে' ব্রহ্ম-দর্শন।
এই সংসার থেকে হয়ে বিরত—
অমৃত হয়ে' পরমধন্য হন॥" (ঐ)

এস্থলে, দ্বিতীয় পংক্তিতে "সত্য" কথাটীর অর্থ হল: মোক্ষ বা মুক্তি, অথবা কৃতকৃতার্থতা বা পরমার্থতা; এবং "অমৃত" কথাটীর অর্থ হল: "অমর ব্রহ্মস্বরূপ"।

অতএব, এই সুন্দর মন্ত্রটীতে একথা স্পষ্টতম ভাবে বলা হয়েছে যে, যিনি এই দেহেই, এই জীবনেই, এই জগতেই ব্রহ্মকে লাভ করেন, তিনি এই দেহেই, এই জীবনেই, এই জগতেই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, পরম কাম্য চরম লাভ "মোক্ষ" বা মুক্তিলাভে ধন্যাতিধন্য হন। সেজন্য বরিষ্ঠ ভক্ত-সাধনে প্রবরেরা সকলেই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মকে, জীবে শিবকে, আত্মায় পরমাত্মাকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে প্রাণপণ করে সচেষ্ট হন।

এস্থলে, ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের দুটী প্রধানতম তত্ত্বের কথা সগৌরবে উল্লিখিত হয়েছে—যথা সিদ্ধি বা মুক্তি; এবং সাধন বা তার উপায়। এই মনোরম মন্ত্রের মতে, মানবজীবনের একমাত্র সিদ্ধি বা মুক্তি হল,—ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করা, এবং তার একমাত্র সাধন বা উপায় হল, —ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে সর্বত্র,—জীবে জড়ে, অন্তরে বাহিরে, আত্মার প্রকৃতিতে সর্বত্রই সাক্ষাৎভাবে দর্শন করা।

এরূপে এই প্রসঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে ছয়টী মূলীভূত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় আমাদের অনিবার্য ভাবেই:—

(১) ব্রহ্মস্বরূপ কি?
(২) ব্রহ্মস্বরূপ লাভের অর্থ কি?
(৩) ব্রহ্মস্বরূপ লাভ কি বর্তমান দেহে, বর্তমান জীবনে, বর্তমান জগতে সম্ভবপর?
(৪) ব্রহ্ম-দর্শন কি?

(৫) ব্রহ্ম-দর্শন-লাভের অর্থ কি ?

(৬) ব্রহ্ম-দর্শন-লাভ কি বর্তমান দেহে, বর্তমান জীবনে, বর্তমান জগতে সম্ভবপর ?

স্থানাভাবে কেবল প্রথম তিনটীর বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হচ্ছে। অবশ্য শেষের তিনটীও প্রথম তিনটীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

(১) ব্রহ্মের স্বরূপ কি ?

অতিশয় কঠিন প্রশ্ন। কারণ, ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-নীতিতত্ত্বের একেবারে মূলীভূত, কেন্দ্রীভূত তত্ত্ব হলেন, সর্ববাদিসম্মতিক্রমে, এই "ব্রহ্ম কি সর্বজনবিদিত, সর্বজনসমাদৃত, রোমাঞ্চকর নাম এটী—"ব্রহ্ম"।—যার বুৎপত্তিগত অর্থ হল : "বৃহত্তম বস্তু" (বৃহ্ + মন্)। স্বভাবতঃই আমাদের জীবনের, আমাদের জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ, বৃহত্তম, মহত্তম, উচ্চতম, গভীরতম, ব্যাপকতম, পবিত্রতম, পূর্ণতম এই তত্ত্ব বা সত্যকে আমরা বিভূষিত করেছি অসংখ্য বিবিধ-বিচিত্র বিশেষণে, করেছি নানা রংএ রঞ্জিত, নানা গন্ধে সুরভিত, নানা মধুতে সিঞ্চিত। কিন্তু, তা' সত্ত্বেও, সবকিছু ছাপিয়ে, সবকিছু মিলিয়ে, সবকিছু পুরিয়ে, তাঁর একটী নাম, একটী, বর্ণনা, একটী সংজ্ঞা প্রজ্জ্বলিত হয়ে রয়েছে উজ্জ্বলতম বিভায় শাশ্বতকাল। সেটী হল—"সচ্চিদানন্দ"। অর্থাৎ, তিনি "সৎ" বা নিত্য, "চিৎ" বা অজড় ; "আনন্দ" বা অমৃতরসঘন। যুগে যুগে এই মধুর-মোহন, সরস-শোভন, ললিত-লোভন বর্ণনাটী অনুপ্রাণিত করেছে জ্ঞানীকে তত্ত্বকে, কর্মীকে সমভাবে। অতএব, এইটীকেই আমরা ধরে নিলাম এক্ষেত্রে ব্রহ্মের স্বরূপ বলে।

(২) ব্রহ্ম-স্বরূপ-লাভের অর্থ কি ?

এটী যেন আরো কঠিনতর প্রশ্ন। কারণ অনেকেই এক্ষেত্রে প্রারম্ভেই বিপরীত প্রশ্ন তুলবেন যে—জীবের পক্ষে ব্রহ্মের স্বরূপলাভ করা কি কোনোক্রমেই সম্ভবপর ? কারণ, অতি ক্ষুদ্র আমরা, তুচ্ছ আমরা দীন আমরা, হীন আমরা, অপূর্ণ আমরা, অসুখী আমরা। সেই আমরাই যদি ব্রহ্মের, ভূমা-মহা, অনন্ত-আনন্দস্বরূপ, অসীম দিব্য গুণশক্তি বিমণ্ডিত স্বরূপ লাভ করি, অর্থাৎ আমাদেরই মধ্যে যদি ব্রহ্মের আবির্ভাব হয়—তাহলে কি তা প্রদীপের মধ্যে সূর্যের রশ্মির, খদ্যোতের মধ্যে চন্দ্রের জ্যোৎস্নার, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আবির্ভাবের মতই সম্পূর্ণ অসম্ভব, সম্পূর্ণ অবাস্তব, সম্পূর্ণ হাস্যকর হবে না ?

না, নিশ্চয়ই হবে না—বলেছেন সত্যভূমি, ব্রহ্মভূমি, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সত্যদ্রষ্টা, ব্রহ্মবাদী, পুণ্যশ্লোক ঋষিরা সমস্বরে। কারণ, মহতের গৌরব ত ঠিক এইখানেই—তথাকথিত ক্ষুদ্রকেও মহৎ করে তোলা ; তার আপাতদৃষ্ট ক্ষুদ্রত্বের আবরণ উন্মোচিত করে। দেখ—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজেই ত লুক্কায়িত হয়ে আছে এক সুবিশাল মহামহীরুহ ; এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ কোরকেই ত নিহিত হয়ে আছে শতদিকপ্রসারী সুবিশাল শতদল। দিগ্‌দিগন্তব্যাপী অনন্ত-অসীম আকাশ কিন্তু তাদের ক্ষুদ্র বলে, তুচ্ছ বলে অবহেলা না করে, সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে, সমান প্রীতির সঙ্গে, সমান মর্যাদার সঙ্গে আলো দিয়ে, বাতাস দিয়ে, জল দিয়ে পূর্ণ উদ্বিত করে তুলছে, পূর্ণ বিকশিত করে তুলছে—সানন্দে সাগ্রহে সাদুগ্রহে। ঠিক একই ভাবে—"মহতো মহীয়ান" (কঠোপনিষৎ ২।২০, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।২০, মহানারায়ণোপনিষৎ ১।১,

৮।৮), "পরমং পরস্তাৎ" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৭)—"মহৎ থেকেও মহত্তর", "পরম থেকেও পরতর", অথবা শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেয়ঃ পরব্রহ্মের স্বরূপ সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সাত্মগ্রহে এসে পড়ছে তথাকথিত ক্ষুদ্র-তুচ্ছ-দীন-হীন-অপূর্ণ-অসুখী জীবস্বরূপে—তারই আলোকে, তারই বাতাসে, তারই জলে সেই জীব-স্বরূপকেও করে তুলছে—পূর্ণ উত্থিত, পূর্ণ বিকশিত।

কিন্তু, না, এও ত ঠিক বলা হল না। কারণ, ওপরে উল্লিখিত বীজের উপমা, কোরকের উপমা প্রারম্ভে কিছুটা খাটলেও, শেষপর্যন্ত তা আর টিকছে না। কারণ, আমরা ত প্রারম্ভে কেবলমাত্র ব্রহ্মবীজ নই। কেবলমাত্র ব্রহ্ম-কোরক নই—যা কালক্রমে, সাধনবলে, ব্রহ্ম-সাহায্যে, ব্রহ্মকৃপায় ব্রহ্মরূপে পূর্ণ উত্থিত হচ্ছে, পূর্ণ বিকশিত হচ্ছে—যেহেতু আমরা প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত ব্রহ্ম, পরিপূর্ণ ব্রহ্ম, চিরন্তন ব্রহ্ম। সেজন্য এক্ষেত্রে ঠিক করে বলতে হলে, বলতে হবে যে—আমরা শাশ্বত ব্রহ্মস্বরূপ হলেও অজ্ঞান-অবিদ্যা-বশতঃ, সেই মহাতত্ত্বটীকে, সেই পরমসত্যটীকে, সেই চরম তথ্যটীকে, জানতে পারি না, উপলব্ধি করতে পারি না অনুভব করতে পারি না। কিন্তু যখন আমরা ব্রহ্মস্বরূপ, এবং একই সঙ্গে, আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞানলাভ করি, তখন সেই জ্ঞানের অরুণালোকে আমাদের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়, এবং আমাদের নিজেদেরই সেই শাশ্বত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদত্বজ্ঞান উদিত হয়। তখন আমরা কি দেখি? দেখি গভীর দুঃখের সঙ্গে অনুতাপের সঙ্গে যে আমরা এতদিন যা দেখেছি, যা বুঝেছি, যা করেছি—সবই ভুল, সম্পূর্ণরূপেই ভুল, মারাত্মকরূপেই ভুল, শাশ্বতরূপেই ভুল। কারণ, এতদিন আমরা দেখেছি দ্বিত্ব, একত্বের স্থলে। তিমিররোগগ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ একচন্দ্রকে দুই বা ততোধিকরূপে দেখেন—সেরূপই। কিন্তু এখন দেখলাম, "ব্রহ্ম + জীব" নেই; আছেন কেবল "ব্রহ্ম = জীব"।

এই ত "ব্রহ্মস্বরূপ-লাভ"—আলোর আলোয় হচ্ছে মিলন—উত্তুঙ্গ অভ্রংলেহী পূত যজ্ঞাগ্নি-শিখায় এসে পড়ছে প্রভাত-সূর্যের অরুণ-কিরণ রেখা—এক হয়ে যাচ্ছে দুই আলোক ধারা। দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপী, সঙ্গমে গঙ্গায় এসে পড়ছে নর্তনলীলা প্রখরবেগা যমুনা এক হয়ে যাচ্ছে দুই জলপ্রবাহ, মৃদু-উচ্চ-গানভঙ্গী দুন্দুভিনিনাদে এসে পড়ছে দশদিকনিনাদী মঙ্গলশঙ্খের সুগম্ভীর নাদ—এক হয়ে যাচ্ছে দুই শব্দ-সম্ভার। একই ভাবে স্বরূপে স্বরূপ এসে পড়ছে—জীবস্বরূপে ব্রহ্মস্বরূপ—এক হয়ে যাচ্ছে দুইস্বরূপ।

কিন্তু, না, আবার ভুল হল—সাধারণ ভাষার এই ত দোষ—জীব ব্রহ্মস্বরূপ হচ্ছেন—এই কথা, উপরে বলা হয়েছে—তা'ত ভুল, যেহেতু জীব ত আদ্যন্তকাল ব্রহ্ম—তাহলে আবার নূতন করে ব্রহ্ম হবেন কিরূপে? কারণ যা' আমরা আদ্যন্তকাল হয়েই আছি, ব্রহ্ম-স্বরূপ তা'ত হয়েই আছি আবার তা' হব কেমনে—কেবল তা জানতেই যা বাকী। সেই "জানা" নিয়েই ত গণ্ডগোল; সেই "হওয়া" নিয়ে নয়।

সে যাহোক—Negative বা নঞর্থক দিক্ থেকেই যা'কিছু লাভ এক্ষেত্রে—কারণ, নঞর্থকদিক থেকে, চির-নিত্য-চির-বিরাজিত ব্রহ্মকেও ত জানতাম না এতদিন, এমন জানলাম অজ্ঞানের আবরণ উন্মোচিত হল—তাও ত মহালাভ, নয় কি?

আমরা এখন হয়ত কিছুটা বুঝলাম—ব্রহ্মস্বরূপলাভের অর্থ কি? তার অর্থ হল—শাশ্বত ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে জানা স্বীয় আত্মারূপে জগতের আত্মারূপে—সেইভাবে, জীব-জগতের সঙ্গে এক ও অভিন্নরূপে। কি মহনীয় বরণীয় নমনীয় কথা এটা।

(৩) ব্রহ্মস্বরূপ-লাভ বর্তমান দেহে, বর্তমান জীবনে, বর্তমান জগতে কি সম্ভবপর?

অর্থাৎ জীবন্মুক্তি-বাদ কি সম্ভবপর? নিশ্চয়ই। ওপরে যা বারংবার বলা হল—প্রথমতঃ এক্ষেত্রে, নূতন লাভ কিছুই নেই, কোনো অপ্রাপ্তবস্তুর নূতন করে প্রাপ্তি নেই; আছে নিত্যস্থিত বস্তুরই নূতন করে প্রকাশ। তা'ত যে কোনো স্থানে, যে কোনো কালে, যে কোনো অবস্থাতেই সম্ভবপর। দ্বিতীয়তঃ—আত্মা ত অতি অবশ্যই জড়দেহ-মনের বহু উর্দ্ধে, জড়-জগতের বহু উর্দ্ধে—তারা ত তাঁকে স্পর্শই করতে পারবে না। সুতরাং সাধক জড়-দেহধারী জড়-মনোবিশিষ্ট ও জড়-জগৎনিবাসী হলেই বা কি হল? পদ্মপত্রে জলের মতই তিনি অনায়াসে সংসারে থেকেও সংসার-পঙ্কে নিমজ্জিত না হয়ে, দিব্য দিন কাটিয়ে দেবেন।

সেজন্য জড়-দেহ-মন-জগৎ থাকলেই বা কি হল—তাতে ব্রহ্ম ও জীব যে এক ও অভিন্ন—এই সাক্ষাৎ উপলব্ধিতে বাধা ঘটবে কেন? বাধা ঘটে যদি তিলমাত্রও, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি এখনও অনাদি অজ্ঞান-অবিদ্যার কুবলয়গ্রস্ত। তুমি এখনও জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-পরিণাম-জরা-মরণ-রূপ ষড়বিকারভাগী দেহের দিক্ থেকে; তুমি এখনও কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যরূপ ষড়রিপুশাসিত, মনের দিক থেকে। এইভাবেই ত আসে জীবনে "মহতী বিনষ্টিঃ" মহান্ বিনাশ। অর্থাৎ এইভাবে জড়দেহ-মনোবদ্ধ হয়ে, জড়জগতের প্রতি কামনা-বাসনাসক্ত হয়ে, সকাম কর্ম করে, বারংবার জন্মগ্রহণ করে, নিরন্তর সংসার-চক্রে বিঘূর্ণিত হয়ে, অসীম দুঃখ-শোকক্লিষ্ট হওয়া। এই যদি "মহতী বিনষ্টিঃ" না হবে ত, আর কি তা হবে? সুতরাং, এরূপ "মহতী বিনষ্টিঃ" থেকে পরিত্রাণ লাভ করার একমাত্র উপায়, নিজেকে জড়-দেহ-মন-জগতের থেকে ভিন্ন করে, উপলব্ধি করে, একমাত্র ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন করে উপলব্ধি করা।

৺শ্রীশ্রীমাতৃপূজারও ত এই-ই হল মর্মোত্থ বাণী। কারণ তিনিই ত স্বয়ং স্পষ্টভাষায় বলেছেন ভক্তবৃন্দকে—

"একৈবাহং জগত্যত্র
দ্বিতীয়া কা মমাপরা?" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ১০ (৫))

"জগতে কেবলই আমি একাকিনী,
দ্বিতীয়া কে আর ভিন্নরূপিণী"? (ঐ)

ওঁ শান্তিঃ।

●

॥ বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাম-কাহিনী ॥

অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

ভারতবর্ষের পৌরাণিক বংশ তালিকায় শ্রীরামের কাহিনী উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত। পৌরাণিক এই বংশপত্রটিই প্রকারান্তরে ভারতবর্ষের ইতিহাস। ইতিহাস রচনার পদ্ধতি দেশ-বিশেষে ভিন্ন হয়। গ্রীস-রোমে বা ইউরোপে যেভাবে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, এদেশের ইতিহাস সেভাবে রচনা করা হয় নি। তাই বলে এদেশের পুরাণো ইতিহাস নেই, একথা বলা অসঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীবৃন্দ স্পষ্টাক্ষরে একথা বলেছেন।

রাম হলেন সূর্যবংশের কীর্তিমান পুরুষদের একজন। তিনি ভগবানের অবতাররূপে স্বীকৃত। অবতার হলেও তাঁর মনুষ্যরূপটি আচ্ছন্ন হয়নি। এদেশে অবতারপুরুষে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব একাধারে মিলিত হয়েছে। তাই বলে তিনি ঐতিহাসিক পুরুষ নন, রূপকথার কল্পিত চরিত্র—একথা বলা উচিত নয়। পুরাণগুলিতে বংশ-বর্ণনার প্রসঙ্গেই রামচরিত্র উদাহৃত হয়েছে। আদর্শ মানুষরূপে, দুষ্টবিনাশনরূপে ও সুশাসক রাজারূপে তিনি এ দেশবাসীর হৃদয়ে অমর আসন লাভ করেছেন এবং লোকোত্তর চরিত্রগুণে তিনি ভগবানের অংশাবতার রূপেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

রামচরিত্র বহু বিচিত্র ও ঘটনাবহুল। প্রাচীন ঋষিদের অনেকেই রাম-কথা বলেছেন। নারদ, পুলস্ত্য, অগস্ত্য, পরাশর, ব্যাসদেব, মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি ঋষি পুরাণ-কথা বর্ণনাপ্রসঙ্গে রাম-কাহিনী বিবৃত করেছেন। এই কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ মহাকাব্যের আকারে প্রকাশ করেন প্রাচেতস্ বাল্মীকি। ভারতীয় মতে তিনিই আদি কবি, অর্থাৎ লৌকিক সংস্কৃত ভাষায় ও লৌকিক ছন্দে রসসমৃদ্ধ করে তিনিই প্রথম রামচরিত রচনা করেছেন। অন্যান্য সকলেই মোটামুটিভাবে তাঁরই কাহিনী-কাঠামোকে অনুসরণ করেছেন। কেউ বা নতুন কোন ঘটনার অবতারণা করেছেন। কোন কোন স্থলে ধর্মীয় মতপার্থক্য অনুসারে তত্তৎ ধর্মের প্রচারবাহন রূপেও রাম-কাহিনীকে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে রাম-কাহিনীর কিছু কিছু রূপান্তরও লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণে রাম-কথা কিভাবে পরিবেশন করা হয়েছে, আলোচ্য প্রবন্ধে তার পরিচয় দেওয়া হল।

॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশের চতুর্থ অধ্যায়ে মাত্র আটটি ক্ষুদ্র অনুচ্ছেদে রাম-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। বর্ণনা গদ্যে। বক্তা ঋষি পরাশর, প্রশ্নকর্তা ও শ্রোতা শিষ্য মৈত্রেয়। পৌরাণিক বংশবর্ণনা প্রসঙ্গেই—মৈত্রেয়ের 'শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বংশান্' প্রশ্নের উত্তরে অন্যান্য চরিত্র-কথার সঙ্গে সূত্রাকারে রাম-কথা বিবৃত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত হলেও মোটামুটি রামের পূর্ণাঙ্গ জীবনই এখানে পাওয়া যায়। বাল্মীকি-বর্ণিত কাহিনী থেকে এ কাহিনী স্বতন্ত্র নয়।

বিষ্ণুপুরাণে রামের জীবন-কথার ক্রম এইরূপ: ১। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নরূপে ভগবান পদ্মনাভের (অচ্যুতাভ) চারিমূর্তিতে জন্ম, ২। বালককালেই ('বাল এব')

বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষার্থে রামের যাত্রা ও তাড়কা বধ, সুবাহুর বিনাশ ও মারীচকে বাণাঘাতে দূরে নিক্ষেপ, ৩। দৃষ্টিমাত্রে অহল্যার শাপমোচন ('সন্দর্শন মাত্রেণ এব অহল্যামপাপাং চকার'), ৪। জনকগৃহে অনায়াসে মাহেশ্বর চাপভঙ্গ ও বীর্যশুল্কে অযোনিজা জনকতনয়া সীতা লাভ, ৫। পরশুরামের শক্তির অবলেপ (৪০-৪৩)।

৬। পিতৃবচনে রাজ্যাভিলাষ ত্যাগ করে রামের ভ্রাতা (লক্ষ্মণ) ও ভার্যা (সীতা) সহ বন গমন, ৭। বিরাধ, খর, দূষণ, কবন্ধ ও বালীবধ এবং সাগরবন্ধন করে সবংশে রাক্ষসকুল ক্ষয় করে দশানন-অপহৃতা সীতাকে অগ্নিশুদ্ধা ও সকল কলঙ্ক মুক্ত করে অযোধ্যায় আনয়ন (৪৪-৪৫)।

তৎপরে উত্তররামায়ণের এই ঘটনা—৮। ভরতের গন্ধর্বনগর জয়, ৯। মধুপুত্র অমেয়বল লবণরাক্ষসকে নিহত করে শত্রুঘ্নের মধুরানগর স্থাপন, ১০। দুষ্টের বিনাশ, জগতের স্থিতি বিধানান্তর রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নের পুনরায় স্বর্গে গমন, ১১। কোশলনগরের যে সকল অধিবাসী রামভক্ত, তাদেরও সালোক্যপ্রাপ্তি, ১২। রামের দুইপুত্র কুশ-লব, লক্ষ্মণের দুইপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু, ভরতের পুত্রদ্বয় তক্ষ ও পুষ্কর এবং শত্রুঘ্নের দুইপুত্র সুবাহু ও শূরসেন (৪৬-৪৭)। বিষ্ণুপুরাণ মতে, রামাদি চার ভাই শ্রীভগবানের অংশাবতার :

"দশরথস্যাপি শ্রীভগবানকল্পনাভো জগৎস্থিত্যর্থম্ আত্মাংশেন
রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নরূপিণা চতুর্ধা পুত্রত্বমবাসীৎ।"

সীতা 'অযোনিজা', 'জনকরাজতনয়া'। সংক্ষিপ্ত হলেও বিষ্ণুপুরাণ রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। সীতার পাতাল প্রবেশের উল্লেখ নেই, কিন্তু রামের দুইপুত্র কুশ-লবের উল্লেখ আছে। রামভক্তরাও যে সালোক্যমুক্তি লাভ করেছিল, তারও উল্লেখ আছে :

"যেঽপি তেষু ভগবদংশেষু অনুরাগিণঃ কোশলনগর
জনপদাস্তেঽপি তন্মনস্কতৎসলোকতামবাপুঃ।"

কিন্তু পুরাণে রামাদির ভগবত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত। বাল্মীকি রামায়ণের ঘটনাক্রমই এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। রাম-কাহিনী যে বাল্মীকির রচনা, তার উল্লেখ না থাকলেও বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের তৃতীয় অধ্যায়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের পূর্ববর্তী ব্যাসরূপে ভার্গববংশীয় ঋক্‌পুত্র বাল্মীকির উল্লেখ করা হয়েছে : 'ঋক্ষোঽসৃজ্ ভার্গবস্তস্মাদ্ বাল্মীকির্যোঽভিধীয়তে'। (বিষ্ণু ৩।৩।১৮); মৎস্যপুরাণমতে ভার্গবসত্তম বাল্মীকি রামচরিত রচনা করেন : 'বাল্মীকিস্তস্য চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ' (মৎস্য: ১২।৫১)। বাল্মীকিই আদি রামায়ণকার পরবর্তী যত রাম-কথা সবই অল্পবিস্তর বাল্মীকির অনুবর্তন। বিষ্ণুপুরাণেও সে অনুবর্তন লক্ষণীয়।

বাল্মীকির অনুবর্তন থাকলেও বিষ্ণুপুরাণের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্যেও কিছু অবান্তর ভেদ লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরাণমতে বিষ্ণুর চতুর্ধা অংশ রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন—সকলেই বিষ্ণুর এক চতুর্থাংশ। রামায়ণ মতে—রাম ভগবানের অর্ধাংশ ('বিষ্ণোরর্ধম্'), ভরত পূর্ণের এক চতুর্থাংশ ('সাক্ষাৎ বিষ্ণোশ্চতুর্ভাগঃ'), আর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন প্রত্যেকে বাকি অর্ধাংশ—

('লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নৌ বিষ্কোরর্ধাংশসম্ভবৌ' ; পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদমতে প্রত্যেকে এক অষ্টমাংশ)। বাল ১৮। বিষ্ণুপুরাণমতে ভরতের পুত্রদ্বয়ের নাম তক্ষ ও পুষ্কর ; রামায়ণমতে তক্ষ ও পুষ্কল। বিষ্ণুপুরাণে শত্রুঘ্নের পুত্রদ্বয়ের নাম সুবাহু ও শূরসেন, রামায়ণেরমতে সুবাহু ও শত্রুঘাতী। রামায়ণের ক্রমানুসারে শত্রুঘ্নের লবণবধ, ভরতের গন্ধর্বলোকজয়ের পূর্বে ; বিষ্ণুপুরাণে ভরতের প্রসঙ্গই পূর্বে, শত্রুঘ্নের লবণবধের কথা পরে উক্ত হয়েছে। লোকস্থিতির লক্ষ্যেই ('জগৎস্থিত্যর্থম্') রামাদির ভগবদংশে অবতার—বিষ্ণুপুরাণে এই উক্তি অতি স্পষ্ট।

॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে (দশম ও একাদশ অধ্যায়) শুকদেব গোস্বামী রাজা পরীক্ষিতের নিকট সূর্যবংশের বংশানুচরিত বর্ণনাপ্রসঙ্গে রামচরিত বিবৃত করেছেন। বর্ণনা গাঢ়বন্ধ, সমাসবহুল ও অলঙ্কারসমৃদ্ধ। এতে রামের জন্ম থেকে রামলীলা সংবরণ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। দশম অধ্যায়ে শ্রীরামের পূর্বচরিত, একাদশ উত্তর রামচরিত।

দশম অধ্যায়ে রাম-কথার এই প্রসঙ্গগুলি প্রধান : অংশাংশে চতুর্ধা বিভক্ত করে 'ব্রহ্মময় ভগবান হরির রামাদিরূপে দশরথের গৃহে জন্ম, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে লক্ষ্মণের সামনেই মারীচাদি রাক্ষসবধ, সীতার স্বয়ংবরে 'ঐশ ধনু' ভঙ্গ করে গুণশীলবতী সীতালাভ, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামের দর্পচূর্ণ (১, ৫-৭)—সত্যপাশে আবদ্ধ পিতার নির্দেশে রাজ্য ও প্রিয়জন ত্যাগ করে রামের সীতাসহ বনে গমন, রাক্ষসভগিনী শূর্পনখার বৈরূপ্যসাধন ও খর, ত্রিশির, দূষণ প্রমুখ চৌদ্দহাজার রাক্ষসবধ করে দুঃখে বনবাস, মারীচবধ, রাবণ কর্তৃক বৈদেহী হরণ ও ভ্রাতার সঙ্গে সামান্য মানুষের মত পত্নীবিরহে কাতর হয়ে বনে বিচরণ, জটায়ু-সংকার, কবন্ধবধ, বানরের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে বালীনিধন ও বানরদের মুখে সীতার সংবাদ পেয়ে সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন, সমুদ্র-শাসনে সমুদ্রের রামস্তুতি ও সেতুবন্ধনের নির্দেশ (৮-১৫)—সেতুবন্ধনপূর্বক বিভীষণের নির্দেশে সুগ্রীব, নীল, হনুমান্ প্রমুখ বানর সৈন্যসহ লঙ্কায় গমন, রক্ষঃপতির নিকুম্ভ, কুম্ভ, ধূম্রাক্ষ, পুত্র, প্রহস্ত, অতিকায় ও কুম্ভকর্ণাদিকে রণে প্রেরণ ; সকলের বিনাশ দেখে 'হতমঙ্গল' রাবণের বিমানরথে যুদ্ধযাত্রা ও মাতলি-চালিত রথে আরূঢ় রামের প্রতি শরনিক্ষেপ, রামের রাবণ-নিন্দা ও বজ্রেরমত বাণে রাবণের হৃদয় ভেদ, মন্দোদরী প্রভৃতি রাক্ষসীর বিলাপ (১৬-২৮) বিভীষণ কর্তৃক আত্মীয়গণের ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সমাপন করা হলে রামের নিজে অশোকবনিকায় গিয়ে দুঃখিনী সীতাকে দর্শন, বিভীষণের রাজ্যাভিষেক ও হনুমান বিভীষণাদিসহ রামের অযোধ্যা যাত্রা—সংবাদ পেয়ে নন্দীগ্রাম থেকে তপস্বী ভরতের পাদুকাসহ আগমন ও রামবন্দনা, রামের অযোধ্যাগমন, রামের জটামোচন ও সিংহাসন গ্রহণ, অতঃপর রামরাজ্যের প্রশংসা (২৯-৫৬)।

একাদশ অধ্যায়ে উত্তর রামায়ণের ঘটনাবলী : রামচন্দ্রের যাগযজ্ঞ ও ব্রাহ্মণকে সর্বস্ব দান—নিজের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাত্রে ছদ্মবেশে নগরে পরিভ্রমণ ও স্বকর্ণে কোন ব্যক্তির মুখে সীতাপবাদ শ্রবণ, সীতানির্বাসন, প্রাচেতসের (বাল্মীকির) আশ্রমে সীতার

আশ্রয়লাভ ও যমজ সন্তান প্রসব, বাল্মীকি কর্তৃক পুত্রদের কুশ-লব নামকরণ ও জাতকর্ম সংস্কারাদি বিধান—অযোধ্যায় লক্ষ্মণের অঙ্গদ ও চিত্রকেতু, ভরতের দুইপুত্র তক্ষ ও পুষ্কল, শত্রুঘ্নের দুইপুত্র সুবাহু ও শূরসেনের জন্ম, ভরতের গন্ধর্বনগর জয়, লবণকে নিহত করে শত্রুঘ্নের মথুরাপুরী প্রতিষ্ঠা ও লবকুশকে মুনির হাতে অর্পণ করে স্বামীর চরণধ্যান করতে করতে সীতার 'ভূবিবর' প্রবেশ, রামের শোক ও অয়োদশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করে 'আত্মজ্যোতি'তে বিলীন হওয়া (১-১১)। তৎপরে রামতত্ত্বার্থ উদ্ঘাটন, রাম-কথা শ্রবণের ফল, ভ্রাতা, প্রজা ও পুরবাসীদের প্রতি রামের আচরণের বর্ণনা ও রামরাজত্বে অযোধ্যার সমৃদ্ধি বর্ণনা (২০-৩৬)।

ভাগবতীয় রাম-কথায় কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায় :

১। ভাগবতবক্তা বলেছেন, তত্ত্বদর্শী বহু ঋষি রামচরিত কীর্তন করেছেন : সেই কাহিনীই তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন ; শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলেছেন,

তস্যানুচরিতং রাজন্, ঋষিভিস্তত্ত্ব দর্শিভিঃ।
শ্রুতং হি বর্ণিতং ভূরিষ্বয়া সীতাপতের্মুহুঃ ॥ ৯।১০।৩

স্পষ্টভাবে এখানে বাল্মীকির রচনার উল্লেখ না থাকলেও, প্রাচেতস্ বাল্মীকির সঙ্গে রামকথার যোগ এই কাহিনীতে দেখানো হয়েছে। বাল্মীকির আশ্রমেই নির্বাসিতা সীতা আশ্রয়লাভ করেন, বাল্মীকিই সীতাপুত্রদের কুশলব নামকরণ করেন ও জাতকর্মাদি সংস্কার বিধান করেন। মনে হয়, শুকদেবের 'তত্ত্বদর্শী ঋষি'র ইঙ্গিত বাল্মীকি-প্রসঙ্গেই। সেই পাপনাশী নির্মল রামচরিত শুকদেবের কালেও রাজসভায় ঋষিগণ গান করতেন :

যস্যামলং নৃপসদসসু যশোঽধুনাপিগায়ন্ত্যঘঘ্নমৃষয়ঃ বাল্মীকি-রামায়ণ রচিত হয়েছিল গান করার উদ্দেশ্যেই।

২। ভাগবতে দেখা যায়, রাম সমুদ্র-শাসন করতে উদ্যত হলে, ভীতসমুদ্র প্রত্যক্ষ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে রামের স্তব করে বলেছিলেন,

ন ত্বাং বয়ং জড়ধিয়ো হ্য বিদাম ভূমন্
কূটস্থমাদিপুরুষং জগতামধীশম্। ৯।১০।১৪

—আমরা জড়মতি : হে বিরাট (ভূমন্) আমরা তোমার স্বরূপ জানি না ; তুমি কূটস্থ আদিপুরুষ, তুমিই জগতের অধীশ্বর। এবং শেষে বলেছিলেন, 'বন্ধীহি সেতুমিহ'—আমার উপর সেতুবন্ধন কর। রামায়ণে রামই সাগরকে তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে—'অন্ত মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্য বা' বলে সাগরের পূজা করেছিলেন—'উপাসত তদা রামঃ সাগরং সরিতাং পতিম্' ; পরে সাগরের নিষ্ক্রিয়তা দেখে সমুদ্রশাসন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন সমুদ্র স্বয়ং উপস্থিত হয়ে রামের স্তব না করে বরং অনুযোগই করেছিলেন এবং শেষে বলেছিলেন, নল আমার উপর সেতু নির্মাণ করুক (লঙ্কা ২১)।

৩। ভাগবতে রাবণবধের পর রাম স্বয়ং অশোকবনিকায় গিয়ে বিরহব্যাধিক্লিষ্টা প্রিয়তমা ভার্যাকে শিংশপাবৃক্ষমূলে দেখে অনুকম্পায় পূর্ণ হয়েছিলেন—

ততো দদর্শ ভগবান্ শোকবনিকাশ্রমে।
কামাং স্ববিরহব্যাধিং শিংশপাবুলক্ষিতাম্॥
রামঃ প্রিয়তমাং ভার্যাং বীক্ষ্যাধ্যকম্পত। ৯।১০।৩০, ৩১

ভাগবতে সীতার অগ্নিপরীক্ষার কথা নেই। পতিদর্শনে আহ্লাদিতা পদ্মাননা সীতাকে যানে তুলে রাম অযোধ্যায় এনেছিলেন।

রামায়ণে রাবণবধের পরে সীতাকে রামসমক্ষে আনা হয়েছিল, রাম সীতাকে কঠোর বাক্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং পরিশেষে দেবগণ ও পিতার বাক্যে অগ্নিশুদ্ধা পত্নীকে গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ ১১৭-১২০।

৪। রামরাজ্যের প্রশংসাপ্রসঙ্গে ভাগবতের বর্ণনায় একটু নতুনত্ব আছে। ভাগবতকার বলেন, রামরাজ্যে ত্রেতাযুগ যেন সত্যযুগের মত হল—'ত্রেতায়াং বর্তমানায়াং কালঃ কৃতসমোঽভবৎ'। 'রামে রাজনিধর্মজ্ঞে'—ধর্মজ্ঞ রামের রাজ্যকালে বন, নদী, পর্বত, বর্ষ, দ্বীপ—'সর্বে কামদুঘ আসন্'; রাজ্যে আধিব্যাধিজড়ামানিদুঃখশোক ছিল না, মৃত্যুও ছিল ইচ্ছামৃত্যু—'মৃত্যুশ্চ অনিচ্ছতাং নাসীৎ'। রাম ছিলেন একপত্নীধর, তাঁর চরিত্র রাজর্ষির চরিত্র—'একপত্নীব্রতধরো রাজর্ষিচরিতঃ শুচিঃ'। ৯।১০।৫১-৫৬

৫। শ্রীমদ্ভাগবতে রামের যাগযজ্ঞ ও দান সম্পর্কে একটি নতুন কাহিনী বলা হয়েছে। রাম যজ্ঞে প্রচুর দান করতেন। সর্বস্ব দানে অবশিষ্ট রইল শুধু নিজের অলঙ্কার ও বসন। রাজ্ঞী সীতারও অবশিষ্ট রইল শুধু অঙ্গের মাঙ্গল্যচিহ্ন। এই দেখে গ্রহীতা ব্রাহ্মণেরা রাজার সব দান ফিরিয়ে দিলেন, বললেন, আপনার কৃপালাভ করায় আমাদের সবই পাওয়া হয়েছে—

তে তু ব্রহ্মণ্যদেবস্য বাৎসল্যং বীক্ষ্য সংস্তুতম্।
প্রীতাঃ ক্রিয়াবিরস্তুষ্মৈ প্রত্যর্পেদং বভাষিরে॥
অপ্রক্তং ন বয়া কিং নু ভগবন্ ভুবনেশ্বর। ১।১১।৫, ৬

রামায়ণে এরূপ ঘটনার কোন বিবরণ নেই।

৬। রামায়ণে দেখা যায়, রাম ভদ্র নামক নিশাদূতের মুখে সীতাপবাদ শ্রবণ করে সীতাকে নির্বাসন দেওয়ার সঙ্কল্প করেন (উত্তর ৫৩)। ভাগবতে দেখা যায়, রাম নিজেই রাজ্যের খবর সংগ্রহের জন্য রাত্রিকালে ছদ্মবেশে ('অলক্ষিত') নগরভ্রমণ করবেন। এইরূপ ভ্রমণকালে একদিন তিনি শুনলেন, একব্যক্তি তাঁর স্ত্রীকে বলছে, তুই পরগৃহগামিনী দুষ্টা অসতী, তোকে আর আমি ভরণপোষণ করব না; আমি কৈল···রাম নই, যিনি পরগৃহবাসিনী সীতাকে ভরণপোষণ করছেন:—

কদাচিল্লোকবিজ্ঞানং গূঢ়ো রাত্র্যামলক্ষিতঃ।
চরন্ বাচোঽশৃণোদ্ রাজ্ঞো ভার্যামুদ্দিশ্য কস্যচিৎ॥

নাহং চিন্তয়ামি ত্বাং দুষ্টামসতীং পরবেশ্মগাম্
স্ত্রীলোভী বিকৃতাৎ সীতাং রামো নাহং ভজেপুনঃ ॥ ৯।১১।৮, ৯

লোকমুখের এই দুর্বাক্য শুনেই রাম সীতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। রামায়ণে অপবাদ পরোক্ষ শোনা, ভাগবতে শ্রবণ প্রত্যক্ষ।

৭। 'সীতার ভূবিবর প্রবেশে'র কাহিনীটিও ভাগবতে নতুন। এখানে নবযুগের রামায়ণ গানের প্রসঙ্গ নেই, সীতার পরীক্ষার কথাও নেই। সীতা স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে বাল্মীকির আশ্রমে আশ্রয় লাভ করেন। সেইখানেই কুশলব নামে দুই পুত্র প্রসব করেন। মুনিই বালকদের নামকরণ, জাতকর্ম ও সংস্কারাদি বিধান করেন। স্বামী-পরিত্যক্তা সীতা সন্তান-দুটিকে বাল্মীকির হাতে সমর্পণ করে স্বামীর চরণ ধ্যান করতে করতে ভূবিবরে প্রবেশ করেন :

মুনৌ নিক্ষিপ্য তনয়ৌ সীতা ভর্তা বিবাসিতা।
ধ্যায়ন্তী রামচরণৌ বিবরং প্রবিবেশ হ ॥ ৯।১১।১২

রাম এই সংবাদ শুনে তচ্ছ্রুত্বা ভগবান রামঃ। সীতার গুণরাশি স্মরণ করে, বৈধশীল হয়েও শোক নিরুদ্ধ করতে পারলেন না।

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ রামো ব্রহ্মণ্যপি ধিয়া শুচঃ।
স্মরন্তস্তা গুণাং স্তাং স্তান্ নাশক্নোদ্ রোদ্ধুমীশ্বরঃ ॥ ৯।১১।১৬

ভাগবতকারের দৃষ্টি ভক্তের দৃষ্টি।...মানুষরূপে অবতীর্ণ হলেও রাম হলেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় ভগবান হরির অংশাবতার। সমুদ্র তাঁকে 'কূটস্থ আদিপুরুষ' বলে বন্দনা করেছেন, ঋষিগণ তাঁকে 'উত্তমশ্লোক ব্রহ্মণ্যদেব' বলে নমস্কার করেছেন। মানুষ হলেও ব্রহ্মা ও শিবও তাঁর অর্চনা করেন—'স মনুষ্যেহ্জভবার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ'। রামাবতার ভগবানের লীলামাত্র। মর্ত্যের সকণ্টক পথযুগল ভক্তজনের হৃদয়ে ন্যস্ত করে তিনি আবার আত্মজ্যোতিতে বিলীন হয়েছেন 'আত্মজ্যোতির গাং', তাঁর ভক্তজনেরাও সালোক্য মুক্তিলাভ করেছে। ভাগবতকারের শেষ কথা—'রঘুপতিং শরণং প্রপদ্যে'। ভাগবতীয় রামকথার স্ত্রীসঙ্গীদের দুঃখের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সীতাবিরহে বিরহী রাম বলেছেন, 'স্ত্রীসঙ্গীণাং গতিমিতি' : ভাগবতকারও পরিশেষে মন্তব্য করেছেন,

স্ত্রীপুংপ্রসঙ্গ এতাদৃক্ সর্বত্র ত্রাসমাবহঃ।
অপীশ্বরাণাং কিমুত গ্রাম্যস্য গৃহচেতসঃ ॥ ৯।১১।১৭

॥ প্রকৃতি, মানুষ ও অতিমানুষ ॥

শ্রীরণজিৎ কুমার সেন

পৃথিবীতে বুদ্ধিজীবীর অংশ যত সম্প্রসারিত হয়েছে, মানবসমাজের বসতিও ততই ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু পৃথিবীতে প্রাণী হিসেবে মানুষই কি একমাত্র জীব? তা নয়। মানুষের জন্মেরও বহু পূর্বে উদ্ভিজ্জ শ্রেণীর সৃষ্টি, তারপর আছে সরীসৃপ ও পশুসমাজ। কীট-পতঙ্গ ও পক্ষীসমাজও বিশেষভাবেই গণনীয়। মানুষের জন্মের পূর্ব থেকেই মানুষের আহার্য পৃথিবীতে প্রস্তুত হয়ে ছিল। মানুষ কেবল তার পর্যায়ক্রমিক উন্নতির ধাপে ধাপে নানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই আহার্যকে আবিষ্কার ক'রে ক্রমে সভ্যতার বিকাশের পথে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু মানুষ সভ্য হয়ে উঠেছে অর্থে সে তার মৌলিক বৃত্তিগুলির যে বিলোপসাধন করেছে, তা নয়। বরং ধাপে ধাপে সে যত উন্নতির পথে এগিয়েছে, তত সে তার প্রাকৃতিক পরিবেশকে পূর্ণমাত্রায় ভোগ করেছে। জলজাত পদার্থ, উদ্ভিদজাত পদার্থ, এবং পশু-পক্ষীজাত প্রাণী—কোনো কিছুই তার ভোগ্যবস্তু থেকে বাদ যায়নি। ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়—সৃষ্টির একটা বিশেষ পর্যায়ে এসে পৃথিবীর এই মাটিতে একই সময়ে এই সমুদয় প্রাণীর অবস্থিতি এবং ধ্বংস ও উন্নতি সমভাবে ক্রীড়াশীল হয়ে চলেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় মানুষকে। কিন্তু তার এই শ্রেষ্ঠতা প্রকৃতি নিরপেক্ষ নয়। বরং প্রকৃতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়েই তাকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হয়েছে। যে ভূমিতে তার জন্ম, সেই ভূমি খনন ক'রে তাকে যেমন নানা আবিষ্কারের পথে এগোতে হয়েছে, তেম্‌নি সেই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে তাকে নানা গঠনমূলক কাজেও মাথা খাটাতে হয়েছে; তেম্‌নি যে জল তার জীবন, সেই জলধারাকেও তাকে নানা বৈজ্ঞানিক প্রকরণে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়েছে। অন্যদিকে বন-প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ দিনে দিনে মিতালী পাতিয়েছে; একদিকে যেমন উদ্ভিজ্জশ্রেণী তার হাতে ধ্বংস পেয়েছে, অন্যদিকে তেম্‌নি বনমহোৎসবের আয়োজন ক'রে সে বৃক্ষবন্দনায় মুখর হয়ে উঠেছে। তেম্‌নি গবাদি-পশু প্রভৃতি শুধু তার কৃষিকর্ম বা শকট চালনেই মাত্র সহায়ক হয়নি, একই সঙ্গে নিজের দেহ এবং দেহজাত দুগ্ধের দ্বারা মানুষের দেহগঠনে ও প্রয়োজনসাধনে পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করেছে। জলজাত মৎস্যশ্রেণী ও নভোচারি পক্ষীসমাজও তেম্‌নি মানুষের প্রীত্যর্থে নিজেদেরকে অজস্রভাবে দান করেছে। অর্থাৎ এই যে সমুদ্র ও নদীবিধৌত ভূ-প্রকৃতি—তার কোন আশ্রয় নিয়ে প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণীই আপন আপন সমাজে যেমন কৌলিন্য রক্ষা ক'রে চলেছে, তেম্‌নি পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতাতেও ত্যাগের গৌরব তার কম নয়। প্রধানতঃই এ গৌরবের সুযোগ গ্রহণ করেছে মানুষ। কারণ সৃষ্টিজগতে বিধাতা তাকে দিয়ে তাঁর আপন লীলা পরিসমাপ্ত করতে চেয়েছেন।

কিন্তু শরীরের একটি অঙ্গে ব্যাধির প্রকোপ ঘটলে গোটা দেহটাই যেমন অচল হয়ে পড়ে, তেম্‌নি সৃষ্টিক্ষেত্রে কোথাও কোনো দুর্যোগ ঘটলে বিশেষ একশ্রেণীই মাত্র আক্রান্ত হয় না, আক্রান্ত হয় পুরো জীবসমাজই। এবং যেহেতু সৃষ্টিধর্মে এই জীবসমাজের উচ্চকুলে অধিষ্ঠিত

রয়েছে মানুষ, সেই হেতু যে কোনোরকম দুর্যোগের মুখোমুখি এসে দাঁড়াতে হয়েছে মানুষকেই। সে জানে—তার একার বাঁচাটাই বাঁচা নয়, তার পূর্ণাঙ্গ জীবন নির্ভর করছে প্রকৃতিজাত সর্বশ্রেণীর প্রাণীসমাজের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার উপর। সেই প্রাকৃতিক নিরাপত্তাকে সার্থক ক'রে তুলতে পারে তার সমূহ চেতনা, তার বুদ্ধিবৃত্তি, তার বিবেক ও শক্তি। কারণ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব সে, তার ধর্মই হচ্ছে সামগ্রিকতাকে রক্ষা ক'রে সৃষ্টিকে রক্ষা করা।

কিন্তু সৃষ্টির বুকের মধ্যেই এমন বিদ্রোহ আছে যে, মাঝে মাঝে সে আত্মপ্রকাশ না ক'রে সৃষ্টিকে খুশী রাখতে পারে না। তারই ফলে কখনো ভূমিকম্প হয়, কখনো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ঘটে, কখনো ঝড়-ঝঞ্ঝা ও সাইক্লোনে ভেঙে পড়ে, তার সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে চলে প্রবাহসঙ্কুল বান ও বন্যা; কখনো পাহাড়ে নামে ধ্বস, কখনো বা অতিরিক্তমাত্রায় বিদ্যুৎস্ফুরণ বা বজ্রপাত ঘটে। বিজ্ঞানীরা এসব ঘটনার যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই দিন না কেন, এবং এই ঘটনাবলীকে যতই তাঁরা নিয়ন্ত্রিত করতে চেষ্টা করুন না কেন, তবু এসব ঘটনা প্রকৃতির নানা আবর্তনে-বিবর্তনে সংঘটিত হওয়া থেকে বিরত নেই। প্রকৃতির চরিত্রের মধ্যেই তার নিজের একটি ধ্বংসের দিক হচ্ছে এই সব সংগঠন। বুঝি বা অন্য দিকে সংগঠনের উদ্যোগটিও একেবারে উহ্য নেই। কিন্তু তার এই ধ্বংসলীলার অর্থ কি প্রাণীসমাজেরই ধ্বংস বা ক্ষতি নয়? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ভূমিকম্পে, সাইক্লোনে, বন্যায়, পার্বত্য-ধ্বসে ও বজ্রপাতে যত প্রাণী ধ্বংস হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বাসভূমি ও শস্যক্ষেত্রের ক্ষতি হ'য়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও আমাদের হিসেবের বাইরে। বলবো না যে, প্রকৃতির এই আপন ধ্বংসাত্মক চরিত্রটি একান্তই তদ্‌গত; মানুষও তার জন্যে কিয়দংশে দায়ী। প্রকৃতির কাছ থেকে সে তার আপন স্বার্থে যতখানি সুবিধে আদায় করতে চেয়েছে, সেই মুহূর্তে প্রতিশোধেরও কিছু-একটা জটিল ইকুয়েশন ক'ষে নিয়েছে প্রকৃতি। ফলে কত রাজ্য-সাম্রাজ্য ডুবেছে, কত জাহাজ তলিয়ে গেছে মহাসমুদ্রের অতলে, কত এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে ভূতলে। সেই সঙ্গে এসেছে মহামারী ও মড়ক, ছড়িয়ে পড়েছে নানা ব্যাধি। কত মরুভূমির রূপান্তরিত হয়েছে সমুদ্রে, কত জলাশয় শুকিয়ে হয়েছে মরুভূমি!

কিন্তু তার মধ্যে সৃষ্টির কাজও অব্যাহতভাবেই চলেছে। এগিয়ে চলেছে মানুষ। দুর্জয় শক্তিতে বারবার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে সে। প্রকৃতি যত বিদ্রোহী হয়েছে, ততো তাকে নিজের আয়ত্তে আনতে জীবন-পণ করেছে মানুষ। কারণ জীব হিসেবে পৃথিবীতে মানুষই একমাত্র বুদ্ধির অধিকারী। সেই বুদ্ধিপ্রবণতাকে সে নানাভাবে খাটিয়েছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে নানা সংগঠনে। এক্ষেত্রে সে তার আপন কীর্তিকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। মানব-সত্যের বিজয়কেতন উড়েছে সর্বকালে সর্বদিকে। সে পর্বত জয় করেছে, সমুদ্র শাসন করেছে অভিযান করেছে চন্দ্রে, অগ্নিকে এনেছে আপন আয়ত্তে, পীড়াকে বেঁধেছে ভেষজে। যত সে ডুবেছে, ততো সে ভেসেছে, আর যত সে মরেছে, ততই সে বার বার বেঁচে উঠেছে। এই বাঁচা তার একক বাঁচা নয়, সামূহিক বাঁচা। যে-কালে যে-পরিবেশে সে জীবনধারণ করেছে, সেই কালে ও সেই পরিবেশে তার সহাবস্থিত অন্যান্য প্রাণীকুলেরও প্রতিরক্ষার

দায়িত্ব নিতে হয়েছে তাকে। এখানে ভূচর, জলচর ও নভোচর জাত সর্ববিধ বিষয়ও এই প্রাণীকুলেরই অঙ্গীভূত। কারণ কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এককভাবে জীবনধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সে প্রতিমুহূর্তের জন্যেই প্রকৃতিনির্ভর; তাই প্রকৃতির সর্বব্যাপী প্রাণপ্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখাই তার প্রাণের ধর্ম। এই ধর্ম-যুদ্ধে যত সে হেরেছে, ততোধিক সে জয়ী হয়েছে। এই জয়ের ইতিহাসই চিরকালের অগ্রগামী মানবযাত্রীর ইতিহাস।

কিন্তু যে-মানুষ প্রকৃতির অধীনে থেকে অথচ প্রকৃতিকে জয় ক'রে ভূমিক্ষেত্রে নিজের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করলো, সেখানে ছিল তার আপন স্বার্থে দুঃসাহসিকতার পরিচয়। তখনো সে সর্বাঙ্গীন মানবিক গুণের অধিকারী হয়নি। অধিকারী হ'লো সেদিন—যেদিন তার সকল দুঃসাহসিকতা মানসিক ও দৈহিক শক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা ক'রে তার মধ্যে র‍্যাশেনালিটিতে এসে যুক্ত হলো। প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এখানে এনিম্যালিটিকে জয় করবার মতো অন্তর্নিহিত এনিম্যালিটি বা দেহসর্বস্ব পশুবৃত্তির প্রভাবে থেকেও তাকে জয় ক'রে র‍্যাশেনালিটি বা গুণবাচক মানবিক বৃত্তিতে উত্তীর্ণ হবার যে শক্তির পরিচয়, সেইটেই মানুষের আসল পরিচয়। সেই শক্তি যেমন ষড়-রিপুকে বশে এনে তার মধ্যে সুকুমার বৃত্তির স্ফুরণ ঘটালো, তেম্‌নি এই সুকুমার বৃত্তিকে আশ্রয় ক'রেই সেই শক্তি মানুষকে নানা দিকে নানা কাজে পরিব্যাপ্ত ক'রে ছিল। পৃথিবীর এই বিরাট ভূমিক্ষেত্রে মানুষের শুধু একচ্ছত্র অভ্যুত্থানই ঘটলোনা, সেইসঙ্গে তার বুদ্ধিবৃত্তি (talent with ethical sense) ও নানা উদ্ভাবনী শক্তির (Power of creativity) বিকাশে নানা দিকে নানা প্রয়োজনের উপাদান গ'ড়ে উঠলো। সমাজ বিকাশের মূলে রয়েছে মানুষের র‍্যাশেনালিটিজাত এই উদ্ভাবনী শক্তি। তার কৃষিকর্ম ও শিল্পকর্ম থেকে শুরু ক'রে বিদ্যাচর্চার যাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান এই শক্তির উপরেই ভিত্তিশীল। কিন্তু সময়ের অগ্রগামিতার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানের ক্ষেত্র কিন্তু তার সীমিত কৃষিক্ষেত্র ও শিল্পক্ষেত্রেই আবদ্ধ রইল না, এই বস্তুজগতের মতো মানুষের একটি মনোজগতেরও সন্ধান পাওয়া গেল—যার পরিধি কোনো সীমানার বন্ধন মানলো না। মানুষের জীবনের একটা অংশ যদি এই বস্তুজগতের সঙ্গে যুক্ত রইল তো আর দ্বিতীয় অংশটি ছড়িয়ে পড়লো সেই পরিব্যাপ্ত মনোজগতের অসীমে। জীবনের সেই ব্যাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি বোধ করি যোগ্যতম—

'জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে,
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে,
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

ভূমিক্ষেত্রের নিত্যপ্রয়োজনীয় জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র ক'রে মানুষ পৌঁছালো দেশ-কালের অতীত মহাবিশ্বলোকে—যেখানে ভাবের সঙ্গে ভাব যুক্ত হয়ে হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের বন্ধন দৃঢ় হয়ে জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগ বেড়ে গেল। এই জীবনের সঙ্গে জীবনের যোগই মানুষের বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগ। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে থেকে যেমন প্রকৃতিকে শুধু জয় করলো না,

জয় করলো প্রবৃত্তিকেও, তেম্‌নি তার এই বিজয়ী মানসিকতা ক্রমে জয় করতে উদ্যত হলো অন্তরীক্ষকেও। কারণ অন্তরে সে আহ্বান পেয়েছে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর, নক্ষত্রলোকের নিমন্ত্রণ পেয়েছে সে আলোকের অক্ষরে। নিজের মধ্যে তখন সে সঙ্গীত হয়ে বেজে উঠেছে। বৃক্ষ যেমন নিজেকে ছাড়িয়ে ওঠে তার পুষ্পে, তেম্‌নি মানুষ দিনে দিনে নিজেকে ছাড়িয়ে উঠেছে তার আপন কীর্তিতে। দস্যু রত্নাকর রূপান্তরিত হয়েছে বাল্মীকিতে। তার কণ্ঠে তখন মহাকাব্যের শ্লোক।

একথা বলবো না যে, সর্ববিজয়ী হ'য়েও মানুষ দুঃখ থেকে, শোক থেকে, ত্রাণ পেয়েছে, কিন্তু সেই দুঃখ ও শোক তার মধ্যে সৃজন করেছে অগ্নি—যার তেজে সে দুঃখ ও শোককে এক মরমী সহনশীলতায় নিজের ব্যক্তিত্বের প্রদাহগুণের সঙ্গে যুক্ত ক'রে আপন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখেছে। তার গৌরবের যোগফলকে সে এগিয়ে ধরেছে ভাবীকালের উদ্দেশ্যে—যে-কালের নব-প্রজন্মের সঙ্গে তার আদৌ যোগ নেই। পাশ্চাত্যের কবি Ella Wheeler Wilcox তাই বলেছেন—

'You were, and you will be ; know this while you are :
Your spirit has travelled both long and after.
It came from the source to the source it returns ;
The spark that was lighted, eternally burns.'

রবীন্দ্রনাথ বললেন : 'মানুষের মাহাত্ম্য প্রভাতের সূর্যের মতো। দিগন্ত তার সম্মুখে বহুদূরে, আলোর মতো সে দূরে প্রসারিত। মানুষের জীবনযাত্রা বর্তমান জীবনকে অতিক্রম ক'রে চলে, তার সকল অজানা অধিকারীদের জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা মহত্তম, তাঁরা বাস করেন অনাগত কালে, তাঁরা প্রস্তুত করেন ভাবী যুগের আশ্রয়। বলবো না যে তাঁদের জীবন দুঃখ থেকে মুক্ত। দুঃখ তাঁদের জীবনে সৃষ্টির অগ্নি ; তাই নিয়ে চিরজীবনের সম্পদ মানুষের জন্যে তাঁরা রচনা করেন, যেমন গাছ করে আপন অন্তরে সূর্যের তাপ সঞ্চয় ; সূর্যালোককে মজ্জাগত ক'রে ফলে ফুলে নিজেকে বিকশিত করাই তার তপস্যা। মানুষের সংসারে দুঃখ আছে ; তার এই তাপের প্রয়োজন আপনার জগৎ নির্মাণের জন্যে, আপনার মধ্যে আপনাকে পরিণতি দেওয়ার জন্যে। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ, তাঁরা সেই দুঃখকে তেজ রূপে মর্মের মধ্যে সঞ্চিত ক'রে জীবনকে শস্যসম্পদে ফলবান করেন, সেই সম্পদ দান করেন এমন সকল মানুষকে, যারা তাঁদের জানাও না, এখনও যারা আসেনি।'

প্রতিদিনের বস্তুসংঘাতে জর্জরিত জীবনের ঊর্ধ্বে যখন এই মহত্তম জীবন মনুষ্যত্বের মহিমায় উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তখনই মানুষের বোধিলাভ হয়। প্রীতির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা এই বোধিকে সে আলোর মতো বিকীর্ণ ক'রে দেয় প্রাণীজগতে। জ্ঞানের পথে, সাধনার পথে সে তখন নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে সেই দুর্দম শক্তি—সে শক্তির গতিবেগে গ্রহ-নক্ষত্র অবিরাম ছুটে চলেছে মহাশূন্যে। তাকে আপন আত্মার মধ্যে উপলব্ধি ক'রে আত্মস্থ হয় মানুষ। ক্রমে উত্তীর্ণ হয় সে অতিমানুষে, মহামানবে। ইতিহাসের এক-একটা

পর্যায়ে তাই পৃথিবীতে এক-একটি মানুষ কখনো হয়ে ওঠেন বুদ্ধ, কখনো যীশু, কখনো শঙ্কর, কখনো চৈতন্য, কখনো বা রামকৃষ্ণ। তাঁদের কণ্ঠনিঃসৃত বাণী তো তাঁদের জীবনবেদ বা চৈতন্যসত্তারই অভিব্যক্তি! সেই তো Life Divine! এই অতিমানুষে উত্তীর্ণ হয়ে সেই মহাজীবন তখন সকল মানুষের সকল প্রাণীকুলের মুক্তির পথ রচনা ক'রে দিয়ে যায়। বিশ্ব-প্রকৃতির উপর সূর্যালোক পতিত হয়ে যেমন সমস্তকিছুকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে দেয়, তেমনি মানুষ অতিমানুষে উত্তীর্ণ হ'য়ে মহনীয়তার ও শ্রেয়তার মহিমালোকে মানব-সংস্কারকে ভাস্বর ক'রে তোলে। মানুষের জীবনে এই অভ্যুদয়ই মানব-অভ্যুদয়। নিজের মধ্যে ক্রমাগতই হয়ে উঠতে উঠতে সে একদিন ঋষি হ'য়ে ওঠে। তখন সে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব চায় না, সমাজের উপর কর্তৃত্ব চায় না, তখন সে প্রতিষ্ঠা চায় সেই লোকে—যে লোক ধ্যানলোক, দেবলোক। তখন তার কাছে কোনো কিছুতেই ভেদ থাকে না, সবই অভেদ: তখন বাউলের কণ্ঠে সে গেয়ে ওঠে—

একই বেদের রূপ প্রকাশে বেদ-অবেদে।
যা দেখি সব একই দেখি ভেদ-অভেদে।
একই মানুষ, একই মন্ত্র,
কি বেদান্ত, কি বা তন্ত্র,
এক দেহ কি ভাগ করা যায় মজ্জা-মেদে?
এই যে আকাশ, বাতাস হু-হু,
শ্বাস বহে যে মুহুর্মুহু,
সব জীবেরই জীবন-খেলা হেসে-কেঁদে।
সবার মাঝে আছেন যিনি,
সবই করেন, করান তিনি,
লোকাচারের আচার শুধু মনকে বেঁধে।
যা দেখি সব একই দেখি ভেদ-অভেদে॥

তখন সকল চিন্তার সকল অশান্ত ধারা যেমন একই আত্মার মহাবিস্তৃতে এসে শান্ত হয়, আর আপন বেগবতী সাধনার নদী যেমন উত্তীর্ণ হয় মহাসমুদ্রে, তেমনি মানুষ ক্রমাগতই নিজের মধ্যে হ'য়ে উঠতে উঠতে উত্তীর্ণ হয় অতিমানুষে। এই উত্তীর্ণ হওয়াই মানবজীবনের পরম সার্থকতা॥

॥ আদিকবি বাল্মীকি ॥

ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য

দেবর্ষি নারদকে মহর্ষি বাল্মীকি প্রশ্ন করলেন বর্তমানে জগতে গুণবান্ বীর্যমান, ধর্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, চরিত্রবান, প্রিয়দর্শন, সর্বভূতের হিতে রত, জিতেন্দ্রিয় এবং যুদ্ধে অপরাজেয় কে আছেন? বাল্মীকির প্রশ্নের উত্তরে নারদ বললেন, ইক্ষ্বাকুবংশ প্রভবো রামো নাম জনৈঃ শ্রুতঃ (আদি ১।৮ —ইক্ষ্বাকুবংশজাত রামের নাম জনগণের মুখে শুনেছি। তিনি সংযতাত্মা, মহাবীর, দীপ্তিমান্, ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান, নীতিমান্, বাগ্মী, শত্রুহন্তা, শোভনাবয়ব, শালস্কন্ধ, জ্ঞানী যশস্বী, প্রতিভাবান্, ধর্মরক্ষক, সর্বলোকপ্রিয়, প্রিয়দর্শন, গাম্ভীর্যে সমুদ্রতুল্য, ধৈর্যে হিমালয়ের মত, বীরত্বে বিষ্ণুর সদৃশ, ক্রোধে কালাগ্নিতুল্য, ক্ষমায় পৃথিবীর মত, ত্যাগে কুবেরসদৃশ, প্রজার হিতে রত,—এইরূপ শ্রেষ্ঠগুণযুক্ত দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে মহারাজ প্রীতিভরে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করতে ইচ্ছা করলেন। অতঃপর নারদ রামচন্দ্রের বনগমন থেকে রাবণবধের পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন এবং এগারহাজার বৎসর স্বমহিমায় রাজত্ব করা পর্যন্ত রামায়ণী কথা সংক্ষেপে বিবৃত করেছিলেন, নারদ বাক্য শ্রবণের পরে নারদকে যথোপযুক্ত সংবর্ধনের পর বিদায় দিয়ে ঋষি বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে সঙ্গে নিয়ে জাহ্নবীর অদূরে তমসা নদীতে স্নান করতে গেলেন, সেইসময়ে ঘটলো নিষাদ কর্তৃক ক্রৌঞ্চযুগলের অন্যতম পুরুষপক্ষীটির হননের করুণ ঘটনাটি। করুণাপরবশ করুণার্দ্রহৃদয় ঋষি শোকার্ত হয়ে আদি কবির প্রথম শ্লোক উচ্চারণ করেছিলেন নিষাদকে অভিশাপ দেওয়ার ছলে—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ (আদি ২।১৫)

এই বাক্য নির্গত হওয়ার পর বিস্মিত মুনি ভাবলেন, বিহঙ্গের শোকে কাতর হয়ে আমি এ কী বললাম—শোকার্তস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া? তৎপরে শিষ্য ভরদ্বাজের সঙ্গে আলোচনা করে শোকজাত বাক্যকে শ্লোক আখ্যা দিলেন এবং ঋষি স্নান সেরে শিষ্যের সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এলেন। নিজের আশ্রমে বসে ঋষি যখন শ্লোকের কথাই চিন্তা করেছিলেন, সেইকালে সৃষ্টিকর্তা চতুর্মুখ ব্রহ্মা বাল্মীকির আশ্রমে সমাগত হলেন। ঋষির দ্বারা সংকৃত পিতামহ চিন্তাকুল বাল্মীকিকে বললেন, আমার ইচ্ছাতেই তোমার মুখ থেকে নির্গত হয়েছে প্রথম শ্লোক তুমি রামচরিত বর্ণনা কর। সমস্ত সত্যই তোমার নিকট প্রতিভাত হবে, তোমার রচনা কিছুই মিথ্যা হবে না এবং তোমার রচনা চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে। ব্রহ্মার অন্তর্ধানের পর বাল্মীকি যোগে বসে যোগবলে রামচরিত্র অবগত হলেন এবং পাঠযোগ্য ও সপ্তস্বরে গীতযোগ্য রামায়ণ রচনা করে রামনন্দন কুশ ও লবকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

উত্তরকাণ্ডে দেখা যায় রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির আশ্রম-সন্নিকটে ত্যাগ করে চলে গেলে মুনিবালকগণপ্রদত্ত সংবাদ অনুসারে বাল্মীকি স্বয়ং অগ্রসর হয়ে সীতাকে নিজের আশ্রমে নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। বাল্মীকির আশ্রমেই কুশীলবের জন্ম

হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্রের যজ্ঞে বাল্মীকি-রচিত রামায়ণ গান করেছিলেন ঋষির শিষ্য কুশীলব। রামচন্দ্র কুশীলবকে সীতার পুত্র জেনে দূত প্রেরণ করেছিলেন বাল্মীকির কাছে সীতার চারিত্রিক বিশুদ্ধতার প্রমাণ প্রার্থনা করে। দূতবাক্য শ্রবণ করে বাল্মীকি পরদিন প্রাতে জানকীকে নিয়ে রামচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হয়ে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—

ইয়ং দাশরথে সীতা সুব্রতা ধর্মচারিণী।
অপবাদাৎ পরিত্যক্তা ময়াশ্রমসমীপতঃ॥
লোকাপবাদভীতস্য তব রাম মহাব্রত।
প্রত্যয়ং নাগতে সীতা তামনুজ্ঞাতুমর্হসি।
ইমৌ তু জানকীপুত্রাবুভৌ চ যমজাতকৌ।
সুতৌ তবৈব দুর্ধর্ষৌ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে।
প্রচেতসোঽহং দশমঃ পুত্রো রাঘবনন্দন।
ন স্মরাম্যনৃতং বাক্যমিমৌ তু তব পুত্রকৌ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি তপশ্চর্যা ময়া কৃতা।
নোপাশ্নীয়াং ফলং তস্যা দুষ্টেয়ং যদি মৈথিলী॥
মনসা কর্মণা বাচা ভূতপূর্বং ন কিল্বিষম্।
তস্যাহং ফলমশ্নামি অপাপা মৈথিলী যদি॥

(উত্তরকাণ্ড—১১০।১৬-২১)

—হে দাশরথি! এই সীতা সুব্রতা ও ধর্মচারিণী, অপবাদ হেতু তাঁকে আমার আশ্রম সন্নিকটে পরিত্যাগ করেছ, হে মহাব্রত রাম, লোকাপবাদভীত তোমার সম্মুখে ইনি প্রত্যয় দেবেন অর্থাৎ বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা দেবেন, তুমি অনুমতি দাও। এই দুই দুর্ধর্ষ যমজ জানকীপুত্র তোমারই পুত্র—আমি এই সত্য বলছি। হে রাঘবনন্দন, আমি প্রচেতার দশম পুত্র, কখনও মিথ্যা কথা বলেছি বলে স্মরণ হয় না, এই পুত্রদ্বয় তোমারই। বহু সহস্র বৎসর আমি তপস্যা করেছি, জানকী যদি দুষ্টা হন তবে সেই তপস্যার ফল আমি ভোগ করতে পারবো না। মন কর্ম অথবা বাক্যের দ্বারা আমি পূর্বে কোন পাপাচরণ করি নি, মৈথিলী যদি অপাপা হন, তবে সেই পাপরহিত পুণ্যকর্মের ফল আমি ভোগ করতে পারবো।

যদিও সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মধ্যে আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড বাল্মীকির রচনা নয় বলে পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত, তথাপি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ থেকে মহাকবি বাল্মীকি সম্বন্ধে এর বেশীকিছু জানা যায় না। জগৎ ও জীবনের নশ্বরতার কথা মনে রেখে এক দার্শনিক উদাসীনতাহেতু প্রাচীন ভারতীয় কবিকুল প্রায়শঃই কাব্যমধ্যে নিজেদের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন নি। তাই কালিদাসের কাল কেটে গেলেও পণ্ডিতদের তারিখ সাল নিয়ে বিবাদ করতে হয়। অসামান্য প্রতিভাধর কবিদের পরিচয় অজ্ঞাত থাকার জন্যই পরবর্তীকালে তাঁরা নানাবিধ কিম্বদন্তীর নায়ক হয়ে ওঠেন। মহাকবি কালিদাসের মত মহাকবি বাল্মীকিকে কেন্দ্র করেও গড়ে উঠেছে নানা কিম্বদন্তী।

রামায়ণ কাহিনী থেকে জানা যায় যে মহর্ষি বাল্মীকি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক কালের লোক। তিনি ছিলেন একজন মহান তপস্বী। তাঁর আশ্রম ছিল অযোধ্যার অদূরে ভাগীরথীর নিকটবর্তী তমসা নদীর তীরবর্তী ভূভাগে। ঋষি ভরদ্বাজ ছিলেন তাঁর শিষ্য। তিনি প্রচেতার দশমপুত্র বা অধস্তন দশমপুরুষ। প্রচেতা ঋগ্বেদে একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। বিষ্ণুপুরাণে পৃথুর পৌত্র প্রাচীনবর্হি প্রজাপতি নামে খ্যাত। সমুদ্রকন্যা সবর্ণার গর্ভে প্রাচীনবর্হির প্রচেতা নামে দশটি পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। প্রজাবর্ধনের উদ্দেশ্যে প্রজাপতির ইচ্ছায় প্রচেতাগণ দশসহস্র বৎসর যাবৎ জলমগ্ন হয়ে বিষ্ণুর আরাধনা করেছিলেন। বৃক্ষকন্যা মারিতার সঙ্গে এঁদের বিবাহ হয়। মারিতার গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম হয় (বি. পু. ১৪-১৫ অঃ)। প্রচেতা পুরাণান্তরে ব্রহ্মার পুত্র—সপ্তর্ষির অন্যতম। কিন্তু পুরাণে প্রচেতার দশমপুত্র বাল্মীকির কোন উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে না। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বাল্মীকির পূর্বনাম রত্নাকর—তিনি চ্যবন ঋষির পুত্র।

চ্যবন মুনির পুত্র নাম রত্নাকর।
দস্যুবৃত্তি করে সেই বনের ভিতর॥

রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি ও ব্রহ্মার কৃপায় ঋষি বাল্মীকিতে রূপান্তরের কাহিনী সুবিদিত। নরঘাতী স্ত্রী শিশুঘাতী রত্নাকরকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সমাগত ব্রহ্মা ও নারদের নির্দেশে স্বকৃতপাপের ফলভোগে পিতা, মাতা ও পত্নীকে অনিচ্ছুক জেনে রত্নাকর ব্রহ্মা ও নারদের শরণ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পাপজিহ্বা রামনাম উচ্চারণে অসমর্থ হওয়ায় ব্রহ্মার উপদেশে একাগ্রচিত্তে মড়া মড়া জপ করতে করতে বল্মীকাবৃত হয়ে পড়েন। মড়া মড়া জপ রাম রাম জপে পরিণত হয়। ষাট হাজার বৎসর পরে ব্রহ্মা এসে রত্নাকরকে উদ্ধার করেছিলেন।

রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর॥
সেই নাম জপে এক স্থানে একাসনে।
সর্বাঙ্গ খাইল বল্মীকের কীটগণে॥
মাংস খাইয়া করিল যে পিণ্ড সোসর।
হইল কণ্টক তৃণ তাহার উপর॥
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে।
বল্মীকের মধ্যে মুনি রাম নাম ডাকে॥

(কৃত্তি. রামা.—আদিকাণ্ড)

ব্রহ্মার আদেশে ইন্দ্র সাতদিন বারিবর্ষণ করলেন। বল্মীক তৃণ গলে গেল—প্রকাশিত হোল অস্থিকঙ্কাল। ব্রহ্মা তাঁকে সঞ্জীবিত করে নাম রাখলেন বাল্মীকি।

ব্রহ্মা বলে তব নাম রত্নাকর ছিল।
আজি হৈতে তব নাম বাল্মীকি হইল॥ (তদেব)

এই কাহিনীর মূল রয়েছে অধ্যাত্ম রামায়ণে। দণ্ডকারণ্যে গমনকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা চিত্রকূট পর্বতে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপনীত হলে বাল্মীকি রামনামের মহিমা কীর্তন প্রসঙ্গে নিজের জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেন। বাল্মীকি বলেছেন যে পূর্বজীবনে কিরাতদের সংসর্গে শূদ্রাচারে জীবন যাপন করে তিনি শূদ্রার গর্ভে অনেকগুলি পুত্রের জনক হয়েছিলেন। পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থতাবশতঃ তিনি দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। অবশেষে একদা সপ্তর্ষিগণের সর্বস্ব অপহরণে উদ্যত হওয়া তাঁদেরি নির্দেশে তিনি স্ত্রীপুত্রকন্যাকে তাঁর কৃতকর্মের পাপভাগ গ্রহণ সম্পর্কে অভিমত জিজ্ঞাসা করে বিফলমনোরথ হয়ে ঋষিবর্গের শরণাগত হলে ঋষিগণ তাঁকে 'ম-রা' জপ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সহস্রযুগের পর ঋষিগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে বল্মীকস্তূপ থেকে বাল্মীকিকে উদ্ধার করেছিলেন—তাঁর নাম দিয়েছিলেন বাল্মীকি—মামপ্যাহর্মুনিগণা বাল্মীকিস্তং মুনীশ্বর। (অ. রা. অযোধ্যাকাণ্ড ৬ অঃ)।

কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী বাল্মীকির পূর্বকথা বর্ণনায় অধ্যাত্ম রামায়ণকেই অনুসরণ করেছেন। পত্নী ও ভ্রাতাসহ অরণ্যযাত্রী রামচন্দ্র গঙ্গা পার হয়ে ঋষিদের আশ্রমে উপনীত হলেন। ঋষি ভরদ্বাজের নির্দেশে চরণ বন্দনা করলে বাল্মীকি অতিথি সৎকার করার পর নিজের পূর্বজন্মের কথা বর্ণনা করেছেন। এখানে বাল্মীকি কিরাতদের দেশে কিরাতদের সঙ্গে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াতেন। সপ্তর্ষিদের দেখে যখন বাল্মীকি তাঁদের বধ করতে চাইলেন তখন—'শরাসনে রইল বাণ নাহি ছুটে তীর'। সাত মুনির নির্দেশে তিনি দারাপুত্রকে পাপভাগ গ্রহণের অনুরোধ করে ব্যর্থকাম হয়ে যখন ফিরে এসে মুনিদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, তখন নারদ নিকটস্থ অশ্বত্থবৃক্ষের শুষ্ক শাখা দেখিয়ে শাখাটি সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন। তখন বাল্মীকি বলছেন—

দেখিয়া কহিনু আমি শুন মহাশয়।
মরা এই ডাল দেখি জীয়ন্ত ত নয়।

ঋষিগণ তাঁকে 'মরা মরা' জপ করার পরামর্শ দিয়ে তীর্থদর্শনে গেলেন, হাজার বৎসর পরে তাঁরা ফিরে এসে বাল্মীকিকে বল্মীকস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

বল্মীকে ঠেলিয়া আমি উঠিলাম সত্বর।
বাল্মীকি আমার নাম থুল্যা মুনিবর॥

(বিষ্ণুপুরী রামায়ণ—পৃঃ ২৬-২৭)

অধ্যাত্মরামায়ণে কিম্বা কবিচন্দ্রের রামায়ণে বাল্মীকির পিতৃপরিচয় কিম্বা পূর্বনামের উল্লেখ নেই। কৃত্তিবাসই চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকরের নাম উল্লেখ করেছেন। বাল্মীকির প্রথম জীবনে দস্যুবৃত্তি, মরা জপে বল্মীকাবৃত হওয়া ও কবি বাল্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী রয়েছে স্কন্দ পুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে এবং প্রভাসখণ্ডে ঈষৎ ভিন্ন আকারে। আবন্ত্যখণ্ডে বাল্মীকির পূর্বনাম অগ্নিশর্মা, পিতা সুমতি ও মাতা কৌশিকী; আর প্রভাসখণ্ডে তাঁর পূর্বনাম বৈশাখ, পিতার নাম শমীমুখ। চ্যবন মুনির পুত্র রত্নাকরের নাম কৃত্তিবাস কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন জানি না, সম্ভবতঃ তাঁর স্বকপোল কল্পিত। রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভায়' চ্যবন ও রত্নাকরের নাম উল্লেখ করেন নি, এমন কি তাঁর বল্মীকাবৃত হওয়ার কাহিনীও বাদ দিয়েছেন। কবি মাইকেল

মধুসূদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে রত্নাকরের দস্যুবৃত্তির উল্লেখ করেছেন কৃত্তিবাসকে অনুসরণ করে—

নরাধম আছিল যে নর নরকুলে
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে,
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুঞ্জয় উমাপতি।
হে বরদে, তব বরে চোর রত্নাকর
কাব্য রত্নাকর কবি। (১ম সর্গ)

ডঃ সুকুমার সেন বাল্মীকির পিতা বা পিতৃপুরুষের চ্যবন নামটি স্বীকার করে নিয়েছেন, তাঁর মতে রত্নাকর ঘটিত কাহিনী বাল্মীকি নামের অর্থ থেকেই এসেছে—"বাল্মীকি নামটি কোন আর্ষঋষির যাঁহার পিতা (অথবা পিতৃপুরুষ চ্যবন। তিনি ও আর্ষ ঋষি। বাল্মীকি সম্ভবতঃ উত্তর-কোশলের অর্থাৎ আধুনিক উত্তর প্রদেশের পূর্বোত্তর অঞ্চলে হিমালয়-পাদদেশের লোক। বাল্মীকির নামের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তাঁহার জীবনী পরবর্তীকালে কল্পিত হইয়াছে। চ্যবনের বংশধর চ্যবনের মতো দীর্ঘ তপস্যায় রত হইবে, খুবই স্বাভাবিক।" (ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ১০০)।

বাল্মীকি রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে চ্যবন ভৃগুনন্দন, শত্রুঘ্ন যমুনাতীরে চ্যবন প্রভৃতি ঋষিদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন এবং ভৃগুনন্দন চ্যবনের কাছে লবণ দৈত্যের সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন। (উত্তর ৬৭ সর্গ)। মহাভারতেও মহর্ষি চ্যবন ভৃগুপুত্র এবং তিনিও তপস্যা করতে করতে বল্মীকস্তূপে পরিণত হয়েছিলেন।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোঽভূচ্চ্যবনো নাম ভারত।
সমীপে সরসঃ সোঽস্য তপস্তেপে মহাদ্যুতিঃ॥
* * *
স বল্মীকোঽভবদ্‌ঘিল্লতাভিরভিসংবৃতঃ।
কালেন মহতা রাজন্ সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ॥
তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্বশঃ :
তপ্যতে স তপো ঘোরং বল্মীকেন সমাবৃতঃ॥ (বনপর্ব ১২২।১, ৩-৪

—হে ভারত, মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে পুত্র ছিলেন, মহাদ্যুতিসম্পন্ন তিনি এই সরোবরের নিকটে সুদারুণ তপস্যা করেছিলেন।...দীর্ঘকাল যাবৎ লতাবৃত পিপীলিকাসমাকীর্ণ বল্মীকে পরিণত হয়েছিলেন। এইভাবে বল্মীকের দ্বারা আবৃত হয়ে সংগুপ্ত থেকে সেই ধীমান্ মৃৎপিণ্ডের মত ঘোর তপস্যা আচরণ করতে লাগলেন।

রাজা শর্যাতির কন্যা সুকন্যা বল্মীক কণ্টকবিদ্ধ করে তপোরত মহর্ষির চক্ষুদ্বয় বিদ্ধ করেছিলেন এবং অপরাধের শাস্তি স্বরূপ সুকন্যা চ্যবনকে পতিত্বে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের কৃপায় চ্যবন যৌবন পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

এই ভার্গব চ্যবন কি কৃত্তিবাস-কথিত রত্নাকর বাল্মীকির জনক ? তা যদি হয়, তাহলে চ্যবনবংশীয়দের বল্মীকত্বপ্রাপ্তি একটি যোগ বিশেষ ? চ্যবনও ত বাল্মীকি ! চ্যবন ও বাল্মীকি কি একই ব্যক্তি ?

কিন্তু মহাকবি অশ্বঘোষ মহর্ষি চ্যবনের রামায়ণ রচনার ব্যর্থ প্রয়াসের উল্লেখ করেছেন।

বাল্মীকিরাদৌ চ সসর্জ পদ্যং জগ্রন্থ যন্ন চ্যবনো মহর্ষিঃ ॥ (বুদ্ধচরিত ১।৪৩)

—বাল্মীকি প্রথমে পদ্য সৃষ্টি করেছিলেন, যা মহর্ষি চ্যবন গ্রথিত করতে পারেন নি।

ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মনে করেন যে বাল্মীকির পূর্বে মহর্ষি চ্যবন রামায়ণ রচনার অসার্থক প্রয়াস করেছিলেন। (Studies in Indian Antiquities p. 31)। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৫৭।৪০) ভার্গবের রামচরিত থেকে একটি রাজনীতিমূলক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে ভীষ্মের যুধিষ্ঠিরের প্রতি উক্তিতে। মৎস্যপুরাণে বাল্মীকিকেও ভার্গব বলা হয়েছে—বাল্মীকিস্তু চরিতং চক্রে ভার্গবসত্তমঃ (১২।৫০) ভার্গবশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি রামের চরিত রচনা করেছিলেন।

বাল্মীকির পূর্বে ভার্গব চ্যবন যে রামায়ণ রচনা করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। বাল্মীকি রামায়ণেই স্পষ্টভাবে বাল্মীকির পূর্ববর্তীকালে রামায়ণ রচনার উল্লেখ রয়েছে।

ইক্ষ্বাকূণামিদং তেষাং রাজ্ঞাং বংশে মহাত্মনাম্।
মহদুৎপন্নমাখ্যানং রামায়ণমিতি শ্রুতম্ ॥ (রামা. আদি. ৫।৩)

—সেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজাদের বংশে রামায়ণ নামে মহৎ আখ্যান উৎপন্ন হয়েছিল।

অতএব ভার্গব চ্যবনের পরে ভার্গব বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ-যোগ্য। সম্ভবতঃ চ্যবন ও বাল্মীকি উভয়েই ভৃগুবংশীয় অথবা ভৃগুশিষ্য ছিলেন। মনে হয় বাল্মীকির প্রতিভার উজ্জ্বলদ্যুতিতে চ্যবনের সৃষ্টির স্তিমিত আলোক ম্লান হয়ে গিয়েছিল, যেমন বাঙ্গালার কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের রামায়ণ ও মহাভারত অন্যান্য রামায়ণ-মহাভারত লেখকদের সৃষ্টিকে ম্লান করে দিয়েছিল। বাল্মীকি তাঁর পূর্ববর্তী চ্যবনের রামায়ণকে শুধু ম্লান করেন নি, সম্ভবতঃ আত্মসাৎও করেছিলেন। সেইজন্যই বাল্মীকি চ্যবনের শিষ্য হিসাবে চ্যবন-নন্দনরূপে প্রসিদ্ধ হয়েছেন এবং সেইজন্যই সম্ভবতঃ চ্যবনের বাল্মীকিত্ব প্রাপ্তি বাল্মীকিতে সংক্রমিত হয়েছে এবং বাল্মীকির প্রকৃত পরিচয় হারিয়ে গেছে।

●

॥ মা অপর্ণার পদার্পণে ॥

শ্রীহরধনরঞ্জন কাব্যতীর্থ

মেঘমসী আজ পলকে বিলীন, চপলা নৃত্যতন্ত্র।
ঋতুর চক্রে সুখ-সুন্দর এলো যে শারদ লগ্ন।
অরুণের রেখা পূর্বাকাশে ফুটে
আলপনা আঁকে ঊষা বুঝি উঠে
মধু-গুঞ্জনে ভ্রমরেরা ছুটে হরষের স্রোতে মগ্ন।

বন বিতানে তুলে মধুতান বিহগেরা মহানন্দে
ভরেছে ভুবন হাসনুহানা সেফালীর মধু গন্ধে ;
নীল নভতলে শুভ্র বলাকা
পুলকেতে বুঝি মেলে দুই পাখা
কার আগমনে শাখী নাড়ে শাখা
মন্দ মেদুর ছন্দে ?

মঙ্গলা মার পদরজে আজ মধুময় ধরা মৃত্তি
তারকার সাথে ইন্দু তুলেছে
দিকে দিকে কিবা দীপ্তি ;
তুহিনের কণা হীরে হয়ে ঘাসে
তটিনীর তটে কাশ মেয়ে হাসে
অর্পণে মা তব পদার্পণে নিখিলের প্রাণে তৃপ্তি—

মানব হৃদয়ে নেইকো হর্ষ সমাজে স্বার্থ পঙ্ক—
শুভদে, তোমার শুভদৃষ্টিতে মুছে যাক কলঙ্ক ;
ঈশ লয়ে এসো জননী-ঈশানি
ভ্রূভঙ্গে তব ঘুচে যাক গ্লানি
ভয় দূর এসে অভয়ে তোমার
বাজায়ে অভয় শঙ্খ।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পূর্বাভাষ :

অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একান্তই নীরব। কেন না, তাঁর বহুমুখী রচনাধারায় কোথাও শ্রীরামকৃষ্ণের তেমন সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ, তাঁর এই নীরবতা দেশবিদেশে সুধীমহলে বিচিত্র জল্পনা-কল্পনা সৃষ্টি ক'রেছে। অনেকে তাঁকে পরমহংসদেব সম্বন্ধে উদাসীন ব'লে মনে করেন। আবার কোন কোন মহলে তাঁর এই তথাকথিত ঔদাসীন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁর অনীহারূপেও বিবেচিত হয়।

অথচ, আমরা দেখি, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দে চিরসমর্পিতা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে কবিগুরুর নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ও সুগভীর প্রেমসম্বন্ধ। বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতাকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম 'লোকমাতা'-রূপে বন্দনা করেন।

যা হোক, এই বিতর্কিত বিষয়ে আর অগ্রসর হ'তে চাই না। আমরা পরমহংসদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও অনুরাগসূচক কিছু কিছু প্রমাণ-পত্র সংগ্রহ ক'রেছি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য সেগুলিই একে একে এই নিবন্ধে উপস্থাপিত ক'রব। আশা করি, এই সংগ্রহ-কণিকা ঐ বিষয়ে আকাঙ্ক্ষিত আলোকপাত ক'রবে।

কথামৃতে রবীন্দ্রনাথ :

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে (৪র্থ।৪।১।১১-২৩) আদি ব্রাহ্মসমাজের এক মহোৎসব-বাসরে পরমহংসদেব ও রবীন্দ্রনাথের একত্র উপস্থিতির বিবরণী লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। নিম্নে সেই সংবাদ সংক্ষেপে পরিবেশিত হ'ল :

১৮৮৩ খৃঃ ২রা মে, বুধবার অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটা। উত্তর ক'লকাতার নন্দনবাগানে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ৮কাশীশ্বর মিত্রের ভবনে[১] ঐ সমাজের সাংবাৎসরিক মহোৎসব। সেই উপলক্ষে গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ও যজ্ঞনাথ মিত্রের সবিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বর থেকে শুভাগমন ক'রেছেন। তাঁর সঙ্গে শ্রীমান্ রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), মাষ্টার মহাশয় ('কথামৃত'-কার) প্রমুখ ভক্তগণ রয়েছেন।

"ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দনবাগানে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। ব্রাহ্ম-ভক্তদের সহিত কথা কহিতেছেন।···বেলা পাঁচটা হইবে।"

"ঠাকুর প্রথমে আসিয়া নীচে একটি বৈঠকখানা ঘরে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে ঘরে ব্রাহ্মভক্তগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র (ঠাকুর) প্রভৃতি ঠাকুরবংশের ভক্তগণ এই উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।"

১। ২৩৩, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৪, বহু মিত্র লেন ও উল্টাডাঙ্গা রোডের মধ্যবর্তীস্থানে বহু মসজিদ সংলগ্ন গলি, অর্থাৎ মোহনবাগান লেনের ঠিক বিপরীত গলিতে ভবনটি এখনও বর্তমান।

"আহূত হইয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে দ্বিতলায় উপাসনামন্দিরে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপাসনার গৃহের পূর্বধারে বেদীরচনা হইয়াছে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র (Piano) রহিয়াছে। ঘরের উত্তরাংশে কয়েকখানি চেয়ার পাতা আছে।"

"শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল[২] প্রভৃতি কেহ কেহ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে উপাসনা-গৃহে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে ঈশ্বরীয় কথা শুনিবেন। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র বেদীর সম্মুখে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া [ঠাকুর] রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতিকে কহিতেছেন—

"নরেন্দ্র আমায় ব'লেছিল, 'সমাজমন্দির প্রণাম ক'রে কি হয়' ?"

"মন্দির দেখলে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয়, সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ[৩] উপস্থিত হয়। এসব জায়গা দেখ্‌লে ভগবানকেই মনে পড়ে।"

তারপর পরমহংসদেব শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল প্রমুখ সুধী ভক্তগণের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে ঈশ্বরীয় তত্ত্বকথা আলাপন করেন এবং কথা প্রসঙ্গে তাঁদের জিজ্ঞাস্যগুলিরও উত্তর দেন। দেখতে দেখতে ঐ উপাসনা গৃহ ব্রাহ্মভক্তগণের সমাগমে পরিপূর্ণ হ'য়ে ওঠে।

"ঠাকুর উপাসনা-গৃহে সমবেত লোকগুলিকে দেখিতেছেন ও বলিতেছেন,—'মাঝে মাঝে এরূপ একসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা ও তাঁর নাম গুণকীর্তন করা খুব ভাল'।

"তবে সংসারী লোকদের ঈশ্বর-অনুরাগ ক্ষণিক—যেমন তপ্ত লৌহে জলের ছিটে দিলে, জল তাতে যতক্ষণ থাকে।"

সন্ধ্যায় সমবেত ব্রহ্ম-উপাসনার আয়োজন হয়। কয়েকজন ব্রাহ্মিকা হাতে সঙ্গীত-পুস্তক নিয়ে ঐ চেয়ারগুলিতে বসেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত বৈষ্ণব বন্দ্যোপাধ্যায় অনকয়েক বেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মভক্তসহ ঐ বেদীতে উপবিষ্ট হন এবং সান্ধ্য উপাসনা আরম্ভ করেন।

"পিয়ানো ও হারমনিয়াম সংযোগে ব্রহ্মসঙ্গীত গীত হইতে লাগিল। সঙ্গীত শুনিয়া ঠাকুরের আনন্দের সীমা রহিল না।···বেদীতে উপবিষ্ট আচার্যগণ বেদ হইতে মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন,···। স্তোত্রাদি পাঠ শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন।···উপাসনা হইয়া গেলে ভক্তদের লুচি মিষ্টান্ন আদি খাওয়াইবার উদ্যোগ হইতেছে।···রাত নয়টা হইল।"

উপাসনাদি সাঙ্গ হ'লে গৃহস্বামীদের পক্ষ হ'তে, উৎসবে উপস্থিত সকলকে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করা হয়।

২। জানকী ঘোষাল—রবীন্দ্রনাথের স্নেহ ভগ্নীপতি, স্বর্ণকুমারীর স্বামী, সরলা দেবীচৌধুরাণীর পিতা।

৩। তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ বেণী, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার কথাপ্রসঙ্গ।
—প্রপন্নগীতা, ৬

কথাপ্রসঙ্গে :

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, পরমহংসদেব সেদিন ঐ মহোৎসব-বাসরে বিকেল প্রায় পাঁচটা থেকে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। অতএব সেই দীর্ঘ অবসরে ঐদিন যুবক রবীন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা 'পরমহংস মহাশয়'-কে অবশ্যই দর্শন ক'রেছিলেন; এ-অনুমান মনে হয়, অসঙ্গত নয়।

বস্তুতঃ সে-সময় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ও আধ্যাত্মিক মহিমা চারিদিকেই বহুল প্রচারিত। তিনি আমন্ত্রিত হ'য়ে যেখানেই উপস্থিত হ'তেন, সেখানে সকলেরই মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতেন। তাছাড়া সেদিন ঐ উৎসব-বাসরে উপাসনা-কক্ষে মেজ-ভগ্নিপতি শ্রীযুক্ত জানকী ঘোষাল ও অন্যান্য সুধী ব্রাহ্মভক্তগণ গভীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সহকারে যাঁর সঙ্গে অতক্ষণ ধরে ঈশ্বরীয় নানা তত্ত্বকথা আলাপনাদি করেন, সেই মহাত্মার প্রতি বিচক্ষণ যুবক রবীন্দ্রনাথের সন্ধানী দৃষ্টি একবারও আকৃষ্ট হয় নি, তা ভাবতেও পারা যায় না।

যা হোক, ঐদিন সেখানে তাঁদের উভয়ের পরস্পর আলাপনের কোনও সংবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে, সেদিন ঐ উপাসনা-প্রকোষ্ঠে মৃদঙ্গবাদক ও গীতিকার যুবক রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন এবং তাঁর সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রবণে পরমহংসদেব আহ্লাদিত ও ভাবাবিষ্ট হ'য়েছিলেন—এ-সংবাদ আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে[৪] অবগত হ'য়েছি।

কবিগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি :

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-শতবর্ষ-জয়ন্তী (১৯৩৬-৩৭ খৃঃ) মহোৎসবের সময় তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আমাদের সকলেরই মুগ্ধদৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ সময় তিনি পরমহংসদেবের উদ্দেশ্যে অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য একটি সংক্ষেপিত অথচ সারগর্ভ ইংরেজী রচনা 'Prabuddha Bharata' (প্রবুদ্ধ ভারত) পত্রিকায় পাঠান। প্রসঙ্গতঃ আরও উল্লেখ্য যে, তিনি ঐ ইংরেজী রচনাটির বাংলা ভাবানুবাদও নিজেই করেন এবং সেটি 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য দেন। সেই রচনাদ্বয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী সংখ্যা 'Prabuddha Bharata'[৫] এবং 'উদ্বোধন'[৬] পত্রিকায় কবিগুরুর হস্তাক্ষরের অবিকল প্রতিলিপিতে মুদ্রিত হয়।

এ-প্রসঙ্গে বিখ্যাত 'রবীন্দ্রজীবনী'-কার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন : "পরমহংসদেবের ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবি Prabuddha Bharat [প্রবুদ্ধ ভারত] পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত বাণীটি ইংরেজীতে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।"

৪। 'কথামৃত'-কার মাষ্টার মহাশয় একদা কথাপ্রসঙ্গে বেলুড় মঠের স্বামী রাঘবানন্দজী (সীতানাথ) মহারাজকে এ-কথা ব'লেছিলেন। পরলোকগত সেই প্রাচীন সন্ন্যাসীর নিকট হ'তে আমরা এ-সংবাদ অবগত হ'য়েছি (?)।

৫। February, 1936.

৬। ফাল্গুন, ১৩৪২।

সেই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন,—'কবি ইহার নিম্নলিখিত বাংলা মর্মানুবাদ করিয়া দেন' :

প্রভাতবাবু 'রবীন্দ্রজীবনী'-চতুর্থখণ্ডে কবিগুরুর ঐ ইংরেজী বাণীটি এবং কবি-কৃত তার বাংলা মর্মানুবাদটিও সযত্নে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৭]

যা হোক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য উদ্দেশ্যে বিরচিত রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলিসূচক ঐ ইংরেজী বাণীটি এবং তার বাংলা মর্মানুবাদটি নিম্নে যথাক্রমে উদ্ধৃত হ'ল। কবিগুরুর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিতে তাদের শিরোনামা, পঙ্‌ক্তিমালা এবং নাম স্বাক্ষরাদি ঠিক যেভাবে সজ্জিত পাওয়া যায়, এখানে সেগুলি হুবহু সেইভাবেই পরিবেশন ক'রলাম :

To the Paramhansa

Ramakrishna Deva

Diverse courses of worship
from varied springs of fulfilment
have mingled in your meditation.
The manifold revelation of the joy of the Infinite
has given form to a shrine of unity
in your life.
Where from far and near arrive salutations
to which I join mine own.[৮]

—Rabindranath Tagore.

পরমহংস রামকৃষ্ণ দেব

বহু সাধকের
বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার
মিলিত হ'য়েছে তারা।
তোমার জীবনে
অসীমের লীলাপথে
নূতন-তীর্থ
রূপ নিল এ জগতে ;

৭। রবীন্দ্রজীবনী—৪র্থ খণ্ড, পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৩৭১। পৃঃ ৩১-৪০

৮। "Sri Ramakrishna A Biography in Pictures". Page No. 100

দেশ বিদেশের
প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার
প্রণতি দিলাম আনি।[১]

শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিবিধ সংবাদ :

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মশতবর্ষ-জয়ন্তী মহোৎসব অনুষ্ঠানের জন্য রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট মনীষীদের নিয়ে যে "রামকৃষ্ণ সেন্টিনারী কমিটি" সংগঠিত হয়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই আন্তর্জাতিক মহাসমিতির সাধারণ সংসদ (জেনারেল কমিটি)-এর অন্যতম সহ-সভাপতি (ভাইস-প্রেসিডেন্ট) পদে অভিষিক্ত হন।

সেই মহাসমিতি উক্ত মহোৎসবের বিশিষ্ট অঙ্গরূপে ক'লকাতায় ১লা মার্চ থেকে ৮ই মার্চ (১৯৩৭ খ্রী:) পর্যন্ত অষ্টাহব্যাপী "বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন" (পার্লামেন্ট অব্ রিলিজিয়ন্স্)-এর আয়োজন করেন। ক'লকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে আয়োজিত উক্ত মহাসম্মেলনের তৃতীয় দিবসের (৩রা মার্চ, ১৯৩৭ খ্রী:) সান্ধ্য অধিবেশনটি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয়। সে-দিনের ঐ মহাসভায় তিনি "বিশ্বমানবতাবাদ" সম্বন্ধে একটি অতি সারগর্ভ ও মনোজ্ঞ অভিভাষণ প্রদান করেন।

অভিভাষণপ্রসঙ্গে :

রবীন্দ্রনাথ সেই ঐতিহাসিক অভিভাষণে প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধেও আবেগপূর্ণ কণ্ঠে নিজস্ব কিছু অভিমত ব্যক্ত করেন। ঐ অভিভাষণের অন্তর্গত কেবল সেই অংশগুলি বাংলা ভাবানুবাদ-সহ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :

"When I was asked to address this distinguished gathering, I do not know if I can be called religious in the correct sense of the term, not claiming as my possession any particular idea of God, authorised by some time-honoured institution. If in spite of all this, I have accepted this honour, it is only out of respect to the memory of the great saint with whose Centenary the present Parliament is associated. I venerate Paramahansa Deva because he in an arid age of religious nihilism, proved the truth of our spiritual heritage by realizing it, because the largeness of his spirit could comprehend seemingly antagonistic modes of Sadhana, and because the simplicity

১। 'উদ্বোধন'—শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী সংখ্যা—ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ১। "প্রবাসী"—ফাল্গুন, ১৩৪২, পৃঃ ৭২৪

of his soul shames for all time the pomp and pedantry of the pontiffs and pundits."

"We, in our human nature, have a hunger for Bhuma, for immensity, for something a great deal more than what we need immediately for the purpose of life."

"Great souls, like Ramakrishna Paramahansa have a comprehensive vision of truth, they have the power to grasp the significance of each different form of Reality that is one in all,—but the masses of believers are unable to reconcile the conflict of codes and commands."[১০]

[এই বিশিষ্ট সম্মেলনে ভাষণদানের জন্য যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, তখন স্বভাবতঃই আমি এই কার্যে নিরুৎসাহ বোধ করি। কারণ, প্রচলিত অর্থে যাকে ধার্মিক আখ্যা দেওয়া হয়, আমি সেই পদবাচ্য কিনা, জানি না। তাছাড়া, ঈশ্বর সম্বন্ধে কাল-সম্বর্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত, বিশেষ কোনও ধারণা আমার আছে, এ দাবিও আমি করি না। এ সত্ত্বেও যে, আমি, এই সম্মান গ্রহণ ক'রেছি, তা কেবলই যে মহান্ ধর্মগুরুর শতবর্ষ-জয়ন্তীর সঙ্গে এই বিশ্বধর্ম মহাসভা বিজড়িত, তাঁরই পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য। পরমহংসদেব ধর্মীয় চরম সংঘাতের এক নিষ্প্রাণ যুগে আমাদের রুদ্ধরুপরায় প্রবাহিত আধ্যাত্মিকতার নিহিত মহাসত্যকে, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির দ্বারা নিজ জীবনে সপ্রমাণিত ক'রেছেন। তিনি স্বীয় প্রাণের উদারতার প্রভাবে আধ্যাত্মিক সাধনরাজ্যের আপাতবিরুদ্ধ প্রণালীসমূহকে সুসমৃদ্ধ ক'রেছেন। তাঁর আত্মার সারল্য ধর্মযাজকমণ্ডলী এবং পণ্ডিতগণের আড়ম্বর ও বাক্‌সর্বস্বতাকে চিরস্তব্ধ ক'রেছে। বস্তুতঃ এই সমস্ত কারণেই আমি পরমহংসদেবকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করি।

আমাদের আপাত জীবনধারণের উদ্দেশ্যে যা প্রয়োজনীয়, মানবস্বভাব-বশে আমরা তদপেক্ষা মহত্তর কিছু লাভের জন্য—ভূমার জন্য, অসীমত্বের জন্য অন্তরে ক্ষুধা অনুভব করি।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের ন্যায় মহাত্মাগণ পূর্ণসত্য দর্শনের অধিকারী। তাঁরা বৈচিত্র্যের মধ্যে একই বাস্তবসত্তার অধিষ্ঠানের তাৎপর্য অবধারণে সক্ষম। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ জনগণ ধর্মীয়তত্ত্বের গূঢ় সূত্রাবলী এবং নির্দেশসমূহ অবলম্বনে পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা সাধনে অক্ষম।]

প্রসঙ্গক্রমে :

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ উক্ত মহাসম্মেলনে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত অভিভাষণ পাঠ করেন এবং ঐ পুস্তিকা উপস্থিত বুধমণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। তাঁর

১০। The Religions of the World—Vol. I, Pages 124-133.

ঐ বিশেষ সারগর্ভ অভিভাষণ সমাগত শ্রোতৃবর্গকে বিমুগ্ধ করে। উক্ত 'বিশ্বধর্মমহাসভা'-কমিটির অন্যতম সম্পাদক (সেক্রেটারি) প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর বিনয়কুমার সরকার মহাশয় ধন্যবাদ ও স্বীকৃতিসূচক ভাষণে বলেন :

"Rabindranath's address tonight is an immortal document. He has delivered to mankind through this audience a permanent chatter of human liberty. It is destined to rank in the world of thought as an eternal manifesto for the enfranchisement of the spirit of man."[১১]

[আজকের নৈশ অধিবেশনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণটি একখানি অবিনশ্বর দলিল। তিনি এই মহাসম্মেলনের শ্রোতৃমণ্ডলীর মাধ্যমে সমগ্র মনুষ্যজাতির নিকট মানবাধিকারের একটি স্থায়ী সনদ ঘোষণা ক'রলেন। মানবাত্মার মুক্তিসাধনার শাশ্বত ঘোষণাপত্র হিসাবে বিশ্বের উন্নততর চিন্তারাজ্যে এটি বিধি-নির্ধারিত।]

উক্ত মহাসম্মেলনের শেষ দিবসের (৮ই মার্চ, ১৯৩৭ খ্রীঃ) প্রাতঃকালীন অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ক'লকাতায় নিযুক্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রদূত ডক্টর এফ. ভি. তউসেক (Dr. Frank Venceolaus Tousek)। তিনিও তাঁর অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথের ঐ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করেন :

"I mention also the message of Rabindranath Tagore as a great achievement. This message delivered by the venerable prophet. has made the greatest impression on me. I read it over and over again. and propose that this message should be translated into all languages and distributed in millions of leaflets throughout the world."[১২]

[আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভিভাষণটিকেও (এই বিশ্বধর্মমহাসম্মেলনের) একটি মহৎ অবদানরূপে উল্লেখ ক'রছি। ভক্তিভাজন মহাত্মা প্রদত্ত এই ভাষণটি আমার অন্তরে মহত্তম অনুভূতি সঞ্চারিত ক'রেছে। আমি কেবলই বারংবার এটি পড়েছি। আমি প্রস্তাব করি যে, তাঁর বক্তৃতাটি সমস্ত ভাষাতেই অনূদিত হওয়া উচিত এবং লক্ষ লক্ষ পুস্তিকার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়া কর্তব্য।]

রামকৃষ্ণসঙ্ঘের সেবাব্রত :

শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় তদীয় অনুরাগী ভক্ত-সেবকমণ্ডলীর দ্বারা পরিসূচিত নীরব নিঃস্বার্থ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতিও রবীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সমর্থন ও শ্রদ্ধা দেখা যায়। ক'লকাতা "রামকৃষ্ণ মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি"র সেক্রেটারী সিষ্টার সরস্বতী উক্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের জন্য কবিগুরুর শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদী কামনা করেন। তার উত্তরে তিনি

১১। The Religions of the World—Vol. II, Page No. 1009.

১২। The Religions of the World—Vol. I, Page No. 163.

সানন্দে তাঁকে একটি সুন্দর শুভেচ্ছাবার্তা লিখে দেন। ভগিনী সরস্বতী ৪ঠা মার্চ (১৯৩৭ খ্রীঃ) বৈকালে গ্র্যাণ্ড হোটেলে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনের প্রতিনিধিবর্গের সম্মানে, উক্ত সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত চা-পানের সভায় (Tea Party) কবিগুরুর সেই বাণীটি পাঠ করেন :

"Perhaps the noblest tribute to the memory of Sri Ramakrishna. is the silent selfless service that has been released under his inspiration. One of the many such organised humanitarian activities is the Ramakrishna Medical Education Society whose secretary. Sister Saraswati has asked for my good wishes, which I give most willingly, along with my congratulations, for the splendid work the Society has been doing."[১৩]

[শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেরণায় আরব্ধ নীরব নিঃস্বার্থ সেবাই মনে হয়, তাঁর স্মৃতিপূজার উদ্দেশে রচিত মহত্তম অর্ঘ্য। এ-জাতীয় মানবকল্যাণকর বিবিধ সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে "রামকৃষ্ণ মেডিকেল এডুকেশন সোসাইটি" অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা ভগিনী সরস্বতী আমার শুভেচ্ছা-বাণী কামনা ক'রেছেন। এই সোসাইটি যে প্রশংসনীয় কাজ-কর্ম ক'রছেন, তারজন্য আমি একান্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে, আমার আন্তরিক অভিনন্দনসহ শুভেচ্ছা প্রদান ক'রছি।]

উপসংহার :

শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় ভারতীয় সন্ত-মহাত্মাগণের আধ্যাত্মিকতাময় দিব্য জীবনাদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কিরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ ছিল, নিম্নোদ্ধৃত তাঁর এই উক্তিটিই তার পরিচায়ক :

"We in India do believe in personality. In the West you have admiration for power. And wherever our heart is touched with something that is perfect in human nature in its completeness, in the spiritual aspect of it, it goes deep and we bow our heads before it. We have a feeling of reverence for the Divine in man and we revere it."[১৪]

[আমরা ভারতীয়েরা মনুষ্যের ব্যক্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু পাশ্চাত্ত্যে আপনারা ক্ষমতার অনুরাগী। মানবচরিত্র সামগ্রিকতার দিক থেকে যেখানে পূর্ণতা লাভ ক'রেছে, তার সংস্পর্শে এলেই তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমা আমাদের চিত্তকে আকৃষ্ট করে এবং তা অন্তরের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হ'য়ে আমাদের অবনতমস্তক ক'রে তোলে। মানব-আধারে যেখানে স্বর্গীয় বৈভব প্রকাশিত, তাঁর প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ বর্তমান ; আমরা তাঁকে ভক্তি করি।]

১৩। The Religions of the World—Vol. I, Pages 36-37.
১৪। The Religions of the World—Vol. II, Page No. 805.

সম্পাদকীয় মন্তব্য :

এই প্রবন্ধ ('শ্রীরামকৃষ্ণপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ')-সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য দিতে বাধ্য হচ্ছি এজন্য যে, রবীন্দ্রনাথ উপাসনা-প্রকোষ্ঠে কয়েকটি ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন সেগুলি শুনে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন—এ'সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা এযাবৎপর্যন্ত পাই নি। লেখক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছেন : 'এ' সংবাদ আমরা নির্ভরযোগ্যসূত্রে অবগত হয়েছি'। অবগতির বিষয়টি স্বর্গগত স্বামী রাঘবানন্দজী (সতীপতি মহারাজ) প্রিম বা মাষ্টার মহাশয়ের কাছ থেকে ঐ কথা শুনেছিলেন। আমরা কিন্তু কোন গ্রন্থে কিংবা বিবরণসূত্রে ঐকথা শুনিনি বা ঐকথা ঠিক বলে মনে করিনি। আমাদের মনে হয় "শুনিয়াছি" বা "অবগত হয়েছি" কথার উপর ঐতিহাসিক তথ্য ঠিক নির্ভর করে না।

॥ অমৃতকণা ॥

শ্রীঅজিতকান্তি সরকার

(কাব্যসুধানিধি)

(১)

আপনারে রাখে যেবা রুদ্ধ ক'রে সদা ক্ষুদ্রঘরে
এ' জগতে ব্যর্থ সে যে ; বৃহত্তের তরে
মানবের জন্ম এই অনিত্য ধরায় ;
সত্য যাহা-নিত্য যাহা রত হও তাহারি সেবায়।

(২)

আলোর পথের যাত্রী-জ্বালা দীপ অন্তরে তোমার,
শিবের পূজারী তুমি ; কর বিশ্বে কল্যাণ সবার।
নিজের আলোক কভু দিবাকর নাহি রাখে ধ'রে-
বরষে আলোর সুধা ধরণীর 'পরে।
তেমনি ধরার বুকে লক্ষ কোটি মানবের চিত
তোমার হৃদয়ালোকে হোক্ আলোকিত।

(৩)

অমৃতের পুত্র তুমি—হে মানব কেন ভুলে যাও ?
মৃত্যুঞ্জয়ী মহামন্ত্রে দীক্ষা আজি নাও।
যতদিন আছে পাপ অবিচার অসত্য অন্যায়—
রণে অবিচল থেকো ; ম্রিয়মান হয়োনা শঙ্কায়।

—•—

॥ রজনীকান্তরচিত দু-একটি শাক্তগীতি প্রসঙ্গে ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

বাঙলার কাব্যেতিহাসে কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের নাম সমুল্লেখ্য মর্যাদার গৌরবে গৌরবান্বিত। তাঁহার কাব্যগীতির বিশেষ এক ধারা শক্তিদেবতাকে উপজীব্য করিয়া রচিত। শাক্তভক্তিগীতিসূত্রে তিনি রামপ্রসাদ কমলাকান্ত-প্রমুখ কবিগণের উত্তরসূরী।

একটি আগমনীপর্যায়ের গানে জননী মেনামুখে কবি বলিতেছেন :

ওমা উমা এ আনন্দ কোথা রাখি বল্।
নগরে উঠেছে কি আনন্দ কোলাহল।

নগরবাসী নর-নারীর দল উমাকে সামান্য এক মেয়ে বলিয়া ভাবিতে পারেন, যাহারা উমাকে শক্তিরূপা ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি বলিয়া ভাবে। কিন্তু রজনীকান্তের মেনকা উমাকে সে সব বলিয়া ভাবিতে পারেন না, তাঁহাকে কেবল কন্যা বলিয়াই ভাবেন। উমাকে কন্যারূপে ভাবিবার সুখস্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া না যায় তাঁহার। তিনি জামনেত্র চাহেন না বলিয়া উঠেন :

না না উমা দিসনে নয়ন, ভাঙ্গিসনে মা সুখের স্বপন
তুই আদ্যাশক্তি ভাবতে আমার চক্ষে আসে জল।
স্বপ্ন যদি হয় মা তারা করিস নে মা স্বপ্নহারা
আমি কন্যা হারা হতে নারি (আমার) এক মেয়ে সম্বল ॥

স্বর্গের দেবতাকে কবি মর্ত্যের মায়ার বন্ধনে ঘরের আদরিণী কন্যারূপে ভাবিতেছেন।

এক সময় রজনীকান্তের ভক্তহৃদয় শ্যামাসঙ্গীতের নিকট আকৃতিতে কাটিয়া পড়ে। ব্যক্তিগত জীবনের ব্যথাবেদনা দুঃখ-যাতনার স্পর্শ লাগে সেই গানের ভাষায় সুরে। আকুলতা স্পষ্ট হইয়া দেখা দেয় :

আর কতদিন ভবে থাকিব মা !
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা।
(তুমি) দেখা ত দিলে না, কোলে ত নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা।

এই পৃথিবীর বঞ্চনাকারীকে কাতর করে, এই মানুষের অনাদর কবিকে পীড়িত করে, কবির আক্ষেপ এত কষ্ট সহ্য করিয়াও তাঁহার মায়া-মোহের ঘোর কেন কাটিতেছে না :

(আমায়) কেহ ত আদর করে না গো,
পড়িতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মর) দুঃখে কারো আঁখি করে না গো,
তবু মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে
আর কত দিন ভাসিব মা।

সঙ্গীতটির অন্তিমস্তবক একান্ত মর্মস্পর্শী। দুঃখহারিণী জননীর নিকট প্রশ্ন আর কতদিন কাঁদিবেন, কতদিন ধূলিতে ক্লিন্ন করিবেন দেহ। দুঃখহারিণীর দুঃখহরা করুণা কি তিনি পাইবেন না :

(আমি) শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়বেদনা বহিয়া গো,
কত কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো,
(আমি) আঁধারে পড়িয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
আর কত ধূলা মাখিব মা।

অন্য একটি গানে অভিমানময়ী আকুতি। নিজেকে পাতকী বলিয়া অভিহিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতেছেন তিনি যদি অন্ধকারপূর্ণ চিরমৃত্যুর সিন্ধু-সলিলে ডুবিয়া যান তাহাতে জগজ্জননীর মহিমার বৃদ্ধি ঘটিবে না। কবি-বক্তব্য আবেগ-আকুলতায় থরথর কম্পিত :

মাগো এ পাতকী ডুবে যদি যায়
অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধুনীরে,
তোমার মহিমা কিছু বাড়িবে না তায়।

জ্ঞান, বুদ্ধি, বল, স্নেহ, করুণা সবই পাইয়াছেন, কেবল জগজ্জননীর করুণানুশীলন করিতে পারেন নাই তিনি। কবি-কণ্ঠে সীমাহীন হতাশার অভিব্যক্তি :

মোহ ঘিরিল মোরে রহি চির-ঘুমঘোরে
ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়ে হায়!

অবশেষে শ্রীচরণে স্থান পাইবার প্রার্থনা নিবেদন করিয়া বলেন রজনীকান্ত :

দুষ্কৃত এ' পতিতে, হবে গো স্থান দিতে
অশরণের শরণ, শ্রীচরণ-ছায়॥

রজনীকান্ত একসময় বুঝিতে পারেন তাঁহার সকলই ভুল হইয়া গিয়াছে ; এই জগতে কেবল পিপাসাও ভ্রান্তি। মিথ্যা মমতা তাঁহাকে ভ্রান্ত করিয়াছিল। 'মাগো আমার সকলি ভ্রান্তি' গানে কবির করুণাভিক্ষা সেই জননীর নিকট :

দিনে দিনে দীনের ফুরাইল দিন,
'আশা'রূপে মাগো নিরাশ প্রাণে জাগো
দিয়ে ও চরণ, অক্ষয়-শান্তি।

শক্তিবিষয়ক কোনো গানে রজনীকান্তের আত্মবিলাপ প্রকাশিত। পরশরতন শক্তিজননীর কথা না ভাবিয়া সারাজীবন ছেলে-খেলার খেলায় বিভোর হইয়া মাতিয়াছেন। নিজেই প্রশ্ন করিয়াছেন—'ওমা কোন্ ছেলে তোর আমার মতন, কাটায় জীবন, ছেলে খেলায়' ?

'আমায় পাগল করবি কবে'-গানে কবির মাতৃভক্তির গভীরতা সুষ্ঠু অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। নির্জনে নীরবে তিনি 'মা' 'মা' করিয়া হাসিবেন, কাঁদিবেন অবিরত ক্রন্দনে দুই

নয়ন ধারাবিপ্লাবিত হইবে। কবির কামনা শ্যামারাধনার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীতাতপ সবই সহ্য করিতে পারিবেন, দেহটা পৃথিবীতে থাকিবে, প্রাণ থাকিবে শ্যামার চরণ-তলে।

শাক্তপদাবলীর একটি ভাগ 'জগজ্জননীর রূপ' নামে চিহ্নিত। রজনীকান্তের রচিত 'আমি চাহিনা ওরূপ'-গানটি এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। কবির মতে জননীর মৃন্ময়ীমূর্তি নয়, তাঁহার ইঙ্গিতে যে বিশ্বভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সংঘটিত হয়। জগজ্জননীর বদনসুষমার বিন্দু দিয়া কোটি কোটি শারদশশীর নিষ্কলঙ্ক সৌন্দর্যের সমুদ্ভব, নয়নকোণে কোটি সূর্যের আবির্ভাব। শ্রীপাদনখে সহস্র আকাশের নক্ষত্রচয়, প্রতি রোমকূপে কোটি জগতের রূপ পরিদৃশ্যমান :

কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছে একবিন্দু,
নয়নকোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ-আবির্ভাব নিরন্তর রয়।
শ্রীপদ-নখরে, এক আকাশের নয়,
সহস্রগগনের নক্ষত্র-নিচয়,
প্রতি রোমকূপে কোটি জগৎ-রূপে
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়।

কবি-কল্পনা এখানেই বিশ্রান্তি মানে না। নিখিলজগতে চঞ্চল সৌদামিনী-সংঘ স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল ও প্রশান্ত-অচঞ্চলরূপে মোহান্ধকার দূর করিতে মায়ের মধুর হাসির রূপ পরিগ্রহ করে। জগজ্জননীর স্নেহ-দয়া-ক্ষমার সীমা নাই। সেই স্নেহ-দয়া-ক্ষমা মৃতসঞ্জীবনী সুধার উপমা :

নিখিল জগতের সমগ্রচপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল প্রশান্ত-অচলা
মোহ-ধ্বান্ত নাশি মায়ের মধুর হাসি
অসীম-স্নেহ-দয়া ক্ষমামৃতময়।

এই জগজ্জননী জগতের জীবে দয়ার্দ্রচিত্তা হন, আশীর্বাদের বরাভয়-রক্ষাকবচ বস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া দেন। ইহা মৃন্ময়ীমূর্তিতে সম্ভব কি করিয়া? কোন্ কুম্ভকাররা ইহাকে গড়িয়া দিতে পারে।

এই শাক্তগীতগুলি কবির ব্যক্তিচিত্তের চিন্তাভাবনাকে ধরিয়া রাখিয়াছে। ভাষা ও শব্দ-বিন্যাস সঙ্গীত-সর্জনার একান্ত উপযোগী। প্রকাশশৈলীর নবীনতাই কেবল রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত হইতে স্বাতন্ত্র্য ঘোষিত করে, কিন্তু ভক্তি-ভাবুকতার তাদাত্ম্য সর্বত্র সমান।

●

১ দুর্গার নানা নামে পশ্চিমবাঙলার গ্রামের নাম ॥

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাঙলার হাজার হাজার গ্রাম-নামের প্রতি মনোনিবেশ করলে প্রথমেই তাদের বিস্ময়কর বৈচিত্র্যে হতবাক্ হতে হয়। দেবদেবীঘটিত, পৌরাণিক অথবা মহাকাব্য-আশ্রিত, প্রকৃতি, গাছপালা ও প্রাণী সংক্রান্ত, ব্যক্তি-নাম কিংবা বৃত্তিসূচক, লোকচরিত্রগত, ইতিহাস ও কিংবদন্তীমূলক, সংখ্যাঘটিত, ধ্বন্যাত্মক এবং মূললিত—কত বিবিধ প্রকারের পল্লী-অভিধা, যে আছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু এসব বিভিন্ন বর্গের মধ্যে দেবদেবীঘটিত নামের সংখ্যাই সর্বাধিক। সেগুলি সেকালের পল্লীবাসী বাঙালীর গভীর ধর্মপরায়ণতার সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন।

গ্রাম-নামের উৎসরূপে কৃষ্ণ (তাঁর বহু নামান্তর-সহ) সব চেয়ে জনপ্রিয় দেবতা। তারপর রাম, তাঁর বিকল্প আখ্যাগুলি সমেত। তৃতীয় স্থানাধিকারী বিষ্ণু-নারায়ণ। চতুর্থ স্থান দুর্গার, যাঁর বিবিধ অভিধা-আশ্রিত পল্লী-নাম বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

যে কোন বাংলা অভিধানে দুর্গার ষাট-সত্তরটি নামান্তরের উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে যেগুলি গুরুভার—যথা, মহিষমর্দিনী, চণ্ডিকা, অপর্ণা, দক্ষসুতা, হৈমবতী, ঈশানী প্রভৃতি—তাদের নিয়ে কোনো গ্রাম-নামের সৃষ্টি হয়নি পশ্চিমবঙ্গে। কারণটা স্বতঃবোধ্য। অতীতের যেসব পল্লীবাসী এহেন নাম নির্বাচন করেছেন, তাঁরা দুর্গার বহুলপ্রচারিত ও সহজবোধ্য নামান্তরগুলির দিকেই যে বেশী ঝুঁকবেন এমনই স্বাভাবিক। সেজন্য, সংখ্যাধিক্যের ক্রম অনুসারে, দুর্গা, চণ্ডী, ভবানী, দেবী ও পার্বতী অভিধাগুলিকে অবলম্বন করেই সর্বাধিক পল্লী-নামের উদ্ভব হয়েছে। সেগুলির অবস্থিতিস্থল ও বিস্তৃতিক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার পূর্বে এ-প্রবন্ধে অনুসৃত কয়েকটি নিয়মের কথা বলা প্রয়োজন। গ্রাম-নামের উল্লেখের পরেই, বন্ধনীর মধ্যে, 'কোলন'-চিহ্নের আগে-পরে, সংশ্লিষ্ট জেলা ও থানার নাম দেখানো হবে। যেমন, দুর্গামণ্ডল (২৪ পরগণা : সন্দেশখালি) বলতে বোঝাবে দুর্গামণ্ডল নামের গ্রামটি ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানায় অবস্থিত। আবার, একই নামের গ্রাম দুটি থাকলে যথাস্থানে এক যতি-চিহ্নের দু'পাশে দুটিরই অবস্থিতিস্থল অনুরূপভাবে নির্দেশিত হবে। যথা, চণ্ডীগাছা (২) (২৪ পরগণা : হাবড়া / হুগলী : বলাগড়)। কিন্তু ভতোধিকসংখ্যক গ্রাম অভিন্ন নামের হলে, স্থান-সংকুলানের জন্য, তাদের ক্ষেত্রে এত বিস্তৃত তথ্য না দিয়ে শুধু জেলাওয়ারি তাদের অংশ দেখানো হবে। যেমন, ভবানীনগর (৩) (মুর্শিদাবাদ-২, মেদিনীপুর-১) অথবা দুর্গাবাটি (৪) (বর্ধমান-২, নদীয়া ও বাঁকুড়া-১টি করে)।

অবস্থিতিনির্দেশের প্রশ্নটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। গ্রাম-নাম নিরূপণের ক্ষেত্রে দুর্গার বিভিন্ন নামের জনপ্রিয়তা কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কোন্ নাম কোন্ জেলায় (বা অঞ্চলে) কতখানি সমাদৃত, সংশ্লিষ্ট তথ্য থেকে, তার হদিশ পাওয়া সম্ভব। গ্রাম-নাম নির্বাচনকারী সেকালের পল্লীবাসীদের এই পছন্দ-অপছন্দের সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও খুবই চিত্তাকর্ষক হবার কথা যা বর্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সম্ভব নয়।

এইবার আমরা দুর্গাঘটিত পল্লী-অভিধা দিয়ে বাস্তব গ্রাম-নামগুলির উল্লেখ শুরু করতে পারি। যথা, দুর্গা (বর্ধমান : কাটোয়া) ('পুর', 'নগর' প্রভৃতি যে কোন অন্ত্য-পদবিহীন এ-নামটি অ-সাধারণ যদিও অনুরূপ আরও কিছু দৃষ্টান্ত আছে), দুর্গাডাঙ্গা (বর্ধমান : মেমারি), দুর্গাডি (২) (পুরুলিয়া : মানবাজার / বর্ধমান : চিত্তরঞ্জন), দুর্গানগর (৪) (২৪ পরগণা-৩, কোচবিহার-১), দুর্গাপুর (৬২) (মেদিনীপুর-১৯, মুর্শিদাবাদ-৯, পশ্চিম দিনাজপুর-৭, ২৪ পরগণা-৬, নদীয়া-৫, বীরভূম, মালদহ ও হুগলী-৪টি করে, বর্ধমান-৩, পুরুলিয়া-১), দুর্গাবাটি (৪) (বর্ধমান-২, নদীয়া ও বাঁকুড়া-১টি হিসাবে), দুর্গাবাস (নদীয়া : কৃষ্ণনগর) প্রভৃতি। সংক্ষেপিত হলেও এ-তালিকা থেকে দেখা যায় যে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও হাওড়া ছাড়া এ-রাজ্যের বাকি বারোটি জেলাতেই দুর্গাঘটিত গ্রাম-নাম অল্পাধিক সংখ্যায় বিদ্যমান। আবার, ৬২টি দুর্গাপুরের মধ্যে ১৯টিই (শতকরা ৩০.১ ভাগ) মেদিনীপুরে অবস্থিত হওয়ায়, সে-জেলাবাসীরা, গ্রাম-নাম নির্বাচনের ক্ষেত্রে, 'দুর্গা'র প্রতি বিশেষ অনুরক্ত মনে হয়। পরবর্তী নামগুলির ক্ষেত্রে এ-জাতীয় সঙ্গত অনুমান পাঠক নিজেই করে নিতে পারবেন।

চণ্ডী-সংক্রান্ত প্রধান গ্রাম-নামগুলি নিম্নরূপ : চণ্ডী (২৪ পরগণা : বিষ্ণুপুর), চণ্ডীগ্রাম (পশ্চিম দিনাজপুর : ইটাহার), চণ্ডীবাড় (জলপাইগুড়ি : আলিপুরদুয়ার), চণ্ডীতলা (হুগলি : চণ্ডীতলা), চণ্ডীপুর (৫৮) (মেদিনীপুর-১৪, ২৪ পরগণা-৮, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ-৭টি করে, বর্ধমান ও বীরভূম-জেলা প্রতি ৬, বাঁকুড়া-৫, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া-২ হিসাবে এবং নদীয়া-১), চণ্ডীপাল (কোচবিহার : কোচবিহার), চণ্ডীহার (মালদহ : হবিবপুর) প্রভৃতি। তালিকাটি সংক্ষেপিত হলেও দেখা যায়, চণ্ডী-প্রভাবিত গ্রাম-নামের পরিসর দুর্গাঘটিত নামের থেকেও বেশী। 'পুর' অন্ত্য-পদযুক্ত অভিধা অন্যান্য অন্ত্যাংশযুক্ত আখ্যা থেকে দু'টি ক্ষেত্রেই যে অনেক বেশী তা-ও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ, পশ্চিমবাঙলার যাবতীয় গ্রাম-নামের সমীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্য যে কোন অন্ত্য-পদ থেকে 'পুর'-এর ব্যবহার বহুগুণে বেশী।

তৃতীয় গুরুত্বের 'ভবানী'-র সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান দৃষ্টান্তগুলি হল—ভবানীচক (৩টিই মেদিনীপুরে), ভবানীনগর (৩) (মুর্শিদাবাদ-২, মেদিনীপুর-১), ভবানীপাথর (বাঁকুড়া : রাণী-বাঁধ), ভবানীপুর (৫৪) (মেদিনীপুর-৮, পশ্চিম দিনাজপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম-৬টি করে, ২৪ পরগণা, পুরুলিয়া ও হুগলি-জেলাপ্রতি ৫, নদীয়া ও মালদহ-৪টি হিসাবে, মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া-প্রতিক্ষেত্রে ২, বর্ধমান-১), এ-তালিকা থেকে বলা যায়, গ্রাম-নামের উৎস হিসাবে ভবানীর গুরুত্ব দুর্গা অথবা চণ্ডীর থেকে বিশেষ কম নয় এবং প্রভাবিত অভিধাগুলি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রব্যাপী।

সংখ্যায় নিরিখে, 'দেবী'-র প্রতিপত্তি অল্প যদিও সংশ্লিষ্ট দৃষ্টান্তগুলি ১৩টি জেলাতেই লভ্য। এই বর্গের সংক্ষেপিত তালিকাটি নিম্নরূপ : দেবী (মেদিনীপুর : ঝাড়গ্রাম), দেবীগঞ্জ (দার্জিলিং : খড়িবাড়ি), দেবীতলা (২৪ পরগণা : মীনাখাঁ), দেবীরপাড়া (হাওড়া : বালী), দেবীপুর (২৮) (২৪ পরগণা-৫, পশ্চিম দিনাজপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ-৪টি করে, বর্ধমান-৩, নদীয়া ও মালদহ-জেলাপ্রতি ২, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি-১টি হিসাবে)।

আলোচ্য শেষ নাম 'পার্বতী'-র সঙ্গে সম্পৃক্ত পল্লী-অভিধাগুলিতে বৈচিত্র্য খুব কম। সংশ্লিষ্ট অ-সংকেলিত তালিকাটি নিম্নরূপ : পার্বতী (২৪ পরগণা : বজবজ), পার্বতীরা (বাঁকুড়া : সোনামুখী), পার্বতীচক (হুগলী : আরামবাগ), পার্বতীপুর (২১) (২৪ পরগণা, পশ্চিম দিনাজপুর, ও মেদিনীপুর-৪টি করে, বাঁকুড়া ও হাওড়া-২ হিসাবে, নদীয়া, বীরভূম, মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি-জেলাপ্রতি ১)।

গ্রাম-নামের উৎস হিসাবে, দুর্গা (তাবৎ নামান্তর সহ) যে গুরুত্ব চতুর্থ স্থানের অধিকারিণী লেকথা এ-প্রবন্ধের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলেছি। তাঁকে অবলম্বন করেই যখন এত অজস্র পল্লী-অভিধার সৃষ্টি হয়েছে তখন পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের নামকরণের ক্ষেত্রে দেবদেবীদের প্রভূত প্রভাব সহজেই অনুমেয়।

●

॥ 'রঙ্কিনী'-দেবী-প্রসঙ্গে ॥

ত্রিপুরা বসু

"আমরা গত সপ্তাহে জানান্বেষণে বর্দ্ধমানের সন্নিহিত রঙ্কিনী দেবীর নিকট যে নরবলির সংবাদ প্রভাকর হইতে প্রকাশ করিয়াছিলাম এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট তাহার সন্ধান আরম্ভ করিয়াছেন এবং মুরশিদাবাদের কমিশনার সাহেবের প্রতি হুকুম দিয়াছেন বিলক্ষণরূপে এ' বিষয়ের সন্ধান করিতে হইবেক এই সন্ধানের ফল জানিবার নিমিত্ত আমরা অত্যন্ত আশাযুক্ত হইয়াছি যেহেতু সাধারণ লোকদের মধ্যে এমত জনরব উপস্থিত হইয়াছে যে তথাকার কোন প্রধান লোক এই নরবলিতে লিপ্ত আছেন এবং আমরা আরো জানি এই রঙ্কিনী দেবীর নিকট পূর্বেও বিস্তর নরবলি হইয়াছে।" জ্ঞানান্বেষণ পত্রিকার ৪.২.১৮৩৭ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত এ সংবাদটি থেকে বর্ধমানের কোন এক রঙ্কিনী দেবীর 'থানে' নরবলির সংবাদ পাওয়া যায়। সেকালের সংবাদপত্রের ভাষ্যকারের অনুমান, ঐ নরবলির সঙ্গে বর্ধমান রাজাদেরও যোগসাজস্ ছিল।

মেদিনীপুর সদর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে কংশাবতী নদীর সেতুর নিকটে হজরত পীর লোহানীর সমাধির নিকটে যে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে স্থানীয় কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, এটি ছিল রঙ্কিনীদেবীর মন্দির। পূর্বে নতুনবাজার, মোহনপুর, হাতিহলকা, জিনসহর, ইত্যাদি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীরা প্রতিদিন পালা করে এখানে একটি করে নরবলি দিত। একদিন এক সহায় সম্বলহীনা বিধবার একমাত্র পুত্রের পালা পড়ে। দেবীর মন্দিরের সামনে বিধবা-জননী করুণ-কান্নায় ভেঙে পড়ে। এতে পীরবাবা লোহানী মনে ব্যথা পান এবং বিধবার পুত্রের রূপে দেবীর সামনে আবির্ভূত হন। ফলে দেবীর সঙ্গে তাঁর প্রবল যুদ্ধ হয়। পরাজিতা দেবী মন্দিরের আমলকটি ধ্বংস করে দিয়ে পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে পলায়ন করেন এবং এক রজকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আশ্রয়দাতা পরে দেবীর কৃপায় ধলভূমের রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ঘাটশীলার কবি কৃষ্ণচন্দ্র রাউলের 'ধলভূম-বিবরণী' থেকে জানা যায়, ধলভূমরাজ জগদ্দেউ প্রথম রাজপুতানা থেকে নাকি দেবীকে আনয়ন করেন। কিন্তু আসার পথে রাজধানী ঘাটশীলায় না এসে দেবী ধলভূমগড়ের প্রান্তে এক মহুয়া গাছের নীচে আশ্রয় লাভ করেন। সেখানেই দেবীর পাষাণমূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে রঙ্কিনীর 'থানচির' নাম অনুযায়ী হয় 'মহলিয়া'। এ' সম্পর্কে বিবরণ নিম্নরূপ :—

"শব্দ শুনি নরপতি পশ্চাতে ফিরিলা।
কঙ্কালী দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলা॥
মহাবেগে মহাকালী মহল তলায়।
বৃক্ষ অন্তরালে আছে উলঙ্গিনী প্রায়॥
দেবী বলে নরপতি শুন পূর্বকথা।
আর না যাইব আমি রহিলাম হেথা॥

মহল বৃক্ষের তলে বিশ্রাম আমার।
মহলিয়া নামে গ্রাম হইবে প্রচার॥
আজি হতে নাম মোর হইল রঙ্কিনী।
যাও রাজা এবে তুমি নিজরাজধানী॥"

'ধলভূম-বিবরণ' থেকে আরও জানা যায়, রাজপুতনার ধারানগরের রাজকুমার সর্বহারা হয়ে পুরী গিয়ে স্বপ্নে এক দেবীর নির্দেশ পান এবং সেই অনুযায়ী তিনি দেবীকে অনুসরণ করে উত্তরদিকে যেতে থাকেন। ক্রমশ: সুবর্ণরেখা-নদীতীরে এসে রাজকুমার অনুন্নত সম্প্রদায়ের ভূস্বামীদের সাক্ষাৎ পান। তাদেরই একজন রঙ্গক জাতীয় প্রজাপীড়ক সামন্তকে যুদ্ধে পরাজিত করে রাজকুমার অনায়াসেই ঐ রঙ্গক বা 'ধবল' রাজ্যের রাজা হন। পরে দেবীর মন্দির ও বিগ্রহ স্থাপন করেন।

অপর কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, দেবীর আদি বাসস্থান ছিল পঞ্চকোটরাজ্যে। তিনি ছিলেন নররক্তলোভী, ভয়ংকরী, রংকালী, রাক্ষসীর ন্যায়। প্রতিদিন পঞ্চকোটরাজ দেবীর কাছে একটি করে নরবলি দিতেন। একবার একব্যক্তির পালা পড়লে তার পরিবারের লোকজন কান্না-কাটি শুরু করে। একজন শক্তিশালী গোপালক সেই ব্যক্তিকে রক্ষা করতে দুটি কুকুর ও একটি পাথরের মুদ্গর নিয়ে দেবীর কাছে যায়। কেউ কেউ বলেন, মেদীনীপুরের পীর লোহানীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিতা দেবীকে নররক্তপান করানোর লোভ দেখিয়ে ধলভূমরাজ এঁকে নিজরাজ্যে নিয়ে যান।

সীমান্তবাংলার নানাস্থানে রঙ্কিনী-দেবীর প্রভাব আছে যথেষ্ট। যদিও ছোটনাগপুরে এর প্রভাববেশী তবু এর উদ্ভবক্ষেত্র সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছুই বলার উপায় নেই। তবে পরবর্তীকালে (বা কোন অজ্ঞাত কালে) যে সমস্ত এলাকায় রঙ্কিনী দেবী পূজা প্রচলিত হয় সে গ্রামগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'মহলা' বা 'মৌলা' নামে পরিচিত হয়ে গেছে বলে প্রয়াত বিনয় ঘোষের অভিমত। তিনি বলেছেন : "এক নামের একাধিক গ্রাম থাকাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আশ্চর্য হল, মৌলা নামের গ্রামের সঙ্গে রঙ্কিনী-দেবীর অবস্থানের সম্পর্ক। সুতরাং মৌলা নামের সঙ্গে রঙ্কিনী-দেবীর কোন ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নেই, এমন কথা বলতে সাহস হয় না। এ'রকম Correlation কখনও আকস্মিক হয় না, হতে পারেনা।" এইসঙ্গে তিনি বর্ধমান জেলার সদর মহকুমা, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানা, বিনপুর থানা ও নন্দীগ্রাম থানার 'মৌলা' নামক গ্রামগুলির উল্লেখ করেছেন, যেখানে রঙ্কিনী-দেবীর পূজা প্রচলিত আছে। অবশ্য এ আলোচনার প্রতিবাদও প্রকাশিত হয়, সে কথায় পরে আসছি।

বাংলা 'রঙ্ক' শব্দের অর্থ দরিদ্র, কৃপণ, নীচ হীন, উড়িয়াতে উন্মাদ। কিন্তু এইরকম একটি অনুন্নত স্বভাবের বিপরীতে কোন দেবীর কল্পনা কতদূর সঙ্গত ছিল তা জানা যায় না। 'মহল' বা মহল্লা শব্দ থেকে 'মৌলা' এসে থাকবে। কিন্তু এর কোন অর্থ হতে পারে কিনা জানিনা। মনে হয় মানুষের উচ্চারণে মহল্লা, মহল বা মহল্লা এ শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর অভিমত হল : "মৌলা বলতে হয়ত রঙ্কিনীর আবির্ভূত

স্থান বা পূজাকল এককালে বুঝাতো। যে সকল পল্লীতে রঙ্কিনী পূজা হ'ত সেগুলির আদিনাম লোপ পেয়েছে রঙ্কিনীর প্রাধান্যকালে, সেই সময় থেকে স্থানীয় লোকসমাজে মৌলা নামেই অভিহিত হচ্ছে।"

কবিকঙ্কন চণ্ডীর চৌত্রিশাস্তবে দেখি—

"রঙ্ক হয়ে রয়েছিনু রঙ্কুখণ্ডে রত।
রতন দিয়া রঙ্গরস করাইলা হত।
রাজা সনে রণ কৈনু রক্ষা নাহি আর।
রঙ্গিনী করহ রক্ষা তবে সে উদ্ধার।"

এখানে রঙ্কিনী 'রঙ্গিনী' শব্দে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে লিপিকর প্রমাদবশতঃ। ধর্মমঙ্গলের ১৭শ সর্গে কানাড়ায় বিবাহ উপলক্ষে "রঙ্গিনী উত্তিলা রণে কবিরা লোচনা" দৃষ্ট হয়। এর আগরণ পালায় "তার রক্তে পূজিত রঙ্কিনী ভদ্রকালী" লিখিত আছে। কালিকামঙ্গলে দৃষ্ট হয়, "মৌলে রঙ্কিনী বন্দো জোড় করি পাণি"। এই ধরনের আরো নানা বন্দনা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের 'দিগবন্দনা' অংশে লক্ষিত হয় :—

"বিক্রমপুরে বন্দিব তোমার আস্থান।
মৌলায় বন্দিব মাতা তোমার বিশ্রাম।
মৌলায় রঙ্কিনী বন্দো শুক্ল হয়্যা মন।
বালিডাঙ্গায় বটেশ্বরী বন্দিব চরণ।
আহিলায় রঙ্কিনী বন্দিলাম সাবধান।
যার কাছে বিধাতা আপনি করে গান।
রঙ্কিনী পূজিব যার পুরী ঘাটশীলা" ইত্যাদি।

এ' ছাড়াও অপরাপর বন্দনায় মৌলা, ইভিপুর, ইত্যাদি স্থানের রঙ্কিনীর নাম মেলে। অনেক অনেক ক্ষেত্রে 'রঙ্গিনী' রূপে উল্লিখিতা (In some of the citations, the name of the goddess in Rangini, and this is, I believe, merely a varient of the word Rankini'—Priyaranjan Sen, C. U.)।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এ দেবীর সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এর বৈশিষ্ট্যানুযায়ী (১) শাস্ত্রীয় দেবী (দুর্গা, কালী বা ভৈরবী), (২) রাজস্থান বা উড়িষ্যাগতা দেবী, (৩) তান্ত্রিক দেবী, (৪) লৌকিক দেবী, (৫) বৃক্ষপূজা থেকে উৎপন্ন মনুষ্যাকৃতিপ্রাপ্তা আর্যেতর দেবী, (৬) আদিবাসীদের মহুয়াবৃক্ষ পূজা থেকে উদ্ভূতা দেবী ও (৭) বন্যহস্তীর অধিদেবী—এই বিভাগগুলি করেছেন।

প্রাচীন কোন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে রঙ্কিনীর উল্লেখ দেখা যায় না। মনে হয় বঙ্গদেশ, বিশেষতঃ বিহার ও উৎকলসীমান্ত অঞ্চলের অরণ্যময় প্রদেশের কোন কোন স্থানে তান্ত্রিক প্রভাবযুক্ত এই শাক্ত দেবীর উদ্ভব হয়ে থাকবে। বিভিন্ন স্থানের দেবী পূজার মন্ত্র, ধ্যান বা পূজাচারের মধ্যেও ভিন্নতা দেখা যায়। ধলভূম-রাজপরিবারের কুলদেবতা হিসাবে এঁকে নির্দেশ করলেও মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে রাজপুরীর বাইরে একেবারে সাধারণ স্থানে এঁর অধিষ্ঠান হল কেন? এ জাতীয় দেবদেবীর উদ্ভব সম্পর্কে স্মরণ করি চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর একটি অমূল্য উক্তি,

"ইতিহাস—পূর্বযুগের অনেক দেবতা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য সমাজে স্থান করিয়া লইয়াছেন, সকলে শাস্ত্রমধ্যে প্রবেশ করিবার সুযোগ পান নাই। শাস্ত্রগ্রন্থেও লৌকিক দেবতার অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। স্বভাবতঃ ভীরু, আত্মপ্রত্যয়হীন, প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনে অসমর্থ, প্রকৃতির বৈচিত্র্যে বিমূঢ়, মানুষ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অলৌকিক শক্তির কাছে মাথা নত করিয়াছে—জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থায় সম্ভাব্যমান নানা বিপদ্-আপদের রক্ষাকর্তা হিসাবে যুগে যুগে বিভিন্ন দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছে ('বাঙলার লৌকিক দেবদেবী' —বঃ সাহিত্য পরিঃ পত্রিকা, ৬৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১০ ।।" তবে এ দেবীর ভয়ংকরী রূপ ও লীলামাহাত্ম্য দেখেশুনে আদিম যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে এঁর সম্পর্ক নির্ণয় করা যেতে পারে। সীমান্তবাংলার অরণ্যময়ভূমিতে এ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে প্রবল ছিল।

রঙ্কিনীদেবীর নামেই গ্রামের নাম মৌলা হয়ে গেছে—নিশ্চিতভাবে এ সিদ্ধান্ত করা চলেনা। বাংলাদেশে এমন অনেক গ্রাম আছে যেখানে রঙ্কিনীর পূজা প্রচলিত কিন্তু সমস্ত নামই মৌলা হয়ে যায়নি। যতীন্দ্রমোহন দত্ত প্রয়াত বিনয় ঘোষের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে লিখেছিলেন, "তিনি যে তথ্যসমূহ পরিবেশন করিয়াছেন তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়না।" যাই হোক, এ পর্যন্ত বিভিন্ন সূত্র থেকে রঙ্কিনী দেবীর নিম্নবর্ণিত পূজাক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে—

মেদিনীপুর জেলার ব্রজলালচক, গড়বেতা, বিনপুর, চিলকিগড়, মালঝাটিয়াগড়, পরমানন্দপুর, বর্ধমান জেলার চকদিঘি, বরাকর, সিংভূম জেলার ধলভূম ও কদমা, হুগলী জেলার তারকেশ্বরের নিকটবর্তী মহলা, জামশেদপুর, ইত্যাদি। এছাড়া মৌলা, মহলা বা মহলিয়া নামে ১১টি গ্রাম মেদিনীপুর জেলায়, ৬টি বীরভূম জেলায়, ২টি বর্ধমান জেলায়, ১টি ২৪ পরগণা জেলায় থাকলেও এ সমস্ত গ্রামে রঙ্কিনীদেবীর পূজা এখন থাকলেও কোনদিন ছিল কিনা তা অজ্ঞাত। কংকালী নামে পূর্বে ইনি পূজিতা হতেন বলে কারো কারো অভিমত। বাংলার গ্রামাঞ্চলে যে 'সাতভইনী' বা 'সাতভয়া' নামক সাতটি দেবীর পূজা প্রচলিত আছে তার মধ্যে 'কঙ্কালিনী' আছেন। মনে হয় ইনিই 'রঙ্কিনী' এবং সম্ভবতঃ যুদ্ধযাত্রাকালে নৃপতিগণ এ দেবীর পূজা করে যুদ্ধে সাফল্য কামনা করতেন। রঙ্কিনীর মূর্তিটি অষ্টভুজা, এলায়িতকেশা, অস্ত্রধারিণী এবং যুদ্ধের ভয়ংকর দৃপ্ততায় তিনি বুঝি ছুটে আসছেন। ঊর্ধ্বাঙ্গ তাঁর অনাবৃত। ধলভূম—ঝাড়গ্রাম অঞ্চলে 'রাঁকা' নামে 'লোভিনী' বা 'লুব্ধ' স্তোত্রক যে দুটি শব্দ পাওয়া যায়, তাকে 'রঙ্ক' শব্দজাত বলেই বলা হয়েছে। সুতরাং যোদ্ধাদেবী হিসাবে ইনি স্বীকৃতি পেলে এঁর সামনে বলি দেওয়ার তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত শাক্ত পূজাবিধি অস্বীকার করা যায়না। নরবলি দেওয়ার কোন সমাজগত ব্যাখ্যা নেই। আর, আমাদের মনে হয়, বহির্বঙ্গ নয়, এই বঙ্গদেশেই এ দেবীর রূপ কল্পিত হয়েছে। দুর্গা বা কালীর আকৃতি-প্রকৃতির সঙ্গে এঁর সম্পর্ক নিকট। ধলভূমেই যদি ইনি প্রথম কল্পিতা হয়ে থাকেন, তবে তাতো বাঙালী অধ্যুষিত অঞ্চল। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ধলভূম পরগণা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। ধলভূম রাজারা ইংরেজ সরকারের ১৭৭০ সালে বাংলাভাষাতে লেখা সনদপত্র প্রদান করেন ('বসুধারা',

শ্রাবণ, ১৩১৫, পৃঃ ৩৭৭)। 'আইন-ই-আকবরী' এ পরগণাকে সরকার মান্দারণের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। কিংবা এমনও হতে পারে, মৌলা বা মহুলা নামের কোন গ্রামের মহুয়া বৃক্ষের তলে এ দেবীর প্রথম পূজা প্রচলিত হয়, পরে তা অন্যত্র প্রচলিত হয়ে থাকবে। পরবর্তীকালে এর থানে পোড়ামাটির হাতী-ঘোড়া, ছলন হিসাবে দেওয়া হতে থাকে।

বঙ্গদেশের অরণ্যময় পশ্চিমসীমান্ত অঞ্চলে, ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তারকালে আর্যেতর মানুষদের বাসস্থান ছিল। তাদের ধর্মভাবনা, পূজাপার্বণ এই সমস্ত অঞ্চলে বহুদিন সজীব ছিল, আজও আছে তার কিছু কিছু। যাই হোক, এই আরণ্যপরিমণ্ডলের আরণ্যকৃষ্টিতে লালিত সেই অন্যতম লৌকিক দেবী রঙ্কিনী পরে নানাভাবে বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ঐ অঞ্চলে আজো যেভাবে তাঁর পূজাচারাদি প্রচলিত আছে, তা দেখে মনে হয়, ইনি অরণ্যচারী আদিবাসীদেরই উদ্ভাবিতা।

ধলভূমরাজ একবার এই দেবীর নিকট নরবলি দিয়ে অভিযুক্ত হন। এ সম্পর্কে 'ধলভূম বিবরণ' জানায় : "একবার কতকগুলি লোক ডেপুটি কমিশনার হেজ সাহেবের কাছে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল যে মহারাজা অষ্টম জগন্নাথ ধবলদেব আপন কুলদেবী শ্রীশ্রীরঙ্কিনী মাতার নিকট নরবলি প্রদান করিয়াছেন। তদনুসারে হেজ সাহেব সদলে মোহলিয়া রঙ্কিনী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নানারূপ অনুসন্ধান করেন। রাজাকে নরহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেন।" আবার স্থানীয় বিশ্বাস, দেবী নাকি তাঁর ইচ্ছামতো মানুষের রক্ত নিজেই পান করতেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ভবানীপুর নিবাসী কালীকৃষ্ণ দেব একটি পত্র লিখে জানান, "…সম্বাদ প্রভাকর পত্র হইতে সমুদায়িক পত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে বর্ধমানে শ্রীশ্রী৺রঙ্কিনীশ্বরী দেবী অর্থাৎ মৃত্তিকার কিম্বা পাষাণ খুদিতা মূর্তির নিকটে একটা নরবলি হইয়াছে কিন্তু তাহা কে করিয়াছে তাহার নির্ণয় এ পর্যন্ত হয় নাই সে যাহা হউক অদ্যাবধি বর্ধমান নিবাসী মহাশয়দিগের এমত দৃঢ় জ্ঞান আছে যে একটা প্রাণী বধ করিলে আর একটা প্রাণী বধ না জীবৎ হইতে পারে। হায় হায় কি খেদের বিষয় আমাদের বাঙ্গলার মনুষ্যগণেরা কতদিনে মনুষ্য হইবেন কিছু বলা যায় না"।

কিন্তু নরবলীর মত একটি ভয়ংকর কুসংস্কার নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠান করে একটি রাজবংশ কিভাবে 'প্রজানুরঞ্জক' বিশেষণ পেতে পারেন সেটাই প্রশ্ন।

॥ নির্দেশিকা ॥

১. 'পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা', ২য় খণ্ড, অশোক মিত্র সম্পাদিত, ১৯৭২।
২. 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৪।
৩. 'বাংলার লৌকিক দেবতা', গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, ১৩৬৬।
৪. 'মৌলাগ্রাম ও রঙ্কিনীদেবী', যতীন্দ্রমোহন দত্ত, বসুধারা, শ্রাবণ, ১৩৬১।
৫. 'কালিকামঙ্গল', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।
৬. 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী', বসুমতী সংস্করণ, ১৩৭০।
৭. 'সীমান্ত বাংলার লোকযান', ডঃ সুধীরকুমার করণ।
৮. 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', বিনয় ঘোষ, ২য় সংস্করণ, ৩য় খণ্ড।

।। দক্ষিণের দাক্ষিণ্য ।।

শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী

সুযোগ থাকিলেও তীর্থদর্শন, ধামদর্শন হয়না। কখন হয়, যদি তীর্থের, ধামের কৃপা হয়। আমার জীবনে এরূপ একবার কৃপা হয় দক্ষিণ ভারতের দেবস্থান দর্শনের। ভ্রমণের সুযোগ আসে "ভারত তীর্থদর্শন" প্রতিষ্ঠানের সহায়তায়। আমি এই প্রবন্ধে দক্ষিণভারতের ধাম ও তীর্থস্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করার প্রয়াসী হইব।

দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ দেবস্থানগুলির বৈশিষ্ট্য—পরব্রহ্মের প্রতীকরূপে পশ্চাৎদেশে মন্দিরাভ্যন্তরে নাগোপরি শায়িত নারায়ণ বিগ্রহ এবং সম্মুখভাগে বিশেষ মন্দিরের বিশেষ বিগ্রহ স্থাপিত—শিব, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি। ইহার অর্থ পরব্রহ্মই মূলস্বরূপ, তাঁহার অস্তিত্বের উপর সকলেরই অস্তিত্ব। কিন্তু ধাম—রামেশ্বরম্ এবং জগন্নাথক্ষেত্র পরব্রহ্মের স্থান বলিয়া অন্য বিগ্রহ স্থাপিত হয় নাই।

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥" গীতা—১২।২

"শ্রীভগবান কহিলেন—যাঁহারা আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধা-সহকারে আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে যুক্ততম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সাধক"। ব্যক্তোপাসনা বা ভক্তিমার্গই শ্রেষ্ঠ, উক্ত শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া বলা হইল।

"যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥" গীতা—১২।৩-৪

"শ্রীভগবান আরও বলিলেন—কিন্তু যাঁহারা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতসাধন হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই **অনির্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা** করেন, তাঁহারাও আমাতে প্রাপ্ত হন। আমি নির্গুণোগুণী পুরুষোত্তম। সগুণ নির্গুণ দুইই আমার বিভিন্ন বিভাবমাত্র, তবে সগুণ উপাসনা কেন? কারণ নির্গুণ উপাসনা দেহধারীর পক্ষে দুঃসাধ্য।"

দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলি দর্শন করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়—দক্ষিণ ভারতে অব্যক্ত নির্গুণ উপাসনার বিশেষ প্রচলন ছিল। প্রতিটি মন্দিরে বিগ্রহ মন্দিরাভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত অন্ধকারস্থানে স্থাপিত। দিনের আলোকেও সম্যকভাবে স্পষ্ট হয় নাই। মন্দিরের পুরোহিতগণ কর্পূরের আলো জ্বালিয়া বিগ্রহ দর্শন করাইয়া থাকেন। ইহার অর্থ দক্ষিণ ভারত জ্ঞানী অদ্বৈতবাদীর দেশ। তাঁহাদিগের মতে কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের সাহায্যে পরব্রহ্মের উপলব্ধি সম্ভব। একমাত্র যিনি ব্রহ্মবিদ্, আত্মবিদ্, তিনিই পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে পারেন। কর্পূরের আলোই অদ্বৈতজ্ঞানের প্রতীক। আবার অধিকাংশ মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখভাগে 'ভূদেবী' ও

'শ্রীদেবী'র মূর্তি স্থাপিত। 'ভূ'দেবীর অর্থ পৃথিবী ও 'শ্রী'দেবীর অর্থ ঐশ্বর্য্য। ইহা জ্ঞানের, ধনের, ঐশ্বর্য্যের প্রতীক স্বরূপ। কোন মন্দিরে 'লীলাদেবী' অর্থাৎ মাধুর্য্যময়ী রাধারাণীর মূর্তি নাই। পক্ষান্তরে প্রেম ও মাধুর্য্যলীলার ভক্তিমার্গের অপ্রকাশ, কেবল অদ্বৈতবাদীর জ্ঞানৈশ্বর্য্যের দিকটি সুপ্রকাশিত। অথচ উত্তরভারতের দেবমন্দির প্রেম ও মাধুর্য্যলীলায় সুভাষিত। এবংবিধায় দক্ষিণভারতে প্রেম ও ভক্তিপথের প্রচলন ছিল না। অনুমান উক্ত কারণেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণভারতের প্রতিটি দেবস্থানে পর্য্যটন করেন এবং প্রেম ও ভক্তির ধারা প্রবাহিত করেন, ঈশ্বরলাভের সহজপথ প্রচার করেন। কেননা শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তাবতার, একধারে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবানের সমন্বয়। কলির জীবনে ভক্তি শিখাইবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব। ভক্তিযোগের বিচারে তিনি প্রেমঘনের ন্যায় ভক্তিঘনও বটে। নিম্নে কয়েকটি প্রসিদ্ধ দেবস্থানের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হইল।

(১) ধাম—পুরী (শ্রীজগন্নাথ-মন্দির)—

পরব্রহ্মের দুইটি বিভাব—একটি সবিশেষ অর্থাৎ পরব্রহ্ম সাকার, সগুণ ও সক্রিয়। ভগবানের রূপ, গুণ ও লীলার সমাবেশ। উত্তর-ভারতের দেবমন্দিরে এই সবিশেষ বিভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র—মথুরা, বৃন্দাবন, দ্বারকা, প্রভাস ইত্যাদি স্থানে। আবার শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্র, অযোধ্যা। পরব্রহ্মের দ্বিতীয় বিভাব—নির্বিশেষ বিভাব অর্থাৎ নিরাকার, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। আবার কোন লীলা নাই অর্থাৎ নির্গুণ। কেবল চক্ষুগুলি বৃহৎ গোলাকার—অখণ্ডস্বরূপ। পরব্রহ্ম দ্রষ্টাস্বরূপ, সাক্ষীস্বরূপ।

"উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥" গীতা—১৩।২২

"এই দেহে যে পরমপুরুষ আছেন, তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর ও পরমাত্মা বলিয়াও উক্ত হন।"

শ্রীজগন্নাথদেব পুরুষোত্তমরূপে বিদ্যমান। পুরুষোত্তমের মন্দির (পুরী) বলিয়া শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র পুরীধাম নামে খ্যাত। চারি যুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। পুরীধাম কলিযুগের ধাম নামে অভিহিত।

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তম।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম॥" গীতা—১৫।১৮

"শ্রীভগবান বলেন—যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেইহেতু আমি লোক-ব্যবহারে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া খ্যাত।"

(২) ধাম—রামেশ্বরম্ (শঙ্কর ও পার্ব্বতী-মন্দির)—

দক্ষিণভারতের মন্দির প্রসঙ্গে কিংবদন্তী আছে—ব্যাপ্তিতে শ্রীরঙ্গম্, (ভগবান শ্রীরঙ্গনাথম্), সৌন্দর্য্যে মাদুরাই (মীনাক্ষী), ও গাম্ভীর্যে রামেশ্বরম্। রামেশ্বরম্ মন্দিরের

বিগ্রহ শিবলিঙ্গ 'শঙ্কর' নামে, শক্তিমূর্তি 'পার্বতী' নামে অভিহিত। বস্তুতই রামেশ্বরধামের 'শঙ্করের' গম্ভীর তেজোময় মূর্তি। উক্ত গাম্ভীর্যহেতু রামেশ্বরধামের নিকট সমুদ্র স্থির ও শান্ত। অন্য কথায় অতীতে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে শাসন করিয়াছিলেন শান্ত হওয়ার নিমিত্ত। রামেশ্বরধামে সমুদ্র অদ্যাবধি শ্রীরামচন্দ্রের শাসন স্মরণে রাখিয়া শান্ত ও স্থির হইয়া আছে। অথচ রামেশ্বরধামের নিকটবর্তী সকলস্থানেই সমুদ্র বড়ই উত্তাল—যেমন মহাবলীপুরম্, পণ্ডিচেরী ও কন্যাকুমারীর সমুদ্র। 'ধাম'-শব্দের সাধারণ অর্থ 'গৃহ', অন্য অর্থ 'জ্যোতি' বা তেজ। প্রকৃতপক্ষে ধামে বিশ্বপিতার জ্যোতি বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। তরঙ্গায়িত সমুদ্র। অনবরত সমুদ্রে বিশাল তরঙ্গ একবার উত্থিত হইতেছে এবং পরক্ষণে পতিত হইতেছে। তদ্রূপ তরঙ্গায়িত মানবচিত্ত। চিত্তে প্রতিমুহূর্তে কামনা-বাসনার উত্থান ও পতন ঘটিতেছে। চঞ্চল মনকে স্থির করা সাধারণের পক্ষে বড়ই দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু ইহাও সম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ —রামেশ্বরধামের জ্যোতি বা তেজ দ্বারা বিশাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র স্থির ও শান্ত হইয়া আছে। তেমনই সাধকের সাধনার জ্যোতি বা তেজ দ্বারা সদা চঞ্চল মনকে স্থির ও শান্ত করা সম্ভব। রামেশ্বরম্ ধাম হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করি। সাধনার চরম উদ্দেশ্য, চিত্ত স্থির করা। চিত্ত স্থির না হইলে ব্রহ্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরলাভ কখনই সম্ভব নহে।

ত্রেতাযুগে উপাস্য রামচন্দ্র। ধাম—'রামেশ্বরম্'। ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত। সত্যযুগে উপাস্য নারায়ণ। ধাম 'বদ্রীনারায়ণ', ভারতের উত্তরে ও দ্বাপরযুগে উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, ধাম 'দ্বারকা', ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত।

(৩) শ্রীশ্রীপদ্মনাভ-মন্দির—(ত্রিবান্দ্রম সেন্ট্রাল)—

শ্রীশ্রীনারায়ণের অনন্তনাগোপরি শায়িত বিশাল মূর্তি। ১৮ ফুট দীর্ঘ। বিগ্রহের মুখমণ্ডল, বক্ষদেশ ও পাদদেশ—তিনটি দরজা দিয়া তিনবার দর্শন করিবার বিধি আছে। ইহার অর্থ—বিরাট বিগ্রহ, তিনবার দর্শনে সমাকভাবে দর্শন হয়। ইহা গৌণ অর্থে। অন্য একটি মুখ্য অর্থ আছে। ঈশ্বরলাভের প্রধানত তিনটি সাধন মার্গ—কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান। আবার গুণানুসারে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। পাদদেশে (নাভি) রজগুণের (কর্মের) প্রতীক। বক্ষদেশ (হৃদয়) সত্ত্বগুণের (ভক্তির) প্রতীক। প্রথম কর্ম ও জ্ঞানের আশ্রয়। পরিশেষে ভক্তি। ভক্তির দ্বারা কর্ম ও জ্ঞানের সমতা সাধন যেমন সত্ত্ব গুণ দ্বারা রজঃ ও তমের সমন্বয়। ভক্তিতেই ভগবান লাভের পথ সুগম হয়। যেমন সবশেষে সত্ত্বে হইতে হয়—নিত্যসত্ত্বে।

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।" গীতা—২।৪৫

"ত্রৈগুণ্য বলিতে বুঝায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমাহার। এই ত্রিগুণের ভাব বর্জন করিতে হইলেই তমঃ ও রজোগুণের দমন করিয়া শুদ্ধ সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হয়। দেহের গঠন বিচার করিলেই উক্ত নীতিটি সহজে উপলব্ধি হয়। দেহের মধ্যস্থলে বক্ষদেশ (হৃদয়), ভক্তির স্থান। একদিকে পাদদেশ (নাভি), কর্মের স্থান। অন্যদিকে মস্তক (সহস্রার),

জ্ঞানের স্থান। বক্ষদেশের সাহায্যে দেহের সমতা (Balance) রক্ষিত হয়, যেরূপ ভক্তি দ্বারা জ্ঞান ও কর্মের অথবা সত্ত্বগুণ দ্বারা রজঃ ও তমঃ গুণের সমতা সাধন হয়। বিগ্রহ দর্শনের বিধি—প্রথমে পাদদেশ (কর্ম), পরে মস্তক (জ্ঞান) ও শেষে বক্ষদেশ (ভক্তি) দর্শন করিতে হয়। কর্মের পরিসমাপ্তিতে জ্ঞান লাভ, আবার কর্ম ও জ্ঞানের পরিপক্কতাহেতু ভক্তির সঞ্চার হয়। সুতরাং বিগ্রহ দর্শনের তিনটি দরজা—তিনটি সাধনমার্গের প্রতীক স্বরূপ, যাহার সহায়তায় ব্রহ্মজ্ঞান হয় বা ভগবান দর্শন হয়।

এই মন্দিরে নারায়ণের মূর্তি বিভুজ। মনুষ্যাকৃতি, মানবজীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মোপলব্ধি, আত্মোপলব্ধি বা ভগবান লাভ করা। অদ্বৈতবাদীর সিদ্ধান্ত—'অহং ব্রহ্মাস্মি' ; 'সোঽহং'—'আমিই ব্রহ্ম', 'আমিই সেই'। আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ নিজেই নিজেকে জানা। ইহাই পরম জ্ঞান।

(৪) ভগবান শ্রীরঙ্গনাথন—(তিরুচিরুপল্লী)—

ব্যাপ্তিতে শ্রীরঙ্গম্। মন্দির দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন বর্গমাইল। সাতটি প্রাকার অতিক্রম করিবার পর ভগবান 'রঙ্গনাথন্'-এর মূল মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। সাতটি প্রাকার মানব-দেহের সাতটি চক্রের প্রতীক, (১) মূলাধার (গুহ্য), (২) স্বাধিষ্ঠান (লিঙ্গ), (৩) মণিপুর (নাভি), (৪) অনাহত (হৃদয়), (৫) বিশুদ্ধাখ্য (কণ্ঠ), (৬) আজ্ঞা (ভ্রূমধ্যস্থল) ও (৭) সহস্রার (মস্তিষ্ক)। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া সাতটি চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারের ঊর্ধ্বে পৌঁছাইতে পারিলেই জীবনের চরমলক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞান ভগবান দর্শন সম্ভব হয়। সেরূপ সাতটি প্রাকার অতিক্রম করিয়া ভগবান (শ্রীরঙ্গনাথন্) দর্শন করিতে হয়। মূল মন্দিরের উপরিভাগ আচ্ছাদন ওঁ-কারের আকার, প্রণবাকার বিমান। মূলতত্ত্ব 'ওঁ'-কে আশ্রয় করিলেই পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করা সম্ভব।

"ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মামনুস্মরণ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন দেহং স যাতি পরমাং গতিম্।" গীতা—৮।১৩

"শ্রীভগবান বলেন—'ওঁ' এই ব্রহ্মাত্মক একাক্ষর উচ্চারণপূর্বক আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া প্রস্থান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।"

মূল মন্দিরের শীর্ষভাগে পাঁচটি স্বর্ণকলস শোভিত। চারিটি কলস বড় আকারের, চারি বেদ—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব-এর প্রতীক। এবং ক্ষুদ্র কলসটি সরস্বতী দেবীর প্রতীক-রূপে বিরাজমান। বেদ জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার, সরস্বতী জ্ঞানদাত্রী। পূর্বদিকে মূল মন্দিরে প্রবেশ করিবার আটটি সোপান আছে। আটটি সোপান অষ্টাক্ষর মন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়"-এর প্রতীক। নারায়ণকে পাওয়ার ইহাই মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া আশ্রয়দাতার নিকট পৌঁছাইতে হয়।

(৫) শুচীন্দ্রম্—

কন্যাকুমারী হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে 'শুচীন্দ্রম্' শৈবমন্দির অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ইহা 'পরব্রহ্মের' মন্দির। পরব্রহ্মের ত্রয়ী অবস্থার পরিচায়ক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর একই

মূর্তিতে বিরাজমান। ইহার অপর নাম 'স্থাণুমলয়'। স্থাণু—শিবের নাম, মল—বিষ্ণু ও অয়ন—ব্রহ্মার নাম। পক্ষান্তরে একই মূর্তিতে ত্রিগুণাতীত (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ) পুরুষোত্তমের প্রকাশ। 'শুচীন্দ্রম্' একমাত্র মন্দির যেখানে একই শিবলিঙ্গ,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, ত্রিদেবের প্রতীকরূপে পূজিত হইতেছেন। এই কারণেই এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য স্মরণীয়। 'শুচীন্দ্রম্' নামের পশ্চাতে একটি পৌরাণিক কাহিনীও আছে। অহল্যাদেবীর সতীত্ব-নাশের জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অভিশপ্ত হন। অভিশাপমুক্ত হওয়ার জন্য ইন্দ্র কঠোর তপস্যা করেন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব আবির্ভূত হন ও প্রতি রজনীতে এই স্থানে তাঁর পূজা করিবার সর্তে ইন্দ্রকে অভিশাপমুক্ত করেন ও স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দেন। ইন্দ্র এইস্থানেই অভিশাপমুক্ত হইয়া পবিত্র হন। সেই কারণেই ইহার নামকরণ হয় 'শুচীন্দ্রম্' (শুচী + ইন্দ্রম্)। কিম্বদন্তী আছে—অদ্যাবধি দেবরাজ ইন্দ্র এই মন্দিরে প্রতি রজনীতে মহাদেবের পূজা করেন। শুধু দেবাদিদেব ইন্দ্র কেন, আজও অসংখ্য জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত পরমারাধ্য পরব্রহ্ম 'শুচীন্দ্রম্' দর্শন করিয়া চিত্তকে শুচি ও বুদ্ধিকে শুদ্ধি করিয়া থাকেন।

(৬) নটরাজম্—চিদাম্বরম্—

"যথা শিবময়ো বিষ্ণুরেবং বিষ্ণুময়ং শিবঃ।
যথান্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি।" —স্কন্দোপনিষৎ

"বিষ্ণু যে প্রকার শিবময়, শিবও সেইপ্রকার বিষ্ণুময়। আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হউক যেন আমি ভেদ দর্শন না করি।" তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হরি-হরে কোন ভেদ নাই। চিদাম্বরমে 'মহাবিষ্ণু' ও 'মহাশিব' মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত থাকিয়া উপরোক্ত তত্ত্বটি সবিশেষ পরিস্ফুট করিয়াছে। মহাশিব মন্দিরে স্বর্ণনির্মিত নটরাজ মূর্তি। পাশেই সোনার শিবলিঙ্গ, উচ্চতায় প্রায় ৪ ফুট। সচ্চিদানন্দের (সৎ + চিৎ + আনন্দ) 'চিৎ' (চৈতন্য) শক্তির বিশেষ প্রকাশ। মূর্তির অপরূপ জ্যোতি দর্শন করিলে চক্ষু উদ্ভাসিত হয়। নটরাজ মন্দিরের উপরের আচ্ছাদনও স্বর্ণনির্মিত। আমার মনে হয় শীর্ষদেশে নয়টি স্বর্ণকলস নয়টি গ্রহের প্রতীকরূপে বিরাজিত। মন্দিরাভ্যন্তরে গ্রহরাজ শিবলিঙ্গ সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইহা 'ব্যোমলিঙ্গ' নামে অভিহিত। চিদাম্বরম কথাটির তাৎপর্য 'চিৎ' অর্থাৎ চৈতন্যশক্তি, 'অম্বর' অর্থাৎ মহাকাশের ন্যায় বিরাট। পক্ষান্তরে বিরাট 'চিৎ'-শক্তির প্রকাশ। চিদাম্বরমে প্রসিদ্ধ 'আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের (চিৎশক্তির) 'ভাণ্ডার-বিশেষ ও জ্ঞানবিতরণের কেন্দ্রস্বরূপ। সেই কারণে উক্ত স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা চিদাম্বরমের মাহাত্ম্য আরও বিশেষভাবে বর্ধিত করিয়াছে।

নটরাজ-মন্দিরের পার্শ্বে মহাবিষ্ণু মন্দির। বাসুকীনাগের উপর শায়িত নারায়ণমূর্তি। মন্দিরের উপর স্থাপিত তিনটি স্বর্ণকলস—ত্রয়ী শক্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীকরূপে

বিরাজিত। একই স্থানে ভক্তগণকর্তৃক 'মহাবিষ্ণু' ও 'মহাশিব' পূজিত ও সেবিত হইতেছেন।

(৭) বেঙ্কটেশ্বর—(তিরুপতি বালাজী)—

"আদ্যং প্রোক্তং স্বয়ং ব্যক্তং বিমান রঙ্গ সন্নিকম্।
শ্রীমুষ্ণং বেংকটাদ্রিশ সালগ্রামং চ নৈসিশম্।
তোতাদ্রিঃ পুষ্করশ্চৈব নরনারায়ণাশ্রমঃ।
অষ্টৌ মে মূর্তয়ঃ সন্তি স্বয়ংব্যক্তং মহীতলে।"

এই শ্লোকটির ভাবার্থ নারায়ণ পৃথিবীতে আটটি ক্ষেত্রে স্বয়ংব্যক্তি হইয়াছে—দক্ষিণ ভারতের চারিটি ক্ষেত্র—(১) শ্রীরঙ্গম্, (২) শ্রীবেঙ্কটাদ্রি (তিরুমালাই), (৩) শ্রীমুষ্ণা (বরাহ-ক্ষেত্র) ও (৪) শ্রীতোতাদ্রি (বনমামালাই)। উত্তর ভারতের চারিটি ক্ষেত্র—(১) পুষ্কর, (২) শালগ্রামম্, (৩) নৈমিষারণ্য ও (৪) বদরিকাশ্রম্।

বেঙ্কটেশ্বরের মন্দির স্বয়ংব্যক্ত নারায়ণের-এর মন্দির। বহুমূল্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত বিগ্রহ ও মন্দির। ঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা। মন্দিরের প্রথম প্রাকারের শীর্ষদেশে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা ও রাণীর মূর্তি। দ্বিতীয় প্রাকারের শীর্ষদেশে সাতটি স্বর্ণকলস, সাতজন ঋষির প্রতীক। নিকটবর্তী সাতটি পাহাড়ে সাতজন ঋষির আশ্রম ছিল। তৃতীয় প্রাকারের শীর্ষদেশে তিনটি স্বর্ণকলস—ত্রিদিব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের প্রতীক, এবং চতুর্থ ও অভ্যন্তরভাগে মূল মন্দিরের শীর্ষদেশে একটি স্বর্ণকলস, পরব্রহ্মের প্রতীকরূপে বিরাজমান। এই মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে নারায়ণ বেঙ্কটেশ্বর (তিরুপতি বালাজী) বিগ্রহ পূজিত ও সেবিত হইতেছেন।

●

॥ দুর্গাবন্দনা ॥

(দুর্গাদশরূপস্তুতিঃ)

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

শঙ্করি ! শশ-সাংসভুজধারিণি !
শুভসাধিকে !
নয়নত্রয়-শোভিতমুখি !
মহিষাসুরঘাতিকে !
দুর্গতি ভয়-হারিণি ! জয়-কারিণি !
গিরিবালিকে !
বিশ্বজননি ! করুণাং কুরু
শরণাগতপালিকে ! ॥ ১ ॥

রক্তিম-নয়-ঘর্ঘরভাষিণি
উন্মত্তরুচিমালিকে !
অভয়ঙ্করি ! বরদেশ্বরি !
করুণাময়ি ! কালিকে !
নীলকমল-নিন্দিততনু-
তারিণি ! পরমাত্মিকে !
বিশ্বজননি ! করুণাং কুরু
শরণাগতপালিকে ! ॥ ২ ॥

ষোড়শি ! ভব-সুন্দরি ! নব-
কাঞ্চনরুচিমণ্ডিতে !
ভুবনেশ্বরি ! পরমেশ্বরি !
ধৃত-ভবনপণ্ডিতে !
ভৈরবি ! বর-গৌরববতি !
ভৈরবপ্রিয়নাদিকে !
বিশ্বজননি ! করুণাং কুরু
শরণাগতপালিকে ! ॥ ৩ ॥

খণ্ডিতনিজ-মস্তককর-ধারিণি !
রণচণ্ডিকে !
ধূমাবতি ! চিন্ময়ি ! সতি !
দেহি বিজয় মন্বিকে !
বগলামুখি ! রিপুনাশিনি !
কাঞ্চনমণিমালিকে !
বিশ্বজননি ! করুণাং কুরু
শরণাগতপালিকে ! ॥ ৪ ॥

মাতঙ্গিনি ! হৃদমোহিনি !
বিশ্বভুবনবন্দিতে !
কমলে ! ধন-দায়িনি ! জন-
ভক্তি-সুমনন্দিতে !
'ইন্দ্রমুকুট'-দীপ্তচরণ-
রঞ্জিত মণিপীঠিকে !
বিশ্বজননি ! করুণাং কুরু
শরণাগতপালিকে ! ॥ ৫ ॥

।। সুরথ ও সমাধি ।।

ডক্টর শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী শুরু হচ্ছে নাটকীয়ভাবে। রাজা সুরথ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার আক্রমণে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছেন মেধা মুনির তপোবনে। ভ্রষ্টরাজ্য সুরথের মন পড়ে আছে ফেলে-আসা রাজ্যের মঙ্গল-অমঙ্গল চিন্তায়। ওদিকে সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় বিব্রত বৈশ্য (ব্যবসায়ী) সমাধিও এসেছেন তপোবনে—উদ্দেশ্য শান্তিলাভ। কিন্তু সংসারের সব থেকে নিকট আত্মীয়েরা তাঁর সঙ্গে নির্মম দুর্ব্যবহার করলেও এই নির্জন তপোবনে তাদের কথাই বারবার ঘুরে ফিরে মনে আসছে।

একদিকে সংসার আর একদিকে তপোবন—দৃশ্যপটের পার্থক্য রীতিমতো রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যবৈপরীত্যে ফুটিয়ে তোলার মতো। সুরথ ও সমাধির মনোবিশ্লেষণে শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনীকার ঔপন্যাসিকোচিত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন ধরুন, রাজা সুরথের পরিচয় ও চণ্ডীতে উল্লেখিত ঘটনাকালীন মানসিক অবস্থার বর্ণনা। এ' বর্ণনায় সুরথের বীরত্ব, সংগ্রামী মনোভাব, ভাগ্যের উত্থানপতনসত্ত্বেও পৌরুষ, রাজোচিত ব্যক্তিত্ব সবই সুপরিস্ফুট।

"চৈত্রবংশসমুদ্ভব" রাজা সুরথ প্রজাদের পুত্রবৎ পালন করতেন। কোলাবিধ্বংসী যবন নরপতিরা এই সুরথের শত্রু হ'লেন। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে পরাজিত সুরথ নিজের রাজধানীতে ফিরে এসে নিজের দেশের রাজত্বেই তুষ্ট থাকতে চাইলেন। কিন্তু নিজের রাজধানীতেও দুষ্ট, দুরাশয়, বলবান আত্মীয়েরা রাজার ধন-ভাণ্ডার ও সৈন্যাদি অধিকার করলো। রাজত্ব হারিয়ে রাজা মৃগয়ার ছলে গভীর বনে চলে গেলেন। সেখানেই মেধা-ঋষির তপোবন। মেধা-মুনির আশ্রমের বর্ণনা—

'প্রশান্তশ্বাপদাকীর্ণং মুনিশিষ্যোপশোভিতম্ ॥' (চণ্ডী ১।১০)

'শান্তস্বভাব পশুপ্রাণীতে পরিপূর্ণ ও মুনিবরের শিষ্যমণ্ডলীর দ্বারা শোভমান'—সেই আশ্রম।

কিন্তু এমন আশ্রমে এসেও সুরথের অন্তরে রয়েছে হৃতরাজ্যের চিন্তা। "আমার পূর্বপুরুষ চৈত্র প্রভৃতি বীরগণ যে রাজ্য গড়ে তুলেছেন, আজ সেই রাজ্য আমার অমাত্যদের হাতে পড়ে কেমন আছে কে জানে? আমার প্রিয় প্রধান হস্তীটি শত্রুদের হাতে পড়ে ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া করছে তো? যারা আমার কাছে বেতন, পুরস্কার, ভোজ্য পেয়ে আমার অনুগত ছিল, তারা নিশ্চয়ই অন্য রাজার দাসত্ব করছে। রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ কত দুঃখে জমিয়েছিলাম, এখন হয়তো এ সবই দুষ্টলোকের হাতে বাজে খরচে নষ্ট হচ্ছে।"—এই সব ভাবতে ভাবতে বৈশ্য সমাধির সঙ্গে রাজার দেখা।

সমাধির মুখভাব দেখে কীজন্য এ আশ্রমে-আসা সে কথা জানতে চেয়ে সুরথ বললেন—

'সশোক ইব কস্মাত্ত্বং দুর্মনা ইব লক্ষ্যসে।' (চণ্ডী ১।১২—১৮)

'আপনাকে কেন শোকার্ত এবং অবসন্ন দেখাচ্ছে ?'

তখন সমাধির বিবৃতিতে সংসারের আর একটি ছবি ফুটে উঠলো। ধনীবংশজাত সমাধির শত্রু তাঁর নিজের স্ত্রী এবং সন্তানেরা। তাঁর টাকা-পয়সা কেড়ে নিয়ে স্ত্রী এবং পুত্রেরা তাঁকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবু সমাধির মন পড়ে আছে তাদেরই দিকে—

'সোঽহং ন বেদ্মি পুত্রাণাং কুশলাকুশলান্বিতাম্।
প্রবৃত্তিং স্বজনানাঞ্চ দারাণাঞ্চাত্র সংস্থিতঃ॥
কিন্তু তেষাং গৃহে ক্ষেমমক্ষেমং কিন্তু সাম্প্রতম্।
কথন্তে কিন্তু—সদ্বৃত্তাঃ কিন্তু মে দুষ্টাঃ॥' (—চণ্ডী ১।২৩,২৪,২৫)

'স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন কারও ভালো-মন্দের খবরই এখানে পাচ্ছি না। সম্প্রতি তাদের কুশল কি অকুশল, আমার ছেলেরা সৎপথে আছে না অসৎপথে চলেছে—তাও আমার জানা নেই'।

রাজা সুরথ এ কাহিনী শুনে অবাক। যে আত্মীয়েরা এত অত্যাচার করেছে, তাদের কথা ভেবে সমাধির এত দুশ্চিন্তা ? সরল মনে সমাধি স্বীকার করলেন, আত্মীয়দের ব্যবহার সত্যি অমানুষিক, কিন্তু কি করবেন, তাদের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর হতে পারছেন না।

সমাধি ও সুরথ দু'জনে মিলে তখন মুনিবরের কাছে উপস্থিত হ'লেন। দু'জনেরই এক জিজ্ঞাস্য। প্রশ্ন করলেন সুরথই—'স্ত্রী-পুত্র-রাজ্যাদির এত দোষ সত্ত্বেও তাদের প্রতি আমাদের মমতা কিছুতেই যাচ্ছে না। এই মূঢ়তার কারণ কি ?' (চণ্ডী ১।৪৫)

মেধা ঋষির উত্তরের সূত্র ধরেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিস্তৃত কাহিনীতে প্রথমে বিষ্ণু-কর্তৃক মধু-কৈটভাসুরবধবর্ণন, তারপর দেবীর হাতে একে একে মহিষাসুর ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ-কাহিনী। আমাদের এ-আলোচনার উদ্দেশ্য অসুরবধ-বর্ণনা নয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী-অংশের সূত্রপাতে এবং অবসানে সুরথ ও সমাধির অভিজ্ঞতা ও পরিণতিই আমাদের লক্ষণীয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনীটি পূর্বাপর সুরথ ও সমাধির অভিজ্ঞতাসূত্রে গ্রথিত। রাজা সুরথ বাইরের রাজাদের কাছে পরাজিত, নিজের অমাত্যজনের দ্বারা অবহেলিত। শত্রুজনের ক্ষমতা যার নেই, তাকে ঘরের মানুষও সম্মান করতে চায় না। আবার দেখা যায়, ঘরের মানুষই অনেকসময় শত্রু হয়ে ওঠে। সে-যুদ্ধের জয়-পরাজয় অত সহজে নির্ণীত হয় না। বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে বাঙালী পরিবারের অন্তর্নিহিত এই সংগ্রাম-কাহিনী নিজস্ব ভঙ্গিমায় ফুটেছে বলেই সর্বভারতীয় সাহিত্যে তাঁদের এত জনপ্রিয়তা। মনে করুন, 'রামের সুমতি' গল্পে বৌদি নারায়ণী, তাঁর মা দিগম্বরী এবং নায়ক বালক দেবর রাম। এ তিনজনের অন্তঃসংঘাত একটি যুদ্ধক্ষেত্রের চেয়ে কম নাটকীয় নয়। সংসারসমরে বিজয়িনী নারায়ণীর মধ্যে শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টি নারীর চিরন্তনী মাতৃমহিমাকেই জয়ী করেছে। এমন অনেক উদাহরণই তাঁর রচনায় রয়েছে। ফলে তাঁর রচনায় বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় পাঠকের অন্তর্দর্শনে এত স্বচ্ছ মহিমায় প্রতিভাত হয় যে নিমেষে লেখকের সঙ্গে প্রাণের আত্মীয়তা স্থাপিত হয়।

ভেবে দেখলে সুরথ ও সমাধির জীবনকাহিনী চণ্ডী-কাহিনীকে আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত করেছে। রাজ্যজয় করেও কোনো রাজা নিশ্চিন্ত নয়; স্ত্রী-পুত্র, ভাই-বোন, মা-বাবার জন্য সারাজীবন অর্থ-বিত্ত উপার্জন ক'রেও বলা কঠিন সংসারে কে কতখানি আপন। সমাধির স্ত্রী ও সন্তানেরা তার টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছিল, ঠিক ঐভাবে না হ'লেও প্রয়োজন ফুরালেও স্নেহ-প্রেম টিকে থাকে এমন উদাহরণ জগতে বিরল। রবীন্দ্রনাথ সে কথা মনে রেখেই লিখেছেন—

সব মূল্য ফুরাইলে
যে দৈন্য প্রেমের অর্ঘ্য আনে,
অসীমের স্বাক্ষর সেখানে।

সেই 'অসীমের স্বাক্ষর'-কার জীবনে কখন কীভাবে দেখা যাবে, বলা কঠিন। সাধারণতঃ আমরা মনে করি ভগবানের দেখা পেলেই মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার শান্তি। কিন্তু ভগবান বা দেবতার কাছে মানুষ অনেকসময় শান্তি চায়ই না, তাঁর দেখা পেয়েও প্রার্থনা করে বসে সংসারের ক্ষণস্থায়ী ধন-সম্পদ মানবিভব (শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'লাউ-কুমড়ো')। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী থেকে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র অবধি অধিকাংশ ভক্তের আকাঙ্ক্ষা সাংসারিক কামনারই হের-ফের। সন্তান 'দুধে-ভাতে' থাকার প্রার্থনা অথবা ক্ষত্রিয়ের জাতিগত ব্রাহ্মণত্বলাভের প্রার্থনা—দুই-ই সকাম ভক্তির উদাহরণ। সব বাসনা যেখানে ফুরায় সেখানেই ঈশ্বরের পরিপূর্ণ করুণা—সেখানেই অসীমের স্বাক্ষর। এজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজিতা শ্রীমা সারদাদেবীর কথায় 'নির্বাসনা'ই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা।

আমাদের সাংবাৎসরিক দুর্গাপূজায় মানুষের সকাম ও নিষ্কাম দুটি প্রার্থনাই রূপায়িত। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠের আগে অর্গলাস্তোত্রপাঠের সময় ওই সকাম প্রার্থনাই 'দেহি দেহি'-মন্ত্রোচ্চারণে রূপায়িত। সকাম প্রার্থনার প্রধান বক্তব্য—

'রূপং দেহি জয় দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি'

—'আমায় রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, আমার শত্রুকে নাশ কর।' সৌভাগ্য, আরোগ্য, বল, বিদ্যা, লক্ষ্মী, মনোরমা ভার্যা, শত্রুক্ষয়ের শক্তি—এই সব প্রার্থনা সেই মানুষের, যে জীবনের সারবস্তুরূপে সম্ভোগকে জেনেছে। তবে দেবতার কাছে এ প্রার্থনার মূল্য এইখানে যে, এভাবেও কিছুটা দেবতা বা ভগবানের চিন্তা হয়। ধীরে ধীরে ভক্তহৃদয়ে এ সত্য প্রতিভাত হ'তে থাকে যে জগদম্বা শ্রীশ্রীদুর্গা—দুস্তর-সংসার-সাগর-উত্তরণে সহায়কারিণী। সে সংসারে একসময় যা একান্ত প্রার্থিত বস্তু, আর একসময় সেই বস্তুকামনাকেই সম্পূর্ণ পরিহার করে মায়ের অভয়পদে শরণ নেওয়াতে সব সার্থকতা।

সুরথ ও সমাধিকে মেধামুনি বলেছিলেন—'শুধু মানুষ নয়, সবরকম জীবজন্তুরই মোহবশে এক অবস্থা। মহামায়ার প্রভাবে মুগ্ধ সব প্রাণী সংসারে আসক্ত হয়ে আছে। পাখিরা নিজেরা না খেয়েও বাচ্চাকে খাওয়ায়। মানুষ উপকার ফিরে পাবে এই আশায় সন্তানদের খেয়ে-না-খেয়ে মানুষ করে'।

'তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতঃ।
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা॥' (—চণ্ডী ১।৫৩)

'এক হিসাবে মোহ আছে একথা পশুপাখি না বুঝুক, মানুষ কিছুটা বোঝে। তবু মহামায়ার সংসার এই মোহের দ্বারাই পরিচালিত। তবে যদি মহামায়া নিজে কাউকে এই মায়া থেকে রক্ষা করেন, তাহ'লেই মুক্তিলাভ'।

'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে। (চণ্ডী ১।৫৬)

'একদিকে তিনি সংসারবন্ধনের কারণ অবিদ্যা। আর একদিকে তিনি মুক্তির অধিষ্ঠাত্রী—পরমা বিদ্যা'।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে সেই মহামায়ার অসুরবধের কাহিনী মেধামুনির মুখে বিবৃত। কাহিনী শেষ করে মেধামুনি মন্তব্য করলেন, এই মায়ার প্রভাবে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধির মোহাচ্ছন্নতা। দেবীর বিচিত্র লীলা-কাহিনী ও তার অন্তর্নিহিত স্বর্গ উপলব্ধি করে সুরথ ও সমাধি নদীতীরে গিয়ে দেবীর মৃণ্ময়ীমূর্তি গঠন করে আরাধনায় মগ্ন হ'লেন। কঠোর তপস্যান্তে—

'পরিতুষ্টা জগদ্ধাত্রী প্রত্যক্ষং প্রাহ চণ্ডিকা।' (—চণ্ডী ১৩।১৩)

'প্রসন্না জগজ্জননী দেখা দিয়ে বললেন, তোমরা দু'জনে আমার কাছে যে যা চাইবে, তাই পাবে'।

এইবারে সুরথ ও সমাধির বরপ্রার্থনার কথা। রাজা সুরথ চাইলেন এ জন্মে হৃতরাজ্যে এবং জন্মান্তরে মনুদের একজন (সাবর্ণি) হয়ে চিরস্থায়ী রাজত্ব। বৈশ্য সমাধি চাইলেন, সংসার-আসক্তি-নাশক তত্ত্বজ্ঞান। নিজের দেহ ও দেহসম্পর্কিত আসক্তির প্রতি তাঁর মোহ চলে যাওয়াতে আর বিষয়ের পুনরুদ্ধার নয়, সম্পূর্ণ বাসনাবন্ধন থেকে মুক্তি—এই সমাধির প্রার্থনা।

দেবী যে ছেলে যেমন চেয়েছে, তাকে সেইরকম বরই দিলেন—সুরথকে রাজত্ব, সমাধিকে জ্ঞান। জন্মান্তরে সুরথ সূর্য সবর্ণার পুত্র হয়ে সাবর্ণি মনুরূপে চরাচরের অধিপতি হ'লেন। সুযোগ থাকলেও সমাধির বিবেক-বৈরাগ্য জাগ্রত হওয়ায় তিনি আর বিষয়সম্পদ চাইলেন না। আমরা ধরে নিতে পারি, তপোবনেই তিনি পরমজ্ঞান লাভ ক'রে জন্ম-মৃত্যুর পারে ব্রহ্মসাযুজ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। বাসনা থাকায় সুরথের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি। এ প্রসঙ্গে মথুরামোহনের মৃত্যুর পর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্তব্য স্মরণীয়—'কোথাও রাজা-টাজা হয়ে জন্মেছে বোধ হয়। ভোগবাসনা ছিল'!

রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি—দু'জনেই দেবীর পুণ্যদর্শনলাভ করেছেন, কিন্তু সে-দর্শনের ফল দু'জনের পক্ষে দু'রকম হওয়ার কারণ নিজ নিজ সংস্কার। বিচারশীল সমাধি সংসারের বিষয়বাসনা থেকে পুরোপুরি মুক্তি চেয়েছেন। এমনও হতে পারে যে, জীবনের বেদনা ও বঞ্চনার দিকটি তিনিই তীব্রতরভাবে অনুভব করেছেন, হৃতরাজ্য সুরথের বেদনার পাত্রটি এত তিক্ত বিষে ভরে ওঠে নি। সে যাই হোক, দেবীর দর্শনলাভধন্য সুরথও তাঁর রাজ্যবৈভব প্রার্থনার মধ্য দিয়ে একদিন পরমসত্যের সঙ্গে মিলিত হ'বেন, তবে ভোগাকাঙ্ক্ষা ক্ষয় হলে তা হবে। অপরপক্ষে সমাধি এই জীবনেই জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পূর্ণমুক্তি লাভ

করে মানবজন্মের চরিতার্থতা অর্জন করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায়—'মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানলাভ'। সে-উদ্দেশ্যের পথে সমাধির ধনলোভী আত্মীয়-স্বজনেরা নিজেদের অজ্ঞাতেই সমাধিকে ঠেলে দিয়েছে। আর ধনলোভের যা স্বাভাবিক পরিণাম, তা মনে রাখলে, সমাধির স্ত্রী ও পুত্রদের ভবিষ্যৎ পরিণতি যে বিষময়, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবু মাঝে মাঝে এমন প্রশ্ন তো জাগবেই যে, অন্যায়কারী স্বজনদের শাস্তিবিধান করাই কি কর্তব্য নয়? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তো অর্জুনকে যুদ্ধ করতেই বলেছেন—যুদ্ধ না করলেই সেখানে অধর্ম।

ধর্মাধর্মের এই সূক্ষ্মবিচারে স্মরণীয়, যথার্থ বৈরাগ্য এলে তখন কোনো কর্তব্যই তার অন্তরায় হতে পারে না। সংসারের ভালোমন্দ মুমুক্ষু সাধকের কাছে ক্ষণস্থায়ী বলেই মিথ্যা। সমাধিকে এক মুহূর্তে তার বিষয়বৈভব দেবী ফিরিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু বিষয়বাসনার তুচ্ছতা বুঝতে পেরে সমাধি আর সংসারে ফিরতে চাইলেন না বলেই দেবীর বরদান—'তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি' (চণ্ডী ১৩।২৫)।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর সুরথ ও সমাধি চরিত্রদুটি মানবসত্তার দুই প্রবণতার প্রতীক। একদিকে আশা-আকাঙ্ক্ষা পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখে ভরা নিত্যক্ষুব্ধিত সংসার—সবাই যেখানে প্রভুত্বকামী। সেই প্রভুত্বেরই সেকালের রূপ রাজা বা সম্রাট। কিন্তু সংসারে ছোট বড়ো সবাই একভাবে না একভাবে আধিপত্যলাভের সংগ্রাম করে চলেছে। এই কামনা-পরম্পরা যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণই বাসনার বিষয়ের জন্য সংগ্রাম সত্য। কিন্তু যিনি কোনো বাসনাই রাখেন নি, তিনি এই ক্ষণস্থায়ী কামনার জগতের পক্ষে কোনোমতেই নিজেকে জড়িত করবেন না। এই আপেক্ষিক জগতে এক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ছাড়া তাঁর আর অভিলষিত কিছুই নেই। তাই সংসারের কোনো লাভক্ষতিই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

কিন্তু প্রতিদিনের পরিচিত জগতে আমরা সাধারণ মানুষেরা কখনো সুরথ, কখনো সমাধি। একদিকে বাসনার জন্য নিরন্তর প্রয়াস, আর একদিকে কোনো দিব্যমুহূর্তে বাসনার নিষ্ফলতার ক্ষণিক উপলব্ধি। কে আমাদের মধ্যে জয়ী হবে—সুরথ—না সমাধি—তা মহামায়াই জানেন।

●

॥ হিমালয়ের পথে পথে—গঙ্গোত্রী, গোমুখ ॥

শ্রীবিশ্বজিৎ দাস

এবার যাত্রা গঙ্গার উৎস-সন্ধানে। তার আগে একদিনের বিশ্রাম। রুদ্রপ্রয়াগের কেদার-বদ্রী-বিশ্রামশালায় আশ্রয় নিয়েছি। চিরঞ্জীব-দা ও তাঁর দলবল নিয়ে রুদ্রপ্রয়াগেই এসে আবার আমার সঙ্গে মিলেছেন। বললেন—'ভালোই হোলো। এবার চলুন একসাথে গোমুখ যাওয়া যাক'।

এখান থেকে সরাসরি গঙ্গোত্রীর বাস মেলা ভার। তাই টিহরীর বাস ধরে এলাম টিহরীতে। টিহরী থেকে মিললো উত্তরকাশীর বাস। উত্তরকাশীতে এক রাত্রি বাস করে পরের দিন সকালেই রওনা হলাম গঙ্গোত্রীর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে সরাসরি বাস গিয়েছে লঙ্কা পর্যন্ত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা ভালো যে, আমি যে সময়ের কথা লিখছি তার পরে কিন্তু গঙ্গোত্রীর এই পথে কনোরিয়াগাড় নামে এক পার্বত্য-নদীতে প্রবল ঢল নেমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ১২ কিলোমিটার পথ। এখন সেই পথের দু-প্রান্ত বাদ রয়েছে। কিন্তু মাঝের ঐ ১০/১২ কিলোমিটার পথ পদব্রজেই যেতে হচ্ছে।

লঙ্কা গঙ্গোত্রী যাবার পথে একটা বিরাট বাসঘাঁটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে না আছে কোন ভালো খাবারের দোকান—না আছে কোন যাত্রীনিবাস। সুতরাং এগিয়ে যেতেই হয়। লঙ্কায় মালপত্র রাখার মোটামুটি ভালো ব্যবস্থাই আছে। ভারী মালপত্র সেখানে ওজন করে জমা রেখে রসিদ নিয়ে এগিয়ে চলি।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। চিরঞ্জীব-দা জোর করেই তাঁর ওয়াটার প্রুফটা আমার গায়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁর গায়ে অবশ্যই একটা ওয়াটার-প্রুফ-জ্যাকেট আছে, তবু আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা শোনেন নি।

ভৈরবঘাটি এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে। সংকীর্ণ পথ। আর তেমনি চড়াই। বাঁ দিকের পাহাড়গুলো ভয়ংকর রকম এবড়ো-খেবড়ো আর ডানদিকে বয়ে চলেছে খরস্রোতা উন্মাদিনী গঙ্গা। সমতলে বসে গঙ্গার সেই উন্মত্ত রূপ কল্পনা করা অসম্ভব। মাঝে মাঝেই তার সাথে এসে মিশেছে ছোট বড় নানা আকৃতির পাহাড়ী ঝরণা। প্রচণ্ড গর্জনে কারোর কোন কথাই আমরা শুনতে পাচ্ছি না। এই প্রকৃতির কাছে এলে বোধহয় আমরা সত্যিই কতো নগণ্য : কত তুচ্ছ। এখানে কবির সুরে গলা মেলাতে হয় না—'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার পরে'। এখানে আপনা থেকেই সেই সেই বিরাট পুরুষের চরণতলে মস্তক অবনত হয়। এ সৃষ্টি মহাভয় তো বটেই মহাসুন্দরও বটে। আবার তারই মধ্যে সুন্দরের অপূর্ব অবস্থান।

ভৈরব-ঘাটি। সমুদ্র সমতল থেকে উঠে এসেছি নয় হাজার ফুট। এখান থেকে গঙ্গোত্রীর দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। বাস, জীপ, দু-রকম যানই রয়েছে।

বাসে উঠে আমরা বসে আছি। এসে গেছেন আরও কয়েকজন যাত্রী। কিন্তু বাস আর ছাড়ে না। চালক জানালেন বাস ভর্তি না হলে তিনি বাস ছাড়বেন না। শেষ পর্যন্ত কিছু বেশী অর্থের বিনিময়ে তাঁকে রাজী করানো গেল।

গঙ্গোত্রী যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যার বেণী উন্মুক্ত হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ঠাণ্ডাও বাড়ছে। দ্রুত চললাম আশ্রয়ের সন্ধানে। সামনা-সামনি দু-একটা চটি, lodge, আশ্রম যা পেলাম কোথাও ঠাঁই নেই। সুতরাং গিয়ে হাজির হলাম দণ্ডীবাবার আশ্রমে। দণ্ডীবাবা তো বাঙালী দেখেই ক্ষেপে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন—'আপ বাহার চলা যাইয়ে'। কয়েকদিন আগে এক বাঙালী পরিবার তাঁর লেপ, গদি ছিঁড়ে নষ্ট করে দিয়ে গিয়েছিল। বাঙালীদের এই অসহিষ্ণু ব্যবহার ও অন্যায়-আচরণের জন্য সর্বত্রই তারা অপাঙ্‌ক্তেয় হতে চলেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিরঞ্জীবদার কথায় বুঝি কিছুটা আস্থা ফিরলো দণ্ডীবাবার। খানিক নরম হয়ে দোতলায় একখানা ঘর দিলেন।

ঘরখানা ভালো। কাঠের ঘর। কম্বল, লেপ আর গদির প্রতিশ্রুতিও পাওয়া গেল। মালপত্র নামিয়েই ছুটলাম দেবী গঙ্গার মন্দিরে।

ছোট মন্দির। বেদীর ওপর সুবৃহৎ গঙ্গামূর্তি। ডাইনে যমুনা, বাঁয়ে সরস্বতী। সোনালী যমুনা, কালো গঙ্গা আর সাদা সরস্বতী। সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছেন সৌম্যদর্শন সুমহান ভগীরথ। আরও অনেকগুলি ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে মন্দিরে—রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, মহাদেব, শঙ্করাচার্য ইত্যাদি।

আরতি শুরু হয়ে গেছে। বৌদি ডালি কিনে পূজো দিলে। পূজোর উপচারে এখানে ফুল অনুপস্থিত। বিশেষ এক সুগন্ধি পাতা সে স্থান অধিকার করেছে। ঢোল বাজছে, বাজছে শিঙা। অগুন্তি নক্ষত্র জ্বলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন। চারদিক ছেয়ে গেছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে। হু-হু করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও মনে হোলো কোনো দুঃখ নেই, কোন বেদনা নেই। অনন্ত আনন্দ সমুদ্রে আমরা যেন অবগাহন করছি।

আরতি শেষ হয়ে গান শুরু হয়ে গেছে। চিরঞ্জীব-দা ডাকলেন—'কতক্ষণ দাঁড়াবে? ফিরতে হবে না?' সত্যিই তো। টর্চের আলোয় পথ খুঁজে আশ্রমে ফিরি। অনেকটা দেরী হয়ে গেছে।

আমাদের ঢুকতে দেখেই এক বৃদ্ধা ছুটে এলেন। বললেন—'দেখো কিকি তোমাদের জন্য কখন থেকে বসে আছি'। আমরা অবাক হই। বৃদ্ধা বলেই চলে—'তোমরাও বাঙালী, আমিও তাই। তোমাদেরকে সামনে বসিয়ে খাওয়াবো'। ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে নিয়ে কয়েক দিন হোলো এই আশ্রমে আছেন। রান্না-বান্নার ভার ওনারাই নিয়েছেন যেচে। অভিভূত হয়ে পড়ি। এ' এক অদ্ভুত আকর্ষণ, অদ্ভুত ভালবাসা। আমরা তো বৃদ্ধাকে চিনিও না: তবু তাঁর এই অদ্ভুত স্নেহ।

• • • •

সকালে সকালে তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়েছি। যাবো গোমুখের পথে। যাত্রা শুরুর আগে এসে দাঁড়ালাম ভগীরথ-শিলার কাছে। প্রায় ২০০ ফুট ওপর থেকে তীব্র বেগে দুটি প্রধান জলধারা এসে আছাড় পড়ছে একখানা সুবিশাল পাথরের ওপর। ফেনিল জলরাশি জায়গাটাকে দোঁয়াটে করে রেখেছে। জলপ্রপাতের গর্জনে চতুর্দিক মুখরিত সগর-রাজার ষাট-হাজার সন্তানের মুক্তির মানসে দিলীপনন্দন ভগীরথ এই শিলার ওপর বসেই তপস্যা করেছিলেন। তাই এই পুণ্য ধারার নাম ভাগীরথী। ভাগীরথীর গঙ্গা নামকরণ হোলো দেবপ্রয়াগ থেকে। মন্দাকিনী ও অলকানন্দা এসে মিলেছে রুদ্রপ্রয়াগে। সেই সংযুক্ত ধারা দেবপ্রয়াগে এসে একাত্ম হয়েছে ভাগীরথীরসঙ্গে। সৃষ্টি হয়েছে গঙ্গার।

শিলার ওপর থেকে জলধারারা নেমে এসে ধরা দিচ্ছে হালকা চকোলেট রঙের মসৃণ পাথরের দুটি চওড়া প্রাচীরের মধ্যে—শিবের জটা। প্রচণ্ড বেগে ফুলে ফেঁপে ছুটে চলেছে। ছুটে চলেছে পনেরোশো সাতান্ন মাইল দূরে সাগরসঙ্গমে। জটার প্রবেশ দ্বারের আগেই একটি শিবলিঙ্গের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছেন গঙ্গা। কিন্তু যা দেখতে এসেছিলাম তা কই? কোথায় সেই গঙ্গার উৎস?

সে' প্রশ্নের উত্তরের জন্যই চলেছি গোমুখের পথে।

• • •

চলেছি আমাদের সঙ্গে রয়েছে দু'জন মালবাহক-কাম-পথ-নির্দেশক। বাহাদুর আর এ পথের সবচেয়ে অভিজ্ঞ পথ নির্দেশক কুন্দন সিং। কীর্তি-দা আর মিষ্টার লাহিড়ী বার বার পিছিয়ে পড়েছিলেন। তাই বাহাদুর রইল ওদের সঙ্গে। আমি চিরঞ্জীবদা আর বৌদি দ্রুত এগিয়ে চললাম কুন্দন সিং কে নিয়ে।

পথ প্রশস্ত। তেমনি সুরম্য। দু' পাশে চির গাছেরই প্রাধান্য। মাঝে মাঝে দু একটা পূর্ণদগ্ধ, অর্ধদগ্ধও গাছও দেখতে পাচ্ছি। বোধহয় কোন দাবানলেই তাদের এই অবস্থা করে থাকবে।

বাগান শেষ হয়ে যায়। এসে পৌঁছই এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তায়। বাঁ দিকে সুউচ্চ পর্বতপুঞ্জ, আর ডান দিকে বহু নীচে গঙ্গার প্রবহমান ধারা। গঙ্গার ওপারে আবার পর্বতরাজি। তাদের সারা বুক আর মাথায় জমে রয়েছে বরফ। নীল আকাশের বুকে সাদা-পাহাড়ের চূড়োগুলো যেন ঈশ্বরের পাদস্পর্শের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সামনেই গ্লেসিয়ার বা বরফের মাঠ। ধুলো আর ময়লায় তার এমন রূপ হয়েছে যে বরফ বলে চেনাই দুষ্কর। গঙ্গার প্রায় অর্ধেকটা বুক ঢেকে দিয়েছে এই গ্লেসিয়ার।

এ' পথে যাত্রী প্রায় নেই ই, কারণ পথ তো বিপদ সংকুল বটেই। তার ওপরে এ পথে ঘোড়া বা ভাণ্ডী, কাণ্ডী, কোন কিছুই মেলে না। পুণ্য লোভাতুর বা দর্শন আকুল সমস্ত যাত্রীকেই পদব্রজে পৌঁছতে হয় গোমুখে।

পেরিয়ে এলাম চিরবাসা। সম্ভবতঃ চির গাছের আধিক্যের জন্যই এই নাম। চিরবাসায় একটি ছোট্ট লগ কেবিন থাকলেও দোকান পাট কিছুই নেই।

কুন্দন সিং জানালো যে, সামনে একটা শর্টকাট পথ আছে। তবে সে পথে আছে একটি ঝরণা। যদি জল বেশী না থাকে তাহলে সেই পথেই সে আমাদের নিয়ে যেতে চায়। আমরাও রাজী। সে-ও এগিয়ে গেল জল বেশী আছে কিনা দেখতে।

আমরা এগোচ্ছি একটু একটু ক'রে। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি সামনে আর এক দল যাত্রী। একদল বলতে ওরা চারজন। দুই বৃদ্ধ, এক কিশোর আর এক কিশোরী। তাদের পথ প্রদর্শকও গিয়েছি ঐ সংক্ষিপ্ত পথের অবস্থা জানতে। কিছুক্ষণ বাদেই কুন্দন সিং ফিরে এলো। জানালো পথ ঠিক আছে। আমরা এগিয়ে চলি। কীর্তিদা বা মিঃ লাহিড়ীকে এখনও দেখতে পাচ্ছিনা। তাঁরা বোধহয় ছবি তুলতেই ব্যস্ত। তবে আমরা পেয়েছি নতুন সঙ্গী।

ঝরণা পেরিয়ে একটা ঝুরঝুরে বালি আর পাথরের পাহাড়। তার বুকে সংকীর্ণ রাস্তা। পাহাড়ের গা আঁকড়ে ধরা যাচ্ছে না; বালি খসে পড়ছে। পায়ের নীচে থেকেও সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে বালির স্তর। শিরশির করে একটা হিমেল-স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে উঠে আসছে মাথা পর্যন্ত। তানদিকে গভীর খাদ। একবার পা ফস্কালে গঙ্গাপ্রাপ্তি অনিবার্য।

পেরিয়ে এলাম। বেঁদিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল কুন্দন সিং। এ-পথের মাধুর্যে সবাই হয় বন্ধু। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলে, শত্রু মিত্র পরিচয় ভুলে একে অপরের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। নতুবা এ দুর্গম পথে আসার সার্থকতা কই? সমতলের জীবনে কত দৈন্য, কত নীচতা, কত ভেদাভেদ। হিমালয়ের কোলে এই বারো হাজার ফুট উঁচুতে সে ভেদাভেদ আর নেই। আমরা সবাই বন্ধু; প্রকৃত অর্থে বন্ধু।

ভুজবাসা। চিরবাসা থেকে ভুজবাসা নয় কিলোমিটার। দিনের আলো ঢাকা পড়েছে মেঘের আড়ালে তাই আশ্রয়ের জন্য দ্রুত পা বাড়াই। এখানে আশ্রয় বলতে লালবাবার আশ্রম। বাবা লালবিহারী দাস।

পরণে একটা গামছা, গায়ে একটা নামাবলী। এই প্রচণ্ড শীতেও ঐ পোষাক। আমাদের দেখেই আনন্দিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন কতজন আছি। সঙ্গে সঙ্গে ছুটলেন রান্নার যোগাড় করতে। অবাক হয়ে ভাবি এই মানুষটির কথা। লালবাবার আশ্রম যদি এখানে না থাকতো তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে গোমুখ দর্শন হয়ে উঠতো অসম্ভব।

প্রথমেই চা এলো। হিমালয়ের এক বিশেষ গাছের পাতার রস-মেশানো হয় এই চায়ে। তাতে শক্তি বাড়ে; শীত কাটে। তার পরেই এলো খিচুড়ী। মনে হ'ল সে যেন অমৃত। মা অন্নপূর্ণাই যেন পুরুষের ছদ্মবেশে এখানে বসে তাঁর সন্তানদের সেবা করছেন।

* * *

বৃষ্টি নেমেছে। সেই সাথে তুষার পাত। আমরা আশ্রমের একটি ঘরে নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছি। লালবাবা রুটি নিয়ে এসেছেন। রাত্রের খাবার। চলছেন—'যে কতগুলো রুটি খাবে তাকে কতগুলো কম্বল দেব'। এ' অপূর্ব স্নেহ লালবাবা কোথায় পেলেন। গোমুখ-দর্শনের আগেই আমার দেখা হয়ে গেল অপূর্ব স্নেহ আর প্রেমের এক উৎস ধারা। প্রণাম করি

লালবাবাকে ! প্রকৃতির এই নীরব সান্নিধ্যেই তিনি আশ্রিত মানুষের সেবা করে ঈশ্বরসেবার মুখ উপলব্ধি করছেন।

পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়েছি। তিনকিলোমিটার মাত্র পথ। কিন্তু কোথায় গোমুখ। গোমুখ বলে চেনবার উপায় নেই। V-আকৃতির একটা মুখ আছে বটে। আর রয়েছে বিরাট বরফের দেওয়াল। সেই বরফ গলেই জন্ম নিচ্ছেন পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী গঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য উৎপত্তির ক্ষণেই তার জল ঘোলাটে কেন ?

ঐ দূরে শিবলিঙ্গ-পাহাড়। দুর্গমতা আর দুরধিগম্যতার প্রতীক হয়ে আজও সে অপরাজেয়। শুভ্র-তুষারে আবৃত।

আমরা এগিয়ে গেলাম গঙ্গোত্রী হিমবাহ স্পর্শ করার জন্য। তারপর। তারপর ফিরে চললাম।

ফেরার পথে পেছনে তাকাতে নেই। জড়িয়ে পড়তে নেই মায়ার বন্ধনে। তবু তাকাচ্ছি। কে যেন আকর্ষণ করছে। সে কি ঐ ক্ষণিকের দেখা ! গোমুখী না কি বাবা লালবিহারী দাস ? তবে গঙ্গার সাথে সম্পর্ক আমাদের চিরদিনের। জীবনের শেষের পরেও এই পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরেই আমাদের দেহ মিশে যাবে পঞ্চভূতে আর লালবাবা। তাঁর অমর কীর্তি কি আমাদেরকে এতটুকুও অনুপ্রাণিত করবে না ? গঙ্গা যেমন অরুণ ধারায় স্নেহ সিঞ্চন করে চলেছে, লালবাবাও তেমনি তার কোলে বসে কোন প্রতিদান পিয়াসী না হয়ে অপূর্ব মনের প্রেমের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। এ' দুই ধারায় স্নাত হয়ে আমরা ধন্য। হাজার মানুষের ভীড়ে যে মন খুঁজে ফিরি তার একটির বোধদয় আজ সন্ধান পেলাম।

●

ভাবনা

হাসিরাশি দেবী

একতারাটা যখন আমার
তোমার সুরে ভরিয়ে তুলে
সকল ভুলে
ভাবতে থাকি
রুদ্ধ ঘরের আড়াল এবার
নিজের হাতে খুলবে নাকি
এখন তুমি খুলবে নাকি।
দিনের আলো চারিদিকে
কি জানি কি ব'লছে লিখে,
গন্ধ তারই মাঝ হওয়ায়
ঐ যে ফোটা প্রথম ফুলে,
তাইতো ভাবি সকল ভুলে।

একতারাটা যখন আমার
বাজিয়ে তোলো আপন সুরে
ঘুরে ঘুরে,—
কেমন ক'রে মিলবে তোমায়
আপন ব'লে চেনার দাবি।
এই কথাটি কেবল ভাবি।

ভিক্ষা ঝুলি কেন আমার,
এমন ক'রে হয় যে ভার।
কোথায় ফেলি—বন্ধ ক'রে
স্মৃতির ঘরে কুলুপ চাবি,
এই কথাটি কেবল ভাবি।

॥ দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলায় ভাস্কর্য ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

ভারতের ইতিহাসে বহু ভাস্কর্য, স্থাপত্য, ও শিল্পকলার কাহিনী দেখিতে পাই। ভারতের দক্ষিণে এক চমকপ্রদ শিল্পসৃষ্টির দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ও স্থাপত্য ভারত-সভ্যতার এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণ-ভারতে কোথাও আছে গুহা-মন্দির, পাথরের ভাস্কর্য, ধাতব-ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির অপূর্ব নিদর্শন এবং আছে মনোমুগ্ধকর চিত্রকলার অভিনব সৃষ্টি।

এই সকল অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসবিশ্রুত নৃপতিগণের রাজত্বের গোড়াপত্তন ও বিস্তারকাহিনী। এইসব শিল্পকলার মধ্য দিয়া শাসনকর্মের সঙ্গে তাঁহারা উদার মনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্যরূপ স্থাপত্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তযুগের শিল্পসৃষ্টির প্রভাব দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক ও তাহার কাছাকাছি স্থানগুলিতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। যেমন দেখা যায়, চালুক্যবংশীয় রাজারা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি-পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের সৃষ্ট মন্দিরগুলির মধ্যে বাদামী, আইহোল, মহাকুটেশ্বর ও পট্টডকল প্রভৃতি মহিমময় নিদর্শন আজিও বিরাজিত। ঐ সকল গুহামন্দিরগুলির শিল্পসৌন্দর্য দেখিলে বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়। দক্ষিণ-ভারতে চালুক্য-রাজাদের রাজত্বের কালে স্থাপত্য ও শিল্পকলায় উত্তর ও দক্ষিণী উভয় রীতির সংমিশ্রণ সেইযুগের মন্দিরের গঠনপ্রণালীতে লক্ষ্য করার বিষয়।

অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে বোম্বাই-শহরের ছয় মাইল পশ্চিমে সমুদ্রের মধ্যে এলিফান্টা-দ্বীপ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ঐ দ্বীপে উচ্চ পাহাড়ের উপরে এলিফান্টা-গুহা অবস্থিত। ঐ গুহার গর্ভগৃহের ভিতরে বিশ্ববিখ্যাত শিবের ত্রিমূর্তি আপন মহিমায় বিরাজ করিতেছে। ঐখানে শিবের সদ্যজাত, অঘোর ও বামদেব এই তিন রূপের মুখের অভিব্যক্তি অতুলনীয়। ত্রিমূর্তির রূপ ধ্যানী, হাস্যময় ও রুদ্র। ঐ ত্রিমূর্তির বিকাশ ও অপরূপ অভিব্যক্তি স্বচক্ষে না দেখিলে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। চক্ষুষ্মান শিল্পীর হস্তে নিখুঁত খোদাইয়ের কাজ কঠিন প্রস্তরের গাত্রে কমনীয় ভাব সৃষ্টি করিয়াছে।

অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য-অঞ্চল রাষ্ট্রকূট-রাজাদের হস্তগত হয়। এই রাষ্ট্রকূট-নৃপতিবর্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দিরে সীতাহরণ, রাবণের কৈলাসপর্বতধারণ ও অপরূপ নৃত্যের ভঙ্গীতে অষ্টভুজ-শিবের মূর্তি। ঐগুলির ভাস্কর্যকলার নিদর্শন দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। শিল্পীদের স্থাপত্য-পরিকল্পনা অত্যদ্ভুত। যেমন একটি বিরাট পাহাড়কে নিপুণভাবে খোদাই করিয়া একটি বিশাল মন্দিরে পরিণত করা হইয়াছে। তাহাছাড়া ইলোরার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-কলার নিদর্শন দেখিলে মনে হয় ঐ বিস্ময়বিমুগ্ধকর নিদর্শনের তুলনা করার কিছু নাই।

গুপ্তযুগে শিল্পকলা ও চিত্রকলা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমেই মনে পড়ে বিশ্ব-বিখ্যাত অজন্তাগুহার কথা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ঐ অজন্তার ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও শিল্পকীর্তি-সম্বন্ধে

অনেক-কিছু জানিতে পারা যায়, কেননা অজন্তায় যেমন আছে ভাস্কর্যের ও স্থাপত্যের সৌন্দর্য, তেমনি আছে বিস্ময়কর রঙ ও তুলি দিয়া চিত্র-অঙ্কনের এক অভিনব অপার্থিব শিল্পমনের পরিকল্পনা ও সৃষ্টি। অজন্তার গুহাগুলিতে শিল্পের তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য, রেখাচিত্র বা রঙ-তুলির ব্যবহার। অজন্তায় উনত্রিশটি গুহা আছে। তাহাদের মধ্যে চারটি চৈত্য ও অন্যগুলি বৌদ্ধবিহার। আবার প্রত্যেকটি গুহাতে চিত্রমালা ও রঙ-রেখার কৌশল দেখিলে শিল্পীর উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধ-জাতকের চিত্রগুলি সেইযুগের এক চমৎকার কলার নিদর্শন। কলাকৌশলপূর্ণ চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে একটি বিষয়ে বেশ আশ্চর্য লাগে যে, চিত্রগুলিতে যে রঙের ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা বেশ হালকা ও ফিকে-রঙের। অজন্তার রঙ-তুলির সাহায্যে চিত্র-অঙ্কনের অপরূপ পদ্ধতির ও ভঙ্গীর ব্যবহার বোধহয় ভারতেই প্রথম। বিশেষ করিয়া পাথরের গাত্রে সুনিপুণভাবে রঙ-তুলির দ্বারা চিত্রিত ছবি দেখা যায়। ঐ সকল চিত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় লতাপাতা, রাজাদের জীবন-যাত্রার কাহিনী, রাজসভা, যুদ্ধযাত্রা, সমুদ্রযাত্রা, পদ্মফুল, বিভিন্ন পাতা ও ফুলের কুঁড়ি। আরও কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র হইতেছে পদ্মপাণি, গন্ধর্বদম্পতি, আশীর্বাদপ্রার্থী মাতা ও পুত্র, রাণীর প্রসাধন, ছাদের অলংকরণের একাংশ ও রাজকীয় শোভাযাত্রার অপরূপ দৃশ্য প্রভৃতি। ঐসকল চিত্রে রঙের উজ্জ্বলতায় ও সঙ্গে সঙ্গে রেখার সাবলীলতায় গতি ও ভাব আলোছায়ার সংমিশ্রণে প্রত্যেকটি প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগের প্রাণোচ্ছল জীবন্ত ও সাবলীল স্বচ্ছন্দ প্রকাশকে বজায় রাখিতে সকল দিক দিয়া শিল্পদৃষ্টি কৃতকার্য হইয়াছে—যাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত না হইয়া পারা যায় না। যদিও বর্তমানে কিছু কিছু চিত্রে রঙের প্রকাশ ও ঔজ্জ্বল্য কিছুটা মলিন হইয়া গিয়াছে, তথাপি তাহারা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। তাই দেখিলে একথাই মনে হয় যে, অতীতে ভারতবর্ষে বহু সুনিপুণ শিল্পীদের জন্ম হইয়াছিল ও শিল্পজগতে তাঁহারা তাঁহাদের সার্থক সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণ-ভারতে পল্লব-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও এক মহৎ শিল্পকলার সৃষ্টি হইয়াছিল। পল্লব-রাজাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্যের সৃষ্টিগুলি সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গাত্রে খোদিত মন্দিরে ভাস্কর্যকলার সৌন্দর্যের সাক্ষ্য বহন করিয়া চলিতেছে। স্থানটি মল্লপুরম বা মহাবলিপুরম নামে পরিচিত। পল্লব-রাজাদের রাজত্বকালে ঐ স্থান দিয়া একটি স্রোতস্বিনী বহিয়া যাইত এবং সেই সঙ্গে ঐখানে একটি সুন্দর জনপদও গড়িয়া উঠিয়াছিল। শোনা যায়, ঐ স্থানটি বন্দর-হিসাবেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঐস্থানে সমুদ্রসংলগ্ন পোতাশ্রয় থাকায় জন্য পল্লব-শিল্পকলায় ভারতের শিল্পধারা পরবর্তীকালে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। আজিও দেখা যায় সেইখানে বৃহৎ-আকারে একটি 'লাইট-হাউস'।

পল্লব-রাজাদের মন্দিরের সৃষ্টিশৈলীর মূল-উৎস 'রথম্'—যাহা 'রথ' নামে পরিচিত। মহাবলি-পুরমের রথগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হইল বিশাল একটি পাথর কাটিয়া মন্দিরে পরিণত করার প্রচেষ্টাসহ অপূর্ব পদ্ধতি। আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল পাহাড়ের বহির্ভাগ খোদাই করিয়া ভাস্কর্য-শিল্পের নিদর্শন তুলিয়া ধরা—যাহা সেইখানকার অমর-কীর্তিগুলির অতীত স্মৃতি বহন করিয়া

চলিয়াছে। পল্লবরাজ নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকালে মহাবলিপুরমের মণ্ডপগুলির মধ্যে কি যে নিখুঁত ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তাহা অবর্ণনীয়। যেমন আছে বরাহের ও মহিষাসুরের প্রাণময় জীবন্ত ভাস্কর্য, আর চতুর্দিকে আছে দেওয়ালে লম্বা লম্বা কুলুঙ্গী ও তাহাদিগের পার্শ্বে পার্শ্বে বিচিত্র রকমে খোদাই-করা অলংকরণ। শিল্পীরা ঐখানে দৈনন্দিন সমাজ-জীবনের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। এই বিশাল বিশ্বে তাঁহারা যে অপূর্ব শিল্প সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা কালজয়ী হইয়াই রহিয়াছে। তাহা ছাড়া বহু পৌরাণিক চিত্রও রহিয়াছে—যেমন দেবী দুর্গার মহিষাসুরঘাতিনী মূর্তি, অষ্টভুজা-সিংহবাহিনীর মূর্তি প্রভৃতি। সিংহবাহিনী-মূর্তিটিতে বীরত্বের ভাব সুস্পষ্ট। ভীষণ আকারে গদাধারী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী, আবার তাহার পার্শ্বে বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণের গো-দোহনের চিত্র। তাহাতে শাবকের প্রতি গাভীর মমতা ও বাৎসল্যের ভাব শিল্পীর সুনিপুণ হস্তে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। মহাবলিপুরমের আরেকদিকের দৃশ্য দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং সেইটি হইল একটি বিশাল পাহাড়ের গাত্রে গঙ্গাবতরণের মনোরম দৃশ্য। নাগ-নাগিনীরা যুক্তহস্তে গঙ্গার তরঙ্গে যেন ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশে বাতাসবাহী দেব-দেবীরা, অপূর্বদৃশ্যপূর্ণ গন্ধর্বগণ, অরণ্যের পশু, মৃগ ও হস্তীযুথ এবং তাহারা শাবকগণকে সঙ্গে লইয়া চলিতেছে, আর এক ঋষি বসিয়াছেন দেবী গঙ্গার পূজায়। শিল্পীরা এই প্রত্যেকটি বিষয় এতই নিখুঁতভাবে তাঁহাদিগের ভাস্কর্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন যে, আজিও প্রতিটি বিষয়বস্তুর ভাবভঙ্গি প্রাণবন্ত হইয়া আছে। আর আছে এক অপূর্ব সৃষ্টি—বানর-পরিবার। বানর বানরীর মস্তক হইতে উকুন বাছিয়া দিতেছে অতি-যত্নে ও অতি-সন্তর্পণে। প্রস্তরের গাত্রে তাহার অপূর্ব দৃশ্য অঙ্কিত। মাতা, পিতা ও শিশু-শাবক মার কোলে মাথা রাখিয়া নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিয়াছে এবং শিশু-শাবকের প্রতি মাতা-পিতার স্নেহের ভাব ও অপূর্ব ভালবাসা ভাস্কর্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে একান্ত কমনীয়তার ও প্রেমের নিদর্শন সৃষ্টি করিয়া—যাহার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া যায় না, একমাত্র ভারতবর্ষের ভাস্কর্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাভারত-সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই কিছু কিছু জানা আছে। মহাভারতে পঞ্চপাণ্ডবের নামানুসারে পাঁচটি রথম্ বা রথ, আর বহু রথ-মন্দির মহাবলিপুরমের চারিদিকে আছে। তাহাদের স্থাপত্য মহাবলিপুরমের ঐতিহাসিক মাধুর্য ও মূল্যকে আরও বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেকটি রথ বা মন্দির এক একটি বিশাল পাথর কাটিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি রথের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে—যেমন ধর্মরাজ-রথ, ভীম-রথ, অর্জুন-রথ, সহদেব-রথ, গণেশ-রথ, আর আছে দ্রৌপদী-রথ। দ্রৌপদী-রথের গঠনভঙ্গি একটু বিশেষ ধরনের। সবগুলি রথ বা মন্দিরের চারিদিকের দেওয়ালে অনেক সুন্দর সুন্দর নর-নারীদের অপরূপ লাবণ্যময়ী মূর্তির নিদর্শন ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে শোভামণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। আরও দুইটি রথ আছে এবং সেইদুইটি বর্তমানে সমুদ্রগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। মহাবলিপুরমের সুদৃশ্য ভাস্কর্য দেখিলে তদানীন্তন সমাজের শিল্পীরা যে কত সুদক্ষ কারিগর ছিলেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শিল্পীরা দেহগঠন ও দেহভঙ্গিমার রূপায়ণে সহজ দীর্ঘায়ত ও লাবণ্যযুক্ত ছন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। মহাবলিপুরমের এই স্থাপত্য অনেকাংশই বালির ঝড়ে, সমুদ্রের বাতাসে ও বৃষ্টিতে বিনষ্ট

হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন নারীমূর্তির ও মদের গায়ে যেইসব ভাস্কর্য রহিয়াছে তাহাদের মস্তকগুলি অনেকাংশে করিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের সাধারণ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই।

সমুদ্রতীরে আজিও দুইটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়—যে'দুইটি দেখিলে মনে হয় যে, শিব ও বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ঐ মন্দিরদুইটি স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাদের গায়েও বহু ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল সুন্দর ভাস্কর্য ভারতের ইতিহাসে ও ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লব-রাজাদের এক উজ্জ্বল কীর্তির স্বাক্ষর রক্ষিত আছে। এইভাবে দক্ষিণ-ভারতের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ধারা উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন বহু পল্লবনৃপতি।

সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্র বর্মন বিচিত্রচিত্ত পল্লব-রাজাদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা প্রতিভাবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই নৃপতি ছিলেন একাধারে সুনিপুণ চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ ও সুরসিক সাহিত্যিকরূপে প্রসিদ্ধ। তিনি নূতন নূতন ধরনের বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারই রাজত্বকালে ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব-সম্বন্ধে পর্যটকগণের প্রশংসাসূচক বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সেইজন্য বলিতে হয় যে, পল্লব-নৃপতিরা তদানীন্তন সমাজের ও শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করিয়া ইতিহাসে আজিও অমর হইয়া আছেন।

পল্লব-রাজাদের সময়ে দক্ষিণ-ভারতে নিজস্ব শিল্পরীতির যে একটি নিদর্শন দেখা যায় তাহা চোল-রাজাদের সময়ে আরও উন্নত হইয়া সৌন্দর্যের চরমশিখরে উত্থিত হইয়াছিল। অর্থ-নৈতিক ব্যাপারেও চোল-রাজারা ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। ভারতের বাহিরে ও ভিতরে সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের রাজ্য বিস্তারে ও তাঁহারা ছিলেন অধিতীয়। চোল-রাজারাও বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে চোল-রাজাদের স্থাপত্যকীর্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বরের মন্দির। পরাক্রান্ত চোল-রাজারা একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরটি যেন উচ্চ ও বৃহদাকারে নির্মিত। তাহার শিখরে সুন্দর ও বিরাট একটি পাথরে খোদিত সুদর্শন অলংকরণরূপে বিরাজিত। মন্দিরের প্রাঙ্গনে উচ্চ বেদীর উপরে একটি বিশাল শিববাহন ষাঁড়ের মূর্তি বসা-অবস্থায় দেবতার দিকে মুখ করিয়া বসানো আছে। মন্দিরের বাহিরের দিকে দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো স্তম্ভ এবং কার্নিশের মধ্যে নানারকম পুরাণের শিবলীলার কাহিনী নিপুণভাবে খোদিত করা আছে। জানিতে পারা যায় যে, ঐ বৃহদীশ্বর-মন্দির নির্মিত হওয়ার প্রায় একশো বৎসর পরে 'সুব্রহ্মণ্যম্' বা কার্তিকের মন্দিরটি নির্মাণ করা হইয়াছিল। তাহার গঠন-সৌন্দর্য ও পরিকল্পনা অতীব মনোহর। এতদ্ব্যতীত আর একটি জিনিস চক্ষে পড়ে যে, চোল-রাজাদের রাজত্বকালেই অন্যান্য শিল্পকলার মধ্যে ধাতুর মূর্তি শিল্পীদের হস্তে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেখানে বহু নরনারীর লাবণ্যপূর্ণ ভাবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর দেখা যায় নটরাজ-শিব, পার্বতী ও তাঁহাদিগের ভক্ত সুন্দরস্বামী, বহু দেবদেবীর মূর্তি ও সাধুদিগের মূর্তি। কঠিন ধাতুর তৈয়ারী মূর্তিগুলির দেহগঠন, লাবণ্যময় ভাব ও কমনীয়তা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। প্রতিটি মূর্তি

দেখিতে দেখিতে মনে হয় কিভাবে জীবনের গভীর উপলব্ধি দিয়া শিল্পীরা তাঁহাদিগের সুনিপুণ হস্তে সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে ঐগুলি তৈয়ারী করিয়াছিলেন। অতুলনীয় ঐ ভাস্কর্যের নিদর্শন মাদ্রাজ-সংগ্রহশালায় ও তাঞ্জোরের শিল্প-সংরক্ষণাগারে সংগৃহিত আছে।

পাণ্ড্য-রাজাদের শিল্পকথা-সম্বন্ধে জানিতে হইলে মেগাস্থেনিসের বিবরণ আমাদের পাঠ করা উচিত। প্রাচীন মাদুরা তখন ছিল তাঁহাদিগের রাজধানী। পাণ্ড্য-রাজারা তখন অবশ্য নূতন মন্দির অধিক নির্মাণ করেন নাই। তবে তাঁহাদিগের প্রচেষ্টা ছিল মন্দিরের প্রবেশদ্বার, গোপুরমে উন্নতি সাধন করা। অপরিসীম উন্নতি করিয়াছিলেন এই পাণ্ড্য-রাজারা। পাণ্ড্য-রাজাদের শিল্পকলার মধ্যে পল্লব-শিল্পকলার প্রভাবও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগের ভাস্কর্যের মধ্যে চালুক্যপ্রভাবও প্রচুর দেখতে পাওয়া যায় মাদুরায় বেশীর ভাগ। মাদুরায় রামনাথপুরম, তিরুনেলভেলি, কন্যাকুমারী[১] ও ত্রিবান্দ্রম উল্লেখযোগ্য। সেখানকার মন্দিরগুলি অধিকাংশ দেবতাদের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হইয়াছিল—যেমন, শিব, বিষ্ণু, নরসিংহ, সুব্রহ্মণ্য প্রভৃতি দেবতার মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে পাণ্ড্য-রাজাদের রাজত্বকাল প্রায় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। পাণ্ড্য-রাজারা বহু মন্দিরের গোপুরম তৈয়ারী করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদিগের নির্মিত গোপুরমের সেইরকম বিস্ময়কর কোন কারুকার্যের বাহুল্য ছিল না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে পাণ্ড্য-রাজাদের খ্যাতিমান রাজা ছিলেন জাতবর্মন-সুন্দরপাণ্ড্য। ইনি সেই সময়ে দুইটি সুবর্ণনির্মিত শিখরযুক্ত বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করিয়া ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। ঐ দুইটি মন্দিরের মধ্যে একটি শ্রীরঙ্গমের অনন্তশায়ী বিষ্ণু-মন্দির ও অপরটি চিদম্বরমের নটরাজ-শিবের মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীর শ্রীরঙ্গমের জম্বুকেশর-মন্দিরে হাজার স্তম্ভযুক্ত ঘোড়ামুখিতে খোদিত কারুকার্য দৃষ্টিগোচর হয়। বহু মণ্ডপ ও অলিন্দ অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়া বর্তমান আছে—যাহা আজিও বিশ্ববিখ্যাত। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে মাদুরায় সর্বশেষ নায়কবংশীয় নৃপতিরা রাজত্ব করিতেন। নায়ক-নৃপতিদিগের কীর্তি মাদুরাই, রামেশ্বরম প্রভৃতি বহু মন্দির আজিও দক্ষিণ-ভারতের শোভা বর্ধন করিতেছে। রামেশ্বরম-মন্দিরটি সুদৃশ্য ও সুন্দর। মন্দিরের চারিটি 'গোপুরম' আছে এবং তাহার চত্বরেও বহু শিল্পকীর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বদিকের গোপুরমটি ১৭০ ফুট উচ্চ এবং হাজার স্তম্ভযুক্ত উহার বিরাট অলিন্দ বিশ্ব-

---

১। ভগবতী কন্যাকুমারীর মন্দিরটি বহু প্রাচীন। কন্যাকুমারীর পবিত্র উপনিষদে ও মহাভারতে উল্লেখ আছে। কন্যাকুমারীর মন্দিরটি এই ভারতবর্ষের একেবারে শেষ-সীমানায় কুমারীকা-অন্তরীপে অবস্থিত। ইহার তিনদিকে সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত, সেইজন্য এই মন্দিরের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, ঐ সমুদ্রের জলরাশি তাহার পবিত্র পদযুগল ধৌত করিতেছে। পূর্বে বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও পশ্চিমে আরবসাগর। কন্যাকুমারীর মন্দিরটি ষোলটি স্তম্ভবিশিষ্ট মণ্ডপ, সম্মুখে স্নানের ঘাট ও সেখানেই বিশ্ববিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দের তপস্যার স্থান। ঐখানেই সমুদ্রে দাঁড়াইয়া পূর্ণিমায় একই সময়ে সূর্যাস্ত এবং চন্দ্রোদয় দেখা যায়। ভারতবর্ষে ইহাই একমাত্র স্থান। ইহার সম্বন্ধে পৌরাণিক বহু গল্প প্রচলিত আছে।

বিখ্যাত। ঐ মন্দিরে অপরাপর মন্দিরের ন্যায় অলংকরণ ও ভাস্কর্য অধিক নাই। তবে বাহ্য-ঐশ্বর্য-বিহীন হইয়াও তপস্যায় রত দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শিব-মন্দিরটি ভাবে ও গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ হইয়া বর্তমান আছে। রামেশ্বরমের পৌরাণিক উপাখ্যানে পাওয়া যায় যে, রামচন্দ্র ঐস্থানে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করেন এবং 'রামেশ্বরম্-শিব' গঠন করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। ধনুষ্কোটির নিকটেই বর্তমানে প্রকৃতির তাণ্ডবলীলায় সকল-কিছুই সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

শিল্পের অবদানক্ষেত্রে কেরলেরও একটি বিশেষ দিক আছে। কেরলে শিল্পসৌন্দর্যপূর্ণ বহু মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় পাথরের দেওয়ালের সঙ্গে কাঠের তৈয়ারী ছাদের ব্যবহার। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে সুচীন্দ্রমের শিব-মন্দির, সপ্তদশ শতকে নির্মিত পদ্মনাভ-স্বামী-মন্দির প্রভৃতির একান্ত সুষমাযুক্ত গোপুরমের জন্য বিখ্যাত। সুচীন্দ্রমের শিব-মন্দিরের মধ্যে মহাবীর হনুমানের যে বিখ্যাত মূর্তি আছে তাহা যেমন বিকট তেমনি সুন্দর ও মহান। ইহার শরীরের গঠন মানুষের মতো, কেবল মুখটি বানরের ন্যায়। ঐ মহাবীরের মূর্তিটি দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহার শিল্পী কিভাবে ঐ মহাবীরের মূর্তিটিতে ভক্তিভাবের প্রকাশকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—সত্যই যাহার তুলনা মেলে না। তাহা ছাড়া দক্ষিণ-ভারতের সকল মন্দিরেই দেখিতে পাওয়া যায় সর্বত্র দেবদেবীকে বহন করার জন্য অপূর্ব কারুকার্যপূর্ণ কাঠের তৈয়ারী রথের নিদর্শন।

মাদুরায় নায়ক-রাজাদের আরও একটি অপূর্ব কীর্তি দেবী মীণাক্ষীর মন্দির। ঐ মীণাক্ষীদেবীর মন্দিরটি বহু স্তম্ভ, তোরণদ্বার ও বহু পুষ্করিণীশোভিত। তাহা ছাড়া বহু কারুকার্য-করা স্তম্ভের সারি, আচ্ছাদিত মণ্ডপ এবং প্রমাণ-মানুষের মূর্তি-শোভিত। ঐ মন্দিরে সর্বশুদ্ধ এগারোটি গোপুরম। তাহাদিগের মধ্যে দক্ষিণের গোপুরমটি সকলের অপেক্ষা উচ্চ এবং অতিশয় সুন্দর কারুকার্যশোভিত। উহার গোপুরমটি উচ্চে প্রসারিত হওয়ার রীতিও একটু বিশেষ ধরনের, কেননা শিখরটি ক্রমে ক্রমে ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া উচ্চে প্রসারিত। উহার প্রতিটি স্তম্ভ বিচিত্র রকমের কারুকার্যে শোভিত এবং অসংখ্য ধরনের মূর্তি তাহাতে খোদিত: কোথাও আছে গজসিংহের স্তম্ভ, কোথাও ময়ূরবাহিনী নারীমূর্তি, কোথাও বা আবার দশমুণ্ড-রাবণের মাথায় কৈলাসপর্বতসমেত উমামহেশ্বর মূর্তি। আবার আছে নটরাজ শিবের নৃত্যলীলা। দেওয়ালে হর-পার্বতী-লীলার মূর্তি দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয় এবং মনে হয় শিল্পীর চিন্তাধারা ধ্যানঘন ভাব ও দৃষ্টি নিহিত।

●

॥ জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা ॥

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

নির্বিকারচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব। ভাবই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূল। ভাব হইতে বর্ণ (রূপময় জগৎ); বর্ণ হইতে কর্ম, কর্ম হইতে শরীর। শারীরিক ও মানসিক যাবতীয় কর্মই বহির্লক্ষ্য ও অন্তর্লক্ষ্য। প্রথমে উহা সবিশেষ-ব্রহ্মের সংকল্প হইতে সমুদ্ভূত। উহাই স্থূল ও সূক্ষ্মরূপে অভিহিত। আবার সংকল্পী-মন নামেও প্রসিদ্ধ। ঐ মনই পরমাপ্রকৃতি শক্তি। এই পরমাপ্রকৃতি হইতেই আবার অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত। ইহাকে কারণ-স্বরূপও বলা হয়। উক্ত সবিশেষ মন বা চৈতন্য-ব্রহ্মপ্রসূতা কারণস্বরূপা ভাবময়ী পরমাশক্তি বৈচিত্র্যহেতু সহকারী-কারণস্বরূপ অবিদ্যা-মোহিনী নাম্নী একটি মায়ার সৃষ্টি করেন। প্রাণী মাত্রেই উক্ত অবিদ্যা বা মায়ার বিমোহিত-হেতু আত্মবিস্মৃত হইয়া জন্মজন্মান্তর লাভ করিয়া নানা প্রকার যাতনা-স্বরূপ ঘোর অশান্তি ভোগ করিতেছে। এই অবিদ্যা-বিমোহিত মানবের একই অন্তঃকরণ সংকল্প-বিকল্প-জড়িত থাকে বলিয়া 'মন', চিন্তন করে বলিয়া 'চিত্ত', নিশ্চয় করে বলিয়া 'বুদ্ধি', অভিমান করে বলিয়া 'অহংকার' নামে অন্তরেন্দ্রিয় বলিয়া কথিত। উক্ত চিত্তোপাধিই সকল অনর্থের মূল। উহা নানা প্রকার চিন্তাজালে নিরন্তর জড়িত। সুতরাং প্রথমেই উহাকে নিজ বশে রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এখন বোঝা যাইতেছে যে, মন বা চিত্তই জীবাত্মার অনর্থদায়ক একটি উপাধি-বিশেষ। কূটস্থ-চৈতন্যে বা নির্বিকার-আত্মায় ঐ চিত্তকে সমাবিষ্ট করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়, অর্থাৎ চিত্তোপাধি নষ্ট হইয়া থাকে। ভ্রান্তিবদ্ধহেতু জীবাত্মা বহু জন্ম-জন্মান্তর হইতে বহির্মুখ বাহ্যেন্দ্রিয় সুখ-লালসায় পুনঃপুনঃ সংস্কারযুক্ত অথবা প্রকৃতিগত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং 'প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহ কিং করিষ্যতি'। অনেকেই উপবাসাদি বাহ্যাদির নিষ্ঠা ও সদাচার-পরায়ণ হইয়া বহু দিবস অতিবাহিত করিলেও কূটস্থ নির্বিকার অবস্থায় অবস্থান করিতে পারেন নাই বলিয়া চিত্তের চঞ্চলবৃত্তিও নষ্ট হয় না। পরিশেষে উৎসাহবিহীন হইয়া কর্মপঙ্গু হইয়া পড়েন।

প্রমাণ আছে যে, মোহিনী-মায়া শব্দ, রূপ বশম্বিনী। বিবিধ প্রকার জাগতিক শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি-রূপে সম্মিলিতা হইয়া চিত্তকে চঞ্চল করাইয়া থাকে। ক্রমে তাহারা অত্যন্ত প্রীতিকর হইয়া উঠে। সুতরাং রূপ-রসাদি-ভোগের পুনঃপুনঃ অভ্যাস-হেতু সংস্কাররূপে অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা ও বর্তমানের কর্ম-বিচারের অবস্থার সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে। এই অবস্থার নাম সম্পূর্ণ বদ্ধাবস্থা। সংসারে এরূপ জীবের সংখ্যাই অধিক। তবে যাঁহারা একান্ত আন্তরিকভাবে তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছু হইয়া ইষ্টনিষ্ঠা ও যাবতীয় কর্ম ভগবৎচরণে কায়মনোবাক্যে বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য হইয়াছেন। মান, অপমান, হানি, লাভ, জয়, পরাজয়, শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ সকলই তাঁহার কাছে সমান। এরূপ লক্ষণযুক্ত মানুষকে প্রকৃত নিরভিমানী বলা যায়। সদ্‌গুরুর কৃপায় অভ্যাসযোগ দ্বারা সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করিতে পারিলে পরিশেষে অবশ্যই তাঁহারা অবিদ্যাদি মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বরূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হন। ইহারাই মুক্তাবস্থার অধিকারী। শাস্ত্র

ইহাদিগকেই 'জীবন্মুক্ত' আখ্যা দিয়াছেন। এরূপ আত্মসমর্পণই অদ্বৈত-অবস্থার নামান্তর। অন্যভাবে বলা যায়, পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের অর্থই হইল আত্মসত্তায় 'অহং' বৃত্তির বিলয় ঘটানো।

"It is to merge in the source of ego. The ego is surrendered to the *self*".[১]

"In surrender there is Advaita. * * * Surrender appears easy because people imagine that once they say with their lips "I surrender" and put their burdens on the Lord, they can be free and do what they like. But the fact is that no like or dislikes after your surrender. You should become completely non-existent, the Lord's will taking place. Such death of ego is nothing different from Jnani".[২]

অর্থাৎ পূর্ণ-আত্মসমর্পণই অদ্বৈত-অবস্থা। লোকে আত্মসমর্পণ সহজ মনে করে—কারণ সে ভাবে মুখে একবার 'আত্মসমর্পণ' করিয়াছি বলিলেই ভগবান তাহার সমুদয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সে এখন স্বাধীন বা ইচ্ছামত যাহা কিছু করিতে পারে। কিন্তু প্রকৃত আত্মসমর্পণের পর ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই থাকিতে পারেনা। তিনি তখন সম্পূর্ণ কর্তৃত্বহীন হইয়া পড়েন। ঈশ্বরেচ্ছাই তৎস্থলবর্তী হয়। যে ব্যক্তির 'অহং'-বৃত্তির এরূপ বিলোপ ঘটিয়াছে তাহার সঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তির (আত্মজ্ঞানী) আর প্রভেদ কোথায় ?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে গিরিশচন্দ্রের 'ম'-কলমা দেওয়ার কথা। গিরিশচন্দ্রের উক্তি : 'ম'-কলমা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি বুঝেছি। এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপ-রূপ কাজের একটা সময়ের অন্ত আছে। কিন্তু যে 'ম'-কলমা দিয়েছে তার কাজের অন্ত নাই। তাকে প্রতিপদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি নিঃশ্বাসটি ফেললে না এই ইতচ্ছাড়া "আমি"-টার জোরে সেটি করল"।[৩]

আসলে কিন্তু দ্বৈত, অদ্বৈত, বন্ধন, মুক্তি এসব কিছুই নাই। দেশকালাবচ্ছিন্ন এক নিরুপাধিক, অখণ্ড, অচিন্ত্য-অনন্তসত্তা অবিকৃতভাবে নিত্য বিরাজিত। সাধকগণ তাঁহাদের উপলব্ধির তারতম্য বুঝাইতে গিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সেই অনন্ত-সত্তার যে সব অনুভূতি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন তাহারই ব্যাখ্যা দার্শনিক মতবাদে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি নানা নামে আখ্যাত হইয়াছে।

"In the reality, there is neither Dvaita nor Advaita, but *That* which is, is * * The real is ever as it is. * * Nothing exists except the one reality".[৪]

১। Talks with Ramana Maharsi, p. 168.

২। Day by Day with Bhagavan (Ramana Maharsi), p. 92.

৩। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ (পূর্বার্ধ), পৃঃ ৯।

৪। Day by Day with Bhagavan (Ramana Maharsi).

অর্থাৎ চরম সত্তায় দ্বৈত বা অদ্বৈত কিছুই নাই। এক সৎবস্তুই সমভাবে চিরবিরাজিত।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের একটি উক্তি : "তারপর মন লয় হয়ে যায়। তারপর নির্বিকল্প। তারপর আরও এগিয়ে কি যে তা মুখে বলা যায় না। সেখানে দেখা নাই, শোনা নাই—অনন্ত। অনন্ত॥ এ সবই অবস্থার কথা। • • দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতং"।[৫] আর-বন্ধন মুক্তি সম্বন্ধে বলা যায়—

"Mukti is not anything to be attaind. It is our real nature. We are always that. It is so long as one feels that he is in bondage that he has to try to get released from bondage. When a man feels that he is in bondage, he tries to find out for whom the bondage and by that enquiry he discovers there is no bondage for him but only the mind and that the mind itself disappears or proves non-existent when turned towards inward, instead of outwards towards sense-objects, it merges into its source the Self and ceases to exist as a separate entity. In that stage there is no feeling of either of bondage or liberation".[৬]

অর্থাৎ মুক্তি 'লাভ' করার কোন বস্তু নয়। এটিই আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। আমরা সর্বদাই সেই অবস্থাতেই স্থিত। কেবলমাত্র যখন কেহ অনুভব করে যে, সে বদ্ধ বা বন্ধনযুক্ত তখনই তাহাকে বন্ধনমুক্তির জন্য সচেষ্ট হইতে হয়। যখন কোন ব্যক্তি মনে করে যে সে বদ্ধ বা বন্ধনযুক্ত তখনই সে অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করে। কাহার জন্য এই বন্ধন এবং সেই অনুসন্ধিৎসার ফলেই সে আবিষ্কার করে যে তাহার কোন বন্ধন নাই—এটি মনেরই একটি অবস্থা এবং যখনই এই বহির্মুখী, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মন বহির্বিষয় হইতে অন্তর্মুখী হয় তখন তাহার উৎস সন্ধানে গিয়া এই মনের অন্তর্ধান ঘটে, বা মনের অস্তিত্ব লোপ পায়। অর্থাৎ মনের উৎপত্তিস্থল যে আত্মা সেখানেই তাহার বিলয় ঘটে—ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাষায় "বোধে বোধ হয়"। তখন তাহার আর পৃথক সত্তা থাকে না। এই অবস্থায় বন্ধন বা মুক্তির কোন অনুভূতিই থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন "মনেই বদ্ধ মনেই মুক্ত"। আবার অন্যভাবেও বলা যায় :

"Our real nature is mukti. But we are imagining we are bound and are making various strenuous attempts to become free, while we are all the while free. This will be understood only when we reach that stage. We will be surprised that we are frantically trying to attain something we have always been and are".[৭]

"আমাদের প্রকৃত সত্তাই হইল মুক্ত। কিন্তু আমরা একটি কাল্পনিক আবরণের দ্বারা মনে করিতেছি আমরা বদ্ধ বা বন্ধনযুক্ত এবং মুক্তিলাভের জন্য নানা কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছি,

৫। ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পৃঃ ২৩।
৬। Day by Day with Bhagavan (Ramana Maharsi), p. 239.
৭। Day by Day with Bhagavan (Ramana Maharsi), p. 101.

অথচ আমরা সদাই মুক্ত অবস্থায় রহিয়াছি। যখন এই অবস্থাটি অনুভব-গম্য হইবে তখন আমরাই আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিব যে আমরা যাহা ছিলাম তাহাই আছি—অথচ সেটি লাভ করিবার জন্য উন্মত্তবৎ কি প্রচেষ্টাই না করিয়াছি। একটি উদাহরণ-সহযোগে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝানো যাইতে পারে: যেমন কোন এক ব্যক্তি একটি কক্ষে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিল যে, সে দুর্গম-গিরি-কান্তার-মরু-নদী-প্রান্তর সব-কিছু অতিক্রম করিয়া বিশ্বভ্রমণান্তে শ্রান্ত পদে, ক্লান্ত দেহে পুনরায় নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। ইতিমধ্যে নিদ্রাভঙ্গে দেখে যে সে বিশ্বপরিক্রমাও করে নাই এবং শ্রান্ত-ক্লান্তও নয় বরং যে স্থানটিতে নিদ্রিত ছিল সেখানেই আছে। এক ইঞ্চিও নড়ে নাই।"

আমাদের বন্ধন ও মুক্তির ব্যাপারটিও তদ্রূপ। দুটিই স্বপ্ন। একটি ঘুমন্ত-স্বপ্ন, অপরটি জাগ্রত-স্বপ্ন। বিশ্বভ্রমণান্তে ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নভঙ্গে যেমন দেখিল সে যেখানে ছিল সেখানেই আছে। সেইরূপ আমাদের জাগ্রত-স্বপ্নও (জগৎ-ব্যাপার) যখন ভঙ্গ হইবে তখন আমরা দেখিব—যে স্বরূপেই অবস্থিত আছি—তাহা হইতে কখন বিচ্যুত হই নাই। সুতরাং বন্ধন বা মুক্তি কিছুই নাই। আমরা উভয় অবস্থারই অতীত। যদি কেহ প্রশ্ন করে—"আমরা যদি মুক্তই তবে বন্ধনের কথাই বা আমাদের মনে উদয় হয় কেন"? উত্তরে বলা যায়—"নিদ্রিত অবস্থায়ই বা কেন ঐরূপ বিশ্বপরিক্রমার কল্পনা উদয় হইল? সবই মনের অবস্থা বা মায়া।"

●

॥ শ্যামা সঙ্গীত ॥

শ্রীসুরেশ চৌধুরী

নাই বা দেখা দিলি শ্যামা
রাখিস মা তোর চরণ ছায়ায়
সব পাওয়া তো তাতেই হবে
রাখিসনি মা দুলিয়ে মায়ায়
রাখিস মা তোর চরণ ছায়ায়॥

তুই যদি চাস দেখা দিতে
চাস যদি মা কোলে নিতে
ইচ্ছে হ'লে সবই পারিস্
শুধু মাগো একটু দয়ায়
রাখিস মা তোর চরণ ছায়ায়॥

যদি মা তুই রাখিস্ চিতে
মনটি পারিস্ রাঙ্গিয়ে দিতে
দুঃখ সুখের আঁধার আলো
আসে আবার সব চলে যায়
রাখিস্ মা তোর চরণ ছায়ায়॥

।। মহাকাশ-অভিযান ।।

শ্রীমতী চামেলী বসু

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তারিখটি ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। ঐ দিন ভারত মহাকাশযুগে প্রবেশ করলো। মাদ্রাজ-সহর থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত শ্রীহরিকোটা-দ্বীপের রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র (Rocket Launching Pad) থেকে সকাল ৮টা ৪ মিনিটের সময় ভারতে তৈরী ৩৫ কেজি ওজনের ছোট্ট কৃত্রিম উপগ্রহ 'রোহিণী' ভারতীয় বিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছে। মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যে মহাকাশে উঠে পরবর্তী দেড় ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ ক'রে সে খবর পাঠাল, 'I am here', 'আমি এখানে'। সঙ্কেতটি প্রথমে কর-নিকোবরে, তারপর যথাক্রমে আমেদাবাদ, শ্রীহরিকোটা ও ত্রিবান্দ্রাম মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে গিয়ে পৌছালো। এই কৃত্রিম উপগ্রহটি (satellite) পৃথিবীকে ঘন্টায় ২৮,০০০ কি. মি. বা ১৭,৫০০ মাইল বেগে একটি উপবৃত্তাকার পথে প্রদক্ষিণ করছে এবং এই সঙ্গে নিজের মেরুদণ্ডের ওপর মিনিটে ১৬৫ বার আবর্তিত হচ্ছে। প্রতি ৯০ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ ক'রে সেটি ১২ ঘন্টা অন্তর একবার ভারতের মহাকাশে আবির্ভূত হচ্ছে এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য পরিবেশন করছে। আশা করা যায় নির্ধারিত নয়মাস কাল সে এইভাবে মহাকাশে বিচরণ ক'রে বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টাকে জয়যুক্ত করবে। 'রোহিণী' ভারতের প্রথম মহাকাশযান নয়, এর পূর্বে 'আর্যভট্ট' ও 'ভাস্কর' উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল রাশিয়ার উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে এবং গতবৎসর ১০ই আগষ্ট ভারতের মাটি থেকে যে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল, সেটি ওপরে না উঠে বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি লাভ করেছিল।

মুক্ত-বিহঙ্গের মতো আকাশপথে বিচরণ করবার স্বপ্ন মানুষ দেখেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। বিভিন্ন দেশের পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে দেবদেবী ও পরীদের এই ক্ষমতার অধিকারী মনে ক'রে অনেকের পিঠে দুটি ডানা জুড়ে ছবি আঁকা হয়, যেমন বাইবেলের দেবদূত, রূপকথার পরী ইত্যাদি। বস্তুতঃ আকাশে উঠতে হলে চাই দুটি ডানা, ডানাওয়ালা উড়োজাহাজ ক'রে সর্বপ্রথম ফান্সের রাইট ব্রাদার্স (Wright Brothers) নামে খ্যাত দুই ভাই ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর সর্বাধিক ৫৯ সেকেণ্ড আকাশে থেকে ৮৫২ ফুট আকাশপথ অতিক্রম করেছিলেন। বর্তমানে দ্রুতগামী যান-হিসাবে বিমান অত্যন্ত সমাদৃত; যাত্রীবাহী, পণ্যবাহী, মারণাস্ত্রবাহী হিসাবে এর ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে।

এরোপ্লেন বা বিমানপোত চলে আকাশে, মহাকাশে যেতে পারে না, কারণ বাতাসের চাপ বিমানকে গতিশীল করে, মহাকাশে বায়ু নেই, কাজেই সেই এলাকা বিমানের অগম্য। মহাকাশে বায়ু নেই ব'লে প্রতিরোধও নেই, একবার যেতে পারলে গতি প্রতিহত করবার জন্য কোন প্রাকৃতিক শক্তি ক্রিয়া করবে না। নিউটনের প্রসিদ্ধ গতিসূত্রের মধ্যে যে গতি-জাড্যের কথা বলা হয়েছে মহাকাশযানের গতি তার সত্যতা প্রমাণ করে। মহাকাশে

পৌঁছানো কিন্তু সহজ ব্যাপার নয়, প্রধান অন্তরায় হ'ল পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষ, তাই মহাকাশ অভিযানের প্রথম সর্ত হ'ল, মহাযানটিকে পৃথিবীর অভিকর্ষ-সীমার বাইরে নিয়ে যেতে হবে, না হ'লে হাওয়াই বাজীর মত সে হুস ক'রে আকাশে উঠেই মাথা নীচু ক'রে ফিরে আসবে এই ধরিত্রীর বুকে।

গাণিতিক হিসাবে দেখা যায়, ঘন্টায় ২৫,০০০ মাইল বা সেকেণ্ডে ৭ মাইল বেগে একটি বস্তুকে অভিলম্ব অভিমুখে উৎক্ষেপ করলে বস্তুটি পৃথিবীর দিকে আর ফিরে আসে না, অনন্ত মহাবিশ্বের কোথায় সে যায় তার হদিস পাওয়া যায় না। এই বেগকে বলা হয় মুক্তিবেগ বা escape velocity.* চাঁদ ও বুধের ক্ষেত্রে এই মুক্তিবেগের মান পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন, চাঁদ ও বুধের ওপরে যে বায়ু নেই তার কারণ মুক্তিবেগ কম হওয়ায় এই উপগ্রহ ও গ্রহের জন্মের পরেই তাদের আবহমণ্ডলে যে গ্যাস অণুগুলি ছিল, প্রচণ্ড গতিবেগ থাকায় তারা ওপরের দিকে উঠে মহাকাশে মিলিয়ে গেছে।

মহাকাশযানকে প্রচণ্ড গতিবেগ দিয়ে উপরের দিকে তুলে দেয় রকেট। প্রায় সাতশ' বছর আগে চীন দেশে রকেট আবিষ্কৃত হয়। রকেট প্রকৃতপক্ষে একটি ইঞ্জিন, যার দ্বারা যে কোন যান বা ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রচণ্ড গতিবেগ দেওয়া যায়, আমরা Rocket misoide-এর (রকেট চালিত ক্ষেপণাস্ত্র) কথা শুনেছি, এত তীব্র বেগ-দেবার ক্ষমতা আণবিক শক্তি পরিচালিত ইঞ্জিন-ছাড়া আর কোন ইঞ্জিনের নেই। মহাকাশযানকে মাথার ওপর ধ'রে মহাকাশ রকেট (Space Rocket) তীব্র বেগে ছুটে যায় মহাশূন্য অভিমুখে। একটি মহাকাশ-রকেট প্রকৃতপক্ষে তিনটি রকেটের সমষ্টি, অথবা বলা যায় এটি তিন পর্যায়ে সমস্ত কাজটি সম্পন্ন করে। প্রত্যেকটি অংশে নির্দীত পরিমাণ জ্বালানী দিয়ে ভরে দেওয়ার পর একটির ওপর আরেকটি চাপিয়ে রকেটটি তৈরী হয়, সবার ওপরে থাকে মহাকাশযান। তিন প্রকারের জ্বালানী আছে, কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়, রোহিণীর রকেট SLV_3-র (Space Launching Vehicle) মধ্যে ছিল কঠিন জ্বালানী (Solid fuel) এই রকেটটির উচ্চতা ছিল ২২ মিটার (প্রায় সাততলার সমান) ওজন ১৭ টন, তার মধ্যে ১৩ টন জ্বালানীর ওজন। নীচের অংশ বা প্রথম রকেটটি সবচেয়ে বড় হয়, এর মধ্যে অধিকাংশ জ্বালানী থাকে।

---

* যদি উৎক্ষেপণ ক্ষেত্রের অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' হয় এবং পৃথিবীর ব্যাসার্ধ হয় R, তাহ'লে মুক্তিবেগের মান হবে,

$$V = \sqrt{2gR}$$

$$= \sqrt{2 \times 980 \times 6400 \times 10^5} \text{ cm/sec.}$$

$$= 11,00,000 \text{ cm/sec.}$$

$$= 7 \text{ mls./sec.}$$

$$= 25,000 \text{ miles/hr.}$$

আমরা জানি,

$$g = 980 \text{ cm/sec}^2$$

$$R = 6400 \text{ km.}$$

$$= 6400 \times 10^5 \text{ cm.}$$

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় দহন শুরু করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অংশ থেকে প্রচণ্ডবেগে গ্যাস নির্গত হয় নীচের দিকে, এর ফলে নিউটনের তৃতীয় সূত্র (ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্র) অনুযায়ী সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয় যা রকেটকে ঠেলে দেয় ওপরের দিকে। জ্বালানী যত শেষ হতে থাকে রকেটটি তত হাল্কা হয়ে যায় ফলে গতিবেগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্রথম রকেটের জ্বালানী নিঃশেষ হয়ে যায়, সেটি নীচে খসে পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় রকেট-ইঞ্জিনে আগুন লাগে। দ্বিতীয় রকেট অত্যন্ত দ্রুত চালিত যানটিকে প্রায় ২৩০ কিঃ মিঃ ওপরে নিয়ে যায় এবং গতিবেগ হয় ঘণ্টায় ১১,০০০ কিঃ মিঃ, এই সময়ে দ্বিতীয় রকেটটি নীচের দিকে খসে পড়ে। এইবার তৃতীয় রকেটটি যান-সমেত ওপরের দিকে ছুটে চলে। যদি যানটিকে কৃত্রিম উপগ্রহে পরিণত করতে হয় তাহ'লে ১০০ কিঃ মিঃ উচ্চতায় অর্থাৎ আবহমণ্ডলের শেষ সীমায় পৌঁছবার পর রোবোটের (Robot) সাহায্যে গতিপথ ৯০° ডিগ্রী ঘুরিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে তৃতীয় রকেট ঐ যানটিকে নির্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে ছেড়ে দেয়। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলেও রকেটটি পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না, তার তীব্র বেগের দরুণ সেও একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মত পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরতে থাকে।

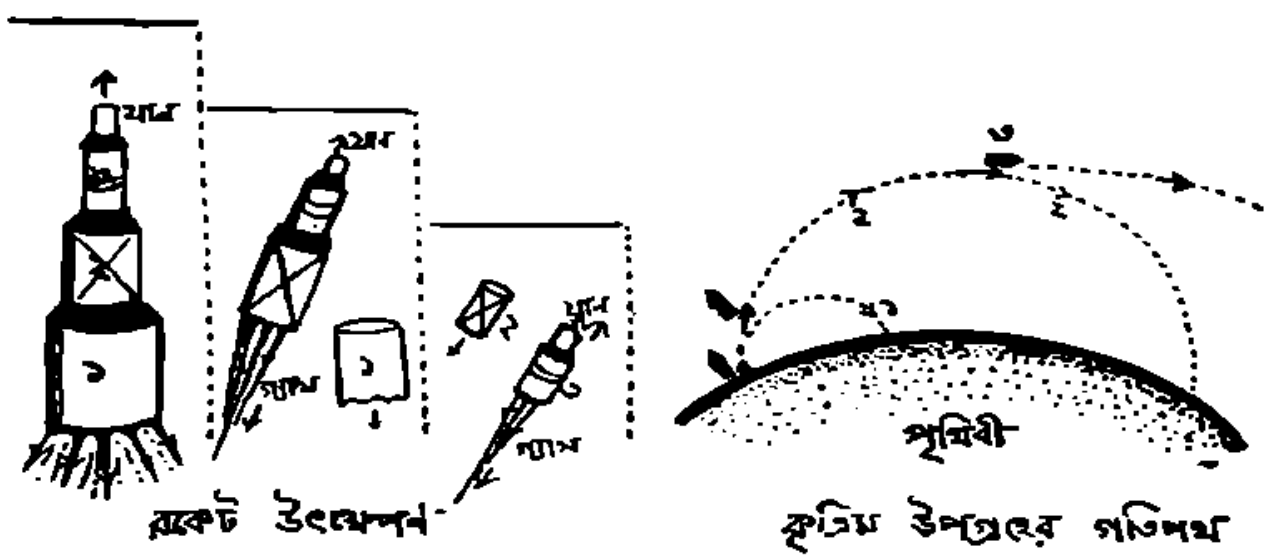

এখানে আমাদের মনে একটি প্রশ্ন ওঠে, সেটি হ'ল -রকেটকে তিন ভাগে ভাগ না করে একটা বড় রকেটের দ্বারা প্রয়োজনীয় গতিবেগ দিলে কি হ'ত। একটি রকেটকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নির্দিষ্ট গতিবেগ সৃষ্টি করতে হ'লে, অধিকাংশ হ'ত, কারণ বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে বেগবান রকেটটিতে যে তাপের উদ্ভব হ'ত তাতে সমগ্র যন্ত্রটি যানসমেত পুড়ে

ছাই হ'য়ে যেত। তাদের তাদের রকেট তিনটিতে দহনক্রিয়া হ'লেও যে উত্তাপের সৃষ্টি হয় তা থেকে যানটিকে রক্ষা করার তাকে একটি আচ্ছাদন (Head Shield) দিয়ে ঢাকতে হয়, ওপরে ওঠার পরে সেটি খুলে যায়।

মহাকাশ-অভিযানের বিভিন্ন লক্ষ্য থাকে। যদি উদ্দেশ্য হয় গ্রহ বা উপগ্রহের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তাহ'লে কৃত্রিম উপগ্রহের মত যানটির গতিপথ পরিবর্তন না ক'রে তৃতীয় রকেট তাকে উচ্চতর গতিবেগ বা মুক্তিবেগ দিয়ে লক্ষ্য অভিমুখে ছেড়ে দেয় যাতে পৃথিবীর আকর্ষণের সীমা পার হ'য়ে সে লক্ষ্য বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে ; তখন সেখান থেকে সেই বস্তুর আকর্ষণে সে লক্ষ্যের কাছে পৌঁছে যায়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাকাশ গবেষণা চলছে, রাশিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। এই দুটি দেশ কতকটা যেন প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে মহাকাশ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ১নং স্পুটনিক (Sputnik I) এবং এর এক মাসের মধ্যে ২রা নভেম্বর আর একটি বৃহত্তর মহাকাশযান ২নং স্পুটনিক মহাকাশে পাঠায়। এর পরেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তাদের প্রথম উপগ্রহ ১নং এক্সপ্লোরার (Explorer-I) উৎক্ষেপণ করে।

এই সাফল্যের পরে চেষ্টা চলতে লাগল যাত্রীবাহী উপগ্রহ পাঠাবার। জন্তু নিয়ে পরীক্ষার পর ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল ভসকট-১ এ করে রাশিয়ার ইউরি গাগারিন মহাকাশে ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট অবস্থান করে ফিরে এলেন এবং প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে সারা পৃথিবীর অভিনন্দন লাভ করলেন। মহিলাদের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র মহাকাশচারিণী হ'লেন মাদাম টেরেসাকোভা, তিনি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই জুন যাত্রা করে ভসকট-৬ এর মধ্যে ২ ঘণ্টা ২২ মিনিট ৫০ সেকেণ্ড মহাকাশে অবস্থান করলেন, এঁরা উভয়েই মহাকাশযানের ভিতরে ছিলেন। যান থেকে নেমে মহাকাশে বিচরণ করবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন আমেরিকার এডওয়ার্ড হোয়াইট, তিনি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন যাত্রা ক'রে, ৪ দিন ১ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট মহাকাশে অবস্থান করেছিলেন। তার মধ্যে ২০ মিনিট যানটির (জেমিনি-৪) বাইরে এসে মহাকাশে বেড়িয়েছিলেন। ভাবতে বিস্ময় লাগে, মহাশূন্যে বেড়াবার সময় তিনি পা রাখলেন কোথায় আর কেমন করেই বা পা ফেললেন। জানা যায়, মহাকাশযান থেকে বার হলেও তিনি যানটির সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করেন নি, ২৫ ফুট লম্বা রজ্জুর মত একটি বন্ধনী দ্বারা তিনি যানটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঐ বন্ধনীতে ছিল একটি অক্সিজেন জেট-বন্দুক (Oxygen jet-gun) যেটির ঘোড়া (trigger) টিপলে সবেগে অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হচ্ছিল, ঐ গ্যাসের প্রচণ্ড গতির ফলে যে প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হচ্ছিল তার ধাক্কা হোয়াইটকে সামনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। এই ভাবে ঐ জেট-গানের সাহায্যে তিনি ইতস্ততঃ পা চালিয়ে মহাশূন্যে বিচরণ করলেন। জেমিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল মহাকাশে চলাচল ও অবস্থানের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা। এই প্রকল্পে জেমিনি-৭ এ করে কনর‍্যাড ও লভেল একত্রে মহাকাশে মোট

১৩ দিন ১৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিট বাস করেছিলেন। এঁদের চেয়ে আরও বেশীদিন মহাকাশে কাটিয়ে ছিলেন রাশিয়ার তিনজন মহাকাশচারী তাঁরা সয়ুজ-৯ যানে মোট ১৭ দিন ১৬ ঘণ্টা ৫৯ মিঃ মহাকাশে ছিলেন ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে।

আমেরিকার জেমিনিগোষ্ঠীর পর এল এ্যাপলো গোষ্ঠী. এদের উদ্দেশ্য ছিল চাঁদে যাওয়া। প্রথমে কয়েকটি যাত্রীবিহীন মহাকাশযান পাঠাবার পর একাদশ এ্যাপলো (Apollo-11) ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬শে জুলাই সারা বিশ্বে বিপুল উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রে তিনজন মহাকাশচারীকে নিয়ে চাঁদে পৌঁছাল। এঁদের মধ্যে কলিন্স্ মূল যানটিতে থেকে সেটি চালু রাখলেন এবং আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন ছোট্ট একটি শকট (Lunar module) করে চাঁদের ওপর নামলেন। তাঁরা আড়াই ঘণ্টা চাঁদে থেকে পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করে নিজেরাই একটি ছোট্ট রকেট চালিয়ে কলিন্স্-এর সঙ্গে মিলিত হলেন। একেবারে নিখুঁতভাবে পরিকল্পনাটি রূপায়িত হলো। এই সময়ে রাশিয়াও দুটি যাত্রীবিহীন যান লুনা-১৬ এবং ১৭ পাঠিয়ে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দ্বারা মাটি সংগ্রহ করল। রাশিয়ার মহাকাশযান সর্বপ্রথম চাঁদের বিপরীত পৃষ্ঠের ছবি তুলেছিল।

চাঁদ-সম্বন্ধে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। চাঁদে বায়ু নেই, এজন্য চাঁদের আকাশ কাল, কারণ আবহমণ্ডলের বায়ুকণা দ্বারা সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হ'লে রংএর সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সূর্যের প্রখর তাপকে আংশিক ভাবে শোষণ করে এবং পৃথিবীকে সেই প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে রক্ষা করে; চাঁদে বায়ু নেই, তাই চাঁদের সৌরদগ্ধ দিকটি অত্যন্ত গরম, তাপমাত্রা ২৪০° ফারেনহাইট এ' ছাড়া চাঁদের একটি দিন, আমাদের একপক্ষ কালের সমান, রাতও তাই ফলে একটানা সূর্যের আলো পেয়ে একটি দিক উত্তপ্ত ও অপর দিক দীর্ঘকাল উত্তাপ না পেয়ে বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা—২৬০° ফারেনহাইট।

আমরা সবসময়ে চাঁদের একই অর্ধাংশ দেখি, অপর দিক দেখতে পাই না কারণ চান্দ্রমাস দুই পক্ষকালে সম্পূর্ণ হয়, সেই সময়ে চাঁদ নিজের মেরুদণ্ডের ওপর একবার আবর্তিত হয় ফলে একটা দিকই সব সময়ে পৃথিবীর সামনে থাকে।

চাঁদে জল নেই, উদ্ভিদ নেই, আছে বহু গিরি গহ্বর, পাহাড়, সর্বোচ্চ পর্বতটি ২৬,০০০ ফুট উঁচু, আর আছে লাল শক্ত মাটি।

আমরা জানি যে, মহাকাশ গবেষণার আর একটি পরিকল্পনা হ'ল নিকটবর্তী গ্রহগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও সংযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা। রাশিয়া ও আমেরিকার 'ভেনেরা', 'ম্যারিনার' প্রভৃতি মহাকাশযানগুলি এই উদ্দেশ্যে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

মহাকাশ অভিযান যেমন জটিল, তেমনি ব্যয় সাপেক্ষ। এতে বিপদের ঝুঁকিও কম নয়। কিন্তু অজানাকে জানার আগ্রহে মানুষ সকল বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা ক'রে এগিয়ে যায়।

সম্প্রতি ভারতবর্ষ মহাকাশ গবেষণায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। 'রোহিণী' উৎক্ষেপণের সাফল্য আমাদের বিজ্ঞানীদের যোগ্যতা প্রমাণ করেছে, তাঁরা আশা করেন, এক বৎসরের মধ্যে বৃহত্তর উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে তাঁরা সক্ষম হবেন।

●

॥ হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার ॥

শ্রী দিবাকর সেনরায়

ওলন্দাজ শিল্পকলার আলোচনায় ফ্লেমিশ শিল্পকলার প্রসঙ্গ স্বতঃই যুক্ত হয়ে পড়ে। ইতিহাসের রাজনৈতিক অধ্যায়ে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপএর শাসিত হল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশের সতেরোটি প্রদেশের পৃথকীকরণ ঘটলো খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে। হল্যাণ্ডের এই খণ্ডিত ভূখণ্ডই পরিচিত হলো ফ্ল্যাণ্ডার্স নামে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্ল্যাণ্ডার্স স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হলো; নাম হলো বেলজিয়াম। ফ্ল্যাণ্ডার্সএর অধিবাসীরা পরিচিত ছিলো ফ্লেমিশ নামে এবং ফ্লেমিশদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলো রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে হল্যাণ্ডের বিভাজনের পর কয়েকটি প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবার (ফ্লেমিশ) দক্ষিণের এণ্টোয়ার্প শহর ছেড়ে চলে এলো উত্তরাঞ্চলের প্রোটেষ্টাণ্ট অধ্যুষিত রটারডাম্‌ এবং হারলেম্‌ শহরে। ঐতিহাসিক বার্ণার্ড র‍্যাকহাম্‌ বলেছেন, রটারডাম্‌ এবং হারলেম্‌এ আগত ওই প্রোটেষ্টাণ্ট পরিবারগুলোর মধ্যে কিছুসংখ্যক সিরামিক শিল্পীও ছিলো। সম্ভবতঃ এই শিল্পীরাই রটারডাম্‌ এবং হারলেম্‌এ সিরামিক তৈরীর কারখানা স্থাপন করে। হল্যাণ্ডের খণ্ডিত ভূখণ্ডে এগুলোই সম্ভবতঃ প্রাচীনতম সিরামিকনির্মাণকেন্দ্র। এই কেন্দ্রগুলোতে ইতালীয়ান মাইয়োলিকা পদ্ধতিতে সিরামিক্‌স্‌ তৈরী করে তাতে চিত্রাঙ্কণ করা হতো।

হল্যাণ্ডের সিরামিক্‌স্‌ নির্মাণের ক্ষেত্রে ইতালীয়ান মাইয়োলিকা পদ্ধতির অনুপ্রবেশের সূত্রসন্ধান করে সম্পর্কিত যে—ইতালীয়ানের পরিচয় জানা গেছে—তার নাম গুইডো ডি স্তাভিনো। স্তাভিনো ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালী ত্যাগ করে অবিভক্ত হল্যাণ্ডের এণ্টোয়ার্প শহরে চলে আসেন। এর কয়েক বছর আগে থেকেই স্তাভিনো-র দুই পুত্র এণ্টোয়ার্প-এ একটি সিরামিকনির্মাণকেন্দ্র খোলবার চেষ্টা করছিলেন বলে জানা যায়। স্তাভিনো-র পুত্রদের নামে উৎসর্গীকৃত মাইয়োলিকা পদ্ধতিতে চিত্রিত একটি টালি এণ্টোয়ার্প-এর ভেস্‌চুইজ সংগ্রহশালায় রয়েছে। টালিটিতে তারিখ দেওয়া আছে ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। ওয়ারেন ই বক্স-এর মতে এই টালিটিই হল্যাণ্ডে নির্মিত মাইয়োলিকার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। বক্স প্রদত্ত এই তথ্য থেকে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকে অখণ্ড হল্যাণ্ডের এণ্টোয়ার্প শহরে মাইয়োলিকা নির্মাণের সূত্রপাত থেকে খণ্ডিত হল্যাণ্ডের রটারডাম্‌ ও হারলেম-এ মাইয়োলিকা নির্মাণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার যোগসূত্রটি অনায়াসে অনুমান করা যায়।

রটারডাম্‌-এর অদূরবর্তী ডেলফ্‌ট্‌ নগরী ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিক থেকেই মাইয়োলিকা পদ্ধতিতে চিত্রিত সিরামিক্‌স্‌-এর নির্মাণকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। পরবর্তী একশো বছরের মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক মাইয়োলিকা তৈরীর কারখানা ডেলফ্‌ট্‌-এ গড়ে ওঠে। ডেলফ্‌ট্‌এর কারখানাগুলোতে তৈরী মাইয়োলিকা কয়েক বছরের মধ্যেই সমগ্র য়ুরোপে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার নামে পরিচিতি লাভ করে। হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার বিভিন্ন দেশে রপ্তানী

হতে থাকে। ইংল্যাণ্ডে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার এমনই জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয় যে, ইংল্যাণ্ডের কারখানায় ডেলফ্‌ট্‌এর নকল তৈরী করা সুরু হয়ে গেলো।

এই বিপুল জনপ্রিয়তার জন্যে কয়েক বছরের মধ্যেই ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিলো। হল্যাণ্ডের তৎকালীন বাণিজ্যিক সাফল্য ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর উৎপাদন বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করলো। এই বাণিজ্যিক সাফল্যের মূলে ছিলো ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা। দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং পর্তুগাল, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায়িক প্রতিযোগীতার জন্যে ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৃষ্টি হয়েছিলো। এই কোম্পানীর মাধ্যমে হল্যাণ্ডের সঙ্গে দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ—বিশেষ করে চীন এবং জাপানের বাণিজ্যিক যোগাযোগ প্রায় দুশো বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিলো। ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মারফত সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতকে হল্যাণ্ডে এসে পৌছালো চীনদেশে নির্মিত চিত্রিত পোর্সিলেন। চৈনিক পোর্সিলেনএর অপূর্ব গড়ন, হালকা ওজন, মার্বেল পাথরের মতো সাদা জমির ঈষৎ স্বচ্ছতা এবং উজ্জ্বল রঙএ চিত্রিত অলংকরণ ও স্বচ্ছ গ্লেজএর দুর্গত দেখে য়ুরোপের জনসাধারণ মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেলো। অল্পদিনের মধ্যেই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে চৈনিক পোর্সিলেনএর বিপুল চাহিদা দেখা দিলো। এই চাহিদা লক্ষ্য করে ওলন্দাজ সিরামিক-নির্মাতারা বিশেষভাবে সচেতন হয়ে উঠলো। রটারডাম্‌, হারলেম্‌ এবং ডেলফ্‌ট্‌এর সিরামিক-নির্মাণকেন্দ্রগুলোতে চৈনিক পোর্সিলেনএর অনুরূপ সিরামিক্‌স্‌ তৈরীর চেষ্টা সুরু হয়ে গেলো।

কিন্তু হল্যাণ্ডে তখনও পর্যন্ত পোর্সিলেনএর প্রধান উপকরণ কেওলিন অথবা চিনামাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই স্থানীয় নদী, পুকুর এবং জলাজমি থেকে সংগৃহীত মাটি দিয়ে সিরামিক্‌স্‌ তৈরী করে ওই সিরামিক্‌স্‌ টিন্‌ অক্সাইড্‌ মিশ্রিত গ্লেজএ ডুবিয়ে তার ওপর চিত্রাঙ্কন করে চুল্লীতে পোড়ানো হতো।

হল্যাণ্ডের টিন্‌ গ্লেজমণ্ডিত চিত্রিত সিরামিক্‌সকে দুটো প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। প্রথম শ্রেণীতে ফেলা যায় ইতালীয়ান মাইয়োলিকার অনুকৃতিগুলোকে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলা যায় চীনা ও জাপানী পোর্সিলেনএর অনুকৃতিগুলোকে। আর এক শ্রেণীর টিন্‌গ্লেজমণ্ডিত ওলন্দাজ সিরামিক্‌সও রয়েছে—যেগুলোতে বিখ্যাত ফ্লেমিশ ও ওলন্দাজ তৈলচিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রকলার অনুসরণে চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। কয়েকজন খ্যাতনামা ওলন্দাজ তৈলচিত্রকর ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার চিত্রণে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন ফ্রেড্‌রিখ্‌ ভ্যান্‌ ফ্রিজটোম্‌ এবং আব্রাহাম ডি বুগে। ফ্রিজটোমএর প্রিয় বিষয়বস্তু ছিলো দৃশ্যচিত্র। এঁর অঙ্কিত ও স্বাক্ষরিত একটি ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর নিদর্শন আমষ্টারডাম সংগ্রহশালায় রয়েছে। এটিতে টিন্‌ গ্লেজএর সাদা জমির ওপর নীল রঙএ গাছ, পাহাড়, সেতু এবং মানুষ চিত্রিত হয়েছে। বুগে ও কিছুসংখ্যক ডেলএ্‌ট্‌ অয়্যার-এ চিত্রাঙ্কণ করেছিলেন বলে জানা গেছে। কিন্তু এঁর স্বাক্ষরিত কোনো ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর নিদর্শন এযাবত পাওয়া যায়নি।

ওলন্দাজ শিল্পী আলব্রেখ্‌ট্‌ কর্নেলিস্‌ ডি হাইজারএর আঁকা একটি ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর নিদর্শন ফ্র্যান্সের লুভর্‌ মিউজিয়মে আছে। এটিতে একটি চীনা পাখি গাছপালাসহ চৈনিক

রীতিতে অঙ্কিত হয়েছে। এই শিল্পীর আঁকা একটি চতুষ্কোণ ডেলফ্‌ট অয়্যার (চায়ের পাতা রাখবার কৌটো) পাওয়া গেছে ; এটিতেও অনুসৃত হয়েছে চৈনিক অলংকরণরীতি। কাইজার-এর দুই জামাতা সিরামিকচিত্রকররূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের নাম হলো জ্যাকোবাস্ এবং এ্যাড্রিয়েন্ পিন্‌নেকার। এঁরা দুজনেই ডেলফ্‌ট্‌এর সাদা জমির ওপর নীল রঙএ চিত্রাঙ্কন করতেন। এ্যাড্রিয়েন্ স্বাক্ষর করতেন লাল রঙএ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের ওলন্দাজ শিল্পী উটার্স ভ্যান্ ইয়েন্‌রন্ এবং তাঁর দুই পুত্র ল্যাম্বারটাস্ ও স্যামুয়েল ডেলফ্‌ট্ অয়্যারচিত্রণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ল্যাম্বারটাস্ সিরামিকচিত্রণে এক নিজস্ব রীতির প্রবর্তন করেন ; এই অঙ্কনরীতি 'ক্যাকেমোনো রীতি' নামে পরিচিত ছিলো। এই শিল্পীরা সকলেই ডেলফ্‌ট্ অয়্যার চিত্রণে সাদা জমির ওপর নীল এবং মেরুণ রঙ ব্যবহার করতেন।

অন্যান্য যেসব ওলন্দাজ শিল্পী ডেলফ্‌ট্ অয়্যারচিত্রণে বৈশিষ্ট্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে ক্রুইক্, বেরেন্‌ডেন্ট, মেস্‌ক্রেট্ মেস্‌ক্, ওয়েমার্স, হপেইন্, হোভ্, রেইজেনস্, ক্লিকিয়াস্ এবং কাম্।

হল্যাণ্ডের সিরামিকশিল্পীরা টালিচিত্রণেও বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এককভাবে অথবা কয়েকটি টালি একত্র করে চিত্রাঙ্কন করা হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বাণিজ্যজাহাজই টালিতে আঁকা হয়েছে। এই চিত্রিত টালি য়ুরোপের সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো। টালিচিত্রণে স্পেনের দীর্ঘদিনের সুনাম থাকা সত্ত্বেও হল্যাণ্ডের চিত্রিত টালি স্পেনে আমদানী করা হতো।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে ডেলফ্‌ট্ অয়্যার ক্রমশঃ উৎকর্ষ হারাতে থাকে। বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে ওলন্দাজ শিল্পীরা ক্রমশঃ স্বকীয়তা হারিয়ে কারিগরে পরিণত হলেন। কমার্শিয়ালাইজেশনের প্রভাবে শিল্পীদের ইমাজিনেশন্ চাপা পড়ে গেলো। এসম্পর্কে ওয়ারেন ই কক্স যা বলেছেন, তা প্রণিধানযোগ্য। কক্স বলেছেন, 'ইতিহাসে মানবসভ্যতার প্রথম পর্বে দলপতি অথবা গোষ্টিপতিদের বাহুবল ও বুদ্ধিবলে এক একটি গোষ্টি কিংবা জাতি পরিচালিত হতো। দলপতিরা যখন অপর রাজ্য জয় এবং লুণ্ঠন করতো তখন শিল্পীদের ওপর ভার পড়তো ওই দলপতিদের মূর্তিনির্মাণ অথবা তাদের মনোরঞ্জক শিল্পকর্ম করার। দ্বিতীয় পর্বে একদল নিরস্ত্র মানুষ জনসাধারণকে প্রথম শোনালো পাপ, পুণ্য, পরলোক, স্বর্গ ইত্যাদির কথা। জনসাধারণ এদের নির্দেশে দলপতিদের যখন পদচ্যুত করলো এবং পাপপুণ্যের এই প্রবক্তারা জয়ী হলো, তখন শিল্পীদের প্রধান কাজ হলো স্বর্গের মহিমা শিল্পকর্মে রূপায়িত করে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা। তৃতীয় পর্বে আবিষ্কৃত হলো অর্থ অথবা মুদ্রার প্রকৃত ব্যবহার এবং শক্তি। দেখা গেলো, এই বস্তুটির সাহায্যে যেমন অস্ত্র সংগ্রহ করা যায়, তেমনই ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করা চলে এবং ক্ষমতার চূড়ায় বসে থাকা যায়। মানুষ তখন একথা ভাবতে সুরু করলো, অর্থের সাহায্যে এই পৃথিবীতেই যখন স্বর্গ অথবা স্বর্গসুখ কেনা যেতে পারে, তখন পাপপুণ্য অথবা মৃত্যুরপর স্বর্গে যাবার কথা ভাবা নিরর্থক। কক্স বলছেন, সপ্তদশ খ্রীষ্টীয় শতক পর্যন্ত বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় এবং ঐস্লামিক ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাবে শিল্পকলার ক্ষেত্রে পাপপুণ্য ও স্বর্গের রূপায়ণ লক্ষ্য করা গেছে। এরপর আমরা প্রবেশ করছি ব্যবসায়িক প্রভাবের যুগে। এই প্রভাবের ফল খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের শিল্পকলা—বিশেষ করে শিল্পিত সিরামিক্‌স্‌এর ওপর কি দাঁড়িয়েছে, তা-ও এক্ষেত্রে—অর্থাৎ ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যাবে।

ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর ওপর কয়েক বর্ণিত ব্যবসায়িক প্রভাবের ফল কি দাঁড়ালো, দেখা যাক্‌। মরিজিয়ো ক্যালভেসি বলেছেন, '১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে যেখানে ডেলফ্‌ট্‌-এ একটি কি দুটি মাত্র টিন্‌গ্লেজমণ্ডিত সিরামিকনির্মাণের কারখানা ছিলো, সেখানে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ৩০টি কারখানা স্থাপিত হয়'। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং প্রচণ্ড চাহিদা মেটাতে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনেই এই কারখানাগুলোর সৃষ্টি হয়েছিলো। তবে ডেলফ্‌ট্‌এর এই সিরামিকনির্মাণকেন্দ্রের সবগুলোই কিন্তু নতুন করে তৈরী করা হয়নি। ডেলফ্‌ট্‌এ যে-বিয়ার তৈরীর কারখানা ছিলো—সেগুলোকেই সিরামিক তৈরীর কারখানায় রূপান্তরিত করা হয়। এই বিয়ার তৈরীর কারখানাগুলোতে তৈরী বিয়ার জাতীয় পানীয় বিদেশে রপ্তানী হতো। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে বিয়ারএর ব্যবসায় মন্দা দেখা দিলো এবং ডেলফ্‌ট্‌এর অধিকাংশ বিয়ারে তৈরীর কারখানা বন্ধ হয়ে গেলো। এইসময়ে হল্যাণ্ডের ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার নির্মাতারা উৎপাদন বাড়াবার জন্যে নতুন কারখানা স্থাপনের কথা চিন্তা করছিলেন। তাঁরা বন্ধ হয়ে যাওয়া বিয়ার তৈরীর কারখানাগুলোর পরিচালনাভার গ্রহণ করে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধনের পর ওই কারখানাগুলোতেই ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। শিল্পী এবং কারিগরদের একটি শক্তিশালী সংস্থা এই সময়ে ডেলফ্‌ট্‌এ গড়ে উঠলো। সংস্থাটির নাম দেওয়া হলো 'গিল্ড অব্‌ সেণ্ট লিউক্‌'। অগ্রগণ্য সিরামিকশিল্পী, চিত্রকর, ভাস্কর এবং বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা এই গিল্ডএর সদস্য ছিলেন। শিল্পদ্রব্যের কারবারীদেরও গিল্ডএর সদস্য করে নেওয়া হলো। গিল্ড একটি চারু ও কারুশিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করলো। এই বিদ্যালয়ের আটটি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো এবং শিক্ষাশেষে পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিলো। গিল্ডএর কার্যকরী সহযোগিতায় ডেলফ্‌ট্‌এর টিন্‌গ্লেজমণ্ডিত চিত্রিত সিরামিক্‌স্‌এর উৎপাদন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু উৎপাদন বাড়াবার দিকে অতিরিক্ত নজর দেবার ফলে পরবর্তীকালে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর শিল্পমানের অপকর্ষ ঘটে। প্রায় দেড়শো বছরে কারিগরী দক্ষতা ও অলংকরণের সূক্ষ্মতায় ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার এতোটা উন্নত মানে পৌঁছেছিলো যে; চৈনিক পোর্সিলেনএর সঙ্গে তফাত নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়তো। স্থানীয় মাটিকে অত্যন্ত মিহি চূর্ণে পরিণত করে সেই মাটিতে টিন্‌গ্লেজমণ্ডিত যে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার নির্মিত হতো—তা চুল্লীতে পোড়াবার পর প্রায় চীনা পোর্সিলেনএর মতোই হালকা হয়ে উঠতো। তাছাড়া চিত্রাঙ্কনের পর লেড্‌ গ্লেজএর পাতলা আবরণ লাগিয়ে পোড়ানো হতো বলে ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যার হয়ে উঠতো অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চকচকে। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেলফ্‌ট্‌ অয়্যারএর চিত্রাঙ্কন ছিলো অলংকারবহুল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে মনুষ্যমূর্তিতে ভর্তি ঐতিহাসিক কাহিনী ও যুদ্ধক্ষেত্রের বিষয় আঁকা

হতো। রেখাঙ্কন সাধারণতঃ গাঢ় বেগুনি রঙএ এবং ডিটেল্ নীল রঙএ আঁকার চল ছিলো। ইতালীর বিখ্যাত 'বারোক্' শৈলীর অনুসরণেও ডেলফ্‌ট্ অয়্যার চিত্রিত হয়েছে।

১৭১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেলফ্‌ট্ অয়্যারও চীনা ও জাপানী পোর্সিলেনএর অনুকরণে হয়েছে। এরপর থেকেই অলংকরণের শিল্পমান ক্রমশঃ উৎকর্ষ হারাতে থাকে। এর কারণ হলো, অধিকাংশ ডেলফ্‌ট্ অয়্যার নির্মাণকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণভার শিল্পী ও কারিগরদের হাত থেকে ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। অল্প সময়ের মধ্যে অতিমাত্রার উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদে শ্রমকালো ও অলংকারবহুল বিষয়বস্তু পরিত্যক্ত হলো। অত্যন্ত সাধারণ বিষয়—যেমন পাখির খাঁচা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি ডেলফ্‌ট্ অয়্যারএ আঁকা হতে লাগলো। বিখ্যাত ফ্রেমিক ও ওলন্দাজ শিল্পীদের আঁকা চিত্রকলার অনুসরণ বন্ধ হয়ে গেলো। প্রতিভাবান সিরামিকচিত্রকরেরা কারিগরের পর্যায়ে নেমে এলেন। ঊনবিংশ খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে ডেলফ্‌ট্এর একটি কি দুটি কারখানার অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় পুরোনো রীতিতে ডেলফ্‌ট্ অয়্যারচিত্রণের কাজ চলতে লাগলো। এই শতকেই দেখা গেলো, ঐতিহ্যবাহী ডেলফ্‌ট্ অয়্যারএর আভিজাত্য ও বৈশিষ্ট্য বিলুপ্তির পথে চলেছে। ওয়ারেন ই কক্স বর্ণিত ইতিহাসের ব্যবসায়িক প্রভাবের যুগে শিল্পকলার অনিবার্য নিয়তি নির্ধারিত হয়ে গেলো ডেলফ্‌ট্ অয়্যারএরও ক্ষেত্রে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। Pottery and Porcelain—W. E. Cox.
২। Encyclopedia of World Art (Vol-III)
৩। Introduction to the History of Fine Arts in India and West—Edith Tomory.

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

১। **বিবেকানন্দ ও বাংলা-সাহিত্য** (তৃতীয় সংস্করণ) : ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ, এম. এ. ডি. লিট্।

করুণা প্রকাশনী, ১৮এ, চৈয়ার লেন, কলিকাতা-১২।

মূল্য—৪০ (চল্লিশ) টাকা।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এদেশের প্রাতঃস্মরণীয় দুটি নাম। নবযুগের ধর্মচিন্তার গুরু রামকৃষ্ণ হলেন ভাবমূর্তি, শিষ্য বিবেকানন্দ কর্মমূর্তি। ভাব ও কর্মের সমন্বয়েই ভারতীয় ধর্মের স্ফূর্তি ও প্রয়োগসিদ্ধি। এই সিদ্ধিকে নব্যভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ। শুধু ধর্মচিন্তায় কেন, নবযুগের সমাজ-ভাবনা, স্বদেশপ্রেম ও মানবসেবার ক্ষেত্রেও তাঁরা এক বিপুল প্রাণদ প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁদের দান যে কত গভীর ও সুদূরপ্রসারী—সেই বিষয়টি একনিষ্ঠ ধ্যানতৎপরতায় আবিষ্কার করেছেন ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ। শ্রীঘোষের এই আবিষ্কার মৌলিক এবং নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন।

বাংলা সাহিত্যে স্বামী বিবেকানন্দের স্বীকৃতি ছিল। যে স্বীকৃতি ছিল তাঁর অল্প কয়েকটি মাত্র বাংলা মৌলিক রচনাকে কেন্দ্র করে—'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'বর্তমান ভারত' প্রভৃতি সৃষ্টিমূলক সাহিত্য-কৃতি নিয়ে প্রবন্ধকার হিসাবে। কিন্তু বিবেকানন্দ যে কবি, অনুবাদক হিসাবেও তাঁর যে একটি ভূমিকা আছে এবং সর্বোপরি চল্‌তি গদ্যের স্রষ্টা শিল্পীরূপে তিনি যে বীরবল প্রমথ চৌধুরীর পূর্বেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন—এ সকল সংবাদ একরকম অজ্ঞাতই ছিল। প্রণববাবু তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের এই সকল সাহিত্যকর্মের তথ্য উদ্ধার করে বঙ্গের বিদগ্ধজনকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গবেষণা-গ্রন্থখানি সাহিত্য-সেবক বিবেকানন্দের বিভিন্নমুখী সৃষ্টি ও তাঁর শিল্পী-মানসের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়। লেখক এই গ্রন্থে আঠারটি শীর্ষনামে বিষয়গুলির আলোচনা করেছেন—(১) বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধি ও স্বামী বিবেকানন্দ, (২) বিবেকানন্দ : মনন ও সাহিত্য, (৩) বিবেকানন্দের সাহিত্যচিন্তা, (৪) বাংলা গদ্যের চল্‌তিরূপ ও স্বামী বিবেকানন্দ, (৫) আলাপচারী বিবেকানন্দ, (৬) সাধু-গদ্য ও স্বামী বিবেকানন্দ, (৭) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী, (৮) বিবেকানন্দের কবিতার পটভূমি, (৯) মাইকেল মধুসূদন ও স্বামী বিবেকানন্দ, (১০) বিবেকানন্দের কবিতা, (১১) অনুবাদক বিবেকানন্দ, (১২) স্বামী বিবেকানন্দের পত্রিকা : 'উদ্বোধন', (১৩) বিবেকানন্দের প্রবন্ধ ও রচনাসংগ্রহ : 'ভাববার কথা', (১৪) বিবেকানন্দের ভারতচেতনা ও 'বর্তমান ভারত', (১৫) ভ্রমণকথা : 'পরিব্রাজক', (১৬) বিবেকানন্দের দুই পৃথিবী : 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', (১৭) বিবেকানন্দের হাস্যরস, (১৮) বাংলাসাহিত্যে বিবেকমন্ত্র : 'উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত'। এ ছাড়া পরিশিষ্টরূপে যোজিত হয়েছে—(১) ধর্মমীমাংসা ও রামকৃষ্ণদর্শন,

(২) 'সঙ্গীত কল্পতরু' ও স্বামীজীর 'গানের খাতা' এবং (৩) শঙ্করাচার্যের 'বিবেকচূড়ামণি' ও বিবেকানন্দের 'সখার প্রতি'।

শীর্ষনামগুলি আলোচ্য বিষয়ের পরিচয় বহন করলেও, আলোচনায় লেখক আরও গভীরে প্রবেশ করে প্রত্যেকটি প্রবন্ধে নতুন তথ্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান দিয়েছেন। এটি বাইরে থেকে কোন খনির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া নয়, খনির অভ্যন্তরস্থ মণির সঙ্গে সাযুজ্য ঘটিয়ে দেওয়া এবং একজন সাহিত্যিকের মনন ও সাহিত্য-প্রেরণার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান দেওয়া। সাহিত্য যে একটি মুহূর্তের আবেশ বা আবেগের সৃষ্টি নয়, সাহিত্য যে ক্রান্তদর্শী কবি-মনীষার সত্যদর্শনজনিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, এই গ্রন্থ থেকে, স্বামী বিবেকানন্দের সৃষ্টি সম্পর্কে সেই ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দের ধ্যান, প্রত্যয় ও উপলব্ধ জীবনদর্শনের প্রতিরূপ বিবেকানন্দের সাহিত্য: 'নির্মম' সন্ন্যাসীর মমত্বগভীর প্রেমের স্পর্শে সে সাহিত্য মর্মস্পর্শী, মধুর অথচ ওজস্বী—প্রণববাবু এই সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের এই বিশিষ্ট দান সর্বদা স্মরণীয় এবং এদিক থেকে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য-চিন্তার মিল রয়েছে। বিবেকানন্দের সমগ্র সাহিত্য-সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে 'ভারত-চিন্তা' বা 'ভারত-বোধ'।

'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' গ্রন্থটিতে একদিকে যেমন, বিবেক-সৃষ্ট সাহিত্যিক বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে, তেমনই অন্যদিকে রয়েছে বিবেকানন্দের রচনা-শৈলীর পরিচয়। কবি Coleridge রচনাকে দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন: এক ধরনের রচনা কোমল, নারীসুলভ কমনীয়তায় ভরা ('feminine'), আর, এক ধরনের রচনাদীপ্ত পুরুষাকারের চিহ্নে চিহ্নিত, পৌরুষ-দীপ্ত ('Masculine'); স্বামী বিবেকানন্দের রচনাভঙ্গী দ্বিতীয় শ্রেণীর। প্রণববাবু স্বামীজীর রচনার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: "বিবেকানন্দের গদ্য-ভঙ্গিমার নিপুণ তীব্রতা আমাদের সেই 'সাফ ইস্পাতে'র উপমাটি মনে করিয়ে দেয়, 'যা এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত গড়ে না'। অশ্রুভারাক্রান্ত বাংলার মেদুর মাটিতে বিবেকানন্দের রচনা-ভঙ্গী যেন মেঘমন্দ্রের মত গভীর ও গম্ভীর; তাঁর পরিহাস-রসিকতাতেও 'জ্বলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত শব্দকণিকা'।

'বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য' নানাদিক থেকেই একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রণববাবু নিজে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আবাল্য পালিত। এই গ্রন্থ রচনার ভিতর দিয়ে তাঁর নিষ্ঠা ধ্যান-তন্ময়তা এবং মনন-ধারার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মানসস্বরূপ, তাঁদের জীবনের 'প্রকাশ ও রহস্য' জীবন্ত হয়ে উঠেছে লেখকের রচনায়। বিষয়-নির্বাচন, তথ্যনিষ্ঠা ও বিষয়-বিন্যাসের দিক থেকে এই গ্রন্থ বাংলা-সাহিত্যে একটি নতুন সংযোজন বলেই আমরা মনে করি। আমাদের দৃঢ় ধারণা এই গ্রন্থ বিদগ্ধ বাঙালী পাঠক মাত্রকেই পরিতৃপ্ত করবে। আমরা এই সৃষ্টির বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী

2. *Siva Sutras* : The Yoga of Supreme Identity by Kshemarāja with the Commentary, Vimarshini—Translated into English with Introduction. Notes. Running Exposition, Glossary and Index by Jaideva Singh. Published by M/s. Motilal Banarasidass, Indological Publishers and Booksellers : Head Office : Bungalord Road, Jahahar Nagar. Delhi-7 ; First Edition : Delhi, 1979, Price : Rs. 45·00 (Paper) and Rs. 60·00 (cloth).

'শিবসূত্র'-গ্রন্থ কাশ্মীরীয়-ত্রিকতন্ত্রের অন্তর্গত, বিদগ্ধ পণ্ডিত ক্ষেমরাজ-কর্তৃক রচিত এবং তাঁর নিজেরই রচিত ভাষ্য 'বিমর্শিণী'-সমন্বিত। পণ্ডিত ক্ষেমরাজ-কৃত 'শিবসূত্র' ও তার ভাষ্য 'বিমর্শিণী' কাশ্মীরীয়-শৈবাগমশাস্ত্রের বিখ্যাত তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ। সমালোচ্য গ্রন্থটির সামান্য পরিচয়প্রসঙ্গে অনুবাদকার শ্রদ্ধেয় জয়দেব সিংহের নিজের বক্তব্যের উল্লেখ ক'রে বলি : "Four Commertaries on *Siva-sutra* are available at present, the *Vimarshini* Commentary of Kshemarāja in prose, the *Siva-sutra-vritti* by some anonymous author in prose, the *Siva-sutra-vártikam* by Bhāskara in verse, and the *Siva-sutra-vártikam* by Varadarāja in verse.....The *Vartikam* by Bhāskara is an independent Commentary. He differs at places from Kshemarāja".

শিবসূত্রের ইংরাজীতে অনুবাদকার শ্রদ্ধেয় জয়দেব সিংহ গ্রন্থের একটি পূর্বাভাস-পরিচিতি (Introduction) দিয়েছেন। 'শিবসূত্র'-গ্রন্থে আলোচিত কাশ্মীরীয়-শৈবাগমতন্ত্রের মূলসূত্র ও তত্ত্বগুলির কথা বলেছেন ইংরাজীতে। তন্ত্রমতে মুক্তিলাভের উপায়নির্দেশের সংখ্যা তিনটি —শাম্ভবোপায়, শাক্তোপায় ও আণবোপায়। (১) শাম্ভবোপায়ে সূত্রসংখ্যা ২২টি, শাক্তোপায়ে সূত্রসংখ্যা ১০টি এবং আণবোপায়ে সূত্রসংখ্যা ৪৫টি।

কাশ্মীরীয়-শৈবাগমে বা শিব-শাসনের মূলতত্ত্ব শিব, শক্তি, পরাপর ও অপর এই তিন শ্রেণীতে বা পর্যায়ে বিভক্ত ও আলোচিত। তাছাড়া কাশ্মীরীয়-ত্রিকতন্ত্র-দর্শনের আবার তিনটি বিভাগ—আগমশাস্ত্র, স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র। আগমশাস্ত্রের মূলতত্ত্বধারণা শিবের। শিবসূত্র বা ত্রিকশৈবসূত্রের আবিষ্কারকর্তা পণ্ডিত ও সাধক বসুগুপ্ত। কথিত-কাহিনী যে, স্বয়ং শিব বসুগুপ্তের হৃদয়ে এই আগমসূত্রতত্ত্বের প্রকাশ করেছিলেন ও পরে বসুগুপ্ত সাধারণে ঐ সূত্রতত্ত্ব প্রকাশ ও প্রচার করেন। রাজতরঙ্গিণীকার কহ্লনের মতে পণ্ডিত বসুগুপ্ত নবম খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ অবন্তি-বর্মনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন এবং শিবসূত্র ও সূত্রতত্ত্ব প্রকাশ করেন তিনি আগমানুরাগীদের সমাজে। শিবসূত্রে মোট চারটি তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে—(১) চরমতত্ত্ব পরাসম্বিৎ, (২) বিশ্বসৃষ্টি, (৩) বন্ধন ও (৪) মুক্তি। চরমতত্ত্ব শিব 'স্বভাব' নামে পরিচিত এবং শিবশক্তির নাম 'বিমর্শ'—যার আর এক নাম 'কর্তৃত্বশক্তি'। এই শক্তি আসলে চিত্তিরূপিণী পরাশক্তি বা পরাবাক্। এই পরাশক্তি বা

পরাবাক্ থেকে বিচিত্ররূপে বিশ্ববিকাশ সম্ভব হয়েছিল। 'চিৎ' অর্থে শিব এবং 'চিতি' অর্থে মহাশক্তি। ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াস্বরূপিণী এই মহাশক্তি। এই মহাশক্তি বা চিতিশক্তি থেকেই বিচিত্র তত্ত্বের প্রকাশ। তত্ত্ব—যেমন বিশ্বোত্তীর্ণ শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সদাশিবতত্ত্ব বা সাদাখ্যতত্ত্ব, ঈশ্বর বা ঐশ্বর্যতত্ত্ব, সদ্‌বিদ্যা বা শুদ্ধবিদ্যাতত্ত্ব প্রভৃতি। তাছাড়া শিব-স্বরূপের বিকৃতিরূপে আছে মায়াতত্ত্ব ও পঞ্চকঞ্চুক প্রভৃতি। কঞ্চুক প্রভৃতি কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি প্রভৃতি। মানসিক-তত্ত্বরূপে বুদ্ধি, অহংকার ও মনস্ বা মনঃ প্রভৃতি আছে। তাছাড়া স্থূলরূপে আছে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম বা আকাশ।

জীবের আণব-মলই বন্ধন ও সংসার। মুক্তি হ'ল এই আণব-মল প্রভৃতি থেকে মুক্ত বা উত্তীর্ণ হওয়া।

পূর্বে কাশ্মীর-গ্রন্থমালায় আগমশাস্ত্রগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। বর্তমানে মেসার্স মতিলাল বানারসীদাস দ্বিতীয় শোভন-সংস্করণ প্রকাশ ক'রে তন্ত্রজ্ঞানীদের মহৎ উপকারসাধন করেছেন, সেজন্য মেসার্স মতিলাল বানারসীদাস-প্রকাশন-বিভাগকে আমরা বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

৩। গল্পে অসুরনিধন। লেখক: শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত।
প্রকাশিকা: শ্রীমতী সুকৃতি সেনগুপ্তা। নীলাচল।
পো: নাটাগড়, ২৪ পরগণা।

"সর্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত।
মধ্যাকৃতা হি পরমাপ্রকৃতিস্ত্বমাদ্যা॥"

লেখক শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত গ্রন্থখানিতে চণ্ডীর উপাখ্যানের সারাংশগুলি শিশুদের উপযোগী ক'রে অতি প্রাঞ্জলভাষায় দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

গ্রন্থখানি ছোট আকারে হলেও দেবী মহামায়ার বর্ণনাগুলি শিশুদের অন্তরে শক্তি ও উদ্দীপনা জাগাবে। গ্রন্থখানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

—ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ

॥ প্রতিবাদ ॥*

(ক)

পরমপূজনীয়,
সম্পাদক মহাশয়,
'বিশ্ববাণী',
১১বি, রাজা রামকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

মহাশয়,

বিশ্ববাণীর ৪২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (শ্রাবণ, ১৩৮৭)-র ২৮৯-২৯০ পৃষ্ঠায় শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়ের "জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা"-প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হই। বিগত ১৩৮৪ শারদীয় 'সাহিত্যজগতে' ২৩-২৪ পৃষ্ঠায় আমার "রামকৃষ্ণজীবনীতে দুই উপেক্ষিতা নারী" (ভৈরবী ও ধনীকর্মকার) প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরেই দৈনিক বসুমতী, ডঃ সুকুমার সেন, সাহিত্যিক মদনচৌধুরী প্রমুখ প্রশংসাপত্র দেন। এখন দেখছি, দুর্গাপদবাবু আমার প্রবন্ধটি থেকে ২৬টি লাইন 'হুবহু নকল' (শব্দবাক্যসহ) ক'রে তাঁর প্রবন্ধে নিজ নামে চালিয়ে দিয়েছেন, অথচ কোথাও আমার নাম উল্লেখ করেন নি। আমি এই রকম শব্দবাক্য জালকে সমর্থন করি না ; এবং এ'ধরণের কার্য নিন্দনীয়। আপনার নিকট এই রকম জাল-করনের যথাযথ ব্যবস্থা-গ্রহণের জন্য প্রার্থনা জানাই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই দুর্গাপদবাবু ঐতিহাসিক সুধীরকুমার মিত্রের 'হুগলীমেলার দেবদেউল' থেকে ৭টি প্রবন্ধ জাল করে সম্প্রতি ধরা পড়েছেন। এছাড়াও তাঁর আরো-কিছু জাল আছে, আমি নিজ দায়িত্বে তার প্রমাণ দিতে পারি। ভবিষ্যতে তিনি এ'ধরণের কাজ না করলে আমরা অনন্দিত হবো।

মিহির চৌধুরী, কামিল্যা।

(খ)

সম্পাদকীয় মন্তব্য হিসাবেও আর একটি কথা এখানে বলি যে, 'বিশ্ববাণী', আষাঢ় (১৩৮৭) সংখ্যার ২৩৫ পৃষ্ঠায় শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় "জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের স্কুলগুরু"-প্রসঙ্গে যে লিখেছেন : "এই সময়ই রামকুমার শ্রীরামকৃষ্ণকে কেনারাম ভট্টাচার্য্যের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করান। পরে শ্রীমা সারদাদেবীও দীক্ষিত হন---"। আমরা কিন্তু শ্রীমার এই দীক্ষার কথা বা এ'প্রসঙ্গে কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থেই পাই না, বা কাহারও নিকটে শুনি নাই, সুতরাং এ'কথার কোন প্রামাণিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না।

---

* এ'সম্বন্ধে আর কোন প্রতিবাদ পত্র 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় প্রকাশ করা সম্ভব হবে না।

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1600)
19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man		Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization		Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30·00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	35.00		
Philosophy of Progress and Perfection			

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

1. Music : Its Form, Function and Value.
2. Music of the South-Asian Peoples, Vols. I—III
3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music, Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
5. Constructive History of Indian Music, Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

With the Compliments of :—

BATLIBOI & COMPANY LIMITED

Regd. Office : P. O. Box 190A V. B. Gandhi Marg

Fort, Bombay-400 023

MACHINERY DIVISION :

26, R. N. MUKHERJEE ROAD,

CALCUTTA-700 001

Tel : 23-8831/4
Telex : 021-7289
Cables : BATLIBOICO

With Best Compliments of :—

MIDNAPUR COTTON MILLS
PROP. THE INDIAN RAYON CORPORATION LTD.
Tantigaria, Midnapur (W. B.)

LEADING MANUFACTURERS OF STAPLE FIBRE, ACETATE VISCOSE AND OTHER MAN-MADE BLENDED YARN

Sales depos : Amritsar, Ludhiana, Surat, Tanda, Jalalpur, Maunathbhanjan and Erode.

Address	Grams	Telephones
Calcutta Office : Birla Building, 14th floor, 9/1, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-1.	'MIDSPIN' CALCUTTA	23-0752—Direct 22-3476) Extn. 23-7416) 275, 282
Mill Office Tantigaria, Midnapur (W.B.)	'MIDSPIN' MIDNAPUR	320, 538, 602, 323

PHONE NO. 34-3990

MODI RADIO CO.

DEALERS OF :

MURPHY RADIO, BUSH RADIO, T. V., TAPE RECORDER, STERIO & OTHER ELECTRONIC ITEMS.

—SALES & SERVICE—

EXPERT : REPAIRERS OF IMPORTED AND INDIAN TAPE RECORDER, STEREO, TWO-IN-ONE, THREE-IN-ONE ETC.

129/7, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA-700 007

(NEAR PROBHAT CINEMA)

Phone { Office : 55-6621
Factory : 55-1861

With the best Compliments of :—

LEONARD CARD-BOARD BOX FACTORY (P) LTD.

Art Printing, Card-Board Makers
Corrugated Board & Box
Manufacturers

Office :
29A, Aroubinda Sarani,
Calcutta-5

Factory :
1-1, Galiff Street,
Calcutta-3

Puja Greetings From :—

DECORINA

59, SIMLA STREET, CALCUTTA-700006

DESIGNER. INTERIOR DECORATOR AND

QUALITY FURNITURE MAKERS.

Phone 24-1592

REYNOLD'S

Patent

Products Manufactured by

National Asbestos Corporation

98, Middle Road, Calcutta-700 014

STEAM, HYDRAULIC

&

RUBBERISED PACKING HEAT-INSULATING 85% MAGNESIA

Phone : 55-4096

TARU ELECTRIC STORES

ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS AND CONTRACTORS.

Office & Workshop :

17/1, BHIM GHOSH LANE, CALCUTTA-6

Different types of Oil Engine, Dynamo, Electric Motor, Pump, Fan Etc. are available on hire and repairing done at moderate rates.
We also supply every type of electrical installation.
House-wiring is our speciality. Trial requested.

Puja Greetings From :—

RAJAT CHAKRABORTY

64, TALTALA LIBRARY ROW,

CALCUTTA.

Puja Greetings From :—

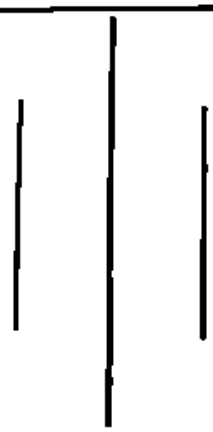

SAIN TRADING CORPORATION

ORDER SUPPLIERS & TRADERS.

25C, SWALLOW LANE,
CALCUTTA-700001

Proprietor :—

Sri Barindra Kumar Paul

With Best Compliments from :-

Mahamaya Pharmaceutical Agency.

Reg: Office

42B, Rajani Gupta Row, Calcutta-700009

Shop Room at

43, Ezra Street, Calcutta-700001

With Puja Greetings From :—

Santoshi Movies

1/1, VANSITART ROW,

CALCUTTA-700001

★

With the best compliments from :—

Ö SICERIN & BIVA

65B & C, Jatindra Mohan Avenue
CALCUTTA-700 005

STOCKIST OF GLAXO PRODUCTS
&
MANUFACTURERS OF QUALITY FILTER PAPER
FOR
RESEARCH, INDUSTRY, EDUCATION.

Phone : 55-5893 **Gram : FILTERORT**

Space Donated by :—

S. K. Jhunjhunwalla

1, Radha Kristo Sett Street,

Calcutta-700 006

Phone : 55-4044

With Compliments of :

S. K. Bhattacharyya & Co.

ARCHITECT • ENGINEER • CONTRACTOR

37A, B. K. PAUL AVENUE,
CALCUTTA-700 005

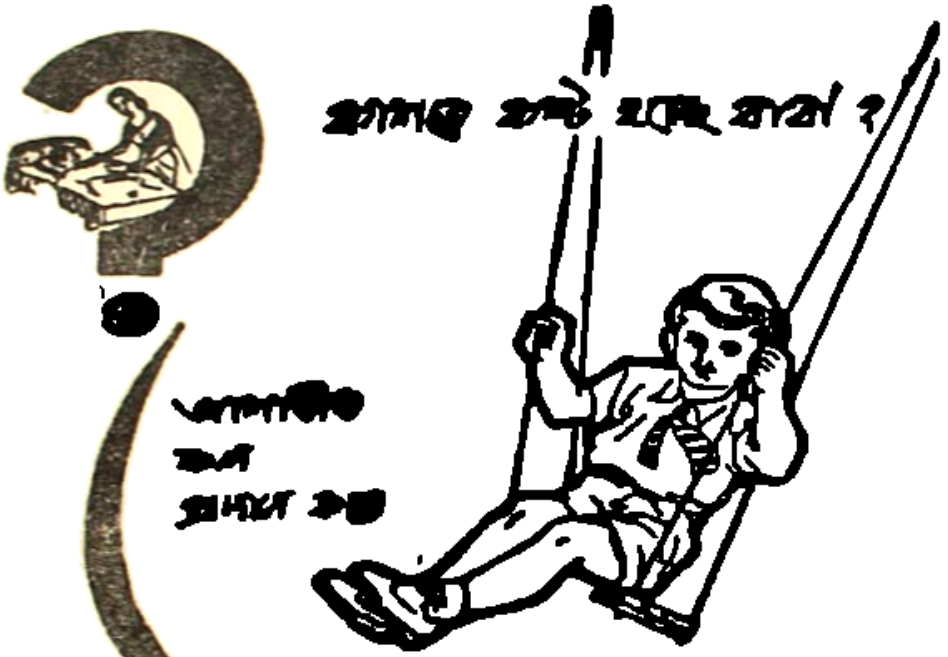

দুলালের তালমিছরী

বাতাসে
সিউলি
ফুলের গন্ধ...

বাতাসে সিউলির গন্ধ।
আকাশ হলো নীল।
এমন দিনে মন থাকে না
বন্ধ ঘরে।
দিগন্তে আজ ছুটির আমন্ত্রণ।

পূর্ব রেলওয়ে

medium

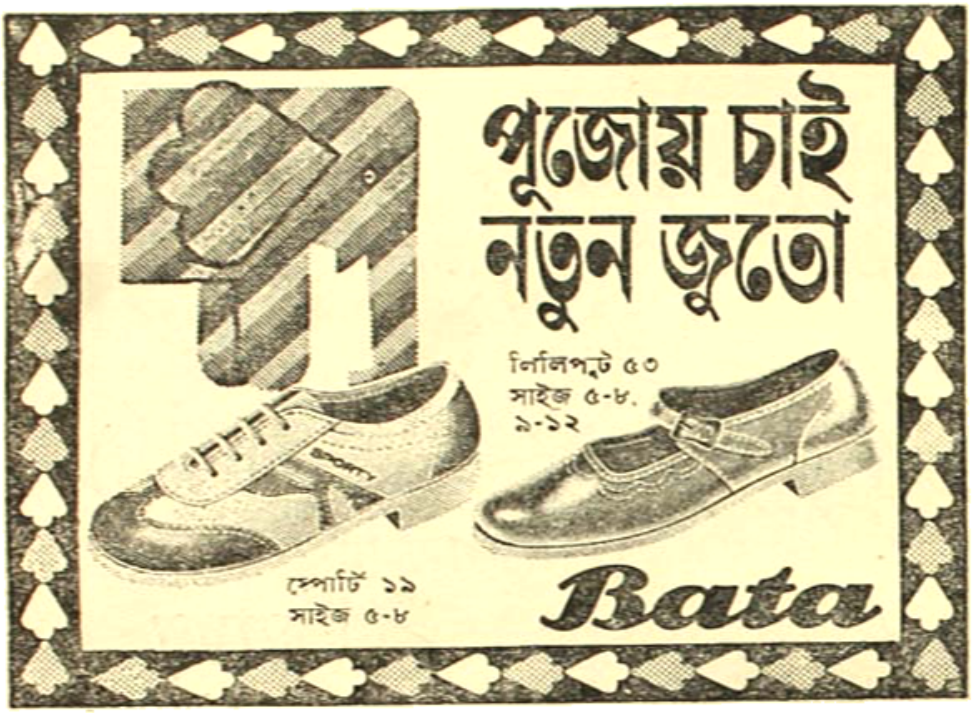

যেমন নির্ম্মল...তেমনি আশ্বাসের ভাব!

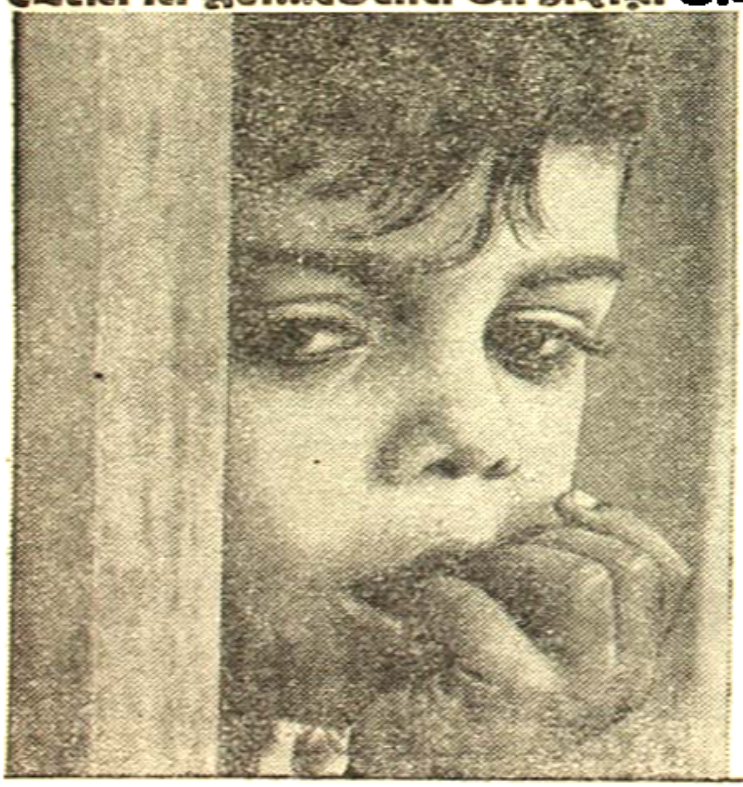

মধু তার ছটি ভাইটিকে দেখতে এইমাত্র হাসপাতালে গিয়েছিল। ওখানেই এ মনে মনে ঠিক করে নিল—বড় হয়ে ও ডাক্তার হবে!

এবার, তার ভবিষ্যৎ আপনারই হাতে। তার লেখাপড়ার এখন সুব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করতে হবে যাতে ও কখনও নিরাপত্তার অভাব বোধ না করে।

তাই আগে থাকতে ভাবুন... আপনার নিকটবর্তী ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখায় চলে আসুন। ওখানে আপনার বিভিন্ন চাহিদা মিটাতে নানাপ্রকার সঞ্চয় যোজনা আছে।

আসুন, ভারতের দ্বাদশ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে আপনার বাচ্চার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা উজ্জ্বল করে তুলুন।

ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
(ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান)
সেবায় ও সহযোগিতায় অবিচল

CONCEPT-BOI-4447 BEN

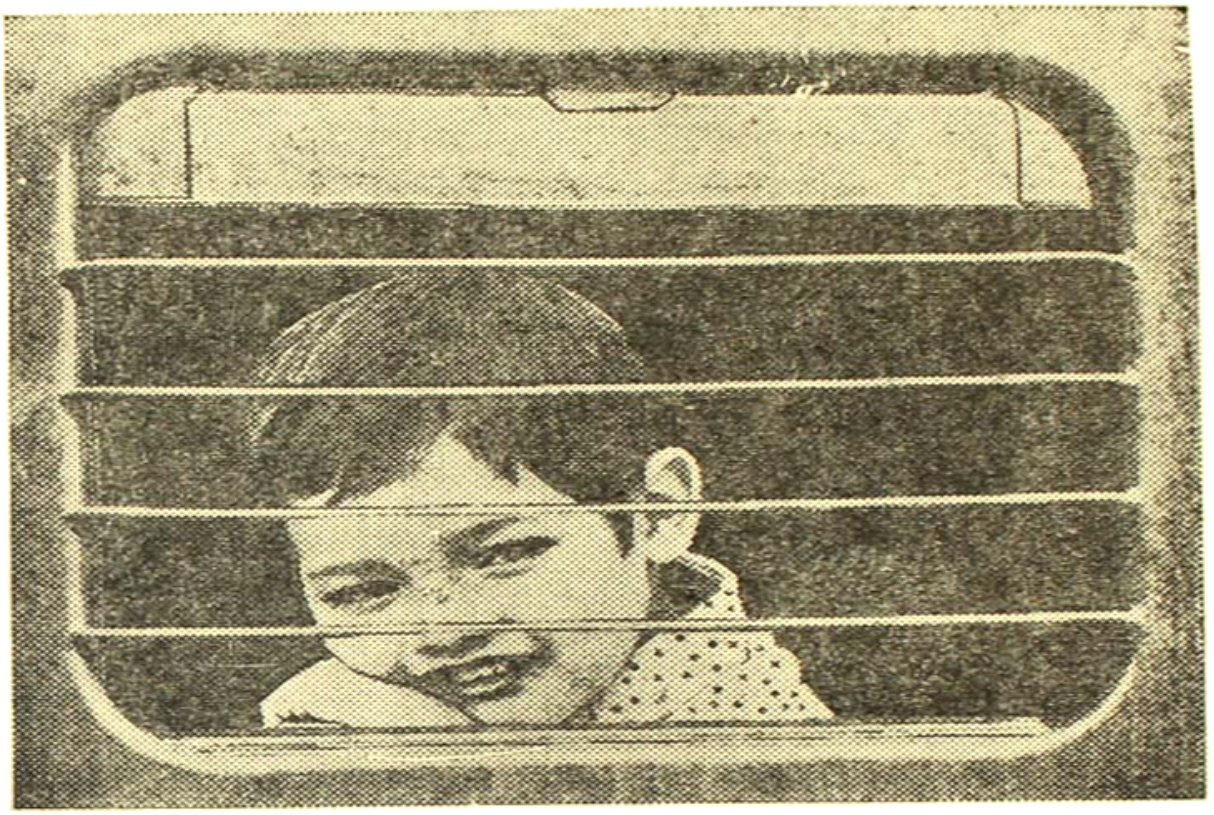

পরকে করেছ আপন বন্ধু, দূরকে করেছ কাছে...

ছোটদের নিয়ে বেড়াতে যাওয়া এখন আর মোটেই ব্যয়সাধ্য নয়। কারণ তাদের বয়স পাঁচ বছরের কম হলে, এখন থেকে আর কোন টিকিটই লাগবে না – তা সে যতদূরেই যাক না কেন।

শিশুরা জানে শিশুদের আমরা সত্যিই ভালোবাসি। ওদের কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখেছি। যেমন ধরুন, জাতি, ধর্ম, ভাষার গণ্ডী পেরিয়ে পরকে আপন করে নেওয়ার মন্ত্র, কি করে দূরকে নিকট করতে হয়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আপন কর্মে বিভোর থাকতে হয়। আমরা অকৃতজ্ঞ নই। আমরাও চাই তাদের কিছু দিতে।

তাইতো আমরা আমাদের শিশুদের জন্য এই পুরস্কারটি বেছে নিয়েছি। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে রেলওয়ে যেমন জাতি, ধর্ম, ভাষা নির্বিশেষে সবাইকে গেঁথে নিয়েছে, তেমনি আমরা চাই শিশুরা এখন থেকে থাকুক সেই মালার মধ্যমণি হয়ে। তারা আমাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াক ভারতের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত—গেঁথে নিক ভারতকে একই সুতোয়, একই মালায়।

আপনাদের
নিরন্তর সেবায় ব্রতী

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

Phone No. 33-5709

MESSRS. K. M. CHOPRA & CO.

Timber Merchant & General Order Suppliers
Specialist in 1st class. C. P. Teak Wood, Badams. Sal &
Hard Wood Etc.

Office :
65/1, Maharshi Debendra Road.
Katgola Lane.

Saw mill :
68, Maharshi Debendra Road.
Nimtalla, Calcutta-6.

Phone : 34-7399

S. SARKAR & BROTHERS

72, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

ORTHOPÆDIC & DEFORMATIC APPLIANCES

Manufacturers of :

Artificial Limbs, Deformatic Shoes, Walking Calipers, Spinal Braces, Lumber Corsets, Hernia Trusses, Abdominal Belts, Cervical Collars Etc.

Specialist in ARTIFICIAL LIMBS

Phone No. 33-1626

BIDHU BHUSAN DUTT & CO. (P) LTD.

Regd. Office :
20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, CALCUTTA-7

Stockists and Agents :
TATA, IISCO, HINDUSTAN STEEL & ASBESTOS CEMENT LTD.

All kinds of Everest Asbestos Sheets, Galvanised Sheets and Black plain Sheets are always available from ready stock. Prompt and Special attentions are given to our customers.

Gram : Holselti

Phone : 26-2403, 27-2404, 27-9811

B. K. SAHA & BROS LTD.

TEA MERCHANT

5, POLLOK STREET, CALCUTTA-700001

(We have No Branch)

পুরস্কার যখন নিজেই সম্মানিত হয়

আর্তজননী টেরেসাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত করে 'নোবেল' পুরস্কার এবার নিজেই সম্মানিত।

আর সম্মানিত হ'ল এই পশ্চিমবাঙ্গলা, যেখানে এক নিবেদিতপ্রাণা অষ্টাদশী তাঁর জীবনের দুষ্কর ব্রত শুরু করেছিলেন জাতিধর্মনির্বিশেষে আর্তের সেবায়। যার আর এক নাম ভালবাসা। অনাথ ও আতুরের প্রতি স্নেহময়ী জননীর অনাবিল, নিঃস্বার্থ ভালবাসা।

যে সমাহিত তাপসীর হৃদয়ে ঈশ্বর ও ভালবাসা অভিন্ন, যিনি এই রাজ্যকে মানবতা ও শান্তির মানচিত্রে চিরকালের জন্য চিহ্নিত করে গেলেন, সেই মহাপ্রাণাকে আমাদের প্রণাম।

★

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

নির্ম্মল লেখার জন্য

বিশিষ্ট সাংবাদিক
শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন—
নির্ম্মল পেন ব্যবহার করে আমি আনন্দিত হয়েছি। কারিগরীর তৈরী হলেও মূল্য এই কালিহীন পেন ছাত্রছাত্রীরা সুখেই ব্যবহার করতে পারেন।

নির্ম্মল পেন

যাদুসম্রাট
পি. সি. সরকার বলেন—
আমি দীর্ঘদিন যাবৎ নির্ম্মল পেন ব্যবহার করিতেছি এবং ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই পেন ব্যবহারে সকলেই যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

নির্ম্মল ষ্টোর্স
১, রামমোহন মল্লিক লেন • মনিহারিপট্টি • বড়বাজার • কলিকাতা-৭

PURE • FRESH • GENUINE

Manufacturers :- SHIWNARAIN RAMNARAIN & CO.
ONLY AUTHORISED AGMARK GHEE PACKER IN WEST BENGAL
PHONE : 33-3540 . 3. BURTOLLA STREET, CALCUTTA-7

Phone : 36-1297

THE ARTISAN

107/A, B. B. GANGULI STREET

CALCUTTA-700012

DESIGNERS. BLOCK-MAKERS & COLOUR PRINTERS

Phone : 33-1609

With Compliments of :—

Chandra Kanta Manna & Co. (Private) Ltd.

★

IRON & HARDWARE MARCHANTS

Govt. Controlled Stockists for Iron and Steel

20, MAHARSHI DEBENDRA ROAD,
CALCUTTA-700007

Phone : 24-2207 08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

23, CONVENT ROAD,
CALCUTTA-700014

Telex : 021-2640 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য মূলগ্রন্থ
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রী-ম কথিত

(৫ম খণ্ডে সমাপ্ত) মূল্য : প্রতি সেট : কাপড় ৭০ টাকা, বোর্ড ৬০ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার ভাণ্ডারী, তাঁর "আদিষ্ট" ভাগবতকার হলেন শ্রী-ম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)। "কথামৃত" শুনিয়া শ্রীশ্রীমা বলেন শ্রীম'কে—"তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন"। স্বামীজী উচ্ছ্বসিতভাবে বলেন, "...এখন বুঝিলাম...এই মহান ও বিশাল কাজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। মনীষী Romains Rolland বলেন, Sri M's work is of Stenographic exactitude. মনীষী A. Huxley বলেন, Sri M's work is Unique in the World's literature of hagiography ইত্যাদি।

প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)।
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০ ০০৬। ফোন : ৩৫-১৭৫১।

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

—হাওড়া— কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)
শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

PLANT AND MACHINERY

Specialists in Generating Sets & Pumps

3, MANGOE LANE, (1st Floor)

CALCUTTA-700 001

Phone : 23-3265
23-7620

Gram : FREQUENCY

With Best Compliments from :

M G F

THE MOTOR & GENERAL FINANCE LIMITED

(ESTD. 1930)

With Compliments from :—

HOWRAH MOTOR ACCESSORIES AGENCY (P) LTD.

3/1, MANGOE LANE

CALCUTTA-700 001

With Best Compliments of :

Phone : { 22-2761 / Ramgarh-271

INDIGENOUS ENTERPRISE CO.

Calcutta Office :
19, STRAND ROAD, CALCUTTA-700001

P. O. MARAR
Dist. HAZARIBAGH, BIHAR

Space Donated By

★

A WELL WISHER

Phone : 33-2038

H. P. TIMBER TRADING CO.

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

65/1, MAHARSHI DEBENDRA ROAD, (Nimtolla)
CALCUTTA-60006

Phone : { Office : 33-5953 / Resi. : 27-7062

SHARADA TRANSPORT AGENCY

PREMIER ROAD CARRIERS

For West Bengal, Bihar. U. P., M. P., Bombay, Punjab & all over India

37, KALIKRISHNA TAGORE STREET
CALCUTTA-700 070

JOIN **ULIP** FOR

★ **LIFE COVER**
★ **HIGH RETURN**
★ **TAX REBATE**

UNIT LINKED INSURANCE PLAN FROM

UNIT TRUST OF INDIA

(A Public Sector Financial Institution)
4, Fairlie Place, Calcutta-700 001
Phone : 23-9391, 23-1639

1. **Family Benefit Deposit :**
   Rs. 100/- only per month brings you after 10 years Rs. 19,423/-
2. **Monthly Income Certificate :**
   Rs. 13,334/- only for 63 months brings you
   Rs. 100/- every month while your deposit remains intact
3. **Cash Certificate :**
   Rs. 5,000/- only brings you after 10 years Rs. 12,177.50
4. **Recurring Deposit Account :**
   Deposit only Rs. 10/- per month to get after 7 years Rs. 1,170/-

We have also many other attractive investment schemes

UNITED INDUSTRIAL BANK LIMITED

Head Office : **17, R. N. Mukherjee Road, Calcutta-700 001**
Regd. Office : **7, Red Cross Place, Calcutta-700 001**
Chairman : **J. N. Biswas**

With Best Compliments of :

BRITISH ELECTRICAL AND PUMPS PRIVATE LTD.

4, B. B. D. BAG EAST,

CALCUTTA-700001

Grams :	Telex :	Phones :
'BHOWMKAL'	021-2426	22-7826, 27, 28 & 23-8714

Phone : 44-1247

With Compliments from :

TRANSLINKS

60A, CHOWRINGHEE ROAD,

CALCUTTA-700 020

THE NEW INDIAN PRESS

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET, CALCUTTA-700006

Phone : 26-7168

With Best Compliments of :—

CHATTERJEE BROTHERS

NO. 7, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1

DEALERS IN PHILIPS LAMPS AND RADIO
DISTRIBUTOR OF VENUS WATER HEATER

With Best Compliments from :—

HANDAK BROS (P) LTD.

22, RABINDRA SARANI,

1st Floor, F. N. 38

CALCUTTA-700001

ফোন : ৩৪-২১৭৫

সৌন্দর্য্যের প্রতীক

নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

যাবতীয় বাইণ্ডিং ও কার্টুন কাজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS CALCUTTA-700005

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

রূপচর্চ্চায়

কে.হোড়ের

প্রসাধনী

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া

বেনারসী সিল্ক সাড়ী পোষাক

শৈলেলাল মণিলাল
স্টোর্স
১৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট · কলি-১২
(বসুমতী ভবনের পার্শ্বে)
বহুবাজার ৩৫-৮৬৩৭ ○ শ্যামবাজার ৫৫-২০০৭

কাশ্মিরী শাল বিছানা হোসিয়ারী

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা
তিল তৈল

শুদ্ধ ও সুগন্ধযুক্ত তিল তৈল বহুদিন ব্যবহার করুন।
ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী প্রতিযোগিতায়
স্বর্ণ পদক-প্রাপ্ত তৈলের উপর প্রতিষ্ঠিত

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সম্মিলন, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রঃপুত এই কবচ ধারণে পরীক্ষার পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—কুতা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
প্রকাশন বিভাগ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৫৫-১৮০০

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্থপার-অফ্-বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

★

APPRECIATION

We extend our heartiest appreciation to all our well-wishers, particularly to those concerns whose co-operation and contributions in the shape of advertisements and donations have made possible the publication of this Puja Special of VISVAVANI at a nominal price.

Wishing all of them peace and happiness.

With Best Compliments from :

Sri Ma Trading & Finance

45, LENIN SARANI, CALCUTTA.

EXPORTERS & IMPORTERS
GENERAL ORDER SUPPLIERS, INVESTORS AND
COMMISSION AGENTS.

With Best Compliments from :

WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LIMITED

(A GOVT. COMPANY)

MANUFACTURERS OF :

RAILWAY & ROAD BRAKES AND SIGNALLING
EQUIPMENTS, AGRICULTURAL PUMPS, POWER
TILLERS AND OTHER ALLIED ITEMS.

17, CONVENT ROAD, ENTALLY, CALCUTTA-700 014
Phone No : 24-7161 (7 Lines). Telegram : INTERLOCK
Telex : 021 2348

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
PUJA SPECIAL NUMBER
42nd Year, October 1980
VOL. VIII

Regn. No. WB/N
PHONE 55-

Published and Printed by Swami Parametmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6,Duff Street, Calcutta-
PRICE Rs. 5.00 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ৫.০

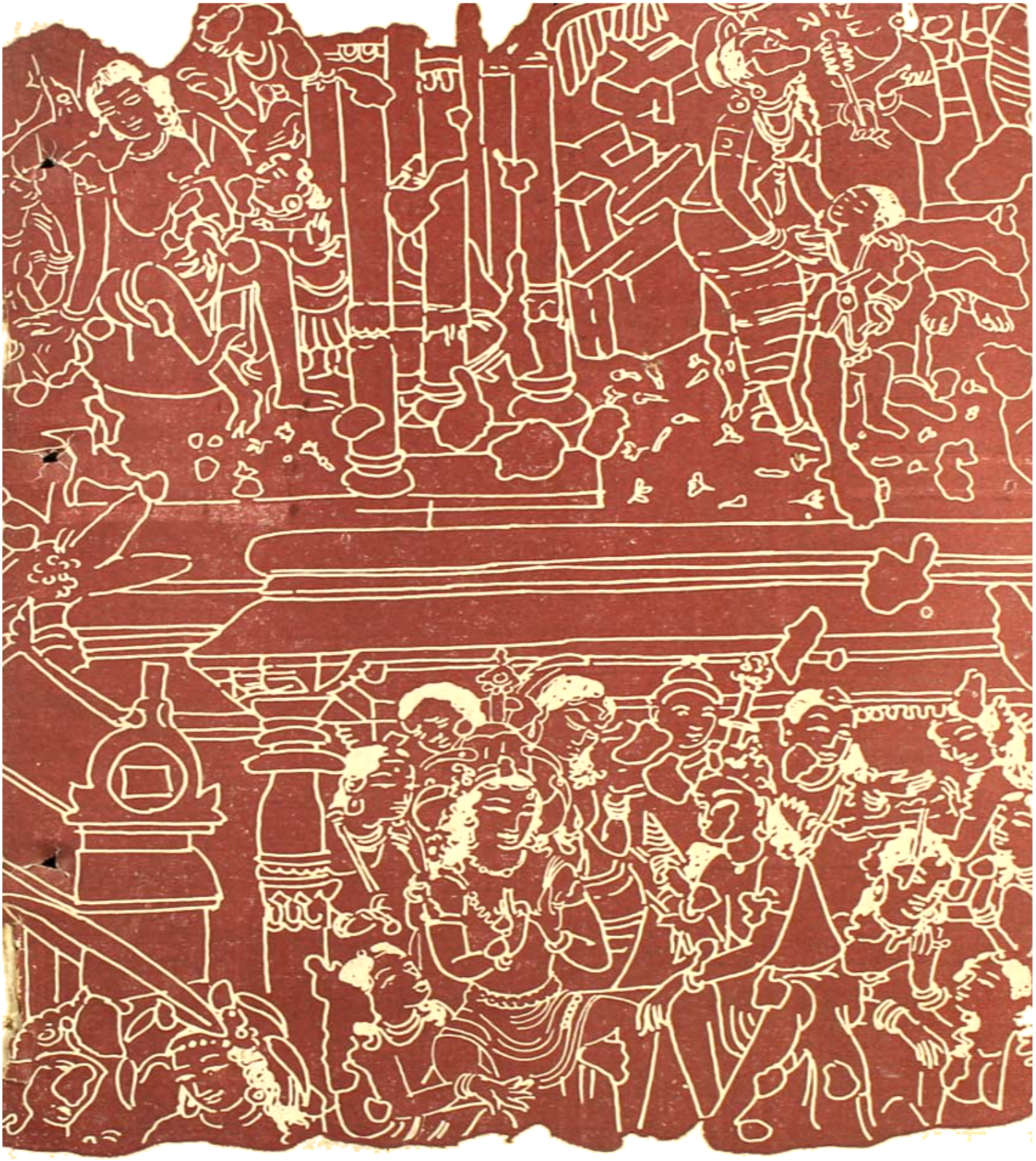

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
নবম সংখ্যা
কার্তিক
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬'০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে যন্ত্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১'৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১'০০ টাকা ও ৬'০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

  বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১০ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।

- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২'৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

রবিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মি: থেকে ১১-০০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

ফোন : ৫৫-৭৬০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিশ্বাসসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২৮·০০
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২৫·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৫·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম·এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙ্গালী ৮·০০

বীরত্বে বাঙ্গালী ৬·০০

বিজ্ঞানে বাঙ্গালী ১০·০০

বাংলার ঋষি ৮·০০

বাংলার মনীষী ৪·০০

বাংলার বিদুষী

ব্যবহারিক শব্দকোষ

(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরুপথের পারে	প্রকাশের অপেক্ষায়	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	প্রকাশের অপেক্ষায়
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	১৪·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	১৬·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২·০০	হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	৩·৫০
		ঐ ২য় খণ্ড	১·৫০

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৫৫-১৮০০)

১৯-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটেন্ট ঔষধের

ডাঃ সেনস

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ কলপ্রদ

সেন্‌স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৪-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ECONOMIC ROADWAYS
CORPORATION

We are thoroughly professional.
We believe in keeping our customers happy
begining with economical freight rates.
We also give goods, big or small, every care
from the time it is loaded on our trucks
to the time it delivered safe to destination.
From any viewpoint, it's economical to us

ECONOMIC ROADWAYS
CORPORATION

P-9, New C. I. T. Road, Calcutta-700 073.
Phone : 27-7704/7214
Booking Office :
Phone : 279291/3534, 69-2414
Delivery Office : Phone : 55-0515.

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯) ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JEET" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES.
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

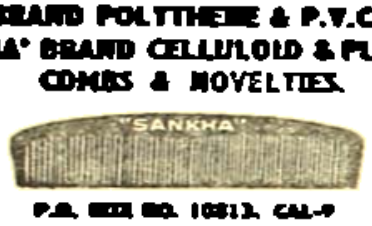

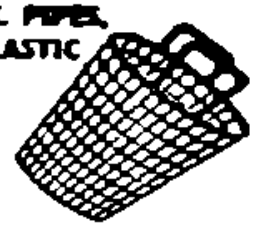

P.B. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

PHONE: 33-

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নির্য্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-১

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৪৪-১৮০০

কার্তিক, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

। উপদেষ্টামণ্ডলী ।

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

। সহায়কমণ্ডলী ।

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

। প্রচ্ছদপট শিল্পী ।
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীসুবোধ দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়জাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এ'টি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়া।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৮, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

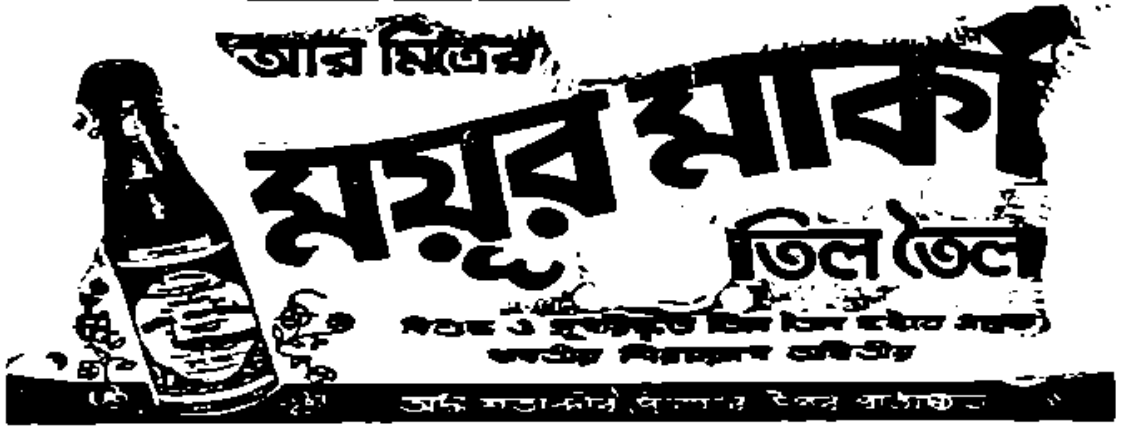

ফোন নং ৪৬-৮৪১৮

যোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

কার্তিক, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী বিচার	৪৮৭	
২।	সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	৪৯৫	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	বিবেকানন্দ মননালোকে সমাজ বিকাশের ধারা	৪৯৭	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৪।	জাপানের কাবুকি নাটক	৫০০	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৫।	তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	৫০২	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৬।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৫০৭	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৭।	কেন হিন্দুরা খ্রীষ্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে—স্বামী অভেদানন্দ	৫১০	অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৮।	কালিদাসে সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ : অশ্ব ও ব্যাঘ্র	৫১৩	অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য
৯।	শিল্পের দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৫১৫	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১০।	সংঘ-বার্তা	৫১৮	

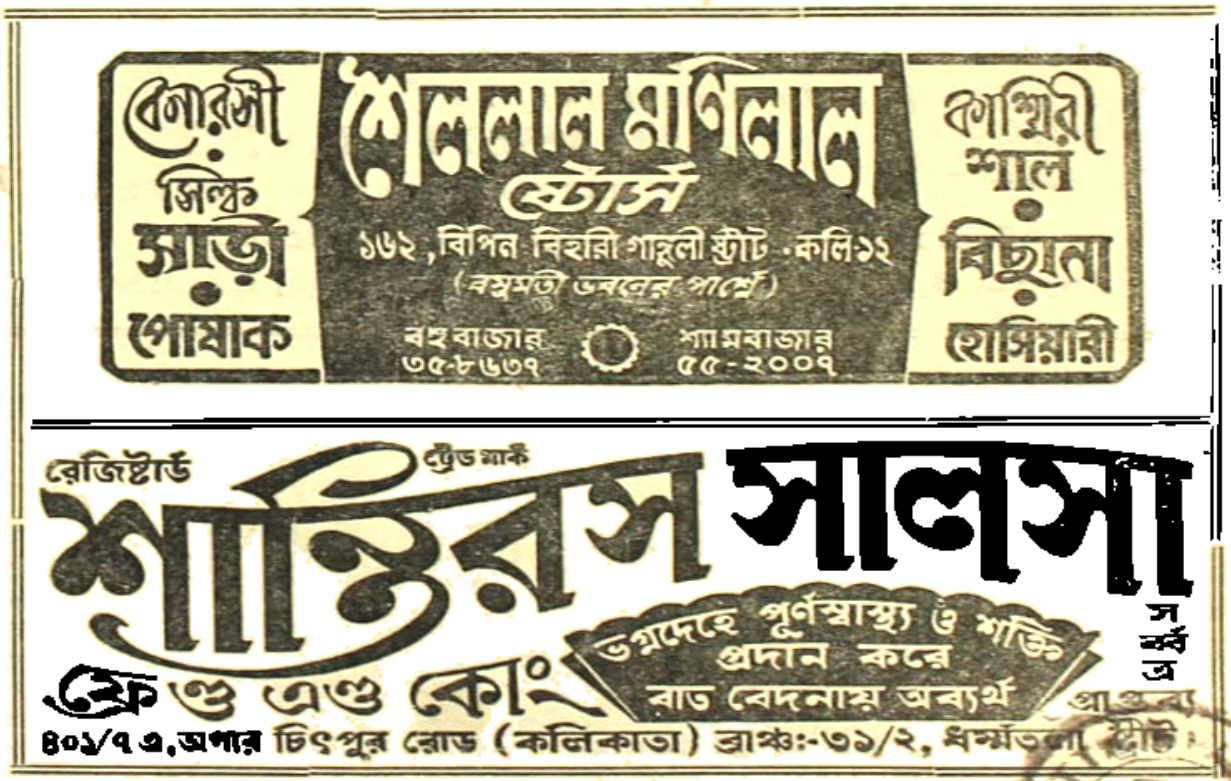

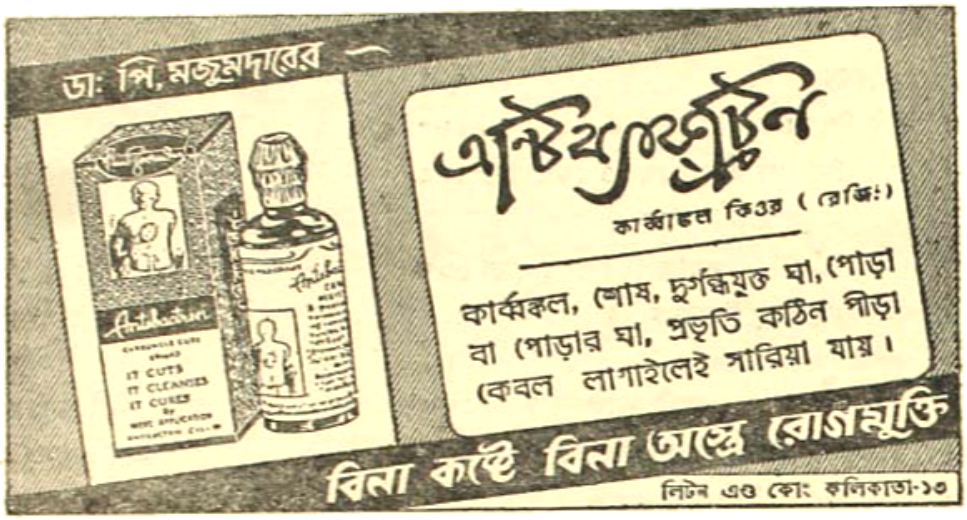

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

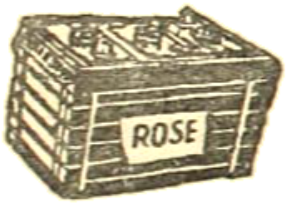

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

89, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

বিয়াল্লিশ বর্ষ	নবম সংখ্যা	কার্ত্তিক ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(ষষ্ঠাংশ)

॥ ঈশ্বরের দিব্যাবতরণ ॥

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-গ্রন্থে শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যজীবনসম্বন্ধে আলোচনা করেছেন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা প্রাতঃস্মরণীয় ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের গয়াধামে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের প্রসঙ্গে এ'সব কাহিনীরই উল্লেখ করেছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য পরবর্তী জীবনীকাররা শ্রীশ্রীলীলাপ্রসঙ্গকেই অনুসরণ করেছেন। গয়াধামপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে গদাধর শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু-ভগবান শ্রীশ্রীনারায়ণের অবতার সেকথা বোঝা যায়। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—শক্তির অবতার। শক্তি বলতে মায়াশক্তি। মায়াশক্তিকে আশ্রয় করেই স্বয়ং ঈশ্বর হন সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর; অর্থাৎ ঈশ্বর মায়াধীশ, কিন্তু মায়াশক্তির সহায়তা নিয়ে তিনি পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হন। গীতার ৪।৬ শ্লোকে 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা···প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া' শ্লোক ঐ কথার বা তত্ত্বেরই নির্দেশ দেয়। 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'—আচার্য মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করেছেন: "প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমদঘটমানঘটনাপটীয়সীং 'স্বাং' স্বোপাধিভূতা 'মধিষ্ঠায়' চিদাভাসেন বশীকৃত্য 'সম্ভবামি' তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি'। অনাদি মায়া ঈশ্বরেরই (সগুণ-ব্রহ্মের) উপাধিস্বরূপ ও এই উপাধিযুক্ত (গুণযুক্ত) হয়েই ঈশ্বর জ্ঞাৎকারণরূপে পৃথিবীতে

অবতরণ করেন। সৃষ্টিই মায়া অর্থাৎ, মায়াশক্তির বিকাশ বা বিলাস এবং এই বিলাসরূপ বিশ্বলীলা করেন সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর। এজন্য বলা হয়, ব্রহ্ম ও শক্তি—সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর ও মায়াশক্তি প্রকৃতির লীলাভূমি এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগৎ। মায়াশক্তি-ছাড়া সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর জগৎকারণরূপে বিশ্বলীলা সার্থক করতে পারেন না, সেজন্য জগৎকারণ ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তি মায়ার মধ্যে একটি অবিনাভাবসম্পর্কযুক্ত সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, সেজন্য শক্তি বা মায়া ও শক্তিমান ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম যেন এক ও অভিন্ন—'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'। সুতরাং গীতার ৪।৬ শ্লোকের আলোকেই আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করবো ব্রহ্ম ও শক্তি—শক্তিমান ও শক্তি কিভাবে অভেদ বা অভিন্নসত্তাসম্পন্ন—টীকার এ'পীঠ ও'পীঠ।

নির্গুণ-ব্রহ্মে গুণের ও মায়ার লেশমাত্র নাই, সুতরাং তাঁর জন্ম-মৃত্যুর বা হ্রাস-বৃদ্ধি সকল-কিছুর সঙ্গে তিনি সম্পর্কহীন। তিনি সর্বাতীত অথচ সর্বানুস্যূত ব্যাপক পরমচৈতন্য। বিরাট প্রাণসত্তাই তাঁর একমাত্র পরিচয়। কিন্তু একথাও আবার সত্য যে, মায়াসহকৃত বা মায়াশবলিত সগুণ-ব্রহ্ম মায়ার সহায়তা-ছাড়া নির্গুণ-ব্রহ্মের সত্তাও নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মায়া উপাধি, কিন্তু এই উপাধি দিয়েই উপাধিবর্জিত নির্গুণ-ব্রহ্মের সত্তা নিরূপিত হয়। কথা এই যে, সীমাহীন অসীম ও সর্বব্যাপক প্রাণসত্তার সত্যকারভাবে কোন উপাধি নাই, সুতরাং অভিধা নাই, নাম নাই ও রূপ নাই, অথচ তাঁকে তুরীয় বা চতুর্থ বলা হয় বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই চৈতন্য-তিনটির সঙ্গে তুলনা ক'রে। প্রকৃতপক্ষে সর্বাতীত তুরীয়চৈতন্যের তুলনাও কোন বস্তুর বা সত্তার সঙ্গে করা চলে না, কেননা তুলনার প্রচেষ্টারূপ কর্ম বা ক্রিয়া আপেক্ষিকতারূপ সঙ্কীর্ণ সীমার ধারণা সৃষ্টি করে। সেজন্য গীতায় ৪।৬ শ্লোকে যে বলা হয়েছে "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা···সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া"—সেই চৈতন্যসত্তা ঈশ্বর—যিনি সগুণ-ব্রহ্ম, কিন্তু স্বরূপে তিনি নির্গুণ-ব্রহ্মের উপরই (আসনেই) প্রতিষ্ঠিত। 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ব্রহ্মের নির্বিকার ও নির্গুণ স্বভাবের কথা প্রমাণ ও আলোচনা ক'রে 'নির্বিকারং নিগুণমেব ব্রহ্ম' স্বীকার করেছেন, কিন্তু মায়ার সাহচর্যে ঐ নির্গুণ-ব্রহ্মই আবার সগুণরূপে পরিচিত হন।[১] সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর জন্ম-মৃত্যু-বিকারের অতীত, কেননা বিকারধর্মী হ'লে তার জন্ম-মৃত্যু ও হ্রাস-বৃদ্ধি থাকে এবং সসীমতার গুণ ও প্রকৃতি নিয়ে তিনি পার্থিব সম্পদেরই সামিল হন। আসলে কিন্তু তিনি নির্গুণ-স্বভাব বা গুণাতীত এবং সকল বিকারের অতীত। তাছাড়া ঈশ্বরই আবার অব্যয়, অজ, বিশ্বচরাচরের কারণ বা পরমকারণ—'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা···' প্রভৃতি বলেছে গীতা মায়াশক্তিসহকৃত অথচ মায়াধীশ সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরকে নির্দেশ ক'রে।[২] শ্রীধর-স্বামী তাঁর 'সুবোধিনী' (সুবোধিনী—সহজ ও সুখবোধ্য) টীকায় গীতার ৪।৬ শ্লোকের উপর আলোকপাত ক'রে বলেছেন : "অজঃ (জন্মশূন্যঃ) অপি সন্ অব্যয়াত্মা (তথা অনশ্বর স্বভাবঃ অপি সন্)

১। অদ্বৈতসিদ্ধি (নির্ণয়সাগর-প্রেস), পৃঃ ৫৩৯, ৬৪০ দ্রষ্টব্য।

২। নির্গুণ-ব্রহ্মসত্তা দিয়েই ব্রহ্মের সগুণস্বরূপ নির্দিষ্ট হয়, আবার সগুণস্বভাব ব্রহ্মের কল্পনা করার জন্য নির্গুণত্বের কল্পনা করাও সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মস্বরূপতা সগুণ-নির্গুণের অতীত এবং দ্বৈত ও অদ্বৈতের অতীত।

ভূতানাং (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তানাম্) ঈশ্বরঃ (কর্মপারতন্ত্র্যরহিতঃ) অপি সন্···স্বাং (শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং) প্রকৃতিং (বৈকণ্ঠীমায়াং ত্রিগুণাত্মিকাম্) অধিষ্ঠায় (স্বীকৃত্য) আত্মমায়য়া (স্বমায়য়া । সম্ভবামি (স্বেচ্ছয়া অবতারামীত্যর্থঃ)" । স্বামীপাদ টীকার মধ্যে শ্লোকোক্ত 'অপি-সন্' বা 'হয়েও' শব্দগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন এজন্য যে, ঈশ্বর সমষ্টিধারাশক্তির বা সর্ববীজময়ী-মহাপ্রকৃতির সহবাসী হলেও জন্ম-মৃত্যুশাসিত অনিত্য সংসারক্ষেত্রে মানুষের মতো দেহ ধারণ করার কোন সার্থকতা নাই, অথচ তিনি যুগপ্রয়োজনে কল্যাণব্রতপালনের জন্য যুগে যুগে আসেন বলতে 'অবতরণ করেন'—যেজন্য তাঁকে 'অবতার' বলা হয় ।

আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরের এই দিব্যাবতরণসম্বন্ধে যেকথা যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেছেন, আচার্য মধুসূদন সেকথারই উল্লেখ ক'রে গূঢ়ার্থদীপিকায় বলেছেন : "উক্তঞ্চ ভগবতা ভাষ্যকারেণ (শঙ্করেণ)—'স চ ভগবান্ (ঈশ্বরঃ) জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্ন-ত্রিগুণাত্মিকাবৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনা-ভাবেঽপি ভূতানুগ্রহিষ্ণুতয়া' ইতি" । পরে আচার্যপাদ শঙ্করের মতবাদ শ্রদ্ধাসহকারে স্বীকার ক'রে তিনি বলেছেন : "ব্যাখ্যাতৃভিরুক্তং স্বেচ্ছাবিনির্মিতেন মায়াময়েন দিব্যেন রূপেণ সম্ভবেতি 'নিত্যো যঃ কারণোপাধির্নীরাধ্যোঽনেকশক্তিমান । স এব ভগবদ্দেহ ইতি ভাষ্যকৃতম্ মতম্' ।" 'ভাষ্যকৃতম্ মতম্' বলতে আচার্য শঙ্করের অভিমত । এই অভিমত-অনুসারে জানা যায় যে, ঈশ্বর নিজের মায়ার প্রভাবে স্বেচ্ছায় ('আত্মমায়য়া স্বেচ্ছয়া') জন্মগ্রহণ করেন দিব্য-ভাগবতী-তনু নিয়ে । মনুষ্যরূপে মায়ার সংসারে জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ঐশ্বরিকশক্তিসম্পন্ন অপার্থিব ও স্বাধীন স্বভাবেই থাকেন, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও ভাগবতী ইচ্ছা ও কর্মের কোন হানি হয় না । এজন্য দেখা যায়, ঈশ্বরের অবতারগণের অমানব-অপার্থিব জীবনচরিত্রে ও জীবনকর্মে বিচিত্র রকমের ঈশ্বরীয় শক্তির বিকাশ দেখা যায় ।

॥ মধুসূদন সরস্বতীর মতে ঈশ্বরের দেহ-দেহী-ভাব ॥

কিন্তু মধুসূদন সরস্বতী আচার্য শঙ্করের মতানুসারী হলেও কিছুটা এখানে ভিন্নমতেরও উল্লেখ ক'রে বলেছেন : 'অন্যেতু'—'কেহ কেহ', অর্থাৎ তিনি অন্য অভিমতও পোষণ করেন । প্রশ্ন যে, সেই অন্য মতামতটি কি ? অন্য অভিমতের উল্লেখ ক'রে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন : "অন্যেতু পরমেশ্বরে দেহদেহিভাবং ন মন্যতে",—অন্য কেহ কেহ (ভাষ্যকার) পরমেশ্বরের দেহ-দেহী-ভাব স্বীকার করেন না, কেননা "যস্ত নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান বাসুদেব পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা স এব তদ্বিগ্রহো নান্যঃ কশ্চিদ্ভৌতিকো মায়িকো বেতি", অর্থাৎ 'যিনি নিত্য বিভু চিন্ময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান, সুতরাং তাঁর অন্য কোন ভৌতিক বা মায়াময় শরীর নাই, কিংবা থাকাও যুক্তিসঙ্গত নয়, সুতরাং বলতে হয় তিনি 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'—আকাশের মতো সর্বগত ও সর্বত্রবিস্তৃত, সুতরাং সীমাহীন অনন্ত বলে সীমার সঙ্কীর্ণতা ও দৈন্য তাঁর মধ্যে থাকতে পারে না । তারপর সর্বগত হলেই সর্বাবভাসক বা সকলের ও সকল-কিছুর তিনি প্রকাশক,

সুতরাং নির্গুণস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন ভগবানের পক্ষে মায়িক বা মায়াময় পার্থিব-শরীরধারণ হতেই পারে না। এ'কথা অবশ্য যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু ঈশ্বর জন্মরহিত হয়েও যখন মায়ার সংসারে অবতীর্ণ হন, তখন মায়া কিছু-না-কিছু তাঁর দেহকে স্পর্শ করেই। এর উত্তরে কোন কোন দার্শনিক বা ভাষ্যকার বলেন যে, ঈশ্বর দেহ ধারণ করলেও তাঁর ভগবত্তী-তনু সর্বদাই মায়ার অতীত, কিন্তু আমরা—যারা সাধারণ মানুষ ভ্রমের অন্ধকারে থেকে ভাবি যে, তিনি মায়ামালিন্যযুক্ত হন। এ'সম্বন্ধে অর্থাৎ এই শেষোক্ত মতের অনুসরণকারী স্বয়ং আচার্য মধুসূদন সরস্বতী। সেজন্য তিনি 'গূঢ়ার্থদীপিকা'-ভাষ্যে স্বীকার ও সমর্থন ক'রে স্পষ্টভাবেই বলেছেন: "বস্তুগত্যা জন্মবিনাশ-রহিতঃ সর্বভাসকঃ সর্বকারণমায়াধিষ্ঠানত্বেন সর্বভূতেশ্বরোঽপি সন্নহং প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দ-ঘনৈকরসং মায়াং ব্যাবর্তয়তি স্বামীতি"; অর্থাৎ মায়ার স্পর্শ থেকে অবতারকে সেই সকল দার্শনিক বাদ দিতে চান। তাঁরা বলেন যে, ঈশ্বর নিজের মহিমায় দেহ ধারণ ক'রে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করলেও (অবতরণ করলেও) তাঁর মায়াতীত স্বরূপ দেহধারণেও অপরিবর্তিতই থাকে: "নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। 'স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত? স্বে মহিম্নি'—ইতি শ্রুতেঃ, স্ব-স্বরূপমহিম্নায় স্বরূপাবস্থিত এব সন্ সম্ভবামি দেহদেহীভাবমন্তরেণৈব দেহিবদ্ভাবহরামি": অর্থাৎ দেহ-দেহী-ভাব ছাড়াই ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং দেহ তাঁর চিন্ময়স্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু তাহলেও আবার প্রশ্ন করা হয়েছে যে, তথাপিও ভাষ্যকার 'আত্মমায়য়া'—'নিজের মায়ার প্রভাবে' জন্মগ্রহণ করেন? এর উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন: "কথং তর্হি অদেহে সচ্চিদানন্দ-ঘনে দেহত্বপ্রতীতিরত আহ আত্মমায়য়েতি। **নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দরসঘনে ময়ি ভগবতী বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ**"। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন: 'আমি নির্গুণ, শুদ্ধ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবান-বাসুদেব দেহদেহীশূন্য, তথাপি আমার উপর দেহবত্তাপ্রতীতি হয়—এটিও মায়ামাত্র অথবা ভ্রমমাত্র, কেননা সর্বগুণশূন্য সত্তায় গুণের আরোপই মিথ্যা বা ভ্রমের প্রসঙ্গ সৃষ্টি করে। মধুসূদন সরস্বতী তাই 'কেচিত্' বলে আর একটি অভিমতের কথা উল্লেখ করেছেন: "কেচিত্ নিত্যস্য নিরবয়বস্য নির্বিকারস্যাপি পরমানন্দস্য-অঘবারবিভাবং বাস্তবমেচ্ছন্তি",—অর্থাৎ তাহলেও কেহ কেহ নির্বিকার ও নিরাকার নিত্য-পরমানন্দস্বরূপ পরমেশ্বরের দেহদেহীভাবকে বাস্তব ও যথার্থ বলেন। অবশ্য এই অভিমতকে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ঠিক গ্রহণ করেন নি —'ন অস্মাভির্বিনিবার্যতে'—'তথাপি আমরা এই মতকে নিবারণ বা নিষেধও করি না' 'নির্যুক্তিকং ব্রুবাণাম্'—যুক্তিযুক্ত না বলেও।

এক্ষণে বলা যায় যে, নিত্য, জন্মরহিত ও সর্বজ্ঞানবান ব্রহ্মঘন ঈশ্বরের মায়ার সাহায্য নিয়ে (মায়ার প্রভাবে) অর্থাৎ সংসারে পৃথিবীতে মায়িক দেহ ও পার্থিব শরীর নিয়ে জন্মগ্রহণ করা একদিক থেকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সেজন্য ভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী এখানে দুটি আশঙ্কা (প্রশ্ন) করেছেন—

(১) প্রথম—কর্মের (অসক্তিপূর্ণ কর্মের) অনুষ্ঠানে ধর্ম ও অধর্ম-সংস্কারের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মাধর্মসংস্কার থেকে অদৃষ্ট সৃষ্টি হয়, আর এই অদৃষ্টই জীবের বা সকল প্রাণীর দেহধারণের কারণ।

কিন্তু সর্বজ্ঞানময় ও সর্বদোষরহিত ঈশ্বর তো নিজের জন্য স্বার্থযুক্ত কোন কর্মই করেন না ('লোকানুগ্রহং কুর্বন্ ন কচিতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহিষ্ণুতয়া'), সুতরাং তাঁর আর ধর্মাধর্ম কি এবং তজ্জন্য অদৃষ্ট কি—যেজন্য দেহধারণের প্রয়োজন হয় ? তাছাড়া ভগবান তো সাধারণ জন্ম-মৃত্যুশীল জীব নন, কেননা জীব অসর্বজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ।[৩]

(২) দ্বিতীয়—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, মায়াশক্তি তাঁর সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে থাকায় (আনন্দগিরি টীকায় বলেছেন : "তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃত্য-ভগবদধীনত্বমাহ")—দেহদেহীভাব অসম্ভব।

এ'দুটি আশঙ্কা দূর করার জন্যই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—'অজোঽপি সন্ অব্যয়াত্মা'। জন্ম-মৃত্যুচক্রের অতীত অব্যয় ও অবিনশ্বর হলেও 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি'—নিজের প্রকৃতিতে বা মায়ায় অধিষ্ঠিত হয়েই (মায়ার সাহায্য নিয়েই) আমি 'যেন' জন্মগ্রহণ করি। 'যেন'-শব্দে বোঝায় জন্মগ্রহণ করি, কিন্তু সত্যকারভাবে করি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় স্বীকার করেছেন যে, আমার মায়া ('মম মায়া') হলেও মায়ার অর্থাৎ মায়াশক্তির অসীম প্রভাব—অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া—যা সৃষ্টি হওয়া বা ঘটা উচিত নয়, তাই সৃষ্টি করে ও ঘটায়। কিন্তু একথা ঠিক যে, মায়াশক্তি আমার কিছু করতে পারে না (আমার যথার্থ-স্বরূপের কোন হানি বা অনিষ্টসাধন করতে পারে না) এবং আমার নিত্য ও অব্যয়স্বভাব-শরীরের কোন বিকারসাধন করতে পারে না। এখানে অদ্বৈত ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ ভাষ্যে বলেছেন : "এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রোঽগ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি···। **তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য** মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি (অবিকারম্ ?)। অন্যত্রাপি 'নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিঃ'।" আচার্য মধুসূদন সরস্বতী দেহদেহীভাবকে 'প্রতীতির্মায়ামাত্র্যমিত্যর্থঃ'—প্রতীতিমাত্র মায়াময় বলেছেন, পারমার্থিক সত্য নয়, কিন্তু প্রাতিভাসিক—'প্রতীতিমাত্র'। অদ্বৈত ভাষ্যকার আচার্য ধনপতি তাঁর 'ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায়' ঈশ্বর যে নিজের মায়াশক্তির দ্বারা দেহ সৃষ্টি করেন—একথা স্বীকার করেছেন—'শরীরং সৃজামি', কিন্তু তাহলেও তিনি 'মায়া ও মায়াবি'-শব্দদুটির প্রসঙ্গে বলেছেন—'পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি', সুতরাং নিত্য বলে স্বরূপে মায়াতীতই।

প্রকৃতপক্ষে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর (মায়াসহকৃত ব্রহ্ম) থেকে বিশ্বচরাচর—জীব-জগৎ সৃষ্টি হয়েছে বলতে আত্মপ্রকাশ করেছেন বা নাম-রূপ ধারণ করেছেন। উপনিষদে ও ব্রহ্মসূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এ'প্রসঙ্গেই আকাশকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন—

'আকাশশরীরং ব্রহ্মেতি'—'আকাশোঽত্র অব্যাকৃতম্', 'আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ' ইত্যাদৌ দর্শনাৎ; 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ' ইতি ন্যায়াচ্চ—এ'সব কথা বলেছেন ভাষ্যে মধুসূদন সরস্বতী। কথা এই যে, 'আকাশই ব্রহ্মের (সগুণ-ব্রহ্মের) শরীর'। 'আকাশ'-শব্দে অব্যাকৃত-কারণ মায়া (কারণ-উপাধিযুক্ত মহামায়া)। আবার বলা হয়েছে যে, তা আকাশেই ওত এবং

৩। মধুসূদন সরস্বতী গীতাভাষ্যে বলেছেন : "অপূর্বদেহেন্দ্রিয়াদিগ্রহণং জন্ম, পূর্বগৃহীতদেহেন্দ্রিয়াদি-বিয়োগো মৃত্যুঃ (মৃত্যোঃ)···তদুভয়ঞ্চ ধর্মাধর্মবশাদ্ভবতি। ধর্মাধর্মবশত্বঞ্চাস্য জীবস্য দেহাভিমানঃ কর্মাধি-কারিত্বাৎ ভবতি।···সর্বজ্ঞস্য ঈশ্বরস্য সর্বকারণস্য ইদৃশ দেহগ্রহণং নোপপদ্যত ইতি তত্তথৈব—কথম্ (দেহধারণম্)।"

প্রোত্ত (একীভূত) হয়ে থাকে। এখানে আকাশ পরমাত্মা (মায়াশবলিত-পরমাত্মা = ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম)। আবার বলা হয়েছে: 'আকাশ ইতি হোবাচ' এখানেও আকাশ পরমাত্মা (মায়াশবলিত-ঈশ্বর)। পুনরায় বলা হয়েছে: 'সর্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে'—'এ'সকল ভূতই (প্রাণী) আকাশ থেকে সৃষ্টি হয়েছে'। পুনরায় বলা হয়েছে: 'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'—তিনি (ঈশ্বর) সর্বত্রবিস্তারী আকাশের মতো সর্বত্র স্থিত, নিত্য অবিনাশী। সুতরাং এখানে আকাশকে আমরা নির্গুণ ও সগুণ উভয় ব্রহ্মের সঙ্গেই তুলনা করতে পারি। তবে অবতার (ঈশ্বরের অবতার) যখন দেহধারণ করেন, তখন তিনি নিজের মায়ার সাহায্যেই দেহধারী মানুষের মতো অবতরণ করেন। টীকাকার আচার্য আনন্দগিরি তাই বলেছেন যে, স্বেচ্ছায় নির্মিত মায়াময় দিব্যদেহ ঈশ্বর ধারণ করেন। সেজন্যই বলা যায় যে, অনেক শক্তিবিশিষ্ট নিত্য মায়া-নামে যে কারণরূপ উপাধি স্বীকার করেন ঈশ্বর, সেই উপাধিই ঈশ্বরের দেহ। তাই শাস্ত্রে বলা হয়েছে: 'মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি'। ভাষ্যকার মধুসূদন সরস্বতী সেজন্য বলেছেন: 'সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং কারণোপাধিং মাং চর্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং নার্হসীত্যর্থঃ'। মোটকথা এ'কথাই সত্য যে, বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্ম বলতে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর, তিনি নিরুপাধিক নির্গুণ নন—যদিও কোন কোন ভাষ্যকার বলেছেন: 'ভগবান বাসুদেবঃ পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা স এব…'।

মতবাদ ও মতভেদ এ'বিষয়েই শুধু নয়, সকল বিষয়েই আছে, সেজন্য এখানে মধুসূদন সরস্বতী ভাষ্যকার শঙ্করের অভিমতকে ('দেহবানিব জাত ইব') গ্রহণ করেও একটু ভিন্ন অভিমত পোষণ করেছেন। মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের প্রতি তাঁর মনের আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা অতিমাত্রভাবে থাকার জন্যই তিনি শঙ্করের মতকে গ্রহণ করেও ঠিক সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের প্রতি পরমপ্রীতির প্রকাশ তিনি গীতাভাষ্যের স্থানে স্থানে করেছেন: (১) 'সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্' (প্রারম্ভে প্রণামমন্ত্রে), (২) 'কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া। অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্মসনাতনম্'। তারইজন্য মধুসূদন সরস্বতী গীতাভাষ্যে বলেছেন: "কিন্তু যশ্চ নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান্ বাসুদেবঃ **পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা** স এব ভবিগ্রহো—নান্যঃ কশ্চিদৌপাধিকো মায়িকো বেতি"।

॥ ঈশ্বরের দেহধারণরহস্য ॥

প্রশ্ন ও আলোচনার বিষয় এখানে এই: (১) মায়াশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) দেহধারণ ক'রে পৃথিবীতে অবতাররূপে অবতরণ (জন্মগ্রহণ) করেন—না (২) মায়াশক্তির স্পর্শের অতীত পরমেশ্বর-পরব্রহ্ম বা নির্গুণ-ব্রহ্ম অবতাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন? 'অজোঽপি'-শব্দগুলিও ব্যবহার করেছেন মধুসূদন সরস্বতী, আবার 'পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা'-শব্দগুলিও ব্যবহার করেছেন মধুসূদন সরস্বতীই—সেকথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নীলকণ্ঠ, ধনপতি এবং

এমনকি রামানুজ ও রামানুজের অনুসারী ভক্তিবাদী দর্শনকারগণ ও ভাষ্যকারগণ 'নির্গুণ-ব্রহ্ম' না বলেও 'মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি' অর্থে প্রকারান্তরে অবতারের (ঈশ্বরাবতারের) বিকার-হীন অজর ও অক্ষয় নিত্যশরীর স্বীকার করেছেন।[৪] মধুসূদন সরস্বতী "নির্গুণঃ পরমাত্মা স এব তদ্বিগ্রহঃ" বাক্য স্বীকার ক'রে ভাষ্যে বলেছেন : "অস্মিন্ পক্ষে যোজনা—'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ'। প্রকারান্তরে ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ এবং ধনপতিও 'মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি' বলে স্বীকার করেছেন এবং এই নিত্যের তাঁরা অর্থ করেছেন : "স্ব-স্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাব-স্থিতএব সন্তবামি **দেহদেহীভাবমন্তরেণৈব দেহিবদ্ ব্যবহরামি**"। দেহদেহীভাব আরোপ না করেও 'যেন দেহধারণ করেন ?—একথাই ব্যবহার করবো। পারমার্থিকভাবে নয়—ব্যবহারিক কিংবা প্রতিভাসিক ভাবে। তারপর আরও-কিছু সন্দেহ দূর করার জন্ত আচার্য মধুসূদন সরস্বতী বলেছেন : "কথং তর্হি অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্বপ্রতীতিরস্ত আহ আত্মমায়য়া ইতি"। এখানে দেখা যায়, ঈশ্বরের মায়াশক্তিকে ('আত্মমায়য়া') স্বীকার ক'রে তিনি পুনরায় বলেছেন : **"নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দরসঘনে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহীভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ"**,—অর্থাৎ সাক্ষাৎ শুদ্ধ (মায়াবিহীন) ও নির্গুণ (সর্বগুণাতীত) একরস ও অখণ্ড সচ্চিদানন্দরসঘন ব্রহ্মে দেহদেহীভাব বা দেহদেহীর ধারণা বিন্দুমাত্র না থাকলেও ঐ দেহদেহীভাব ভগবানের প্রকাশ পায় (প্রতীতি হয়) মায়ার জন্ত ('মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ')। মধুসূদন সরস্বতী ঈশ্বরকে বা শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে বলেছেন 'পূর্ণব্রহ্ম সনাতনম্'। অবশ্য ভক্তিবাদী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ বেদান্তদর্শনের 'জন্মাদ্যস্ত যতঃ'-সূত্রের ভাষ্যে রামানুজের মতবাদের প্রতিধ্বনি ক'রে নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ ও শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেছেন এবং করাও তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেছেন : "ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ততে।... অতঃ পরব্রহ্মভিধানঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাসা-কর্মভূতঃ। ন চাত্র গুণাধ্যাসো বক্তুং যুক্তঃ বস্তুতো ব্রহ্মত্বপ্রসঙ্গাৎ।...ইহ ব্রহ্মণো জীবেতরত্ব-প্রতিপাদনাৎ তয়োরদ্বৈতং নাভিমতং...মোক্ষেঽপি তয়োরদ্বৈতনিরূপণাচ্চ"। শ্রীমদ্ বলদেব শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে সচ্চিদানন্দই বলেছেন : "সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে নমো"। অবশ্য একথা সত্য যে, পরমাদ্বৈতবাদী মধুসূদন সরস্বতী সম্পূর্ণভাবে আচার্য শঙ্করানুসারী, সুতরাং তাঁর পক্ষে 'পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা স এব' এবং 'পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্'-পদগুলি ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের উদ্দেশ্তে ব্যবহার করা পরমব্রহ্মেরই নিদর্শন।

৪। এখানে প্রশ্ন এই যে, গীতার ৪।৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান) 'বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তবচার্জুন···' শ্লোকে তাঁর বহুজন্মের কথা উল্লেখ করেছেন। জন্ম থাকলে মৃত্যু থাকে, সুতরাং জন্ম-মৃত্যু-বিকারের বা পরিবর্তনের অধীন শ্রীকৃষ্ণ-ভগবান নিজেও—একথাই বলা হ'ল। অতএব ভগবান বা ঈশ্বর 'অজঃ' এবং 'অব্যয়ঃ'—জন্ম-মৃত্যুর অতীত কিভাবে হয় ? তার উত্তরে মধুসূদন সরস্বতী ভাষ্যে বলেছেন : "জন্মানি লীলাদেহগ্রহণানি লোকদৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণাদিত্যস্যোদয়বৎ", অর্থাৎ সূর্য যেমন প্রতিদিনই আকাশে উদিত হয়, অথচ লোকে বলে সূর্যের উদয় (জন্ম) হ'ল, তেমনি ঈশ্বরের অবতাররা দেহ ধারণ করেন অর্থে জন্মগ্রহণ করেন—এটি লৌকিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টি থেকে বলা হয়, নতুবা শ্রীভগবানের অবতারদেহ চিন্ময় ও নিত্য, প্রকৃতপক্ষে তাঁর জন্ম-মৃত্যু নাই।

॥ 'ভক্তিরসায়ণ'-গ্রন্থে মধুসূদন সরস্বতী ॥

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'ভক্তিরসায়ণম্'-গ্রন্থে ব্রহ্মসত্তাকে পরমানন্দস্বরূপ স্বীকার ক'রে পুনরায় বলেছেন 'রসতামেতি পুরুষম্' (১।১০)। চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অখণ্ডানন্দস্বরূপত হয়েও 'মায়য়া আবৃতং অস্তি', সেজন্য 'নির্বিকারে ব্রহ্মণি বিকারভেদান্ উদ্ভাবয়তি'—অবিকারী ব্রহ্মসত্তা 'রসতা' বা রসরূপে সাধকের অনুভবের বা উপলব্ধির বিষয় হন, সেজন্য 'সুখচিদ্‌ঘনস্য জ্ঞানেঽপি অজ্ঞানমিব ভবতীতি'—অনুভবের ও আস্বাদনের বিষয় আকারবান রস-স্বরূপে নিরাকার ও বিকারহীন অখণ্ড হলেও আকার ও খণ্ডরূপে প্রকাশ পান ব'লে ব্রহ্মের যথার্থস্বরূপ অনেকে বুঝতে পারেন না—'অজ্ঞানমিব ভবতি'। মধুসূদন সরস্বতী ১।১১ শ্লোকে ঐ প্রসঙ্গে বলেছেন: "কার্যকারণতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ"—কার্য ও কারণের ভেদে এক ও অখণ্ড পরমানন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম 'জগদুপাদানমিতি প্রতিপাদিতম্' এবং 'জন্মাদস্য যতঃ' ১।১।২ ব্রহ্মসূত্রেই তার প্রমাণ। 'রসো বৈ সঃ'—ব্রহ্ম আস্বাদ্যবস্তুরূপ রসরূপে প্রকাশ পান এবং এই প্রকাশ সাকার ও মায়াসাহিত্যেরই কারণ। অর্থাৎ মায়ারূপ শক্তি প্রভৃতি গুণ বা বিশেষণের অতীত নির্গুণ ও নিরাকার ব্রহ্মসত্তা 'রস-রূপে' অন্যপ্রকাশ করেন, মায়াসম্পৃক্তিই তার কারণ।

পূর্বে রসস্বরূপ ব্রহ্মের আলোচনায় পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ-রচিত 'রসগঙ্গাধর'-গ্রন্থে '...প্রমাত্মা স্বপ্রকাশতয়া বাস্তবেন নিজ স্বরূপানন্দেন সহ গোচরীক্রিয়মানঃ·····রত্যাদিরেব রস' প্রভৃতি আলোচনা করেছি। এখানেও বক্তব্য এই যে, আচার্য মধুসূদন সরস্বতী পরম-অদ্বৈতবাদী হয়েও 'ভক্তিরসায়ণম্'-গ্রন্থে অনুভবসিদ্ধ রসের (চিদানন্দরসের) উপযোগিতা স্বীকার ও প্রমাণ করেছেন মন-বুদ্ধির অগোচর ব্রহ্মকে মন-বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করার জন্য—"মায়াবৃত্তি তিরোধানে বৃত্ত্যা সদ্বয়ম্ভয়া ক্ষণম্"। কথা এই যে, মায়ার আবৃতির বা আবরণের জন্য চিরজ্ঞাত ব্রহ্ম অজ্ঞাত বিষয়রূপেই প্রতিভাত হন, কিন্তু ভক্তিরসে মায়ার আবরণ দ্রবীকৃত হ'লে অজ্ঞাত ব্রহ্মও সাধকের নিকট জ্ঞাত অর্থাৎ প্রত্যক্ষ-উপলব্ধির বস্তু হন। অদ্বৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে স্বপ্রকাশ, স্বয়ংপ্রকাশ ও সর্বদাপ্রকাশ ব্রহ্মসত্তা সকল সময়েই জ্ঞানস্বরূপ, সুতরাং জ্ঞাত হলেও আত্মবিস্মৃতি-রূপ মায়ার আবরণের জন্য ব্রহ্ম যেন অজ্ঞাতই থাকেন, সেজন্য মায়ারূপ আবরণের অপসারণ প্রয়োজন এবং তাহলেই ব্রহ্ম জ্ঞাত বা জ্ঞানের ও অনুপলব্ধির বিষয় হন।[৭] এইসকল কথাদ্বারা মায়া ও মায়ার আবরণ যেমন স্বীকার করা হয়, তেমনি মায়ার আবরণের নাশে বা বিলয়ে ব্রহ্মের চিরপ্রকাশস্বভাবও স্বীকার করা হয়।

৭। উপলব্ধির বিষয়সম্বন্ধে রসাদ্বৈতবাদীরা বলেন অলৌকিক-আস্বাদন, লৌকিক নয়। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথও বলেছেন: 'আনন্দোদ্রেকং ন লৌকিকসুখান্তরসাধারণম্।...অপরোক্ষসুখালম্বনত্বাচ্চা-পরোক্ষাত্মিকা...'। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ১।১০ শ্লোকে একথাই বলেছেন। টীকাকার এ'প্রসঙ্গে বলেছেন: 'অতএব অমর্যাদিচ্ছিন্নচিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ 'কৃষ্ণাখ্যভক্তিরসে অত্যন্তাবিভাবমাত্রস্য', কেননা 'লৌকিক-রসস্যাপি পরমানন্দস্বরূপতানুপপত্তিঃ'। সুতরাং এই অলৌকিক ও লৌকিক অনুভূতিও নির্গুণ ও সগুণ-প্রকৃতির বোধক। ভক্তিশাস্ত্রে ও রসশাস্ত্রে রস পরমানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপ—মায়াবরণের জন্য সগুণ ও লৌকিক এবং মায়ার তিরোধানে নির্গুণ ও অলৌকিকতা দুটির প্রকাশক

অদ্বৈতবেদান্তে সর্বব্যাপক সর্বস্বরূপচৈতন্য (মহাচৈতন্য) এক ও অখণ্ড, কিন্তু মনুষ্য-সমাজে ব্যবহারের জন্য ঐ একই চৈতন্যকে অদ্বৈতবেদান্ত প্রমাণচৈতন্য, প্রমেয়চৈতন্য ও প্রমাতৃ-চৈতন্য তিনভাগে ভাগ করা করেছে। এই তিনটি ভাগের কল্পনা হয় মায়ার জন্য, মায়াই জগদ্ব্যবহারকে সার্থক করে, কেননা জগদ্ব্যবহারে প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমাতা বা জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা-রূপ-খণ্ড-খণ্ডজ্ঞানের প্রকাশ হয়, অথচ প্রকৃতপক্ষে বা স্বরূপে এক ও অনির্বচনীয়-স্বভাবসম্পন্ন চৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য। সগুণ ও নির্গুণ-ব্রহ্মস্বরূপতাও সার্থক হয় মায়ার থাকা ও না-থাকার জন্য।

●

॥ সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ॥

স্বামী প্রভানন্দ

রোমা রঁলার দৃষ্টিকোণে, শ্রীরামকৃষ্ণ চৈতন্যতত্ত্বের একটি কুসুমিত শাখা। মোহিতলাল মজুমদারের মূল্যায়নে, নদীয়ার জলমাটিতে ভূভিয়ার ধর্মবীজ যে ফুল ফোটাতে পারে কেশবের ধর্মজীবন সেই ফুল। বাংলার মাটিতে পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মধুর মিলন এক মুগ্ধতার জগৎ সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষের ধর্মজাগরণে একটি ইতিহাস রচিত হয়েছিল।

এই দুই মহাপুরুষের মিলনে উৎসারিত হয়েছিল আধ্যাত্মিক ভাবৈশ্বর্য। ভাবৈশ্বর্যের সর্ববিচিত্র স্ফুরণ ঘটেছিল সংকীর্তনানন্দের মাধ্যমে। সমজাতীয় বহু ঘটনার একটির চিত্র এঁকেছেন সমকালীন অশ্বিনীকুমার দত্ত। অশ্বিনীকুমার কেশব-অনুরাগী, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন। একদিন অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছেন। পরমহংসদেবের কুটীরে গিয়ে দেখেন পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ একখানা কালপেড়ে ফিনফিনে ধুতি পরে কারুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি একবার ওঠেন, একবার বসেন, আবার বাইরে গিয়ে কি যেন দেখে আসেন। আনন্দবন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ বালকবৎ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে দলবল নিয়ে সমুপস্থিত হন কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখপদ্ম প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। হর্ষোচ্ছ্বাসে প্রাণ হয় উদ্বেলিত। প্রাথমিক সম্ভাষণাদির পর শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন কেশবচন্দ্রকে : "কেশব। কিছু হবে কি ?" কেশবচন্দ্র সোৎসাহে বলেন : হাঁ, হবে বৈ কি। সচকিত অশ্বিনীকুমার ভাবেন, "হা বুঝিয়াছি, তবে এখন উঁহাদের সেই বস্তুটি সেবন করিবার সময় উপস্থিত।" যেই কথা, সেই কাজ। মুহূর্তের মধ্যে সুরার ডাক পড়িল। ঘন রোলে খোল কর্তাল বাজিল। হরিনামের গভীর ধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্ধে উত্থিত হইল। এবং সেই দুই প্রমত্ত ভক্তবীর হরিরসমদিরা পানে আত্মহারা হইয়া পরস্পরের হস্তধারণ করতঃ প্রেমকম্পিত পদক্ষেপণে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন।"[১]

১। মতিলাল দাস : শ্রীকেশবকাহিনী, পৃঃ ২৮৪

মদিরার মতই বা অধিকতর উত্তেজক হরিরসমদিরা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রাণমাতানো কণ্ঠে গাইতেন : সুধাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে, মন মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বুঝিয়ে বলতেন : ভজনানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, এই আনন্দই সুরা, প্রেমের সুরা। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা। ভক্তিই সার। (কথামৃত ৫।১।১) হরিরসমদিরার সংক্রামক শক্তি। হরিরসে প্রত্যক্ষ অংশভাক্-তো বটেই, আসরের শ্রোতা দর্শকগণও এই রসের প্রভাবে উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন। আনন্দের অপরূপ মহিমায় কীর্তনের আসর হয় সমাচ্ছন্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাঁরা দুজনে প্রেমবন্ধনে বদ্ধ। একদিনের ঘটনা। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরে বসে সংপ্রসঙ্গ করছিলেন। অকস্মাৎ গঙ্গার দিক হতে ভেসে এল সংকীর্তনের ধ্বনি। আনন্দোদ্দীপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণ শিহরিত-কণ্ঠে বলেন : "ঐ যে হরিনাম করতে করতে কেশব আসছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের মত ছুটে যান গঙ্গার ঘাটে। কিছুক্ষণের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হয় কেশবচন্দ্রের টীমার। ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরে তোলা হয় জলযানে। হরিরসমদিরার নিক্ষাত শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন : 'তুমি শ্যাম আমি রাধা, তুমি শ্যাম আমি রাধা।' আনন্দোচ্ছ্বাসের প্লাবন উপস্থিত ব্যক্তিদের মোহিত করে। ভক্তদের হৃদয়ে প্রেমপদ্ম ফোটে।[২] প্রেমের প্রতিস্ফুরণে দিব্যভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়।

চৈতন্যতরঙ্গের বিকাশে সমাজে যে জাগরণ ঘটেছিল, সেই জাগরণের জয়ধ্বনি সংকীর্তন। ইদানিংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখেছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুর মহাসংকীর্তন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে দুলুই শ্যামবাজারে মহাসংকীর্তনের অনুষ্ঠান করেছিলেন, জনজীবনকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এদিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শিক্ষিতসমাজে কীর্তন প্রবর্তন করে ও পথে-ঘাটে নগরকীর্তন সংগঠন করে রাজধানী কলিকাতায় বিশেষ চমক সৃষ্টি করেছিলেন।

রস ও ভাবসিক্তিত কীর্তনগানে ঘটে সরল হৃদয়াবেগের প্রাণস্ফূর্তি, সহজানন্দের উল্লাস। সংকীর্তনে মূল গায়েনের ভাব ও আবেগ সার্বজনীনতার আহুতি ও অকুণ্ঠ ভালবাসায় নিক্ষাত হয়ে এক অখণ্ড আনন্দসম্পৃক্ত ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে। সে-সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় অমিয়কণ্ঠের সুধাধ্বনি কীর্তন শিল্পের বা পরিবেশের সকল দৈন্যতাকে দূর করে শ্রোতাকে করে আকৃষ্ট। উপলব্ধিতে অগ্রসর সাধক এর মধ্যে অনুভব করেন ধ্যানসুন্দর পরিবেশের সান্নিধ্য। আর কোন কোন ভাগ্যবান ধন্য হন আনন্দোজ্জ্বল অভিজ্ঞতায়। তাছাড়াও এ-ধরনের সংকীর্তন পরিশোধিত করে গোষ্ঠীজীবনকে, সঞ্চোচ্ছত অমিয় ভাবধারায় সমৃদ্ধ করে গণমানসকে। সংকীর্তনের মূলগায়েনের হৃদয়োত্থিত ভাবতরঙ্গ কীর্তনকারীদের মধ্যে প্রসারিত হয়ে তাদেরকে কীর্তনের রসে রসাসিক্ত করে। ভাবতরঙ্গ পরিমণ্ডলের স্থবিরোধী ভাব দূর করে। উপস্থিত সকলকে ঈশ্বরাভিমুখীন করে। এ-সকল কারণে সংকীর্তনের মূলকেন্দ্রে অবস্থিত প্রধান গায়েনের

২। সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১১৫

সঙ্গীত ও নৃত্যের কুশলতা, সর্বোপরি তাঁর ভাবসঞ্চালনের দক্ষতার উপর সংকীর্তনের সরসতা নির্ভরশীল।

নামসংকীর্তনের প্রবর্তক চৈতন্য মহাপ্রভু। তাছাড়াও লীলাকীর্তন ও গুণকীর্তনের জনপ্রিয়তার কীর্তিও তাঁর। বাসনাব্যাধির বিভীষিকায় বিড়ম্বিত মানুষের জন্য মহাপ্রভু নাম-কীর্তনের নিদান দিয়েছিলেন। প্রেম-নাম-সংকীর্তনের সময় চৈতন্যদেব তিন অবস্থার মধ্যে বিচরণ করতেন। "অন্তর্দশায় ভাবানন্দদর্শন করে সমাধিস্থ হতেন, অর্ধবাহ্যে একটু বাহিরের হুঁস থাকত। বাহ্যদশায় নামগুণকীর্তন করতে পারতেন।" (ক ৩।১।৩) বাহ্যদশায় স্থূল দেখে, কারণ মন থাকে অন্নময় কোষে। মন যখন কারণশরীরে আসে তখন আনন্দ, কারণ মন থাকে আনন্দময় কোষে। এটি চৈতন্যদেবের অর্ধবাহ্যদশা। তারপর মন লীন হয়ে যায়। মনের নাশ হয়। মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ হলে আর খবর থাকে না। এটি হল চৈতন্যদেবের অন্তর্দশা।[৩]

●

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ সংস্কৃতিকরণ ॥

প্রাচীনযুগে সভ্য ও অসভ্য জাতি, বিশেষত কৃষিজীবী ও যাযাবর জাতি, কিভাবে সংঘর্ষ ও মিলনের মাধ্যমে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করেছে এবং এরফলে কিভাবে সমাজ বিবর্তিত হয়েছে সে-কথা আমরা আলোচনা করেছি। কৃষিজীবী সমাজের ওপর যাযাবরদের আক্রমণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হয়েছে মিশরের ইতিহাসে, নগর-রাষ্ট্রগুলির ওপর অর্ধসভ্য যাযাবরদের আক্রমণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আমরা দেখেছি সুমেরীয়া রাজ্যে ও এসিরা মাইনরে, একটি অর্ধসভ্য কৃষিজীবী সমাজ কিভাবে বিভিন্ন যাযাবর-আক্রমণে স্বীয় সংস্কৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করেছে তা দেখেছি ইহুদীদের ইতিহাসে, এবং অসংখ্য অসভ্য খণ্ডজাতিকে নিয়ে কিভাবে একটি কৃষিজীবী গোষ্ঠী রাষ্ট্র গঠন করেছিল তার পরিচয় পেয়েছি চীনের প্রাচীন ইতিহাসে।

যদিও আলোচ্য প্রবন্ধের বর্তমান অংশে আমরা দেখাবার চেষ্টা করেছি 'ব্যাপক মিলনের যুগ'-এ কিভাবে সমাজ বিকশিত হয়েছিল, অর্থাৎ আদিম যুগের অসভ্যপর্ব থেকে বর্বরপর্ব পার হয়ে অব্যবহিত যুগে সমাজ-বিকাশের ধারা, তবুও পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে মধ্যযুগীয় পৃথিবী সম্বন্ধে স্বামীজীর বেশ কিছু মন্তব্য আমরা উল্লেখ করেছি। এর কারণ, 'ব্যাপক মিলনের যুগ'-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সংস্কৃতিকরণ (Acculturation)। এই যে

৩। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ২।১৯।২ দ্রষ্টব্য।

সংস্কৃতিকরণ ব্যাপারটি, এটি যে শুধু প্রাচীনযুগেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং পৃথিবীর সামগ্রিক ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে আমরা এটি দেখতে পাই। প্রাচীনযুগে এটি তো ছিলই, মধ্যযুগে ইওরোপে এবং আধুনিকযুগে উপনিবেশগুলিতেও এটি যথেষ্ট ক্রিয়াশীল ছিল, সাম্প্রতিক কালেও এর প্রভাব আমরা দেখতে পাই। এ-সত্ত্বেও এই সংস্কৃতিকরণ প্রথম লক্ষণীয়ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল 'ব্যাপক মিলনের যুগ'-এই। সংস্কৃতিকরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার জন্যই আমরা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পৃথিবী সম্বন্ধে স্বামীজীর মন্তব্যগুলি তুলে ধরেছি। একটা কথা আমরা জোর দিয়েই বলতে পারি যে, **ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম এই সংস্কৃতিকরণ বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।** পরবর্তীকালে নির্মলকুমার বসু, ডি, এফ, পোকক, এম, এন, শ্রীনিবাস প্রমুখ এই সংস্কৃতিকরণ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করলেও[৪৩] স্বামীজীই এই ব্যাপারে পথিকৃৎ। তাছাড়া শ্রীবসু ও শ্রীনিবাসন যেখানে তাদের গবেষণাকে ভারতীয় সমাজেই কেন্দ্রীভূত রেখেছেন সেখানে স্বামীজীর গবেষণা সমগ্র পৃথিবী নিয়ে।

বিভিন্ন সমাজের সংমিশ্রণে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠে তার কাঠামো বহু ক্ষেত্রে আগেকার মতোই থাকতে পারে, কিন্তু সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তনের ফলে সমাজ-ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তন আসে। সামাজিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে তখন একটা গতিশীলতা আসে। সাধারণভাবে বলা যায়, সংস্কৃতিকরণ হচ্ছে এমন এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনসাধারণ নিজেদের আদর্শ, আচার-অনুষ্ঠান ও জীবনধারায় পরিবর্তন এনে উচ্চবর্গীয়দের সমান হতে চেষ্টা করে।[৪৪] এই যে গতিশীল প্রক্রিয়া যার ফলে সমাজে বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে, এর পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। আমরা এখানে লক্ষ্য করবো কিভাবে ব্যাপক-মিলনের যুগে এই সংস্কৃতিকরণ ঘটেছিল।

হিক্‌সোস্-আক্রমণের আগে এবং হিক্‌সোস্‌দের বিতাড়নের পরে মিশরীয় সমাজের অবস্থা দেখা যাক। আগে রাজা এবং প্রধান পুরোহিত ছিলেন একই ব্যক্তি। রাজপুরুষ ও সামন্তবর্গ নিয়ে ছিল সমাজের আভিজাত্যকুল। মধ্যম বর্গে ছিল ব্যবসায়ী ও কারীগর শ্রেণী, এবং নিম্নবর্গে ছিল চাষীরা (Serfs)। সামন্ত-রাজারা (Nomarch) নিজস্ব জেলাগুলিতে (Hsaput)

৪৩। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই এবং প্রবন্ধের জন্য দেখুন—

S. Diamond : Culture in History, New York, 1960

K. M. Panikkar : Hindu Society at Crossroads, Bombay, 1955

M. N. Srinivas : A note on Sanskritization & Westernaization, Far Eastern Quarterly, August 1956

D. F. Pocac : Inclusion & Exclusion, A Process in the Caste system of Gujarat, S-W Journal of Anthropology Spring, 1957

Swami Sankaramanda : Rigvedic Culture of the Pre-Historic Indus.

৪৪। সজল বসু (সম্পা,) : ভারতের সমাজ ভাবনা, [কলকাতা, আগষ্ট ১৯৭১] ১-ম খণ্ডে প্রকাশিত এম, এন, শ্রীনিবাসের প্রবন্ধ 'সংস্কৃতিকরণ', পৃঃ ৬৭

পৃথক সৈন্যবাহিনী, কোষাগার, বিচার-বিভাগ, ভূমি বিভাগ, পূর্তবিভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তর চালাতেন। এই সমস্ত-রাজারাই পরে ফারাওয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠলেন। এই সুযোগেই হিক্‌সোস্‌রা মিশর অধিকার করে। হিক্‌সোস্‌দের বিতাড়নের পর সাম্রাজ্যযুগে ফারাওয়ের ক্ষমতা গেল বেড়ে। তখনও সামন্তেরা ছিলেন তবে তাদের কাজ কর আদায় ও বিচার করার মধ্যেই সীমিত ছিল। ভূমির মালিক হলেন ফারাও নিজে এবং চাষীরা পরিনত হলো রাজ-ভৃত্যে। কেন্দ্রীয় শাসনের ফলে সামন্তের বদলে রাজ-কর্মচারীদের মাধ্যমে ফারাও দেশশাসন করতে লাগলেন। এই রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে একদল ছিল হিসাব-রক্ষক; অন্যদল কর আদায় করতো, রাজ-ভৃত্যদের কাজের তদারকী করতো, ইত্যাদি। এইভাবে আভিজাত ভূ-স্বামী সামন্তদের কার্যত বিলুপ্তি ঘটলো, এবং রাজ-কর্মচারীরাই সমাজে অভিজাত[৪৭] হয়ে উঠলো। ফারাও এদের ওপর বিশেষ ভরসা করতেন বলে এরা ক্রমশ পুরোহিতকুলের চেয়েও উচ্চবর্গে উঠে গেল। তাছাড়া ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী সমাজে মধ্যমবর্গীয় হলেও যেহেতু পুরোহিতকুল ছাড়া মধ্যমবর্গীয় সকল শ্রেণীর লোকদের যুদ্ধে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল এবং রাজ-কর্মচারীরা এই নতুন ক্ষত্রিয় শ্রেণীর নেতা ছিলেন, সেজন্য সমাজে রাজার পরই স্থান পেলেন রাজ-কর্মচারীরা। এইভাবে রাজকর্মচারীদের সাথে পুরোহিতকুলের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হলো তাতে শেষ পর্যন্ত পুরোহিতকুল জয়লাভ করলো প্রথম থাট্‌মোসের আমলে।

মিশরীয় সমাজের স্তরবিন্যাস

হিক্‌সোস্‌-আক্রমণের আগে	হিক্‌সোস্‌-বিতাড়নের পরে
(১) সম্রাট—প্রধান পুরোহিত	(১) সম্রাট
(২) (ক) রাজপুরুষ, সামন্তরাজারা	(২) (ক) রাজকর্মচারী
(খ) পুরোহিতকুল	(খ) পুরোহিতকুল, সামন্তরাজারা
(৩) (ক) ব্যবসায়ী	(৩) (ক) ব্যবসায়ী
(খ) কারিগর	(খ) কারিগর
(গ) রাজকর্মচারী	
(৪) চাষী	(৫) চাষী

৪৭। প্রাচীন মিশর (পূর্বোক্ত), পৃঃ ১১

॥ জাপানের কাবুকি নাটক ॥

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(এক)

জাপানী জাতি যে জাতীয় ঐতিহ্য বিষয়ে কত রক্ষণশীল, তা তার তিন প্রকার প্রাচীন নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে তার আধুনিক মনোভাব থেকেও বুঝতে পারা যায়। এই তিন শ্রেণীর জাপানী নাটকের নাম নো, বুনরাকু ও কাবুকি। তাদের মধ্যে কাবুকি উদ্ভব কালের দিক থেকে সব চাইতে পরবর্তী, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাচীনতর। নাটকগুলোর মধ্যে বর্তমানে অধিকতর জনপ্রিয়। তার কারণ, অন্যান্য নাটক রাজসভা কিংবা অভিজাত মহলের পৃষ্ঠপোষকতায় জন্মলাভ করে প্রধানতঃ তাদের মধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল, কিন্তু কাবুকি জনসাধারণের মধ্যে উদ্ভূত হয়ে জনসাধারণের মধ্যেই প্রথম থেকেই প্রচার লাভ করেছিল, সেই ধারা অক্ষুণ্ণভাবে আজ পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে এসেছে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তার উদ্ভব হয়েছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত যুগের পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় নি, সেই প্রাচীন ধারা অনুযায়ীই তার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আজও টোকিও সহরে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-ধর্মী নাট্যশালার সঙ্গে সঙ্গে কাবুকির জন্য স্বতন্ত্র নাট্যশালা আছে এবং আজো পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নিজস্ব প্রাচীন মধ্যযুগীয় পদ্ধতিতে তার মধ্যে মধ্যে তার অনুষ্ঠান হয়। এমন কি, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও যখন তার অনুষ্ঠান হয়, তখন সেখানেও দর্শকের অভাব হয় না, কাবুকি আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিচয় সমাদর লাভ করেছে।

১৯৭২ সনে আমি পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের দল নিয়ে যখন ইংল্যাণ্ডে যাই, তখন আমরা 'স্যাডলার ওয়েলস্' নামক যে থিয়েটারে পনর দিন ব্যাপী আমরা ছৌনৃত্যের অনুষ্ঠান করি, আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পরদিন থেকেই সেই রঙ্গমঞ্চেই জাপান থেকে আগত একটি সম্প্রদায়ের কাবুকি নাটকের পনর দিন ব্যাপী অভিনয়ের সূচনা হয়। আমাদের পরের দিনই প্যারিস চলে যেতে হয়েছিল বলে আমি সেখানে কাবুকি নাটকের অভিনয় দেখ্‌বার সুযোগ পাই নি। সেই ক্ষোভ আমার মনের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল। তারপর ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দে জাপান থেকে কাবুকি নাটকের একটি সম্প্রদায় কোলকাতায় রবীন্দ্রসদনে এসে দু'দিন ধরে তাদের অনুষ্ঠানে করেছিল, সেখানেই আমি তা প্রথম দেখ্‌বার সুযোগ পাই। কিন্তু ১৯৭৮ সনেই যখন আমি অষ্ট্রেলিয়ার এডেলাইড্ উৎসবে যোগদান করতে যাই, তখন সেখানে জাপান থেকে আগত একটি দলের কাবুকি নাটকের অনুষ্ঠান দেখে আমি বুঝতে পারি যে এই নাটক কোলকাতার রবীন্দ্রসদনের মত মঞ্চে যা অনুষ্ঠান হয়েছিল, তা তার একটি ক্ষুদ্রতম সংস্করণ মাত্র—তার অনুষ্ঠানের জন্য সুবৃহৎ মঞ্চ এবং বিস্তৃত আয়োজনের প্রয়োজন। অষ্ট্রেলিয়ার উৎসবে তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু সেখানেই শুনেছিলাম, জাপানে কাবুকির জন্য স্থায়ী নাট্যশালা আছে, তাতে এই নাটকের অনুষ্ঠান না দেখতে গেলে তার যথার্থ রূপ

এবং তার মর্ম উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু কোনোদিন এ সুযোগ লাভ করতে পারব, তা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। তাই এবার জাপানে এসেই কোন নাট্যশালায় কবে কাবুকির অভিনয় হবে তার সন্ধান নিতে লাগ্‌লাম। পরে একদিন তার সুযোগ পাওয়া গেল।

কিন্তু কাবুকি নাটকের উৎপত্তির ইতিহাস ও তার ক্রমবিকাশের ধারাটি এখানে বর্ণনা করা দরকার, কারণ প্রথমতঃ তার সঙ্গে আমাদের দেশের অবস্থার তুলনা করা যেতে পারবে, দ্বিতীয়তঃ তার মধ্য দিয়ে জাপানী চরিত্রের অনেকখানি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে ওকুনি নামে জাপানী মহিলা কাবুকি নাটকের মূল ভিত্তি স্থাপন করেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক তিনি একটি নৃত্যগীত সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। ওকুনি একটি মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন, মন্দিরের গৃহ নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর গীতনৃত্যের দল নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে তার অনুষ্ঠান করতেন। তিনি তার দল নিয়ে তখনকার জাপানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কায়োটো-তে এলেন, সেখানে তার অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করল। তাঁর জনপ্রিয়তার একটি প্রধান কারণ এই ছিল যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গীতনাট্যের ঐতিহ্যের ধারার উপরই তিনি তার নৃত্যগীতের পরিকল্পনা করেছিলেন, যা ইতিমধ্যে কিছু কিছু লুপ্ত হয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল, তাও তিনি পুনরুদ্ধার করে তার মধ্যে সংযোজিত করলেন, ফলে তার মধ্যে একটি সামগ্রিক জাতীয় রূপ প্রকাশ পেল। কাবুকি নাটকের এইটিই প্রধান গুণ।

বহুদিনের যুদ্ধবিগ্রহ এবং সামন্ত শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর কলহ-বিবাদ এবং জন-সাধারণের মধ্যে গোষ্ঠী সংগ্রামের অবসানে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জাপানের সমাজে কতটা শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, তখন অশান্তি থেকে সদ্য মুক্ত হয়ে জাতি তার অতীত সাংস্কৃতিক উপকরণগুলোকে যখন সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে গেল, তখন জাপানের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তির উপর নব-পরিকল্পিত কাবুকি নাটকের উদ্ভব হয়েছিল, তাই জাতি তা সাগ্রহে গ্রহণ করল।

হিন্দুধর্মের মতই বৌদ্ধধর্ম ক্রমে জটিল আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে জনসাধারণের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে চৈতন্যদেব যেমন প্রচার করেছিলেন যে 'কলিযুগে ধর্ম হয় নাম সংকীর্তন' এ যুগে আর কোনো ধর্ম নেই এবং তার ফলে সংকীর্তন প্রচার করে তাঁর ধর্মমত সহজে সর্বত্র প্রচার করেছিলেন সেই যুগেই জাপানেও সেই প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল, তখন বৌদ্ধধর্মকে সকল আচার থেকে মুক্ত করে কেবলমাত্র বুদ্ধের নাম কীর্তনের মধ্য দিয়েই তা পালন করা হ'য়েছিল; আমাদের দেশের সংকীর্তনের মতই নৃত্যসহ সেখানে বুদ্ধেরও কেবল নাম সংকীর্তন হতে লাগল, বুদ্ধের সেই নৃত্যসম্বলিত নাম সংকীর্তনকে বলত সংকীর্তন নাচ (নেনবুৎসু ও দোরি)। আমাদের দেশের কীর্তন গানের মতই তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে যেমন চৈতন্যদেব সংকীর্তনের প্রবর্তন করেন, এই শতাব্দীতেই জাপানেও বুদ্ধের নাম সংকীর্তনের প্রবর্তন হয়।

তারপর জাপানের উৎসব মাত্রই অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ, তার জাঁকজমক উৎসবে অংশগ্রহণকারীর পোষাকে পরিচ্ছদে এবং উৎসব সজ্জায়, তাই নানা উপলক্ষে জাপানে যখন নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হতো তাতে জাঁকজমক পোষাক পরে লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান হতো। উৎসব উপলক্ষে জমকালো পোষাক পরে যে নৃত্য হতো, তার নাম 'ফুরুইরু' বা উৎসব নৃত্য।

তারপর আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই যেমন কৃষ্ণযাত্রার একটি ধারা মধ্যযুগ ধরে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে এসেছে, জাপানে এমনই একটি প্রাচীন লোক-নাট্যের ধারা বর্তমান ছিল, তার নাম নো-নাটক, তার প্রধান বিশেষত্ব তাতে জাঁকজমক পোষাক পরে অভিনয় করবার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার মুখোসও ব্যবহার করা হতো। আমাদের দেশে পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যনাট্যে যে মুখোস ব্যবহার করা হয়, নো-নাটকের মুখোস পুরোপুরি সেই মুখোস নয়, বরং তা সেরাইকালের ছৌ-নাচের মুখোসের অনুরূপ বলা যায়। আমার মনে হয়, সেরাইকেলার মহারাজ জাপানী নো-নাটক কোথাও দেখেছিলেন, তা থেকে পুরুলিয়ার ছৌ-নৃত্যের মুখোসটির পরিবর্তে এই মুখোসটি গ্রহণ করেছেন, কারণ, এই মুখোস ব্যবহার করা পুরুলিয়ার মুখোসের চাইতে আরো সহজ। যাই হোক, নো-নাচের জাঁকজমকপূর্ণ পোষাকই এখানে লক্ষ্য করবার বিষয়।

নো-নাটকের বিষয়-বস্তু সবাই জাপানের জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণ করে এসে থাকে, তাতে জাতীয় বীর, ধার্মিক ও নানা শ্রেণীর চরিত্রের নাট্য রূপায়ণ হয়ে থাকে।

●

॥ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী বিবেকানন্দ প্রত্যেক ধর্মমতের তিনটি দিক স্বীকার করেছেন। প্রথমতঃ দর্শনের (Philosophy) বা তত্ত্বের দিক যাতে ধর্মজীবনের ভিত্তিস্থানীয় বিভিন্ন বিশ্বাস, মূলনীতি, লক্ষ্য এবং তা প্রাপ্তির উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। ঈশ্বরের প্রকৃতি, জীব ও জগতের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের উপায়, ধর্মজীবনের লক্ষ্য, এসবই এই দিকের ব্যাপার। ধর্মমতের দ্বিতীয় দিক হল—পুরাণ বা দেবতাখ্যান (Mythology); বিভিন্ন দেবদেবীর গল্প, ঋষি, মহাত্মার কাহিনী প্রভৃতি পুরাণের অন্তর্গত। ধর্মের তৃতীয় দিক হ'ল—অনুষ্ঠান (Ritual); পূজা, পুষ্পার্ঘ-প্রদান, বলি, যজ্ঞ বা এই জাতীয় কিছু কাজ। বিবেকানন্দের

মতে যে কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতেই এই তিনটি দিক আছে। তবে কোন ধর্মমত হয়ত কোন দিকের ওপর গুরুত্ব দেয়, অন্যমত হয়ত গুরুত্ব দেয় অন্যদিকের ওপর।[১]

দর্শনের দিক থেকে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্যের বা সার্বজনীনতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেক ধর্মই নিজ বিশ্বাস ও মতের ওপর গুরুত্ব দেয় এবং এদেরই একমাত্র সত্য বলে মনে করে। বিশেষ করে আমরা যাদের সেমেটিক ধর্ম বলি। যেমন ইহুদীধর্ম, খৃষ্টধর্ম বা ইসলামধর্ম, তারা ধর্মান্তরিত করার কাজকে পুণ্যকাজ বলে মনে করে। ওল্ড টেষ্টামেন্টে জিহোবা (Jehovah) বা ঈশ্বর অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ, তিনি অন্যকোন ঈশ্বরই সহ্য করতে পারেন না। আবার খ্রীষ্টধর্ম যদিও ভাগবত প্রেমের কথা প্রচার করে, তবু অন্য ধর্মাবলম্বী স্বর্গ পেতে পারে, এ বিশ্বাস এ ধর্মে নেই। সেজন্যই খ্রীষ্টধর্মে পরিত্রাণের জন্য একমাত্র যীশুর শরণ নেবার নির্দেশ আছে। আমাদের দেশে পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য যা করেন তা আমাদের সকলেরই জানা আছে। ইসলামধর্মে অন্য ধর্মাবলম্বী বা কাফেরকে হত্যা করলে বা কাফের হত্যা করতে গিয়ে নিজে নিহত হলে বেহেশত লাভ হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেন, কোন কোন ধর্মমত প্রয়োজন হলে অস্ত্রের সাহায্য নিয়েও অন্যদের সেই মতে আনার জন্য প্রেরণা দেয়। ফলে মানুষ ধর্মোন্মাদ (fanatic) হয়ে ওঠে। ধর্মোন্মাদদের আন্তরিকতার সন্দেহ করার কিছু নেই, তবে তারা জগতের অন্যান্য উন্মাদের মতই অত্যন্ত দায়িত্বহীন। ধর্মোন্মত্ততা একটি ভয়ঙ্কর রোগ। এতে মানুষের মধ্যে ক্রোধ হয় প্রবল এবং মানুষ ব্যাঘ্রের মত হিংস্র হয়ে ওঠে।[২] এজন্যই বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সমন্বয় বা সামঞ্জস্য অসম্ভব বলে মনে হয়। পুরাণের দিক থেকেও বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সম্ভব নয়। প্রত্যেক ধর্মেরই নিজস্ব পুরাণ আছে এবং কোন ধর্মই তার পুরাণকাহিনীকে কাহিনী মাত্র মনে করে না। খ্রীষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর ঘুঘু (dove)

১। 'In every religion there are three parts—I mean in every great and recognised religion. First there is the philosophy which presents the whole scope of that religion, setting forth its basic principles, the goal and the means of reaching it. The second part is mythology, which is philosophy made concrete. It consists of legends relating to the lives of men or of supernatural beings and so forth. It is the abstractions of philosophy concretised in the more or less imaginary lives of men and supernatural beings. The third part is the ritual. This is still more concrete and is made up of forms and ceremonies, various physical attitudes, flowers and incense and many other things that appeal to the senses. In these consists the ritual, you will find that all recognised religions have these three elements. Some lay more stress on one, some on another'—The Ideal of Universal Religion ;—Selections from Swami Vivekananda, p. 158-189.

২। Each religion brings out its own doctrines and insists upon them as being the only true ones...Some will even draw the words to compel others to believe as they do. They are very sincere...but they are quite as irresponsible as other lunatics in the world. This discovere of fanaticism is one of the most dangerous of all discoveres... Anger is stirred up...and human beings become like tigers'—তদ্বৎ, ১৫৯ পৃষ্ঠা।

রূপে জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে এটা গল্প নয়, ইতিহাস। হিন্দুরা মনে করেন, ঈশ্বর গোমাতায় মূর্ত। খ্রীষ্টানদের মতে, এটা কুসংস্কার। ইহুদীরা মনে করেন, যদি কোন মূর্তি বাক্স (box) বা সিন্দুকের (chest) আকারে তৈরী হয় এবং তার দুই দিকেই যদি পরী থাকে তবে তা জিহোবার খুব প্রিয়। কিন্তু, যদি কোন মূর্তি সুন্দর মানুষ বা সুন্দরী রমনীর আকারে তৈরী হয় তবে তা জঘন্য এবং ভেঙ্গে ফেলা উচিত। পুরাণের দিক থেকে আমাদের বিভিন্ন ধর্মমতের এমনই অনৈক্য।[৩]

অনুষ্ঠানের দিক থেকেও বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য নেই। কোন ধর্মসম্প্রদায়ের মতে কোন অনুষ্ঠান পবিত্র, অন্যদের মতে তা কুসংস্কার। হিন্দুরা লিঙ্গপূজা করে। লিঙ্গ তাদের মতে স্রষ্টার প্রতীক। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মতে এটা অশ্লীল ব্যাপার। আবার হিন্দুদের মতে খ্রীষ্টানদের পবিত্র রক্তমাংস ভোজন (Sacrament) পৈশাচিক। তার জন সুবকের মত নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানও এই প্রথায় আদিবাসী জীবনের অসভ্যতার প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন।[৪]

এই প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ 'Thoughts on Philosophy and Religion' গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে বলেছেন, প্রাচীন গ্রীসে এথেন্সবাসীরা প্রত্যেক পঞ্চম বর্ষে শস্যের দেবতা সিরিস (ceris)-এর উৎসব করতো। এই দেবতা তার মাংস (flesh) দিতেন খেতে যেমন বেকাস (Bacchus), মদের দেবতা, পান করার জন্য দিতেন রক্ত। প্রাচীন মিশরে ওসিরিস (osiris)-এর পুনরাবির্ভাব (Resurrection) পালন করে রুটি ও মদ (bread and wine) খাওয়া হ'ত। বৈদিক যজ্ঞে সোমরস এবং পুরডাস ব্যবহারের রীতি ছিল। এই সমস্ত প্রথা ভাগবত সম্মিলনের প্রতীক (Symbols or signs of divine communion)। রুটি ও মদ বা মদ ও মাংস বা পুরডাস্ ও সোমরস গ্রহণের মধ্য দিয়ে ভক্ত ও ভগবানের

৩। 'All religions have their own mythology, only each of them says—"my stories are not mere myths"....The christian believes that God took the shape of a dove, and came down to earth ; to him this is history, and not mythology. The Hindu believes that God is manifested in the cow. Christians say that to believe so is mere mythology and not history, that it is superstition. The Jews think that if an image be made in the form of a box, or a chest, with an angel on either side, then it may be placed in the Holy of Holies ; it is sacred to Jehovah ; but if the image be made in the form of a beautiful man or woman, they say, "This is a horrible ideal : break it down." This is our unity in mythology।—তদ্‌বৎ, ১৫১ পৃষ্ঠা।

৪। 'To the christians the phallus is horrible and to the Hindus the christian sacrament is horrible. They say that the christian sacrament, the killing of a man and the eating of his flesh and the drinking of his blood to get the good qualities of that man is cannibalism....Even such a devout christian as Sir John Lubbock admits this and says, that the origin of this christian symbol is in this savage idea.'

—তদ্‌বৎ, ১৫০ পৃষ্ঠা।

আধ্যাত্মিক মিলন বোঝান হয়েছে। এই সমস্ত প্রথা বা কাহিনী আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে চলে না। এদের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হয়। স্বামী অভেদানন্দ তাঁর গুরুর উদ্দেশে বলেছিলেন—

'তুমি যেমন খেয়েছ আমায়
আমি তেমন খেয়েছি তোমায়
এ রহস্য বুঝিবে কেবা।

এখানে 'খাওয়া' ভাত বা রুটি খাওয়ার মত সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এটা আধ্যাত্মিক একান্মতার ব্যাপার। রহস্য। উপলব্ধিগম্য, বুদ্ধিবেদ্য নয়।[৫]

দর্শন, পুরাণ, অনুষ্ঠান কোন দিক থেকেই যদি বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে ঐক্য দৃষ্ট না হয়, তবে বিবেকানন্দ যে বিভিন্ন ধর্মমতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের কথা বলেছেন, তা কি করে সম্ভব হ'বে? এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য এই যে, সত্যধর্ম মানে দর্শন, পুরাণ বা অনুষ্ঠান নয়; ধর্ম মানে নিজের সুপ্ত মহিমা বা ভূমাত্ব অনুভব, এ উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকারের ব্যাপার, একান্তভাবেই ব্যবহারিক। তিনি বলেছেন—'No longer will religion remain a bundle of ideas or theories, nor an intellectual assent, it will enter into our very self. By means of intellectual assent we may today subscribe to many foolish things, and change our minds altogether tomorrow. But true religion never changes. Religion is realisation; not talk, nor doctrine, nor theories, however beautiful they may be. It is being and becoming, not hearing or acknowledging, it is the whole soul becoming changed into what it believes. That is religion'.[৬] এই অর্থে এবং এইভাবে ধর্ম বুঝলে বিভিন্ন ধর্মের বিরোধিতার কারণ থাকে না। বিবেকানন্দ বলেন, 'Unity in variety is the plan of the universe'.[৭] এই জগতের পরিকল্পনার ভিত্তি হ'ল বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। জগতে যেমন বৈচিত্র্য আছে, তেমনি ঐক্যও আছে। আমরা সবাই মানুষ, আবার আমরা একজন আর একজন থেকে স্বতন্ত্র। আমাদের রুচি, প্রকৃতি এবং ক্ষমতা একজনের নয়, ভিন্ন রকমের। কেউ আমরা যুক্তিবাদী, কেউ আমরা আবেগপ্রবণ, আবার কেউ কর্মে উৎসাহী। বিবেকানন্দ বলেন, আমাদের প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য অনুসারে আমাদের ধর্মসাধনা ভিন্ন। যুক্তিবাদীরা জ্ঞানযোগ অনুসরণ করবেন, আবেগপ্রবণেরা ভক্তিপথ এবং কর্মী অবলম্বন করবেন কর্মযোগ, আর যারা যোগী তাদের জন্য রাজযোগ। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন পথ অনুসরণ করলেও তাদের লক্ষ্য এক—ভূমাত্বলাভ,

৫। E.O. James রচিত 'Comparative Religion' গ্রন্থে দশম অধ্যায়ে 'Sacrifice and Sacrament' এবং চতুর্থ অধ্যায়ে 'Myth and Ritual' সম্বন্ধে অত্যন্ত সুলিখিত আলোচনা পাওয়া যায়।

৬। ঐ গ্রন্থ, ১৭৪ পৃষ্ঠা।

৭। ঐ গ্রন্থ, ১৮৭ পৃষ্ঠা।

আনন্দ ও অমৃতপ্রাপ্তি। ঐক্য লক্ষ্যে, বৈচিত্র্য পথে। এইদিক থেকে বিভিন্ন ধর্মমতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বর্তমান।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—এই যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, তাতে কি শুধু ঐক্য সত্য এবং বৈচিত্র্য মিথ্যা? বিবেকানন্দ বলছেন তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে এবং অভেদানন্দ তাঁর সঙ্গে একমত হবেন যে, বৈচিত্র্য ঐক্যেরই বিভিন্নরূপ বা প্রকাশ। ঐক্যই সত্য, তবে বৈচিত্র্য এই সত্যেরই রূপ বা প্রকাশ বলে মিথ্যা নয়। বৈচিত্র্য ঐক্যের বিভিন্ন ভাব, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভঙ্গী প্রকাশ করে। কিন্তু তা একই ঐক্যের প্রকাশ। সত্য এক বৈ দুই নেই, তবে তার বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন ভঙ্গী, বিভিন্ন ভাব থাকতে পারে। যিনি সেই এককে জেনেছেন, তিনি এ রহস্য উপলব্ধি করেন, আর যারা তা জানেনি, তারা অযথা কলহ করে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে একই সত্যের বিভিন্নভাবে, বিভিন্নরূপে এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে উপলব্ধি হয়।

জৈনদর্শনে অনেকান্তবাদ প্রচারিত। বস্তু অনন্তধর্মবিশিষ্ট। বিভিন্ন দিক থেকে তার বিভিন্ন ধর্ম বা গুণ প্রকাশিত। এইসব ধর্মই বা গুণই সত্য। কোন ধর্মই একান্ত সত্য নয়, সব ধর্মই সত্য বলে সত্য অনেকান্ত। তবে জৈনেরা কিন্তু সত্য এক ও অদ্বিতীয় একথা বলেন না। অর্থাৎ, জৈনেরা অদ্বৈতবাদী নন, বহু তত্ত্ববাদী। শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ প্রভৃতি অদ্বৈতবাদী। তাঁরা বলছেন, সমস্ত ধর্মই এক বেদান্তধর্মের বিভিন্ন রূপ। আমরা পরে একথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবো।

এখানে আবার প্রশ্ন হ'বে—হেগেল যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্বীকার করে ঐক্য বৈচিত্র্যের দ্বারা পুষ্ট, সঞ্জীবিত এবং সমৃদ্ধ হয় বলে উল্লেখ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর সন্তানেরা কি একথা স্বীকার করবেন? আমাদের ধারণা, তাঁরা বলছেন, বৈচিত্র্য না থাকলে ঐক্য কম পুষ্ট, সঞ্জীবিত বা সমৃদ্ধ হ'ত, এ প্রশ্ন ওঠে না। কারণ, ঐক্য স্বয়ং পুষ্ট, সঞ্জীবিত এবং সমৃদ্ধ। তবে বৈচিত্র্য থাকায় কিছু ক্ষতি হয়নি। মানুষের প্রকৃতির বৈচিত্র্যের স্বাভাবিকতার জন্যই, এই বৈচিত্র্যও স্বাভাবিক। রামানুজ যেমন বৈচিত্র্যকে ঐক্যের অংশ বলেন এবং তাদের মধ্যে গুণ গুণীর সম্বন্ধ স্বীকার করেন, ধর্মের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কি সেরকম কিছু? আমাদের ধারণা, ধর্মের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ক্ষেত্রে গুণ-গুণীর প্রশ্ন ওঠে না। বিভিন্ন ধর্মগুণ এবং তাদের ঐক্য গুণী, একথা বলার অর্থ হয় না। পূর্ণ ও অংশের সমস্যাও এখানে নেই, কারণ প্রত্যেক ধর্মই স্বয়ং সম্পূর্ণ বলে স্বীকৃত।

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(ছয়)

ভারতাত্মার মৌল রূপটি হল অদ্বৈত বেদান্তের সমদর্শন, বিশ্বৈক্যবোধ এবং জীব-শিবতত্ত্ব। অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই এক অখণ্ড অধিকারী পরম সত্তার প্রকাশ রূপে দেখার ও উপলব্ধির সাধনাই ভারতের শাশ্বত সাধনা রূপে চিহ্নিত হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের কীর্তি ও বিশেষ অবদান প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে ভারতধর্মের মূল সত্যটি—অর্থাৎ ভারতীয় শাশ্বত জীবনদর্শনের মৌলিক তত্ত্বগুলি এই ভাবে সূত্রাকারে সাজিয়েছেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় :

(১) "সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত, জগদ্ব্যাপী ও জগদতীত এক অখণ্ড নিত্য বস্তুতে বিশ্বাস। (২) জীবাত্মা বা ব্যক্তিচৈতন্য এই নিত্যবস্তু বা ব্রহ্মস্বরূপের অংশীভূত এবং ইহার উপলব্ধিই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। (৩) ভারতীয় চিন্তাধারা এই নিত্যবস্তু সম্বন্ধে কোনো যুক্তিহীন ও বদ্ধমূল মতবাদে বিশ্বাসী নহে, বরং ব্যক্তির বুদ্ধি বা অধ্যাত্মশক্তি এবং সাধনানুসারী—বহুবিধ বিভিন্ন মতের স্বাধীনতাকেই স্বীকার করে থাকে। (৪) ইহার ফলে, কোনো ঐক্যমতাবলম্বী আদর্শ ও ধর্মপন্থা সকলের উপর বলপূর্বক আরোপিত হয়নি, বরং উহাতে উদারতম সহনশীলতা এবং চিন্তা, দর্শন ও ঈশ্বরোপাসনার অসীম স্বাধীনতা সূচিত হচ্ছে। (৫) জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও যোগ—এর যে কোনো একটি বা একাধিক পথের মাধ্যমে নিত্য বস্তুর উপলব্ধি হতে পারে।"

এরপর তিনি আরো লিখলেন, "বহুবিধ জাতি সংমিশ্রণে ভারতের ইতিহাস ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। তাহাতে এমন সমস্ত শ্রেণীবিন্যাস ও আশ্রমব্যবস্থা, বিশেষ ধরণের ধর্মীয় কৃত্য ও আচার-বিচার বিকাশ লাভ করিয়াছিল, যেগুলিকে কোনোদিন অপরিবর্তনীয় ও মৌলিক বলিয়া মনে করা হয় নাই। কর্মবাদ, সংসার অর্থাৎ আত্মার দেহান্তর গ্রহণ ও আচরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। জীবনের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের যথাযথ সাধনকেই মানুষের পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। এবং ইহাকেই ভারতীয় জীবনাদর্শ বলা যায়।"

"ভারতীয় আদর্শ বা ভারতধর্মের মূল কথা—নিত্যবস্তুর একত্ববোধ এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সমতল সমন্বয়, এই বোধের সংজ্ঞা ও সূত্র বেদ-উপনিষদ এবং মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত ভগবদ্-গীতায় পাওয়া যাইবে—ইহাই বাস্তবতর ভারতের বেদান্তদর্শন। পৃথিবীতে এমন কোনো ধর্মবিশ্বাস নাই, যাহাতে পরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বেদান্তানুযায়ী তত্ত্বকথার কিছু-না-কিছু নিহিত নাই।" এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ্য যে স্বামীজী স্বয়ং ইউরোপের সাহিত্যেও বেদান্তের ব্যাপক প্রভাব অনুভব করেছিলেন। তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাক : "বেদান্তের প্রভাব ইউরোপে—কাব্যে এবং দর্শনশাস্ত্রে সর্বাধিক। ভালো কবি-মাত্রেই দেখেছি বেদান্তী ; দার্শনিক তত্ত্ব লিখতে গেলেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বেদান্ত। তবে কেউ কেউ স্বীকার করতে চায় না,

নিজের সম্পূর্ণ নূতনত্ব বহাল রাখতে চায়—যেমন হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি ; কিন্তু অধিকাংশরাই স্পষ্ট স্বীকার করে।"

উপরোক্ত আলোচনায় সুনীতিকুমার তাকে ভারতধর্ম বলে অভিহিত করলেন—সেই ভারতীয় সত্যবোধের পরিশুদ্ধ নিষ্ঠা ও অঙ্গীকার, প্রত্যয়দীপ্ত বলিষ্ঠ বিশ্বাসে স্থির যুক্তিতর্কই বিবেক-সাহিত্য ও বক্তৃতারও বিষয়বস্তু। এমন কি বলা যায়—স্বামীজীর সমগ্র জীবনই এই মহৎ সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিবেদিত একখানি মহাকাব্য। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। আগে কহ আর। আরো কিছু আছে। ভারতদর্শনকে স্বামীজী একালের মানবজীবনের উপযোগী করে নবতর ভাষ্যে উদ্দীপ্ত ও সর্বজন-সর্বদেশ-গ্রাহ্য করে বিশ্বের দরবারে—বিশ্বমানবের একমাত্র শান্তি ও মুক্তির পথরূপে প্রমাণ করে গেছেন। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব। পরম প্রতিভার আয়োঘ স্বাক্ষর। এবং এভাবেই জাতীয়তা এবং আন্তর্জাতিকতাকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে গেছেন স্বামীজী। ব্যক্তি ও সমষ্টিকে—জীবন ও জীবনাতীতকে একই আদর্শের মহাবিন্দুতে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন।

এবারে বিবেকানন্দের কথায়ই বিবেক-ধর্মের নতুন ব্যাখ্যান শোনা যেতে পারে। তিনি বললেন, "আমার ধর্মের সার কথা কিন্তু শক্তি। যে ধর্ম হৃদয়ে শক্তির সঞ্চার করে না, তা আমার কাছে ধর্মই নয়—তা উপনিষদের, গীতার কিংবা মহাভারতের যারই হোক না কেন। শক্তিই ধর্ম ; শক্তির চেয়ে বড় কিছু নেই।" বলা বাহুল্য, এ শক্তি মানে গায়ের জোর নয়,—বন্দুকের কামানের আস্ফালন নয়—। এ শক্তি মানে আত্মিক শক্তি, শুদ্ধ মননের ও চিন্তার ঐশ্বর্য। নির্ভীকতা ও সাহসী মনোভাব। তাই তিনি ঘোষণা করলেন, "He is an atheist who does not believe in himself. The old religions said that he was an atheist, who did not believe in god. The new religion says that he is an atheist who does not believe in himself."

"If you have faith in the three hundred and thirty millions of your mythological gods, and, in all the gods which foreigners have introduced into your midst, and still have no faith in yourselves, there is no salvation for you. Have faith in your selves and stand upon that faith and be strong." আবার বললেন, "The abstract Advaita must become living-poetic-in everydaylife ; and out of bewildering yogism must come the most scientific and practical psychology—and all this must be put into such a form that a child may grasp it. This is my life's work." বেদান্তকে সর্বসাধারণের জীবনের একান্ত উপযোগী ও গ্রাহ্য দর্শন রূপে গড়ে তুলতেই তিনি প্রয়াসী ছিলেন। জনতাকে মহৎ জীবনের পথে উদ্বুদ্ধ করতে প্রথমে চাই রজোগুণের কর্মপ্রয়াস ও নানা শ্রমনিষ্ঠ জীবন যোজনা। এই কর্মহীন অধঃপতিত ভারতবাসীর কাছে বারবার তাই তিনি শক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে গেছেন। উপনিষদের

শ্রেষ্ঠতম মন্ত্র অতীঃ সেই তিনি জাতির বাঁচবার জন্য একমাত্র বীজমন্ত্ররূপে গ্রহণ করতে আদেশ করেছিলেন। আগে বাঁচতে হবে, পঞ্চকোষের পূর্ণ পরিপুষ্টি নিয়ে মানুষের মত বাঁচতে হবে। নর-কে আগে নরোত্তম হতে হবে। তারপর আসবে নারায়ণে উন্নীত হবার সাধনা। তাই তিনি সহজেই বলতে পারেন, "বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আমি আরো বেশী করে অনুভব করেছি যে পৌরুষের উপরেই সব কিছু নির্ভর করে।" আগে ভোগ করতে শিখো, তারপর ত্যাগ আসবে। ত্যাগের ছদ্মবেশের অন্তরালে তমোগুণের অতলে তলিয়ে যাবার বিরুদ্ধে তাঁর চিরকালীন সত্যসন্ধানী বিদ্রোহ। সর্বসাধারণের জন্য তাই তাঁর জলন্ত উপদেশ —"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে স্থবির জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরকালেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।" ভারতীয় শাস্ত্রেরও নির্দেশ বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক জাতিধর্ম পালন বা স্বধর্মের অনুশীলনই ব্যক্তি বা সমাজের পক্ষে একমাত্র কল্যাণের পথ—যথার্থ মুক্তির সেতু। জাতিধর্মের বিনষ্টির ফলেই জাতির এই সর্বাত্মক অধঃপতন। জাতিধর্মকে আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আচার্য বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবনও জগতের বিশ্বমানবের সর্বাত্মক আত্মপ্রকাশ এবং জীবনের মহোত্তম উদ্বোধনের জন্যই আত্মনিবেদিত। এর পরেও বিবেকানন্দের সন্ন্যাস জীবন বিমুখ, ধর্মচিন্তা মধ্যযুগীয়, দেশপ্রেম শুধু অতীতের স্মৃতিচারণা—যাঁরা এ ধরণের সমালোচনা করেন—বুঝতে হবে একান্তভাবে বিদ্বেষ ও ঈর্ষাবিদ্ধ হয়েই এসব উক্তি করে থাকেন। আজকে তো একথা ঐতিহাসিক সত্য বলে সর্বজনস্বীকৃত যে বিবেকানন্দের বীর বাণীকে অবলম্বন করেই বাংলার স্বদেশী যুগ এবং বৃহত্তর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বপ্রথম প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল। বিবেকানন্দ-নিবেদিতার গোমুখীই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত প্রসারিত সমস্ত রকম স্বাধীনতা আন্দোলনের একক উৎসধারা রূপে ক্রিয়াশীল ছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে দেশবিদেশের বিজ্ঞ সকল ঐতিহাসিকই একথা একবাক্যে স্বীকার করে গেছেন। —পরানুবাদ ও পরানুকরণে নয়, স্বধর্মে আত্মপ্রতিষ্ঠাই যে ভারতবর্ষের একমাত্র মুক্তিপথ—এ ঘোষণাও স্বামীজীর। এদ্বারা কেউ যেন আবার মনে না করেন যে পার্থিব সুখ-সম্পদ ও ঐশ্বর্যের বস্তুসম্ভার আহরণকেই স্বামীজী মানবজীবনের একক তৃষ্ণা বলে মনে করেছিলেন। বস্তুতঃ তিনি চেয়েছিলেন সমন্বয়। জীবনের অখণ্ড পরিপূর্ণতা। যেহেতু "খালি পেটে ধর্ম হয় না"—, তাই মৈত্রেয়ী সভ্যতার সঙ্গে কাত্যায়নী সভ্যতার কর্ষণাও একান্তভাবেই প্রয়োজন। তাই কাম্যও বটে। ভারতীয় সভ্যতা একদা যেদিন পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধির পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল, তখনই জাতির মর্মের গভীর থেকে উচ্চারিত হয়েছিল ত্যাগের বাণী—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই ক্রম মেনে নিয়েই জীবন পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই উদ্গতির পথে অভিযাত্রা সম্ভব হয়ে ওঠে। ভারতাত্মার এই হল শাশ্বত বাণী। কবি জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়—অন্নবস্ত্র আহার নিদ্রা—জীবন রচনার প্রতিটি উপাদান ও আবিষ্কারই সত্য, কিন্তু শেষ সত্য নয়। দৃশ্যমান

এই আশ্চর্যবৎ জীবন ও জগৎ পেরিয়েই জীবনাতীতের কাছে পৌঁছাতে হয়। বিবেকানন্দও সেই সত্য উপলব্ধি করে প্রচার করেছেন যে ফুল যত সুন্দর, মুগ্ধ-মনোহরই হোক—তার স্বাভাবিক সহজ পরিণতি ফলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই নিরাসক্ত মননের অধিকার অর্জন করাই জীবনের পরম কৃত্য। কারণ একমাত্র নিরাসক্ত মনই জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্য উপলব্ধিতে সক্ষম। বৈরাগ্যের বিবিক্ত সিংহাসনে বসবার আগে চাই পূর্বপ্রস্তুতি এবং নানাভাবে নিদিধ্যাসনার সর্বাত্মক সম্প্রয়োগ। একথাই স্বামীজী অন্যভাবে অন্যভাষায় উচ্চারণ করলেন, "আমাদের দেশে মোক্ষলাভেচ্ছার প্রাধান্য, পাশ্চাত্য ধর্মের। ধর্ম কি?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে। মোক্ষ কি?—যা শেষায়—ইহলোকের সুখও গোলামি, পরলোকেও তাই। এই প্রকৃতির নিয়মের বাইরে তো এলোকও নয়, পরলোকও নয়, তবে সে দাসত্ব লোহার শিকল আর সোনার শিকল।...অতএব মুক্ত হতে হবে, প্রকৃতির বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, শরীর-বন্ধনের বাইরে যেতে হবে, দাসত্ব হলে চলবে না। এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে, অন্যত্র নাই।" কিন্তু ভারতবর্ষ একদিন এই মোক্ষ ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সর্বসাধারণের জন্য একটি সার্বজনীন জীবন-পথের সন্ধান দিতে সক্ষম হয়েছিল। এখানেই তার বিশিষ্টতা, নতুনত্ব। পৃথিবীর আর কোনো সভ্যতা এমন করে সর্বমানুষের জন্য সার্বজনীন সুধার সন্ধান দিতে পারেনি, পারেনি সর্বকল্যাণকর এমন সমন্বয়ের জীবনদর্শন উপহার দিতে।

●

॥ কেন হিন্দুরা খ্রীস্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদ : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

হিন্দুরা যিশুখ্রীস্টের ধর্ম থেকে গির্জার ধর্মকে পৃথক মনে করে। হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায়, গির্জাগুলি আজ যে ধর্ম সমর্থন করে ও প্রচার করে, তা' যিশুখ্রীস্টকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও, জনসাধারণের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম নামে পরিচিত হলেও যখন আমরা যিশুখ্রীস্টের প্রচারিত ও তাঁর শিষ্যদের আচরিত সেই শুদ্ধ হৃদয়ের ধর্মের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, এ ধর্মকে "গির্জার ধর্ম" বলা-ই সঙ্গত। যিশুখ্রীস্টের ধর্মে, অর্থাৎ যথার্থ খ্রীস্টধর্মে কোন গোঁড়ামি, ধর্মমত বা ধর্মতত্ত্ব ছিল না। সে-ধর্ম ছিল হৃদয়ের ধর্ম : কোন অনুষ্ঠান, আচার বা পুরোহিত-তন্ত্র সেখানে ছিল না। কোন গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে সে-ধর্ম গড়ে ওঠে নি। হৃদয়ানুভূতির উপর, ব্যক্তি-আত্মার সঙ্গে স্বর্গের পিতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উপর সে ধর্ম গড়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে, গির্জার ধর্ম হচ্ছে এক গ্রন্থ-কেন্দ্রিক ধর্ম, এ ধর্ম একটি মতবাদে বিশ্বাস করে, একটি ধর্মমতের কথা বলে, এ ধর্মমত প্রচারের একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতি আছে, বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব এ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে, এ ধর্ম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে ও একদল পুরোহিতের প্রভুত্ব মেনে চলে।

গির্জার ধর্মের জনপ্রিয় ইতিহাস আরম্ভ হয় ৩২৫ খ্রীস্টাব্দে, মহামতি কন্‌স্ট্যান্‌টাইন্‌-এর রাজত্বের বিংশ বৎসর থেকে। নিসিয়া (Nicea) নগরীতে সেই বিখ্যাত পরিষদ আহূত হয়েছিল। যাঁরা এই মহান্‌ রোম-সম্রাটের জীবনী পাঠ করেছেন, তাঁরা স্মরণ করতে পারবেন, গির্জার ধর্মমতের তথাকথিত এই একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকটি কি অদ্ভুত প্রকৃতির লোকই না ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের পুত্র ও পত্নী ফাউস্তাকে নিছক সন্দেহবশে হত্যা করেছিলেন, তাঁর শ্যালক লিসিনিয়াস্‌ ও লিসিনিয়াস্‌-এর নির্দোষ পুত্রকে কেটে ফেলেছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রত্যেককে নির্বিচারে খুন করেছিলেন। তবুও গ্রীক চার্চ তাঁকে সাধু-শ্রেণীভুক্ত করেছিল এবং সেন্ট কন্‌স্ট্যান্‌টাইন্‌-এর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখায়।

মহামতি কন্‌স্ট্যান্‌টাইন্‌-ই ৩২১ খ্রীস্টাব্দে ইহুদীদের পবিত্র দিন শনিবারের পরিবর্তে রবিবারটিকে সর্বসাধারণের পালনীয় বলে এক আদেশ জারি করেছিলেন। তিনি ইহুদিদেরকে এবং ইহুদিদের সম্পর্কিত সবকিছুকে ঘৃণা করতেন। তিনি বলেছিলেন, "এই দিনটিকে (রবিবারকে) প্রার্থনার বিশেষদিন হিসাবে গণ্য করতে হবে; কারণ দিনটি সূর্যের দিন, আমাদের প্রভুর দিন।" পৌত্তলিকদের মধ্যে এই দিনটি যে সূর্যোপাসনার দিন,—গির্জা সে ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে তখন থেকেই কন্‌স্টান্‌টাইন্‌-এর সে আদেশ পালন করে আসছে।

মহামতি কন্‌স্টান্‌টাইন্‌-ই গির্জার ধর্মনীতি স্থির করেছিলেন এবং নিসিয়ার পরিষদে গৃহীত ধর্মমতকেই পবিত্র আত্মার (Holy Spirit) আদেশ হিসাবে গ্রহণ করতে সমবেত যাজকদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন। তখন থেকেই গির্জা সেই ধর্মমতকে যথার্থ বলে মেনে নিয়েছে। খ্রীস্টান জগতের প্রাচীনপন্থী সমস্ত গির্জার প্রায় প্রতি রবিবার সেই ধর্মমতের পুনরুল্লেখ করা হয়ে থাকে।

প্রবঞ্চনা-প্রতারণা, আড়ালে থেকে রাজনৈতিক কার-নিয়ন্ত্রণ, ধর্মতত্ত্ব নিয়ে ভোজবাজি, যাজকদের কুক্রিয়াসক্তি, উত্তেজনাপ্রসূত গালাগালি ও শাপ-শাপান্ত, রক্তাক্ত গণহত্যা এবং খ্রীস্টধর্মের সংহতি সম্মেলনগুলিতে অমানবিক গুপ্তহত্যাগুলির ভয়ঙ্কর-ভীতিজনক বিবরণই প্রমাণ করে যে, এগুলিই ছিল গির্জার ধর্ম-মত গড়ে তোলার প্রধান হাতিয়ার। যাজকদের ইতিহাস যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা মনে করতে পারবেন—নিসিয়ার সেই বিখ্যাত সভার পরেই এক বিবাদে কুমারীদেরকে অপমান ও কশাঘাত করা হয়েছিল, পবিত্র মন্দির অপবিত্র করা হয়েছিল, গ্রন্থাবলী জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, গির্জা ও গির্জার দীক্ষাস্নান পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সন্ন্যাসীদেরকে পদদলিত করা হয়েছিল। এরকমই ছিল পুণ্যাত্মা যাজক গির্জার ধর্মপ্রবর্তকদের কাণ্ডকারখানা।

৪৩১ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এফেসাস্‌ (Ephesus)-এর পরিষদ সভায় সন্ন্যাসী ও যাজকেরা চীৎকার করে বলেছিলেন, "যে-ই দু'রকম কথা বলে সে-ই কুপরামর্শদাতা (Nestorius); তা'কে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ফেলা হবে।" পরস্পর বাদ-বিতণ্ডাকালে এক যাজক আরেক যাজককে লাথি মেরে খুন করেন; অধিকন্তু, যে অকাট্যযুক্তি মাধ্যমে নিষ্ঠুরতম দলটি প্রচলিত ধর্মে তা'দের নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছে, তারই নিদর্শন হিসাবে তা'রা এবশ' সাইত্রিশটি লাশ গির্জায় ফেলে রেখে যায়।

গির্জার ধর্মের সৌধস্তম্ভ যাঁরা নির্মাণ করেছিলেন, সেই সাধুদের সভাগুলি ছিল এ-রকমই। যে সকল সভায় গির্জার নিয়ম-কানুন রচিত হয়েছিল সে সকল সভার মূল উদ্দেশ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি। গির্জাগুলির ইতিহাসের আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রকৃত ধর্মের দু'টি সর্বাধিক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য,—চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতাকে চেপে রাখা হয়েছে; অধিকন্তু ধর্মের নামে ধর্মোন্মত্ততা, ধর্মান্ধতা, অভিশাপ, গালাগালি, উৎপীড়ন, অত্যাচার ও পৈশাচিক কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেম, করুণা, দয়া, শান্তি ও শুভেচ্ছার পরিবর্তে সেখানে ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও হানাহানি দেখা গিয়েছে। ধর্মের নামে যদি তরবারি নিষ্কাশিত না হ'ত, নিরীহের রক্তপাত না হ'ত, তা'হলে পৃথিবী থেকে গির্জার ধর্মমত লোপ পেয়ে যেত। জগতের ধর্মেতিহাসের পৃষ্ঠায় গির্জার ধর্মের কার্যাবলী দুরপনেয় কলঙ্কের কালিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে হিন্দুরা মানবোচিত গুণসম্পন্ন, দয়ালু, নম্র, শান্তিপ্রেমিক যারা কেবলমাত্র মানুষকেই নয়,—জগতের সকল প্রাণীর মধ্যেই তাদের অন্তরের আশীর্বাদ, শুভেচ্ছা, স্নেহ ও প্রেম বিলিয়ে দিতে চায়,—সেই হিন্দু আমরা কি তা'হলে গির্জার ধর্মকে বর্জন করব? যে হিন্দুরা সকলের আত্মায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, সেই হিন্দু আমরা কি সেই তত্ত্বকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করব, যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল শুধু মতবাদের উপর মাটিতে, যা'তে সায় দেওয়া হয়েছে নিরীহ মানুষের কণ্ঠে নিংড়ানো প্রাণশক্তি সাহায্যে আর যা' লালিত হয়েছে শহীদের রক্তে?

অদৃষ্টের অদ্ভুত পরিহাসে, হিন্দুরা আজ দেখ্‌ছে, গির্জার ধর্মের অনুগামীরা, অতীত অবজ্ঞা করে, ভারতবর্ষে এসে তথাকথিত "হিদেন"-কে শোনাচ্ছে—গির্জার ধর্ম কিভাবে এ জগৎকে সভ্য করেছে, কিভাবে তা' পৃথিবীতে শান্তি এনেছে আর কিভাবেই বা তা' পাপীদের আত্মাকে রক্ষা করেছে! কিন্তু একজন হিন্দু সত্য ও স্বাধীনতা-প্রেমিক। চিন্তার স্বাধীনতা ও বাক্ স্বাধীনতা তার দিশারী নক্ষত্র। স্মরণাতীত কাল থেকেই সত্যান্বেষণ ও সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ হিন্দুদের মনকে তাদের চারপাশে প্রদত্ত যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিজ্ঞোচিত অনুসন্ধান করতে বাধ্য করেছে। একজন হিন্দুকে অন্ধের মত কোন কিছু বিশ্বাস করানো একেবারেই অসম্ভব। কোন মতবাদকে সত্য হিসাবে গ্রহণের পূর্বে সে সে'টির উৎস পর্যন্ত অনুসন্ধান করে, পক্ষে-বিপক্ষে যাবতীয় যুক্তি বিচার করে, তারপর তার নিজের দেশে পরিজ্ঞাত মহত্তম আদর্শগুলির সঙ্গে সে'টি তুলনা করে। তার এই চারিত্রিক প্রবণতা ও সত্যানুরাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন একজন হিন্দু গির্জার ধর্মের মূল বিষয়গুলি আলোচনা করে, তখন সে প্রথমেই যতদূর সম্ভব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাইবেলখানি পড়ে নেয়, পদে পদে যুক্তি-বিচার প্রয়োগ করে; তারপরে সে পাশ্চাত্যের মনীষী ও সমালোচক, যাঁরা ঐতিহাসিক গবেষণার উপর ভিত্তি করে, নিরপেক্ষভাবে খ্রীস্টধর্মের গ্রন্থগুলি বিচার করেছেন,—তাঁদের যে-সব লেখা পাওয়া যায়, তা' পাঠ করে।

●

॥ মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ : অশ্ব ও ব্যাঘ্র ॥

অধ্যাপক ডক্টর রামজীবন আচার্য

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্য সুধার রত্নাকর সমুদ্র। স্বাদুতায় অমৃতসমান, সম্পদ-ভাণ্ডারে রত্নাকর সমুদ্রের উপমা। মানবেতর জীবজগৎ সম্পর্কে মহাকবি কতো কথাই না বলিয়াছেন। সেই জীবজগতের মধ্যে অশ্ব অন্যতম।

প্রাচীনকালে যুদ্ধাদিকার্যে, রাজপ্রয়োজনে অশ্বের সম্যক ব্যবহার হইত। কালিদাসকাব্যে পুনঃপুনঃ অশ্ববিষয়ের উল্লেখ আছে। রঘুবংশ মহাকাব্যের প্রথমসর্গে দেখি নৃপদম্পতী দিলীপ-সুদক্ষিণা অশ্ববাহিত রথে বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করেন। পথের ধূলিপটল অশ্বক্ষুরোদ্ধত হইয়াও অনুকূল পবনের জন্য দিলীপ-সুদক্ষিণার অলক স্পর্শ করে নাই। কালিদাস লিখেছেন—

পবনস্যানুকূলত্বাৎ প্রার্থনাসিদ্ধিশংসিনঃ।
রজোভিস্তুরগোৎকীর্ণৈরস্পৃষ্টালকবেষ্টনৌ ॥ ১।১২

আশ্রম নিকটবর্তী হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ রাজা সারথিকে অশ্ব-বিশ্রামের নির্দেশ দিয়াছেন। 'অশ্ব বন্তারমাদিশ্য ধুর্যান্ বিশ্রাময়োতি সঃ।' রঘুবংশের তৃতীয়সর্গে অশ্বমেধযজ্ঞের উল্লেখ আছে। রাজা দিলীপ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছেন। দিলীপপুত্র রঘুর চতুরঙ্গসেনা। 'চতুস্কন্ধেন সা চমূঃ।' এই চতুস্কন্ধের একটি স্কন্ধ অশ্ব। রঘু দিগ্বিজয়ে পাশ্চাত্যসেনার সঙ্গে যে তুমুল যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে পাশ্চাত্যগণ অশ্ববলে বলীয়ান ছিলেন। 'সংগ্রামস্তমুলস্তস্য পাশ্চাত্যৈরশ্বসাধনৈঃ।' ইন্দুমতীলাভে অজের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিগণের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে অশ্বক্ষুরোদ্ধত ধূলিজাল মহাকবির কাব্যে উল্লিখিত হয় সপ্তমসর্গে 'উত্থাপিতঃ সংযতিরেণু রশ্বৈঃ সান্দ্রীকৃতঃ স্যন্দনবংশচক্রৈঃ।' অজনন্দন দশরথের মৃগয়ায়ও অশ্বক্ষুরক্ষুণ্ণধূলি। 'অশ্বক্ষুরোদ্ধতরেণুভিঃ।' দাশরথি রামের নির্দেশে সীতাকে বনপ্রদর্শনের জন্য সুমন্ত্র রথবাহনের উদ্দেশ্যে যে অশ্বগুলি আনিয়াছিলেন তাহারা ছিল অনুদ্ধত। আত্মবত্তি র্মুক্তধুরং তুরঙ্গৈঃ।'

মহাকবির অভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রথমাঙ্ক। রথারূঢ় দুষ্মন্ত স-সারথি রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি মৃগানুসরণে রত। দুষ্মন্ত-নির্দেশে রশ্মিমুক্ত করিয়া দিলে তাঁহার রথাশ্বগুলি ত্বরিতবেগে ছুটিয়াছে। সূতমুখে মহাকবি ধাবমান অশ্বগুলির বর্ণনায় লিখিয়াছেন :

মুক্তেষু রশ্মিষু নিরায়তপূর্বকায়া
নিষ্কম্পচামরশিখা নিভৃতোর্ধ্বকর্ণাঃ।
আত্মোদ্ধতৈরপি রজোভিরলক্ষ্যণীয়া
ধাবন্ত্যমী মৃগজবাক্ষময়েব রথ্যাঃ ॥

রশ্মিমুক্ত অশ্বগুলি দেহপূর্বার্দ্ধে নিঃশেষ দীর্ঘায়তন লাভ করিয়াছে। চামরের অগ্রভাগ নিশ্চল। কর্ণগুলি স্থির ও ঊর্দ্ধোত্থিত। নিজ নিজ খুরে উদ্ধতরেণুরাজিত অশ্বগুলিকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে অক্ষম। অশ্বযুগ্ম মৃগগতিবেগ সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন দ্রুতবেগে ধাবমান।

তাপসগণ সম্মুখে উপস্থিত হইলে দুষ্মন্ত সারথিকে অশ্বসংযমনে নির্দেশ দিয়াছেন। 'তেন হি নিগৃহ্যতাং বাজিনঃ।'

এই মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্তের অশ্বসমূহ খুরে খুরে আরক্তধূলিজাল সৃষ্টি করিয়াছে। সেই ধূলিপটল বিটপবিলগ্ন আর্দ্রবল্কলে এমনভাবে আসিয়া পড়িয়াছে মনে হইতেছে যেন সন্ধ্যাসূর্য্য-লোহিত যেন পল্লবপাল ছাইয়া গিয়াছে।

তুরগখুরহতস্তথাহিরেণুর্বিটপবিলগ্নজলার্দ্রবল্কলেষু।
পততি পরিণতারুণপ্রকাশঃ শলভসমূহইবাশ্রমদ্রুমেষু॥

মালবিকাগ্নিমিত্র নাট্যেও অশ্বমেধযজ্ঞের কথা আছে। 'বৎসরায় নিবর্ত্তনীয়ো নিরর্গলস্তুরঙ্গমো বিসর্জিতঃ।

মহাকবি কালিদাসের সাহিত্যকৃতিতে ব্যাঘ্র বিরল। রঘুবংশ মহাকাব্যের দশরথ-মৃগয়া উপলক্ষে মহাকবি যে যে পশুর বিবরণ দিয়াছেন তাহাদের মধ্যে ব্যাঘ্রও অবশ্য ছিল।

ব্যাঘ্রানভীক্ষ্ণাভিমুখোৎপতিতান্ গুহাভ্যঃ
ক্ষুন্নাসনাগ্রবিটপানিব বায়ুরুগ্রান্।
শিক্ষাবিশেষলঘুহস্ততয়া নিমেষাৎ
তূণীচকার শরপূরিতবক্ত্র-রন্ধ্রান্॥ ৯।৬৩

ব্যাঘ্রগুলি ভয়বিহীন দশরথকে গুহার মধ্য হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। শরক্ষেপক্ষিপ্র রাজা সেই ব্যাঘ্রগুলিকে বায়ুবিমর্দিত সর্জতরুর শাখাগ্রের মতো নিমেষ মধ্যে ভূতলশায়ী করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদের বদনবিবর দশরথের বাণে বাণে ভরিয়া গিয়াছিল।

দশরথমৃগয়ার ক্ষেত্র নিশ্চয়ই কোনো পর্বতদেশের বনস্থলী ছিল। গভীর অরণ্যে ব্যাঘ্রের বাস হইলেও পার্বত্যদেশে তাহারা গুহাশ্রয়ে বাস করে। গুহাবাসী ব্যাঘ্রেরা দশরথকে গুহাভ্যন্তর হইতেই আক্রমণ করিয়াছিল।

মহাকবি কালিদাসের রচনায় ব্যাঘ্র অল্প হইলেও, মৃগয়াবিহারী দুষ্মন্তের অনুচর-পরিচয়-সহচর-বন্দনে বনগ্রহণকোলাহলের সময় মৃগ, বরাহের সঙ্গে ব্যাঘ্রের নাম করিত তাহার পরিচয় আছে অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের দ্বিতীয়াঙ্কের প্রবিশকে মৃগয়াবিরক্ত বিদূষকমাধব্যের স্বগতকথনে। 'অয়ং মৃগঃ অয়ং বরাহঃ অয়ং শার্দূল ইতি মধ্যাহ্নে অপি গ্রীষ্মবিরলপাদপচ্ছায়াসু বনরাজিষু আহিণ্ডাতে অটবীতঃ অটবী।'

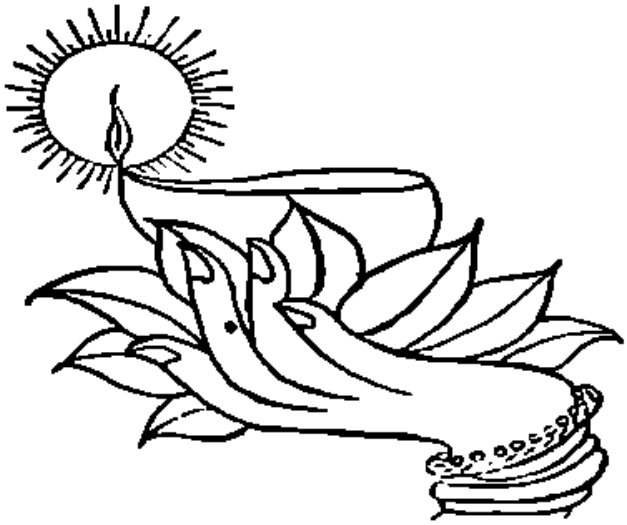

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(তিন)

সিরামিক্‌স্ নির্মাণে যে পর্যন্ত সাদা পোড়ামাটি অথবা white burning clay-র ব্যবহার শুরু হয়নি—সে পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণ মাটি, অর্থাৎ লাল পোড়ামাটি (red burning clay)-তে সিরামিক্‌স্ নির্মিত হয়েছে। সাদা পোড়ামাটির প্রধান উপাদান চিনামাটি অথবা Kaolinএর আবিষ্কার এবং ব্যবহার চীনদেশেই সর্বপ্রথম হয়েছিলো। তাই চীনদেশের নাম চিনামাটির নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

প্রধানতঃ যে কয়টি মিশ্রিত মাটির মধ্যে সাদা পোড়ামাটির সিরামিক্‌স্ তৈরী হয়ে থাকে—তার মধ্যে রয়েছে বোসিলেন, ষ্টোন্ অয়্যার এবং ফাইন আর্দেন অয়্যার। এই তিন ধরনের মাটির মিশ্রণের উপাদানগুলো যেমন বিভিন্ন ধরনের, তেমনই পোর্সিলেন জাতীয় মিশ্রিত মাটিতে উপাদানের তারতম্যের জন্য পোর্সিলেনকেও দেওয়া হয়েছে তিনটি আলাদা নাম। উপাদান এবং উত্তাপসহনীয়তার বিভিন্নতা অনুযায়ী পোর্সিলেনকে যথাক্রমে শক্ত পোর্সিলেন, নরম পোর্সিলেন এবং ফস্‌ফেটিক্ পোর্সিলেন—এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ফস্‌ফেটিক্ পোর্সিলেন বোন্ চায়না নামেও পরিচিত।

শক্ত পোর্সিলেনএর নির্মাণপদ্ধতি আনুমানিক দুশো খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীনদেশে উদ্ভাবিত হয়। ১৩০০° সেন্টিগ্রেড্ অথবা তারও বেশি উত্তাপে শক্ত পোর্সিলেন পোড়ানো হয়ে থাকে। আনুমানিক বারোশো খ্রীষ্টাব্দে আরব ব্যবসায়ীদের মারফত ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বন্দরগুলোতে চৈনিক পোর্সিলেন এসে পৌছায়। বিখ্যাত ইতালীয়ান পর্যটক মার্কোপোলো বারোশো আটানব্বই খ্রীষ্টাব্দে চীনভ্রমণের যে-বিবরণ লিখে গিয়েছেন—তাতে চৈনিক পোর্সিলেনএর উল্লেখ রয়েছে। য়ুরোপে—বিশেষ করে ইতালীতে চৈনিক পোর্সিলেনএর অনুকরণে পোর্সিলেন তৈরীর চেষ্টা পঞ্চদশ খ্রীষ্টীয় শতকের শেষভাগ থেকেই শুরু হয়েছিলো ; সে-চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। অবশেষে অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে জার্মানীতে পোর্সিলেন নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত

হলো। জার্মানীর রসায়নবিদ জন্ ফ্রেডেরিক বট্‌চার্ সতেরোশো নয় খ্রীষ্টাব্দে শক্ত পোর্সিলেন তৈরী করতে সক্ষম হন্।

অষ্টাদশ খ্রীষ্টীয় শতকের মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে যে-পোর্সিলেন নির্মিত হলো—তাকে অবিশ্যি শক্ত পোর্সিলেন বলা চলে না। কারণ ওই পোর্সিলেন পোড়ানো হতো অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপে—১২০০° থেকে ১২৫০° সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে। তাই এধরনের পোর্সিলেনকে বলা হতো নরম পোর্সিলেন।

ইংল্যাণ্ডে কেওলিন আবিষ্কৃত হয় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। এই শতকের শেষার্ধে ইংল্যাণ্ডে কেওলিন এবং হাড় পোড়ানো ছাই (bone ash) এর সংমিশ্রণে যে-সিরামিক্স্ তৈরী করা হলো—তার নাম দেওয়া হলো ফস্‌ফেটিক্ পোর্সিলেন। পরবর্তীকালে এই ফস্‌ফেটিক্ পোর্সিলেনই বোন্ চায়না নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সাংস্কৃতিক এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ রয়েছে সুপ্রাচীনকাল থেকে। সাংস্কৃতিক দূত এবং ব্যবসায়ীদের মারফত খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকেই যে চীনের পোর্সিলেন ভারতে এসে পৌঁছেছিলো—এ-অনুমান অনায়াসেই করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতে বৃটিশদের আগমনের পূর্বে এদেশে পোর্সিলেন তৈরীর কোনো চেষ্টা হয়েছিলো বলে জানা যায়নি। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নির্দেশে ভারতবর্ষে কেওলিনএর খনি আবিষ্কারএর চেষ্টা করা হতে থাকে। বিহারের ভাগলপুর জেলায় কলগাঁওএ কেওলিনএর সন্ধান পাওয়া যায়। ওই কেওলিনএর নমুনা কলকাতা মেডিকেল কলেজের ল্যাবরেটোরীতে পরীক্ষা করার পর পোর্সিলেন নির্মাণে ব্যবহারের উপযোগী বলে রিপোর্ট দেওয়া হয়। পোর্সিলেনএ ব্যবহারযোগ্য চিকনলেম অথবা ফ্লেক্স নিয়েও ওই ল্যাবরেটোরীতে পরীক্ষানিরীক্ষা হয়েছিলো বলে জানা যায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলগাঁওএর কাছে পাথরঘাটায় একটি কারখানা স্থাপিত হয়। এই কারখানাতেই ভারতীয় পোর্সিলেনএর প্রথম নিদর্শনটি নির্মিত হয়েছিলো বলে মনে করা যেতে পারে।

ভারতে উচ্চশ্রেণীর পোর্সিলেন নির্মাণের কারখানা প্রথম স্থাপিত হয় কোলকাতায়। বর্তমান খ্রীষ্টীয় শতকের গোড়ার দিকে কোলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলে স্বর্গীয় সত্যসুন্দর দেব এই কারখানাটি স্থাপন করেন। সত্যসুন্দর দেবকে ভারতবর্ষে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে উচ্চশ্রেণীর পোর্সিলেন নির্মাণের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে।

খ্রীষ্টীয় শতকের চল্লিশ দশকে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কোলকাতার বেলেঘাটায় একটি পোর্সিলেন তৈরীর কারখানা স্থাপন করেন। এই কারখানার পরিচালক নিযুক্ত হন শশধর রায়। শ্রীরায়ের পরিচালনায় এই কারখানায় ফস্‌ফেটিক্ পোর্সিলেন অথবা বোন্ চায়না নির্মিত হয়। এই কারখানাটি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বোন্ চায়না নির্মাণের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে।

শক্ত পোর্সিলেনএ কেওলিন ছাড়াও থাকে ফেলস্‌পার এবং কোয়ার্টজ। শতকরা হিসেবে যথাক্রমে ৫৩, ২৭ ও ২০ ভাগ। ফেলস্‌পার ও কোয়ার্টজ হলো স্ফটিক জাতীয় পাথর। শক্ত পোর্সিলেন ফ্লেক্সসহ ১৩০০° সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রার ঊর্ধ্ব উত্তাপে পোড়ানো হয়।

নরম পোর্সিলেনএ শতকরা হিসেবে কেওলিন ৩৫ ভাগ, ফেলস্‌পার ৩০ ভাগ এবং কোয়ার্টজ্‌ ৩৫ ভাগ থাকে। নরম পোর্সিলেন গ্লেজসহ ১২০০° থেকে ১২৫০° উত্তাপে পোড়ানো হয়।

ফস্‌ফেটিক্‌ পোর্সিলেন অথবা বোন্‌ চায়নার শতকরা হিসেবে কেওলিন ৩০ ভাগ, ফেলস্‌পার ১২ ভাগ, পোড়ানো অস্থিচূর্ণ (bone ash) ৪০ ভাগ এবং কোয়ার্টজ্‌ ৮ ভাগ থাকে। গ্লেজ লাগাবার আগে বোন্‌ চায়না ১২০০° থেকে ১২৫০° সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তাপে একবার পুড়িয়ে নেওয়া হয়। গ্লেজ লাগাবার পর আবার ১০৫০° সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তাপে পোড়ানো হয়ে থাকে।

ষ্টোনঅয়্যারএ কেওলিনএর বদলে ফায়ার ক্লে ব্যবহার করা হয়। ষ্টোনঅয়্যারএ শতকরা হিসেবে ফায়ার ক্লে থাকে ৫৮ ভাগ, ফেলস্‌পার ১৭ ভাগ এবং কোয়ার্টজ্‌ ২৫ ভাগ। ষ্টোনঅয়্যার গ্লেজসহ ১২৫০° থেকে ১৩০০° সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তাপে পোড়ানো হয়ে থাকে।

পোর্সিলেন এবং ষ্টোনঅয়্যার যথোপযুক্ত উত্তাপে পোড়ালে গলে গিয়ে কাঁচএ পরিণত হয়। সেজন্যেই পোর্সিলেন এবং ষ্টোনঅয়্যার যথোপযুক্ত উত্তাপে পোড়ালে ঈষৎ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ফাইন আর্দেনঅয়্যার কিন্তু যথোপযুক্ত উত্তাপ—অর্থাৎ ১২০০° থেকে ১২৫০° সেন্টিগ্রেড্‌ পোড়ালে গলে যায় না, কিছুটা নরম হয়ে ওঠে, ঠাণ্ডা হবার পর জমাট বেধে যায়। তাই ফাইন আর্দেনঅয়্যার যথোপযুক্ত উত্তাপে পোড়ালেও কখনো ঈষৎ স্বচ্ছ হয় না, অস্বচ্ছই থেকে যায়। ফাইন আর্দেনঅয়্যার বোন্‌ চায়নার মতোই গ্লেজ লাগাবার আগে একবার উচ্চতাপে অর্থাৎ ১২০০° থেকে ১২৫০° সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তাপে পোড়ানো হয় এবং গ্লেজ লাগাবার পর আবার নিম্নতাপে অর্থাৎ ১০৫০° সেন্টিগ্রেড্‌ উত্তাপে পোড়ানো হয়। শতকরা হিসেবে ফাইন আর্দেনঅয়্যারএ ফায়ার ক্লে থাকে ৪০ ভাগ, কেওলিন ১৫ ভাগ, ফেলস্‌পার ১৫ ভাগ এবং কোয়ার্টজ্‌ ৩০ ভাগ।

পোর্সিলেন, ষ্টোনঅয়্যার এবং ফাইন আর্দেনঅয়্যারএ ব্যবহৃত উপাদানগুলো—অর্থাৎ কেওলিন, ফায়ার ক্লে, ফেলস্‌পার ও কোয়ার্টজ্‌এর বড়ো বড়ো খণ্ডগুলোকে প্রথমে জ' ক্রাশার যন্ত্রের সাহায্যে ছোটো ছোটা টুকরোয় পরিণত করে এজ্‌ রানার যন্ত্রের মোটা দানার চূর্ণ করা হয়। মোটা দানার চূর্ণ প্রয়োজনমতো একসঙ্গে মিশিয়ে বল্‌ মিল্‌এর ভেতর পুরে ঘোরানো হয়। বল্‌ মিলএর ভেতরে ওই চূর্ণের সঙ্গে প্রয়োজনমতো জল এবং ছোটো ও বড়ো আকারের শক্ত পাথরের গোলক (flint)। বল্‌ মিলএর ঘূর্ণনে পাথরের গোলকগুলো আবর্তিত হতে থাকে এবং আবর্তন ও ঘর্ষণে মোটাদানার চূর্ণ মিহি চূর্ণে পরিণত হয়ে জলের সঙ্গে মিশে মাটির লেই হয়ে যায়। ওই মাটির লেইএর জলীয় অংশের বেশির ভাগ ফিল্‌টার প্রেস্‌ যন্ত্রের সাহায্যে বের করে নিলে যে-নমনীয় মাটির মণ্ড পাওয়া যায়—তাতে চাক্‌এর সাহায্যে বিভিন্ন আকারের সিরামিক্‌স্‌ তৈরী করা যেতে পারে।

দিবাকর সেনরায়

●

॥ সংঘবার্তা ॥

১৭ই নভেম্বর ১৯৮০ (১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭) সোমবার, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে (১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও শ্রীরামকৃষ্ণমিশনের পরমপূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ এবং ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন পরমপূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ (ভরত মহারাজ) এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পূজনীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ।

ঐ উপলক্ষে আয়োজিত দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শতাধিক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ এবং প্রায় দুই সহস্র শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-শিষ্যগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

●

বিজ্ঞপ্তি

বিশ্ববাণীর পূজার বিশেষ সংখ্যা সকল গ্রাহকগ্রাহিকার নামেই ডাকযোগে পাঠানো হইয়াছে গত ২৪শে ও ২৫শে অক্টোবর ১৯৮০ তারিখে (৭ই ও ৮ই কার্তিক '৮৭)। তথাপি এযাবৎ অনেক গ্রাহকগ্রাহিকা পত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে তাঁহারা উক্ত সংখ্যা এখনও পান নাই। এব্যাপারে বিশ্ববাণীর কর্তৃপক্ষ নিরুপায়, কারণ পুনরায় তাঁহাদের নিকট অতিরিক্ত কপি পাঠানো সাধ্যাতীত। সকল পত্রের উত্তর দেওয়া সম্ভব না হওয়ায় এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল। —স

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৪৪-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

লব্ধপ্রতিষ্ঠ-চিকিৎসক পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা, কবিরাজ প্রতিষ্ঠিত

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রীশ্রীমহাদেবের প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত বিশ্বজন-সমাদৃত অলৌকিক গুণসম্পন্ন

সিদ্ধ ভৈরব কবচ ঃ তন্ত্রের অদ্ভুত শক্তি

পুরশ্চরণে সিদ্ধ প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মন্ত্রশক্তি ও দ্রব্যগুণের অপূর্ব্ব সন্মিলন, ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্রপূত এই কবচ ধারণে পরীক্ষায় পাশ ও মকদ্দমায় জয়লাভ, চাকুরীপ্রাপ্তি, কার্য্যোন্নতি, দুরারোগ্য ব্যাধির শান্তি, সৌভাগ্যলাভ, ব্যবসাবাণিজ্যে উন্নতি, শত্রু বশীভূত ও কুপিত গ্রহ সুপ্রসন্ন হয় এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিলাভ করা যায়। যিনি কবচ ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সম্পূর্ণ নাম, গোত্র ও কবচ ধারণের উদ্দেশ্য জানাইতে হয়।

শ্রীগোষ্ঠ বিহারী চট্টোপাধ্যায়

"কালী মন্দির" পোঃ অঃ—কুণ্ডা। 814143 জিলা—এস, পি, বিহার

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিংচার ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্পীরিট-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এস, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

THE NEW INDIAN PRESS

★

QUALITY
PRINTERS
DESIGNERS

★

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

★

মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন।

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

'পিয়ারলেস ভবন'

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

মোট সম্পদ—১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সমৃদ্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮··

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization Philosophy and Religion	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45·00	Music of the South-Asian Peoples. Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music . Its Form, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

3. Indian Music in Relation to Art and Culture.
4. Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
6. Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
42nd Year, November 1980
VOL. IX

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৫৩, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৪০২২৩, ৩২৬৬৩, ৩৪১২৩২
Cable:'Cookmepure','Dasspice'
Telex:021 2591 A/B'Cook'
Post Box:Burrabazar 6985 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
3, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press 6,Duff Street, Calcutta-700006
ICE Rs. 1.50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১.৫০টাকা

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহঃ সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
দশম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা ভাকে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্ধাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।

- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।

- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারা পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।

- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।

- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

ছুটির বারে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

দুলালের
তালমিছরী

ব্যবহারে
উপকার হচ্ছে এই
এ ব্যাপারে আমি
আপনার

৬

দশটা বেজে গ্যাচে। ছেলেরা বই হাতে করে রাস্তায় হো হো কত্তে কত্তে স্কুলে চলেছে। মৌতাতী বুড়োরা তেল মেখে গামছা কাঁদে করে আফিমের দোকান ও গুলির আড্ডায় জম্‌ছেন। হেটো ব্যাপারীরা বাজারে ব্যাচা কেনা শেষ করে খালি বাজরা নিয়ে ফিরে যাচ্চে। কলকেতা শহর বড়ই গুল্‌জার— গাড়ির হর্‌রা, সহিসের পয়িস পয়িস শব্দ, কেঁদো কেঁদো ওয়েলার ও নরম্যাণ্ডির টাপেতে রাস্তা কেঁপে উঠচে – বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা কথা নয়। খীরুকৃষ্ণ দাঁর ম্যানেজার কানাইধন দত্ত এক নিশ্বাসা রকমের ছক্কড় ভাড়া করে বাস্কোয়ত্তি পূজার বার্ষিক সাদ্‌তে বেরিয়েচেন।

৭

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় ঘোড়ার খুরে রাস্তা কাঁপানো যে-কলকাতার ছবি, সে-কলকাতা আজ আর নেই। তবুও কালীপ্রসন্ন-র কলকাতার সঙ্গে আজকের কলকাতার মিল রয়েছে এক জায়গায়। আজও 'বিনা ব্যাঘাতে রাস্তায় চলা বড় সোজা নয়।' তার কারণ ক্রমবর্ধমান

কালীপ্রসন্নর কলকাতা

জনসংখ্যার তুলনায় আজকের কলকাতার পথঘাট সংখ্যায় স্বল্প, পরিধিতে সংকীর্ণ, যানবাহন সীমিত এবং শ্লথ। বর্তমানের এই দুরূহ সমস্যার একমাত্র সমাধান ভূগর্ভ রেল। জনসাধারণের সহযোগিতার সঙ্গে আমাদের নিপুণ কর্মীদের অক্লান্ত প্রয়াস মুক্ত করে, ভূগর্ভ রেলই কলকাতাকে উপহার দিতে পারে অগ্রগতির এক অভাবনীয় ইতিহাস।

কলকাতার নতুন মানচিত্র রচনায় ভূগর্ভ রেল

মেট্রো রেল, কলকাতা

আয়ুর্বেদীয় পেটেন্ট ঔষধ

ডাঃ সেন্সেস

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

'JEET' BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
'SANKHA' BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO 10811, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ ৬

ফোন: ৩৫- ৩৭১৯

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিত্যানন্দ ফার্মাকিউটিক্যাল প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড
কলিকাতা-৭

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১১ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাক ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়রাজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এটি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়া।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রকেদর রাস গোর ঘোষাল, এম.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office :—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

আর মিত্রের

ময়ূর মার্কা তিল তৈল

শুদ্ধ ও সুস্বাদুতে তিল তৈল বহুদিন প্রচলিত,
ভারতীয় শিল্পপ্রদর্শনী প্রতিযোগিতায়

অর্ধ শতাব্দীর বিশ্বাসের ফসল প্রতীয়মান

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৫১৯	
২।	সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	৫৩১	স্বামী প্রভানন্দ
৩।	সারদাস্তোত্র	৫৩৮	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দারপা
৪।	সারদাপ্রণাম	৫৩৮	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দারপা
৫।	বিবেকানন্দ মননালোকে সমাজ বিকাশের ধারা	৫৩৯	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৬।	তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	৫৪১	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৭।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৫৪৭	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৮।	দক্ষিণ-ভারতের শিল্পে ভাস্কর্য	৫৫১	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
৯।	জাপানের কাবুকি নাটক	৫৫৩	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১০।	কেন হিন্দুরা খ্রীষ্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে	৫৫৬	স্বামী অভেদানন্দ
১১।	হিমালয়ের পথে পথে—উত্তরকাশী	৫৫৯	শ্রীবিশ্বজিৎ
১২।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৫৬৩	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১৩।	মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের স্মৃতি	৫৬৫	শ্রীসুকুমার সান্যাল

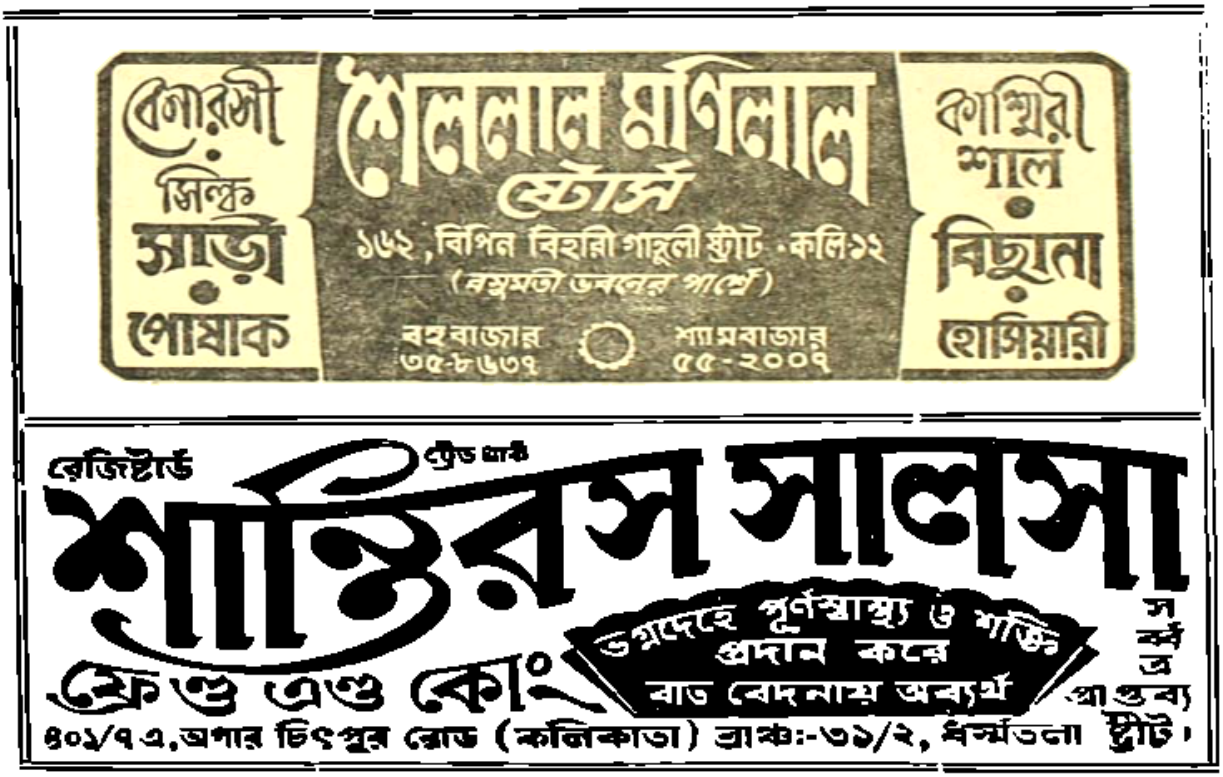

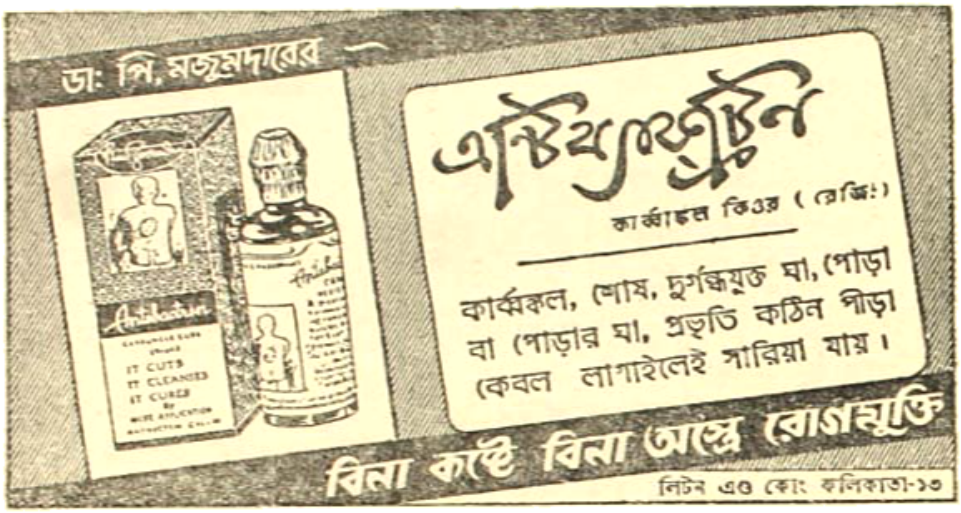

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

BUDGE BUDGE, HALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

67, Netaji Subhas Road,

Calcutta-1

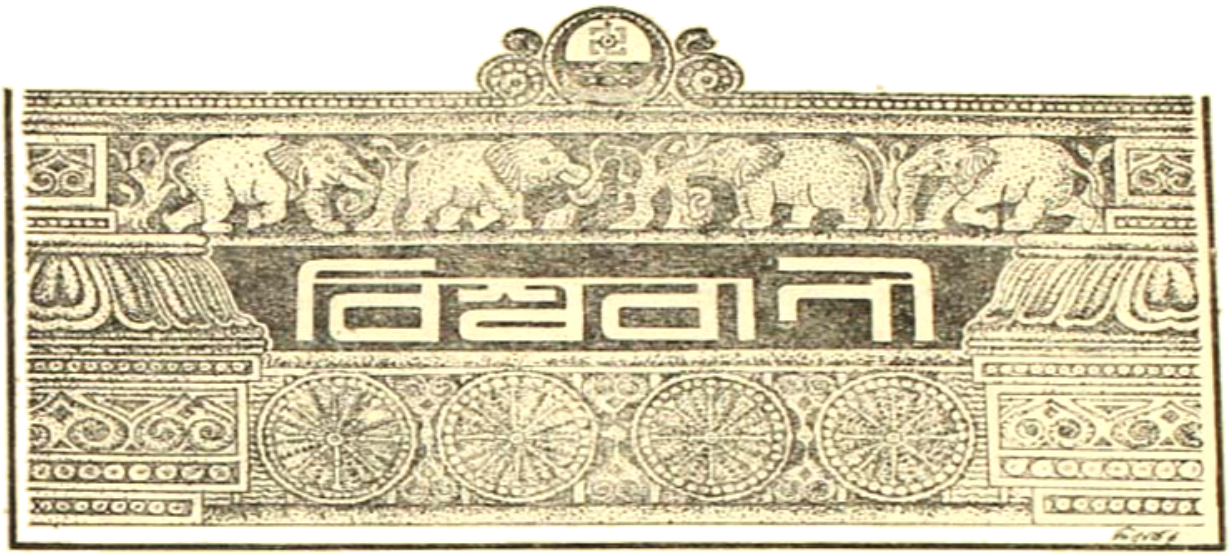

বিয়াল্লিশ বর্ষ | দশম সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(সপ্তমাংশ)

॥ মায়া ও মায়িন ॥

মায়া ঈশ্বরশক্তি। এই ঈশ্বর তুরীয় বা মায়োত্তীর্ণ নন, ইনি সগুণ-ব্রহ্ম, সুতরাং মায়ারূপ গুণের সহবাসী, কিন্তু মায়াধীশ। আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী অদ্বৈতমতের দার্শনিকরা একথা স্বীকার করেন। মায়োত্তীর্ণ বিশুদ্ধ-ব্রহ্ম বিষয় নন এবং বিষয়ীও নন—neither object, nor subject, কেননা বিষয়-বিষয়ীভেদ বা কর্তা-কর্মভেদ সৃষ্টি করে গুণময়ী মায়াসত্তা—'গুণময়ী মম মায়া'। অধ্যাপক এম. কে. বেঙ্কটরাম আবার মায়াস্বরূপের বিশ্লেষণ ক'রে বলেছেন: "Maya is simply the principle which breaks up the original unity of the sensation and gives a distorted picture of it as subject and object, as that which perceives and that which is perceived (গ্রাহ্যগ্রাহক-ভেদলক্ষণঃ)। It is the principle of differentiation and integration inherent in the human mind. It breakes up the original whole presented in sensation into its component parts and reconstructs them in its own way" (vide *Advaita Vedanta* (1964), p. 68).

মায়ারূপ উপাধির জন্যই নিরুপাধিক নির্গুণ-ব্রহ্মসত্তাকে আমরা সগুণসত্তারূপে উপলব্ধি করি। অধ্যাপক বেঙ্কটরাম আবার একথাই অন্যভাবে বলেছেন: "Consequently the

limitations of the intellect, and the sense organs are sometimes spoken of as an external something, called *upa'dhi*. We have already said that Nirguna-Brahman, if viewed through the intellect and the sense organs, *appears* as Isvara, Jiva and the World. This is one way of looking at the fact. Another way is to objectify the limitation and speak of it as an adjunct or *upa'dhi*. If this adjunct or *upa'dhi* is taken in its entirety, we get the conception of Isvara or Saguna-Brahman; if, on the other hand, it is taken to a limited extent, we get the conception of *Jiva*. In other words, if matter in its entirety becomes an adjunct (*upa'dhi*) of spirit, we get Isvara or Saguna-Brahman, and if matter to a limited extent becomes the adjunct of spirit, we get the conception of *Jiva*. The phenomenon of Nirguna-Brahman appearing as Isvara and *Jiva* can thus be presented in two ways..... when we think of it as a subjective limitation, we call it *ajnana* (অজ্ঞান), and when we view it as cosmic factor, we call it Maya (মায়া)"।[১]

সুতরাং দেখা যায় যে, মায়ারূপ গুণের বা উপাধির জন্য একই নিরুপাধিক অখণ্ড-ব্রহ্ম কখনও নির্গুণ, কখনও সগুণ, আবার কখনও অজ্ঞান, কখনও মায়া-রূপে প্রতীত হন। তাছাড়া এভাবে বা এই দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতেই বোঝা যায় যে, মায়া আবরণীশক্তি এবং মায়িন মায়াসমলঙ্কৃত ঈশ্বর—

'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'।

১। এর তাৎপর্য এই যে, মায়া-উপাধির জন্য এক ও অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু বিষয়ী ও বিষয়-রূপে প্রকাশ পায় এবং এই প্রকাশ অখণ্ড ও অপৃথক বস্তুর খণ্ড ও পৃথক রূপ। এই খণ্ডরূপ বিকৃত। অখণ্ড রূপের বিকৃতি অনুভূত হয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ বোধশক্তির দ্বারা। এই পৃথকত্ব বা পার্থক্যের (দ্বৈত) ধারণা কিন্তু অজ্ঞানাশ্রয়ী মানুষের মধ্যে হয় আত্যন্তিকভাবে, কেননা দ্বৈত ও পৃথক বলেই সেই এক ও অখণ্ড বস্তুকে বা তত্ত্বকে খণ্ড ও পৃথক দেখে বা অনুভব করে মানুষ।

মায়া-রূপ উপাধির স্বভাবই হ'ল পৃথকবোধ সৃষ্টি করা। তাছাড়া একথাও সত্য যে, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তুর ধারণা করলেও খণ্ডজ্ঞানেরই সৃষ্টি হয়। জীব ও জগৎ স্বরূপত ব্রহ্ম থেকে অপৃথক ও এক হলেও মায়ারূপ উপাধি থাকলে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও বৌদ্ধিকজ্ঞান সকল-কিছুই দ্বৈতক্ষেত্ররূপ অজ্ঞানের এলাকায় পড়ে, সেজন্য ইন্দ্রিয়জ্ঞান, মনের জ্ঞান ও বৌদ্ধিকজ্ঞানকে অতিক্রম না করলে বোধিরূপ শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ হয় না, আর শুদ্ধজ্ঞানের প্রকাশ না হলে নির্গুণ-ব্রহ্মেরও কোনও উপলব্ধি হয় না। নির্গুণ-ব্রহ্ম বলতে মায়ারূপ উপাধির অতীত ব্রহ্ম—যিনি একমাত্র বোধে বোধ হন। সেজন্য মায়ারূপ উপাধি ও আবরণই ব্রহ্মের সগুণত্ব, নির্গুণত্ব প্রভৃতি রূপের সৃষ্টি করে।

ঈশ্বর[২] বা সগুণ-ঈশ্বর মায়িন, আর মায়া ত্রিগুণাত্মক শক্তি। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী গুণময়ী বা ত্রিগুণাত্মক মায়া বা প্রকৃতি-সম্বন্ধে বলেছেন: "গুণময়ী সত্ত্বরজস্তমোগুণত্রয়াত্মিকা ত্রিগুণরজ্জুরিবাতিদৃঢ়ত্বেন বন্ধনহেতুঃ 'মম' মায়াবিনঃ পরমেশ্বরস্য সর্বজগৎকারণস্য সর্বজ্ঞস্য সর্বশক্তেঃ স্বকৃতা স্বাধীনত্বেন জগৎসৃষ্টাদিনির্বাহিকা 'মায়া' তত্ত্বপ্রতিভাসপ্রতিবন্ধেনাতত্ত্বপ্রতিভাসহেতু-বারণবিক্ষেপশক্তিরূপবত্ত্যাবিদ্যা সর্বপ্রপঞ্চপ্রকৃতিঃ—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' (শ্বেতাশ্বতর উঃ ৪:১০) ইতি শ্রুত্যাঃ…"। গুণ এখানে সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ (গুণত্রয়) এবং সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর গুণত্রয়ের অধীশ্বর বা গুণাতীত হয়েও (যেন) গুণাশ্রয়ী, সুতরাং ঈশ্বর মায়াশ্রয়ী মায়িন—দাহিকাশক্তিযুক্ত অগ্নি যেমন, কিংবা জ্যোতিচ্ছটাবিশিষ্ট মণি যেমন।

প্রশ্ন এই যে, দাহিকাশক্তিবিশিষ্ট অগ্নি ও জ্যোতিচ্ছটাবিশিষ্ট মণি—এদের মধ্যে 'বিশিষ্ট'-শব্দটি বিশেষণের বোধক (প্রকাশক) এবং বিশেষণ থাকার অর্থ তার অনুসঙ্গীরূপে একটি বিশেষ্য অবশ্যই থাকে—যেমন 'গুণ'-রূপ বিশেষণ থাকে 'গুণী'-রূপ বিশেষ্যবস্তুতে। সুতরাং এ'ভাবেই সাধারণতঃ প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক যে, বিশেষ্য ও বিশেষণ দুটি পৃথক বস্তু,—একটি বস্তু ও আর অপরটি তার নির্দেশক বা নির্দিষ্ট স্বভাব গুণ বা প্রকৃতি। অগ্নির দাহিকাশক্তি বলার উদ্দেশ্য অগ্নির নিজস্ব স্বভাব, গুণ বা প্রকৃতি (nature) দাহ করা বা পোড়ানো। তেমনি বরফ ও তার শৈত্য বা হিমগুণ। ঠিক এ'ভাবে ব্রহ্ম ও শক্তি দুটি যেন পৃথক বস্তু—একটি বিশেষ্য ও অপরটি বিশেষণ, আর বিশেষণরূপ স্বভাব বা প্রকৃতি দিয়ে নির্দিষ্ট (determined) হয় অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ব্রহ্ম ও শক্তি; শক্তিমান ও শক্তি অভেদ"। সুতরাং দেখা উচিত ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ কোন্‌দিক থেকে? 'অভেদ'-শব্দটি আসলে ঐক্য বা একতা ও অখণ্ডসত্তার বোধক ও প্রকাশক।

২। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে এখানে জীব ও ঈশ্বর উভয়ের সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। অদ্বৈতবেদান্তে জীব (জীবচৈতন্য) ব্রহ্ম (ব্রহ্মচৈতন্য) থেকে অভেদ। তবুও বেদান্ত জীবের ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করেছে অজ্ঞানরূপ উপাধির সাহায্য নিয়ে। 'সিদ্ধান্তবিন্দু'-গ্রন্থে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে বলেছেন ভিন্ন ভিন্নভাবে—

(ক) 'অজ্ঞানোপহিতং বিম্বচৈতন্যমীশ্বরঃ অন্তঃকরণতৎসংস্কারাবচ্ছিন্নাজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং জীবং ইতি বিবরণকারাঃ।'

(খ) 'অজ্ঞানপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যমীশ্বরঃ। বুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং জীবঃ।'

(গ) 'অজ্ঞানবিষয়ীভূতং চৈতন্যমীশ্বরঃ। অজ্ঞানাশ্রয়ীভূতং চ জীব ইতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ।'

(ঘ) 'অজ্ঞানুপহিতং শুদ্ধং চৈতন্যমীশ্বরঃ, অজ্ঞানোপহিতং চ জীব…।'

এ'ভাবে মধুসূদন সরস্বতী একজীববাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ প্রভৃতি মতবাদ এবং সংক্ষেপশারীরকার, বিবরণকার প্রভৃতিদের মতের ও সিদ্ধান্তের পরিচয় দিয়েছেন ঈশ্বর ও জীবের স্বরূপনির্ণয়প্রসঙ্গে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় যে, উপাধিভেদে একই চৈতন্য (শুদ্ধচৈতন্য) ঈশ্বর ও জীব নামে পরিচিত হন। মধুসূদন সরস্বতী এজন্য 'সিদ্ধান্তবিন্দু'-গ্রন্থে ভিন্নভাবে বলেছেন: "জীবেশ্বরবিভাগাদিকল্পনায়াস্তু পুরুষবুদ্ধিমাত্রপ্রভবা অপি শাস্ত্রেনা-নুমতে। তত্ত্বজ্ঞানোপায়োপপত্তয়ে।…অতএব জীবস্যোপাধিনাভিভূতত্বাৎসংসারোপপত্তিঃ। পরমেশ্বরস্য তদনুপাধিবশিত্বাৎসর্বজ্ঞত্বাদিকমিতি সম্যগুপপন্নতে ব্যবস্থা"।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন : "যখন নিষ্ক্রিয় (বা শক্তি)—তাকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, তখন শক্তি বলি"। সুতরাং ব্রহ্ম ও শক্তির নির্দেশক বস্তুটি নিষ্ক্রিয়তা ও সক্রিয়তা কিংবা ক্রিয়াহীন ও সক্রিয়, অর্থাৎ যখন ক্রিয়াযুক্ত বা ক্রিয়াশীল ও নিষ্ক্রিয়। এই অক্রিয় বা ক্রিয়াহীনতা ও সক্রিয় বা কর্মচাঞ্চল্য দুটি শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে বস্তু যে এক ও অভেদ একথাও বোঝা যায়। বোঝা যায় যে, একই বস্তু বা সত্তা যখন কাজ করে না ও চঞ্চল নয়—অচঞ্চল, তখন স্থিরসত্তা ব্রহ্ম, আর যখন কাজ করে বা চঞ্চল, তখন সেটিই অস্থিরসত্তা—শক্তি। এখানে ব্যবহার করেছি 'সেটিই'-শব্দ—যা থেকে বোঝা যায় দুটিই এক বা অভিন্ন বস্তু বা সত্তা—যার অক্রিয়া ও সক্রিয়াভেদে 'যেন' অবস্থান্তর হয় ও রূপভেদ হয় এবং এই অবস্থান্তর ও রূপভেদের জন্যই সাধারণ দৃষ্টিতে তারা (আপাতপ্রতীয়মান বস্তুদুটি) ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়, কিন্তু স্বরূপত তারা ভিন্ন নয়, অবস্থান্তরের জন্য রূপ ও নাম পৃথক পৃথক ধারণ করে, বা আমরা তাদের ভিন্ন বলি মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এদের উদাহরণ দিয়েছেন স্থির বা না-চলা সাপ ও অস্থির বা চলা-সাপ, অথচ কিন্তু একটাই- সাপ। একটাই সাপ যখন কুণ্ডলী পাকিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে, আবার একই সাপ যখন অস্থির বা ক্রিয়াচঞ্চল হয়ে চলে।

॥ সগুণ ও নির্গুণ-সম্বন্ধে অদ্বৈতবেদান্ত ॥

ঠিক এ'ভাবে অদ্বৈতবেদান্তে একই ব্যাপকচৈতন্যকে (all-pervading Consciousness) বলা হয়েছে নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকার, বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বগত। তাই ব্রহ্মবস্তু এক, কিন্তু যখন মায়া-উপাধিহীন, তখন নির্গুণ ও তুরীয় অর্থাৎ মায়োত্তীর্ণ ও সর্বাতীত নিষ্কল ব্রহ্ম, আবার যখন মায়া-উপাধিযুক্ত, তখন সগুণ ও মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম। ব্রহ্ম বা সর্বব্যাপকচৈতন্য একটিই, তবে তাতে মায়া থাকা ও না-থাকার জন্য তিনি নির্গুণ ও সগুণ। নিরাকার ও সাকার এবং বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বগত (transcendent and immanent) গুণদুটি সম্বন্ধেও ঐ একথা। আবার সর্বাতীত মায়োত্তীর্ণ-ব্রহ্ম কিন্তু কোন-কিছুর আধার ও কারণ না হয়েও সর্বাধার ও সর্বকারণ, কেননা ঐ একরস-অখণ্ড-পরমকারণ-ব্রহ্মের উপরই মায়া ও মায়ার পরিণতি (বিকার) বিশ্বচরাচর এবং অন্যান্য সকল-কিছু প্রতিষ্ঠিত—যেমন মায়িক ও মিথ্যা (প্রতিভাসসম্পন্ন) সাপের অধিষ্ঠান বা আধার দড়ি—যে দড়িকে অল্প-আলোকে, অন্ধকারে বা ভিন্ন দৃষ্টির জন্য আমরা সাপ বলি। সাপ কিন্তু প্রতিভাস বা মিথ্যা-সাপেরও আধার বা অধিষ্ঠান (background), এবং অধিষ্ঠান দড়ির তাতে কোন বিকার বা বিকৃতিও হয় না। তেমনি জগৎ, মায়া ও উপাধিযুক্ত চৈতন্য একই মহাচৈতন্য অদ্বৈত ও অদ্বৈতরস-ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও ঐ পরমপ্রতিষ্ঠা-ব্রহ্মের কিন্তু কোন বিকার, বা তাঁর সত্তার কোন পরিবর্তন হয় না। ঐ মহাধার ও মহাকারণ অথচ কারণাতীত তুরীয়চৈতন্যকে বাদ দিলে বিশ্বের বা সৃষ্টির কোন বস্তুসত্তারই সার্থকতা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এ'কথাকেই একটু ভিন্নভাবে বলেছেন : "অগ্নি বললে দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়।...একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করবার যো নাই"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতার কথাই বলেছেন এবং অদ্বৈতবেদান্তের

দৃষ্টকোণ থেকে সকল দার্শনিকই বলেন পরমসত্তা সর্বানুস্যূত-ব্রহ্মকে (তুরীয়-ব্রহ্মকে) বাদ দিয়ে তাঁরই আলোকে আলোকে—তাঁরই সত্তায় সত্তাবান আর কোন-কিছুকেই চিন্তা করার উপায় নাই, কেননা তাহলেই সকল-কিছুই নিঃসত্তাসম্পন্ন শূন্যবস্তুতে পরিণত হয়। আর একথা একান্তভাবে সত্য যে, অদ্বৈতবেদান্তে উপাধির সাহায্যে যদিও আমরা একই মহাচৈতন্যকে ভাগ করি নির্গুণ ও সগুণ ব'লে, নিরাকার ও সাকার ব'লে, অদ্বৈত ও দ্বৈত ব'লে, কিংবা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট (সমষ্টিতে) এবং বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ (ব্যষ্টিতে) ব'লে, আসলে একই সর্বাতীত অথচ সর্বাধার তুরীয়-ব্রহ্মচৈতন্য সকল চৈতন্যস্তরেই অনুস্যূত থাকে; কিংবা বলা যায়, (৪) তুরীয়চৈতন্য, (৩) ঈশ্বরচৈতন্য, (২) হিরণ্যগর্ভচৈতন্য ও (১) বিরাটচৈতন্য, আবার (৪) তুরীয়চৈতন্য, (৩) প্রাজ্ঞচৈতন্য, (২) তৈজসচৈতন্য ও (১) বিশ্বচৈতন্য চৈতন্যাংশে এক ও অখণ্ড সর্বাবভাসক ও সর্বানুস্যূত মহাচৈতন্য। সেজন্য আচার্য শঙ্কর পরমোপলব্ধির দৃষ্টিতে বলেছেন: "জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ", 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'—পরমবস্তু এক, সেজন্য জীবরূপে প্রতীয়মান ব্রহ্ম ও স্বরূপে ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন, কেবল রূপে রূপেই আপাতবিরোধী ও ভিন্ন ব'লে প্রতীত হয়—'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'।

॥ শৈবাগমশাস্ত্রে ঈশ্বর ও মায়াশক্তি ॥

সকল তন্ত্রশাস্ত্রেই শিব ও শক্তি উভয়ে তত্ত্ব—'প্রপঞ্চবাসনারূপা শান্তিরিত্যভিধীয়তে, নিষ্প্রপঞ্চচিদেকাত্মা শিবতত্ত্বং সমীরিতম্'। এটি পরমানন্দতন্ত্রের কথা। অন্যান্য তন্ত্রে তত্ত্বদুটির বর্ণনা হয়তো কিছু কিছু পৃথক।

পরশুরামকল্পসূত্রে ১।২ মন্ত্রবাক্যে ভগবান শিব শক্তির (মায়াশক্তি এখানে নিত্যাশক্তি) সাহায্য নিয়ে অষ্টাদশ বিদ্যা, সর্বদর্শন প্রভৃতি সৃষ্টি করেন অর্থে বিশ্বসৃষ্টিই করেন। কল্পসূত্রকার আচার্য পরশুরাম বলেছেন: "ভগবান্ পরমশিবভট্টারকঃ শ্রুত্যাদি-অষ্টাদশবিদ্যাঃ সর্বাণি দর্শনানি লীলয়া তত্তদবস্থাপন্নঃ প্রণীয়···"। বৃত্তিকার পণ্ডিত রামেশ্বর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণপ্রসঙ্গে লিখেছেন: "ইত্যেতাদৃশ-ষড়্গুণৈশ্বর্যসম্পন্নো ভগবান্। নন্থ পরমশিবঃ তত্ত্বাতীতঃ, তস্য বিদ্যাকর্তৃত্বং ন সম্ভবতি উপাধিশূন্যত্বাৎ···। জগদীশ্বরত্বরূপধর্মবান্ মায়োপাধিকঃ ইতি তদর্থঃ।···লীলয়া অনায়াসেন তত্তদবস্থাপন্নঃ ঈশ্বরাবস্থাপন্নো বেদান ··নির্মায়ঃ"।[৩] এখানে 'লীলা'-শব্দে তন্ত্রকার বলেছেন প্রয়াসবর্জিত সন্নিয়ন্ত্রী স্বাত্মাভিন্না ভাবতী ভৈরবীর অবস্থাপন্ন হন ঈশ্বর। এই অবস্থাপন্ন হওয়ার সময়েই ঈশ্বরের নাম 'মায়িন'—মায়াশক্তিসম্পন্ন পুরুষ বা মহেশ্বর। এই ঈশ্বর-সহাচারিশক্তিই তন্ত্রে ভৈরবী বা ভৈরবীশক্তি—যে শক্তির সাহায্যে ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম বিশ্বসৃষ্টি করেন। বৃত্তিকার রামেশ্বর এই লীলাপ্রয়ী ঈশ্বরকে 'ভট্টারকো জগদ্রূপনাট্যারম্ভকঃ' বলেছেন। বেদান্তে ইনিই সগুণ-ব্রহ্ম—যিনি স্বরূপে সচ্চিৎ বা শুদ্ধচৈতন্য।

কাশ্মীরীয় অদ্বৈত-শৈবদর্শনে বা শৈবাগমে সর্বপরিবর্তনের অতীত পরমশিব বা শিবতত্ত্ব থেকে বিশ্বসৃষ্টির উন্মেষ ও প্রসার বা প্রসরণ স্বীকৃত, কিন্তু সৃষ্টিতে বা উন্মেষে পরমশিব শক্তি বা

৩। আচার্য শ্রীকণ্ঠের অভিমতও অনেকটা তাই।

বিশ্বরূপে প্রতীয়মান হলেও তিনি পরমশিবই বা ঈশ্বর থেকে স্বরূপে অভিন্নই। এই শক্তি আনন্দোচ্ছলিতা, অর্থাৎ পরমশিবের আনন্দরূপ ও প্রকাশ, সেজন্য সাধারণদৃষ্টিতে শিবের বা শিবতত্ত্বের ও শক্তি বা মায়াশক্তির (শক্তিতত্ত্বের) মধ্যে সাধারণত ভেদ দেখা গেলেও স্বরূপে এক ও অভিন্ন। এজন্যই কাশ্মীরীয়-শৈবাগমতন্ত্রের নাম অদ্বৈতশৈবদর্শন। তবে মনে রাখা উচিত যে, অদ্বৈতবেদান্তদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত কাশ্মীরীয়-অদ্বৈতশৈবদর্শনের দৃষ্টি ও সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে এক বা অভিন্ন নয়, তাহলেও উভয়ের তত্ত্বদৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ বা ভিন্নতা দেখা যায় না। কাশ্মীরীয়-ত্রিকদর্শনের সিদ্ধান্তসম্বন্ধে কিছুটা পূর্বে আলোচনা করেছি।

কাশ্মীরীয়-অদ্বৈতশৈবদর্শন আগমশাস্ত্র, স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্র তিনভাগে বিভক্ত। মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব, মৃগেন্দ্র, স্বচ্ছন্দ, রুদ্রযামল, শৈবসূত্র প্রভৃতি শুদ্ধ আগমশাস্ত্রের অন্তর্গত। স্পন্দশাস্ত্র বা স্পন্দকারিকা ও কিছু কারিকা স্পন্দশাস্ত্রের অন্তর্গত এবং সোমানন্দ-কৃত শিবদৃষ্টি, উৎপলাচার্য-কৃত ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক (১ম—১২শ ভাগ), ক্ষেমরাজ-কৃত প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয় প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের অন্তর্গত। মোটকথা কাশ্মীরীয়-শৈবাগমশাস্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্রশাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও বিচারশৈলী ভিন্ন ভিন্ন হলেও চরমসিদ্ধান্তে প্রমাণ করেছে চিৎ বা পরমশিব এবং চিতি বা পরাশক্তি স্বরূপে এক ও অভিন্ন, প্রকাশেই কেবল ভিন্ন। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে আচার্য ক্ষেমরাজ বলেছেন: "চিতি স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ?"—চিতি বা শক্তির স্বতন্ত্র ইচ্ছাতেই জগতের ও সৃষ্টির সার্থকতা—'প্রসরন্ত্যাং জগৎ উন্মিষতি ব্যবতিষ্ঠতে চ, নিবৃত্তপ্রসারায়াং চ নিমিষতি'। মোটকথা চিতি, প্রকৃতি বা মায়ার সহায়তায় চিদ্ বা ঈশ্বর বা ব্রহ্মচৈতন্যের ভিন্নভাবে প্রকাশ সম্ভব হয়। পুনরায় বলা হয়েছে: "চিদেব ভগবতী স্বচ্ছ-স্বতন্ত্ররূপা তত্তদনন্তজগদাত্মনা স্ফুরতি"। সুতরাং অদ্বৈত-আগমশাস্ত্রের অভিমত যে, চিদ্ ও চিতি—পরমশিবরূপী ব্রহ্ম বা ঈশ্বর চিতি, প্রকৃতি বা মায়াশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপ ধারণ করেন, কিন্তু স্বরূপে তারা সকল বিকার ও পরিবর্তনের অতীত, এক ও অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিপন্ন করার প্রণালী কিছুটা ভিন্ন হলেও স্বরূপসত্তার উপলব্ধনে শৈবাগমের সঙ্গে তার এক ও অভিন্ন মত।

॥ ব্রহ্মের সগুণ-নির্গুণ-রূপ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ॥

সগুণ ও নির্গুণ—সাকার ও নিরাকার—সবিশেষ ও নির্বিশেষ প্রভৃতি গুণ সর্ব-উপাধিবিহীন ব্রহ্মে আরোপ করে মানুষ (সাধক) তার নিজের স্বতন্ত্র রুচি ও দৃষ্টি-অনুযায়ী। এ'প্রসঙ্গে সর্বসমন্বয়ীদৃষ্টিসম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত অপরূপ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একজন বৈষ্ণব-গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে বলেন: "আবার কেউ কেউ বলে ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন।...যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎদর্শন হয়, তাহলে ঠিক বলা যায়। যে দর্শন করেছে—সে ঠিক জানে ঈশ্বর সাকার—আবার নিরাকার। আরও তিনি কত কি আছেন বলা যায় না"। এটিও বেদান্তের কথা। ঈশ্বর সাকার হয়েও মূর্তি ধরে আসেন, আবার সকল আকারের পারে তিনি নিরাকার। তাই ঐ বৈষ্ণব গোস্বামীকে লক্ষ্য ক'রে পুনরায়

বলেছেন : "তা ঈশ্বর শুধু সাকার বললে কি হবে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় মানুষের মতো দেহধারণ ক'রে আসেন—এও সত্য, আর নানারূপ ধ'রে ভক্তকে দেখা দেন—এও সত্য। আবার তিনি নিরাকার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—এও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার দুই বলেছে ; সগুণ বলেছে—নির্গুণও বলেছে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ২৮-২৯)।

এরপর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের প্রত্যক্ষভাবে উদাহরণ দিয়ে বলেছেন : "কি রকম জানো ?—সচ্চিদানন্দ যেন অনন্তসাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের চাঁই সাগরের জলে ভাসে, তেমনি ভক্তিহীম লেগে সচ্চিদানন্দ-সাগরে সাকার-মূর্তি দর্শন হয়। ভক্তের জন্য সাকার। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে বরফ গলে যায়—আগেকার যেমন জল, তেমনি জল। অধঃ ঊর্ধ পরিপূর্ণ। জলে জল। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সব স্তব করেছে—ঠাকুর, তুমিই সাকার, তুমিই নিরাকার। আমাদের সামনে তুমি মানুষ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে (উপনিষদে) তোমাকেই বাক্য-মনের অতীত বলেছে" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃ: ৩০)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব এখানে বেদ, উপনিষৎ বলতে প্রকারান্তরে বেদান্তের কথাই বলেছেন, এটি শুধু তন্ত্রের আলোকে জ্ঞান লাভ ক'রে বলেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন বেদান্তের সহজলভ্য জ্ঞানের কথা—"হাঁ, ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, আবার সাকার-নিরাকারের পার। তাঁর ইতি করা যায় না"।

উপলব্ধির দৃষ্টি ও জীবন নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন—

(ক) "আদ্যাশক্তিই এই জীব-জগৎ, এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। অনুলোম, বিলোম"।

(খ) "যখন খোল ছেড়ে মাখন পেল তখন বোধ হয়—'খোলেরই মাখন, মাখনেরই খোল'। তখনই বোধ হয়—তিনিই (ঈশ্বরই) সব হয়েছেন"।

(গ) "যিনি ব্রহ্ম, তিনিই আদ্যাশক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি—পুরুষ বলি, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—এইসব করেন, তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। আনন্দময় আর আনন্দময়ী"।

(ঘ) "যার পুরুষ-জ্ঞান আছে, তার মেয়ে (প্রকৃতি)-জ্ঞানও আছে (কেশবের হাস্য)"।

(ঙ) "যার অন্ধকার-জ্ঞান আছে, তার আলো-জ্ঞানও আছে। যার রাত (রাত্রি)-জ্ঞান আছে, তার দিন-জ্ঞানও আছে। যার সুখ-জ্ঞান আছে, তার দুঃখ-জ্ঞানও আছে"।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ, ১১১-১১২

অবশ্য এ'গুলি অনেকটা আপেক্ষিক-জ্ঞান—একটা থাকলে আর-একটা থাকে—যেমন সূর্য থাকলে দিন থাকে। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, একটি থাকলে আর একটি থাকে এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন রূপ ও পরিবর্তন-অনুসারে একের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম হওয়াও স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানীর ও বিচারীর দৃষ্টিতে ঐ সকল রূপ ও নাম মিথ্যা, রূপী ও নামীই কেবল সত্য, কেননা রূপী ও নামী ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র, আসলে একেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম—বিবর্তন।

॥ অখণ্ড নিত্য-বস্তুর বিবর্তন কেন হয় ॥

অখণ্ডের এই বিবর্তন বা পরিবর্তন কিজন্য হয়? অদ্বৈতবেদান্ত বলে যে, মায়ার বা অবিদ্যার জন্য বিবর্তন হয়। মায়া বা অবিদ্যার জন্য আমরা সত্যকে মিথ্যা বলি ও মিথ্যাকে সত্য বলে দেখি। অনেকে মায়া ও অবিদ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রাতিভাসিক বা প্রাতীতিক-সত্তা বলেন, কিন্তু পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, আচার্য শঙ্কর ও বিবরণ-সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবেদান্তীরা মায়া ও অবিদ্যার মধ্যে কোন ভেদ বা পার্থক্য স্বীকার করেন না, ভেদ স্বীকার করেন বাচস্পতিমিশ্রের অনুসারীরা বা ভামতীসম্প্রদায়। তবে একথাও পূর্বে আলোচনা করেছি যে, ব্রহ্ম-ব্যতীত মায়ার সত্তা বা অস্তিত্ব নাই—যেমন স্রষ্টা ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) ব্যতীত সৃষ্টির সত্তা-সার্থকতা নাই। সেজন্য আচার্য শঙ্কর বলেছেন যে, চরমসত্তা নির্গুণ-ব্রহ্ম বা নিগুণ-সগুণের অতীত তুরীয়-ব্রহ্ম সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ-সত্তা ও স্বাধীন হলেও মায়ার আধার বা অধিকরণ শুদ্ধব্রহ্মই স্বীকৃত। মায়া ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠ বা অবস্থিত, এজন্য বিশ্বপ্রপঞ্চ বা জগৎ ব্রহ্ম থেকে অতিরিক্ত বস্তু বা পদার্থ নয়। শঙ্কর 'প্রতিষেধাচ্চ' (৩।২।৩০) ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে সেকথাই বলেছেন—'অথাত আদেশো নেতি নেতি', 'তদেতদ্ব্রহ্ম পূর্বমনপরমং তরমবাহ্যম্' ইতি চ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত-প্রপঞ্চনিরাকরণাদ্ব্রহ্মমাত্রপরিশেষাচ্চ এষ এব সিদ্ধান্ত ইতি গম্যতে"। তাছাড়া মায়ার বা মায়াশক্তির আশ্রয় ঈশ্বর বা পরমেশ্বর, কিন্তু তিনি মায়ার অধীশ্বর অর্থাৎ মায়া তাঁর অধীনে, একমাত্র মায়ার একান্ত অধীন হিরণ্যগর্ভ-ব্রহ্ম বা ব্রহ্মা-প্রজাপতি। আচার্য শঙ্কর মায়ার প্রতিভাসস্বরূপে অধ্যাস স্বীকার করেন এবং বলেছেন জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মেই অধ্যস্ত। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর অবভাসকে অধ্যাস বলে—'অস্তাস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'।

॥ অদ্বৈতসিদ্ধিমতে মিথ্যাত্বের পঞ্চলক্ষণ ॥

মায়া মিথ্যা অর্থে সদসদ্‌ভিন্না অনির্বচনীয়া, এজন্য মায়া ব্রহ্মকে আবৃত করে ও বিক্ষেপশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকে জগৎ বলে ভুল দেখায়। সেজন্য মায়ার আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি স্বীকৃত। মায়া আবরণশক্তির দ্বারা সত্যবস্তুর স্বরূপকে আবৃত করে বিক্ষেপশক্তির দ্বারা মিথ্যাকে সত্য বলে প্রতীতি করায়। আচার্য মধুসূদন সরস্বতী তাঁর বিখ্যাত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থে মিথ্যার (মিথ্যাত্বের) পাঁচটি লক্ষণের কথা বলেছেন। সে' পাঁচটি লক্ষণ হ'ল—

(১) প্রথম—**'সদসত্ত্বানধিকরণত্বরূপম্ অনির্বাচ্যত্বং মিথ্যাত্বম্'**। অর্থাৎ 'সত্যাত্যন্তাভাবাসত্যাত্যন্তাভাবরূপং ধর্মত্বয়ং মিথ্যাত্বম্', অথবা 'সৎপ্রতিযোগিকাসৎপ্রতিযোগিকভেদদ্বয়ং মিথ্যাত্বম্ অথবা সত্যাত্যন্তাভাবত্বে সতি অসত্যাত্যন্তাভাবরূপং বিশিষ্টং মিথ্যাত্বম্'।

মোটকথা সত্তা বা অস্তিত্বের অত্যন্তাভাব ও অসত্তা বা অনস্তিত্বের অত্যন্তাভাব মিথ্যা। মায়াসত্তার একান্ত বা অত্যন্তাভাব, কেননা সৎ যা—তা শাশ্বত ও নিত্য, কিন্তু মায়া নিত্য ও শাশ্বত নয় বলে মায়াসত্তার অত্যন্ত অভাব, যেহেতু যা অসৎ, তা কোন কালেই থাকে না, সুতরাং মিথ্যা অনিত্য।

(২) দ্বিতীয়—'**প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্**'। অর্থাৎ প্রতিপন্ন উপাধির ত্রিনকালে (বর্তমানে, অতীতে ও ভবিষ্যতে) নিষেধ বা সত্তা থাকে না। রজ্জুতে সর্প অতীতে ছিল না, বর্তমানে নাই, ভবিষ্যতেও থাকে না, অথচ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, কেননা রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রমে দেখা যায়, ভ্রান্ত লোক তাই মিথ্যাসর্প দেখেও ভয় পায়। সেরূপ নির্গুণ-ব্রহ্মে মায়া ত্রিনকালেই থাকে না, অথচ মায়ার কারণ বা মায়াসৃষ্টিরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ থাকে ও দেখা যায়, সুতরাং মায়া মিথ্যা।

(৩) তৃতীয়—'**জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্**' অথবা '**জ্ঞানব্যাপ্যধর্মেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্**'। অর্থাৎ মায়া জ্ঞানকে আবৃত করে। জ্ঞানাভাব বা অজ্ঞানের জন্যই রজ্জুতে সর্প দেখা যায়, অথচ রজ্জুই সর্পের বাধক, কেননা রজ্জুর জ্ঞান হলেই সর্পরূপ ভ্রমজ্ঞান চলে যায় (দূর হয়)। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞান হলেই মায়া মিথ্যা বলে জ্ঞান হয় বলতে ব্রহ্মজ্ঞান মায়া বা ভ্রমজ্ঞানের বাধক, তাই 'সাক্ষাৎকারত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বং মিথ্যাত্বম্'।

(৪) চতুর্থ—'**স্বাশ্রয়নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বং মিথ্যাত্বম্**'। অর্থাৎ ভ্রমের আধারে বা অধিষ্ঠানে ভ্রমের অত্যন্তাভাব মিথ্যা। রজ্জু সর্পভ্রমের আধার বা অধিষ্ঠান, কিন্তু রজ্জুতে সর্পের সর্বদাই অত্যন্তাভাব, সুতরাং রজ্জুতে সর্পের অভাব অর্থে মিথ্যা। তেমনি ঈশ্বর মায়ার আশ্রয়, কিন্তু ঈশ্বরে স্বরূপত মায়া নাই, মায়ার অত্যন্তাভাব, তাই ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে মায়ারূপ ভ্রম দূর হয় এবং মায়া মিথ্যা বা অনিত্য বোধ হয়।

(৫) পঞ্চম—'**সদ্‌বিবিক্তত্বং মিথ্যাত্বম্**'। অর্থাৎ সত্যের সম্যক্‌বিচার ও জ্ঞানই মিথ্যাবস্তু না-থাকা প্রতিপন্ন করে—অর্থে মিথ্যাবস্তু যে কি তা সত্যজ্ঞানে বোঝা যায়। যেমন রজ্জুর যখন সম্যক্‌-উপলব্ধি বা জ্ঞান হয়, তখনই সর্প মিথ্যা বলে জ্ঞান হয়। রজ্জুর জ্ঞান ও সর্পের তিরোধান (না থাকা) এককথা। তেমনি ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান বা ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞান হলেই মায়াভ্রম দূর হয়, মায়া অসৎ বলে তখন বোঝা যায়। আচার্য উদয়ন বলেন: 'ব্রহ্মপ্রমাতিরিক্তাবাধাত্বে সতি সত্ত্বেন প্রতীত্যর্হত্বং চিদভিন্ন-প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধ-প্রতিযোগি ন বা, পারমার্থিকত্বাকারেণ উক্তং নিষেধপ্রতিযোগি ন বা'। আচার্য উদয়নের এই বাক্য থেকেই প্রমাণ হয় যে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তই সত্য, অন্য সিদ্ধান্ত মিথ্যা।

'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থকার অদ্বৈতবাদী সুরেশ্বরাচার্য একথাই বলেছেন: 'আত্মস্বরূপতাই অবিদ্যানিবৃত্তি এবং এই অবিদ্যানিবৃত্তি অনির্বাচ্য'। আচার্য আনন্দবোধ একটু ভিন্নভাবে বলেছেন: 'আত্মাতিরিক্ত অবিদ্যানিবৃত্তি', কেননা অবিদ্যা বা অজ্ঞান সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়া। তবে আচার্য আনন্দবোধ অনির্বচনীয়া বা অনির্বাচ্যও স্বীকার করেন নি, কেননা অনির্বাচ্য সাদি বা আদিযুক্ত এবং অজ্ঞান তার উপাদান, মুক্তিতে এই উপাদানরূপ অজ্ঞান থাকে। তবে জ্ঞানে (ব্রহ্মজ্ঞানে) এই অজ্ঞানের লয় বা নিবৃত্তি হয়। সুতরাং দেখা যায় যে, 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-কার সুরেশ্বরাচার্যের আত্মস্বরূপতাই মুক্তি, আর আনন্দবোধের আত্মাতিরিক্ততাই অজ্ঞান ও এই অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে মুক্তি হয়—দু'জনের স্বীকৃতি প্রায় একই প্রকারের।

উপরে মিথ্যার বা মিথ্যাত্বের পাঁচটি লক্ষণের উল্লেখ করেছি আচার্য মধুসূদন সরস্বতী-রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থের অনুযায়ী সেকথা বলেছি। 'চিৎসুখী'-কার চিৎসুখাচার্য মিথ্যাত্বসম্পর্কে দশটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন এবং মনে হয় মধুসূদন সরস্বতী ঐ দশটিকে সীমিত করেই পাঁচটি লক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে পদ্মপাদাচার্য 'পঞ্চপাদিকা'-গ্রন্থে 'সদসদ্‌বিলক্ষণত্বং মিথ্যাত্বম্' —এই একটি লক্ষণেই মিথ্যাত্বের সুষ্ঠু-পরিচয় দিয়েছেন—যেমন স্বামী বিবেকানন্দ স্বল্পকথায় সুন্দরভাবে অজ্ঞানের পরিচয় দিয়ে বলেছেন 'statement of fact'. বিবরণকার প্রকাশাত্ম-যতি মিথ্যাত্বের লক্ষণসম্বন্ধে বলেছেন : 'প্রতিপন্নোপাধৌ ত্রৈকালিকনিষেধপ্রতিযোগিত্বম্' এবং 'জ্ঞান-নিবর্তত্বম্'। মোটকথা অবিদ্যার বা অজ্ঞানের তিরোধানে বা অপসারণে জ্ঞানের প্রকাশ হয়—যেমন অন্ধকার দূর হ'লে আলোকের প্রকাশ হয়। আচার্য চিৎসুখের মিথ্যাত্বের লক্ষণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি, তবে চিৎসুখাচার্য বলেন যে, ব্রহ্মরূপ আশ্রয়ে বা অধিষ্ঠানে বিশ্বপ্রপঞ্চরূপ অজ্ঞানের অভাব স্বতঃসিদ্ধ, কেননা জ্ঞানের আশ্রয়ে অন্ধকার থাকে না। আচার্য প্রকাশাত্ম-যতির অভিমতও তাই। তবে অধিকাংশ অদ্বৈতবেদান্তের আচার্যদের অভিমত 'মিথ্যা সদসদ্‌বিলক্ষণ' (সৎ নয় এবং অসৎও নয়) ব'লে অনির্বচনীয় এবং এই অনির্বচনীয় বা অনির্বাচ্য-বাদের আলোচনা পূর্বে করেছি।

॥ মিথ্যা-শব্দের অর্থ ॥

'মিথ্যা'-শব্দে সাধারণভাবে বুঝি কি? মিথ্যা বলতে বোঝায় সত্তাহীন অসৎ। কিন্তু বন্ধ্যাপুত্রতুল্য বা আকাশকুসুমের মতো অসৎ বলতে শূন্য নয়। তাহলে আচার্য শঙ্কর যে বলেছেন : 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'—এর প্রকৃত অর্থ কি? ব্রহ্ম সত্য অর্থে ত্রৈকালিক-সত্তাযুক্ত (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ—তিনকালেই সত্তা বর্তমান থাকে বলে) সত্য, আর জগৎ ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা তিনকালে থাকে না বলে মিথ্যা? সুতরাং ব্রহ্ম সত্যরূপে থাকে, আর জগৎ ও অজ্ঞান মিথ্যারূপে বা অসদ্‌রূপে থাকে—এই কি এর অর্থ হবে? ব্রহ্ম এবং জগৎ ও অজ্ঞান দু'টি পদার্থ, একটি সত্য ও আর একটি মিথ্যা বা অসৎ। কিন্তু 'ব্রহ্ম সত্য ও জগন্মিথ্যা'-কথার এটি যথার্থ অর্থ নয়। জগৎ ও অজ্ঞান বা অবিদ্যা অথবা মায়া মিথ্যাজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান নয়, কেননা 'সর্বব্রহ্মময়ং জগৎ', 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' কথাগুলি থেকে একথাই বোঝায় যে, জগৎ, অজ্ঞান, অবিদ্যা, মায়া এ'সমস্ত স্বরূপে ব্রহ্মচৈতন্যই—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। ব্রহ্মসত্তা ছাড়া আর কোন-কিছুরই যথার্থসত্তা নাই, বা কোন-কিছুই সত্য নয়, সুতরাং জগৎ ও অজ্ঞান বা মায়াকে আমরা ব্রহ্মচৈতন্য থেকে পৃথক ক'রে ভাবি ও দেখি—এটিই অযথার্থ, অসৎ বা মিথ্যা। মিথ্যার অর্থও তাই। যাকে যা বলে দেখা উচিত, আমরা তাকে তাই বলে দেখি না বলেই মিথ্যা—'অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'। একথা বলেছেন আচার্য শঙ্কর। জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চকে, জীবকে, অজ্ঞান বা মায়াকে, অজ্ঞান বা ভ্রমকে ব্রহ্মসত্তা বা ব্রহ্মবস্তু থেকে ভিন্ন বলি ও দেখি এবং এই বলা ও দেখাই মিথ্যা, অর্থাৎ অযথার্থ, ঠিক নয়। সুতরাং 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা'-কথার অর্থ ব্রহ্ম চিরদিনই সত্য ও আছেই, কিন্তু যখনই আমরা ভ্রমে জীব, জগৎ, মায়া প্রভৃতিকে ব্রহ্ম থেকে

পৃথক বা ভিন্ন বলে ভাবি ও দেখি, তখনই সেই চিন্তা ও দেখা মিথ্যা অর্থে যথার্থ নয়, অর্থাৎ সত্য নয়। সেজন্য আচার্য শঙ্কর মিথ্যাজ্ঞানকে বলেছেন মিথ্যাপ্রতীতি বা মিথ্যাপ্রত্যয়—'মিথ্যাপ্রত্যয়ত্বাৎ'। মিথ্যাপ্রত্যয়ে সৃষ্টি হয় ভুলবুদ্ধি ভুল দেখার জন্য। ভুলবুদ্ধির জন্য জীব, জগৎ, মায়া প্রভৃতিকে আমরা মিথ্যা বা সত্তাহীন বলি, আসলে ব্রহ্মসত্তাই সত্য—'সর্বব্রহ্মময়ং জগৎ'।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এই দৃষ্টিতেই ব্রহ্ম ও মায়াকে এক ও অভিন্ন বলেছেন। ব্রহ্ম ও মায়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভেদবুদ্ধিতে ও অভিন্নদৃষ্টিতে একটি টাকার এ'পীঠ এবং ও'পীঠ। এখানে শুধুই বুদ্ধি দিয়ে বিচারের কথা নয়, এখানে বুদ্ধি ও বুদ্ধির খেলারূপ বিচার শুরু হয়। বুদ্ধি এখানে পর্যবসিত হয় চৈতন্যের সাগরে—যা সর্বব্যাপক ও সর্বত্রবিস্তৃত। এই ক্ষেত্র অনুভূতি বা উপলব্ধির ক্ষেত্র—যে অনুভূতি বা উপলব্ধিতে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়—উপলব্ধা-উপলব্ধি-উপলব্ধির বস্তু একাকার হয়। এ'প্রসঙ্গে অনেকে ব্রহ্মবৃত্তির কথা বলেন, কিন্তু বৃত্তি ও বস্তু এখানে এক ও অভিন্ন। যিনি এখানে সমাধিতে বা নিদিধ্যাসনে ব্রহ্মসত্তাকে বোধে বোধ করেন, একমাত্র তিনিই বোঝেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের উপলব্ধি এক বা একাকার।

সুতরাং একই দেশ-কালাতীত ও সর্বাতীত অথচ সর্বানুগত পরমসত্তার জন্য বিশ্ববৈচিত্র্যকে যেমন সত্তাবান বা আছে বলি, বিশ্ববৈচিত্র্যের পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা প্রমানযোগ্য নয়, তেমনি একই সর্বানুগত ব্যাপক বস্তুর প্রকাশে বিশ্ববৈচিত্র্যও প্রকাশিত হয় ব'লে বিশ্ববৈচিত্র্যের পৃথক ও স্বতন্ত্র সত্তা এবং প্রকাশও গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং একথাই স্বীকার করা সঙ্গত হবে যে, একই অখণ্ড প্রকাশমান নির্বিকার সত্তা খণ্ডরূপে বিশ্ববৈচিত্র্য বা জগৎরূপে প্রতীয়মান হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, নির্বিকার হয়ে বিকারী বস্তুরূপে প্রতিভাত বা প্রকাশমান হওয়া তখনই সম্ভব—যখন এমন কোন একটি কারণ থাকে যার সামর্থ্যে বা প্রভাবে ঐ নির্বিকার অখণ্ডস্বরূপ বিকারী ও খণ্ডরূপে প্রতিভাত ও প্রকাশমান হয়। অবশ্য আমাদের ব্যবহারিক জ্ঞানে এরূপ একটি কারণের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—যা ভ্রমজ্ঞান বা অজ্ঞান। প্রকৃতপক্ষে আমাদের অনুভবের বিষয় যে, যখন কোনও বস্তু আমাদের জ্ঞানে স্ব-স্বরূপে প্রতিভাত না হয়ে তার বিপরীতভাবে প্রতিভাত হয়, তখন তার প্রতীতির কারণও হয় অজ্ঞান ও অজ্ঞানজন্য ভ্রম বা ভ্রান্তি। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অল্প-অন্ধকারে রজ্জুকে ভ্রান্তদৃষ্টির জন্য সর্প বলে মনে করি। এখানে সর্পাদি প্রতিভাসরূপে কার্য এবং ঐ কার্যের আশ্রয় রজ্জুও প্রতীত হয়। ঐ রজ্জু পূর্বে যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটিভাবেই প্রতীত হয়, রূপের কোন পরিবর্তন হয় না। এখন বিচারের বিষয় যে, প্রতিভাসরূপ আশ্রয় (ভ্রম) ছাড়া রজ্জুসর্পের বিপরীত প্রতীতি বা জ্ঞান হওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে? প্রকৃতপক্ষে অনুভবও করি যে, যতক্ষণ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞান আমাদের মধ্যে থাকে, ততক্ষণই সর্পের প্রতিভাস বর্তমান থাকে, আর যখন ঐ বিষয়ে অজ্ঞান থাকে না, তখন সর্পের আর প্রতিভাস বা মিথ্যাসর্প থাকে না। সুতরাং যখন অজ্ঞান বা ভ্রম থেকে যে বস্তুর জন্ম বা সৃষ্টি হয় ও অজ্ঞানের অপসারণে (নাশে) যার সত্তা থাকে না, তখন অজ্ঞানই ঐ ভ্রান্তি বা ভ্রমজ্ঞানের উপাদানকারণ বলা যুক্তিসঙ্গত হবে। উদাহরণ যেমন মৃত্তিকানির্মিত ঘট। এখানে ঘটের উপাদানকারণ

মৃত্তিকা বা মাটি, কেননা ঘটের উৎপত্তি বা সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ বা প্রযোজক মৃত্তিকা। ঠিক তেমনই রজ্জু-সর্পস্থলে অজ্ঞানই কারণ, অজ্ঞান-ছাড়া আর অন্য কারণ নাই। অজ্ঞানই রজ্জুর স্বরূপ আবৃত ক'রে রজ্জুতে সর্পের প্রতিভাস সৃষ্টি করে এবং সেজন্য অজ্ঞানই ঐ প্রতিভাস বা ভ্রমজ্ঞানের উপাদানকারণ।

॥ মায়াই সত্যবস্তুর আবরণের কারণ ॥

এভাবে বুঝি যে, অজ্ঞান বা মায়াই কোন পদার্থের স্বরূপকে আবৃত করে, আর সেখানে সেই আশ্রয়ে অন্যথাপ্রতিভাসেরও কারণ থাকে। প্রকৃতস্থলেও অখণ্ডতত্ত্ব অখণ্ডরূপে প্রতিভাত বা প্রকাশিত না হয়ে খণ্ডরূপে প্রতীত হওয়ায় ঐ অন্যথাপ্রতীতির উপাদানকারণরূপে এক মূল-অজ্ঞান স্বীকার করা-ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। ঠিক সে'রকমই অশেষ-বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বিচিত্র ভেদযুক্ত জড়-চেতনাত্মক এই বিশ্ব বা জগৎ যখন রজ্জুসর্পের মতোই এক, অনন্ত, অখণ্ড ও দেশকালাতীত স্বপ্রকাশ মূলতত্ত্বের অন্যথাপ্রতীতি হয় এবং অন্যথাপ্রতীতি-ছাড়া এর আর স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, তখন রজ্জু-সর্পের সৃষ্টি ও স্থিতির উপাদানকারণ ব্যষ্টি-অজ্ঞানের মতো জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির উপাদানকারণরূপেও একটি মূল-অজ্ঞানের সত্তা অবশ্য স্বীকার করা হয়, আর সেই মূল-অজ্ঞান বা মায়াই ঐ মূলতত্ত্ব-ব্রহ্মের স্বরূপ আবৃত ক'রে সেই ব্রহ্মাধিষ্ঠানে জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্যের জ্ঞান সৃষ্টি করে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে অধিষ্ঠান ক'রে সেই ব্রহ্মাধিষ্ঠানে বিশ্ববৈচিত্র্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং মূল-অজ্ঞানকেই জগতের উপাদানকারণ বলা সঙ্গত। এই মূল-অজ্ঞানই মায়া, অর্থাৎ যে অদ্বৈতবাদীরা অজ্ঞান ও মায়াকে পরস্পর ভিন্ন বলেন, সেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান জীবাশ্রিত ও মায়া ঈশ্বরাশ্রিত অর্থাৎ সগুণব্রহ্মাশ্রিত বলেন, তাঁদের অভিমত ঠিক নয়।

॥ মায়ার সার্থকতা কি ॥

এক্ষণে মায়া বা মায়াশক্তির যথার্থ কোন সার্থকতা আছে কি-না এ'নিয়েও প্রশ্ন হ'তে পারে, সেজন্য অদ্বৈতবাদীরা জগতের বা বিশ্ববৈচিত্র্যসৃষ্টির মূলে একটি কার্য্যাত্মক শক্তি স্বীকার করেন—যে শক্তি অনির্বচনীয়া মায়াশক্তি, কেননা ঐ অনির্বচনীয়া মায়াশক্তিই ব্রহ্মাশ্রিত (সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরের আশ্রিত) হয়ে বিশ্বপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করে এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ মায়া বা মায়াশক্তি থেকে সৃষ্ট বলে বিশ্বপ্রপঞ্চের শাশ্বত ব্রহ্মসত্তা থেকে ন্যূনসত্তাসম্পন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, কিন্তু জগৎ মিথ্যা অর্থে অনির্বচনীয়। এক্ষণে বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলতত্ত্ব বলে গণ্য বা গ্রহণ করি আমরা সর্বাতীত পরিশুদ্ধ নির্গুণ-ব্রহ্মকে, সুতরাং মায়াশক্তি যদি মূলতত্ত্ব-ব্রহ্মাশ্রিত হয়ে (কেননা ব্রহ্মসত্তাশ্রিত বিশ্বসত্তার কোন মূল্য নাই) বিশ্ব সৃষ্টি করে তাহলে সেখানে নানাপ্রকার অসঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে। যেমন প্রশ্ন হতে পারে যে, নির্গুণ-ব্রহ্ম তো সর্ববিকারশূন্য অবিকারী শাশ্বতসত্তা, আর মায়া বিকারীসত্তা, সুতরাং ব্রহ্মাশ্রিত হয়ে মায়া যদি বিশ্বপ্রপঞ্চ বা জগৎ সৃষ্টি করে—একথা সঙ্গত হয়, তাহলে কি একথাই ঠিক বা যুক্তিসঙ্গত হবে যে, বিকারযুক্তা বা বিক্রিয়মানা শক্তি বা মায়াশক্তি নির্বিকার-মূলতত্ত্ব-ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নভাবে একত্রে থাকে? কিন্তু একথাই বা সঙ্গত

হতে পারে কিভাবে? কেননা বিকারী মায়া অবিকারী ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকলে অবিকারী ব্রহ্ম কিভাবেই বা তাঁর অবিকারীস্বভাব বা অবিকারীত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হবেন? সুতরাং কার্যকারিণী মায়াশক্তি কখনই মূলতত্ত্ব-ব্রহ্মের আশ্রয় হতে পারে না, অথচ ব্রহ্মের আশ্রয়ে মায়াশক্তি থাকে—একথা স্বীকার না করলে বিশ্বসৃষ্টির কোন সঙ্গত কারণ খুঁজেও পাওয়া যায় না, বা কার্যজগতের কোন কারণ নির্দেশ করাও সম্ভবপর হয় না, সুতরাং আশ্রয় ও আশ্রয়ী-সম্বন্ধেযুক্ত ব্রহ্ম কার্যাত্মকী শক্তি মায়ার মধ্যে একটি সম্বন্ধ বা সম্পর্ক অবশ্যই স্থাপন (স্বীকার) করতে হবে। কেননা কথা এই যে, ব্রহ্মই যখন একমাত্র মূল ও পরম-তত্ত্ব এবং সেই ব্রহ্ম যদি স্বরূপত শক্তিযুক্ত হতে পারেন না, অথচ শক্তি বা মায়াশক্তি স্বীকার না করলে কার্যজগতের একটি সঙ্গতিপূর্ণ কারণও নির্দেশ করা সম্ভব নয়, তখন শক্তিকে বা মায়াকে ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলেই স্বীকার করতে হবে। অধ্যস্ত বলতে যা যথার্থ নয়—সেই অযথার্থ প্রতিভাস। সুতরাং ব্রহ্মে বা ব্রহ্মতত্ত্বে অধ্যস্ত শক্তি বা মায়া স্বীকার করা-ছাড়া গত্যন্তর নাই। আবার একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ব্রহ্মের সত্তা-ছাড়া শক্তির বা মায়ার পৃথক কোন সত্তা নাই। আবার শক্তির বা মায়ার সত্তা ছাড়া কার্যরূপ জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্যেরও কোন সত্তা ও সার্থকতা নাই, সুতরাং ব্রহ্মের সাধু শাস্ত্রিনাথ বলেন যে, **স্বরূপতঃ জগৎ বা বিশ্ববৈচিত্র্য তন্মূলীভূতা শক্তি বা মায়া থেকে অভিন্ন এবং শক্তি বা মায়াও ব্রহ্ম বা ব্রহ্মসত্তা থেকে অভিন্ন,** অর্থাৎ মায়া ও মায়িন ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) এক ও অভেদ একথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন একটু ভিন্নভাবে।

●

॥ সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(দুই)

চৈতন্যতরুর কুসুমিত শাখা শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরপ্রেমদীপ্ত তাঁর জীবন। সংকীর্তনের ভাবতরঙ্গে তাঁর দেহসৌন্দর্য অপরূপ শ্রী ধারণ করত। তাঁর নয়নে দরবিগলিত অশ্রুরাশি, শরীরে শিহরণের রোমাঞ্চ, চরণে লীলায়িত নৃত্যভঙ্গী, মুখে উচ্চারিত কৃষ্ণনামের করুণধ্বনি। বিষয়তৃষ্ণাবিমুক্ত তাঁর মন শ্রীচৈতন্যের ন্যায় দশাত্রয়ের মধ্যে সঞ্চরণশীল। সংকীর্তনে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়হারী কয়েকটি চিত্র আমরা পাঠককে উপহার দেব।

ফুলুই শ্যামবাজার। সেখানে চব্বিশপ্রহরী সংকীর্তন দেখতে যান শ্রীরামকৃষ্ণ। কীর্তনের প্রারম্ভেই তাঁর বাহ্যচৈতন্য মুহুর্মুহু লুপ্ত হতে থাকে। কখনও বা ভাবের ঘোরে অঙ্গভঙ্গী করে নৃত্য করতে থাকেন। "যেন সর্বাঙ্গে অস্থিহীন—তাঁহার দেহলতা যেন ভাবরূপ-প্রেমানন্দ-মলয়ে তরঙ্গায়িত। আবার কখনও বা মহাভাবে সমাধিস্থ, নিস্পন্দ, স্থিরনেত্রে দরদরধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে।···কর্ণে প্রণবোচ্চারণ···আবার ক্ষণেক পরে মহানন্দে উদ্দাম নৃত্য ও মধুর

কণ্ঠে গাহিতেছেন।···ক্রমেই আনন্দের প্রবাহ দিগ্‌দিগন্ত ছাইল, সহস্র সহস্র লোক মিলিয়া উদ্দাম নৃত্য ও কীর্তন করিতে লাগিল। ভাবে কেহ গাহিতেছে, কেহ নৃত্য করিতেছে, কেহ বা মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। দূরাৎসমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিবার মানসে কেহ কুটীরের চালের উপর হইতে কেহ বা বৃক্ষের শাখা অবলম্বনপূর্বক তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতেছেন না। সকলেই চিত্রার্পিতের ন্যায় একদৃষ্টে সেই আনন্দমূর্তি অবলোকন করিতেছেন।···গ্রামের মহিলাগণ পর্যন্ত কেহ বা শঙ্খ লইয়া মঙ্গলধ্বনি করিতেছেন, কেহ বা উলুধ্বনি করিতেছেন, আবার কেহ বা তাঁহার দর্শনমানসে লজ্জা ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখায় উঠিতেছেন। দেখিতে দেখিতে দিনমণি অস্ত গেলেন। অমনি পুনরায় শঙ্খঘণ্টার রবে আনন্দের তরঙ্গ আরও হুহুঙ্কারের সহিত মাতিয়া উঠিল। কীর্তনের মধ্যস্থিত সহস্র সহস্র লোক সকলেই আত্মহারা, প্রেমের বন্যায় ভাসমান। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, তথাপি কাহারও জ্ঞান নাই।"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের অসাধারণ নান্দনিক প্রতিভা ও সদা-ঈশপ্রাণতার মধুর সমন্বয়ে উদ্ভূত হয়েছে এক অনাস্বাদিতপূর্ব রসলোক, যার উৎসারিত আনন্দোচ্ছ্বাস গণমানসকে করেছে উজ্জীবিত ও ভগবদভিমুখীন। স্থানীয় কীর্তনশিল্পিগণ রামকৃষ্ণচন্দ্রকে বেষ্টন করে চন্দ্রমণ্ডলিকার ন্যায় জনসাধারণের কাছে নূতন আকর্ষণীয় বস্তুরূপে প্রতিভাত হল। এই মহাসংকীর্তনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ পরে মন্তব্য করেছিলেন : "আকর্ষণ কাকে বলে, এখানেই বুঝলাম। হরিলীলার যোগমায়ার সাহায্যে আকর্ষণ হয়, যেন তেল্‌কি লেগে যায়।" (ক ৪/২০/২)

সংকীর্তনের আরেকটি দৃশ্যপট। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিন। আনন্দকন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে পঞ্চবটীতলায় সমবেত হয়েছে জনা-ষাটেক ভক্তিরসপিয়াসী মানুষ। তাদের অনেকেই নান্দনিক গুণসম্পন্ন। সংকীর্তনের আসর জমে উঠেছে। মধ্যস্থলে হৃদয়নন্দন শ্রীরামকৃষ্ণ অপূর্ব ভাবাবেগে নৃত্যরত। "এমন অদ্ভুত নৃত্য কেহ কখনও দর্শন করেন নাই। প্রেমের লহরী চলিয়াছিল, সকলেই আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গের সময় যেমন উল্লিখিত আছে—সঙ্কীর্তনে প্রেমের প্রবাহ চলিত, ভক্তগণ সেই শোনা কথা অদ্য প্রত্যক্ষ করিলেন—ভক্তেরা মনে করিলেন, মরি মরি কি শুভদিন আজ পোহাইয়াছিল। ভক্তবৎসল হরি, আজ কি পাপীদের উদ্ধারের জন্য রামকৃষ্ণ পরমহংসের মধ্য দিয়া প্রেম ঢালিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাল করিয়া দিলেন।···এই গীতটি সকলে উন্মত্ততার সহিত গান করিয়াছিলেন—

সুরধুনী তীরে হরি বলে কে রে, / বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে— / ও তা নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে, / নিতাই নৈলে প্রাণ জুড়াবে কিসে রে।

পরে 'এই আমাদের প্রেমদাতা' এই ধুয়া ধরিয়া অর্ধঘণ্টা ঠাকুরকে প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। ঠাকুর তখন একেবারে স্থির সমাধিতে ছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেছিলেন।···এমন সময়ে কয়েকটি ইংরাজ স্ত্রী ও পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উহাদের মধ্যে একজন নিকটে আসিয়া কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এ ব্যক্তির কি মরিবার পূর্ব লক্ষণ? সে ব্যক্তি

৩। গুরুদাস বর্মন : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরিত, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭৪-৭৫।

বলিল, ঈশ্বরের নামে ভাব হইয়াছে।"[৫] সংকীর্তনের আবেগ, অনুরাগ ও আনন্দ ভগবদ্ভাবে সমৃদ্ধ করে গণচিত্তকে।

সংকীর্তনের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ মহাসংকীর্তন পাণিহাটির উৎসব-প্রাঙ্গণে। তিলক-মালাধারী এক গোস্বামীর লোক-দেখানো আচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে উদ্দীপ্ত করে ভগবদ্ভাব। মোহন-মূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ চক্ষের নিমেষে একলাফে অবতীর্ণ হন কীর্তনের আসরের মধ্যস্থলে। ভাবের গভীরতায় বাহ্যসংজ্ঞা লুপ্তপ্রায়। কখনও অর্ধবাহ্যদশায় সিংহবিক্রমে নৃত্য করেন, কখনও অন্তর্দশায় স্থির চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থান করেন। "ভাবাবেগে নৃত্য করিতে করিতে যখন তিনি দ্রুতপদে তালে তালে কখনও অগ্রসর এবং কখনও পশ্চাতে পিছাইয়া আসিতে লাগিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল—তিনি যেন সুখময় সাগরে মীনের ন্যায় মহানন্দে সন্তরণ ও ছুটাছুটি করিতেছেন। প্রতি অঙ্গের গতি ও চালনাতে ঐ ভাব পরিস্ফুট হইয়া তাহাতে যে অদৃষ্টপূর্ব কোমলতা ও মাধুর্য-মিশ্রিত উদ্দাম উল্লাসময় শক্তির প্রকাশ উপস্থিত করিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব।" উপস্থিত শরৎচন্দ্র (পরে স্বামী সারদানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণের তাণ্ডবনৃত্যের মধ্যে রুদ্রমধুর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। প্রবল ভাবাবেগে রামকৃষ্ণবপুর পরিবর্তনাদি তাঁকে বিস্মিত করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের "ভাবপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডল অপূর্ব জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া চতুষ্পার্শ্ব আলোকিত করিয়াছিল।"[৬] হরিনামের হাটবাজারে অকাতরে প্রেম বিতরণ করে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান শ্রীরামকৃষ্ণ। প্রত্যক্ষদর্শী রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন, "আমরা অনেক সংকীর্তন ও প্রেমিক ভক্ত দেখিয়াছি, অনেক জ্ঞানী সাধকও দেখিয়াছি, অনেক সুপণ্ডিত ও সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ গায়ক দেখিয়াছি, অনেক লয়-মান-সংযুক্ত নৃত্যও দেখিয়াছি, কিন্তু পরমহংসদেবের নৃত্য ও সংকীর্তনের ভাব এক চৈতন্যদেব ব্যতীত আর কাহারও সহিত তুলনা হইতে পারে না।"[৭]

উপর্যুক্ত পরিবেশে নূতন ব্রহ্মজ্ঞানীর দল অনুপস্থিত বা স্বল্প উপস্থিত। কিন্তু প্রগতিশীল ব্রাহ্মদের উপস্থিতিতে ভগবদ্ভাবানুরঞ্জিত শ্রীরামকৃষ্ণের হরিনামের শ্রবণ-কীর্তন-স্মরণ ও অর্চনা-বন্দনা-আত্মনিবেদনাদি[৮] সমভাবে বা অধিকতর প্রবলবেগে অনুষ্ঠিত হত। ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ সংকীর্তনসুধা অকাতরে বিতরণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। "বেলঘরিয়ার তপোবন। কেশবপন্থী তাপসগণের সাধনকানন। পঁচিশ-ত্রিশ জন ব্রাহ্মভক্তের সমাবেশে শ্রীরামকৃষ্ণ সমুপস্থিত। তাঁর উপস্থিতিতে ভগবদানন্দের হিল্লোল প্রবাহিত হল। ব্রাহ্মপত্রিকা 'ধর্মতত্ত্ব' লিখেছে : "শ্রীমদ্ভাগবতে প্রেমভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে, 'ক্বচিদ্রুদত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্‌হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্য লৌকিকাঃ /

৫। 'তত্ত্বমঞ্জরী', ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ১১-১৪।

৬। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ৭।পৃঃ ২৭২-৭৯।

৭। রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, পৃঃ ৬৯।

৮। শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং / অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।

ভাগবত ৭।৫।২৩।

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।' অর্থাৎ ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখনও আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নামগান করেন, কখন তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জন করেন। পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এইসকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বর দর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথা বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড়পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, মুরামন্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন।"[৯] এই 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকা শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে লিখেছে, "তাঁহাতে (শ্রীরামকৃষ্ণে) যোগভক্তির আশ্চর্য সম্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের ন্যায় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে সুন্দর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনেক সময় ভাবে বিভোর হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগসমাধিতে একেবারে স্পন্দহীন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সমুদায় তাহাতে পূর্ণভাবে লক্ষিত হইয়াছে।"[১০]

আরেকটি মনোরম দৃশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণের শিশিরকণাসদৃশ স্নিগ্ধ প্রভাবে কেশবপন্থীগণ ঈশ্বরের মাতৃভাব গ্রহণ করেছেন। নববিধানের সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গভীর ভাবব্যঞ্জক মাতৃনামের সঙ্গীত রচনা করেন; ব্রাহ্মগণ মাতৃনামকীর্তনে মেতে ওঠেন। সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ত্রৈলোক্যনাথ মাতৃনাম গাইছেন। সঙ্গে ষোল করতাল বাজছে। "শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে কতবার সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছেন; স্পন্দহীন দেহ, স্থিরনেত্র, সহাস্যবদন, কোন প্রিয় ভক্তের স্কন্ধদেশে হাত দিয়া আছেন। আবার ভাবান্তে মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় নৃত্য। বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া গানের আখর দিতেছেন—

নাচ মা, ভক্তবৃন্দ বেড়ে বেড়ে; / আপনি নেচে নাচাও গো মা; / (আবার বলি) হৃদিপদ্মে একবার নাচ মা; নাচ গো ব্রহ্মময়ী সেই ভুবনমোহনরূপে।

"সে অপূর্ব দৃশ্য। মাতৃগতপ্রাণ, -প্রেমে মাতোয়ারা সেই স্বর্গীয় বালকের নৃত্য। ব্রাহ্মভক্তেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন; যেন লোহাকে চুম্বকে ধরিয়াছে। সকলে উন্মত্ত হইয়া ব্রহ্মনাম করিতেছেন; আবার ব্রহ্মের সেই মধুর নাম—মা নাম করিতেছেন। অনেকে বালকের মত 'মা, মা' বলিতে বলিতে কাঁদিতেছেন।"[১১]

●

৯। শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে), পৃঃ ১৮।

১০। শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে), প্রথম সংস্করণ, পৃঃ ৭৩

১১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ১।১২।৭।

॥ সারদাস্তোত্র ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দারপা

[স্বামী অভেদানন্দ-রচিত শ্রীসারদাস্তোত্রমের ছন্দানুগ-অনুবাদ]

পরমা প্রকৃতি অভয়া বরদা নরক্রপধর জনতাপ হরিতে
শরণাগত সেবক সন্তোষিণী প্রণমি মা তোমায় জগত-জননী ॥১

গুণহীন সুতের অপরাধ অযুত, কর দান কৃপা কর উদ্ধার মা
তরণী ভবসাগর পার করো প্রণমি মা তোমায় জগত-জননী ॥২

বিষয়-কুসুম, করি ত্যাগ তারে মনভৃঙ্গ পিয়ো ভবরোগহরা
পিয়ো মাতৃচরণকমলের সুধা প্রণমি মা তোমায় জগত-জননী ॥৩

কৃপা কর মহাদেবী প্রণত এ' সুতে তব
চরণে আশ্রয় দাও, নমি তোমা কৃপাময়ী ॥৪

লজ্জাপটাবৃতা নিত্যা সারদা জ্ঞানদায়িকা
পাপ থেকে রক্ষা কর নমি তোমা কৃপাময়ী ॥৫

রামকৃষ্ণগতপ্রাণ তাঁর নাম শুনে সুখী
তাঁরি ভাবে ভরা কায় প্রণমি মা মুহুর্মুহু ॥৬

পবিত্র চরিত যাঁর পবিত্র জীবনখানি
পবিত্রতা স্বরূপিণী সেই দেবীকে নমো নমঃ ॥৭

দেবী প্রসন্না প্রণতার্তিহন্ত্রী যোগীন্দ্র পূজ্যা মুক্তিধর্মপাত্রী
হৃদয়ে ভক্তি বিজ্ঞানদাত্রী দয়ারূপা প্রণমি মা নিত্যা ॥৮

স্নেহে বেঁধেছ অন্তর আমাদের অশেষ দোষ করো সংশোধন
অহেতুকী দয়ায় নিয়েছ যে কোলে অতি বিচিত্র তোমার এ লীলা ॥৯

যাচি বিনয়ে হও মা প্রসন্না কর নিত্য স্নেহে সন্তানে পূর্ণ
চিরদগ্ধ চিত্তে প্রেম একবিন্দু সিঞ্চন করি কর তারে শান্ত ॥১০

জননী সারদা আর জগদ্‌গুরু রামকৃষ্ণ
পাদপদ্মে শরণ লই, মুহুর্মুহু প্রণাম করি ॥১১

●

॥ সারদাপ্রণাম ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

[স্বামী অভেদানন্দ-রচিত স্তোত্রের প্রথম তিনটি শ্লোকের অনুসরণে]

দুর্গা ॥ পাদরা

পরমা প্রকৃতি অভয়া বরদা
মানবী তুমি মা মানবে তরিতে
শরণ মাগি' ও চরণ কমলে
প্রণমি চরণে জননী সারদা ॥

ও সুত দোষী মা বহুল দোষে যে
বিনাশো মোহ মা, বিকাশো মহিমা
আমার এ তরণী তরাও তারিণী
প্রণমি চরণে জননী সারদা ॥

রে মন-ভ্রমর, বিষয় কুসুমে
কি ফল মাতিয়া বিফল আশাতে
মজোরে মায়েরি চরণ সরোজে
প্রণমি চরণে জননী সারদা ।

●

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সুমেরীয় রাজ্যেও দেখি অপরূপ সংস্কৃতিকরণ। ২৬৫০ খৃঃ পূর্বাব্দে সেমিটিক রাজা সারগন্ এই রাজ্য অধিকার করলেও সুমেরীয়দের সভ্যতা ছিল উন্নত। ফলে সেমিটিক লোকেরা সুমেরীয়দের কাছ থেকে কিউনিফর্ম লিপি, শিল্পকৌশল, কারিগরী, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখতে লাগলো। এমন-কি রাজকার্যেও সেমেটিক শাসকদের সাহায্য করতেন সুমেরীয়রা। সম্রাট সারগন্ শুধু যে সুমেরীয়দের সাহায্যই গ্রহণ করলেন তা নয়, দেবতার গুণ ও অধিকার দাবী করলেন। আগে শাসকেরা ছিলেন 'পটেশী' বা দেবতার ইজারাদার প্রজা, কিন্তু সারগন্ হয়ে উঠলেন 'আক্কাডের দেবতা' (God of Akkad)।[৩৮] জ্ঞান ও সভ্যতায়

৩৮। প্রাচীন ইরাক (পূর্বোক্ত), পৃঃ ৫৩

পিছিয়ে থাকা সম্রাট এইভাবে সংস্কৃতিকরণের সাহায্যে উন্নীত হলেন। সে-যুগে সুমেরীয় রাজ্যে শাস্ত্রসিদ্ধ বর্ণবিন্যাস অর্থনৈতিক শর্তসমূহ থেকে আলাদাভাবে নিজের নিয়মে চলতো, অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিয়মে ক্ষত্রিয়েরা সবচেয়ে প্রভাবশালী জাতি হলেও শাস্ত্রানুসারে পুরোহিতই [আর্থিক দিক দিয়ে নীচু হওয়া সত্ত্বেও] উচ্চবর্ণ। তাই সারগন্ ক্ষমতায় এসে জীবনধারা ও আচারবিধিতে সংস্কৃতিকরণ সক্রিয় করে 'দেবত্ব' দাবি করলেন। যেহেতু অধীনস্থ সুমেরীয় লেখক (রাজ্যের করণিক ও উপদেষ্টারা) সারগনের এই দাবীকে সমর্থন করলো সেহেতু সম্রাটও তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে বাধ্য হলেন। ফলে অভিজাত হিসেবে দু'টি বর্ণ পরস্পরের মুখোমুখি হলো—সেমেটিক রাজার আত্মীয়স্বজন ও সেমেটিক উপ-শাসকেরা, এবং সেমেটিক-সম্রাটের আস্থাভাজন সুমেরীয় লেখকেরা। এই সমস্যার সমাধানে সারগন্ সুমেরীয়দেরই তুলে ধরলেন, এবং সেমেটিক অভিজাতদের নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। এর ফলে সারগনকে এই অভিজাতকুল ক্ষমা করেননি ; তাঁর বংশধর নারাম-সিন সারগনের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি কোন লিপি-লেখনে। পরবর্তীযুগে সম্রাট হাম্মুরাবি কিন্তু এই ভুল করেননি। তাঁর রাজ্যে সুমেরীয়দের সম্মানীয় পদ দেওয়া হলেও সেমেটিক অভিজাতবর্গের স্থানই ছিল সর্বোচ্চ।[৩৯]

ভারতেও আমরা এটি দেখি। বহিরাগত গ্রীক, শক, পহ্লব, হূণ ইত্যাদি জাতি ভারতে এসে বসবাস করার পর ক্রমশ ভারতীয় চতুর্বর্ণের অঙ্গীভূত হয়ে ক্ষত্রিয়কুলে পরিণত হলো।[৪০]

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, শাসকগোষ্ঠী তাদের গতিশীল ভূমিকা বৈধকরণে পুরোহিতদের ও জ্ঞানী কর্মচারীদের সাহায্য নিতেন, এবং তাঁরাও স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার সাথে সাথে শাসকদেরও যোগ্য সম্মান দিতেন। এ-থেকে বোঝা যায় যে উচ্চ ও মধ্য বর্গীয় লোকেরা স্থানীয় স্তরের চেয়ে এক বৃহত্তর সামাজিক পরিধি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় বোধ ছাড়া বিবাহ-ব্যবস্থারও সংস্কৃতিকরণে এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। গুজরাটে যেমন দেখা গেছে রাজপুতরা কোলি-নেতাদের মেয়েদের বিয়ে করার পর কোলিরা নিজেদের উঁচু স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কুর্গদের একটি বংশ আম্মা কুর্গ এভাবে ব্রাহ্মণদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে[৪১] আবদ্ধ হয়ে নিরামিষ খাওয়া ও পৈতে পরা শুরু করে। প্রাচীন যুগেও আমরা দেখি সাম্রাজ্যবাদী কালে মিশরের গৌরবসূর্য যখন মধ্যাহ্নে তখন মিতানি, আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনের রাজারা মিশরের ফারাওদের সাথে নিজেদের মেয়ের বিয়ে দিয়ে রাজা হিসেবে

৩৯। প্রাচীন ইরাক (পূর্বোক্ত), পৃঃ ১৩৫

৪০। "সময়ে সময়ে তাঁহারা (ভারতীয় মহাপুরুষেরা) দলকে দল বেলুচি লইয়া এক মুহূর্তে তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিয়া ফেলিতেন, দলকে দল জেলে লইয়া এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণ করিয়া ফেলিতেন।" —বাণী ও রচনা ৫ : ১৯০

৪১। ভারতের সমাজ-ভাবনা (পূর্বোক্ত), পৃঃ ৯১-২

উচ্চবর্গে উঠতে উৎসাহী। এ-প্রথা অবশ্য অধিকাংশ স্থলেই একতরফা, অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় রাজারা নিজেরা এ-ধরনের বিয়ে করতেন কিন্তু নিজেদের মেয়েকে অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার সাথে বিয়ে দিতেন না। ব্যাবিলনের রাজা কাদাসমান-এনলিল মিশরের ফারাও তৃতীয় আমেনহটেপ্‌কে তো অভিযোগ করে চিঠিই দিয়েছিলেন এই বলে যে ব্যাবিলন-রাজ তার মেয়ের বিয়ে ফারাওয়ের সাথে দিলেও ফারাও কিন্তু মিশরীয় রাজকন্যার সাথে ব্যাবিলন-রাজের বিয়ে দেননি।[৫২]

এই যে বিয়ের মাধ্যমে সংস্কৃতিকরণ, এটি অনেক সময় উচ্চবর্গের সমাজে লক্ষণীয় পরিবর্তন এনেছে। ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখেছি রাজপুত-কন্যা বিয়ে করায় মোগল বাদশাহদের মানসিকতায় বিশেষ পরিবর্তন এসেছিল। আকবর তার প্রধান মহিষী যোধাবাঈয়ের ধর্মে হাত দেননি, রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এনেছিলেন, এমন-কি পরবর্তী-কালে দারা শিকো উপনিষদ-চর্চায় বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত সে-সময় হিন্দু-রাজকর্মচারীরা এতটা প্রাধান্য পেয়েছিল বলেই মুসলমান মোল্লারা আওরঙ্গজেবের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। হিকসোস্-বিতাড়ণের পর আহমোস্ মিশরে অষ্টাদশ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তার উত্তরাধিকারী প্রথম আমেনহটেপ বিয়ে করেছিলেন এমন একজন মেয়েকে যিনি রাজবংশ-সম্ভূতা ছিলেন না। সম্ভবত এ-সময়ে কোন একটি নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠী এভাবে নিজেদের সংস্কৃতিকরণ করেছিল। রাজবংশেও এর প্রভাব দেখা যায়। আমেনহটেপের উত্তরাধিকারী প্রথম থাটমোস মিশরীয় রাজবংশের রীতি ভেঙে তাঁর মেয়ে হাটশেপসুটকে সিংহাসন দিয়ে গিয়েছিলেন। এই রাণী বিয়ে করেছিলেন তাঁর বৈমাত্র ভাইকে। দুই পুরুষ পরে তৃতীয় আমেনহটেপ সিরিয়া দেশের মেয়েকে বিয়ে করে মিশরীয় পুরোহিতকুলের খুবই বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বিজাতীয় মেয়েদের বিয়ে করে ফারাওদের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছিল পুরোহিতরা তা বরদাস্ত করতে পারেননি। ফলে[৫৩] রাজকুল ও পুরোহিতদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। তৃতীয় আমেনহটেপের ছেলে ফারাও ইখনাটন বিয়ে করেছিলেন তার বোন নেফ্রেটেটিকে। ইখনাটন এরপর পুরোহিতদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে মিশরের সব দেবদেবীর উচ্ছেদ সাধন করে কেবল সূর্যদেব 'আটন'-কেই উপাস্য করে তুললেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মিশরে আগে সূর্য-উপাসনা থাকলেও এর আমদানি করা হয়েছিল মেসোপটেমিয়া থেকে।

মধ্যযুগীয় ভারতে ভক্তিবাদী সন্তেরা তাঁদের ধর্ম-আন্দোলনের মাধ্যমে ব্যাপক[৫৪] সামাজিক পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথমত, নীচু জাতের মধ্য থেকে বহু ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে এবং এই সন্তেরা ধর্মের অত্যধিক আচার-বিচার ও পুরোহিতদের দাপটের বিরোধী হয়ে সরল বিশ্বাস ও ঈশ্বর-ভক্তিকে তুলে ধরে মানুষে-মানুষে ভেদকে তীব্র আঘাত করেছিলেন

৫২। প্রাচীন ইরাক, পৃঃ ১০৯

৫৩। প্রাচীন মিশর (পূর্বোক্ত), পৃঃ ৮৩

৫৪। ভারতের সমাজ-ভাবনা (পূর্বোক্ত), পৃঃ ৮৭

দ্বিতীয়ত, সংস্কৃতের বদলে আঞ্চলিক ভাষাকে তুলে বিশাল নিরক্ষর জনসমাজকে জ্ঞান ও বিদ্যায় উৎসাহিত করেছিলেন। প্রাচীনযুগের ইহুদীদের মধ্যে প্রফেট বা নবীদের কাজও ছিল ঠিক এ-রকম। ইস্রায়েলের রাজকুল ও পুরোহিতকুলের তীব্র বিরোধী এই নবীরা দরিদ্র ও নিরক্ষর সমাজে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে এক ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন উপস্থিত করেন, যার ফলে ঐ সমাজের নিম্নবর্গীয় লোকেদের মধ্যে সংস্কৃতিকরণ-প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। 'স্ত্রী' শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ "বিহুলা" যার অর্থ 'অধিকৃতা নারী'।[৫৫] বস্তুত তৎকালীন সময়ে ইহুদী সমাজে পরিশ্রমের বিনিময়ে ও অর্থের সাহায্য ছাড়াও বন্দী শত্রুদের মধ্য থেকে এবং অপহরণ করে পুরুষেরা স্ত্রী সংগ্রহ করতো। সমাজে নারীর স্থান খুব উঁচুতে ছিল না, স্ত্রী ছিল পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। নারীদের এই অবস্থা দূর করার জন্য ইহুদী নবীরা (Prophets) যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। নারীর মাতৃরূপ এঁরাই তুলে ধরেন। সারা, রাচেল, মিরিয়াম প্রমুখ নারী এবং ডেবোরা নামক মহিলা-নবীর আবির্ভাব হয় এ-সময়। রাজা জোসিয়ার ধর্মসংস্কারে সাহায্য করেন মহিলা-নবী হুলদিয়া। বিবাহ-প্রথাকে সাংসারিক বিষয় (Secular) থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উন্নত করেন এই নবীরাই। অন্যান্য ধর্ম থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করলেও বিভিন্ন কালে অন্যান্য জাতির মধ্যে থেকেও যে ইহুদী জাতি যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরে রাখতে পেরেছিল তার কারণ ইহুদী নবীদের প্রতিভা ও আন্তরিক প্রয়াস। সর্বদা অত্যাচারিত ইহুদীদের মধ্যে বারে বারে এঁরাই নতুন আত্মসম্মানবোধ ও স্বাধিকার চেতনার সঞ্চার ঘটিয়েছেন।

●

॥ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের আলোচনার ভিত্তিতে ধর্ম সম্বন্ধে স্বামী অভেদানন্দের মত মূলতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়—(১) Great Saviours of the World (২) Religion of the Twentieth Century (৩) Universal Religion and Vedanta (৪) Vedanta towards Religion (৫) Thoughts on Philosophy and Religion এবং (৬) Religion. Revelation and God.

স্বামী বিবেকানন্দের মতই স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন—"True religion does not consist in following a creed or in believing in dogmas. doctrines or spiritual writings. nor does it consist in holding aloft the Banner

৫৫। প্রাচীন প্যালেস্টাইন (পূর্বোক্ত), পৃঃ ১২১

of a particular Prophet and by joining a sect or a denomination, but its aim is to lift the individual souls above the limitations of the senses and to bring it in communion with the Infinite."[১] কোন মত বা পথ বা শাস্ত্র অনুসরণ, কোন ধর্মপ্রচারকের জয়গান বা কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়াকেই ধর্ম বলেনা. ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের ইন্দ্রিয়-নির্ভর দৈহিক জীবন-উত্তরণ এবং তার ভূমারূপের সঙ্গে সম্মিলন। একে স্বামী অভেদানন্দ 'God-consciousness' বা ভাগবত চেতনালাভ বলেও উল্লেখ করেছেন। 'Great Saviours of the World'-গ্রন্থে তিনি বিশ্বের প্রখ্যাত ধর্মপ্রবক্তাদের জীবনী আলোচনা করে তাঁরা সকলেই যে আমাদের এদিকেই উদ্বুদ্ধ করেছেন, তা বলেছেন। আমরা এপ্রসঙ্গ একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করছি।

১৯০৭ থেকে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অভেদানন্দ নিউ ইয়র্কের ব্রুকলিন ইনষ্টিটিউট অফ আর্টস অ্যাণ্ড সাইন্স (Brooklyn Institute of Arts and Sciences of New York) প্রতিষ্ঠানে 'Great Saviours of the World' বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এখানে 'Saviour' শব্দটি খ্রীষ্টধর্মে স্বীকৃত পাপ এবং অনন্ত নরকবাস থেকে উদ্ধারকর্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দটির ব্যাপকতর অর্থ, মানুষের নানাবিধ দুর্গতি থেকে 'ত্রাণকর্তা', গৃহীত হয়েছে।[২] এই বক্তৃতাগুলোর মূল উদ্দেশ্যকে নিম্নলিখিতরূপে প্রকাশ করা যায় :—

(১) বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তা ত্রাণকর্তাদের উপদেশাবলীতে একই ভাতীয় ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার সুর ধ্বনিত।

(২) ত্রাণকর্তাদের জীবনের সঙ্গে যুক্ত গল্প বা কাহিনীর মধ্যে সাদৃশ্য বর্তমান।

(৩) বেদান্তের সার্বজনীন ধর্ম সমস্ত ত্রাণকর্তাদের উপদেশাবলীই গ্রহণ করে এবং তাদের সমন্বয় সাধন করে।

স্বামীজী শ্রীকৃষ্ণ, জোরোআস্টের (Zoroaster), লাওসি (Lao-Tze), বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, মোহাম্মদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা করেছেন। জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি প্রামাণ্য ইতিহাস অনুসরণ করেছেন এবং তাতে যে শ্রম তাঁর হয়েছে এবং ঘটনাগুলোর বিন্যাস ও তাৎপর্য নিরূপণে তাঁর যে মনীষা প্রকাশিত তা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। সর্বোপরি যে সহজ উপলব্ধির আলোতে তিনি এঁদের মর্মবাণী উদ্ধার করতে পেরেছেন তা তাঁর মত আত্মতত্ত্ববিদ্, সত্যদ্রষ্টা সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব। তিনি নিজেই বলেছেন, "If you ask me whether I have seen God. I will answer ; 'He that hath seen the Son, hath also seen the Father'. The latest manifestation of Divinity was in the form of Bhagavan Sri Ramkrishna. Him I have

১। Vedanta towards Religion, দ্বাদশ অধ্যায়।

২। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ; The Philosophical ideas of Swami Abhedananda, Chapter XXIV, ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

seen, therefore, I have seen God, and through Him, I have realized Buddha, Christ, Chaitanya, Krishna and other great prophets and saviours.' (যদি আমাকে প্রশ্ন কর—ঈশ্বর দেখেছেন কি? তবে আমি বলবো—যিনি পুত্রকে দেখেছেন তিনি পিতাকেও দেখেছেন। সবচেয়ে আধুনিক অবতার হলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁর মাধ্যমে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য মহান ত্রাণকর্তাদেরও দেখেছি।) নিহিতার্থ এই যে, ঈশ্বরই অবতাররূপে জগতে অবতরণ করেন। সুতরাং কেউ যদি কোন অবতারপুরুষকে দেখেন, তবে তিনি ঈশ্বরই দর্শন করেন এবং একবার ঈশ্বর দর্শন হলে তাঁর কাছে সমস্ত অবতারের রহস্যই উদ্ঘাটিত হয় ও তাঁর সমস্ত অবতার দর্শন হয়।

সমস্ত ত্রাণকর্তাদেরই ভাগবতজীবনের বার্তাবহ বলে মনে করা হয়। আমরা তাঁদের অবতার, পয়গম্বর প্রভৃতি নামে অভিহিত করি। তাঁরা অতিমানবীয় শক্তি ও গুণাবলীতে ভূষিত, লোকসংগ্রহার্থে বা জনকল্যাণের জন্য তাঁরা কাজ করেন এবং কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রতিষ্ঠাই তাঁদের লক্ষ্য। দেশ ও কালের প্রয়োজনে হিন্দুদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জোরোআস্টের আবির্ভূত হ'ন পারস্যদেশের ইরাণীদের মধ্যে এবং তাদের কাছে আধ্যাত্মিক বাণী প্রচার করেন। প্রায় সে-সময়েই চীনে লাওসি (Lao Tze) এবং কনফুসিয়াস (Confucious) এবং ভারতে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়। যীশু খ্রীষ্টের আবির্ভাবে ছয়শত বর্ষ পূর্তির পূর্বেই আরবদেশে পয়গম্বর মোহম্মদের আবির্ভাব। এঁদের সকলেরই ছিল পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা, দিব্যজ্ঞান এবং অহেতুক ভালোবাসায় স্নিগ্ধ ও বদ্ধ জীবন।

কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবদ্গীতার উদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণ স্বামীজীর মতে যীশু খ্রীষ্টের মতই ঐতিহাসিক পুরুষ। তিনি একথা প্রমাণ করার জন্য অধ্যাপক লেসেন (Prof. Lassen), ক্যাপ্টেন উইলফোর্ড (Captain Wilford), আউথুর লিলি (Authur Lily), স্যার উইলিয়ম জোনস্ (Sir William Jones), স্যার গডফ্রি হিগিনস্ (Sir Godfry Higgins), অধ্যাপক ভাণ্ডারকার (Prof. Bhandarkar), ডক্টর ডাব্লউ, এইচ, মিল (Dr. W. H. Mill) প্রভৃতির সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি অনুসরণ করে তিনি শ্রীকৃষ্ণের 'পৌরাণিক-ঐতিহাসিক' এক চিত্র অঙ্কন করেন এবং দেখাতে চেষ্টা করেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে দিব্য ও মানবিক গুণাবলীর এক বিস্ময়কর সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বিশ্বমানবের জন্য শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছেন এবং যোগ, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিমার্গের সমন্বয় প্রদর্শন করে সাধনা ও ধর্মের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব পরিহার করেছেন। তিনি 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্' বলে বিভিন্ন ধর্মমতের বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের বাণী প্রচার করে বিশ্ববাসীকে পথ প্রদর্শন করেছেন। অভেদানন্দ বলেন, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং দিব্য গুণাবলীর প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে যেমন দেখা যায়, তেমন আর কারও জীবনেই দেখা যায় না। অন্য কোন অবতার, তিনি বুদ্ধই হোক্, কি খ্রীষ্টই হোক্,

কৃষ্ণের স্থান অধিকার করতে পারেন না, কারণ এঁদের কেউই ঈশ্বর ও জগৎ এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়-সাধন করতে পারেননি।[৩] বক্তব্য এই যে, বুদ্ধ বা খ্রীষ্ট আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে খুবই উজ্জ্বল দু'টি নাম। কিন্তু, তাঁরা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সমন্বয়ের কথা কিছু বলেননি। কিন্তু, শ্রীকৃষ্ণ তা বলেছেন। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে অবিরোধ, শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে প্রদর্শন করেছেন, অন্যে তা করেননি। শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগে কর্ম করার নির্দেশ দিয়ে কর্মফল পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। ফলে জগৎকে উপেক্ষা করার কথা নেই, তবে নিষ্কাম হবার নির্দেশ আছে। এইভাবে ভোগ ও ত্যাগ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ভূমি ও ভূমার সমন্বয় সাধন হয়েছে। এমন সমন্বয় অন্য কেউ করতে পারেননি।

স্বামীজীর মতে, জোরোআস্টের ধর্মের প্রবক্তা জোরোআস্টের খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝির আগে জন্মগ্রহণ করেননি। তবে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী এবং খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে দুটি মতও প্রচলিত আছে। জোরোআস্টের বলেছেন, আহুর মজ্‌ডা মানুষের স্রষ্টা এবং তার দেহ ও মনের বিধাতা। তাঁর করুণা ছাড়া মানুষ স্বীয় চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে কিছুই করতে পারে না। জোরোআস্টের ধর্মে আহুর মজ্‌ডার প্রতি অটুট বিশ্বাস, নির্ভরশীলতা এবং ভক্তি প্রচার করা হয়েছে। স্বামী অভেদানন্দের মতে সার্বজনীন বেদান্তধর্মের অন্তর্গত দ্বৈতবাদী ভক্তিযোগ এই ধর্মে প্রচারিত হয়েছে। বক্তব্য এই যে, বেদান্তধর্মে যেমন শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ এবং জ্ঞানযোগ স্বীকৃত, তেমনি আবার মধ্বাচার্যের দ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ও তাঁদের ভক্তিবাদ এবং বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিভাগাপৃথক্‌ত্বদ্বৈতবাদও স্বীকৃত। জোরোআস্টের ধর্মে বেদান্তের ভক্তিবাদ গৃহীত হয়েছে। জোরোআস্টের আহুর-মজ্‌ডা ছাড়া আহিরমন নামে আর একটি দেবতা স্বীকার করেছেন। আমাদের সুর অসুরের মত যেন আহুরমজ্‌ডা ও আহিরমন নিয়তিবিপক্ষে রত। আহুরমজ্‌ডা সমস্ত কল্যাণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, আর আহিরমন সমস্ত অকল্যাণের স্রষ্টা। তবে এঁদের সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত কল্যাণের দেবতা আহুর মজ্‌ডাই জয়ী হয়। অভেদানন্দ বলেছেন, জোরোআস্টের দিব্য আলো বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং ইরাণীদের মধ্যে মুক্তির বাণী প্রচার করেছিলেন।

চীনদেশে তিনটি ধর্মমত প্রচলিত ছিল—কনফিউসিও ধর্ম (Confucioism), 'তাও' ধর্ম (Taoism) এবং বৌদ্ধধর্ম। কনফিউসিও ধর্ম এবং 'তাও' ধর্ম চীনে উদ্ভূত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে চীনে প্রচারিত হয়েছিল। কনফিউসিয়াস (Confucius)

৩। 'Nowhere do we find another example of perfect embodiment of all moral, spiritual and godly attributes which were manifested in the character of Krishna...No other incarnation, neither Buddha, nor Christ can take the place of Krishna, because neither of them could harmonize God and the world, and neither of them could set as highest an example in social, political, ethical and spiritual ideas as was done by this world s redeemer (Krishna)—Great Saviours of the world.

কনফিউসিও ধর্ম এবং লাওসি (Lao-Tze) 'তাও' ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই দুইজন ধর্মপ্রচারকই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। লাওসির ধর্মমত তাঁর রচিত তাও-তে-কিং (Tao-Teh-King)-গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়। 'তাও' (Tao) শব্দের অর্থ 'পথ'। কেউ কেউ বলেন, 'তাও' লোগোস (Logos), নিত্য সত্তা (Eternal Being)। আবার কেউ বলেন, 'তাও' বুদ্ধি (Reason) বা প্রকৃতি (Nature)। বৌদ্ধেরা 'তাও' শব্দটি বোধি-প্রকাশক বলে মনে করেন। তবে 'তাও' শব্দের আক্ষরিক অর্থ দিব্য আলোক বা বোধিলাভের পথ বা পদ্ধতি।

লাওসি প্রচার করেছেন যে, 'তাও' একমেবাদ্বিতীয়ম এবং কূটস্থ, নিত্য। অদ্বৈত-বেদান্তের ব্রহ্মের মত 'তাও' নির্গুণ ও বচনমনের অতীত। লাওসি তাঁকে জগতের উপাদান কারণ বলে উল্লেখ করছেন। 'তাও' ঈশ্বরের স্রষ্টা। 'তাও'-ধর্মে ঈশ্বর সগুণ এবং ব্রহ্মের প্রথম প্রকাশ (the first manifestation)। অভেদানন্দ বলেন, অদ্বৈতবেদান্তে যেমন জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে স্বরূপগত অভেদ স্বীকার করা হয়েছে, 'তাও'-ধর্মেও তাই করা হয়েছে। লাওসির মতে মানুষ নিয়ম (Law) পেয়েছে পৃথিবী থেকে, পৃথিবী পেয়েছে স্বর্গ থেকে, স্বর্গ পেয়েছে 'তাও' থেকে। নিয়ম 'তাও'-এর স্বরূপগত। বক্তব্য কি এই যে, প্রাকৃতিক নিয়ম থেকে মানুষ পেয়েছে নিয়ম, আবার প্রাকৃতিক নিয়ম, ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্যের নিয়ম এবং ঈশ্বরের নিয়ম 'তাও' বা সত্যের স্বরূপেই বর্তমান? এখানে কি আমাদের 'মত'-এর মত কিছু বলা হচ্ছে?

'তাও'-ধর্ম পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। টলস্টয় লাওসি'র বাণী এবং 'তাও'-ধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘ বৌদ্ধধর্মের এই ত্রিরত্ন 'তাও'-ধর্মে পূর্ণ পবিত্র এক (Perfect Holy One), উচ্চতম পবিত্র এক (Highest Holy One) এবং বৃহত্তম পবিত্র এক (Greatest Holy One) রূপে পরিবর্তিত হয়েছিল কি? বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের মতই 'তাও' ধর্মাবলম্বী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনীরা হলুদ টুপি পরিধান করতেন। বৌদ্ধধর্ম থেকেই 'তাও ধর্ম' যমলোক (Purgatory) মৃত্যুর পর পুরস্কার ও তিরস্কার এবং পুনর্জন্মের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। লাওসি বলেছেন, আত্মা অমর এবং আত্ম-সংযমের পথেই 'তাও' উপলব্ধি এবং মুক্তিলাভ হয়।

স্বামী অভেদানন্দ বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনা করে তাঁর উপলব্ধ চারটি আর্য সত্য—দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ দূর করা সম্ভব এবং দুঃখ দূর করার উপায় আছে—ব্যাখ্যা করেছেন। সর্বশেষে তিনি বুদ্ধদেব-প্রচারিত নির্বাণের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, বুদ্ধদেব নির্বাণ বলতে কি বুঝতেন, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। স্বামীজী এ বিষয়ে বিভিন্ন মত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন যে, নির্বাণ আসলে তথতা-প্রাপ্তির অবস্থা বোঝায়, তথতা উপনিষদের আত্মা-সদৃশ। তবে একথা যে বুদ্ধদেব নিজে বলেননি, তা স্বামীজী পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করেছেন। অভেদানন্দজীর বক্তব্য নির্বাণের প্রকৃতির একটি বিশিষ্ট

ব্যাখ্যা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয়, যদি বুদ্ধদেবকে সাধারণতঃ নৈরাত্ম্যবাদী বলা হয় তবু পরবর্তীকালের বৌদ্ধদার্শনিক বসুবন্ধুর বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধির বিংশিকা কারিকায় যেখানে নিত্য সুখ স্বরূপ চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে, অথবা বৌদ্ধধর্মে যখন মৈত্রী ভাবনা বা ব্রহ্মবিহারের কথা বলা হয়, তখন বৌদ্ধধর্মে আত্মা অস্বীকৃত বা তা ঔপনিষদিক আত্মা নয়, তা বলা যায় কি? এইসব কথা বিবেচনা করে স্বামী অভেদানন্দ বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের যে বৈদান্তিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা খুব অসঙ্গত মনে হয় কি? আসলে একথা বলে স্বামীজী বোঝাতে চেয়েছেন যে, বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকতর বেদান্তধর্মেরই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ।

যীশু খ্রীষ্টের জীবনী ও বাণী আলোচনার জন্য স্বামী অভেদানন্দ চারটি অধ্যায়—(১) Christ and his Teachings, (২) Christ and Christians, (৩) Vedanta and the teachings of Jesus এবং (৪) Did Christ teach a new Religion রচনা করেছেন। স্বামীজী বলেছেন, যীশু তাঁর ক্রিয়াকলাপের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, তিনি পবিত্রতা ও ধর্মভাবের প্রতিমূর্তি ছিলেন এবং দিব্যজ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের ছিলেন অবতার। স্বামীজীর মতে যীশু বস্তুতঃ বৈদান্তিক প্রেমেরই অনুসারী ছিলেন। যিনি সর্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত এই বৈদান্তিক অনুভূতির অধিকারী নন, তিনি কি করে বলবেন—তোমার প্রতিবাসীকে নিজের মতই দেখবে (Treat thy neighbour as thy self)? প্রতিবেশীর আত্মা (self) যে আমারই আত্মা, এই বোধ জাগ্রত হলেই আমরা প্রতিবেশীকে আঘাত করতে পারিনা, সর্বজনের প্রতি প্রেম হয় অবারিত। স্বামীজী বলেন, যীশু যোগসাধনা করেছিলেন।[৪] লাডাকের হেমিস মঠে প্রাপ্ত একটি তিব্বতী পুঁথি থেকে অভেদানন্দ যীশু যে ভারতে এসেছিলেন এবং এখানে অষ্টাদশ বৎসর অবস্থান করেছিলেন, তা প্রমাণ করেছেন। আমেরিকা থেকে প্রকাশিত 'Adept of Galilee' গ্রন্থে স্বামীজীর 'How to be a Yogi' গ্রন্থের নবম অধ্যায় 'Was Christ a Yogi' উদ্ধার করা হয়েছে।

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে যীশুর শিক্ষা বেদান্তের শিক্ষার অনুগত, যীশুর প্রেম ও মৈত্রীর বাণী বেদান্তের বাণীর সঙ্গে অভিন্ন, তবে যীশু উপদেশ দিয়েছিলেন গল্পের (Parables) মাধ্যমে, কিন্তু বৈদান্তিক নীতি ও ধর্মের ভিত্তি হ'ল বিচার ও বিশ্লেষণ।[৫] তিনি আরও বলেছেন, ভারতে যেমন বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন যীশুও তেমনি যুডাইসমের (Judaism) বা ওল্ড টেষ্টামেন্টের পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।[৬]

৪। অভেদানন্দ-রচিত 'How to be a Yogi'-গ্রন্থের নবম ও দশম ব: সর্বশেষ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৫। Great Saviours of the World গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় 'Vedanta and Teachings of Jesus' দ্রষ্টব্য।

৬। 'As in India, Buddha rebelled against the ceremonials, rituals and priest crafts of the Brahman and introduced a simple form of worship and religion of the heart, so among the Jesus, nearly five hundred years after Buddha, Jesus of Nazareth rebelled against the priest craft of Judaism.'

ইসলামধর্মের প্রবক্তা মোহম্মদ সম্বন্ধে অভেদানন্দ বলেছেন, তিনি দুর্ধর্ষ এবং দুর্বিনীত আরবের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার করে তাদের প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করেছিলেন। তাদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং ন্যায় পরায়ণতার বোধ সঞ্চার করেছিলেন। মক্কায় তাঁর আবির্ভাব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি একেশ্বরবাদ এবং এক পয়গম্বরবাদ প্রচার করেছিলেন। মোহম্মদের জীবনের আধ্যাত্মিকতা ও মৈত্রীর প্রতি স্বামীজী ছিলেন শ্রদ্ধাশীল। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এইচ. জি. ওয়েলস (History of the World) বা টেটসম্যান (Statesman পত্রিকায়) মূল্যায়নের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না। স্বামীজীর মতে অন্যান্য ত্রাণকর্তাদের মতই মোহম্মদও ছিলেন মানবকল্যাণ ও বিশ্বমৈত্রীর বাণীবাহক।

অভেদানন্দ বলেন, অমৃতলোকের বার্তা যাঁরা এনেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষে সব সাধনার ধারা সমন্বিত করে পিপাসার্ত ধরণীর বুকে ভাগবতপ্রেমধারারূপে নেমে এসেছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। সন্দেহবাদী ও অবিশ্বাসীদের সমস্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর করে একমাত্র তিনিই প্রমাণ করেছেন যে, ভাগবতচেতনা কল্পনা নয়, বাস্তব এবং তিনি নিজে তাঁর অধিকারী। তিনি আরও বলেছেন, 'Those who have seen and watched him day and night have proclaimed before the world that he was the embodiment of the highest spiritual ideals. given in all the scriptures of different nations of the world'. যাঁরা তাঁকে দিবারাত্র দেখেছেন তাঁরা বলেছেন, তিনি ছিলেন জগতের বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পরিবেশিত মহত্তম আধ্যাত্মিক আদর্শের বিগ্রহ। বিশ্বের আধ্যাত্মিক ভাবধারার তিনি যেন ছিলেন পরিপূর্ণ পরিণতি। সমস্ত রকমের সঙ্কীর্ণতা, অসহিষ্ণুতা, কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মোন্মত্ততামুক্ত উদার, আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার ধর্ম তিনি প্রচার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ; শক্তি, শৈব ও বৈষ্ণব ; ঋষিদের কালের ব্রহ্মজ্ঞানী ও ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা—সকলেই এক বস্তুকে চাইছো। তবে যার যা পেটে সয়, মা সেইরূপ ব্যবস্থা করেছেন। মা যদি বাড়ীতে মাছ আনেন, আর পাঁচটি ছেলে থাকে, সকলকেই পোলাও কালিয়া করে দেননা। সকলের পেট সমান নয়। কারু জন্য মাছের ঝোলের ব্যবস্থা করেন।...কি জান? দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম করেছেন। কিন্তু, সব মতই পথ, মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আন্তরিক ভক্তি করে একটা মত আশ্রয় করলে তাঁর কাছে পৌছান যায়।[৭]

আসলে বিভিন্ন ধর্মমতের যে বিরোধ তা বিভিন্ন ধর্মের দর্শন, পুরাণ এবং অনুষ্ঠানের পার্থক্য-জনিত। একথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ধর্ম যখন উপলব্ধি, আন্তরজীবনের ব্যাপার তখন আর বিরোধ নেই, আছে শান্তি ও সামঞ্জস্য। সেজন্যই দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁরা মিষ্টিক সাধক তাঁদের উপলব্ধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য। খ্রীষ্টান মিষ্টিক অনুভব করেন, 'thou and thy heavenly father are one' (তুমি এবং তোমার স্বর্গীয় পিতা অভিন্ন। সুফী সাধক বলেন, 'আনল্ হক্' (তুমিই সেই) এবং বৈদান্তিক সাধক

৭। কথামৃত ২।১৭।১

বলেন, 'তত্ত্বমসি'। এই সমস্ত ক্ষেত্রে উপলব্ধির সাদৃশ্য এত স্পষ্ট যে তা অস্বীকার করা মূঢ়তা। শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের এই দিকটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনের অমৃত ও আনন্দের অধিকারী তাঁরা তাঁদের সেই তৃপ্তিতে এত মগ্ন যে তাঁদের কাছে কোন বিরোধ নেই, আছে শুধু সমন্বয়; কোন দ্বন্দ্ব নেই, আছে শুধু মহামিলন; কোন বিদ্বেষ নাই, আছে শুধু প্রেম। স্বামী অভেদানন্দ সেই বোধে জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে 'Great Saviours of the World' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন—'Shall we be so narrow, intolerant and prejudiced as to accept only the Saviour, simply because our forefathers worshipped him, and on that very ground alone, reject and disregard the other Prophets and Saviours of the World? Nay that time has come when we must put aside all sectarianism and bigotry and become broad and liberal so as to follow them all and place them upon the alter of universal religion, which is all embracing and infinite in its scope'. (আমরা কি এতই অনুদার, অসহিষ্ণু এবং পক্ষপাতদুষ্ট হব যে, একমাত্র যে ত্রাণকর্তা আমাদের পূর্বপুরুষের পূজিত তাঁকেই আমরা গ্রহণ করবো এবং অন্য ত্রাণকর্তাদের করবো অবজ্ঞা এবং প্রত্যাখ্যান? সময় এসেছে যখন আমাদের সমস্ত রকমের সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মোন্মত্ততা পরিহার করে উদার হয়ে সমস্ত ত্রাণকর্তাদেরই সার্বজনীন ধর্মের পীঠভূমিতে স্থান দিয়ে অনুসরণ করতে হ'বে। সর্বধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা যা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় উপলব্ধির ভিত্তিতে প্রচার করেছিলেন তাঁর সন্তান অভেদানন্দ সেই শ্রদ্ধায় দীক্ষিত হওয়ার জন্যই আহ্বান জানিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। 'Great Saviours of the World' গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মপ্রচারকদের জীবন ও বাণীর তুলনামূলক আলোচনা করে স্বামী অভেদানন্দ সর্বধর্মসমন্বয়ের এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ-নির্ভর। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা—

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
যেখানে তোমায় মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(সাত)

সমালোচক যথার্থই বলেছেন, "বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করে, ধর্ম অনুশীলন করে ও জীবনচর্যা বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ একথা সার বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের সাধনা হচ্ছে বেসুরোকে সুরের মধ্যে আনা, বিরোধকেই রোলার চালিয়ে সমভূমি করে দেওয়ার চাইতে তাকে যথাসম্ভব ঐক্যের মধ্যে রক্ষা করা—যাকে ইতিহাসের ভাষায় বলা যেতে পারে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মিলন, বহুর মধ্যে একের উপলব্ধি। নানা ছোটখাটো ভেদ বৈষম্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষ প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একপ্রকার ভাবের ঐক্যকে অনুসরণ করেছে এবং সে ঐক্যবোধের মূল প্রেরণা হল ব্রহ্মবাদ। বেদান্ত-প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্ব বিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্পর্কহীন কোটি কোটি জীবকে একটি পারমার্থিক ঐক্যবোধের মধ্যে আনতে পেরেছে, যার সঙ্গে ইন্দ্রিয়জ জগতের বিরোধ নেই। তার ফলেই বাইরের ইতিহাসের কুশীলবেরা আকাশ বিদীর্ণ করলেও জাতির অন্তঃপুরে তার কর্কশ কলরব পৌঁছায়নি।"…ভারতবর্ষ যে আজও জাতি হিসাবে বেঁচে আছে—এতদিনে ইসলাম বা খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করে হারিয়ে যায়নি তার কারণ নানা বিপরীত তরঙ্গের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজের স্বরূপ সম্পর্কে এ জাতি কখনো একেবারে আস্থা হারিয়ে ফেলেনি। অবশ্য বৈদিক ও ঔপনিষদিক, বৌদ্ধ এবং পৌরাণিক যুগের ধর্মমত ও আচারানুষ্ঠানের অনেক রূপান্তর ঘটেছে, দেবদেবীরাও কায়া বদল করেছেন। তবু মূল কুলধর্মে হাত পড়েনি। সে মূল বৈশিষ্ট্য হল রঙ্গনটী প্রকৃতির জড় ও জীবকে কেন্দ্র করে নর্তনবিলাস এবং আকার-অবয়বহীন কালত্রয়াবাবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ চিদাত্মাবোধ—যাকে প্রচলিত কথায় বলা হয় ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মবিহার—এই দুইয়ের ভেদ ও বিকল্পের প্রতিভাস সম্পূর্ণরূপে নিরসন। বৌদ্ধযুগের শেষপর্বে এ সমন্বয়-বন্ধন ছিন্ন হল। কিন্তু পৌরাণিক যুগের কিছু কিছু ভাবগত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও এই সম্পর্ক অস্বীকৃত হয়নি—শুধু অধিকারী-ভেদ স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। বিবেকানন্দ সেই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করলেন"। এবং এই শাশ্বত ভারতবর্ষের যে কয়েকটি মহামানবিক বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ চিরকাল দেদীপ্যমান হয়ে আছে স্বামীজীর ভাষায়ই এখানে তা উল্লেখ করা যেতে পারে: (১) পাশ্চাত্য সমাজ ও ভারত একই নীতি বা সূত্র অনুসরণ করে গড়ে ওঠেনি; সমাজব্যবস্থা নিয়ে দুটি পক্ষ দুইটি বিরাট পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলেছে। (২) ভারতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বেড়া দেওয়া সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য-সাম্যবাদের বেড়া দেওয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ। (৩) পাশ্চাত্য সমাজের মত তরবারির ধারটি নয়, যুগ যুগ ধরে ভারত চলেছে জ্ঞানের প্রদীপকে সম্বল করে। ভারতীয় সমাজকে পথনির্দেশ করেছেন বিদ্বজ্জনেরাই, সেনানায়কেরা নন। (৪) পাশ্চাত্যের মত দাসপ্রথা (Slavery) ও আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) ভারতে দেখা যায়নি। (৫) সামন্তপ্রথা (Feudalism) ভারতে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে নি।

(৬) ভারতীয় সমাজে ভূমির রাষ্ট্রায়ত্ত চরিত্র অতীতকাল থেকেই দেখা যায়। (৭) উৎপাদন-ব্যবস্থায় (mode of production) ভারতের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (৮) কোনো কোনো ঐতিহাসিক ভারতীয় সমাজকে স্থবির অপবাদ দিলেও ভারত চিরকালই প্রাণচাঞ্চল্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। প্রাণই একমাত্র সমন্বয় ও সাঙ্গীকরণ করতে পারে।

ভারতবর্ষের এই প্রাণশক্তির পরিচয় হিসেবেই—স্বামীজী ভারতবর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করে কয়েকটি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। এভাবেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যে ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজকে স্থবির বলে অপবাদ দিয়েছেন স্বামীজী তার প্রতিবাদ করেছেন: (১) বিভিন্ন চিন্তা ও ভাবধারাকে ভারতবর্ষ চিরদিনই সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান-শিল্প-সাহিত্যে সে পরদেশকে আমন্ত্রণ করেছে সাদরে। পরমতসহিষ্ণুতায় ভারতবর্ষ চিরদিনই অনন্য। (২) যে ঐস্লামিক শক্তি সুদূর আরব থেকে মিশর, জর্ডন, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশে সকলকেই ধর্মান্তরিত করে নতুন সংস্কৃতি নিয়ে এল, ভারতে এসে সে শক্তি সেরকম সাফল্য লাভ করতে পারেনি। (৩) যে ইউরোপীয় শক্তি আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি উপনিবেশে স্থানীয় অধিবাসীদের নির্মূল করেছে, সে শক্তি ভারতে এসে এ বিষয়ে বিফল হয়েছে। (৪) যুগে যুগে বিভিন্ন বহিরাগত জাতি এসে যেভাবে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে, তেমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। (৫) দর্শন-সাহিত্য-বিজ্ঞান-শিল্প তথা ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংস্কৃত-ধর্ম-দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যাওয়া—সকল বিষয়েই ভারত চিরদিনই বিশ্বে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে থেকেছে। (৬) প্রাচীন সভ্যতার কোনো চিহ্ন মিশরে, চীনে, গ্রীসে বা দক্ষিণ আমেরিকায় আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। একমাত্র ভারতই তা আজও অম্লান রাখতে পেরেছে। (৭) সঠিক বিশ্লেষণে দেখা যায়,—ভারতীয়দের চিরকালই এমন একটি অন্তর্নিহিত শক্তি রয়েছে যা একদিকে যেমন সকল প্রতিঘাতকে সহ্য করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, অন্যদিকে তেমনি সকল বহিরাগতকে আত্মস্থ করেছে।

পূর্বোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি ভারতাত্মা বলতে ভারতবর্ষের শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-বিজ্ঞান-কাব্য-দর্শন-ধ্যানধারণা-আচার-অনুষ্ঠান-বিধি-ব্যবস্থা-নিয়ম-নীতি সব কিছু নিয়ে সামগ্রিকভাবে ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই বোঝা যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে ভারতের সাধনা চিরকালই পূর্ণের সাধনা। জড় ও চৈতন্য নিয়েই যেমন জগৎ ও জীবনের—বিশ্বপ্রকৃতির পরিপূর্ণতা ও সমগ্রতা, $E = Mc^2 =$ Energy Mass | Velocity of light $(3 \times 10^{10}$ cm/Second $)\}^2$ যেমন একটি শাশ্বত বৈজ্ঞানিক সত্যের পরিপূর্ণতার ইঙ্গিতবাহী, ঠিক তেমনি মানবসভ্যতাও পূর্ণতা লাভ করেছে তার দুটি দিক নিয়েই। একদিকে যেমন তার জীবধর্মের পরিপোষণা অবশ্য কর্তব্য, ঠিক তেমনি আবার জীবনের ঊর্ধ্বে উদ্গতির অভিমুখে তার অভিযাত্রার জন্য আধ্যাত্মিক নানা নিদিধ্যাসনার কর্ষণাও সমান কাম্য। স্বামীজী তাই অর্থব্যঞ্জক ভাষায় বললেন, "যতক্ষণ মানুষ প্রকৃতিকে অতিক্রম করিবার জন্য সংগ্রাম করে, ততক্ষণ তাহাকে যথার্থ মানুষ বলা চলে"।

বললেন, "বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করাই হল মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার উপায়। তাই যুগপৎ চাই বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মচিন্তা"। আরও বললেন, "এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য প্রতিভা সম্যক বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।...এই দুটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমান কালের মীমাংসা।" বলা বাহুল্য, ভারতবর্ষকে আবার পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠার জন্যই স্বামীজীর এই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের যুগবাণী—।

জীব হিসেবে মানুষ বাঁচতে চায়। সুখে-শান্তিতে থাকতে চায়। স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরামে আনন্দের সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতে চায়। এসব আকাঙ্খা কিছু দোষের নয়। এ তার জীবধর্ম। এই যে প্রত্যহ-জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের অন্বেষণায় মানুষ তৎপর হয়েছে —প্রকৃতিকে জয় করে আহরণ করেছে নানা ভোগের সামগ্রী ও বেঁচে থাকার, ভালোভাবে বেঁচে থাকার নানা উপকরণ,—এসব অবশ্যই মানবসভ্যতার অঙ্গ। এই যে মাথার উপর আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে, এই যে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরের মধ্যে আরাম-চেয়ারে বসে আছি— এই যে এক মুহূর্তের মধ্যে রেডিও-টেলিভিশনে দূরকে অতি নিকটে ধরে এনে প্রত্যক্ষ করছি, এই যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমা করে আসছি, এই যে পাহাড়ে উঠছি, সমুদ্রের নীচে নামছি,—এই খাচ্ছি-দাচ্ছি, আরাম করছি,—নিশ্চিত নিরাপত্তা অর্জন করেছি,— রাষ্ট্র ও সমাজের কাছ থেকে,—এ সবের জন্যই মানুষ হিসাবে নিশ্চয়ই আমরা গৌরবান্বিত। এবং প্রাণধারণের ও জীবনযাপনের এই সব সামগ্রী ও নানাবিধ উপকরণই সভ্যতার দান। মানব সভ্যতার দুটি দিক। এই সুখে শান্তিতে ভালোভাবে বেঁচে থাকার যে আয়োজন— তাকে বলা যায় কাত্যায়নী সভ্যতা বা সংস্কৃতি। দৃশ্যমান জগতে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার অঙ্গীকার যে পেয়েছি যাঁদের কাছ থেকে—তাঁদের কাছেও আমরা অবশ্যই নতজানু। কৃতজ্ঞ পূর্বসূরীদের কাছে। এবং বলা বাহুল্য, মানব সভ্যতার এটিও একটি বিশেষ দিক। আবার প্রত্যহের পুঞ্জীভূত এই সব উপকরণ ও বিষয়সামগ্রী ছাড়িয়ে মানবাত্মার যে জীবনাতীতের দিকে অম্লান অভিসার—সেটিও মানব-হৃদয়েরই চিরন্তন তৃষ্ণা বা অভীপ্সা। সব পেয়েও যখন হৃদয় ভ'রে ওঠে না, সেই মহৎ হৃদয়ের দুর্লভ আকুতিও সমান সত্য। সমস্ত সুখ-সামগ্রী ও বিষয়ের বস্তুপুঞ্জ করতলগত হওয়া সত্ত্বেও যখন হৃদয় বলে ওঠে "যেনাহং নাং মৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"।—যাতে আমি অমৃতত্ব পাব না তা দিয়ে আমি কি করব?—সেই মনকে, সে অপ্রাপ্তির পরম বেদনাকেও আমরা সমান মর্যাদা দিয়েছি। কিংবা সেই কিশোর বালক নচিকেতার কণ্ঠের আশ্চর্য উচ্চারণ—"মাস্যং তন্মানচিকেতা বৃণীতে"। "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ," "তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে"।—জীবনের এই পরম মূল্যবোধই ভারতীয় সংস্কৃতিকে দিয়েছে মহত্তম মর্যাদা।—এবং এই অমৃতের সন্ধানেই এদেশে "রাত্রি অন্ধকারে / চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে / ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে / অন্তর প্রদীপখানি। তারই জন্য রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্ন কন্থা বিষয়ে বিরাগী / পথের ভিক্ষুক।—" এবং এই অমৃতের সন্ধানে মানুষের যা কিছু প্রয়াস-প্রচেষ্টা ও কর্মানুভূতি, যা কিছু অনুভব, অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-জ্ঞান—তার পরিপূর্ণ বর্ণনা ও আলেখ্যকেই বলা যায় মৈত্রেয়ী সভ্যতা।

এই দুই সভ্যতারই সমন্বয় ঘটেছিল ভারতবর্ষে। এজন্যই ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—সবই আমাদের কাছে আশ্রমের মতই পবিত্র। কারণ ক্রমান্বয়ে এই চারটি অবস্থার মধ্য দিয়ে—মানবাত্মা অবিরাম হয়ে ওঠার সুযোগ লাভ করে। প্রতিটি আশ্রমেই প্রত্যেক মানুষেরই বিশেষ কতগুলি মানবকৃত্য অবশ্য অনুষ্ঠিতব্য থেকে যায়। এবং এই সব কৃত্য পালনের মধ্য দিয়েই ঘটে মনুষ্যত্বের উদ্বোধন।—আত্মার অনন্তরূপে সর্বব্যাপ্ত উত্তরণ।

একেই স্বামীজী আবার অন্যভাবে অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: Development of 3-H.—Head, Hand and Heart-এর অর্থাৎ মস্তিষ্ক, বাহু এবং হৃদয়ের যুগপৎ কর্ষণাই আমাদের কাম্য। মানুষ হয়ে ওঠার পথে অবশ্য পালনীয় কৃত্য। প্রাচীন ভারতবর্ষে সেই সমন্বিত আদর্শ, সমন্বিত নন্দিত ঐক্যে স্থিত সুন্দর সমাজ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেদিনকার সেই আদর্শ সমাজব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষ দেহে-মনে ও আত্মার উৎকর্ষে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার সুযোগ পেতেন। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফললাভই ছিল মানবজীবনের পরম অভিষ্ট। এভাবেই সমাজের প্রতিটি মানুষ তার নিজের প্রকৃতি, বাসনালোক, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক ও পরিবেশ অনুযায়ী পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ পেত। এই কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী সভ্যতার সমন্বয় প্রসঙ্গেই স্বামীজী আবার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি বিজয়ের কথাও বলেছেন। প্রকৃতি বা নিসর্গ-বিজয় মানুষের জন্মগত এষণা। বহিঃপ্রকৃতি জয় করেই মানুষ জড়-জগতের উপর প্রতিষ্ঠা করেছে নিজের প্রভুত্ব এবং এই নিসর্গ বিজয়ের পথেই জয়যাত্রা শুরু হয়েছে বিশ্বমানব সভ্যতার। আজো এগিয়ে চলেছে সে দিগ্বিজয়ের ক্রম-প্রসারণা। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির আদি যুগ থেকেই অন্তঃপ্রকৃতি বিজয়ের জন্যও চলেছে অবিরাম প্রয়াস প্রচেষ্টা ও নিদিধ্যাসনা। এই উভয় প্রকৃতির বিজয়-বৈজয়ন্তীর মধ্যেই যথার্থ আদর্শ মানবসভ্যতার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বস্তুতঃ ভারতবর্ষ মনে করে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য—প্রভৃতি রিপু-নিচয়কে জয় করা সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ব্যাপার। অথচ এদের জয় করতে না পারলে শুধুমাত্র জড়প্রকৃতি বা বহিঃপ্রকৃতিকে শাসন করে সুখ-সামগ্রী সঞ্চয় ও ভোগবিলাসের নিত্য নানা উপকরণ আবিষ্কারের পথে পরিপূর্ণ শান্তির সন্ধান পাওয়া সম্ভব নয়। ভোগের পথ ধরে শেষপর্যন্ত উদ্গতির পথে ত্যাগে পৌঁছাতে না পারলে ব্যর্থ হবে মানুষের সভ্যতার তপস্যা। মনে হবে "এ কেবল দিনরাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবার"। অর্থহীন মনে হবে মানুষের বহিঃপ্রকৃতি বিজয়ের ইতিবৃত্ত। তাই প্রাচীন ভারতবর্ষ এই উভয় প্রকৃতির উপরই নিজের শাসন কায়েম করে প্রতিষ্ঠা করেছিল বহু বৈচিত্র্যের ঐক্যবন্ধনে দৃঢ় সম্বদ্ধ-সমন্বয়ী এক মহান সভ্যতার। অথচ বিশেষ করে অন্তঃপ্রকৃতি বিজয় বা সন্ন্যাসকেই সবচেয়ে বড় বলে মনে করেন নি আমাদের অগ্রজেরা। তাই দেখা যায় উপনিষদের যুগে, এমন কি পৌরাণিক যুগেও অনেক তপস্বী-সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-মুনিঋষি পরা এবং অপরা এই উভয়বিধ বিদ্যারই পাঠ গ্রহণ করছেন আপাতঃদৃষ্টিতে অতি সাধারণ গৃহস্থের কাছে। এই কারণেই ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম পুরুষদের মধ্যে যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস-শুক-জনকও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

কিন্তু কালের নিয়মেই ক্রমশঃ অভাব ঘটল সেই আশ্চর্য সমন্বয়ের, এবং সুস্থ সুন্দর সামঞ্জস্যের। এবং পরিণামে শুরু হল জাতীয় অধঃপতন। প্রাকৃতিক নিয়মেই আবহাওয়ার ভারসাম্য হারালে যেমন সেখানে আবির্ভাব ঘটে ঝড়ের, ঠিক তেমনি একের পর এক ঝড়ের আক্রমণে বিপর্যস্ত ছিন্নভিন্ন হতে লাগল জাতির জীবন। অতঃপর ধর্ম অনাদৃত হয়ে মোক্ষমার্গই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। সব কিছু ছেড়ে আন্তঃপ্রকৃতি জয়ের দিকেই নিবদ্ধ হল জাতির সমগ্র দৃষ্টি। অথচ সমষ্টিগতভাবে সকলের পক্ষে এ প্রয়াস কখনোই হতে পারে না সাফল্যমণ্ডিত। স্বামীজীর ভাষায়ই বলি, "যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে সে তো ভালোই। কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হইলে ত্যাগ হয় না। আগে ভোগ করো, তবে ত্যাগ হবে"। আবার বলছেন, "জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা-ব্যবহার-নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর করে এক করতে গেলে কী হবে? বৌদ্ধরা বললে, মোক্ষের মত আর কি আছে, দুনিয়াশুদ্ধ মুক্তি নেবে চলো। বলি তা কখনো হয়? তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ও সব কথায় বেশি আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর—একথা বলেছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না লম্বা পার হবে"। "দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে একবুদ্ধি হয়ে একটা সাধারণ হিতকর কাজ করতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়াচ্ছ"।..."ধর্মের চেয়ে মোক্ষটা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে বসে উৎপাত করে ফেললে আর কি! অহিংসা ঠিক নির্বের বড় কথা, বড় কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলেছেন তুমি গেরস্থ, তোমার গালে একচড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তবে তুমি পাপ করবে।"

●

॥ দক্ষিণ-ভারতের শিল্পে ভাস্কর্য ॥*

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(দ্বিতীয় পর্যায়)

বলিতে গেলে দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্যশিল্পকলা ভারতের এক বিস্ময়কর অধ্যায় রচনা করিয়াছে। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে মহীশূরে হয়সাল-শিব-মন্দিরের শিল্পকলা বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য। হয়সাল বল্লাল-বংশের রাজধানী দ্বার-সমুদ্র কিংবা দ্বারাবতীপুর ছিল। হিন্দুশিল্পের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি শিবমন্দির সম্ভবত বীর-সোমেশ্বর পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে হুসালের মন্দিরটি কারুকার্যপূর্ণ এবং বড়। হয়সাল-রাজাদের মন্দিরগুলি

* গত শারদীয়া-সংখ্যার প্রথম পর্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এক ধরনের নরম-পাথরের অপূর্ব কারুকার্যময় মন্দির। তাঁহাদিগের মন্দির-রচনার রীতি বা শৈলী হইল একটু উচ্চ বেদীর উপর মূর্তি স্থাপনা করা। মন্দিরের আকৃতিতে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মূলমন্দিরের চারিদিক হইতে কোণাকুনিভাবে দেয়ালগুলি বাহির হইয়া আসায় কারুকার্যময় দেওয়ালের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহাদের একটি গোল-কোণযুক্ত তারার মতো দেখিতে লাগে। দ্বাদশ শতাব্দীতে মহীশূরে হাসানজেলায় দুইটি মন্দির নির্মিত হয়। তাহাদের মধ্যে একটির নাম বেলুড়ের চেন্ন-কেশব বিষ্ণু-মন্দির এবং অপরটি হালেবিডের হয়সালেশ্বর শিব-মন্দির। দ্বাদশ শতাব্দীতে চেন্ন-কেশব-মন্দিরটি হয়সালরাজ বিষ্ণুবর্ধন বিজয়-নারায়ণ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বল্লাল উত্তর-পূর্বকোণে একটি পুষ্করিণী খনন করেন এবং তাহার মণ্ডপের স্তম্ভগুলি অপূর্ব কারুকার্যময়। আর একটি কারুকার্য দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় যে, মন্দিরের স্তম্ভগুলির মাঝে মাঝে ছিদ্র করা আছে এবং ঐ সকল ছিদ্র দিয়া বায়ু চলাচল করে। ঐ সকল ছিদ্র জালির আকারে নির্মিত। জালিদেওয়া স্তম্ভগুলি দেখিলে মনে হয় যেন ঐগুলি চন্দনকাঠের কিংবা হাতীর দাঁতের সূক্ষ্ম-কারুকার্য। মন্দিরের অধিষ্ঠানবেদীতে, গর্ভগৃহের দেওয়ালে, মণ্ডপে ও বাহিরের দিকে চারিদিকে অতিসুন্দর কারুকার্যপূর্ণ ভাস্কর্যকলার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। মূল বা আসল মন্দিরের সিঁড়ির নিকট দুইধারে দুইটি ছোট ছোট মন্দিরের মধ্যে একটি চেন্ন-কেশবের—বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মন্দিরের ভিতরে ছাদের অতি-আশ্চর্য ও সুন্দর পাথরের মনোরম ও অতুলনীয় নারীমূর্তি-দ্বারা শোভিত। সেইগুলি দেখিতে এতো সুন্দর যে, মুখে বা লেখনীতে তাহাদের সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না।

দ্বাদশ শতাব্দীতে হালেবিডের হয়সালেশ্বর-মন্দিরটি বেলুড়ের চেন্নকেশব-মন্দিরের ন্যায় একই ধরনের সৌধবেদীর উপর স্থাপিত। এই মন্দিরটিও কোণাকুনিভাবে বাহিরের দিকে বিস্তৃত। গর্ভগৃহের অন্তরাল ও তিন দিকে বিস্তৃত ক্রসচিহ্নের দ্বারা মণ্ডপটি সাজানো। এই মন্দিরেও কারুকার্যপূর্ণ স্তম্ভ ও ছিদ্র-দ্বারা বাতায়নের ব্যবহার আছে। হয়সালেশ্বর-মন্দিরের সূক্ষ্মকারুকার্য এতোই সুন্দর যে, তাহা না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। তাহার বাহিরের দিকে দেওয়ালের নীচে সারি-সারি-হস্তীগণের মিছিলের স্তর, সারি-সারি সিংহের মূর্তি এবং ক্রমশই উপরের দিকে বিস্তৃত। তাহাছাড়া অশ্বারোহী, মকর ও হংসবলাকা ঐ সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। উপরে ও মাঝামাঝি জায়গায় অতিসুন্দর দেবদেবীর মূর্তিসকল সুবর্ণময় কারুকার্যে যোজিত করা দেখা যায়, দেখিলে মনে হয় যেন অসংখ্য মণি-মুক্তা-দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের গাত্রে অপূর্ব কারুকার্যপূর্ণ শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে নৃত্যসরস্বতী, সিদ্ধিদাতা গণেশ, নৃত্যগণেশদেব, দশ-মস্তক-রাবণ, মহিষমর্দিনী-দুর্গা প্রভৃতির অপূর্ব মূর্তিসকলের দ্বারা শোভিত এবং মনে হয় যেন, এক একটি মূর্তি বহুমূল্য মণি-মুক্তার দ্বারা শোভিত। দুইটি মন্দিরের দেবদেবীদের মূর্তিগুলির মধ্যে আর একটি জিনিষ লক্ষ্য করার মতো যে, মূর্তিগুলির মস্তকে, কর্ণে, গলায়, হস্তে, কোমরে, পদযুগলে সর্বত্রই সুনির্মিত অলঙ্কারের দ্বারা শোভিত করা রহিয়াছে। ঐ সকল নিখুঁত কারুকার্যের অলংকরণের ব্যবহার দেখিলে

বিস্ময়ান্বিত না হইয়া পারা যায় না। বেলুড়ে চেন্ন-কেশব-বিষ্ণুমন্দির ও হালেবিডের হয়সালেশ্বরের শিব-মন্দিরটির তুলনা পৃথিবীতে অতুলনীয়। তাহাছাড়া বেলুড়ে একটি বিখ্যাত মূর্তি রহিয়াছে—'শুকপাখী হাতে নায়িকা' এবং তাহার ভাবগম্ভীর সৌন্দর্যপূর্ণ দৃশ্য দর্শকমাত্রকেই বিস্ময়ে অভিভূত করে। মন্দিরের প্রতিটি শিল্পকে আজিও কোনকিছু মলিন করিতে পারে নাই। সেজন্যই বলি যে, দক্ষিণ-ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ছাড়াও সাহিত্যে ও সঙ্গীতে কীর্তিমন্ত দক্ষিণ-ভারত।

●

॥ জাপানের কাবুকি নাটক ॥

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(দুই)

কাবুকি নাটকের জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ এই যে তাতে জাতীয় সংস্কৃতির এই তিনটি ধারা এসে তার মধ্যে একত্র মিলিত হয়েছে। আমাদের দেশের উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাগানেও একদিন তাই হয়েছিল। তবে ক্রমে তা পাশ্চাত্ত্য নাটকের উপাদানে এবং আঙ্গিক এত বেশী পরিমাণে গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে যে এখন তার মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় উপাদান সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে. কিন্তু কাবুকির মধ্যে আঙ্গিকেই হোক, কিংবা তার বিষয়-বস্তুতেই হোক, আজ পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য নাটক কিংবা রঙ্গমঞ্চের নিজস্ব কোন উপাদান এসে মিশ্‌তে পারেনি, তা এখন পর্যন্ত জাপানের জাতীয় উপাদানে আনুপূর্বিক গঠিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রাগানে আমাদের দেশে যতদিন ভক্তির ভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, ততদিন পর্যন্ত তার জাতীয় চরিত্রও অক্ষুণ্ণ ছিল, কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে তা পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের নিকট প্রায় পুরোপুরি আত্মবিলোপ ঘটিয়েছে। জাপানে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব, আমাদের দেশ অপেক্ষা বর্তমান কাল পর্যন্ত কম হয়েছে, তা বলা যায় না, কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপানীরা তাদের জাতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভারতীয়দের অপেক্ষা অধিকতর সচেতন ; কাবুকি তার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। আর বাংলার যাত্রাগান আমাদের পরানুকরণ-প্রিয়তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত।

নো-নাটকের মধ্যে সামাজিক অব্যবস্থা কিংবা নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ ব্যবহার করা হতো, ওকুনি তার নব-প্রবর্তিত নৃত্যনাট্যের মধ্যে বুদ্ধকীর্তন, উৎসব নৃত্য, নো-নাটকের আড়ম্বরপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ ও তার বিদ্রূপাত্মক সংলাপের একত্র সমন্বয় ঘটিয়ে নূতন বিষয়-বস্তু ও আঙ্গিকের পরিকল্পনা করলেন, তার ফলে জাপানের তৎকালীন

জাতীয় লোক-সংস্কৃতির জনপ্রিয় উপাদানগুলোর এই আধারে পরিবেশন হলো। তার ফলে জাতির নিকট তার আকর্ষণ বেড়ে গেল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেও কৃষ্ণযাত্রার ভক্তি, লোক যাত্রার নৃত্য, পুরাণের কাহিনী প্রভৃতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যে নূতন যাত্রা আবির্ভাব হয়েছিল, তার জনপ্রিয়তার তুলনা ছিল না, কিন্তু অচিরে তা এই আদর্শ বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্ত্য রঙ্গমঞ্চের নিকট সম্পূর্ণ আত্মবিক্রয় করল, তার ফলে তার মধ্যে জাতীয় চরিত্র আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না। জাপানী এবং বাঙালী চরিত্রের পার্থক্য তা থেকে বুঝতে পারা যাবে।

আমাদের দেশে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত যাত্রা যেমন নূতন যাত্রা বলে পরিচিত হয়েছিল, তেমনই কাবুকি নাটকের প্রথমে এই অর্থেই এই নামকরণ হয়েছিল। কারণ, কাবুকি শব্দের অর্থ জাপানী ভাষায় 'নূতন'। ওকুনির নৃত্যগীত সম্প্রদায়ের শিল্পীদের নূতন ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার এবং নূতন পদ্ধতির নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের জন্যই তাকে 'নূতন' অর্থে কাবুকি বলত। তারপর ওকুনির জনপ্রিয়তার আকর্ষণ দেখে তারও বহু সম্প্রদায় অনুরূপ পদ্ধতিতে গীতনৃত্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করল।

কাবুকি নৃত্যনাট্যের প্রতিষ্ঠাত্রী একজন মহিলা, সুতরাং এ কথা খুবই স্বাভাবিক যে তাতে পুরুষের সঙ্গে নারীও নৃত্যাভিনয়ে যোগদান করত এবং নৃত্যাংশে নারীরই অগ্রাধিকার ছিল। কাবুকি ও নো-নৃত্যের পরই জাপানে পুতুল নাচ, যাদুকরের খেলা এবং কুস্তি প্রদর্শনী তখন বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কায়ভোর প্রাচীন নগরে কামো নদীর শুষ্ক খাতে তখন এই সকল অনুষ্ঠান প্রায় একসঙ্গেই বিশেষ কোনো কোনো সময়ে অনুষ্ঠিত হতো, তার ফলে একের প্রভাব অন্যের উপরে গিয়েও বিস্তার লাভ করত, কারণ, এই সবগুলো বিষয়ই জাপানে তখন থেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে কাবুকির রূপসজ্জার অভিনবত্ব দৃশ্যসজ্জার বিশাল বৈচিত্র্যে ঘটনা-সংস্থাপনার নাটকীয়তা এবং জাতীয় জীবনের ঐতিহ্যমূলক নানা উপকরণের পরিবেশনায় কাবুকি ক্রমে সব চাইতে জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু এ কথাও সত্য, প্রথম অবস্থায় কাবুকির দৃশ্যসজ্জাই হোক কিংবা রূপসজ্জাই হোক এত জটিল ছিল না। ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে এই জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের দেশের যাত্রা কিংবা ছৌনাচের আসরে যেমন চারদিক খোলা, মাথার উপর নামমাত্র চাঁদোয়া, তারপর দর্শকের মধ্য দিয়েই একটি অভিনেতা অভিনেত্রীদের একটি যাতায়াতের জন্য সরু রাস্তা থাকে, কাবুকিরও তাই ছিল। আমাদের দেশের যাত্রার কিংবা ছৌনাচের সেভাবেই আজো অভিনয় হয়, কিন্তু কাবুকির জন্য আজ আর বাঁধা মঞ্চ না হলে চলে না। তার আড়ম্বর বেড়ে যাবার ফলেই তার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের দেশে যাত্রার জন্য এখনো কোনো বাঁধান স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নি, অর্থাৎ তার বিষয়-বস্তু কিংবা অভিনয়-ভঙ্গির মধ্যে যে আধুনিকতাই হোক না কেন, তার উন্মুক্ত অর্থাৎ চারদিক খোলা আসরেই তার এখনো অভিনয় হয়। সে'দিক থেকে যাত্রা কাবুকির চাইতে অনেক রক্ষণশীল। চারদিক খোলা আসরে কোনদিনই কাবুকির অভিনয় হয় নি, তার আসরের পিছনের দিকে একটি কাঠের দেওয়াল (wall)

থাকত। কিন্তু বাংলার যাত্রার আসর গোড়া থেকে আজ পর্যন্তও চারদিকই খোলা। তার চারদিক খোলা বলেই তার মধ্যে কোনো মঞ্চোপকরণ প্রথম থেকে জমে উঠ্‌তে পারে নি, কিন্তু কাবুকির মঞ্চের তিনদিক খোলা ছিল বলে একদিকের কাঠের দেওয়ালের মধ্যেই ক্রমে বিপুল মঞ্চসজ্জার আজ সঞ্চিত হয়েছে, ফলে তার আরো দুটো দিক বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। তার নিজের মঞ্চের বাইরে অভিনয় করতে হলেই পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের মতই একদিক মাত্র খোলা রাখ্‌তে হয়। তবে কাবুকির আসরে যাত্রার মতই কোনোদিনই কোনো পর্দা নেই। তবু মঞ্চের বিষয়ে যাত্রা কাবুকির চাইতেও রক্ষণশীল। আর যথাসম্ভব কণ্ঠকে সংযত করে বিপুল মঞ্চ ও রূপসজ্জার সহায়তায় কাবুকির অভিনয় হয়, যাত্রার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কেবলমাত্র তাদের কণ্ঠস্বরটি অবলম্বন করে তাদের দায়িত্ব পালন করে, সেখানে মঞ্চোপকরণের কোনো সহায়তা তারা পায় না।

যাত্রার মতই কাবুকির দর্শকেরাও একদিন মাটির উপর বস্‌ত, মাথার উপর কোনো চাঁদোয়াও থাকত না, কখনো কখনো বিশেষ অতিথিদের জন্য সামান্য চাঁদোয়ার ব্যবস্থা থাকত মাত্র। এখন টোকিও সহরের কাবুকির বাঁধা মঞ্চে স্থায়ী গৃহে আসনে বসে কাবুকি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যাত্রার দর্শকদের সে সৌভাগ্য আজো হয় নি। তার ফলে যাত্রার গ্রাম্যমান চরিত্রটি যেমন নিখুঁতভাবে রক্ষা পেয়েছে, কাবুকির তা পায় নি। গ্রাম্যমানতার মধ্যে লোক-নাট্যের যে একটি বিশেষ গুণ রক্ষা পায়, তা কাবুকির মধ্যে আর আশা করা যায় না।

যাত্রা প্রথম থেকে যেমন স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় পুরুষ দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল, কাবুকি তার পরিবর্তে স্ত্রী-চরিত্রের অভিনয় তরুণী এবং সুন্দরী নারী দিয়েই আরম্ভ হয়েছিল। এমন কি, তখন ব্যবসায়ী কাবুকির সম্প্রদায়গুলো সারা জাপান থেকে সুন্দরী তরুণীর সন্ধান করে তাদের সম্প্রদায়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার প্রয়াস পেত, বাংলা যাত্রার তার কোনো উপায় ছিল না বলে অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করবার প্রয়োজন হতো। সে কাজ খুব সহজ ছিল না, তথাপি তাদের সার্থকতা এ ক্ষেত্রে যে প্রশংসনীয় ছিল, তা কেউ অস্বীকার কর্‌তে পারবেন না। সব বিষয়ে আমরা বাঙালীকে নিন্দা এবং বিদেশীকে প্রশংসা করে থাকি, কিন্তু এই বিষয়ে সে'দিন বাঙালী-যাত্রার পরিচালকগণ যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছিলেন, তা জাপান দেখাতে পারেনি।

●

॥ কেন হিন্দুরা খ্রীস্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

অনেক হিন্দুর কথা আমার জানা আছে, তাঁরা বাইবেল পাঠের পূর্বে টমাস পেইন Thomas Paine)-এর "যুক্তির যুগ" (Age of Reason) বইখানি পড়ে নেন। একজন হিন্দু জানে যে বর্তমান শতাব্দীতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সুসমাচার পুস্তকে বর্ণিত খ্রাষ্টারেথ্-এর যীশুর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ভীষণ মতবিরোধ রয়েছে। কাজেই, সে সুসমাচারগুলিতে যীশুর ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। সে আরও জানে, বাইবেল-গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের গবেষণা প্রমাণ করেছে যে খ্রাষ্টারেথ্-এর যীশুর জীবন ও উপদেশের সঙ্গে জড়িত ঘটনাবলী সম্পর্কে যাজকীয় সুসমাচারে যা' বর্ণিত হয়েছে, সে-বর্ণনার সঙ্গে অন্যান্য উৎস-সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য নেই।

ভারতে মিশনারীরা প্রচার করে থাকেন যে "নিউ টেস্টামেণ্ট" নাকি প্রত্যাদিষ্ট অর্থাৎ ঈশ্বরের উক্তি-সম্বলিত গ্রন্থ। শিক্ষিত হিন্দুরা কিন্তু জানেন যে যীশু নিজে কিছু লিখে রেখে যান নি, তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যেও কেউ এমন কোন সুসমাচার লিখেন নি—যেটিকে গির্জা অভ্রান্ত ও ঈশ্বরের প্রত্যাদিষ্ট বাণী হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা এ বিষয়টির সঙ্গেও পরিচিত যে, বাইবেল-গ্রন্থে কিংবা তার বাইরে কোথাও যীশুর জীবন ও উপদেশের কোন সমকালীন লিখিপত্র বা বিবরণ মোটেই নেই। তারা আরও জানে যে, লেখাগুলির রচনার কালানুসারে পলের চিঠিগুলিই ছিল প্রাচীনতম লেখা। পলের নামের সঙ্গে জড়িত চৌদ্দখানি চিঠির মধ্যে কেবলমাত্র চারখানিই প্রামাণিক। সেগুলি হচ্ছে,—রোমানদের কাছে লেখা একখানি চিঠি, কোরিন্থিয়ানদের কাছে লেখা প্রথম ও দ্বিতীয় চিঠি, গ্যালেসিয়ানদের কাছে লেখা একখানি চিঠি।

আবার, পল কিন্তু যীশুখ্রীস্টকে কখনও প্রত্যক্ষ করেন নি। শুধু একবার মাত্র স্বপ্নে তিনি তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, আর একবারই মাত্র তিনি যীশুর বাণী উদ্ধৃত করেছেন,—শেষ ভোজ (last supper) স্মৃতি-উৎসব সম্পর্কে একটি প্রাসঙ্গিক কথা,—"এই পেয়ালার পানীয় হচ্ছে আমারই রক্তে নূতন চুক্তিপত্র ; যতবার তুমি তা' পান করবে, ততবার আমার স্মরণার্থেই তা' করা হবে"। গির্জার অনেক গোঁড়া যাজক এ কথা মেনে নিয়েছেন যে, সুসমাচার পুস্তকের অনেক উপদেশ ও ধর্মমত পল প্রবর্তন করেছিলেন,—পরে অবশ্য গির্জার ধর্মমতও সেগুলি মেনে নিয়েছে। পল যে খ্রীস্টের ধর্মমত প্রচার করেন নি, সে'টি একটি সুপরিচিত ঘটনা। যদি তিনি তা' করতেন, তবে তিনি একথা বলে গর্ব করতে পারতেন না যে এ্যান্টিওক্-এ (Antioch) পিটারের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁকে বাধা দিয়েছিলেন।

গির্জার ধর্মমতের যে সব অনুগামী হিন্দুদের কাছে প্রচার করেন যে 'নিউ টেস্টামেন্ট' হচ্ছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বাণী, হিন্দুরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, "ঈশ্বর যদি তাঁর বাণী প্রকাশ করতেই ইচ্ছুক, তবে তিনি সে-কার্য সম্পাদনের জন্য ইতিহাস রচনার এতগুলি বিভিন্ন লোককে অনুপ্রাণিত করবেন কেন?—মাত্র চারখানি বাদে বাকি প্রায় সব রচনাকেই বা কেন পরে জাল ও অলীক বলে জনসাধারণ বর্জন করেছিল?"

গলদেশে লিয়ন্স-এর বাজক ইরেনিয়াস্-এর সময় পর্যন্ত, তিনি ১৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ২০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন, আমরা গির্জার অনুশাসনসম্মত চারখানি সুসমাচার সম্পর্কে কিছু শুনিনি। তিনিই ছিলেন গির্জার অনুশাসনের (Church Canon) প্রকৃত প্রবর্তক। ইরেনিয়াস্-ই সর্বপ্রথম চারখানি সুসমাচারের উল্লেখ করেছিলেন। চারখানি সুসমাচার গ্রহণের পক্ষে তাঁর যুক্তি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ,—যদিও তা' সন্দেহভঞ্জক নয়। তিনি বলেছেন, "সুসমাচারের সংখ্যা চার অপেক্ষা কম-বেশী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, যেহেতু পৃথিবী চারটি চতুর্থাংশ-সমন্বিত, মৌলিক পদার্থ চারটি, ঋতু চারটি ও প্রধান বায়ু চারটি; গির্জারও চারটি স্তম্ভ থাকতে হবে; সুতরাং সুসমাচারও চারখানি হওয়াই সঙ্গত"। এই বিখ্যাত বাজকের যুক্তি কি চাতুর্যপূর্ণ!

অধিকন্তু, সুসমাচারগুলিতে এত বেশী অসামঞ্জস্য, অসঙ্গতি ও ভুলভ্রান্তি আছে যে হিন্দুদের মধ্যে কোন সমালোচক-ছাত্র বলতে পারে না যে সেগুলি অকাট্য ও ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ-বাণী। যেহেতু গির্জা এই মতবাদের সমর্থক এবং এই পুস্তকের অকাট্যতার প্রচারক, সেজন্য হিন্দুরা তাকে গির্জার মতবাদ হিসাবে বর্জন করেছে।

"অ্যাপসল্স্ ক্রীড" (Apostles' Creed) ও "টোয়েল্ভ্ আর্টিকেল্স্ অব্ ফেথ্" (Twelve Articles of Faith) দু'টিকে "নিসেনে" (Nicene) মতবাদে বজায় রেখে সম্প্রদায়িত করা হয়েছে, "রিফরমেসন্ থিয়লজি" (Reformation Theology) সম্প্রদায়ের প্রধান অঙ্গই হচ্ছে ঐ দু'টি, আর ঐগুলিকেই শেষ পর্যন্ত বর্ধিত করে "এপিস্কোপাল" (Episcopal) মতবাদের উনচল্লিশটি অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে। হিন্দুরা যখন "অ্যাপসল্স্ ক্রীড" (যীশুর শিষ্যদের ধর্মমত) বা "টোয়েল্ভ্ আর্টিকেল্স্ অব্ ফেথ্" (বিশ্বাসের বাদশটি অনুচ্ছেদ) পাঠ করে তখন তা'রা দেখে, সেখানে একগুচ্ছ মতবাদ আছে যেগুলিকে সমর্থন করা যায় না,—না বিজ্ঞানের সাহায্যে, না দর্শনের সাহায্যে,—সেগুলি যুক্তিগ্রাহ্যও নয়। অথচ সেগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হোক বা না হোক, সেগুলিকে মেনে নিতে হবেই। কিন্তু হিন্দুর মন এ সকল "বিশ্বাসের অনুচ্ছেদ"-এর একটিকেও সত্য হিসাবে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়,—যদি না তা' যথেষ্ট যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও দর্শন দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে। একজন হিন্দু বলে থাকে, ঈশ্বর যখন আমাদেরকে যুক্তি, বুদ্ধি ও দীশক্তি দিয়েছেন আর সেগুলিকে ব্যবহারের স্বাধীনতাও দিয়েছেন, তখন অন্য কোন লোকের কথার প্রামাণিকতাকে অন্ধভাবে মেনে নিলে আমরা ঈশ্বরের অভিপ্রায়-বিরোধী কাজই করব। আমরা অবশ্যই প্রশ্ন করব, তর্কবিজ্ঞানের-খপরে প্রতিটি দাবিকে সঠিক যুক্তির-আগুনে আমরা অবশ্যই যাচাই করব। কাজেই, একজন

হিন্দু বলে, যে-কোন "বিশ্বাসের অনুচ্ছেদ" (article of faith) গ্রহণের পূর্বে আমরা অবশ্যই সেগুলিকে পরীক্ষা করব।

ঐ মতবাদের প্রথম অনুচ্ছেদটি-ই একজন হিন্দুর কাছে একটা প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক ; কারণ সে অংশে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব। জগৎসৃষ্টি সম্পর্কে 'জেনেসিস্'-এ বলা হয়েছে, এক অতি-মহাজাগতিক সত্তা দ্বারা শূন্য থেকে ছ' দিনে এই বিশ্ব সৃষ্ট হয়েছিল। একজন হিন্দুর কাছে কিন্তু এ তত্ত্ব অতি উদ্ভট ও ছেলেমানুষী বলে মনে হয়, কারণ জন্মাবধি সে বিবর্তনবাদ বিশ্বাস করেই বড় হয়েছে,—তার কাছে এ জগৎ হচ্ছে ক্রম-বিবর্তনের পরিণতি-স্বরূপ। এই জগৎ ৬০০০ বৎসর পূর্বে সৃষ্ট হয়েছে, এই সূর্য সৃষ্ট হবার আগেই এই পৃথিবীর উৎপত্তি হয়েছিল, —হিন্দুদের মন এসব কথা বিশ্বাস করতে পারে না। হিন্দুরা বলে থাকে, এরকম কাহিনীকারকে, তা' তিনি দেবতাই হোন আর মানুষই হোন, এ সম্পর্কে আরও অধিক পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন ছিল, এজন্যই কোন কিছু না থেকে আপনা-আপনি জগৎসৃষ্টি বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে ওঠে নি। প্রাচীন ও আধুনিক হিন্দু ঋষি ও দার্শনিকদের প্রচুর পরিমাণ রচনাবলীর মধ্যেও আপনারা কোন কিছু না থেকে আপনা-আপনি জগৎসৃষ্টি কিংবা অপার মহাজাগতিক কোন কিছু থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে,—এমন তত্ত্ব খুঁজে পাবেন না। গির্জার ধর্ম এরকম সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং তা' প্রচারও করে, হিন্দুরা এটিকে একটি উদ্ভট মতবাদ বলে বর্জন করে।

যীশুখ্রীস্টই ঈশ্বরের একমাত্র জাত-পুত্র,—এ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে উক্ত মতবাদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ রচিত হয়েছে। এ অনুচ্ছেদটি তার সংরক্ষণের কথা বাদে হিন্দুদেরকে আর নূতন কিছু বলে না। ঈশ্বরের অবতারতত্ত্ব কিংবা অপৌরুষের বাণী,—এ হচ্ছে ভারতীয়-আর্য মতবাদ ; আর হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে এরকম অবতার অতীতে অনেক হয়েছিলেন এবং ভবিষ্যতেও অনেক হবেন। "অপৌরুষের বাণী", "ঈশ্বরের পুত্র" প্রভৃতি কথা ভারত থেকে গ্রীসে যায়। সেগুলি প্রকাশ পায় হেরাক্লিটাস, প্ল্যাটো, নিও-প্ল্যাটোনিস্ট প্রভৃতি আদি গ্রীক দার্শনিকদের রচনায় ; ফিলো এবং তাঁর অনুগামীদের লেখায়,—চতুর্থ সুসমাচার লেখক —শেষ পর্যন্ত গির্জাও সে সকল বিষয় তার প্রাথমিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করেছে।

●

॥ হিমালয়ের পথে পথে—উত্তরকাশী ॥

শ্রীবিশ্বজিৎ দাস

ইচ্ছে করেই পায়ে হাঁটা পথকে বেছে নিয়েছি। অলকানন্দার ধারাকে পাশে রেখে নেমে এসেছি গোবিন্দঘাট। বদ্রীনাথ থেকে গোবিন্দঘাটের দূরত্ব ২৩ কিলোমিটারের মত। এখানে ছোট্ট একটা ঝরণা এসে মিশেছে অলকানন্দার সঙ্গে। এখান থেকেই পথ গিয়েছে হেমকুন্ড আর ভ্যালী অব ফ্লাওয়ার্সের দিকে।

থাকবার জন্য গোবিন্দঘাটে ছোট্ট একটা ধর্মশালা রয়েছে; আর রয়েছে গুরুদোয়ারা। মাথার রুমাল বেঁধে অনায়াসেই এই গুরুদোয়ারায় থাকার অনুমতি মেলে। খাওয়াদাওয়াও নেহাৎ মন্দ নয়।

আমি যে ঘরে রয়েছি সে ঘরে রয়েছে হল্যাণ্ডের এক ইতিহাসের ছাত্র। একটা ছোট্ট রুকস্যাকের মধ্যেই তার রাজ্যের সম্পত্তি। চোখে পড়ল সেখানে একটা 'হিন্দি মেইড্ ইজি' বই রয়েছে; আর রয়েছে একটা ছোট্ট গীতা আর বুদ্ধদেবের উপদেশাবলী। গলায় আর হাতে তুলসীকাঠের মালা।

পরের দিন, বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি যোশীমঠের দিকে। ভগবান শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত চারটি মঠের এটি একটি। তাই এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও বড় কম নয়। চলেছি পায়ে হেঁটে, তীর্থরেণু গায়ে মেখে। দূরত্ব গোবিন্দঘাট থেকে ১৯ কিলোমিটার। ভেবেছিলাম আজকেই পৌঁছে যাবো। কিন্তু বাদ সাধলো আকাশ। দুপুর হতে না হতেই আকাশ সাদা মেঘে ছেয়ে গেল; চারিদিক ঢেকে গেল সাদা ধোঁয়াশায়। পাহাড়ের বুক থেকে সাদা মেঘের ধোঁয়া সারা আকাশ ছেয়ে ফেললে।

তবু এগিয়ে চলেছি। সাবধানে। পথ কখন কোনদিকে বাঁক নিয়েছে ঠিক মতো বুঝতে না পারলেই সোজা খাদে গিয়ে পড়বো। বাঁদিকে বড় পাথরটার ওপর বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি এমন সময় দুটো পাহাড়ী ছেলে গ্রাম থেকে এসে হাজির; আমার সাথে দিব্যি গল্প জুড়ে দিলে; তাদের কাঁচড় থেকে আমাকে গ্রামও খাওয়ালে বেশ কয়েকটা। তারপর টুপটাপ করে দু'ফোঁটা বৃষ্টির জল এসে গায়ে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলে দুটো অদৃশ্য হোলো এক ছুটে। আমিও আশ্রয়ের আশায় হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে চললাম।

কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে। এক হাত দূরের জিনিষও দেখা যায় না, এমন অবস্থা; বৃষ্টির বেগও বেড়েছে। প্রায় ভিজে সপসপে হয়ে গেছি। ঈশ্বরের আশীর্বাদ—বাঁ দিকেই চোখে পড়লো একটা বড়সড় পাহাড়ের কাটল। কাটল না বলে গুহা বললেই ভালো হয়। তারই ভেতর ঢুকে পড়লাম। বৃষ্টির হাত থেকে তো বাঁচি।

কতক্ষণ বসে ছিলাম জানি না; একটা কুকুর এসে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে আমার পায়ের কাছে। বড় বড় লোমওয়ালা পাহাড়ী কুকুর। বাইরেটাও আস্তে আস্তে অন্ধকার

হয়ে আসছে। বৃষ্টির কিন্তু বিরাম নেই। একটু ভয় ভয়ও করতে লাগলো। এমনি ভাবে একলা পাহাড়ের কোকরে থাকতে হবে ভেবে ঐ শীতেও গলা শুকিয়ে উঠলো।

• • •

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেরিয়ে পড়েছি। ঘণ্টাখানেক হাঁটার পরই যোশীমঠে এসে পৌছলাম।

যোশীমঠ থেকে পথ গিয়েছে তিব্বতের দিকে। নিতিপাস পেরিয়ে কৈলাস আর মানস সরোবরেও যাওয়া যায় এখান থেকে। কিন্তু বর্তমানে সে পথ সাধারণ যাত্রীদের জন্য বন্ধ।

অত্যন্ত দ্রুততার শঙ্করাচার্যের মন্দিরটি দেখে বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে পৌছলাম। আপাততঃ কোন বাস নেই; একটা মিলিটারী কনভয় আমাকে চামোলী পর্যন্ত নিয়ে যেতে রাজী হোলো। চামোলী থেকেও বাস প্রায় মেলেই না বলতে গেলে। ভরসা কেবল মিলিটারী ট্রাক। তাও প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর রুদ্রপ্রয়াগগামী একটা মিলিটারী ট্রাকের দেখা মিললো। অপেক্ষমান যাত্রীরা তাতেই উঠে পড়লেন। সেই সঙ্গে আমিও।

রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা আর মন্দাকিনী এসে মিশেছে। সঙ্গমের কাছেই 'কেদারবদ্রী রেষ্ট হাউস'। সেখানেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে নিয়েছি। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী এখানেই আমার অপেক্ষা করার কথা। কারণ বদ্রীনাথ দর্শন সেরে চিরঞ্জীবদারা এই রুদ্রপ্রয়াগেই ফিরে আসবেন। মনে পড়েছে একদিন কেদার-যাত্রার প্রাক্কালে এই রুদ্রপ্রয়াগেই তাঁরা আমাকে বিদায় জানিয়েছিলেন, আর আজ এটাই হতে চলেছে আমাদের মিলনক্ষেত্র।

এসে গেছেন চিরঞ্জীবদারা; বিধ্বস্ত অবস্থা; তবু আমায় বললেন—'কালকেই কিন্তু বেরোবো'। আমি বললুম, 'একদিন বোধহয় বিশ্রাম নিলে ভালো করতেন'। বৌদি বললেন—'না, না; পাহাড়ে এসেও আবার বিশ্রাম। পাহাড়ে ঘোরাটাই তো আমাদের শহুরে জীবনের একটা বিশ্রাম।'

বেশ। তবে তাই হোক। এই নুন। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে টিহরী। পথের দৃশ্য এবার আলাদা। দু'পাশে পাহাড়। কাউ আর চির গাছের অরণ্য; দূরে দূরে গম চাষের ক্ষেত; কোথাও বা দশ বারোটি গৃহসমূহ। একে বোধহয় অরণ্য বললে ভুল বলা হয়; এর সৌন্দর্য উদ্যানের চেয়েও বেশী; যেন দৃপ্ত সৈনিকের ভঙ্গীতে প্রতিটি বৃক্ষ সৃষ্টিকর্তার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করছে। ঈশ্বরের কোন সৃষ্টি না আশ্চর্য!

টিহরীতে যেমন গরম আর তেমনি জলের কষ্ট; তবু তারই মধ্যে আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে; শ্রীনগর থেকে যে বাস আসবে, তাতেই আমাদের উঠতে হবে। লক্ষ্য উত্তরকাশী।

বাসে যখন উঠলাম তখন প্রায় ১টা বাজে। ভাগীরথীকে পাশে রেখে বাস এগিয়ে চলেছে। পথের উচ্চতা বাড়ছে, বাসের গতিও তাই শ্লথ। এমন ভাবে পথ চললে আজকে উত্তরকাশী পৌছতে পারবো কিনা সন্দেহ। শেষ পর্যন্ত এক সময় বাস থেমেই গেল। কি ব্যাপার? দৃষ্টি গিয়ে পড়লো সামনের থেমে থাকা দুটো বাস পেরিয়ে আরও সামনে।

ধ্বস নেমেছে। ড্রিলিং-এর কাজ চলছে। পাথর কাটিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করা হবে। অনেকেই নেমে পড়েছেন বাস থেকে। আমরাও নামলাম। বাঁদিকে এবড়ো খেবড়ো পাহাড়। পাথরগুলো এমন ভাবে আটকে রয়েছে যেন যে কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। ডানদিকে অনেক নীচে ভাগীরথী। আমরা যন্ত্রতন্ত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বৌদি বার বার সাবধান করছেন—'এই, ওদিকে যেয়ো না ; এদিকে এসো ; ওপাশটা ঢালু।' সে যাই হোক! রাস্তা পরিষ্কার হতে অন্ততঃ ঘন্টা দুয়েক বাকী। আমরা ঝকঝকে পিচঢালা রাস্তার উপরেই বসে পড়লাম গোল হয়ে। চিরঞ্জীবদার ইচ্ছে ছিল মিনি ষ্টোভটা বের করে চা করার। কিন্তু বৌদির অমতে তা আর হোলো না। কীর্তিদা তাঁর টব থেকে মাখন, পাউরুটি আর কিছু ফল বার করলেন। ডিনামাইট ফাটিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলা হোলো বিরাট পাথরটাকে। তারপর সবাই মিলে সেই টুকরোগুলোকে গড়িয়ে ফেলে দিতে লাগলাম, নীচে, ভাগীরথীর বুকে।

সন্ধ্যে প্রায় সাতটা নাগাদ এসে পৌঁছলাম উত্তরকাশী। তখন পাহাড়ে পাহাড়ে জ্বলে উঠেছে আলোর মালা।

* * *

বাসষ্ট্যাণ্ডের উল্টোদিকেই Travellers' Lodge ; ব্যবস্থা খুবই ভালো। আমরাও সেখানেই রয়েছি।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে ; গরমও খুব বেশী নয়, ঠাণ্ডার প্রকোপও নেই ; বাইরে বাগানে বসে আকাশকে পর্যবেক্ষণ করছি। ঝকমক করছে তারার দল। 'আজি কত তারা জ্বলে আকাশে।' কলকাতার বসে এত তারার হদিশ মেলাই ভার।

দূরে মানেরী বাঁধ তৈরীর কাজ চলছে। তারই যান্ত্রিক শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে।

মন্দির বেশ কয়েকটি আছে উত্তরকাশীতে। টিহরীরাজের তৈরী বিশ্বনাথ মন্দির, শক্তি মন্দির ; তাছাড়াও রয়েছে পরশুরাম মন্দির।

স্কন্দপুরাণে আছে জমদগ্নি ঋষির স্ত্রী রেণুকা একসময় গন্ধর্বরাজ চিত্ররথের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। টের পেয়ে ঋষি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে মাতৃহত্যার আদেশ দিলেন। কিন্তু সে রাজি হোলো না। ফলে ক্রুদ্ধ পিতার অভিশাপে সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়ে গেল। জমদগ্নি তখন তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পরশুরামকে এই আদেশ করলেন। পিতার আদেশ শিরোধার্য করে পরশুরাম মাতৃহত্যা করলেন। তৃপ্ত হয়ে ঋষি বললেন—'বৎস। তোমার পিতৃভক্তিতে আমি মুগ্ধ। তুমি বর প্রার্থনা করো।' পরশুরাম মায়ের পুনর্জীবন প্রার্থনা করলেন। চমকিত পিতা অপলক নেত্রে দেখলেন তাঁর মাতৃভক্ত সন্তানকে। রেণুকার প্রাণদান করে জমদগ্নি তপস্যায় বসলেন। এই উত্তরকাশীই সেই অলৌকিক ঘটনার নীরব সাক্ষী। তাই এখানে রয়েছে পরশুরামের মন্দির ; সাদা ঘোড়ার পিঠে আসীন পরশুরাম।

Travellers' Lodge-এর পাশের রাস্তা দিয়ে কিছুটা এগোলেই একাদশ রুদ্র শিবের মন্দির। নির্জন, নিঃস্তব্ধ পরিবেশ। চিরঞ্জীবদা আম নিয়ে এসেছেন মহাদেবকে অর্পণ করবেন বলে। রুদ্র শিবের লাগোয়া অম্বিকা দেবীর মন্দির।

কথিত আছে এই উত্তরকাশীতেই নাকি কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ হয়েছিল। মহাভারতের এমনিতরো কত ঘটনাই না ছড়িয়ে আছে হিমালয়ের পথে পথে।

এসে পৌঁছেছি শক্তি মন্দিরে। মন্দিরের ছাদ ভেদ করে অনেক উঁচু পর্যন্ত উঠে গেছে একটি শ্বেতপাথরের ত্রিশূল। এই ত্রিশূল নাকি দেবাসুরের যুদ্ধের সময়ের।

মিঃ লাহিড়ী দেখি মন্দির প্রদক্ষিণ করতে শুরু করেছেন। তিনবার প্রদক্ষিণের পর চিরঞ্জীবদাকে জিজ্ঞেস করলেন—'আচ্ছা। কোনদিক থেকে কোনদিকে প্রদক্ষিণ করতে হয়?' চিরঞ্জীবদা ভারী গম্ভীর হয়ে বললেন—'সম্ভবতঃ উত্তর থেকে দক্ষিণে'। মিঃ লাহিড়ী চিন্তিত হয়ে বললেন—'কিন্তু আমি যে দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঘুরলাম।' চিরঞ্জীবদা কোন গূঢ় মত প্রকাশ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধা দিলাম আমি। বললাম—'ব্যাপারটা তো একই; আপনি তো গোল হয়ে ঘুরছেন। এর মধ্যে আবার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম আসছে কোত্থেকে?'

ইচ্ছে ছিল জতুগৃহ দেখতে যাবো। কারণ এই সেই বারণাবত, যেখানে দুর্যোধনের পরামর্শে পুরোচন তৈরী করেছিল এই জতুগৃহ। ইচ্ছে ছিল পাণ্ডবদের পুড়িয়ে মারার। কিন্তু বিদুরের চেষ্টায় রক্ষা পেলেন পাণ্ডবেরা। আর কুচক্রী পুরোচনই পুড়ে মরলো সেই জতুগৃহে।

দ্বাপরের ক্ষত্রিয়দের রাজ্যলোভের ভ্রাতৃহন্তার প্রচেষ্টার সাক্ষী স্বরূপ সেই বারণাবতই আজকের উত্তরকাশী। জতুগৃহের অবস্থানের সম্ভাব্য স্থানটিকে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। কিন্তু দূরের পথ। কয়েক অক্ষিস পেরিয়ে, আল ধরে হেঁটে তবেই সেখানে পৌঁছান যাবে।

সুতরাং ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই।

তার চেয়ে বরং গঙ্গার ঘাটেই স্নানটা সেরে নেওয়া যাক। উত্তরবাহিনী তরঙ্গিনী গঙ্গা। গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সে জায়গার নামই কাশী। যেমন বারাণসী। তেমনি এই উত্তরকাশী। পুণ্যতোয়া গঙ্গার অমৃতধারা আমাদের যেন নবজীবন দান করে। আমরা এগিয়ে চলি নতুন পথের সন্ধানে। গঙ্গার উৎস সন্ধানে গঙ্গোত্রী পথে।

●

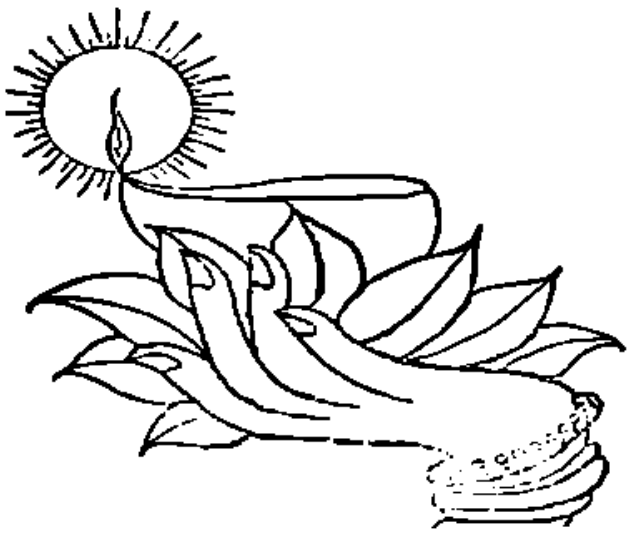

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(চার)

অভিন্ন আকারের বহুসংখ্যক সিরামিক্‌স্ ঢালাই পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে হলে ছাঁচ (mould) এর সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। শ্রীগুরচরণ সিংএর মতে সিরামিক্‌স্‌এ ছাঁচে ঢালাই পদ্ধতির প্রয়োগ আনুমানিক ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে য়ুরোপে প্রচলিত হয়। এই ছাঁচ প্রধানতঃ তৈরী করা হয় প্লাষ্টার অব্ প্যারিস্‌এ। কখনো কখনো অবিশ্যি পোড়ামাটির ছাঁচও ব্যবহার করা হয়। প্লাষ্টার অব্ প্যারিস্‌এ তৈরী ছাঁচ কিছুটা নরম এবং হালকা হয়ে থাকে। সে তুলনায় পোড়ামাটিতে তৈরী ছাঁচ হয় অপেক্ষাকৃত কঠিন। সাধারণ ক্ষেত্রে—অর্থাৎ মসৃণ তল (surface) বিশিষ্ট সিরামিক্‌স্‌এর আঁদরা (model) এবং ছাঁচ প্লাষ্টারেই তৈরী করা হয়। তবে উচ্চাবচ কিংবা খোদিত অলংকরণযুক্ত সিরামিক্‌স্‌এর আঁদরার ছাঁচ পোড়ামাটিতে তৈরী করাই সুবিধেজনক। কারণ পোড়ামাটিতে ছাঁচ তৈরী করলে ওই অলংকরণের সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা ভালোরকম বজায় থাকে। তাই পোড়ামাটির ছাঁচে ঢালাই করা অলংকৃত সিরামিক্‌স্‌এর মুদ্রণও হয় নিখুঁত এবং পরিপাটি। তবে প্লাষ্টারের ছাঁচএর তুলনায় পোড়ামাটির ছাঁচএর শোষকতা কম হওয়ায় ঢালাইকরা তরল সিরামিকমণ্ডের জলীয় অংশ শোষণে সময় অপেক্ষাকৃত বেশি লাগে। তাই সিরামিক্‌স্ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্লাষ্টার-ছাঁচএর তুলনায় পোড়ামাটির ছাঁচ অনেক বেশি সংখ্যায় তৈরী রাখতে হয়। সেজন্যে ছাঁচ তৈরীর খরচও বেশি পড়ে যায়। এই কারণেই সিরামিক উৎপাদনকেন্দ্রগুলোতে সাধারণতঃ প্লাষ্টারের ছাঁচই ব্যবহার করা হয়।

প্লাষ্টার তৈরী হয় জিপসাম্ (gypsum) থেকে। জিপসাম্ হলো একধরণের নরম পাথর ; দেখতে সাদা মার্বেলের মতো হলেও মার্বেলের মতো শক্ত নয়। ছুরির ফলা কিংবা পেরেকের সাহায্যে জিপসাম্‌এর ওপর সহজেই গভীরভাবে আঁচর কাটা যায়। জিপসাম্‌এর বড়ো বড়ো খণ্ডগুলোকে ক্রাশার যন্ত্রে ছোটো ছোটো টুকরোয় ভেঙে নেওয়া হয় এবং ওই টুকরোগুলোকে ১৮০° থেকে ১৯০° সেন্টিগ্রেড্ উত্তাপে চুল্লীতে পোড়ানো হয়। পোড়াবার

পর জিপসাম্ আরও নরম হয়ে পড়ে। এবারে পেষণযন্ত্রের মধ্যে ফেলে জিপসাম্ গুঁড়ো করে ফেলা হয়। এই গুঁড়ো বেশ মিহি হওয়া দরকার। একশো মেশ্এর তারের জালের (যে-জালের একবর্গ ইঞ্চিতে একশোটি ফুটো থাকে) ওপর ঢেলে দিলে জিপসাম্এর গুঁড়ো যদি ওই ফুটো দিয়ে গলে তলায় পড়ে যায়, তবেই বোঝা যাবে গুঁড়ো যথেষ্ট মিহি হয়েছে। জিপসাম্এর এই গুঁড়োকেই বলা হয় প্লাষ্টার।

প্লাষ্টারএর যে কেবলমাত্র সিরামিক্স্এর ছাঁচই তৈরী করা হয় তা নয়, সিরামিক্স্এর আঁদরাও তৈরী হয়। প্লাষ্টার জলশোষক হওয়ায় প্লাষ্টারএ জল মিশিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে প্লাষ্টার জল শুষে নিয়ে জমাট বেঁধে যায়। জমাটবাঁধা অবস্থায়ও প্লাষ্টারের জলশোষকতা কিছু বজায় থাকে। তাই শুকনো প্লাষ্টারের ছাঁচে জলমেশানো তরল সিরামিকমও ঢেলে দিলে অল্প সময়ের মধ্যেই তরল সিরামিকমতের জলীয় অংশ ওই ছাঁচ শুষে নেয় এবং ঢালাই করা সিরামিক্স্ ছাঁচ থেকে আলগা হয়ে যায়।

সিরামিক্স্এর আঁদরা অথবা মডেল প্লাষ্টারের বদলে সাধারণ মাটিতেও তৈরী করা হয়। তবে ওই মাটি আঁঠালো ও নমনীয় হওয়া দরকার। সাধারণ মাটির আঁঠালোভাব এবং নমনীয়তা উদ্ভিদ কিংবা যোজিত অলংকারযুক্ত সিরামিক্স্এর আঁদরা তৈরীতে সুবিধেজনকভাবে কাজে লাগানো যায়। মাটিতে আঁদরা তৈরী করতে হলে যে-জিনিষগুলোর দরকার তা হলো, আঁঠালো মাটি, প্রয়োজনমতো চাঁছবার জন্যে বাঁশের কিংবা কাঠের হাতল-লাগানো তারের 'স্ক্রেইপার' (scraper), কাঠ কিংবা বাঁশ তৈরী চ্যাপ্টা ও গোলাকৃতি কয়েকটি বিভিন্ন মাপের 'চেরি'—যা দিয়ে মাটিতে চাপ প্রয়োগ করে গড়ন ফুটিয়ে তোলা যায়, একটি মাঝারি সাইজের ছুরি এবং লোহা কিংবা কাঠের তৈরী একটি চাকা। এই চাকার ওপর বসিয়েই মাটিতে মডেলের আকার দেওয়া হয়ে থাকে। দরকারমতো চাকাটিকে যাতে এদিকে ওদিকে ঘোরানো যেতে পারে সেজন্যে চাকাটি সাত-আট ইঞ্চি লম্বা একটি লৌহদণ্ডের মাথায় বসানো থাকে আনুভূমিকভাবে। লৌহদণ্ডটির তলায় থাকে একটি ভারি ধাতবখণ্ড—যাতে লৌহদণ্ডটি চাকার ওজন শীর্ষে নিয়েও খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

এই চাকার ওপর প্লাষ্টার জমিয়ে প্লাষ্টারের জমাটবাঁধা তাল ছুরির সাহায্যে কেটে সরু ও পাতলা করাত (hacksaw blade) দিয়ে চেঁছে প্রয়োজনমতো মডেলের আকার দেওয়া যেতে পারে। তবে বড়ো আকারের সিরামিক্স্এর মডেল অথবা আঁদরা সাধারণতঃ 'জিগার-জলি' যন্ত্রে তৈরী করা হয়। জিগার-জলি (jigger-jolley) যন্ত্রের জিগার এবং জলি অংশ দুটো আলাদা হলেও মডেল তৈরীতে যুক্তভাবেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জিগার যন্ত্রটি গ্রামীন মৃৎশিল্পীদের চাক্-এর সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। ভারিকাঠের পাটাতনে লম্বভাবে স্থাপিত লৌহদণ্ডের মাথায় আনুভূমিকভাবে যুক্ত থাকে আট থেকে দশ ইঞ্চি ব্যাসের একটি লোহার চাকা। দণ্ডটি ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে ঘোরানো যায় এবং দণ্ডটি ঘোরালে চাকাটিও ঘুরতে থাকে। দণ্ডটির তলার দিকে লাগানো একটি ব্রেকএর সাহায্যে চাকার ঘূর্ণন বন্ধ করা যায়। যে কাঠের টেবিলে জিগার স্থাপিত হয় সেই টেবিলের ওপরই জিগারের

একটু পেছনে জলি যন্ত্রটি বসানো থাকে। লম্বভাবে স্থাপিত একটি লৌহদণ্ডে আর একটি লোহার দণ্ড কীলকের সাহায্যে যুক্ত থাকে কোণাকুণিভাবে। এই দণ্ডটি (কোণাকুণিভাবে বসানো)-র একপ্রান্ত জিগারের চাকাটি থেকে খানিকটা ওপরে থাকে এবং অপর প্রান্তটিও যুক্ত থাকে একটি ভারি লোহার চাকা অথবা বল—যেটির ওজনের ভারে প্রান্তটি ঝুলে থাকে নীচের দিকে। উত্থিত প্রান্তটিতে থাকে একটি কাঠের হাতল—যাতে চাপ দিলে দণ্ডটি নীচের দিকে নেমে চাকাটির ওপরে আনুভূমিক অবস্থানে আটকে যায়। কাঠের হাতল থেকে কিছুটা পেছনে প্রায় দেড় থেকে দুফুট লম্বা এবং দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি চওড়া একটি লোহার পাতা স্ক্রু'র সাহায্যে লৌহদণ্ডটিতে লাগানো থাকে। স্ক্রু আলগা করে প্রয়োজনমতো লোহার পাতাটিকে সামনে অথবা পেছনে সরানো যেতে পারে। জিগারের চাকার ওপর প্লাষ্টার জমিয়ে চাকাটি মোটরের সাহায্যে ঘুরিয়ে দিলে জমানো প্লাষ্টারের তালটিও ঘুরতে থাকে। এবারে জলির হাতকে চাপ দিয়ে কোণাকুণি দণ্ডটিকে আনুভূমিক অবস্থানে এনে দণ্ডে লাগানো লোহার পাতটিকে প্লাষ্টারের জমাট তালটি থেকে কয়েক ইঞ্চি দূরে সরিয়ে স্ক্রু এঁটে দেওয়া হয়। পাতটি দণ্ডটি থেকে সমকোণে লম্বভাবে ঝুলতে থাকে। বাঁ হাতে জলির হাতলটি ধরে ডান হাতে ছুরি অথবা পাতলা করাতের চাপ কোলানো লোহার পাতের ওপর রেখে ঘূর্ণমান প্লাষ্টারের জমাট তালটি কেটে এবং চেঁছে প্রয়োজনমতো আকারের মডেলের রূপ দেওয়া হয়।

দিবাকর সেনরায়

●

॥ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের স্মৃতি ॥

শ্রীসুকুমার সান্যাল

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল অর্থাৎ ভগিনী নিবেদিতার জন্মতিথি পালিত হল ২৮শে অক্টোবর তাঁর জন্মদিন হচ্ছে ১৬ই নভেম্বর, ভগিনী নিবেদিতার সম্বন্ধে কিছু লেখা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবেনা, ভারতাত্মা নিবেদিতা শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন দার্জিলিং-শহরে, দিনটি ছিল ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর।

মাস কয়েক পূর্বে দার্জিলিং শহরের শ্মশানে গিয়েছিলাম ভগিনী নিবেদিতার সমাধিতে প্রণাম জানাতে এবং সেই সময়ে মনে মনে স্থির করেছিলাম যে সমাধিবেদীতে নিবেদিতার একটি ছবি টাঙিয়ে দেবো। বেনুড় মঠ-হতে একটি বড় আকৃতির ছবি সংগ্রহ করলেও সময় সুযোগের অভাবে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করা হয়ে উঠেনি। সুযোগ এল ঢেউসী-পর্বের দিনটিতে। নেপালীরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনটিকে একটি পবিত্র উৎসবের দিন মনে করেন, আর সুরে সুর মিলিয়ে গান করেন 'কিলিমিলি কিলিমিলি ঢেউসীরে'। বোধহয় মরুভূমির রাখী আর হিমালয়ের ঢেউসী উৎসব লোকাচারের দৃষ্টিতে একই সুরে বাঁধা।

দার্জিলিং-শহরে যখন পৌঁছলাম তখন ঘড়িতে বাজে বেলা দেড়টা। উৎসবের দিন বলে গাড়ী দুষ্প্রাপ্য। শ্মশানের ওরালো আর উকালো বাটোর (অর্থাৎ নীচুর দিকে যাওয়া

আর উপর দিকে ওঠা) কথা ভেবে মনটা প্রথমে দমে গেল, কারণ শহর থেকে প্রায় দুই ফার্লঙ্গ আঁকাবাঁকা রাস্তা নেমে গেছে হাজার দেড়েক ফুট নীচে। আবার উঠতেও তো হবে, দম ফুরিয়ে যাবে নাতো ? ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে ছবিখানি ও কিছু ফুল নিয়ে জোর কদমে রওনা হলুম। তিন কোয়ার্টারের মধ্যে শ্মশানের এলাকায় পৌঁছে গেলুম।

মাথার উপর পরিষ্কার সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিন। বরফ ঢাকা রূপালী কাঞ্চনজঙ্ঘা মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ পেয়ে ঝল ঝল করছে। ধারে কাছে ছেঁড়া মেঘের চিহ্নও নেই, শহরের রাজভবন-সমেত বেশ কিছুটা অংশ এখান হতে দৃষ্টিপথে আসে। অদূরে সুতোর মতো রোপওয়ের লোহার তার নীচের দিকে নেমে গেছে। শ্মশানে নিস্তব্ধ প্রহরীর কাজ করছে পাইন বৃক্ষশ্রেণী। উপত্যকার শেষপ্রান্তে ঢালু খাদ। খাদের ওপার হতে শুরু হয়েছে সবুজ সুউচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়ের ঢেউ, কে জানে কোথায় শেষ মিশেছে !

ক্রমশঃ সিষ্টারের সমাধিবেদীর কাছে পৌঁছে গেলুম। সমাধিটি আয়তাকার দশফুট লম্বায় এবং চওড়ায়। আট ফুট জায়গার মধ্যে সীমাবদ্ধ, চারিপাশে সিমেন্টের রেলিং দিয়ে ঘেরা এবং মাথায় গম্বুজাকারের মতো ছাদ উঠানো হয়েছে—যার উচ্চতা হবে সাত আট ফুটের মত। কোন চাকচিক্য নেই, নেই কোন আড়ম্বর। চিতার উপর যিনি এই স্মৃতিস্তম্ভটি তৈরী (নির্মাণ) করে দিয়েছেন তিনি চিরপূজ্য। শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ—শ্রীরামকৃষ্ণেরই অন্যতম অন্তরঙ্গপার্ষদ। সমাধি বেদীর ভিতরের শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা "Here reposes the ashes of Sister Nivedita (Margaret Elizabeth Nobel) who gave her all to India 13th October 1911." অপর ফলকটির ভাবার্থ এই "এখানে সিষ্টার নিবেদিতা যিনি সমকালীন নারীজাতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এখানে তাঁর দেহাবশেষ ভস্মীভূত ১৩ই অক্টোবর ১৯১১"। ছাদের কার্নিশ-ঘিরে তিনটি নাম না-জানা ফুল প্রস্ফুটিত ছিল। আমার মনে হয়েছিল ফুল-তিনটী যেন অভ্রান্ত প্রহরী হয়ে শ্রীশ্রীসারদাদেবীর আদরের খুকী, আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতাকে সস্নেহ দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে চলেছে।

আমার পক্ষে একাকী ছবিটি দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে দেওয়া সত্যই কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে দু'টী নেপালী-যুবক এসে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছবিটি সুন্দরভাবে গম্বুজের ভিতর দিকে টাঙ্গিয়ে দিলেন,—যাতে ঝড়-বৃষ্টিতে ছবিটির কোন ক্ষতি না হয়। শুধু তাই নয়, যুবকদুটি হাঁটুমুড়ে নতজানু হয়ে প্রণাম জানালেন মহাপ্রাণা নিবেদিতাকে আমার সাথে। ধূপ জ্বেলে দেওয়া হল, ছবিতে ফুল দেওয়া হল। আমার মনের বোঝা হাল্কা হয়ে গেল।

দার্জিলিং-শহরে যখন ফিরে এলুম তখন পূর্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে পাড়ি দেবার উদ্যোগ করেছেন। মনেই হলনা যে, এতখানি ওকালো রাস্তা, (পথ) ভেঙ্গে উপরে উঠে এসেছি। কে যেন আমার হাত ধরে সেদিন শহরে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। এলাম উপরে, কিন্তু মনের মধ্যে বয়ে চলেছিল আনন্দভরা ভাবের প্রবাহ। প্রণাম জানালাম শেষে মেঘভরা আকাশের দিকে চেয়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে। সেদিনের কথা জাগরূক থাকলো ভবিষ্যৎ-জীবনে স্মৃতিচারণের জন্য।

Phone : 24-2207 08

With Best Complimants from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও [illegible]য়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

—হাওড়া—
কুষ্ঠ-কুটীর

সর্বজনসমাদৃত শ্রেষ্ঠ চিকিৎসালয়

অসাড়কুষ্ঠ, গলিতকুষ্ঠ, বাতরক্ত, গাত্রে নানাবর্ণের দাগ, হাত, পা, মুখ, কান প্রভৃতি ফোলা, স্পর্শশক্তিহীনতা বা অসাড়তা, স্নায়ুসমূহের স্থূলতা, একজিমা, সোরাইসিস্ ও দূষিত ক্ষতাদি এই স্থানের চিকিৎসালয়ে অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়ী আরোগ্য হয়।

ধবল বা শ্বেত রোগের জন্য যাঁহারা সর্বচিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা "হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীরে" চিকিৎসিত হউন। এখানকার সুনিপুণ চিকিৎসায় অল্পদিনের মধ্যেই ধবলের সাদা দাগ চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং আর পুনঃপ্রকাশ হয় না।

ঠিকানা : হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর পি, বি, ৭, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২৩৫৯)

শাখা : ৩৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা (মির্জাপুর ষ্ট্রীটের মোড়)

হোমিওপ্যাথিক

। ঔষধ ।

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

। পুস্তক ।

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পো: নবদ্বীপ, নদীয়া

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6.00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45·00	Music of the South-Asian Peoples Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its Form, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year. December 1980
VOL. X

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

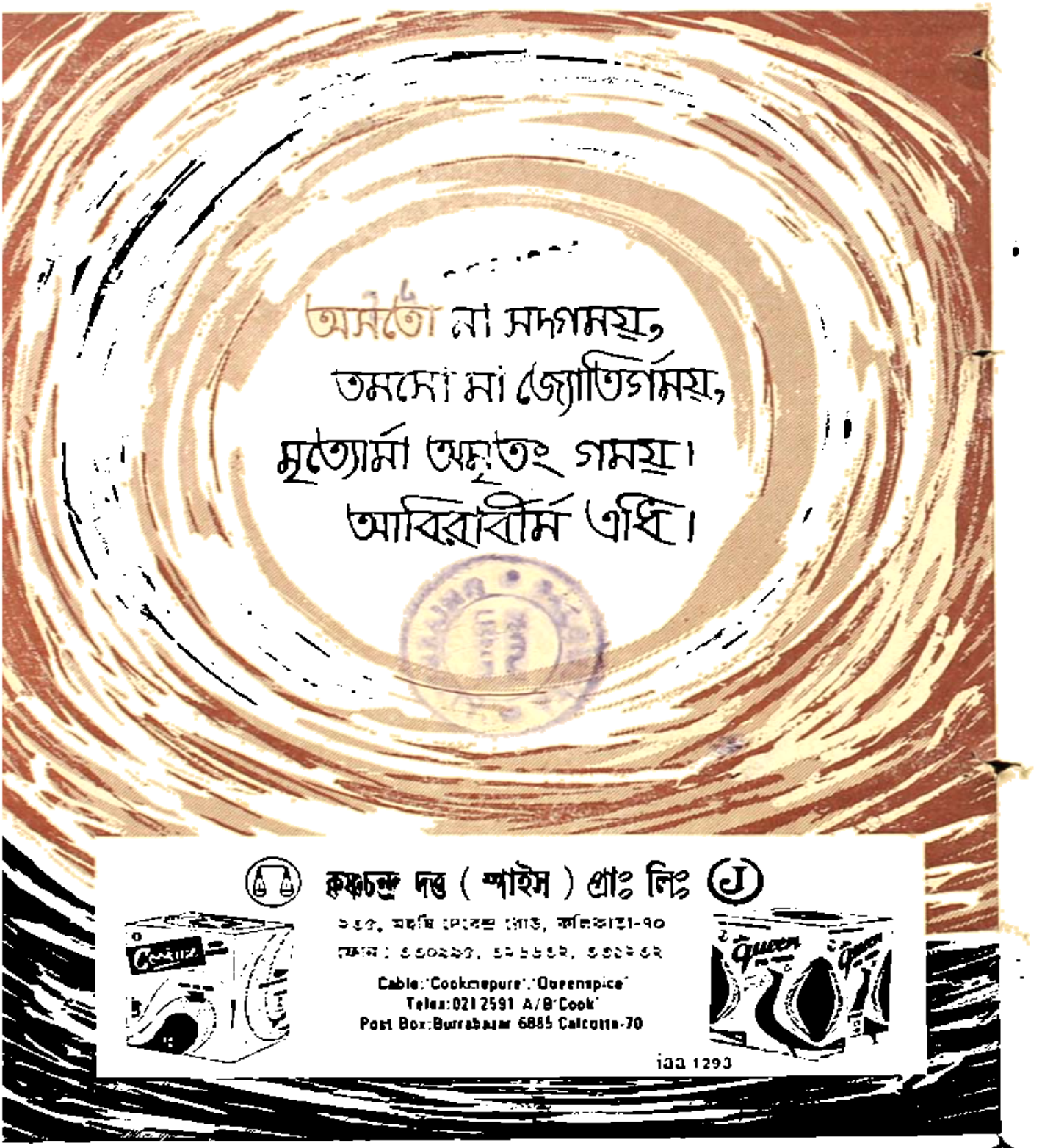

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
1-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Duff Street, Calcutta-700006
RICE Rs. 1.50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য ১.৫০টাকা

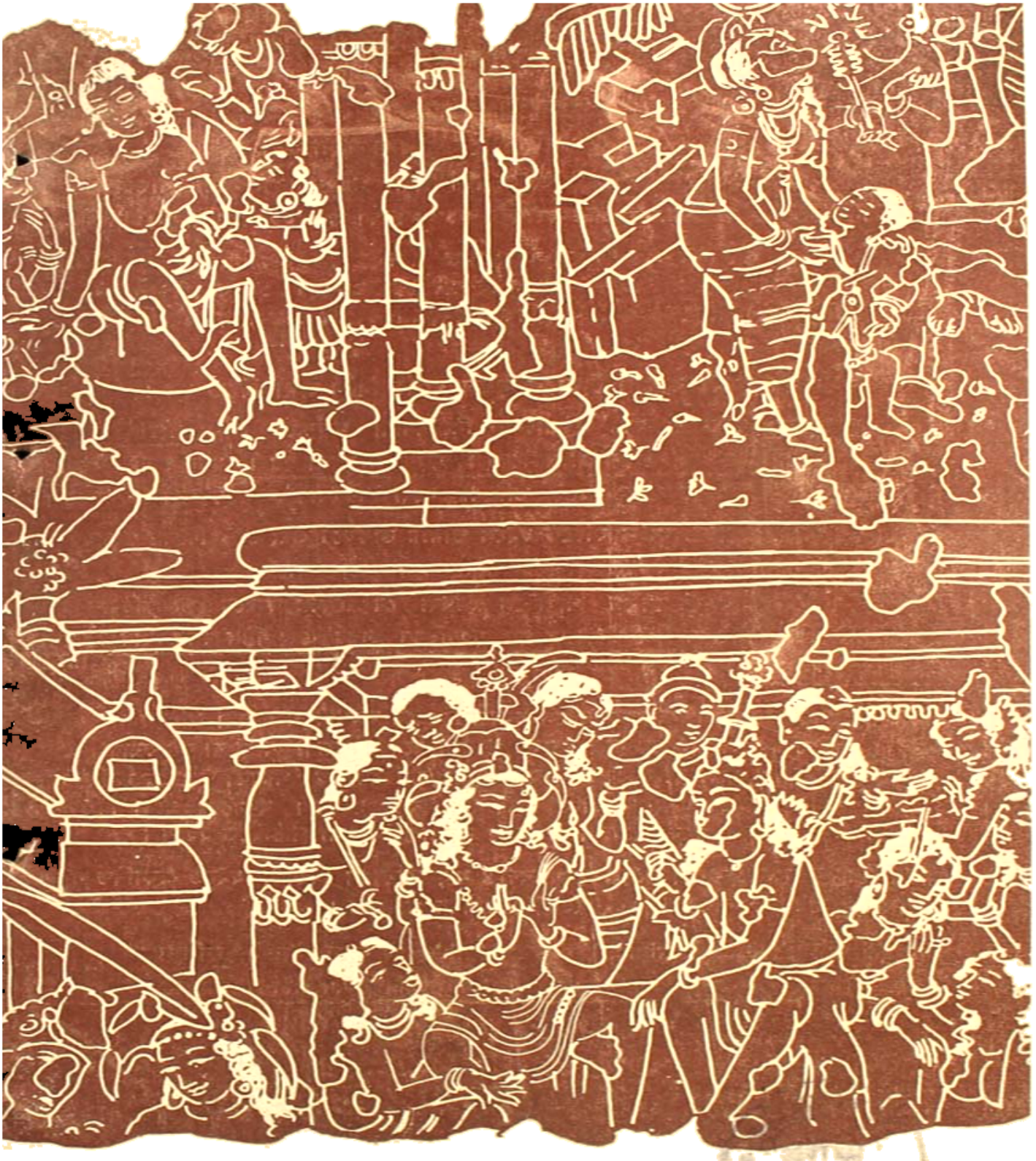

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহঃ সম্পাদক :
শ্রীঅমৃতোষ ঘোষ

বিয়াল্লিশ বর্ষ
একাদশ সংখ্যা
পৌষ
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·০০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।

- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্ব্বে বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারনে পত্র দিবার সময় গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র দ্বারাৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬,

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

শুক্রবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩০মি: থেকে ১১-৩০মি: এবং বিকাল ৩-৩০মি: থেকে ৬-৩০মি:

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্ব্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ঃঃ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা	২৮·০০	সুলেখক শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত	
(মূল অন্বয় অনুবাদ টীকা ভাষ্য-সহিত ভূমিকাসহ)		ব্যায়ামে বাঙ্গালী	৮·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম	২৫·০০	বীরত্বে বাঙ্গালী	৬·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)		বিজ্ঞানে বাঙ্গালী	১০·০০
সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা	১৫·০০	বাংলার ঋষি	৮·০০
শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা	৪·০০	বাংলার মনীষী	৪·০০
		বাংলার বিদুষী	৬·০০
প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী		ব্যবহারিক শব্দকোষ	২০·০০
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩		(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

বাংলা প্রকাশন

: স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

	টাকা		টাকা
আমার জীবন-কথা	১০·০০	ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	৩·০০
স্বামী অভেদানন্দ (কালীতপস্বী)	২·৫০	কাশ্মীর ও তিব্বতে	
মরণের পারে	১৬·০০	স্বামী বিবেকানন্দ	
যোগশিক্ষা	১০·০০	হিন্দুনারী	৩·৫০
পুনর্জন্মবাদ	৮·০০	স্তোত্র-রত্নাকর	৬·০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম		আত্মজ্ঞান	১০·০০
মনের বিচিত্র রূপ	৬·০০	আত্মবিকাশ	৬·০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	২০·০০	কর্মবিজ্ঞান	

: স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত :

মন ও মানুষ	প্রকাশের অপেক্ষায়	তীর্থরেণু	৮·০০
বাণী ও বিচার (১ম ভাগ)	২০·০০	ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস ১ম ভাগ	১৫·০০
ঐ (২য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ প্রথমার্ধ	২০·০০
ঐ (৩য় ভাগ)	২০·০০	ঐ ২য় ভাগ শেষার্ধ	২০·০০
ঐ (৪র্থ ভাগ)	প্রকাশের অপেক্ষায়		
মন্ত্রসাধনা ও সঙ্গীত	৭·০০	পদাবলীকীর্তনের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	১২·০০
রাগ ও রূপ প্রথম ভাগ		সঙ্গীতে রবীন্দ্র-প্রতিভার দান	
ঐ দ্বিতীয় ভাগ	১৪·০০	অভেদানন্দ দর্শন	
শ্রীদুর্গা	নূতন সংস্করণ যন্ত্রস্থ	নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৫·০০
		রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা	৮·০০

অন্যান্য বাংলা গ্রন্থ

বিশ্বরূপিণী মা সারদা		পত্রে উপদেশ	
আচার্য অভেদানন্দ	২·০০	অর্চনা (নূতন সং)	০·৩০
স্বামী অভেদানন্দের বিজ্ঞানদৃষ্টি	৮·০০	স্বামী বিবেকানন্দ স্মারক-গ্রন্থ	
লোকগুরু অভেদানন্দ		স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ	
বাংলাদেশ ও শ্রীরামকৃষ্ণ		হিমালয়ের তীর্থপথে	
গীতা	৬·৫০	স্বামী অভেদানন্দ ১ম খণ্ড	
		ঐ ২য় খণ্ড	

॥ কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-কর্তৃক কঠোপনিষদের ধারাবাহিক ভাষণের অনুলিখন। অধ্যাপিকা শ্রীমতী চামেলী বসু দ্বারা অনুলিখিত। মূল্য—৬·০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশনা বিভাগ (ফোন : ৪৫-১৮··)

১১-বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০০৬।

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেন্সেশ্স

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৪৪-৩১৬০
ল্যাবরেটরি—৪৬-২৪৭৪

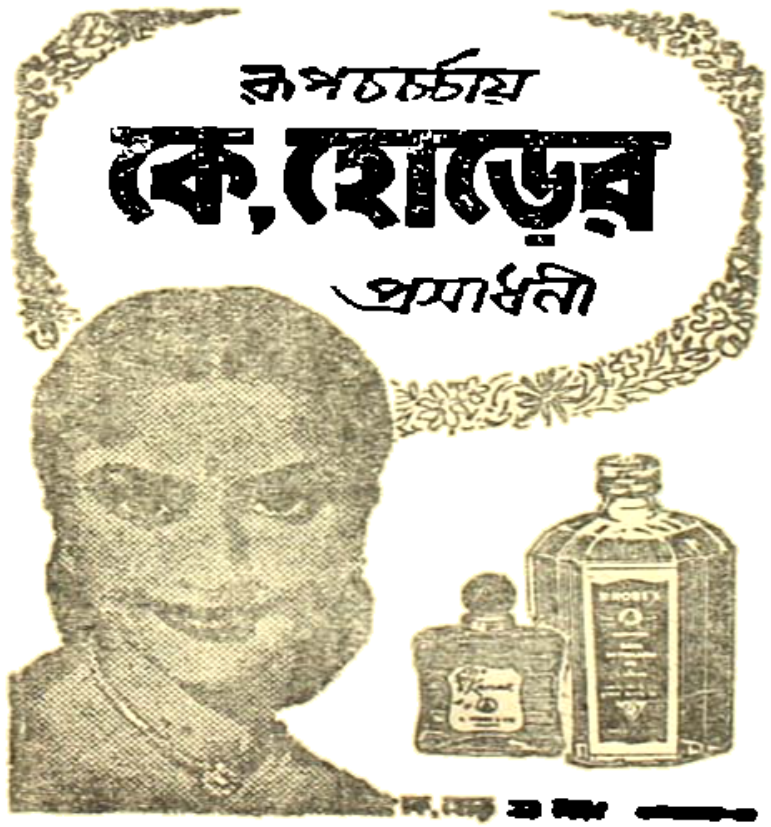

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫৯, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পো: নবদ্বীপ, নদীয়া

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল এবং গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট · কলিকাতা-৬

ফোন ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JEET" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,

"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC

COMBS & NOVELTIES.

P.O. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

ফোন: ৩৪-

কেশুতে পাতার রসে ও গন্ধে

কেশুত

কেশতৈল

নির্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস (প্রাঃ) লিমিটেড

কলিকাতা-২

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

পৌষ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীকুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ডাফ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়াজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এটি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়া।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস পৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.

(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১১৫, উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

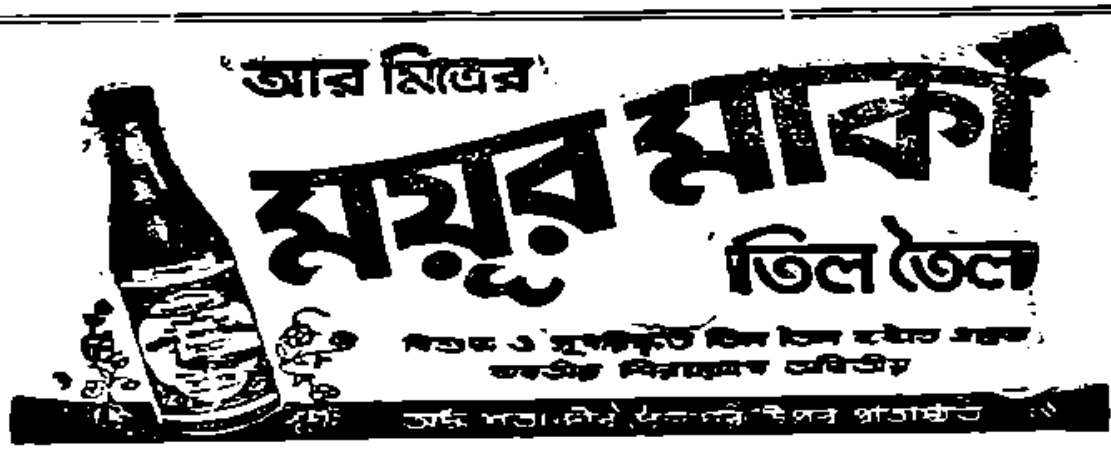

ফোন নং ৪৬-৮৪১৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • রানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

পৌষ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৫৬৭	
২।	শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তবামৃতম্	৫৭৮	স্বামী জীবানন্দ
৩।	সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	৫৮১	স্বামী প্রভানন্দ
৪।	মাতৃ-সংগীত	৫৮৪	স্বামী চণ্ডিকানন্দ
৫।	বিবেকানন্দ মননালোকে সমাজ বিকাশের ধারা	৫৮৫	স্বামী সোমেশ্বরানন্দ
৬।	তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	৫৮৯	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৭।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৫৯৪	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৮।	কেন হিন্দুরা খ্রীষ্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে—স্বামী অভেদানন্দ	৫৯৮	অনুবাদক : শ্রীকৃপতি মোহন মুখোপাধ্যায়
৯।	শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ	৬০১	শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ
১০।	জাপানের কাবুকি নাটক	৬০২	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
১১।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৬০৫	
১২।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৬০৮	

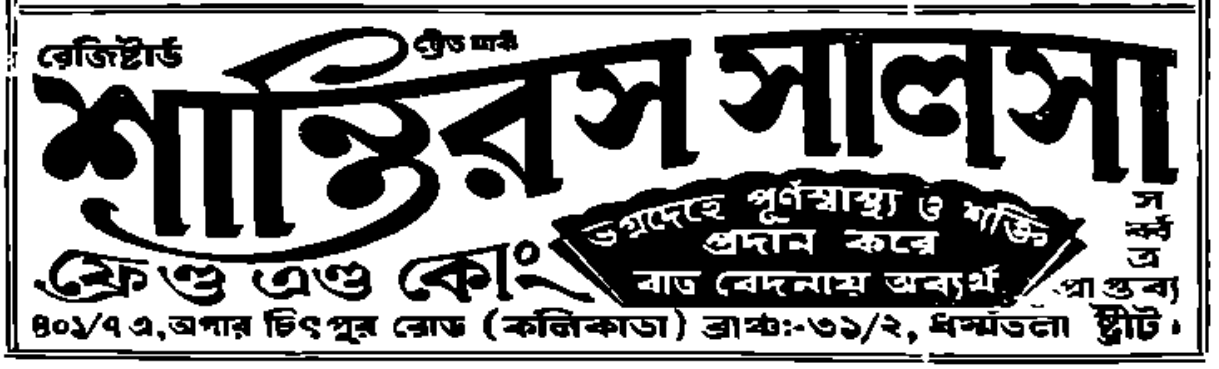

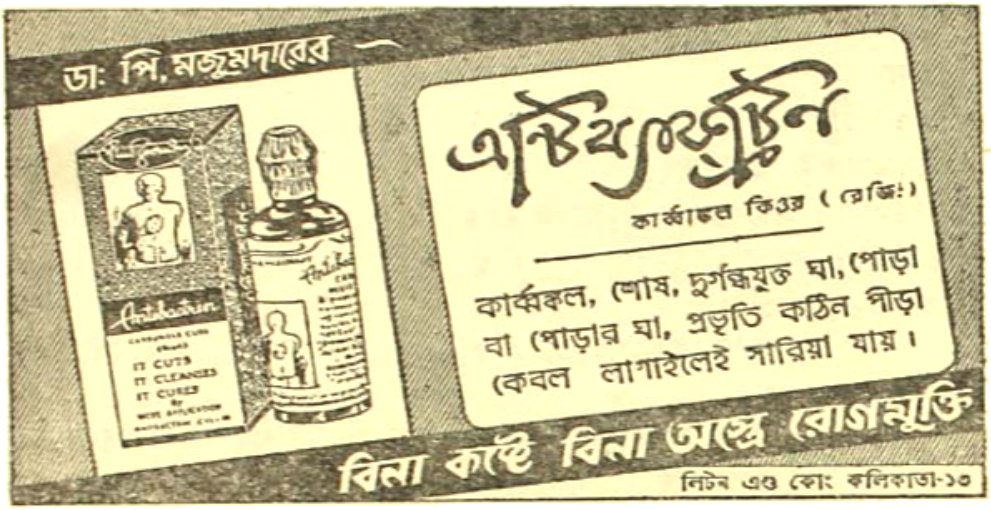

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR

JATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMACY

RUBY PARK, NALTU, 24 PARGANAS

Hd. Office :

37, Netaji Subhas Road

Calcutta-1

বিয়াল্লিশ বর্ষ | একাদশ সংখ্যা | পৌষ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(অষ্টাংশ)

নির্গুণ ও নিরুপাধিক ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধির সাহায্যে সগুণ-ব্রহ্মরূপে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে আচার্য শ্রীকণ্ঠও ব্রহ্মরূপ স্বয়ম্ভূ-শিব-ভট্টারকের মায়াসাহচর্য স্বীকার করেছেন এবং প্রকারান্তরে মায়া ও ব্রহ্মের অবিনাভাবসম্বন্ধও প্রতিপন্ন করেছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে শিবার্কমণিদীপিকায় আচার্য অপ্পয়দীক্ষিতের প্রচেষ্টাও তাই। আচার্য শ্রীকণ্ঠ শিবাদ্বৈতবাদ-প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করলেও প্রকারান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতরূপ দ্বৈতবাদের ক্ষেত্রেই অবতরণ করেছেন, ফলে তাঁর ও আচার্য অপ্পয়দীক্ষিতের পক্ষে ব্রহ্ম ও মায়াশক্তির মধ্যে অবিনাভাবসম্পর্ক স্থাপন করলেও ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি যে পৃথক এবং শক্তি ও শক্তিমান যে একেবারে অপৃথক ও এক নয় একথাই প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাহলেও শক্তি ও শক্তিমানের আলোচনাক্ষেত্রে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ও ভাষ্যকার অপ্পয়দীক্ষিতের মতের কিছুটা এখানে আলোচনা করা উচিত মনে করি।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) সূত্রের ভাষ্যে আচার্য শ্রীকণ্ঠ বলেছেন: "ব্রহ্মণো জ্ঞানরূপস্য জগৎকারণত্বে তস্য বিকারাপত্ত্যা 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্ত'-মিত্যাদি শ্রুতিতদ্ভঙ্গপ্রসঙ্গঃ।...যদ্যপি জন্মাদের্জগদ্বিশিষ্টত্বেন ব্রহ্মণ্যসম্বন্ধঃ, তথাপি তাটস্থ্যেন লক্ষণত্বং যুজ্যতে।... চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপ-শক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ কদাচিদপি ন নির্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্।...অনন্তাভিরেব

শক্তিভির্জগতো জনকং শাসকং চ ব্রহ্ম ভবতি।...অনন্তশক্তিমত্ত্বাদ্ ব্রহ্মণোঽপরিচ্ছিন্নপ্রণব-সমবায়িকরণত্বং সিদ্ধতি।...তদেব শিবশব্দবাচ্যমানন্দাদিধর্মাশ্রয়তয়া সিদ্ধম্। অত আনন্দাদীনাং বিকল্পাদিচিন্তানিরর্থিকা। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যা'-দিতি মায়ায়াঃ প্রকৃতিত্বমীশ্বরাধিকারা এব 'মায়িনং তু মহেশ্বর'-মিতি বাক্যশেষাৎ। সূক্ষ্মচিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং তৎকার্যং ভবতি। অতো জগজ্জন্মাদিলক্ষণং ব্রহ্মেতি সিদ্ধান্তঃ"।[১]

'শিবার্কমণিদীপিকা'-ভাষ্যে ভাস্করায় অপ্পয়দীক্ষিত আচার্য শ্রীকণ্ঠের ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন ক'রে বলেছেন: "এবং চ যদ্যপি ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া বিয়দাদ্যচেতনরূপেণ পরিণমতি ব্রহ্মাশ্রয়া তদাশ্রয়জীবাশ্রয়া চ চিচ্ছক্তিজ্ঞানাদিরূপেণ। ন তু ব্রহ্ম কেনাপ্যাকারেণ পরিণমতি। তথাপি তথাতথা পরিণমমানানাং মায়াদীনাং ব্রহ্মৈবাদ্যুত্তসিদ্ধাশ্রয়ত্বপর্যবসানভূমিরিতি ব্রহ্মপর্যন্তমুপাদানত্ব-মায়াতীতি ভাবঃ।...এবং তটস্থলক্ষণবাবস্থিতৌ তদুপলক্ষি'তস্য গুণবিগ্রহবিশেষরূপং স্বরূপ-লক্ষণমপি ব্যবতিষ্ঠত ইতি ভাবঃ"।

মোটকথা জন্মাধিকরণে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ও ভাস্করায় অপ্পয়দীক্ষিত মায়াশক্তি স্বীকার করেছেন, আবার নির্বিকার ব্রহ্ম-শিব-ভট্টারকের বিকৃতিরূপ পরিণাম প্রত্যক্ষভাবে স্বীকার না করলেও প্রকারান্তরে বিকৃতি বা জগদ্রূপে বিকার স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে, মায়াশক্তিই এই বিকারের কারণ। বিকারও পরিণতিরূপ পরিণামবাদের অন্তর্গত, সুতরাং ব্রহ্ম জগদ্রূপে বিবর্তিত না হলেও প্রকারান্তরে পরিণতই হন—এটাই শ্রীকণ্ঠাচার্যের অভিপ্রায়। শ্রীকরভাস্করায় শ্রীপতি-পণ্ডিতের অভিমত অনেকটা তাই।[২]

শ্রীকণ্ঠাচার্যের দার্শনিক মতবাদ 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈত'। তিনি আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুসারী ছিলেন এবং শ্রীকরভাস্করায় শ্রীপতি-পণ্ডিতের অভিমতও যে, শ্রীকণ্ঠাচার্য ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বা 'বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী'। শ্রীকণ্ঠের দার্শনিকমতবাদ-সম্পর্কে ভক্টর রমা চৌধুরী তাঁর *The Schools of the Vedanta*-গ্রন্থে (Part III, page 138) লিখেছেন: "Brahman, according to Srikantha is possessd of infinite numbers of Power (*ananta-saktimán*). According to Srikantha such a Parā-Sakti or Supreme Power is Parā-Prakriti.... The Parā-Prakriti is above the Univers of Souls and Matter, and its *Maha'-Vibhuti* or supreme-sublime-superb-sereme-sweet-Powers of the form of supreme knowledge and bliss above all the narrow limits of space, time etc. As a matter of fact, Parā-Prakriti constitutes the very essence as well as the attributes—svarupa and guna—of the Supreme Brahman Himself. Thus without Parā-Prakriti,

---

১। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (কুম্ভকোনম্ সং, ১৯০৮), পৃঃ ১৫৮।

২। শ্রীপতি-পণ্ডিত ব্রহ্মসূত্রের ১।২ সূত্রে সিদ্ধান্তরূপে বলেছেন: "সিদ্ধান্তস্তু। সর্বাধিষ্ঠান-সচ্চিদানন্দ ঘটদ্বপরশিবব্রহ্ম এব জগজ্জন্মাদিকারণত্বং যুক্তম্।...মায়ায়াঃ জগদুপাদানত্বম্"।

..... are not at all possible on the part of Brahman or Siva. Thus, Para-Brahman without Parā-Sakti is absolutely powerless, as we say 'Siva without Sakti is only a Shava (শব)—a corpse'' (pp. 138-139).

পুনরায় ভট্টর রমা চৌধুরী শ্রীকণ্ঠের মতে 'মায়া কি'—সে' সম্বন্ধে বলেছেন : "That is why, Umā (Māyā) is taken to be the very Self (Svarupa) of Siva, *so identical with Him*, yet to make the concept of Love possible, She (Umā or Māyā) is taken to be different from Him (Supreme-Siva or Brahman)....In the way, Umā (Māyā) is rhe Svarupa or nature of Siva, *so identical with Him* (Siva or Brahman). She (Māyā) is thus one with Him, yet completes Him ; depends on Him, yet makes Him possible.....Umā is also called Māyā—a Mystic and a Magic something....She (Māyā), of course, is Suddhā-Māyā (vide Appyadikshita's *Sivārka-manidipika* (2. 2. 36), as distinguished from Asuddhā-Māyā or Prakriti.....We can think of Brahman as absolutely one without any duality, remaining always in His full oneness, without even an iota to the contrary. But here ? Here (in Srikantha's philosophy), we have the strange conception of one, apparently becoming dual, yet *remaining one in essence*." (pp. 144-145).

সেজন্য আচার্য শ্রীকণ্ঠ সৃষ্টিপ্রসঙ্গে আনন্দময়-লীলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন ও বলেছেন (ভট্টর রমা চৌধুরীর কথায় বলি) : "The loving blissful God, like a great Mayāvin, Magician loves Himself, loves His own Māyā joyfully..... Thus the concept of Māyā inevitably leads to that of Lilā.....The whole relation between Siva (Brahman) Sakti (Māyā) is thus one of Lilā, or loving blissful Divine Sport on the part of the Brahman" (p. 145).

কথা এই যে, আচার্য শ্রীকণ্ঠ লীলাবাদের আলোকে ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির অবিনাভাব-সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করেছেন। অবিনাভাবসম্বন্ধের ধারণা অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এজন্য আচার্য শ্রীকণ্ঠ নিজের দার্শনিক মতবাদকে 'শিবাদ্বৈতবাদ' বলে প্রচার করলেও আসলে তিনি বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদী ছিলেন। বিশিষ্ট-শিবাদ্বৈতবাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত সেকথা পূর্বে বলেছি এবং বিচারের ক্ষেত্রে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বৈতবাদেরই প্রতিধ্বনি। আচার্য রামানুজের ব্রহ্ম যেমন বিভিন্ন শুভৈশ্বর্যসম্পন্ন এবং মায়াও ব্রহ্মের নিত্যসঙ্গিনী, শ্রীকণ্ঠাচার্য এবং শ্রীকরভাষ্যকার শ্রীপতি-পণ্ডিতের 'শিব' বা 'শর্ব'-রূপী-ব্রহ্মও তেমনি অনুগ্রহ-দয়া-দাক্ষিণ্যসম্পন্ন লীলাময় ব্রহ্ম। সুতরাং তাঁদের ব্রহ্ম সর্বগুণাতীত ও সকল উপাধির অতীত

নির্গুণ-ব্রহ্ম নন, তিনি শক্তিসম্পন্ন সগুণ-ব্রহ্মই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমত কিন্তু এঁদের থেকে একটু ভিন্ন, কেননা শ্রীরামকৃষ্ণদেব মহাসমুদ্রের শান্ত-স্থির-জল স্বীকার করেছেন নিত্যে ও স্বরূপে, আবার সচঞ্চল তরঙ্গও স্বীকার করেছেন লীলাকর্মরূপ সৃষ্টিতে বা স্বরূপের বিরূপে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আচার্য শঙ্কর ও জার্মান-দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্টের মতো বিশ্বপ্রপঞ্চের বা সৃষ্টির ব্যবহারিক ও প্রাতীতিক সত্তা স্বীকার করেছেন—যদিও শঙ্করের মতোই তিনি আবার পরমার্থিক-সত্তাই যথার্থভাবে স্বীকার করেছেন লীলামহিমোত্তীর্ণ গুণাতীত ব্রহ্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে।

কিন্তু কথা এই যে, গুণময়ী শক্তির বা মায়ার পরিণাম ও বিকৃতি আছে এবং অদ্বৈতবাদী আচার্যদের মধ্যে সকলেই একথা স্বীকার করেন যে, ব্রহ্ম অবিকারী ও সকল গুণ ও উপাধির অতীত, সুতরাং সৃষ্টিপক্ষে অবিকারী ও অপরিণামী ব্রহ্ম কিভাবে বিকারী ও পরিণামী মায়া-শক্তির সঙ্গে সাহচর্যরূপ মিলনসাধন করতে পারেন? অবশ্য শ্রীকণ্ঠাচার্য ও শ্রীপতি-পণ্ডিতও এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সুতরাং এ'প্রশ্নের উত্তর ও সমাধান কি? এই সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সাধু শান্তিনাথ তাঁর Māyāvāda (মায়াবাদ)-নিবন্ধে যেভাবে আলোচনা করেছেন তাঁর উল্লেখ করি এখানে। তিনি বলেছেন এবং আমরাও বলি: এখন একমাত্র উপায় যে, শক্তি বা মায়া ও বিশ্ববৈচিত্র্য (জগৎ) স্বরূপত না থেকেও ব্রহ্মে প্রতিভাসরূপে প্রকাশ পায়। এই যে তত্ত্ব—না থেকেও থাকে, আবার প্রকাশ পায়—এর একটি কারণ ও সমাধান অবশ্যই আছে। এই কারণ ও সমাধানের বস্তু 'মায়া'। কিন্তু পুনরায় জিজ্ঞাস্য হতে পারে—কিন্তু মায়ার সত্তা কোথায়? ব্রহ্মের ভিতরে—না বাইরে? ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্নভাবে—না ভিন্নভাবে? তাহলেও কথা এই যে, ব্রহ্মের ভিতরে বা বাইরে মায়াসত্তা থাকা সঙ্গত নয়—বিশেষ ক'রে মূলতত্ত্ব নির্গুণ-ব্রহ্মে —একথা পূর্বেও বলেছি। কিন্তু একথাও পুনরায় সত্য যে, মায়া বা মায়াশক্তি না থাকলে বিশ্ব-প্রপঞ্চের সৃষ্টি ও বিকাশ হওয়াও সম্ভব নয়। সুতরাং একথাই আমাদের অর্থাৎ অদ্বৈত-বাদীদের স্বীকার করতে হয় যে, ব্রহ্মসত্তাকে আশ্রয় (অধিষ্ঠান) ক'রেই অনির্বচনীয়া অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার স্থিতি এবং এই দৃষ্টিতেই মায়া বা প্রকৃতি উপাদানকারণ ও ব্রহ্ম মায়াধীন সগুণ-ব্রহ্ম।

আচার্য শঙ্কর, পদ্মপাদ, বাচস্পতিমিশ্র, মধুসূদন সরস্বতী সকলেই সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরকে মায়াধীশ বলে স্বীকার করেও মায়ার সাহায্যে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-পালন-কর্ম করেন—একথা বলেছেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের অভিমতও তাই—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্, প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" (৪।৬)। পূর্বে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর ভাষ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছি এবং এখনও ক'রে বলি: "প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিঅঘটনানঘটনা-পটীয়সীং 'স্বাং স্বোপাধিভূতা'-মধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য···দেহবানিব ইব জাত ইব ভবামি"। সুতরাং মূলতত্ত্ব নির্গুণ-ব্রহ্মে মায়া থাকে কি—না এই আশঙ্কা না ক'রে যদি আচার্য শঙ্কর ও শঙ্করানুসারী অদ্বৈতবাদীদের বিচার অনুসরণ করি তাহলে ব্রহ্মে (সগুণ-ব্রহ্মে) মায়ার থাকা-সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু সমাধান অবশ্যই করতে পারি এবং সেদিক থেকে গীতার ৪।৬ ভাষ্যে আচার্য মধুসূদন সরস্বতীর "কিন্তু যশ্চ নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান বাসুদেবঃ পরিপূর্ণ

নির্গুণঃ পরমাত্মা. স এব তদ্বিগ্রহঃ" কথাগুলির বিচার এখানে ও এই প্রসঙ্গে নাও গ্রহণ করতে পারি। তবে আচার্য মধুসূদন সরস্বতী একান্তভাবে অদ্বৈতমতাবলম্বী হলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রণতির ভাব বর্তমান ছিল এবং থাকাও স্বাভাবিক। কিন্তু তাহলেও মধুসূদন সরস্বতী যুক্তিপূর্ণভাবে ঐ মায়াময় সৃষ্টিসম্পর্কের একটি সিদ্ধান্ত ক'রে বলেছেন : "নির্গুণে-তত্ত্বে সচ্চিদানন্দরসঘনে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্য তত্ত্বরূপেণ প্রতীতির্মায়া-মাত্রমিত্যর্থঃ—'...দেহীভাবাতি মায়য়া'।" সুতরাং মায়াশক্তির প্রভাবে মায়াধীশ-ব্রহ্ম বলতে সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরেই মায়াস্পর্শ থাকে—একথা গ্রহণ করা উচিত এবং মায়িন ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম থেকেই জগৎ সৃষ্ট হয়—যা মায়ার বা প্রকৃতির কার্য ও বিকাশ। এই সিদ্ধান্তানুসারেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "ব্রহ্ম ও শক্তি, শক্তি আর শক্তিমান—অভেদ"। শ্রীরামকৃষ্ণদেব আরও বলেছেন : "যখন নিষ্ক্রিয়—তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই, যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন—তখন শক্তি বলি। কিন্তু একই বস্তু—অভেদ। অগ্নি বললে দাহিকাশক্তি অমনি বুঝায়, দাহিকাশক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে। একটাকে ছেড়ে আর একটাকে (অপরকে) চিন্তা করবার যো নাই"। জগৎ থেকে সগুণ বা মায়াযুক্ত-ব্রহ্ম ঈশ্বর থেকে সৃষ্টিরূপ জগৎ পর্যন্ত সমস্তই মায়িক ও আপেক্ষিক (relative) ক্ষেত্র, সুতরাং সেখানে মায়িক ঈশ্বরের সঙ্গে মায়ার সম্পর্ক থাকেই। এই মায়া বা প্রকৃতি অনির্বচনীয়া বা অনির্বাচ্যা:—যা সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎ নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়া। কথা এই যে, অজ্ঞান, মায়া বা মূলাপ্রকৃতি ব্রহ্ম (সগুণ-ব্রহ্ম ও নির্গুণ-ব্রহ্ম) থেকে ভিন্ন, আবার পারমার্থিকভাবে ভিন্ন নয় ; আবার ব্রহ্মের মতো সৎ বা সত্তাও নয়, শশবিষাণের বা বন্ধ্যাপুত্রের মতো অসৎ বা তুচ্ছাও নয়, কিন্তু অনির্বচনীয়া। এই অনির্বচনীয়াশক্তি কি ?— সেই সম্বন্ধে 'বেদান্তসার'-গ্রন্থে সদানন্দ-যোগীন্দ্র বলেছেন : "সদসদ্ভ্যাং অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মিকং জ্ঞান-বিরোধি ভাবরূপং 'যৎ কিঞ্চিৎ ইতি যদন্তি'..."। 'বিদ্বন্মনোরঞ্জনী'-টীকায় আচার্য রামানন্দ-যতি বলেছেন : "অয়মর্থঃ—ন অস্মাভি অজ্ঞানস্য ভাবত্বং পরমার্থসত্তাভিপ্রায়েণ উচ্যতে, কিন্তু অভাববৈলক্ষণ্যাভিপ্রায়েণ"। অর্থাৎ 'অহং অজ্ঞঃ, মাং অহং ন জানামি'—ইতি 'অপরোক্ষানুভবঃ'—এজন্যই ভাবরূপ অজ্ঞান, অথচ অনির্বচনীয়। সিদ্ধান্ত এই যে, অদ্বৈততত্ত্বের সঙ্গে বিশ্ববৈচিত্র্যরূপ জগতের একটি সঙ্গত সম্পর্ক-স্থাপনের জন্যই মূলাপ্রকৃতি বা কারণ-অজ্ঞানরূপ অনির্বচনীয়াশক্তি স্বীকার করেছেন অদ্বৈতবাদীরা, কারণ অদ্বিতীয়-অখণ্ড-অপরিণামী-নির্বিশেষ-ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থিত সৎ এবং ঐ পারমার্থিক সদ্‌সত্তার তুলনায় মায়া ও জগৎ ব্যবহারিকভাবে সৎ হলেও পারমার্থিকত মিথ্যা এবং সেজন্য ব্রহ্মের সঙ্গে বিশ্বপ্রপঞ্চের বা জগতের একটি সম্পর্কনির্ণয়ের বা স্থাপনের জন্যই অনির্বচনীয়া মায়া বা প্রকৃতির (কিন্তু সাংখ্যের জড়াপ্রকৃতি নয়) কল্পনা করা হয়। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ভাষ্যকার আচার্য শঙ্কর ও অন্যান্য অদ্বৈতবাদীদের অভিমতে বিশ্বপ্রপঞ্চের বা জগতের সৃষ্টি হয় মায়াধীশ সগুণ-ব্রহ্ম থেকে, নির্গুণ-ব্রহ্ম থেকে নয়।

'পঞ্চপাদিকা'-ভাষ্যে আচার্য পদ্মপাদ অবিদ্যাশক্তি বা মায়াশক্তিকে অনির্বচনীয়া ও মিথ্যা বলেছেন : "মিথ্যা চ তদজ্ঞানং চ মিথ্যাজ্ঞানম্। মিথ্যেতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে"।

সুতরাং মায়াশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর (সগুণ-ঈশ্বর) থেকে বিশ্ব সৃষ্টি হয় এবং ঐ মায়া বা মায়াশক্তি ঈশ্বরের নিজেরই শক্তি—'পরমেশশক্তিঃ' এবং 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্'। সুতরাং পরমেশ বা পরমেশ্বর (ঈশ্বর) যে সগুণ সেকথা বলেছি এবং সগুণ-ব্রহ্ম থেকেই নির্গুণ-ব্রহ্মের কল্পনা করারও কোন অসংগতি ও কষ্টকল্পনা নাই। তাছাড়া একথাও সত্য যে, যখনই রজ্জুতে সর্পের ভ্রম (ভুলজ্ঞান) হয় এবং রজ্জুকে প্রত্যক্ষ করলেই সর্পভ্রমের নিরসন বা অবসান হয়, তখন একথাই বোঝা উচিৎ যে, ভ্রমে যে রজ্জুকে সত্যসর্প বলে ভ্রম করেছিলাম, আসলে তা রজ্জুই, অর্থাৎ রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানেই সর্পের ভ্রম হয়, সুতরাং ভ্রমরূপ মিথ্যাজ্ঞানের অপসারণে সত্যজ্ঞানের প্রত্যক্ষ বলতে ব্রহ্মের উপলব্ধি হয় এবং সেই ক্ষেত্রে ভ্রমই সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ **ভ্রম সংশোধিত (corrected) হ'য়ে সত্যজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়।** সুতরাং এখানে সর্পভ্রমটিই সত্যরজ্জুরূপে প্রত্যক্ষ হয়, অথবা বলা যায় যে, যাকে ভ্রম বলেছিলাম, তাকেই পরে সত্যজ্ঞান বলি ; যাকে মায়া বলেছিলাম, তাকেই পরে (উপলব্ধি হলে) ব্রহ্ম বলি। এখানে মায়া কিন্তু স্বরূপে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা পৃথক নয়, বিরূপেই কেবল পৃথক। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিরসংশোধিত জ্ঞানচক্ষে যে ব্রহ্ম ও শক্তি বা মায়া যে অভিন্ন বলে প্রতীত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! অজ্ঞানীর দৃষ্টিভেদে এবং জ্ঞানীর দৃষ্টি অভেদে। আর এরই নাম দৃষ্টিভেদ।

পূর্বে অনির্বাচ্যবাদ বা অনির্বচনীয়খ্যাতি-সম্বন্ধে আচার্য পদ্মপাদকৃত 'পঞ্চপাদিকা'-গ্রন্থ থেকে কিছুটা আলোচনা করেছি ও বলেছি 'মিথ্যোতি অনির্বচনীয়তা উচ্যতে'। যে বস্তু সৎ নয়, অসৎ নয়, কিংবা সদসৎ নয়, তাকেই অনির্বচনীয় বলে। অনির্বচনীয়তা সেজন্য সদসদ্‌বিলক্ষণ মিথ্যা বা অসদ্‌বস্তুসম্পর্কেই ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এই খ্যাতি-অনুসারে মিথ্যা-অর্থে অনির্বচনীয়। অর্থাৎ যে বস্তু একান্তভাবে সৎ, অসৎ, বা একবার সৎ ও আর-একবার অসৎ-রূপে প্রতিভাত বা প্রকাশিত নয়—তাই নির্দিষ্টবচনীয়তাহীন বা নির্বয়হীন মিথ্যাবস্তু। সুতরাং মিথ্যাবস্তু সৎ, অসৎ ও সদসৎ থেকে পৃথক বা বিলক্ষণ। ভ্রমে ভাসমান শুক্তিরজতাদি সৎ, অসৎ, বা সদসৎ বস্তু থেকে পৃথক, সেজন্য অনির্বচনীয় রজতাদি ভ্রমে ভাসমান হয় ব'লে ভ্রমজ্ঞানকে অনির্বচনীয়খ্যাতি বলেছেন ডক্টর বাসনা সেনও তাঁর 'বাদরায়ণসূত্রের প্রয়োজনীয়তা'-গ্রন্থে। এই অনির্বচনীয়খ্যাতিও আচার্য শঙ্করনির্দিষ্ট অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিরই অনুরূপ। অরজত শুক্তি রজতরূপে প্রতিভাত হয় ভ্রমে বা ভ্রান্তবুদ্ধিতে।

আচার্য মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থে বিচারসহ অনির্বচনীয়বাদ স্থাপন করেছেন। ডক্টর সংযুক্তা গুপ্ত তাঁর *Studies in the Philosophy of Madhusudan Saraswati*-গ্রন্থে (১৯৬৬) এ'সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে লিখেছেন : "In order to establish the nature of *ajnana*, Madhusudana discusses the definition of *anirvacyatva*. *Anirvacyatva* can be defined as (i) the quality of being different from existent, diffetent from non-existent, and different from being both existent and non-existent at the same time. (*Sadvilaksanatva satyasadvilaksantve sati sadasadvilaksanatva*)' (ii) the qualification of

not being incapable of being proved as either existent or non-existent (*Satva'satva'bhva'm vica'ra'sahatve sati sadasatvena vica'rasahatvam*, (iii) the quality of being contradicted where it appears to be existent. (*Pratipannopadhau va'dhyatvam*). Here the words existence and non-existence are used exactly in the sense as regarded be everybody. It cannot be objected that contradiction of one means the existence of the other quality. Because all kinds of contradiction is regarded to be false in this system. Nobody can claim that false silver is contradictory to real necre. Therefore whenever in the definition, the term contradiction (*nisedha*) is used in connection with existence, non-existence and so on, it is done in order to establish the falsity of those objects. Those who consider the destruction of avidya as a fifth category, other than. existence. non-existence, both existence and non-existence and the contradiction of both, should add the quality of not being existent at the time of liberation, to the definition of *anirva'cyatva*" (p. 48).

প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞানের স্বভাব বা প্রকৃতি প্রত্যক্ষ, অনুমান, শ্রুতি, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা নিরূপিত হয় একথা মধুসূদন সরস্বতীও স্বীকার করেছেন। মোটকথা অজ্ঞান বা অবিদ্যা থাকার জন্য যে বস্তু মিথ্যা বা অবিদ্যানিমিত্ত একথাই প্রমাণ হয় এবং অনির্বচনীয়বাদ প্রমাণ করে ঐ আবিদ্যিক মিথ্যাবস্তু—যা সাধারণের কাছে সত্য ব'লে প্রতীত হয়, প্রকৃতপক্ষে সত্য ও নিত্য নয়।

আচার্য শঙ্কর অনির্বচনীয়তাবাদী ছিলেন এবং আচার্য মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করেরই অনুবর্তী। অনির্বচনীয়খ্যাতিবাদী শঙ্করের মতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রসবিনী মায়া—যার প্রভাবে পরমাত্মা নাম-রূপাদির বিকাশসাধন ক'রে আপনি ঐ নাম ও রূপের অন্তরালেই নিজেকে আবৃত ক'রে রাখেন। অসীম অনন্ত তিনি নাম-রূপের সীমার মাঝে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। "তিনিই একমাত্র আলোক। তাঁহার প্রকাশের দ্বারাই নাম-রূপের প্রকাশ হইতেছে। তিনি নাম-রূপের অধিষ্ঠান বা আশ্রয়রূপে (background) বিরাজ করিতেছেন। জীবের বিভ্রান্ত-দৃষ্টি তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছে না। জীবের দৃষ্টিতে কেবল নামরূপাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চই ধরা পড়িতেছে এবং জগতের মধ্য দিয়া যাহার প্রকাশ হইতেছে সেই জগদাত্মার স্বরূপটি যথাযথভাবে দেখা যাইতেছে না, বরং তাঁহার বিকৃত রূপই দেখা যাইতেছে। ইহাই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য। ভ্রমজননী এই অবিদ্যা জীবের বুদ্ধির ও দৃষ্টির তিরস্করণী (শক্তি)। ইহাই মায়ার আবরণশক্তি। জগজ্জননী অবিদ্যা বা মায়া ইহা হইতে বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির। ইহাই জগদ্বীজ—নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের জননী। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে

বিবিধ বিচিত্র নামরূপাত্মক জগতের বিকাশ—মায়ার বিক্ষেপশক্তির কার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। জগৎ শাঙ্করবেদান্তের মতে জীবের বিজ্ঞানমাত্র বা মানসকল্পনাপ্রসূত নহে। ব্যবহারিক জীবনে পরমেশ্বর-সৃষ্ট জগতের সত্যতা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই স্বীকার করিতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে যখন জীবের অবিদ্যা বিনষ্ট হয়—মিথ্যাদৃষ্টি তিরোহিত হয়, তখন আর এই অধ্যাস থাকে না। নামরূপাত্মক জগতের অন্তরালে ব্রহ্মচৈতন্যের স্বাতন্ত্র্য পরিস্ফুট হইয়া উঠে। জগৎ তখন স্বাধীন স্বতঃসিদ্ধ বস্তুরূপে প্রতীয়মান হয় না, পরব্রহ্মের মায়িক অভিব্যক্তি রূপেই ব্রহ্মের 'আত্মভূত' বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।···এই মায়াকে বা অবিদ্যাকে বলা হইয়াছে 'ঈশ্বরের আত্মভূত' অর্থাৎ ইহা পরমেশ্বরেরই শক্তিস্বরূপ। মায়া ও অবিদ্যা শঙ্করের মতে বস্তুতঃ অভিন্ন। মায়া সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী।

"সুতরাং অবিদ্যা, মায়া বা অজ্ঞানকে শাঙ্করবেদান্তের মতে বিদ্যার বা জ্ঞানের অভাব-স্বরূপ বলা চলে না। ইহা ভাবস্বরূপ (positive) ও বস্তুভূত। অবিদ্যা বা মায়াই জগৎসংসারের মূলকারণ, জগতের বীজশক্তি, সুতরাং ইহাকে অসৎ বলা যায় কিরূপে? অবিদ্যাকে যেমন অসৎ বা অভাবস্বরূপ বলা যায় না, সেইরূপ সদ্‌বস্তু বলিয়াও স্বীকার করা যায় না, কেননা যাহা সৎ—তাহা চিরদিনই সৎ বা আছে ও থাকিবে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, হইতে পারে না।···অবিদ্যার প্রতীতিকালে উহা সত্য বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং উহা অংশত সৎ বটে, আবার বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া উহা অংশতঃ অসৎও বটে। যাহা সৎও বটে, অসৎও বটে, তাহকে অদ্বৈতবেদান্তের পরিভাষায় 'অনির্বাচ্য' বলা হইয়া থাকে। অনির্বাচ্য অর্থ—ইহাকে সদ্‌রূপে বা অসদ্‌রূপে কোনরূপেই নির্বাচন করা চলে না। অবিদ্যা বেদান্তের মতে সদ্‌রূপ নহে, অসদ্‌রূপও নহে, সদসদ্‌রূপও নহে। এ'জন্যই অবিদ্যা বা মায়া[৩] অনির্বচনীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবিদ্যা যেমন অনির্বচনীয়, অবিদ্যাকার্য নামরূপাত্মক জগৎও সেইরূপ অনির্বচনীয়। অবিদ্যামূলে যে অধ্যাসের বা মিথ্যাদৃষ্টির উদয় হয়, তাহাও অনির্বচনীয়। মিথ্যাদৃষ্টিকে শাঙ্করবেদান্তে 'অনির্বাচ্যখ্যাতি' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। যাহা অনির্বচনীয়, তাহাই মিথ্যা" (ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী : 'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ', ১ম খণ্ড (২য় সংস্করণ পৃঃ ১৬৪-১৬৫)।

৩। পূর্বে মায়া ও অবিদ্যা যে এক, আবার ভিন্ন ভিন্ন—এ'সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। তবে সাধারণভাবে অবিদ্যা ও মায়ার সত্তাকে ভিন্ন ভিন্ন বলি। অধ্যাপক নলিনীমোহন মুখার্জী-শাস্ত্রী তাঁর *A Study of Sankara* (1942)-গ্রন্থে মায়া ও অবিদ্যাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন : "Looked at from the subjective point of view this Maya is again Avidya. It is false preception that creates the appearance of a plurality. Looked at as the objective world of experience, it is Maya, but looked at as the mental factor that causes this distorted perception of reality, it is Avidya.....It is an objective force. The tendency of our minds of seeing reality, which is one, as *many* is Avidya and the appearance of the one as *many* is Maya" (pp. 141—142).

অনুরূপভাবেই বলেছেন এম. কে. বেঙ্কটরাম আয়ার তাঁর *Advaita Vedanta*-গ্রন্থে : "Māyā is, therefore, a positive entity, a *bhāva-padārtha*, and not the mere absence of knowledge. According to Advaita, what is presented to perception at the *nirvikalpaka* level, is Nirguna Brahman. We view it through the intellect and impose names and forms on it. . Consequently the limitations of the intellect and the sense organs, *appears* as Iśvara, Jiva and Jagat. This is one way of looking at the fact. Another way is to objectify the limitation and speak of it as an adjunct or *upādhi*. If this adjunct is teken in its entirety, we get the conception of Iśvara or Saguna Brahman ; if on the other hand, it is taken to a limited extent, we get the conception of Jiva" (pp. 68-69).

মোটকথা অদ্বৈতবেদান্তে মায়ার বা অবিদ্যার স্থান একেবারে নগণ্য নয়, কেননা একমাত্র মায়ার বা অবিদ্যার অপ্রভাব ও প্রভাবের পরিপ্রেক্ষিতেই নির্গুণ-ব্রহ্ম ও সগুণ-ব্রহ্মের সত্তানিরূপণ সম্ভব হয়—যা অদ্বৈতবেদান্তের ক্ষেত্রে একান্তভাবে প্রয়োজনীয়।

মোটকথা অনির্বচনীয়া মায়াশক্তির বশে ঈশ্বর (সগুণ-ব্রহ্ম) বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য করেন : "জন্মস্থিতিভঙ্গং যতঃ সর্বজ্ঞাৎ সর্বশক্তেঃ কারণাৎ ভবতি তৎ ব্রহ্মেতি ব্যাক্যশেষ ইতি"।

" 'যতো বা ইমানি'-ইতি কারণস্যৈকবচননির্দেশাৎ তদর্থমাত্রস্যৈব বিধিৎসিতত্বাদর্থাৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তি-জগৎকারণমিতি কারণবিশেষো বাক্যাদবগম্যতে।···তস্মাৎ ব্রহ্মসংস্পর্শাভাবাৎ সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিসমন্বিতং পরমানন্দং ব্রহ্মেতি জন্মাদিসূত্রেণ ব্রহ্মস্বরূপং লক্ষিতমিতি সিদ্ধম্"। তাহলেই পঞ্চপাদিকামতে 'সর্বজ্ঞত্বাদিগুণকং ব্রহ্ম জগৎকারণং প্রতিপাদয়ন্তি'—অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মক-শক্তিবিশিষ্ট মায়াযুক্ত সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বরই জগতের বা বিশ্বসৃষ্টির কারণ।

সুতরাং বিভিন্নভাবে বিচার ক'রে দেখলে ঈশ্বর যে নিজের বৈষ্ণবী-মায়ার সাহায্য নিয়ে (মায়াযুক্ত পরমাত্মা-ব্রহ্ম) অবতাররূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন সেকথা গীতার ৪।৭-৮ শ্লোকদুটিতে উল্লিখিত 'তদাত্মানং সৃজাম্যহম্' (৪।৭) ও 'সম্ভবামি যুগে যুগে' (৪।৮)-তত্ত্ব বোঝা যায়। তাছাড়া গীতার ৪।৭ শ্লোকের ভাষ্যে ('অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা···') শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গেও—

(ক) আচার্য শঙ্কর বলেছেন : "স চ ভগবান জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তিবলবীর্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহৈকপ্রয়োজনতাম্" ইতি। এই রহস্যময় ইঙ্গিতকেই বাস্তবরূপে আমরা দেখি প্রতিটি যুগে—বুদ্ধাবতারে, রামাবতারে, কৃষ্ণাবতারে, চৈতন্যাবতারে, শ্রীরামকৃষ্ণাবতারে।

(খ) আচার্য মধুসূদন সরস্বতী (পূর্বেই উল্লেখ করেছি) "নিত্যো যঃ কারণোপাধির্মায়া-যোগাদনেকশক্তিমান্। স এব ভগবদ্দেহ ইতি ভাষ্যকৃতাং মতম্'—ভাষ্যকার শঙ্করের এই অভিমতকে স্বীকার ক'রে একটু স্বতন্ত্রভাবে বলেছেন : 'কিন্তু যশ্চ নিত্যো বিভূঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান্ বাসুদেবঃ পরিপূর্ণো **নির্গুণঃ পরমাত্মা** স এব তদ্বিগ্রহো নান্যঃ···'আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ' ···প্রভৃতি। অর্থাৎ পরিপূর্ণ নির্গুণ (মায়ায় সগুণ-ঈশ্বর) পরমাত্মা 'দেহম্বপ্রতীতিরত··· আত্মমায়য়েতি"—নিজের মায়ায় অবিষ্ট হয়ে দেহধারণ ক'রে পৃথিবীতে (অবতাররূপে) জন্মগ্রহণ করেন।

(গ) ভাষ্যকার নীলকণ্ঠও (গীতাভাষ্যে) স্বীকার করেছেন : "এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রোঽপ্যগ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি ···'নিত্য এষ সা জগন্মূর্তিঃ' "।

(ঘ) আচার্য ধনপতিও ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকায় স্বীকার করেছেন নীলকণ্ঠের মতোই : "সৃজতি এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রোঽপ্যগ্রাহ্যঃ স্বমায়য়া শরীরং সৃজামি।···তস্মাৎসিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়ং শরীরং নিত্যমিতি"।

(ঙ) আনন্দগিরি, রামানুজ, নিম্বার্ক, মাধ্ব, বলদেব বিদ্যাভূষণ, অভিনবগুপ্ত, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীপতি-পণ্ডিত, শ্রীধর-স্বামী ও অন্যান্য ভাষ্যকাররা এ'বিষয়ে আচার্য শঙ্করের মতবাদই স্বীকার করেছেন। আনন্দগিরি মায়ার স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার ক'রে মায়া যে শ্রীভগবানেরই অধীন—সে'কথার উল্লেখ করেছেন : 'তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃত্য ভগবদধীনত্বমাহ'। ঈশ্বর মায়ার সাহায্যে মানবদেহ ধারণ করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে মায়াধীশ, সেজন্যই মায়াশক্তিকে নিয়ন্ত্রন করারও শক্তি ঈশ্বরে বর্তমান।

(চ) শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঈশ্বরের অবতারত্ব স্বীকার ক'রে বলেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)—তিনি (ঈশ্বর) ভক্তের জন্য দেহ ধারণ ক'রে যখন আসেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরাও আসেন। কেউ অন্তরঙ্গ, কেউ বহিরঙ্গ। কেউ রসদার" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২৮৩)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুনরায় বলেছেন : "···নিরাকার, সাকার দুই দেখা যায়। সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয়।···**অবতারকে দেখাও যা—ঈশ্বরকে দেখাও তা**। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২)।

এই আলোচনার অবসরে ঈশ্বর ও ব্রহ্ম-সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকদের সত্যকারের কি মতামত এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিপ্রেত ঈশ্বর ও ব্রহ্মের স্বরূপ কি—সে'সম্বন্ধেও কিছুটা আলোচনা করি এখানে। ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে শঙ্কর, রামানুজ, মধ্বা, নিম্বার্ক প্রভৃতির দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের সত্তার ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছুটা ঐক্য ও অনৈক্যের সন্ধান সুস্পষ্ট। ভারতের উপনিষৎ—যা যথার্থ বেদান্ত নামে পরিচিত ('বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্')—তার মতে ঈশ্বর সত্য-শিব-সুন্দরমের প্রতিচ্ছবি। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, প্রতিপালক, আবার ধ্বংসের অধিকর্তা—মহেশ্বর। তবে ঈশ্বর মায়াশক্তিসম্পন্ন ব'লে সর্বাতীত অথচ সর্বকারণরূপ ব্রহ্ম বা সর্বাত্মভাসক ব্যাপকচৈতন্য থেকে ছোট বা ন্যূনসত্তাক (inferior in status)। ভারতের তন্ত্রশাস্ত্র ঈশ্বরকে পরমেশ্বররূপ মহাশক্তিসমন্বিত পুরুষরূপে কল্পনা করে এবং পরমেশ্বরের এই

শক্তি জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়ারূপিণী-চিতিশক্তি ও বিশ্বব্যাপিনী। তন্ত্রে ঈশ্বর মহাশক্তিরূপিণী ঈশ্বরী নামেও পরিচিত। সাংখ্যকার মুনি কপিল 'ঈশ্বরাসিদ্ধে' বা 'ঈশ্বর অসিদ্ধ' বলে ঈশ্বরের পৃথক সত্তা অস্বীকার করেছেন। তবে ন্যায়-বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকরা ঈশ্বর স্বীকার করেন। ঋষি পতঞ্জলি 'পুরুষবিশেষঃ ঈশ্বরঃ' বলে ঈশ্বরের সত্তায় ও ব্যক্তিতে বিশ্বাসী।

আচার্য শঙ্কর উপনিষদের অভিমতকে স্বীকার করেই বলেছেন যে, ঈশ্বর যথার্থ ব্রহ্মসত্তাই, তবে মায়াশক্তিযুক্ত সগুণ-সবিশেষ-ঈশ্বরও। রামানুজ ঈশ্বরকে ষড়ৈশ্বর্যশালী পুরুষোত্তম-বাসুদেব ও নারায়ণ বলেছেন। মাধ্ব, নিম্বার্ক, বলদেব-বিদ্যাভূষণ ও বৈষ্ণব-দার্শনিক রূপ-গোস্বামী প্রভৃতি রামানুজের মতেরই অনেকটা পরিপোষক। বৌদ্ধদর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নি—যেহেতু গৌতম-বুদ্ধ 'নির্বাণ'-রূপ মহাসুখ লাভ করলেও ঈশ্বর স্বীকার করেন নি। শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর-বিশ্বাসী ছিলেন এবং ভারতের অধিকাংশ দার্শনিকরা তাঁকে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার ব'লে স্বীকার করেছেন। শ্রীচৈতন্য রামানুজের মতেরই পরিপোষক এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে আরাধ্য-দেবতারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরের অবতাররূপে বিশ্বকল্যাণযজ্ঞ-অনুষ্ঠানের জন্য প্রায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীতে পৃথিবীতে অবতরণ ক'রে দয়া ও প্রেমের অবতার-রূপেই পরিচিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব পুরোপুরি ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন। তবে তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বনিয়ন্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেও এবং অদ্বৈতবেদান্তমতানুযায়ী ঈশ্বরকে সগুণ-সাকার-সবিশেষ-ব্রহ্মের অভিধান দিলেও তাঁরও অতীত নির্গুণ-নিরাকার-নির্বিশেষ-ব্রহ্মের কথা বলেছেন। তবে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চক্ষে সগুণ-ঈশ্বরই বিশ্বমানুষের সমাজে একান্ত আরাধ্যদেবতা, কেননা নিরাকার ও নির্গুণ-ব্রহ্মের ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অনায়াসসাধ্য নয়, সাকার ও সগুণ-ব্রহ্ম করুণাবতার ভগবানই সকলের অনায়াসলভ্য। তাছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণের চক্ষে ঈশ্বর ছিলেন কেবলই স্বর্গবাসী দেবতা নন, তিনি ছিলেন সর্বজীবরূপী জাগ্রত নারায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদৃষ্টি ও পরমানুভূতি লাভ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।'

সর্বভূতে ঈশ্বরকে দর্শন ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবতাধর্মের বীজ রোপণ করেছিলেন প্রথমে গুরুগতপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে ও পরে এই মানববর্মবাদে বিশ্বমানবের অন্তরে রোপিত হয়েছিল। মানুষকে ভালবাসা ও নিঃস্বার্থভাবে শিবজ্ঞানে জীবের সেবা করা, বা নারায়ণজ্ঞানে নরের সেবা করা বড়ই কঠিন—কঠিন 'সর্বব্রহ্মময়ং জগৎ' বা 'ঈশা কাষ্যমিদং সর্বম্'—এই সর্বাত্মক জ্ঞানের উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত। আশ্চর্যময় আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মানবধর্মবাদে দীক্ষিত হয়েই স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্র বিশ্ববাসীকে 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার'-মন্ত্র শুনিয়েছিলেন।

●

॥ শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তবামৃতম্ ॥

(ভাবানুবাদসমেতম্)

স্বামী জীবানন্দ

ব্রহ্মযুক্তনিত্যশক্তিসৃষ্টজীব পালিকাং
রামকৃষ্ণশক্তিশুদ্ধবুদ্ধিমুক্তিদায়িকাম্ ।
রামকৃষ্ণ-ভাবসিক্ত-রামকৃষ্ণবল্লভাং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥১

ব্রহ্মের সহিত যুক্ত শক্তি সনাতনী সৃষ্টজীবে করেন পালন,
শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি শুদ্ধ বুদ্ধি মুক্তি অকাতরে যাঁর বিতরণ,
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবে স্নাত সিক্ত তাঁর সুযোগ্য সহধর্মিণী,
প্রণতি শ্রীপাদপদ্মে সারদাদেবীর যিনি মহাবিশ্বের জননী ।

ব্রহ্মশক্তিদিব্যরূপসর্বসৃষ্টিভাসিকাং
জ্ঞানভক্তিপূর্ণমূর্তি-নিত্যসত্য-সুস্থিরাম্ ।
প্রেমভক্তি-রাগভক্তিনিত্যমোক্ষদায়িনীং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥২

ব্রহ্মশক্তি জ্যোতির্ময়ী সৃষ্ট চরাচর যাঁর দিব্য আলো-উদ্ভাসিত,
জ্ঞান ও ভক্তিতে পূর্ণ মূর্তি অনুপম সনাতন সত্যে প্রতিষ্ঠিত ।
প্রেম ভক্তি অনুরাগ পরম শুচিতা নিত্য মোক্ষ ভক্তে দেন যিনি,
সেই সারদাদেবীরে নমি ভক্তিভরে তিনি মহাবিশ্বের জননী ।

রামকৃষ্ণপূজিতাং সুপাবনীং ভবেশ্বরীং
দৃষ্টিপাত-শুদ্ধিদান-দক্ষ জন্মঘাতিনীম্ ।
রামকৃষ্ণশুদ্ধনিত্যভক্তিদানতৎপরাং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৩

করেন শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা যাঁর তিনি ভগবতী পরমা-পাবনী,
কৃপাদৃষ্টিপাতমাত্রে শুচিতা-প্রদানে জন্মের বন্ধন-বিনাশিনী,
রামকৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিত্য অহৈতুকী শুদ্ধাভক্তি প্রদানকারিণী,
সারদাদেবীর পদে নতি নিরন্তর তিনি মহাবিশ্বের জননী ।

রামকৃষ্ণনামমুগ্ধ তৎ সুধাকথাপ্রিয়াং
রামকৃষ্ণ লুপ্ত-চিত্ত-সর্বকামবর্জিতাম্ ।
বিশ্বলোকপূজ্য-নিত্যসিদ্ধসাধিকাসতীং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৪

শ্রীরামকৃষ্ণের নামে মুগ্ধ অতিশয় শ্রবণপিয়াসী কথামৃত,
বিলুপ্ত শ্রীরামকৃষ্ণে চিত্ত প্রাণ মন সকল বাসনা-তিরোহিত।
ভুবনবাসীর পূজ্যা নিত্যসিদ্ধা সতী সকল সাধিকার অগ্রণী,
মাতা সারদার পদে প্রণতি নিয়ত তিনি মহাবিশ্বের জননী।

ভর্তৃদেবরামকৃষ্ণ-শেষকর্মসাধিকাং
দীর্ঘকালপুণ্যযোগ-পূর্ণসিদ্ধিকারিকাম্।
প্রাপ্তসর্বযোগসিদ্ধিপূর্ণকামমাতরং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৫

ভগবান রামকৃষ্ণ পতি দেবতার অবশিষ্ট কর্ম-সম্পাদিকা,
দীর্ঘকাল সাধনায় তীব্র তপযোগে সিদ্ধহেতু নিরত-সাধিকা,
সর্বযোগে পূর্ণসিদ্ধা মাতা আপ্তকাম সকলের কল্যাণকারিণী,
সারদাদেবীর পদে সভক্তি প্রণতি তিনি মহাবিশ্বের জননী।

গেহিকৃত্য-গেহকর্ম-নীতিধর্মদেশিকাং
ত্যাগিসেব্য-দিব্যধর্ম-কায়চিত্তমণ্ডিতাম্।
কোটিভক্তকণ্ঠগীত-মাতৃনাম বন্দিতাং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৬

গৃহস্থ ভক্তজনের কৃত্য কর্ম-ধর্ম-নীতির মহাদর্শ-দায়িনী
সন্ন্যাসীর পালনীয় দিব্যধর্ম ত্যাগে সুমণ্ডিত মন তনুখানি।
কোটি ভক্তকণ্ঠে গীত পুণ্য মাতৃনামে সুবন্দিতা আনন্দদায়িনী,
নিত্য নতি পাদপদ্মে সারদাদেবীর তিনি সারা বিশ্বের জননী।

জ্ঞান-ভক্তিমিশ্র-পূর্ণ-শৌর্য-বীর্যদায়িকাং
ক্লৈব্যমোহ-দীনহীন ভীতিভাবনাশিকাম্।
দৃষ্টবিশ্বরামকৃষ্ণভাবপূতনন্দিতাং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৭

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যিনি দেন অকাতরে শৌর্য-বীর্যসহ পূর্ণভাবে,
দীনহীন ভীতিভাব ক্লৈব্যমোহ সব বিনাশেন যিনি সর্বভাবে,
শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে সারা বিশ্ব পূর্ণ ভাবনেত্রে দেখে দ্রষ্টা যিনি,
সেই সারদাদেবীর শ্রীপদে প্রণতি তিনি মহাবিশ্বের জননী।

সর্বসম্প্রদায়হীন সত্যধর্মদেশিনীং
দেশকালজাতিমধ্য-তুচ্ছ-ভাবনাশিনীম্।
দেশপূজ্য-কালপূজ্য-কার্যহেতু বন্দিতাং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৮

সকল সম্প্রদায়ের কুসংস্কারমুক্ত সত্যধর্মনির্দেশদায়িনী,
দেশ-কাল-জাতিগত স্বার্থপূর্ণ ক্ষুদ্র তুচ্ছভাববিনাশকারিণী,
অতিক্রমি' দেশকাল সদা সর্বপূজ্যা কার্য-কারণাতীতা জননী
সারদাদেবীর পদে নতি নিরন্তর জগতের মাতৃস্বরূপিণী।

আদ্যশক্তি দিব্যমূর্তি-হৃদ্যশান্তিদায়িনীং
বেদমূর্তি সত্যমূর্তি-কল্পবল্লিরূপিণীম্।
ভক্তসন্ততিচিত্তনিত্য-বিত্তবৃদ্ধিকারিণীং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥৯

আদিশক্তি সনাতনী মূর্তি জ্যোতির্ময়ী হৃদয়ে পরা শান্তিদায়িনী,
বেদ ও সত্যের মূর্তি শরণাগতের কাছে কল্পলতা স্বরূপিণী,
ভক্ত সন্তানের চিত্তে শাশ্বত সম্পদ বৃদ্ধি করেন কল্যাণরূপিণী
মাতা সারদাদেবীর পদে নতি নিতি তিনি মহাবিশ্বের জননী।

সর্বভীতিনাশিনীঞ্চ পাপপুণ্যকারিণীং
সুপদেশদায়িনীঞ্চ শোকমোহতারিণীম্।
রামকৃষ্ণ-ভাবযুক্ত-সর্বসিদ্ধিদায়িনীং
তাং নমামি সারদাং হি বিশ্বমাতৃরূপিণীম্ ॥১০

নাশি' সর্বভয় যিনি করেন সতত পাপকেও পুণ্যে পরিণত,
উপদেশ ভ'রে দেন চিত্ত অবিরত, হয় ভক্ত শোকমোহ-মুক্ত।
শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবযুক্ত সিদ্ধি দেন যিনি মঙ্গলকারিণী
সারদাদেবীর পদে নমি ভক্তিভরে তিনি মহাবিশ্বের জননী।

ইতি সানুবাদং শ্রীশ্রীসারদাদেবীস্তবামৃতং স্বামী জীবানন্দেন বিরচিতম্।

॥ সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(তিন)

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : রামপ্রসাদ সিদ্ধ, তাই তার গান ভাল লাগে। ঠিক একই কারণে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া গীতের ছিল সম্মোহনী শক্তি, দুর্দম প্রভাব। তাঁর গান শুনে বৈজ্ঞানিক ডা: মহেন্দ্রলাল সরকার মোহিত হয়েছিলেন, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি 'ডাইলিউট' হয়েছিলেন, সাধক পণ্ডিত পদ্মলোচন অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন। স্বভাবদত্ত সুধাকণ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের গান শুনে প্রেমত্ত নৃত্য দেখে সাধক গায়ক নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, আপনিই সাক্ষাৎ গৌরাঙ্গ"। সংকীর্তনে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবরসান্বিত সঙ্গীত ও ভাবস্বচ্ছন্দ নৃত্য দেখেশুনে ভগবৎ-প্রীতি 'অহর্দিন বাড়ল অবধি না গেল।' রামকৃষ্ণপ্রেমের হিল্লোলে সংকীর্তনের আসর টলমল করে, উপস্থিত সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে।

অপরপক্ষে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শিক্ষায়-দীক্ষায় মানে-বিত্তে বিদ্যায়-বাগ্মিতায় ভারতবাসীর প্রথম সারির নেতা। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের আদর্শের ধারক ও বাহক কেশবচন্দ্রের নিকট বৈষ্ণবকীর্তনাদি বিষতুল্য হওয়া স্বাভাবিক। আদর্শগত এই দায়দায়িত্ব সত্ত্বেও তিনি পরমবৈষ্ণব গরিফার রামকমল সেনের নাতি। শৈশবেই তিনি হরিনাম শিখেছিলেন। যৌবনে ব্রাহ্ম-আন্দোলনে যোগদান করে তিনি ব্রাহ্ম মত-পথ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁর মধ্যে সমুপস্থিত হয়েছিল বিপুল পরিবর্তন। তিনি 'জীবনবেদে' (পৃ: ৬২-৬৩) লিখেছেন : "তখন বিবেকপ্রধানই ছিলাম, সেকালে ব্রাহ্মদের সকলেই প্রায় বিবেকপ্রধান ছিলেন। .. শ্রীমৃদঙ্গের নাম শোনা যায় নি, শ্রীহরিকে ডাকিতে শিখি নাই, শ্রীমতী আনন্দময়ীকে দেখা হয় নাই। শ্রীনাথ, শ্রীপতি প্রভৃতি নাম তখনও ব্রাহ্মেরা ঈশ্বরকে দেন নাই। তখন পিতা ব্রহ্ম ছিলেন, আনন্দময়ীর মন্দির হয় নাই। খোল বাজে নাই, একটিও সংকীর্তন প্রস্তুত হয় নাই।" এ-সকল পরিবর্তনাদি সত্ত্বেও কেশবজীবনে বৈষ্ণবভাব যে ফল্গুধারার ন্যায় চিরপ্রবাহিত ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। কেশবচন্দ্র চন্দননগর পালপাড়ার মোড়ে একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন : আমার পিতা-পিতামহ বৈষ্ণব ছিলেন, আমি ব্রহ্মোপাসক হইয়াছি; কিন্তু আমার হৃদয় চৈতন্যের প্রতি অনুরক্ত। . চৈতন্য আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।...চৈতন্যের এতদিন পরে জন্মিয়াছি; কিন্তু এখনও দেখিতেছি জীবন্ত চৈতন্যের আত্মা ক্রমে ক্রমে নগরে বেড়াইতেছে।"[১২]

কেশবচন্দ্রের জীবনে আসে উপর্যুপরি ঘাত-প্রতিঘাত তদুপরি খ্রীষ্টিয়ানি মতোচিত পাপবোধ ও অনুশোচনা তাঁর বুকে সীসার বোঝার মত চেপে থাকে। তপ্ত-জীবন পীড়িত-মন কেশবচন্দ্র হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যে আবিষ্কার করেন মুক্তির অর্গল। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' (পৃ : ৩০৬)-তে লিখেছেন : "কেহ কেহ বলিলেন সংকীর্তনের সুর অতি মনোহর, পরে স্থির হইল একজন বৈষ্ণবকে আনাইয়া সংকীর্তন শ্রবণ করা হোক। অনন্তর সকলেই বৈষ্ণবের মুখে মৃদঙ্গের সহিত সংকীর্তনের গান শ্রবণ করিয়া প্রীত হইলেন এবং তাহা আপনাদের মধ্যে প্রবর্তিতকরণের ইচ্ছা করিলেন। পরে কেশববাবু

১২। "ধর্মতত্ত্ব", ১লা মাঘ, ১৮০১ শক। পৃ: ২৯৭

একখানি মৃদঙ্গ ক্রয় করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে নিভৃতস্থানে রাখিয়াছিলেন, মধ্যে মধ্যে তাহা বাজাইতেন। সংকীর্তনের সুললিত সংগীত তাঁহাদের সে-সময়ে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।"

নেতা কেশবচন্দ্রের ভাবানুযায়ী প্রাক্তন ও ভবিষ্যতের পরম বৈষ্ণব বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী দুটি গান কীর্তনের সুরে প্রস্তুত করলেন। গান দুটি হ'ল : (১) পাপে মলিন মোরা, চল চল ভাই। / পিতার চরণ ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে। ইত্যাদি ও (২) পতিত-পাবন ভকত জীবন / অখিলতারণ বলরে সবাই। / বলরে বলরে বলরে সবাই। ইত্যাদি। কীর্তনের সুরে এই ব্রহ্মসংগীত সাদরে প্রবর্তিত হ'ল। কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠানে উপাসনা হয়, সে-সময়ে প্রথম প্রকাশ্যভাবে খোলসহ কীর্তন গাওয়া হয়েছিল।[১৩]

ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্তনের প্রধান রচয়িতা ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ওরফে চিরঞ্জীব শর্মা। কিন্তু 'বিধানের কীর্তনীয়া' ছিলেন কুঞ্জবিহারী দেব। নামকীর্তনের সংযোজনে ব্রাহ্মোৎসব ও প্রচার অধিকতর জনপ্রিয় হয়, সেসঙ্গে 'বিবেকপ্রধান' ব্রাহ্মসাধকদের জীবন হয় সরস। সাধকদের চিত্তরূপদর্পণ পরিমার্জিত হয়, ভক্তির ভাবের প্রতিচ্ছবি তাতে পরিস্ফুট হয়।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা ও বক্তৃতার সঙ্গে সংযোজিত হয় সংগীত ও সংকীর্তন। ১৮৬৮ খ্রী : প্রকাশ্য রাজপথে নগরকীর্তন সংগঠন ব্রাহ্ম-আন্দোলনের একটি উল্লেখজনক ঘটনা। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নগর-সংকীর্তনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। নগর সংকীর্তনের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা পাই 'কেশবচরিত' গ্রন্থে : "কেহ ব্রহ্মনামাঙ্কিত নিশান লইয়া রণবীরের ন্যায় অগ্রে অগ্রে চলিতেছে, কেহ নামধ্বনিতে গগণ বিদীর্ণ করিতেছে, কেহ বা পাদুকাবর্জিত-পদে ঊর্ধ্ব-নয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে চলিতেছে; কৃতবিদ্য ভক্তযুবকদের কি অপূর্ব শোভাই তাহাতে হইয়াছিল। ...ভদ্রবেশে গম্ভীরভাবে কীর্তন হইল। উদ্দণ্ড নৃত্য, প্রেমোন্মত্ততা তখনও দেখা যায় নাই। সংকীর্তনের পর নূতন ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়।"[১৪] সেদিন নিম্নলিখিত গানটি মৃদঙ্গ করতাল তূরী ভেরীর সঙ্গে গাওয়া হয়েছিল।

ভোরা আয়রে ভাই
এতদিনে দুঃখের নিশি হ'ল অবসান,
নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।
কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্মসংকীর্তন,
পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন।
দিতে পরিত্রাণ করুণানিধান,
ব্রাহ্মধর্ম করিলেন প্রেরণ;
খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন।
সে দ্বার অবারিত, / কেউ না হয় বঞ্চিত;
তথায় দুঃখী ধনী মূর্খজ্ঞানী সকলে সমান।
নরনারীর সাধনের সমান অধিকার।
যার আছে ভক্তি, / সে পাবে মুক্তি, । নাহি জাতবিচার॥

১৩। ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল : ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, পৃঃ ৩৬৮
১৪। চিরঞ্জীব শর্মা : কেশবচরিত, পৃঃ ৮০

নগরসংকীর্তনে কলকাতা মহানগরী সচকিত হয়ে ওঠে। সেদিন সোমবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৮১ খ্রীঃ যুবক ব্রাহ্মগণ কেশবচন্দ্রের কলুটোলার বাড়ী হতে যাত্রা করে রাজপথ পরিক্রমা করে কমলকুটীরে পৌছায়। সেখানে প্রার্থনা হয়। প্রার্থনার পর "ভক্তগণ সিংহের ন্যায় মত্ত হইয়া, সংকীর্তনের জয়রবে আকাশ ভেদ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে রাজপথে বাহির হন"। গায়কদের গলায় পুষ্পমালা, গায়ে ছিল গেরুয়া উত্তরীয়। খানা খোল, করতাল, রামশিংগা, ভিগর, ঘন্টা, গং বিচিত্র সুরে বাজছিল। নানান রংয়ের ২৯টি বিজয় নিশান, সর্বোপরি নববিধানাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা শোভা বৃদ্ধি করেছিল। "আর নগরকীর্তন যেরূপ জমাট হইয়াছিল এ প্রকার আর কখনও হয় নাই। মহানগরীর বক্ষ দিয়া যেন একটি ঝড় বহিয়া গিয়াছিল"। (ধর্মতত্ত্ব, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০২ শক)। এভাবে দেশের অভিজাত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কীর্তনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন কেশবচন্দ্র।

"১৮০৩ শকের বৈশাখের (১৮৮১ খ্রীঃ) প্রথম দিন হইতে নগরের পথে পথে সদলে নববিধানের হরিলীলা-মাহাত্ম্য গান করিতে লাগিলেন। প্রায় একমাসকাল নগরের নানাস্থানে যেরূপ মত্ততার সহিত তিনি (কেশবচন্দ্র) হরিপ্রেম বিলাইতেছিলেন, তাহাতে সমগ্র কলকাতা সহরে ভক্তি ও প্রেমের মধুর তরঙ্গাবলি উত্থিত হইয়াছিল।"[১৫] প্রেমভক্তি বিতরণকারী কেশবচন্দ্রের মনোহর একটি চিত্র এঁকেছেন চিরঞ্জীব শর্মা। তিনি লিখেছেন: কেশবভিখারী নগরের দ্বারে দ্বারে হরিপ্রেম-সুধা বিলাইয়া গেলেন, একথা বঙ্গদেশ যেন কখন বিস্মৃত না হয়। অনাবৃতপদে, একতন্ত্রীহস্তে, গৈরিক অঙ্গাবরণ ধারণ করিয়া তিনি পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিতেন। বৈশাখের গ্রীষ্মতাপে শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, দর্শকবৃন্দ আসিয়া চতুর্দিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে, নর্দমার দুর্গন্ধে নাক জ্বলিয়া যাইতেছে, তথাপি কেশবের শ্রান্তি বোধ নাই। অন্য সময় তিনি অর্ধক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন না, কিন্তু প্রচার-যাত্রায় বাহির হইয়া তিনি চারিঘন্টা কাল দাঁড়াইয়া বক্তৃতা ও সঙ্গীত করিতেন, দুই-তিন মাইল পথ খালি পায়ে চলিয়া যাইতেন। নগরের পথে গান করিতে বাহির হইলে প্রায় প্রতিদিন দুই-একজন সুরাপায়ী আসিয়া জুটিত। তাহারা জগাই-মাধাইয়ের ন্যায় কীর্তনের সঙ্গে নানা রঙ্গভঙ্গ করিত, কেহ বা নাচিত গাইত। কোথাও বা ভদ্র গৃহস্থেরা ফুলের মালা, গোলাপজল দ্বারা গায়কগণের সম্মান বর্দ্ধন করিতেন। এইরূপে ভিখারীর বেশে কেশবচন্দ্র কখন রাজভবনের দ্বারে, কখনও দুঃখী গোপগৃহে, কখনও বা হিন্দু পল্লীমধ্যে, কখনও খ্রীষ্টীয় প্রাঙ্গণে হরিগুণ গাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন।"[১৬] এ-কালের ব্রাহ্মসঙ্গীত ছিল মাতৃভাষায় রচিত; রামপ্রসাদী, বাউল ও ভাটিয়ালীর সুরে গাওয়া হত। কীর্তন-গায়ক কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আরও কিছু মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। "হরিনামে বিভোর হইয়া মহাপ্রাণ কেশবচন্দ্র নৃত্যের সময় প্রফুল্ল মনে পায়ে নূপুর ও হাতে সোনার বালা পরিয়া কখনও হাসিতেন, কখনও কাঁদিতেন, কখনও হুঙ্কার করিতেন।"[১৭]

১৫। যোগেশচন্দ্র গুপ্ত: কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃঃ ৭৮
১৬। চিরঞ্জীব শর্মা: কেশবচরিত, পৃঃ ১৭৯
১৭। যোগেশচন্দ্র গুপ্ত: কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য, পৃঃ ৭৯

॥ মাতৃ-সঙ্গীত ॥

(মূলতান—ঝাঁপতাল)

স্বামী চণ্ডিকানন্দ

প্রাণ-সুরধুনী-তীরে বেলুড়-মাতৃ-মন্দিরে
আনোদর-গঙ্গা-তীরে জয়রামবাটী-মন্দিরে
কে তুমি করুণাময়ি ! সারদা নামধারিণী ॥
মৃণাল ভুজ-যুগল প্রসারিত অবিরল
বিতরিছ বরাভয় সবারে দিবা-যামিনী ॥
দেব-দেবী-অবতার তাঁরা তো তনয় তোমার
ভুবন-মঙ্গলা মা গো ! তুমি কি বিশ্বজননী ।
রামকৃষ্ণময়ি মাগো ! তুমি কি বিশ্বজননী ॥

॥ স্বরলিপি ॥

×	২	০	৩	×	২	০	৩	
ন্ স	ক্ ঞ্ ঙ্	প ণ	প প —	ঞ্ ঙ্	পন দপপ	ঙ্ প	ঙ্ প	ঙ্ ঞ্
প্রা ণ —	সু — র	ধু নী	তী রে —	বে লু	ড় — মা	তৃ ম	ন্দি	রে —
আ মো	দ — র	গ ঙ্গা	তী রে —	জ য়	রা ম বা	টী ম	ন্দি	রে —
ণ্ ঞ্	ঙ্ প প	প ণ দ	প — প	ঞ্ ঙ্	প ণ প	ঙ্ ঞ্	ঙ্ স	— ।
কে তু	মি — ক	রু ণা	ম — য়ী	"সা র	দা" — না	ম ধা	রি ণী	— ।
স ঞ্	ঙ্ — স	স স	স স —	স দ্	ন্ স স	স ঞ্	স স	—
মৃ ণা	ল — ভু	জ যু	গ ল —	প্র সা	রি — ত	অ বি	র ল	—
স ঞ্	ক্ প প	প ণ দ	প প —	প ঞ্	ঞ্ প দ প	ম ঞ্	ঞ্ স	— ॥
বি ত	রি — ছ	ব রা	ভ য় —	স বা	রে — কি	বা যা	মি নী	— ॥
প ঞ্	ঙ্ প ন	প র্স	র্স র্ —	র্স র্ঞ্	র্ঞ্ ঙ্ র্স	ন র্স	ণ দ	প
দে ব	দে — বী	অ ব	তা র —	তাঁ রা	তো — ত	ন য়	তো মা	য়
ঞ্ ঙ্	প — প	ন র্ন	দ প প	প ঞ্	ঞ্ প দ প	ম ঞ্	ঞ্ স	—
ভু ব	ন — ম	ঙ্ গ লা	মা — গো	তু মি	কি — বি	শ্ব জ	ন নী	—
রাম	কৃ — ষ্ণ	ম য়ি	মা — গো	তু মি	কি — বি	শ্ব জ	ন নী	— ॥

॥ বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজ-বিকাশের ধারা ॥

স্বামী সোমেশ্বরানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

সংস্কৃতি-করণের কয়েকটি উদাহরণ আমরা দেখলাম। কিভাবে একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় সমাজের উচ্চবর্গে উঠে যায় এ-কথা আমরা পরেও আলোচনা করবো। এখানে যে-কথাটি বলা দরকার সেটি হলো, এই সংস্কৃতিকরণের পেছনে চারটি মৌল সামাজিক শক্তি কাজ করে—জ্ঞান, শৌর্য, অর্থ এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা। ইহুদী জাতি ও ভারতীয়দের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় জ্ঞানের অধিকারী হয়ে পুরোহিতকুল উচ্চবর্গে স্থান লাভ করেছিলেন। [এ-সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করবো।] শৌর্য কিভাবে সংস্কৃতি-করণে প্রধান ভূমিকা নেয় সে-কথা আমরা দেখেছি আসিরিয়া ও ব্যাবিলোনীয়ার ইতিহাসে। মিশরের সাম্রাজ্যবাদী যুগে আমরা দেখেছি অর্থ ও চাষযোগ্য জমির ওপর কিভাবে সংস্কৃতি-করণের পেছনে চালিকা-শক্তি হিসেবে জনসংখ্যার গরিষ্ঠতার প্রভাব। [আমাদের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করার সময় এই চারটি মৌল সামাজিক শক্তির ভূমিকা আরও বেশী করে চোখে পড়বে।]

'ব্যাপক মিলনের যুগ'-এ সংস্কৃতিকরণ প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সমাজ-বিকাশে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্যবোধ এনে দিয়েছিল এটি। সামাজিক ঐক্যবোধই এর একমাত্র পরিচয় নয়; সেই সাথে এটি নিয়ে এসেছিল নতুন বৈচিত্র্য। স্বামীজীর ভাষায়: "সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠার সময় হইতেই এই দুইটি শক্তি কাজ করিয়া আসিতেছে—একটি ভেদ সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি ঐক্য স্থাপন করিতেছে। ইহাদের ক্রিয়া বিভিন্ন আকারে দেখা দেয় এবং ইহা বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়।...একটি বর্ণবৈষম্য সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি উহা ভাঙিতেছে; একটি শ্রেণী অধিকার সৃষ্টি করিতেছে, অপরটি সেগুলি ধ্বংস করিতেছে।...সমগ্র বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এবং ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের ক্রীড়াক্ষেত্র...।"[৫৩] প্রাচীন যুগের ইতিহাসে আমরা দেখি যখনই দু'টি জাতি পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে সংঘর্ষ বা মিলনের মাধ্যমে তখনই নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সমাজ বিকশিত হয়েছে, পাল্টেছে মানুষের জীবনধারা ও চিন্তাধারা। নতুন সভ্যতায় দু'টি জাতিরই অবদান ছিল। এই নতুন সভ্যতায় একটি ঐক্যবোধেরও সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে আবার নতুন বৈচিত্র্যও উপস্থিত হয়েছে। একদিকে মানুষ যেমন আঞ্চলিক সত্তা থেকে মুক্তি পেয়ে বৃহত্তর সামাজিক পরিধিতে নবজীবন লাভ করেছে, অন্যদিকে ব্যক্তিসত্তা নতুন তিনটি চেতনাকে আশ্রয় করে বৈষম্যেরও সৃষ্টি করেছে। এই তিনটি চেতনা হলো—নিজস্ব দৈহিক, মানসিক ও কর্মকুশলতার বৈশিষ্ট্য। আদিমযুগের গোষ্ঠীচেতনা সমাজ-চেতনায় বিবর্তিত হয়ে নতুন সভ্যতার সৃষ্টি করলো ব্যক্তিচেতনা। পরিবারের সৃষ্টি হয়েছিল আগেই। ব্যাপক মিলনের যুগে এই পরিবার-চেতনায় অনুপ্রবেশ ঘটলো 'প্রাইভেসী'র (privacy)। অনুরূপভাবে মানসিক দিক দিয়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির সৃষ্টি হলো। এবং বিভিন্ন ধরনের কাজ

৫৩। বাণী ও রচনা ৩ : ৩৪৬, ৩৪৯

মানুষকে তার কর্মকুশলতা অনুযায়ী ঠেলে দিল 'স্পেশালাইজেশনের' (specialisation) দিকে।[৭৭]

পরিবার-চেতনার ফলেই আমরা টোটেম-প্রথার (Totem) বদলে পাই বংশগুলির পদবীর সৃষ্টি কোনো মানুষের নামে। কেবল রাজবংশ বা ক্ষত্রিয়বংশই নয়, সাধারণ মানুষও নিজস্ব বংশ-পরিচয়কে প্রধান করে তুললো। এইভাবে "সমাজের মধ্যে সমাজ" সৃষ্টি হতে লাগলো। এই ভাব ক্রমশঃ বংশকে ছাড়িয়ে প্রবেশ করলো পরিবারে। সংসারে মা-বাবা-ছেলে-মেয়ে প্রত্যেকেই নিজস্ব সত্তা নিয়ে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলো যার ফলে বাড়ির মধ্যে ঘরের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। শোবার ঘর, রান্নার ঘর, ড্রইংরুম ইত্যাদির প্রয়োজন মানুষ বুঝতে শিখলো।

দৈহিক দিক দিয়ে এভাবে মানুষের নিজস্ব সত্তা বিকশিত হয়ে ওঠার সাথে সাথে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে মানুষ নিজস্বভাবে চিন্তা করতে শুরু করলো এবং এভাবে ক্রমশ তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটলো অন্যান্য ক্ষেত্রেও। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষ স্বাধীন চিন্তায় উৎসাহিত হয়ে উঠলো। একই সমস্যাকে নানা জনে নানা দিক থেকে দেখতে লাগলো যার ফলে একই সমস্যার নানান সমাধান উদ্ভাবিত হতে লাগলো। সেইসাথে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্নটিও বড় হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন সমাজের মিলন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে সমাজ তার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজ দাবী করলো এবং সেই সাথে স্বভাবতই আশা করলো কর্মে আরও বেশি কুশলতা। এর ওপর যেহেতু এই কর্মকুশলতার ব্যাপারেই নির্ভর করছে মানুষের সামাজিক সম্মান, অতএব মানুষ আগের চেয়ে বেশি করে স্পেশালাইজেশনের দিকে নজর দিলো। এই তাগিদই মানুষকে বংশানুক্রমিক বৃত্তির দিকে ঠেলে দিলো।

এভাবে সামাজিক সত্তা অতিক্রম করে যে ব্যক্তি-সত্তার উদয় হয়েছিল তা অনেক সময়ই ইতিহাসে আকস্মিক ঘটনার সৃষ্টি করেছে। নগর-রাষ্ট্রে তৃপ্ত গ্রীক জাতি হঠাৎ সাম্রাজ্য-বিস্তারে কেন মন দিলো, এর কারণ হিসেবে আলেকজাণ্ডারের ব্যক্তিগত উচ্চাশাকেই ধরতে পারি। অনুরূপভাবে ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয় ইহুদীজাতি রাজা ডেভিডের অনুপ্রেরণায় হিংস্র ও বিলাসী হয়ে উঠেছিল। যদিও এগুলিকে ইতিহাসের 'আকস্মিক ঘটনা' বলছি তবুও এগুলির পেছনে সামাজিক কারণও ছিল। আসলে, সমাজের মধ্যে ব্যাপক-মিলনের যুগে নানান পরিবর্তন এলেও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে যে একেবারে লোপ করা যায় না সে-সম্বন্ধে আমরা আগে আলোচনা করেছি। ইতিহাসের বিভিন্ন কালে এই চাপা-পড়ে-যাওয়া আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে দেখি কোন ব্যক্তি-বিশেষকে কেন্দ্র করে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে। তাছাড়া, বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেলেও জাতিগুলির কয়েকটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না, নতুন রূপ লাভ করে মাত্র। এ-প্রসঙ্গে স্বামীজীর মন্তব্য—"এই সকল ভাব—

৭৭। তুলনীয় Marshall McLuhan : Understanding Media—The Extension of Man. [New York, Eleventh Printing], p. 104

পাঁচাপেঁচি, মহা গেরোর উপর গেরো, তস্ত গেরো হয়ে বর্তমান মহা জটিল সমাজ উপস্থিত হলেন। কিন্তু ছিট মরে না। যেগুলো পূর্ব জন্মে [অর্থাৎ সভ্য হবার আগে] ভেড়া চরাত, মাছ ধরে খেত, সেগুলো সভ্য-জন্মে বোম্বেটে ডাকাত প্রভৃতি হতে লাগলো। ... সে 'প্রাতঃস্মরণীয়া'দের কালের মেয়ে, এ জন্মে তো আর এক সঙ্গে অনেক বর যে করতে পায় না, কাজেই হয় বেশ্যা।"[৫৮] "অন্য সব দেশে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়েরা। রাইন-নদীর তীরবর্তী কোন অভিজাতবংশীয় ব্যক্তিকে নিজের পূর্বপুরুষরূপে আবিষ্কার করিতে পারিলে রোমের পোপ খুবই খুশী হইবেন।...ভারতের শ্রেষ্ঠ নরপতি অতীতের কোন অরণ্যচারী সংসারবিরাগী, সর্বত্যাগী, ভিক্ষাজীবী, ইহকাল ও পরকালের তত্ত্বালোচনায় জীবনযাপনকারী ঋষিকে পূর্বপুরুষ বলিতে পারিলে আনন্দিত হইবেন।"[৫৯]

স্বামীজীর এই মন্তব্যের প্রমাণ পাই ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। মিশর, ভারত ও চীনের মৌল সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সাম্রাজ্যবাদের কোন স্থান ছিল না। আধুনিক কাল পর্যন্ত এই দেশ তিনটির সুদীর্ঘ ইতিহাসেও আমরা দেখি এরা সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় দেয়নি। মাঝে মাঝে কোনও সময়ে তারা চিরাচরিত রীতি ভেঙে সাম্রাজ্যবাদীর আচরণ দেখিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তাদের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসের এক খণ্ডাংশ মাত্র। বিপরীতদিকে ইওরোপীয় জাতিগুলির স্বভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ইতিহাসের পাতায় দেখি কেবল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদই নয়, ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদেও এরা অতুলনীয়। ছলে-বলে-কৌশলে ধর্মান্তরকরণে ইওরোপীয়রা যে প্রতিভা দেখিয়েছেন তা মূলত তাদের সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতারই একটি রূপ। দক্ষিণ আমেরিকায় মায়া সভ্যতার ধ্বংস অনেক আগে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ঐ অঞ্চলের লোকেরা আজও তাদের মৌল সত্তা ত্যাগ করতে পারেনি। আফ্রিকায় আজ নবজাগরিত বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জনসাধারণ আজও সেই উপজাতীয় আকলিকতায় বিশ্বাসী।

আরও গভীরে গিয়ে বলা যায় প্রত্যেক জাতিরই একটি 'প্রাণ' [স্বামীজী যাকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন "জাতীয় উদ্দেশ্য"[৬০]] আছে। প্রাচীনযুগের গ্রামমাণ জীবনে বা স্থিতিশীল জীবনে যখন সভ্যতার আলোকে জেগে ওঠার সময় হয়েছিল তখন প্রাকৃতিক পরিবেশ এই প্রাণকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়েছিল। এই নির্দিষ্ট রূপটিই হল[৬১] জাতির বৈশিষ্ট্য। একই জাতি গ্রামমাণ জীবনে বিভিন্ন পরিবেশে গিয়ে সভ্য হলে তাদের বৈশিষ্ট্যও বিভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীকালে ভিন্ন প্রকৃতির জাতির সাথে মিলনে এই বৈশিষ্ট্যের ওপর দেশজ-কালজ (of time and space) আবরণ পড়ে। এবং এই আবরণের ওপরই নির্ভর করে জাতিটির ভবিষ্যৎ। উদাহরণ দিয়ে[৬২] বোঝানো যাক। ধরুন 'ক' একটি জাতি।

৫৮। বাণী ও রচনা ৩ : ২০৪
৫৯। ঐ ৩ : ৩৭৮
৬০। ঐ ৬ : ১৭৮
৬১। ঐ ৮ : ৩৭
৬২। ঐ ৮ : ৩৩৩-৪

এর জাতীয় উদ্দেশ্য—বন্ধন থেকে মুক্তি। এখন কালপ্রবাহে ক-জাতিটি তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তিন রকম প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে পড়লো। নদী-বিধৌত সমতল অঞ্চলে যাওয়ার জন্য ক-১ জ্ঞান-বিজ্ঞানে বেশি মনোযোগী হলো এবং এইভাবে মুক্তি-ধারণা আধ্যাত্মিক মুক্তি হিসেবে জাতির মনে নির্দিষ্ট রূপ নিলো। ক-২ সমুদ্র-উপকূলে বাসা বেঁধে নগর-রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে গণতান্ত্রিক শাসন গড়ে তুললো। প্রাকৃতিক পরিবেশ এদের নাবিক করে তোলায় এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধের জন্য নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীচুক্তি করে দেশ-বিদেশে বেরিয়ে পড়লো এবং এভাবে বণিক হয়ে উঠে অর্থনৈতিক সুখ-সুবিধের দিকে নজর দিলো। ফলে জাতীয় উদ্দেশ্য 'মুক্তি' ক-২ জাতির কাছে 'অর্থনৈতিক মুক্তি'-রূপ জাতীয়বৈশিষ্ট্যে পরিণত হলো। আর ক-৩ জাতি বিভিন্ন পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে অন্যান্য জাতির অত্যাচার সহ্য করতে লাগলো। প্রতিক্রিয়া হিসেবে এদের মধ্যেও নিষ্ঠুর একনায়ক নেতার আবির্ভাব হতে লাগলো। এইভাবে এরা ধীরে ধীরে বুঝতে শিখলো মানুষে-মানুষে বিদ্বেষ ও অত্যাচারের পরিণাম কি। স্বভাবতই এরা ব্যক্তি-স্বাধীনতার মর্যাদা বুঝবে এবং এইভাবে মুক্তি-ধারণা এদের মনে 'রাজনৈতিক-মুক্তি' হিসেবে বৈশিষ্ট্যলাভ করবে। এখন এই তিনটি জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়েই সবকিছুকে বিচার করতে শেখে।[৬৩] যেমন ক-১ আধ্যাত্মিক মুক্তি নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ-সম্বন্ধে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার সৃষ্টি করবে, অনুরূপভাবে ক-২ অর্থনৈতিক মুক্তি নিয়ে এবং ক-৩ রাজনৈতিক মুক্তি নিয়ে। ক-২ অর্থনৈতিক মুক্তির একটি নতুন পথ উদ্ভাবন করে অন্য দুটি জাতিকে দিতে চাইলে ক-১ বিচার করবে আধ্যাত্মিক মুক্তির পথে এই নতুন অর্থনৈতিক পথটি সাহায্য করতে পারবে এবং ক-৩ বিচার করবে রাজনৈতিক মুক্তির পথে এটি কতদূর সহায়ক।

আর যখন দুটি জাতির মধ্যে সংঘর্ষ বা শান্তির মাধ্যমে মিলন ঘটবে তখন তিনটি বিকল্প দেখা যেতে পারে। ধরুন, 'খ' ও 'গ' দুটি জাতির মিলন[৬৪] ঘটলো। এখন খ-জাতি যদি গ-জাতির শাসনাধীন হয় তবে (১) খ-জাতির বৈশিষ্ট্য নিস্তেজ ও সংকুচিত হতে পারে, (২) খ-জাতি মুগ্ধ হয়ে গ-জাতির অনুকরণ করতে পারে এবং এর ফলে একটি সংকর (crossed) বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলতে পারে, (৩) খ-জাতি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গ-জাতিকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে জয় করতে পারে। স্বামীজী এর উদাহরণ 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' ও 'পরিব্রাজক' বই দুটির বহু জায়গায় দিয়েছেন।[৬৫]

●

৬৩। ঐ ৫ : ১১১

৬৪। তুলনীয় প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় : ইতিহাস ও অভিব্যক্তি (Philosophy of History), [যাদবপুর, ১৯৭৯], পৃঃ ৩৮১

৬৫। দ্রষ্টব্য বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড

॥ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী অভেদানন্দ 'Saviours of the World' গ্রন্থে বিভিন্ন ধর্মপ্রবক্তার জীবন ও উপদেশ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন, সমস্ত ধর্মই বেদান্ত ধর্মে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য লাভ করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই বেদান্তধর্ম কি ?

'Vedanta towards Religion' গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে স্বামীজী বলেন, জ্ঞান বৃক্ষের ফুল হ'ল ফিলসফি এবং ফল হ'ল ধর্ম'।[১] ধর্মের ঔপপত্তিক দিক (theoretical aspect) হচ্ছে ফিলসফি, আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ফিলসফিই হ'ল ধর্ম (Religion is philosophy in practice)। নিহিতার্থ এই যে, জ্ঞানকে যদি একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা করা হয় তবে ফিলসফিকে তুলনা করা যায় তার ফুলের সঙ্গে এবং ধর্মকে ফলের সঙ্গে। ফুল যেমন ফলে পরিণতি লাভ করে, তেমনি ফিলসফি ধর্মে পরিণত হয়। ফিলসফিতে আমরা তত্ত্ব নিয়ে বিচার, বিশ্লেষণ করি আর ধর্মে এই তত্ত্বের সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি হয়। সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধি হ'ল অপরোক্ষানুভূতি বা অপরোক্ষজ্ঞান। বিচার পরোক্ষজ্ঞান। অপরোক্ষজ্ঞান সব সময়ই পরোক্ষ জ্ঞানের চেয়ে নিশ্চয়তার দিক থেকে উৎকৃষ্ট। তত্ত্বসাক্ষাৎকার হলেই তত্ত্ববিচারের শেষ হয়। এইদিক থেকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারকে তত্ত্ববিচারের পরিণতি বলা যায়। ভারতীয় দর্শনে 'ফিলসফি' ও ধর্মের সমন্বয় হয়েছে। আমরা ভারতবর্ষে দর্শনে ঔপপত্তিক বিচার-বিশ্লেষণ বা ফিলসফি নিশ্চয়ই করি ; কিন্তু এই বিচারের উদ্দেশ্য হ'ল সাক্ষাৎকার বা ধর্ম। 'দর্শন' শব্দের একটা অর্থ তত্ত্বদর্শন বা তত্ত্বসাক্ষাৎকার। আমরা তত্ত্ব নিয়ে বিচার করি তার অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জন্য। আমাদের দেশে দর্শন শুধু তাত্ত্বিক (ফিলসফি) নয়, ব্যবহারিক (ধর্ম)ও। সেজন্যই আমাদের দেশের প্রত্যেক দার্শনিকই আচার্য। অর্থাৎ, তিনি শুধু তত্ত্বচর্চা করেন না, তত্ত্বভিত্তিক জীবনযাপন করেন। আমাদের দেশে সেজন্যই আস্তিক দর্শনে শুধু মননের কথা নেই, নিদিধ্যাসনের কথাও আছে। বৌদ্ধদর্শনে শুধু প্রজ্ঞার কথা নেই, শীলের কথাও আছে।

ফিলসফির পরিণতি ধর্ম বলে বেদান্তধর্ম আলোচনা করতে হ'লে বেদান্ত ফিলসফি আলোচনা করতে হ'বে। স্বামী অভেদানন্দ 'An Introduction to the Philosophy of Panchadasi' গ্রন্থে 'বেদান্ত' শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, সংস্কৃতে 'বেদ' ও 'অন্ত'-শব্দ দুটির সমন্বয়ে 'বেদান্ত' শব্দটি গঠিত হয়েছে। 'বেদ' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে। 'বিদ্' ধাতুর অর্থ জানা। সুতরাং 'বেদ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান বলতে বহির্বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে, আবার আন্তর বিষয়ের জ্ঞানও হ'তে পারে ; প্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান হ'তে পারে, আবার অপ্রাকৃত বিষয়ের

১। 'Of the true of Knowledge, Philosophy is the flower while religion is the fruit.'

জ্ঞানও হ'তে পারে, সাপেক্ষ বিষয়ের (অর্থাৎ, যে বিষয় অন্য বিষয়ের ওপর নির্ভর করে) জ্ঞান হতে পারে, আবার এমন সত্তার জ্ঞানও হ'তে পারে যা সাপেক্ষ নয়, অনিত্য নয়। 'অন্ত' শব্দটির অর্থ 'শেষ'। সুতরাং 'বেদান্ত' হচ্ছে জ্ঞানের শেষ বা চরমজ্ঞান। স্বামী অভেদানন্দ বলেন, নিরপেক্ষ ও শাশ্বতের জ্ঞানই চরমজ্ঞান। ব্রহ্ম বা আত্মা নিরপেক্ষ ও শাশ্বত। ব্রহ্ম বা আত্মা অন্য কারও অপেক্ষা করে না বলে নিরপেক্ষ এবং ধ্বংস ও পরিবর্তন রহিত বলে শাশ্বত। বেদান্ত আসলে ব্রহ্ম বা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্ম বা আত্মার প্রকৃতি আলোচনা বেদান্ত-দর্শনের কাজ, আর ব্রহ্মোপলব্ধি বা আত্মসাক্ষাৎকার বেদান্তধর্মের উদ্দেশ্য।

বেদান্ত বলতে আমরা উপনিষদও বুঝি। উপনিষদের মূল আলোচ্য ব্রহ্ম বা আত্মা। উপনিষদকে বেদের অন্ত বা শেষ বলা হয় কেন, তা অন্যভাবেও বোঝা যায়। প্রথমতঃ বৈদিক যুগের সাহিত্যসৃষ্টির কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদের স্থান সর্বশেষে। বৈদিক যুগের সাহিত্য সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদ। বৈদিক মন্ত্রের সমাহারই সংহিতা। সংহিতা চারটি—ঋক্, যজু, সাম এবং অথর্ব। ঋষিরা সংহিতার দ্রষ্টা। বৈদিক যাগযজ্ঞের বিভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে ব্রাহ্মণ। পুরোহিতদের সঙ্গে ব্রাহ্মণের যোগ। ব্রাহ্মণ বৈদিক সাহিত্যের কালানুক্রমিক বিচারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সংহিতার পরই ব্রাহ্মণের স্থান। বৈদিক যুগের সর্বশেষ সাহিত্য উপনিষদ। বিভিন্ন দার্শনিক সমস্যাই উপনিষদের আলোচ্য। দার্শনিকদের সঙ্গে উপনিষদের যোগ। এই তিন প্রকার সাহিত্যই ব্যাপকতর অর্থে বেদ নামে পরিচিত। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যে সর্বশেষ স্থানে থাকার জন্য বেদান্ত। দ্বিতীয়তঃ পাঠবিধি অনুসারেও উপনিষদের স্থান সর্বশেষে। ভারতবর্ষ মানুষের জীবনকে চারটি আশ্রমে বিভক্ত করেছে—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস। জীবনের প্রারম্ভকালে ব্রহ্মচর্য। অধ্যয়নই তখন মানুষের একমাত্র কর্তব্য। তারপর সংসারধর্মপালন এবং এরই নাম গার্হস্থ্য। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করলেই সংসার ছেড়ে বনে যাওয়ার নির্দেশ। একেই বলে বানপ্রস্থ। সর্বশেষে সন্ন্যাস। সন্ন্যাস গ্রহণ করার অধিকার সকলের নেই। নিজেদের উৎসাহ, ঐকান্তিকতা এবং নিষ্ঠার দ্বারা যাঁরা সন্ন্যাসলাভের অধিকার অর্জন করেন, একমাত্র তাঁরাই সন্ন্যাসী হ'তে পারেন। শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচর্য আশ্রমে সংহিতা পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। গার্হস্থ্যকালে গৃহস্থধর্ম অনুসরণের জন্য ব্রাহ্মণ পাঠের আদেশ। ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট যাগযজ্ঞ করা গৃহস্থের পবিত্র কর্তব্য। সর্বশেষে মানুষ যখন সংসার ছেড়ে বনে যাবে, তখনই সে উপনিষদ পাঠের জন্য বিশেষ যোগ্য হবে। জগতের কোলাহল থেকে দূরে বানপ্রস্থকালেই মানুষ স্থির মস্তিষ্কে দার্শনিক সমস্যাবলী ও তাদের সমাধান উপলব্ধি ও অনুসরণ করতে সক্ষম। সেজন্যই শাস্ত্রকারেরা উপনিষদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন জীবন-সন্ধ্যায়। উপনিষদই বৈদিক সাহিত্যগুলোর মধ্যে সর্বশেষে পাঠ্য বলে একে সঙ্গতভাবেই বেদান্ত বলা যায়। তৃতীয়তঃ বৈদিক চিন্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ও পরিণতি উপনিষদেই লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদের চিন্তার চেয়ে মহত্তর চিন্তা শুধু বৈদিক যুগে কেন, পৃথিবীতে কোন যুগেই হয়েছে কি-না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বলেছেন, সমগ্র জগতে উপনিষদ পাঠের

মত উপকারী ও উন্নয়নকারী অন্যকোন পাঠই নেই। উপনিষদ আমাকে জীবনে শান্তি দিয়েছে, মৃত্যুতেও শান্তি দেবে'।[২] বৈদিক চিন্তার চরম প্রকাশ বলেও উপনিষদকে বেদান্ত বলা হয়।

বেদান্তদর্শনের ভিত্তি প্রস্থানত্রয়—শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায়প্রস্থান। বেদোপনিষদ শ্রুতি প্রস্থান; একসময় বেদোপনিষদ গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, গুরু বলতেন এবং শিষ্য শুনতেন, এইভাবেই বেদোপনিষদ শ্রুতি নামে পরিচিত। ভগবদ্গীতাকে স্মৃতিপ্রস্থান এবং বাদরায়ণ ব্যাস রচিত ব্রহ্মসূত্রের ওপর বিভিন্ন আচার্যের ভাষ্য ন্যায়প্রস্থান বলা হয়। বেদান্তদর্শনের বিরাট অট্টালিকা শ্রুতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান এবং ন্যায় প্রস্থান—এই তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, শ্রুতিপ্রস্থান যেমন উপনিষদকে বোঝায়, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রও আসলে উপনিষদই। কিভাবে, তাই আলোচনা করছি। গীতামাহাত্ম্যে বলা হয়েছে—'সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতম্ মহৎ'। সমস্ত উপনিষদ গাভী সদৃশ, গীতা এই গাভীর অমৃতরূপ দুগ্ধ, দোহনকারী গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, প্রথম ভোক্তা বৎসরূপ পার্থ এবং শেষে সমস্ত সুধীজনই তা পান করেন। নিহিতার্থ এই যে, গোপালনন্দন শ্রীকৃষ্ণ উপনিষদরূপ গাভী দোহন্ করে গীতারূপ দুগ্ধ পার্থরূপ বৎসকে পান করতে দিয়েছিলেন এবং পরে সেই দুগ্ধ সমস্ত সুধীজন পান করছে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, গীতা উপনিষদেরই সার বা দুগ্ধ। আবার বাদরায়ণ ব্যাস অসংখ্য উপনিষদে বিভিন্ন মত লক্ষ্য করে তাতে মানুষের মনে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় তারজন্য উপনিষদের মূল শিক্ষা সূত্রাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তা-ই ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত। এই সূত্রগুলোর প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বলে এমন নাম দেওয়া হয়েছে। সূত্র সংক্ষিপ্ত ও জটিল বাক্য, অর্থ স্পষ্ট নয়। সেজন্য বিভিন্ন আচার্য এই সূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। বিভিন্ন আচার্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বা ভাষ্য আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেদান্তদর্শন আসলে উপনিষদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য। উপনিষদের মূল প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম বা আত্মা বা সৎ বলে বেদান্তদর্শনের আলোচ্য ব্রহ্ম, আত্মা বা সৎ।

বিভিন্ন আচার্য যাঁরা বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের স্রষ্টা তাঁরা অনেকেই বিভিন্ন উপনিষদ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন। ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্যের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ—(১) শঙ্করের কেবলাদ্বৈত, (২) রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত, (৩) বল্লভের শুদ্ধাদ্বৈত, (৪) নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত, (৫) মাধ্বের দ্বৈত, (৬) বলদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ এবং (৭) বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিভাগলক্ষণাদ্বৈত।[৩] এদের মধ্যে প্রথম ছয়টি সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছে,

২। 'In the whole world there is no study so beneficial and so elevating as that of the Upanisads. It has been the solace of my life, it will be the solace of my death'—Schopenhauer.

৩। ডক্টর সুরীন্দ্রনাথ মৈত্র রচিত 'Studies in Philosophy and Religion' গ্রন্থের 'Schools of Vedanta Philosophy' অধ্যায় এবং P. Nagaraja Rao রচিত 'The Schools of Vedanta' এবং Ghate রচিত 'Vedanta' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কিন্তু শেষেরটি একজন ব্যক্তির ভাষ্য এবং তা কোন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেনি। শঙ্কর ও মাধ্বের ভাষ্য অন্যান্য ভাষ্য থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য ভাষ্যে দ্বৈত এবং অদ্বৈত দুইই স্বীকৃত; কিন্তু শঙ্কর দ্বৈত বর্জন করেন এবং একমাত্র অদ্বৈতই সত্য, একথা ঘোষণা করেন। মাধ্বমতে দ্বৈতই সত্য, অদ্বৈত গ্রহণযোগ্য নয়। শঙ্কর ও বিজ্ঞানভিক্ষু ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ভাষ্যকারই মোক্ষলাভের জন্য জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন।

শঙ্করের মতে নির্গুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম এবং জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত এবং মায়ার পরিণাম। এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একমাত্র সত্য বলে দ্বৈত মিথ্যা। জ্ঞানেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার এবং মুক্তি। জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি দুইই সম্ভব। রামানুজ জগৎকে মিথ্যা বলেন না। তাঁর মতে একমাত্র সত্য ব্রহ্মের দুটি অংশ—চিৎ ও অচিৎ। চিৎ অংশ জীবাত্মার প্রকাশিত এবং জগৎ ব্রহ্মের অচিৎ অংশের পরিণাম। চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের গুণ, ব্রহ্ম গুণী। ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ গুণীর সঙ্গে গুণের বা অংশীর সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ। যাগযজ্ঞ প্রভৃতি বেদের কর্ম অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং উপাসনাত্মক জ্ঞানে বা ভক্তিযুক্ত জ্ঞানে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা মুক্তি। ব্রহ্ম অশেষ কল্যাণগুণের আকর এবং সমস্ত দোষমুক্ত। তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। রামানুজ বৈষ্ণব বেদান্তে বিশ্বাসী। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের যে অদ্বৈতভাব তা বিশিষ্ট, কারণ ব্রহ্ম চিৎগুণবিশিষ্ট।

বল্লভাচার্য রামানুজের মতই শঙ্করের মায়াবাদ এবং জগতের মিথ্যাত্ব পরিহার করেন। তাঁর মতে শুদ্ধ অথচ স্বগুণ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তা পুরুষোত্তম,[৪] জগৎবৈচিত্র্য ব্রহ্মের মধ্যেই বর্তমান এবং তাঁর সঙ্গে বৈচিত্র্যের সম্বন্ধ অংশীর সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ। তবে এই সম্বন্ধ রামানুজের গুণী ও গুণের সম্বন্ধ নয়। এটা আসলে অসীমের সঙ্গে সীমার এবং সমগ্রের সঙ্গে অংশের সম্বন্ধ। অংশ সমগ্রের গুণ নয়, সমগ্রই এখানে সীমার মধ্যে প্রকাশিত। ব্রহ্ম জগতের সমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ। ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় সৃষ্টিতে লীলা করেন। তিনি জীব ও জগতে পরিণত হয়েও অবিকৃত থাকেন। এই মতকে অবিকৃত পরিণাম[৫] বলা হয়। মোক্ষের জন্য পুরুষোত্তমের নিকট আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করতে হয়। রাগানুগাভক্তি মোক্ষের সাধন। তবে পুরুষোত্তমের কৃপা চাই। তাঁর কৃপা হলেই গোলকবাস সম্ভব। বল্লভ রামানুজের মতই জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন না।

নিম্বার্ক,[৬] ভাস্কর প্রভৃতি দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। তাঁদের মতে ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ রামানুজের মত গুণী গুণের সম্বন্ধ নয়, বল্লভের মত অংশী ও অংশের সম্বন্ধ নয়। স্বাধীন (স্বতন্ত্র) ও পরাধীন (পরতন্ত্র) সত্তার সম্বন্ধ। ব্রহ্ম অন্য কারও ওপর

৪। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ রচিত 'Schools of Indian Philosophical Thought' গ্রন্থের অষ্টাদশ থেকে দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে বিভিন্ন বেদান্ত সম্প্রদায়ের আলোচনা লক্ষ্যণীয়।

৫। ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার Comparative studies in Vedantism, ১০০-১০২ পৃষ্ঠা।

৬। ডক্টর রমা চৌধুরী 'History of Philosophy—Eastern and Western' গ্রন্থে নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

নির্ভরশীল নয় বলে স্বাধীন, জীব ও জগৎ (চিৎ ও অচিৎ) ব্রহ্মের অধীন বলে পরাধীন। নিম্বার্ক বা ভাস্কর শঙ্করের মায়াবাদ প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র স্বাধীন বলে অদ্বৈত, আবার জীব ও জগৎ ব্রহ্মের স্বাধীন হলেও অধীন বলে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন বা দ্বৈত। তাঁরা ব্রহ্মপরিণামবাদী এবং মুক্তির জন্য উপাসনা, ভক্তি, আত্মনিবেদন বা প্রপত্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

মধ্বাচার্য সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতবাদী। তাঁর মতে ভেদই সত্য, অভেদ মিথ্যা। তিনি পাঁচটি ক্ষেত্রে নিত্যভেদ স্বীকার করেন—ঈশ্বর ও জীব, ঈশ্বর ও জগৎ, জীব ও জীব, জীব ও জগৎ, জগতের যে কোন বস্তুর সঙ্গে অন্য আর একটি বস্তু। ব্রহ্ম সগুণ ঈশ্বর, ষড়ৈশ্বর্যময়। তাঁকে বিষ্ণুও বলা যায়। তিনি সর্বব্যাপক এবং স্বতন্ত্র। লক্ষ্মী বিষ্ণুর নিত্যসঙ্গী তবে তিনি বিষ্ণুর ওপর নির্ভরশীল। ভক্তি মুক্তির সাধন। তবে বিষ্ণুর কৃপা আবশ্যক। মুক্তি হলেও ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয় না। জীব বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর সত্য সম্বন্ধ উপলব্ধি করে আনন্দ লাভ করে।

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রীচৈতন্যের মত বলে মনে করা হয় এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্য এই মতের ভিত্তিস্থানীয় গ্রন্থ বলে পরিচিত। ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে। যেহেতু ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ, তারা একসঙ্গে থাকতে পারেনা, সেজন্য এই সম্বন্ধকে অচিন্ত্য বা সাধারণ চিন্তার অতীত বলে মনে করা হয়। এই মতে ব্রহ্ম সগুণ। জীব অণু-চৈতন্য এবং ব্রহ্মের অংশ। জগৎ ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল হলেও সত্য। ঈশ্বরের তিনটি শক্তি—জীবশক্তি, মায়াশক্তি, স্বরূপশক্তি। ঈশ্বরের জীবশক্তি অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত, মায়াশক্তি অচেতন জগতের উপাদানকারণ, স্বরূপশক্তি নিমিত্ত কারণ এবং তা উপাদান কারণকে নিয়ন্ত্রণ করে। শক্তির সাহায্যেই ঈশ্বর সৃষ্টি ও লীলা করেন। শক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ তা ভিন্নও বটে, আবার অভিন্নও বটে এবং আসলে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। এই মতে ভক্তি বিনে মুক্তি নেই।

বিজ্ঞানভিক্ষুর অবিভাগলক্ষণাদ্বৈত অন্যসমস্ত বেদান্তবাদ থেকে স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানভিক্ষু ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্যরচনা করেছেন তাতে তাঁর সমন্বয়ীভাব এবং বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা প্রকট। তিনি বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের সমন্বয়সাধনের চেষ্টা করেছেন। তিনি অবিভাগলক্ষণাদ্বৈত বলতে এমন অদ্বৈতমত বুঝিয়েছেন যা ন্যায়, সাংখ্য এবং অন্যান্য মতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাঁর মতে বেদান্তের অদ্বৈততত্ত্বই জীবের অভিজ্ঞতায় বিচিত্র বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। সাংখ্যের প্রকৃতিকে জগৎ-বৈচিত্র্যের অদ্বৈত ভিত্তি বলা যায়। আবার পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাবের ভিত্তি মনে করা যায় বেদান্তের ব্রহ্ম। যা অভিজ্ঞতায় বিভক্তরূপে ব্যক্ত তার একটি অবিভক্ত ভিত্তি সহজেই ভাবা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, সাংখ্যের দ্বৈতভাব, ন্যায়ের বহুত্বভাব প্রভৃতির একটি অদ্বৈতভিত্তি সম্ভব এবং তাই বেদান্তের ব্রহ্ম।

ওপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে, বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈচিত্র্য বর্তমান। এখানে অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং নানাভাবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচলিত। সাধনমার্গরূপে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি কখনও একসঙ্গে, কখনও

কোন একটি, কখনও বা কোন দুটি স্বীকৃত। ব্রহ্মেরও সাকার, নিরাকার, সগুণ, নির্গুণ প্রভৃতি বিভিন্ন ভাব বিভিন্ন সম্প্রদায়ে গৃহীত। এইভাবে বিচিত্র বেদান্তদর্শনের ভিত্তিতে যে বেদান্তধর্ম প্রচলিত তাও বিচিত্র বা বিভিন্ন হ'বে। স্বামী অভেদানন্দ 'Vedanta towards Religion' গ্রন্থের বিভিন্ন বক্তৃতায় এই বৈচিত্র্য প্রকাশ করে মানুষ তার রুচি, প্রকৃতি ও ভাব অনুসারে অনুসরণীয় ধর্ম যে বেদান্তধর্মেই পাবে তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বক্তব্য এই যে, বেদান্তধর্ম বিচিত্রপথগামী হয়ে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে সমস্ত যাত্রীকেই আহ্বান করতে পারে এবং সমস্ত যাত্রীই এই ধর্মে তাদের অভিলাষ অনুযায়ী পথ পেয়ে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলাভে ধন্য হতে পারে। এইদিক থেকে বেদান্তধর্মে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্বীকৃত, একথা বলা যায়।

[ক্রমশঃ]

●

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(আট)

আসলে প্রথমে আমরা অন্তঃপ্রকৃতি জয় করতেই প্রয়াসী হয়েছিলাম, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে নিবিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু কাজটা তো অত সহজ নয়। প্রবৃত্তির সামগ্রিক উৎসাদন কখনোই সম্ভব হতে পারে না। Instinctকে annihilate করা যায় না। আর এই উৎসাদনের কাজটি একটা গোটা জাতির—সমগ্র দেশের সকলের দ্বারা কখনোই গৃহীত হতে পারে না। তাই জোর করে সকলের উপর ব্রহ্মচর্যের ভার চাপাতে গিয়ে বিপরীত ফল ফলতে শুরু করল। সত্ত্বগুণের নামে শুরু হলো তমোগুণের উদ্দাম উপাসনা। এবং পরিণামে যা ঘটবার তাই ঘটতে শুরু হলো। পরবর্তীকালে ধর্মের নামে মোক্ষের নামে বৌদ্ধ সংঘারামগুলোতে শুরু হল নানা অমানবিক বিপরীত আচার-অনুষ্ঠানের অক্ষয় অঙ্ক অনুবর্তন। ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হল যখন সমগ্র দেশ,—আচার্য শঙ্করের আবির্ভাব ঘটল সেইসব পুঞ্জীভূত অবক্ষয়ের অন্ধকার সরিয়ে প্রজ্ঞার আলোক জ্বেলে দিতে আসমুদ্র হিমাচল এই ভারতভূমিতে। অদ্বৈতবাদের শাণিতখড়্গে আঁধারের, অন্ধসংস্কার এবং কুৎসিত আচার-অনুষ্ঠানের মহিষকে দু'টুকরো করে দুয়ার ভেঙে আবির্ভাব ঘটাতে হল—প্রজ্ঞার পবিত্র সূর্যের।—এসব কথাই স্বামীজী বললেন, "ঐ জৈন বুদ্ধ শঙ্করাচার্যের পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের পাল্লায় পড়েছি —দেশশুদ্ধ পড়ে কতই হরি হরি বলছি, ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না, আজ হাজার বৎসর।"—শুনবেন না কারণ আমরা জাতিধর্ম ভুলেছি। প্রমত্ত হয়েছি অন্ধকারের

উপাসনায়। কাপুরুষের কোনো ধর্ম নেই। ভীরু দুর্বল ক্লীবের কথা কেউ শোনে না। সেইজন্যই তিনি বার বার এমন করে শক্তির আবাহন করে গেছেন। জাতির চরিত্রে আত্মবিশ্বাস আর বীর্যবত্তা ফিরিয়ে আনতে, সাহসিকতার উদ্বোধন ঘটাতে বার বার এমন করে আঘাত করেছেন। বার বার আবাহন করেছেন পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণকে, গোপীজনবল্লভ বংশীধারী মাধবকে নয়। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ:।"—এই মহামন্ত্রের অজপা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন জাতিকে। এই অধঃপতিত, আত্মভ্রষ্ট, ভীরুতা ও কাপুরুষতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত জাতির দুঃখদুর্দশা স্মরণ করেই ভারতদর্শনের মহান প্রবক্তার কণ্ঠে এমন করে জীবনের জয়গান উচ্চারিত। এই কারণেই তাঁকে প্রেমিক সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আগে প্রাণধর্মের অনুশাসন মানতে হবে। উপনিষদোক্ত পঞ্চকোষী মানুষের সমন্বিত মহৎ রূপটিই আকাঙ্ক্ষিত হলেও সবচেয়ে আগে চাই অন্নময়, প্রাণময় কোষের পরিপুষ্টি। তারপরে ক্রমে মনোময় ও বিজ্ঞানময় হয়ে আনন্দময় কোষে উত্তরণ ঘটবে সর্বশেষে। সেকথা পরে ভাবা যাবে। কারণ ক্ষুধার্তকে ধর্মের উপদেশ দেয়া বা অধ্যাত্মজ্ঞান বিতরণ করা পাপ। "ধর্ম অধ্যাত্মবোধ ভারতের প্রচুর আছে। ভারতের জন্য যা একান্তভাবে আশু প্রয়োজন, তাহল কোটি কোটি নিরন্ন ক্ষুধার্তের জন্য অন্ন-পানের ব্যবস্থা করা।"—বলেছিলেন স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে। এই ক্ষুধার্ত ভারতবাসীর,—এই দরিদ্র মূর্খ ভারতবাসীর, মুচি-মেথর, চণ্ডাল ভারতবাসীর অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা আর দারিদ্রের কথা ভাবতে গিয়েই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর চোখেও জল আসে। মুক্তি-পিয়াসী সন্ন্যাসী হয়েও—স্বদেশবাসীর বুকে জ্বেলে দেন জ্বলন্ত মশাল। বুকে বুকে জাগ্রত করেন স্বাধীনতার অভীপ্সা। অথচ অথণ্ড মুক্তির অভিসারী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দুঃস্থ ক্ষুধার্তের মুখে অন্নমুষ্টি তুলে দিতে ছুটে যান ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। এই যে স্বদেশবাসীর মানুষের জন্য অপরিসীম বেদনাবোধ—এখানেই সন্ধান মেলে স্বামী বিবেকানন্দের যথার্থ পরিচয়ের। তাঁর এই করুণাঘন মহৎ হৃদয় দেখেই ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন, "বিবেকানন্দ কে? দেশের জন্য ব্যথা কি শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।" এই পরের দুঃখকে নিজের বলে অনুভব এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা দেখেই মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, "দেখলি বাঙাল, কত বড়ো প্রাণ। তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলে মানি না। কিন্তু ঐ যে জীবের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্য মানি। চোখের সামনে দেখলি তো, মানুষের দুঃখকষ্টের কথাগুলো শুনে করুণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদবেদান্ত সব কোথায় উড়ে গেল।" ঘটনাটা ঘটেছিল বাগবাজারে বলরাম বসুর বাড়ীতে। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী বেদ পড়াচ্ছিলেন। গিরিশ চন্দ্রের মুখে পাড়ার স্থানীয় বহু পরিবারের অভাব অনটন দুঃখদুর্দশার কথা শুনে এবং ভীষণ দুর্ভিক্ষে অনেক মানুষের অনশনের সংবাদ পেয়ে স্বামীজীর অশ্রুছলছল চোখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার দৃশ্যটি দেখে গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছিলেন স্বামীজী-শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে।

কিন্তু সন্ন্যাসীর এই জীবন-মমতা, দুঃখী-দুঃস্থ-আর্তের জন্য এই অপরিসীম বেদনাবোধকে —সহমর্মিতা এই করুণা ও সেবাবৃত্তিকে অনেকেই সেদিন সমর্থন করতে পারেন নি। এমন কি গুরুভাইদের কেউ কেউ এবং পরমহংসদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের মধ্যেও অনেকে সমর্থন করেন নি। স্বয়ং মাস্টারমশাই পর্যন্ত একদা প্রশ্ন করেছিলেন স্বামীজীকে: "দেখ, তুমি যে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, সে তো মায়া-রাজ্যের কথা। যখন বেদান্তমতে মানবের চরমলক্ষ্য মুক্তিলাভ, সমুদয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ওসব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি?" - স্বামীজী তার উত্তরে বলেছিলেন, "মুক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? আত্মা তো নিত্য মুক্ত, তার আবার মুক্তির জন্য চেষ্টা কি?"—এ উত্তর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হলেও—সাধারণের মনে তবু যেন প্রশ্ন থেকে যায়। একথা তো স্বাভাবিকভাবেই সাধারণবুদ্ধিতে মনে হতে পারে যে স্বামীজী তো বার বার অদ্বৈতসাধনার উপর জোর দিয়েছেন। "আমি ব্রহ্ম, এই চিৎসত্য জ্যোতির্ময়" (স্বামীজীরই নিজের রচিত কবিতার অংশ)—এই যদি তাঁর একমাত্র বক্তব্য হয়, তাহলে জীবসেবা, দান পরোপকার ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কোথায়?—অনেকের আবার একথাও মনে হতে পারে যে, "অধ্যাত্মধর্ম অপেক্ষা মানুষের বাস্তব কল্যাণ ও অবহেলিত জনসাধারণের সামাজিক অধিকারের কথাই তিনি বুঝি অধিকতর আবেগের সঙ্গে প্রচার করিয়াছেন।" এমন কি আমার এই প্রবন্ধের পাঠকবর্গেরও এ প্রশ্ন মনে হতে পারে—ভারতদর্শনের প্রবক্তা ও ভারতাত্মার প্রতীকরূপে স্বামীজীর এইসব সামাজিক ও মানবিক কর্মকুশলতা, হৃদয়সংযোগ ও ধ্যানধারণার সঙ্গে যোগ কতটুকু? আদৌ এইসব কুশলকর্ম-প্রকরণ ও হৃদয়চর্চা একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে সমর্থনযোগ্য কি? কিন্তু গুরু-প্রবর্তিত নয়া অধ্যাত্মবাদ তাঁকে এই দীক্ষাই দিয়েছে যে মানবসেবা ও দেবসেবা একে অপরের পরিপূরক। ভারতদর্শন-সমন্বিত যথার্থ অধ্যাত্মধর্মে মানবপ্রসঙ্গ এবং তার সঙ্গে প্রথমে স্বদেশ-চিন্তা ও স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং পরিণামে বিশ্বমানবতার ঐক্যবোধের প্রসঙ্গ একান্তভাবেই অবশ্যম্ভাবী। এই প্রসঙ্গে তাঁর গুরুকণ্ঠের সেই আশ্চর্য যুগবাণীটি পুনর্বার অবশ্য স্মর্তব্য: "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" এইকথা কয়টি মনে মনে পর্যালোচনা করলেই অনেক প্রশ্নের সমাধান মিলবে। ঐ খালি পেটের সমস্যা সমাধানের জন্যই স্বামীজীর এইসব প্রত্যহের উপল-বন্ধুর জীবন-পথে পরিব্রাজকের পরিক্রমা। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে। ভারতের সাধনা তো চিরকালই পূর্ণের সাধনা, সমন্বয়ের সাধনা, সমগ্রের সাধনা। মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী সভ্যতার সমন্বয় ও মিলনের মধ্যেই গড়ে উঠতে পারে সম্পন্ন মানবসমাজ এবং ব্যক্তিজীবন সেখানেই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়—পূর্ণবিকশিত ব্যক্তিত্ব মানেই তো সাম্যে স্থিত আদর্শ সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণ প্রতিশ্রুতি। সুতরাং বহিঃপ্রকৃতি বিজয় যেখানে অসমাপ্ত বা যে কোন কারণেই বিবর্জিত বা বিসর্জিত—সেখানে নবজীবন রচনার দায়-দায়িত্ব অধ্যাত্ম-নেতারও অবশ্য কৃত্য। এতে কোনো অসামঞ্জস্য বা অনঙ্গতি নেই। তাছাড়া গুরু পরমহংসদেবের সেই আশ্চর্য অমোঘ উক্তি পুনর্বার এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে বলি: "খোলা, বীচি, শাস—সবাই নিতে হবে—নইলে ওজনে কম

পড়বে যে।" তাই শুধু নিত্যের কথা নয়, লীলার দিকটিও ভেবে দেখতে হবে বৈকি। তাছাড়া এ নবযুগের আন্দোলন সকলের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তির প্রয়োজনে। বিভিন্ন রুচি-প্রকৃতির, বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে পুষ্ট বিচিত্র সব মানুষের, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আদর্শে বেড়ে ওঠা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির—সকলের হাতেই যে তুলে দিতে হবে একই সঙ্গে জীবন ও মহাজীবনের মুক্তি-সনদ, শাশ্বত শান্তির শুভ ফরমান। সকলকেই যে ছায়া দিতে হবে, ফল দিতে হবে, ফুল দিতে হবে। নরেন যে বটবৃক্ষ। নরেনকে যে লোকশিক্ষা দিতে হবে। তাই তাঁর সাধনা এবং কর্মবৃত্ত ও বহুমুখী এবং বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত প্রবাহিত হতে বাধ্য। মামুলী কানে মন্ত্র দেয়া গুরুগিরিতেই তাঁর ভূমিকা শেষ হয় না। স্বামীজী সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই এইসব কথা স্বভাবতঃই ভাবতে হবে।

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে নিবেদ্য। ক্রম-প্রবহমান জীবনের গতির সঙ্গে তাল রেখে আদর্শেরও রূপ পালটায়। প্রয়োগরীতির পরিবর্তন ঘটে। তাই বলে পরিবর্তন মানেই মিথ্যা থেকে সত্যের পথে এগিয়ে চলা নয়। বরং বলা চলে সত্য থেকে অধিকতর সত্যের পথে পরিক্রমাই সভ্যতার ইতিহাসেরও মূল কথা। স্বামীজীও বলেছেন, "হিন্দু বিশ্বাস করে মানুষ মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে অগ্রসর হয় না। অগ্রসর হয় সত্য থেকে সত্যের দিকে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যের দিকে।" বিজ্ঞানের পৃথিবীতে চেয়ে দেখলে কথাটা আরো পরিষ্কার হবে। কোপার নিকাস—গ্যালিলিও—নিউটন—আইনস্টাইন—এখানেও সেই সত্য থেকে অধিকতর সত্যে উপনীত হবার পথযাত্রা। কোথাও মিথ্যার প্রশ্রয় নেই—অন্ধকারের উপাসনা নয়। আজকে আইনস্টাইনের প্রবর্তিত ও আবিষ্কৃত আপেক্ষিক-তত্ত্বের সাহায্যে জগৎ-ব্যাপারের অনেকটাই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনে হয়তো আরো নতুন কোনো সত্যের দ্বারা জগৎ-ব্যাপারকে বুঝতে হতে পারে। তাতে আইনস্টাইন-তত্ত্ব কিন্তু মিথ্যা হয়ে যাবে না। স্বামীজী তো অধ্যাত্মশাস্ত্রকেও বিজ্ঞান বলে মনে করতেন এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে তা তিনি বারবার প্রমাণও করে গেছেন। এবং অন্যান্য মানবিকী শাস্ত্র, সমাজবিদ্যা, কলাবিদ্যা, ইতিহাস, দর্শন সবই তো নিত্য নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়ে চলেছে। ধ্রুব (classical) সাহিত্যের মত যতই শাশ্বতী হোক, চিরন্তনীর মহিমায় প্রভাস্বর, সমস্ত-পরিবেশের নিত্য নানা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নব নব তাৎপর্যের লাভ করে নতুন নতুন অর্থদ্যোতনায় ভারতাত্মার বাণীও জীবন্ত হয়ে উঠবে—এটাই তো স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। এভাবেই সে চলমান জীবনের নিত্য অনুসঙ্গী হয়ে উঠবে—স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জগৎ ও জীবনকে নতুন শক্তিতে চালিত করবে। ভারতদর্শন বা ভারতাত্মারও তাই নব নব রূপ-পরিগ্রহ ও প্রয়োগরীতি আমরা নিশ্চয়ই মেনে নেব। মৌল কাঠামোর উপর এইসব পরিবর্তন ও তাৎপর্যগ্রহণ তার শাশ্বত জীবন ও প্রাণশক্তিরই সূচক। বস্তুতঃ যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এবং যুগস্রষ্টারা জগৎ ও জীবনের পথ-নির্দেশের ভার গ্রহণ করে অবতারকল্প হয়ে ওঠেন। আমাদের ধর্মের অবতার-তত্ত্বের পশ্চাতেও এই একই সত্য ক্রিয়াশীল। বিশেষ

করে গুহা-নিহিত ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যায় তাঁরা অগ্রণী হয়ে নতুন নতুন অর্থসংযোগ ঘটিয়ে ও ভাষ্যান্তর পরিব্যাপ্তি এনে ঐ একই ভারতদর্শনের সাহায্যে ধ্বংস ও মৃত্যুর হাত থেকে জীবন ও জগৎকে রক্ষা করেন। অন্যথায় প্রায় সব কথাই তো বলা হয়েছে। বিভিন্ন শাস্ত্র-সংহিতায়, বিচিত্র সব মানবপ্রজ্ঞার আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে বহুকাল আগে থেকে অনেক সত্যেরই আবিষ্কার উন্মোচন ঘটে গেছে। যুগোপযোগী তাকে নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে নব নব ভাষ্যান্তরণের মধ্য দিয়ে নব নব সম্প্রয়োগের ক্ষেত্র প্রসারিত করে—উদ্দাম প্রাণ-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রিত ও ছন্দোময় করে সত্য পথে পরিচালনা করেন বলেই তো তাঁরা সত্যদ্রষ্টা বলে অভিহিত। ঠাকুরের উপলব্ধিজাত মহাবাক্য—'যত মত তত পথ'-এর মধ্যে যে জীবন-সত্য সন্নিহিত রয়েছে তাই আমাদের এমন করে নাড়া দিয়ে গেছে। বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান এযুগে মেনে চলা অসম্ভব। তাই হৃদয়ের শুদ্ধ চেতনাকে প্রস্ফুট করার জন্য জোর দিলেন মননের উপর। মনে, বনে আর কোণে। কর্মযোগ, সত্য-সাধনা ও সেবাকে অবলম্বন করে উর্দ্ধায়ত হবার উপদেশ দিলেন। দেশকালের পরিবর্তন মেনে স্বামীজীও তাই তাঁর গুরুর নির্দেশেই চিরকালীন ভারতদর্শনকে নতুনরূপে উপস্থাপিত করলেন নব্য ভারতবাসীর কাছে। সন্ন্যাসী হয়েও তাই জোর দিলেন বিজ্ঞান-সাধনার উপর। মঠের চত্বরের মধ্যেই বেদান্ত শিক্ষার ব্যবস্থার সঙ্গে টেকনিকাল কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চারণ করতে পারলেন এক নিঃশ্বাসে। সাধু-সন্ন্যাসীদেরও বিজ্ঞানবোধে উদ্দীপ্ত হতে বললেন। তরুণ বাংলাকে এক অধ্যায় গীতা পড়ার চেয়ে এক গেম ফুটবল খেলতে উৎসাহ দিয়ে গেলেন। শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের প্রয়োজনের কথা আগে বললেন। অভীঃ-মন্ত্র দিলেন জাতির কণ্ঠে। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে বললেন আগে। বীরত্বকেই মানবজীবনের আদর্শ বলে তুলে ধরলেন দেশবাসীর কাছে। কর্ম-নিরোগকেই শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে নির্দেশ করলেন।

●

॥ কেন হিন্দুরা খ্রীস্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

হিন্দুদের অনেকে নরদেহে ঈশ্বরের অবতারত্বে বিশ্বাস করলেও গির্জাগুলি যে যুক্তিহীন পদ্ধতিতে তা হিদেনদের কাছে প্রচার করে, হিন্দুরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। তাদের প্রথম আপত্তি হচ্ছে—যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে কোন একস্থানে ঈশ্বর দেহধারণ করতে পারেন, তবে তিনি প্রয়োজন হ'লে যে-কোন সময়, যে-কোন স্থানে সে-রকম অবতার হয়ে দেহধারণ করবেন না কেন। এরকম সঙ্কীর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে গির্জার মতবাদ ঈশ্বরের মানবপ্রেমকে স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমিত করে ফেলেছে। ঈশ্বরের মানব-প্রেম অবশ্যই

অনন্ত। ঈশ্বর সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসেন; তাঁর প্রেম সূর্যালোকের মতোই সমগ্র প্রাণীজগতের মধ্যে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের অবতারত্ব সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণাটি ভগবদ্গীতায় অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। সেখানে কৃষ্ণ বলছেন, "যখন প্রকৃত ধর্মে গ্লানি দেখা যায় ও অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, আমি তখন ন্যায়-নীতির প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়কে বিনাশ হেতু নিজে নূতন নরদেহ ধারণ করি।

ঈশ্বরের অবতারদের মধ্যে হিন্দুরা কৃষ্ণ, বুদ্ধ, রাম প্রভৃতিকে মেনে নিয়েছেন। একজন হিন্দু যখন সংক্ষিপ্ত সুসমাচারে যিশুখ্রীস্টের জীবনী ও বাণী পাঠ করে এবং কৃষ্ণের জীবনী ও বাণীর সঙ্গে তা' তুলনা করে তখন সে পবিত্র গর্ভধারণ ও নক্ষত্রের উদয় থেকে আরম্ভ করে কবর হ'তে পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ পর্যন্ত প্রতিটি সামান্য ব্যাপারেও অসামান্য সামঞ্জস্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। খ্রীস্টের জন্মের প্রায় ১৪০০ বৎসর আগে কৃষ্ণ এবং ৫৪৭ বৎসর আগে বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বহু প্রখ্যাত ইউরোপীয় পণ্ডিত নিরপেক্ষভাবে প্রাচ্যের ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করে ছিলেন। তাঁরা তাঁদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখায় ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় দেখিয়েছেন যে, সংক্ষিপ্ত সুসমাচারগুলি পরবর্তীকালের রচনা বলে ঐ সব গ্রন্থের অতি গুরুত্বপূর্ণ অনেক সত্য ভারতের কৃষ্ণ ও বুদ্ধের জীবনী ও বাণী থেকে ব্যাপকভাবে গৃহীত হ'তে পারে। খ্রীস্টান মিশনারীরা প্রথম যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন তাঁরা কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও খ্রীস্টের জীবনী ও বাণীর মধ্যে এ সকল অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়ে পড়েন। সে সময় তাঁরা যে বিষয়টি মেনে নিয়ে তাঁদের জিজ্ঞাসু মনকে শান্ত করেছিলেন, স্যার উইলিয়াম জোন্স-এর ভাষায় সে বিষয়টি হচ্ছে, "খ্রীস্টের আবির্ভাবের ঘটনা আগেভাগে জ্ঞাত হয়ে শয়তান তাঁর ধর্মপ্রচারের আগেই এমন এক ধর্ম আগাম প্রতিষ্ঠা করে গেছে, যে ধর্ম ঠিক তাঁরই ধর্মের অনুরূপ।" প্রতীক-সম্পর্কিত ইতিহাসের পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে খ্রীস্টের জন্মেরও বহু পূর্বে এবং খ্রীস্টানদের গির্জায় ক্রশ চিহ্ন গৃহীত হবার ও একচেটিয়াভাবে সেইটি তাদের নিজেদের সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হবার বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে ক্রশ-চিহ্নের ব্যবহার ছিল। হিন্দুরা ধর্মে কোনকিছুর একচেটিয়ায় বিশ্বাসী নয়, আর সেজন্যই তারা গির্জার ধর্মের দাবিগুলি বর্জন করে।

গির্জার ধর্ম আদমের প্রলোভন এবং স্বর্গোদ্যান হ'তে তা'র পতনের বিষয় নাটকীয় ভাবে বর্ণনা করে। আর, এই 'পতন' সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'অসৎ'-এর মূল পাওয়া যায় এবং সেইটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই জগতে "পাপ" এসেছে। কিন্তু হিন্দুদের কাছ থেকে এ ব্যাখ্যার স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। হিন্দুরা বিষয়টিকে আদিম মানুষদের পুরাণ-কাহিনী, অপরিণত মনের ব্যাখ্যা হিসাবে মনে করে। সেই অপরিণত মনের লোকগুলি বিশ্বাস করত যে খ্রীস্টের ৪০০০ বৎসর আগে এমন একজন লোক ছিলেন, যিনি হচ্ছেন সমগ্র মানবজাতির জনক, আর যেহেতু তিনি পাপ করেছিলেন সেজন্য তাঁর বংশধরেরা সকলেই পাপী হয়ে জন্মেছে। হিন্দুরা জানে, যুগ যুগ ধরে জেনে এসেছে যে এ রকম একটি সৃষ্টিতত্ত্ব যুক্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক। আধুনিক গবেষণায় তাদের সেই চিন্তাধারার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে; কারণ নিশ্চয়-এ

(Nippur) খ্রীস্টের প্রায় সাত-আট হাজার বৎসর পূর্বেকার এক অতি উন্নত ধরনের বিশাল সভ্যজাতির অস্তিত্বের বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং একজন হিন্দুর পক্ষে কি করে পাপের এই মূলতত্ত্ব-সম্পর্কিত ধারণা মেনে নেওয়া সম্ভব ?

তা'রা বলে, স্বার্থপরতাই পাপ। এই পাপের কারণ তারা খুঁজে পেয়েছে কোন পৌরাণিক শয়তানের মধ্যে নয়, কোন অতিপ্রাকৃত অশুভ শক্তির মধ্যে নয়;—পাপের কারণ তারা খুঁজে পেয়েছে মানুষের নিজের দেবত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যে,—প্রতিটি জীবাত্মায় ঈশ্বর বিরাজ করেন,—এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার মধ্যে। যতদিন না আমরা আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হই, ততদিন দেহ-মনের মধ্যেই আমরা আমাদের পরিচয় সীমাবদ্ধ রাখি; আর এজন্যই আমরা স্বার্থপর হয়ে থাকি। যে মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি করি যে, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বিরাজমান এবং আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হই, সে মুহূর্তেই আমরা নিঃস্বার্থ ও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হই। স্বর্গীয় জ্ঞানাগ্নি যাবতীয় পাপরাশি ভস্মীভূত করে আত্মাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে সে মুক্ত। হিন্দুদের মধ্যে পাপ সম্পর্কে এ রকমই ধারণা, আর এ জন্যই তা'রা আত্মার মুক্তির জন্য বিশেষ কোন পরিকল্পনা গ্রাহ্য করে না। নারকাগ্নি, মতবাদে তারা বিশ্বাসী নয়, শাশ্বত শাস্তির স্থান হিসাবে কোন নরক আছে বলেও তা'রা বিশ্বাস করে না। আর এজন্যই তাদের কোন সালিশীর সাহায্য প্রয়োজন হয় না। যারা শাশ্বত শাস্তিতে বিশ্বাসী, তারাই সেই শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন অনুভব করে। বিখ্যাত ধর্মযাজক ডঃ জন হেনরী ব্যারোজ যখন ভারতে গিয়েছিলেন, সেখানে এক বড় শহরে তিনি একদল বিজ্ঞ শ্রোতার সভায় ভাষণপ্রসঙ্গে ঐ মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর ভাষণ শেষে জনৈক শ্রোতা উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, "মশায়, আমরা ভেবেছিলাম কৃতবিদ্য এক দেশ থেকে আপনি আমাদেরকে শিক্ষিত করতে এসেছেন; বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা জানতাম না যে আপনাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি আমাদের কথিত-কুসংস্কারের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়।" ডঃ ব্যারোজ আমেরিকায় ফিরে এসে বলেছিলেন, ভারতে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে এ-ও অনুরোধ করেছিলেন, ভারতে যেন সে উদ্দেশ্যে আরও অধিক ধর্মপ্রচারক ও অর্থ প্রেরিত হয়। একথা শুনে জনৈক বিশিষ্ট বক্তা বলে উঠলেন, "বন্ধুগণ, তার বদলে আপনারা সেখানে একটা ঘমকল পাঠান না কেন!—তা'তে খরচ আরও কম পড়বে।"

গির্জার ধর্মমত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের নীতি শিক্ষা দেয়। এ শিক্ষা কোমলপ্রাণ ও স্নেহশীল হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এ কাজটিকে তারা ঈশ্বরের পক্ষে কৃপা বা প্রেমের কাজ বলে ব্যাখ্যা করে না; তারা বরং বলে যে ঈশ্বরের নিরীহ সন্তানকে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করানো ঈশ্বরের পক্ষে নিষ্ঠুর ও অযৌক্তিক কাজ।

●

॥ শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ অভেদানন্দ ॥

শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

পরিব্রাজক-জীবনে কালীপ্রসাদ সর্বদাই সর্বত্র নগ্নপদে অর্থাৎ খালিপায়ে দেশ ভ্রমণ করিতেন। নরেন্দ্রনাথ তাহা দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন ; 'ভাই, এভাবে এদেশে খালিপায়ে ভ্রমণ করা তোমার উচিত নয়। কথা না শোন, ভুগতে হবে শেষে। বলা বাহুল্য যে, মহাপুরুষের বাক্য প্রায় দেড় বৎসর পরে সফল হইয়াছিল। কালীপ্রসাদ যখন (কলিকাতায়) আলমবাজার-মঠে ফিরিয়া গিয়াছিলেন, তখন সত্যই তাঁহার পায়ে গিনি-ওয়ার্ম (নাহারু) দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের ভালবাসা ও লক্ষ্য সর্বদা কালীপ্রসাদকে অনেক কর্মের ও অনেক বিপদের সম্মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

পণ্ডিত মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীর বিশেষ অনুরোধে কালীপ্রসাদ তাঁহার বাড়ীতে তিন-চারিদিন থাকিলেন। কালীপ্রসাদ আরও এইজন্য থাকিলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তিনি অনাবিল আনন্দের সঙ্গে কাটাইবেন। মনেও খুব তৃপ্তি পাইলেন তিনি। একত্রে এক স্থানে থাকা সৌভাগ্য—তাহা কালীপ্রসাদের হৃদয়ে বারবার অনুভব করিতে লাগিলেন।

অবশেষে কালীপ্রসাদ সকলের নিকট ও স্বামী বিবেকানন্দ নিকট হইতে বিদায় লইয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিদায় লইবার সময়ে কালীপ্রসাদ অনুভব করিলেন তাঁহার অভিন্নহৃদয় ভ্রাতা স্বামী বিবেকানন্দ অশ্রুভারাক্রান্ত নেত্রে তাঁহাকে বিদায় জানাইলেন এবং হৃদয়ের স্নেহের স্পর্শ এমনই প্রবল যে, পণ্ডিত মনসুখরাম সূর্যরাম ত্রিপাঠীও তখন চোখের জলে তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় স্বামী বিবেকানন্দ একান্ত স্নেহের সঙ্গে কালীপ্রসাদকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনিও দুই একদিন পরেই বোম্বাই যাইবেন। ইহা শুনিয়া কালীপ্রসাদ কিছুটা আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। এইস্থানে এক মধুর ও শান্ত পরিবেশে সৃষ্টি হওয়ায় কালীপ্রসাদের মনে সেই কাশীপুরের শ্রীরামকৃষ্ণমণ্ডলের আনন্দহাটের বহুকথাই স্মরণ হইতে লাগিল এবং অন্তরে বেশ আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন।

কালীপ্রসাদ দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া দ্বারকাজীর মন্দির দর্শন করিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইয়াছিলেন। দ্বারকায় একদিন রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাসতীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন এবং সেইখানে একদিন রাত্রিবাস করিয়া বোম্বাই যাইবেন স্থির করিলেন। এই তীর্থভ্রমণে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, দেশ-ভ্রমণকালে কোন টাকা-পয়সা স্পর্শ করিবেন না। কিন্তু কি উপায়ে সমুদ্র পার হইবেন তাহাও চিন্তা করিবার বিষয়। চিন্তা করিতে করিতে কালীপ্রসাদ অকস্মাৎ দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার সম্মুখে একজন গুজরাটী শেঠ, তাঁহাকে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন তিনি কোথায় যাইবেন এবং কালীপ্রসাদকে জাহাজের ভাড়া-বাবদ কিছু টাকা দিতে চাহিলেন। তাহা শুনিয়া কালীপ্রসাদ তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা

শেঠজীকে জানাইলেন যে, তিনি এই ভ্রমণের সময়ে কাহারও নিকট কোন-কিছু গ্রহণ করিবেন না। তবে যদি বোম্বাই যাইবার একটি ডেকের টিকিট কিনিয়া দেন তবে তাহা লইতে পারেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া শেঠজী বিশেষভাবে আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং একটি তৃতীয়শ্রেণীর টিকিট কিনিয়া কালীপ্রসাদের হাতে দিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইলেন। পর পর অঘটনঘটন সকল ঘটনা হইতেছে দেখিয়া কালীপ্রসাদ মনে মনে বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিলেন সমস্তই করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের খেলা। কোথায় কখন তাঁহার কি কি প্রয়োজন হইবে ঠিক সেই সেই সময়ে কেহ-না-কেহ আসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিয়া যাইতেছে। কালীপ্রসাদ তখনই অন্তরে চিন্তা করিলেন 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'। অনন্যমনে শ্রীভগবানের নিকট অকপটে আত্মসমর্পণ করিলে শ্রীভগবান ভক্তের সকল-কিছু ভারই গ্রহণ করেন। কালীপ্রসাদ মনে অদম্য উৎসাহ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর একান্ত-শরণাগতির ভাব লইয়া বোম্বাই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

●

॥ জাপানের কাবুকি নাটক ॥

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(তিন)

জাপানে কিছুকাল যাবৎ অভিনেত্রী নিয়ে কাবুকির দল পরিচালনা করবার পর তার সামাজিক কুফল অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিল। কাবুকির সম্প্রদায়গুলির পরস্পর ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতার ফলে দেখা গেল তারা তরুণী অভিনেত্রীদের মোসরের বাইরেও ব্যবহার করে অর্থোপার্জন করতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে জাপানী সরকারকে বাধ্য হয়ে অগ্রসর হয়ে এসে এ'বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে কাবুকির অভিনয়ে অভিনেত্রীর অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করে দিল। কেবলমাত্র তখন থেকেই বাংলার যাত্রার অনুকরণে কাবুকি নাটকে নারীচরিত্রের অংশে পুরুষকে অবতীর্ণ হতে হলো। যে নৈতিক দূরদর্শিতা বাঙালী যাত্রার পরিচালকদের ছিল, তাতে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য জাপানকে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে হলো। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল, তা দ্বারা কাবুকির নৈতিক আবহাওয়া শুদ্ধ হলো না। কারণ জাপানী তরুণ কিংবা কিশোরেরাও, যারা কাবুকির দলে যোগ দিয়েছিল, তারাও অনুরূপ দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হলো এবং তাদেরকে অধিকার করবার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মানুষের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে লাগল, তাতে তার নৈতিক আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠল। কুড়ি বছরের মধ্যেই দেশের সরকারকে আবার তাতে হস্তক্ষেপ করে কাবুকি নাটকের অনুষ্ঠানে তরুণ ও কিশোর অভিনেতাদেরও অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। ফলে কাবুকি নাটকে তার উদ্ভবকালের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই জাপানে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল। তখন কিছুদিন জাপানের দর্শকেরা তার পরিবর্তে ভাঁড়ামি, ভন কমেডি, স্বাদু

প্রদর্শনী, এই সব থেকে আমোদ লাভ করতে লাগল, কিন্তু কাবুকির স্মৃতি তাদের মন থেকে লুপ্ত হলো না। কেউ কেউ নূতন ভাবে সংস্কার করে তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

তার ফলে আমাদের দেশের নূতন যাত্রার মত এক নূতন কাবুকির সৃষ্টি হলো। কিন্তু একটি সর্তাধীনে এই কাবুকির অনুষ্ঠান করতে জাপানী সরকার সম্মত হলেন যে তার বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোনো যৌন আবেদন থাকতে পারবে না, দৈহিক সৌন্দর্যকে তাতে দর্শনীয় করে তোলা যাবে না তাতে কেবলমাত্র শিল্পগত আবেদন এবং নাটকীয় গুণ থাকতে পারবে।

এইভাবে কাবুকির পুনর্জন্ম হলো। কিন্তু যদিও তার নাটকীয় গুণ বৃদ্ধির জন্য অভিনেতা এবং অভিনেত্রী উভয়েরই তাতে অংশগ্রহণ করা স্বভাবতই আবশ্যক, তথাপি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা স্মরণ করে জাপানী সরকার কিছুতেই তাতে অভিনেত্রী বা স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ে নারীর অংশগ্রহণে সম্মত হলো না; কেবলমাত্র পুরুষকেই স্ত্রীচরিত্রে অংশ গ্রহণ করবার অনুমতি দিল। তার ফলে বাধ্য হয়ে পুরুষকেই স্ত্রী চরিত্রের অংশে অভিনয় করবার জন্য যোগ্যতা অর্জন করবার প্রয়োজন হলো। সেইভাবেই শিল্পীরাও তৈরী হতে লাগল। ক্রমে এক শ্রেণীর পুরুষ স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করল। বাংলা যাত্রার সে যুগের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, তাতে কয়েকজন পুরুষ স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়ে এমন দক্ষতা লাভ করেছিলেন, যে তাঁরা স্ত্রী কি পুরুষ অভিনয় কালে তা কেউ বুঝতে পারতেন না, অনেক সময় দক্ষ অভিনেত্রীর তুলনায়ও তাঁরা সার্থকতর অভিনয় করতে পারতেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে কাবুকি নাটকের স্ত্রীচরিত্রের অভিনয়েও জাপানী পুরুষ এমনি দক্ষতা লাভ করে আসছেন।

প্রথমে কাবুকি নাটকের জন্য লিখিত কোনো পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন হতো। কিছু গান বাঁধা ছিল, সেগুলোকে কেন্দ্র করে মুখে মুখে সংক্ষিপ্ত সংলাপ রচিত হতো। আমাদের দেশের কৃষ্ণযাত্রার তুলনায় তার কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই (তখনও আমাদের দেশে কৃষ্ণযাত্রার যুগ) কাবুকির কাহিনীর মধ্যে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন থেকেই তার জন্য এক সুনির্দিষ্ট কাহিনী পাণ্ডুলিপিতে লেখা হতে লাগল। এক শ্রেণীর লেখক কাবুকির জন্য গীতিনাটক রচনার সূচনা করলেন। তাদের মধ্যেও কেউ কেউ খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। আমাদের যাত্রার অগ্রগতির সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই।

ক্রমে কাবুকি নাটকের মঞ্চসীমা বাড়তে লাগল। আগে নো-নাটকের মত অল্প-পরিসর মঞ্চে তার অভিনয় হতো, ক্রমে তার পরিসর বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একাধিক দৃশ্য, দৃশ্যের মধ্যে দৃশ্য, তার এই সব জটিলতা বাড়তে লাগল এবং এমন কি শেষ পর্যন্ত তার মঞ্চের সম্মুখের দিকটার আবরণস্বরূপ একটি পরদা বা যবনিকাও যোগ করা হলো। এ'কথা স্মরণ রাখতে হবে যে তখন পর্যন্ত জাপানের সঙ্গে পাশ্চাত্য জগতের কোনো যোগাযোগ হয় নি, সুতরাং এই পর্দা পাশ্চাত্য রঙ্গমঞ্চের প্রভাবের ফল নয়, তাদের নিজস্ব সৃষ্টি। তখন থেকে কাবুকি নাটকের রঙ্গমঞ্চ প্রাচীনতর জাপানী নাটক 'নো'র রঙ্গমঞ্চ থেকে পুরোপুরি

স্বতন্ত্র হয়ে গেল। কিন্তু তার আগে এ'দুয়ের মধ্যে মঞ্চের দিক থেকে কোনো পার্থক্য ছিল না। তার কারণ, আগেই বলেছি 'নো'র মঞ্চে অনুকরণেই কাবুকির মঞ্চ প্রথম উদ্ভব লাভ করেছিল।

জাপানের জাতীয় জীবনের উত্থান পতনের সঙ্গে কাবুকি নাটকের ইতিহাসও ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত। সেইজন্যই কাবুকি জাপানের জাতীয় নাটক।

তারপর কিছুকাল অন্তর্বিপ্লব চলবার পর জাপানে এক সামরিক গোষ্ঠী এক কঠিন সামন্ততন্ত্র স্থাপন করল। এতদিন জাপানের রাজধানী ছিল কায়তো, তাই সেখানে জাপানের জাতীয় সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু নূতন রাজশক্তি দেশের অধিকার লাভ করে এডো (বর্তমান টোকিও) সহরটিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নিল এবং সেখানে জাতির নূতন সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অথচ কায়তোর প্রভাব পুরোপুরি লুপ্ত হয়েও গেল না, প্রথমতঃ দীর্ঘকাল ধরে সেখানে তার যে এক শক্ত বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তা থেকে তার সাংস্কৃতিক জীবন সহজে বিচ্ছিন্ন হলো না। বিশেষত জাপানের সম্রাট তখনো কায়তোতেই থাকতেন। এডো সহর নূতন চরিত্র নিয়ে গড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, তার মূলমন্ত্রে যতখানি শক্তির উত্তাপ ছিল, ততখানি সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতা ছিল না। কিন্তু জাপানী চরিত্র এতদিন ধরে সৌন্দর্যের আদর্শের দীর্ঘকাল সেখানে গড়ে উঠেছিল।

জাপানে তখন থেকেই আর একটি কেন্দ্র এক নূতন বাণিজ্য-ভিত্তিক ব্যবহারিক জীবনের আদর্শে গড়ে উঠ্‌ছিল, তা ওসাকা। এডো কিংবা ওসাকায় নূতন জীবনের ইসারা দেখ্‌তে পাওয়া গেলে যে সাংস্কৃতিক জীবনের ঐতিহ্যের ধারা জাপানকে এতকাল পর্যন্ত তার আত্ম-বিকাশের পথে সহায়ক হয়েছিল, তা তখন পর্যন্ত কায়তোতেই নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছিল। তার ফলে জাপানের আত্মপ্রসারের মধ্য দিয়েও তার সাংস্কৃতিক জীবনের নিবিড়তা বা ঐতিহ্য কোনোদিক থেকেই বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়্‌তে পারেনি। কোলকাতা সহরের মধ্যে যেমন শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি, সংস্কৃতি এই স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকবার ফলে পরস্পরকে আঘাত করেছে, তাতে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সব চাইতে বেশী বিপর্যয় ঘটেছে, জাপানে তা হতে পারেনি। সেখানে প্রাচীন সহর কায়তোতে সাংস্কৃতিক জীবন নিবিড়তা লাভ করবার পর যখন তার শিল্প-বাণিজ্য ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ ঘটেছে তখন তার বিকাশের জন্য যেন আপনা থেকেই নূতন নূতন ক্ষেত্র স্থাপিত হয়ে যে যার ক্ষেত্রে সরে গেছে। সেইজন্য চরম আধুনিকতার মধ্যেও সে তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবিকৃত রাখ্‌তে সক্ষম হয়েছে: কারণ, তার সেই ক্ষেত্রটি আধুনিকতার স্পর্শ থেকে সর্বদাই দূরে সরে ছিল। কায়তো সহরটিকে দেখ্‌লে এখনো তা মনে হতে পারে। যেন পুরানো জাপান, ঐতিহ্যের জাপানকে আজো বুকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে, চারদিককার বিস্তারের মধ্যে যেন নিজের জগতের এলাকাটি ঘিরে একটি গণ্ডী টেনে রেখেছে, সেখানে সীতার অপহরণকারীর প্রবেশ নিষেধ হয়ে আছে।

●

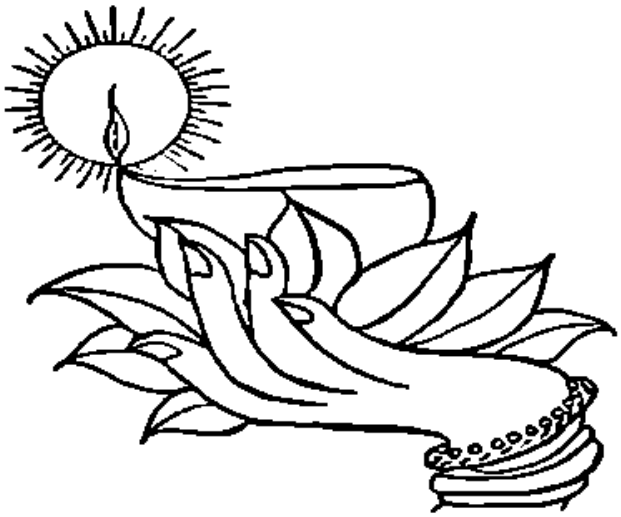

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

শ্রীদিবাকর সেনরায়

(পাঁচ)

সিরামিক্‌স্‌এর আঁদরা এবং ছাঁচ তৈরী সম্পর্কিত আলোচনায় ড্রইং (drawing) অথবা রেখাচিত্র অঙ্কণের প্রসঙ্গটি প্রাথমিকভাবে এসে পড়ে। কেবলমাত্র সিরামিক্‌স্ তৈরীর ক্ষেত্রেই নয়, যে কোনো জিনিষ তৈরী করার ক্ষেত্রেই সর্বাগ্রে ওই জিনিষটির একটি খসড়াচিত্র অথবা রেখাচিত্র এঁকে নেওয়া দরকার। খসড়াচিত্র অথবা রেখাচিত্রকে ইংরেজীতে যথাক্রমে Sketch এবং drawing বলা হয়। প্রযুক্তিবিদ্যার পরিভাষায় এই ড্রইংকে বলা হয় নকশা (design অথবা plan)। একটি বিরাট দশ / বারো তলা বাড়ি, সমুদ্রগামী কোনো জাহাজ, নদীর ওপর বিরাট একটি সেতু ইত্যাদি বড়ো বড়ো জিনিষ তৈরী করতে হলে যেমন প্রথমেই ওই জিনিষটির একটি নকশা এঁকে নেওয়া দরকার, তেমনই অতি ক্ষুদ্র কোনো যন্ত্র কিংবা যন্ত্রাংশ—যেমন কোনো হাতঘড়ি অথবা ওই হাতঘড়িরই একটা স্ক্রু তৈরী করতে হলেও ওইটির একটি নকশা আগে এঁকে নিতে হবে। এজন্যেই নকশাকে বলা হয় প্রযুক্তিবিদ এবং এন্‌জিনিয়ারদের সাংকেতিক ভাষা। নকশাতে কিছু কিছু সংকেত থাকে যেগুলো সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়না, যাঁরা ওই সংকেতগুলোর অর্থ জানেন —অর্থাৎ প্রযুক্তিবিদ এবং এন্‌জিনিয়াররা, তাঁরাই নকশার সংকেতগুলো বুঝতে পেরে সমগ্র নকশাটির পাঠোদ্ধার করতে পারেন।

যাঁরা সিরামিক্‌স্ তৈরী করতে আগ্রহী—প্রাযুক্তিক রেখাচিত্রাঙ্কণ অথবা এন্‌জিনিয়ারিং ড্রইংএর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকা একান্ত দরকার। রেখাচিত্র মানুষের ভাবপ্রকাশের আদিমতম বাহনও বটে। পণ্ডিতদের মতে মানুষের মুখে যখন ভাষা ফোটেনি—মানবসভ্যতার সেই উষালগ্নে আদিম মানুষ তার মনের ভাব রেখাচিত্রের মাধ্যমে পর্বতগুহার দেয়ালে প্রকাশ করে রেখে গেছে। অঙ্কণের মাধ্যমে মনোভাবপ্রকাশের ইচ্ছাকে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলোর অন্যতমও বলা যায়। শিশুদের অঙ্কন লক্ষ্য করে এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। মুখে ভালো করে ভাষা ফোটবার আগেই খড়ি কিংবা ইটের টুকরো হাতের কাছে পেলে তাই দিয়ে শিশু মেঝের ওপর নানান ধরণের দাগ আঁকতে থাকে। শিশুদের এই দাগ কাটা আমাদের কাছে অর্থহীন হিজিবিজি বলে মনে হলেও মনঃস্তাত্ত্বিকরা অবশ্য এই সব হিজিবিজি থেকে শিশুমনের অভিব্যক্তির অনেক অর্থই খুঁজে পান। তাঁদের মতে এই হিজিবিজি দাগ কাটা নাকি মানবশিশুর অন্তর্নিহিত সহজাত অঙ্কণেচ্ছার বহিঃপ্রকাশ। একজন সিরামিক-শিল্পীর পক্ষে রেখাচিত্রাঙ্কণের অভ্যাস করা এবং প্রাযুক্তিক নকশার সংকেতগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ একটি সিরামিকপাত্র, ফুলদানী কিংবা টালি—যা-ই তৈরী করা হোকনা কেন, ওইটির গড়ণ এবং বিভিন্ন অংশের মাপ নিয়ে একটি রেখাচিত্র অথবা নকশা প্রথমেই কাগজে এঁকে নিলে ওই নকশাটি অবলম্বন করে সিরামিক তৈরী করা সুবিধাজনক হতে পারে।

সাধারণ মাটি, পোর্সিলেন, ফাইন আর্থেনওয়্যার অথবা ষ্টোন্‌ওয়্যার—যেসব মাটির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সেইসব মাটির সংকোচন বিভিন্ন তাপমাত্রায় ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নির্ভিগড়ণ এবং মাপের সিরামিক্‌স্ তৈরীর জন্যে ওইটির রেখাচিত্রাঙ্কণ করা অথবা নকশা কাগজে আঁকতে হলে সেই মাটির সংকোচন যথোপযুক্ত তাপমাত্রায় কতোটা হতে পারে—সেটা আগে থেকেই নির্ধারণ করে নেওয়া দরকার। জন বি. কেনী তাঁর লেখা Ceramic Design বইটিতে মাটির সংকোচন নির্ধারণের একটি পদ্ধতির কথা লিখেছেন। পদ্ধতিটি এরকম: যে-মাটির মণ্ডে সিরামিক নির্মিত হবে—সে-মাটিতে একটি টালি (৬/৭ বর্গইঞ্চি মাপের) তৈরী করে ওই টালির একপ্রান্ত থেকে ২/৩ ইঞ্চি ভেতরের দিকে ধাতব শলাকার সাহায্যে একটু গভীর করে একটি সরলরেখা টানতে হবে। সরল রেখাটির মাপ স্কেলের সাহায্যে নিয়ে কাগজে লিখে রেখে টালিটি যথোপযুক্ত উত্তাপে চুল্লীতে পুড়িয়ে নেওয়া দরকার। পোড়াবার পর টালিটি কিছুটা সংকুচিত হবে এবং টালির ওপর শলাকার সাহায্যে টানা সরলরেখাটিও সংকুচিত হয়ে যাবে। সংকুচিত রেখাটির মাপ স্কেলের সাহায্যে নিয়ে কাগজে লিখে নিতে হবে। টালির ওপর টানা সরল রেখাটির যে-দুটো মাপ (চুল্লীতে পোড়াবার আগে ও চুল্লীতে পোড়াবার পর) কাগজে লিখে রাখা হয়েছে—ওই দুটো মাপের সাহায্যে একখণ্ড কাগজে একটি রেখাচিত্র এঁকে নিলে ওই চিত্রটির সাহায্যে মাটির সংকোচন নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

চিত্রটি হবে এ-রকম :

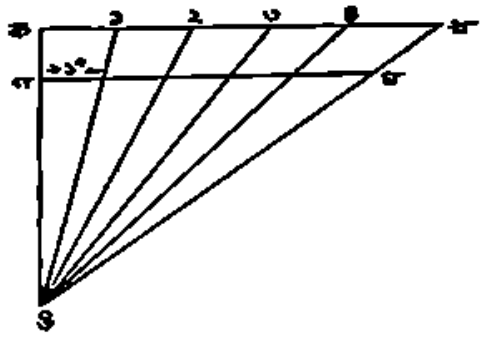

ক-খ হলো কাঁচা (পোড়াবার আগে) টালির মাপ এবং গ-ঘ হচ্ছে পোড়ানো টালির মাপ। ক-গ এবং খ-ঘ সরলরেখার সাহায্যে যুক্ত করে তলার দিকে সরলরেখা দুটো বাড়িয়ে দেওয়া হলো। সরলরেখাদ্বয় যুক্ত হলো ঙ বিন্দুতে। এবারে গ-ঘ রেখাটিকে এক ইঞ্চি মাপে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ঙ বিন্দু থেকে সরলরেখার সাহায্যে ওই ভাগগুলো যুক্ত করা হলো এবং সরলরেখাগুলো সম্প্রসারিত করা হলো ক-খ রেখার ১, ২, ৩, ৪ বিন্দু পর্যন্ত। ক-খ রেখার ওপর ক এবং ১, ১ এবং ২, ২ এবং ৩ বিন্দুগুলোর মধ্যবর্তী মাপে মাটির মণ্ডে (যে-মাটির মণ্ডে নমুনা টালিটি তৈরী করা হয়েছিলো) টালি তৈরী করে যথোপযুক্ত উত্তাপে (যে-তাপাঙ্কে নমুনা টালিটি চুল্লীতে পোড়ানো হয়েছিলো) পোড়ালে টালিটি এক ইঞ্চি মাপের হবে।

চুল্লীতে যথোপযুক্ত উত্তাপে পোড়ালে কোনো সিরামিকএর অনুরূপ সিরামিক তৈরী করতে হলে প্রথমেই ওই সিরামিকটি কোন্ তাপাঙ্কে হয়েছিলো এবং ওই তাপাঙ্কে সিরামিকটির সংকোচন কতোটা হয়েছিলো—তা জানা দরকার। তা জানা সম্ভব না হলে যে-মাটিতে ওই সিরামিকটি তৈরী করা হবে—সে-মাটির সংকোচন যথোপযুক্ত উত্তাপে কতোটা হবে তা ওপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে নির্ধারণ করে নিতে হবে। মাটির সংকোচনের যে-মাপ পাওয়া যাবে—নমুনা সিরামিকটির মাপের সঙ্গে সংকোচনের মাপ যুক্ত করে বর্ধিত আকারে নমুনা সিরামিকটির একটি রেখাচিত্র অথবা নকশা কাগজে এঁকে নিয়ে ওই নকশা অনুযায়ী আঁদরা এবং ছাঁচ তৈরী করে ওই ছাঁচে তরল সিরামিক মণ্ড ঢালাই করে যথোপযুক্ত উত্তাপে পোড়ালে নমুনা সিরামিকটির অনুরূপ সিরামিক পাওয়া যাবে।

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

অন্বেষা সাহিত্য ও মননশীলতা—রমেন্দ্রনাথ মল্লিক, কার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৩/বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, (১৯৮০). বারো টাকা।

শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রনাথ মল্লিক বাংলা সাহিত্যে কবি ও আধুনিক কথা-সাহিত্যিক-রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর মননশীল প্রবন্ধ-রচনার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন এবং বইখানির উক্ত নামকরণ করেছেন। কবি এবং কথা-সাহিত্যিক-রূপে তাঁর মধ্যে যে সৃজনীপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, এই বইখানি দিয়ে তিনি তার সঙ্গে আর এক নূতন প্রতিভা যুক্ত করেছেন, তা মননশীলতা।

সাম্প্রতিক বাংলা-সাহিত্যে মননশীল সাহিত্যের শোচনীয় অভাব দেখা যাচ্ছে। যা আপাতদৃষ্টিতে মননশীল বলে পরিচিত হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তাও তথ্য কিংবা দার্শনিক চিন্তামূলক। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কবি প্রতিভাও তাঁকে প্রকৃত মননশীল সাহিত্যরচনার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তাই তাঁর গদ্য রচনাও পদ্যধর্মী, এমনকি, দার্শনিক প্রবন্ধের ভাষাও কাব্যভাষা, তাতেও তিনি কাব্যের অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রপ্রভাবিত যুগে বাংলা সাহিত্যের ওই স্বাভাবিক ধর্ম হয়ে উঠেছিল। কচিৎ কোনো কোনো রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত দার্শনিক পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উপর প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে সাহিত্যরসের স্পর্শহীন বাংলাগদ্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্য পাঠে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁরা সেই সকল প্রবন্ধ কদাচ পাঠ করেন না। এই অবস্থায় একজন কবি এবং কথা-সাহিত্যিকের হাতে যখন মননশীল বাংলা প্রবন্ধ লিখতে দেখি, তখন আগ্রহের সঙ্গে তা পাঠ করি। কারণ, তার মধ্যে মননশীলতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের স্বাদও অনুভব করতে পারি। কারণ, কবি কখনো তাঁর স্বধর্ম বিসর্জন দিতে পারেন না, এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তা পারেন নি।

আজও আমাদের দেশে ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মবিষয়ক পত্রিকা যত প্রকাশিত হয়, তত আর কিছু হয় না। সুতরাং দার্শনিক প্রবন্ধ রচনার এবটি চর্চা আমাদের দেশে চিরকালই চলে আসছে। কিন্তু তার ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের ভাষার ব্যবধান ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। সেই ব্যবধান যাঁরা দূর করবার প্রয়াস পান তাঁরা, প্রত্যেক বাঙ্গালী সাহিত্যিকেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কবি রমেন্দ্রনাথ মল্লিক তাই। সেইজন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

পথ ও পথিক—শ্রীসুবোধচন্দ্র পাল। শ্রীবিনয় ভূষণ দাসগুপ্ত কর্তৃক স্টেশন পল্লী, ভানকুনি, হুগলী থেকে প্রকাশিত। মূল্য—২·০০ টাকা।

মোট ৪৪টি ছোট-বড় পদ্যের সংকলনই এই গ্রন্থ। অধিকাংশ পদ্যই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিদের নীতি-কবিতাকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়। 'বন্দনা ও ক্রন্দন', 'চিন্তা ও চিন্তা', 'অসীম', 'দেহ ও মন' প্রভৃতি পদ্যগুলির মূল বক্তব্যে নূতনত্ব নেই। প্রকাশ-ভঙ্গিও গতানুগতিক। 'ভুলবো কেমন করে', 'দেবতা আর কেহ নয়', 'আমি যে

বাঙালী', 'সুভাষ', 'রামকৃষ্ণ' প্রভৃতি পদ্যে দেশ, জাতি, মানুষ, স্বাধীনতা এবং স্বদেশীর কৃতী-পুরুষদের কেন্দ্র করে কবির কৃতজ্ঞতা, গর্ব, বিক্ষোভ বা অভিমান দানা বেঁধে উঠেছে। 'নিবেদন' পদ্যে কবি 'পরের দ্বারে ভিক্ষা করে মিথ্যা কেলে অশ্রুজল' এর বিনিময়ে 'স্বাধীনতা' বা 'রাষ্ট্রশক্তিবল' লাভের বিরুদ্ধে যেমন গর্জে উঠেছেন, আবার পাশাপাশি দেশবিভাগ এবং তজ্জনিত রক্তক্ষরে কবির বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে 'দ্বিখণ্ডিতা' পদ্যে। ভাববার অবকাশ না থাকলেও পদ্যগুলি পড়তে পড়তে ছন্দগুলো যেন আপনি দুলে ওঠে মনের মধ্যে। 'পথ ও পথিকের' পদ্য-চিহ্ন-খচিত প্রচ্ছদটি নামের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। ছাপাও পরিষ্কার।

শ্রীদীপঙ্কর বিশ্বাস

Essays and Speeches—(বাণী ও রচনাবলী)—স্বামী শর্বানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ—সারদাপীঠ, কাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ। (ইংরাজী) মূল্য—২৫৲

স্বামী তুরীয়ানন্দ এক সময় স্বামী শর্বানন্দকে বলেছিলেন, "আমাদের পর তুমিই উদীয়মান ক্ষেত্র"। স্বামী শর্বানন্দও মহাপুরুষের সেই ভবিষ্যৎবাণীর যথাযথ মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন ৪৪ বৎসরকাল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সেবা দ্বারা। পরবর্তীকালে অবশ্য তিনি স্বীয় আদর্শে কাড়গ্রামে একটি কন্যাগুরুকুল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাপীঠ স্থাপন করে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারা-প্রচারে ব্রতী হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাশীতে স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন করেন এবং ১৯০৬ সালে কাশীতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ১৯১১ সালে তিনি মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পদে ব্রতী হন—শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্তান স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের দেহান্তের পর। মাদ্রাজ হতে বেদান্ত-কেশরী ইংরাজী মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন তিনিই। তাছাড়া দিল্লী, নাগপুর ও করাচী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমেরও তিনি সংগঠক। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ উন্নত দেহ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ও সর্বোপরি বাগ্মিতা তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ প্রচারকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাঁর তেজ-দৃপ্ত বাণী শ্রবণে শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে যেত। সর্বোপরি গভীর অধ্যাত্ম-চেতনা যা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পত্রাবলীর মধ্যে, ভক্ত-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরে—তাও তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন "শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কী"-গ্রন্থে।

'**Essays and Speeches**' আলোচ্য (বাণী ও রচনাবলী) এই গ্রন্থখানি সিংহল, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর, দূর-প্রাচ্য, দিল্লী, নাগপুর, করাচী প্রভৃতি স্থানে প্রদত্ত তাঁর ২৮টি ভাষণের সংকলন। তিনি একজন চলিষ্ণুমনের সন্ন্যাসী। এজন্য তাঁর এই সংকলন-গ্রন্থখানির মধ্যে দেখি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের মূলভিত্তির সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তার সমন্বয় ঘটিয়ে তিনি এই বাণী ও রচনাগুলিকে বৈজ্ঞানিক-মানসিকতাযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে উপস্থাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ফলে শ্রোতৃমণ্ডলীও গভীরভাবে তাঁর বক্তৃতার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। ভারতীয় দর্শনের সহিত পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের তুলনামূলক এরূপ আলোচনায় স্বামী অভেদানন্দ ব্যতীত পরবর্তীকালে অপর কাউকে এভাবে সচেষ্ট হতে দেখা যায় নি। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থখানিতে "Vedanta and Nationalism" "Concept of the Soul,"

"God, Soul and Matter", "Sublimation of Instinct", "Vedanta and Communism" এবং "Maya in Modern Science"—উল্লেখযোগ্য রচনা এবং এগুলির মধ্যে বৈদগ্ধ্যের সাক্ষ্য সুস্পষ্ট।

"Sublimation of Instinct"-বক্তৃতায় William James, Mcdougull প্রভৃতির আলোচনা উদ্ধৃত করে এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতবাদটি প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন যে—"জৈবিক-স্বভাবধর্ম" পরিবর্তিত হয়ে দেহধর্ম থেকে (Physical) নৈতিক (Moral), এবং নৈতিক থেকে আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থায় কেমন করে মানুষ উন্নীত হতে পারে, করেছেন তার তুলনামূলক আলোচনাও।

"Vedanta and Communism"-দীর্ঘ আলোচনায় নানা প্রশ্নের অবতারণা করে উপসংহারে গ্রন্থকার ভঙ্গিতেই বলেছেন : "So Communism or Socialism of any complexion that denies the spiritual varities of life and tries to base its pseudo-philosophy on a purely economical social or political basis is bound to fail in the long run."

অর্থাৎ যে কোন ধাঁচের কমিউনিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ যদি জীবনের ধ্রুব-আধ্যাত্মিকতাকে অস্বীকার ক'রে নেতি-মূলক দর্শনকে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক, সামাজিক অথবা রাজনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয় তাহলে তা পরিশেষে ব্যর্থ হতে বাধ্য। বিশেষ করে তাঁর Maya in Modern Science"-বক্তৃতায় স্বামী শর্বানন্দজী একটি পরিপূর্ণ বিদগ্ধ-মনের সাক্ষ্য রেখে গেছেন : ব্র্যাডলি, আইনষ্টাইন্, জেমস্ জীনস্, আর্থার এডিংটন, হাইজেনবার্গ, শ্রোডিংগার প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মনীষীদের মন্তব্য ও যুক্তি উদ্ধৃতি দ্বারা বলেছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে—"বস্তুকে আমরা যেভাবে প্রত্যক্ষ করি, তার প্রকৃত স্বরূপ তা নয়"। এইভাবে তিনি আচার্য শংকরের 'মায়া'-র সংজ্ঞা 'জগৎ'-কে আমরা যেভাবে দেখি তার প্রকৃত স্বরূপও তা নয়—দেখিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের সঙ্গে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সামঞ্জস্য বিধান করে গেছেন। সুতরাং স্বামী শর্বানন্দজীর মতো গভীর অধ্যাত্ম-বোধসম্পন্ন ও একজন বিদগ্ধ সন্ন্যাসীর এই সংকলন-গ্রন্থখানি যে বুদ্ধিজীবি সমাজে বিশেষ সমাদৃত হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

মুদ্রণত্রুটি নাই বললে চলে। প্রচ্ছদ্ ও বাঁধাই উত্তম।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

●

আগামী ২৭শে জানুয়ারী ১৯৮১ মঙ্গলবার যুগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম শুভজন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠে বিশেষ পূজানুষ্ঠান, সঙ্গীতাদি ও সন্ধ্যায় 'সাধারণসভা'-র অধিবেশন হইবে। আপনি সবান্ধব এই উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করিবেন।

জিনিষপত্রের দাম কমানোর জন্যে

যত দিন যাচ্ছে বাজারে জিনিষপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করাই এখন দুরুহ কাজ। প্রতিদিনই সব কিছুর দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। এই তো আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এর কি কোনই প্রতিকার নেই ?

খাদ্যশস্য, চিনি, তেল, কেরোসিন, ডিজেল, সার, কয়লা, কাপড় ইত্যাদি ১৪টি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের দাম বেঁধে দিয়ে সেগুলি সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই সম্ভব নয় ? আমরা মনে করি সম্ভব। একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই এই দায়িত্ব নিতে পারেন। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই নির্ধারণ করতে পারেন। কারণ রাজ্য সরকারের হাতে বিদেশ থেকে কোন কিছু আমদানি করার ক্ষমতা নেই—এমনকি কেন্দ্রের সক্রিয় সহযোগীতা ছাড়া অন্য রাজ্য থেকে তাঁরা কোন কিছু কিনতেও পারেন না। কাজেই সারা দেশ জুড়ে এ ধরনের বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। একমাত্র তাঁরাই দেশের যেখানে যে জিনিষ পাওয়া যায় কিনে যেখানে প্রয়োজন সেখানে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন। কারণ এর জন্যে যে বিরাট সম্পদ ও বিশাল পরিবহন ব্যবস্থার প্রয়োজন—সে সবই তো তাঁদের হাতেই। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই দায়িত্ব পালন করে রাজ্যে রাজ্যে জিনিষপত্র পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, রাজ্য সরকারগুলির তখন দায়িত্ব হবে সেইসব জিনিষ সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। একমাত্র এইভাবেই মজুতদার, মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের ক্ষমতা খর্ব করা সম্ভব।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ২৯৫/৮১

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাণী ও বিচার

(ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

॥ তৃতীয় ভাগ ॥

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

'বাণী ও বিচার' গ্রন্থ এখন আর কাহারও নিকট অপরিচিত নয়। ইহার তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। ইহাতে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। বিশেষ করিয়া 'মহাকাল ও মহাকালী' ও 'তন্ত্রকথা' প্রভৃতি আলোচনা এই গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও অন্যান্য ছবি দেওয়া হইয়াছে। তাহা ছাড়া দুইটি পরিশিষ্টের মধ্যে প্রথম পরিশিষ্টে স্বামী প্রভানন্দ মহারাজ-লিখিত 'শিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধ আলোচনাটিও প্রকাশিত হইল। আর প্রকাশিত হইল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অঙ্কিত দুইটি চিত্র।

মূল্য—২০·০০

গ্রন্থ-মূল্য পাঠাইলে ডাকখরচ V.P.P. করা হইবে
মূল্য পাঠাইবার ঠিকানা :—

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

প্রকাশন বিভাগ

১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ফোন : ৫৫-১৮০০

আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠুক
—এই আমাদের প্রচেষ্টা...

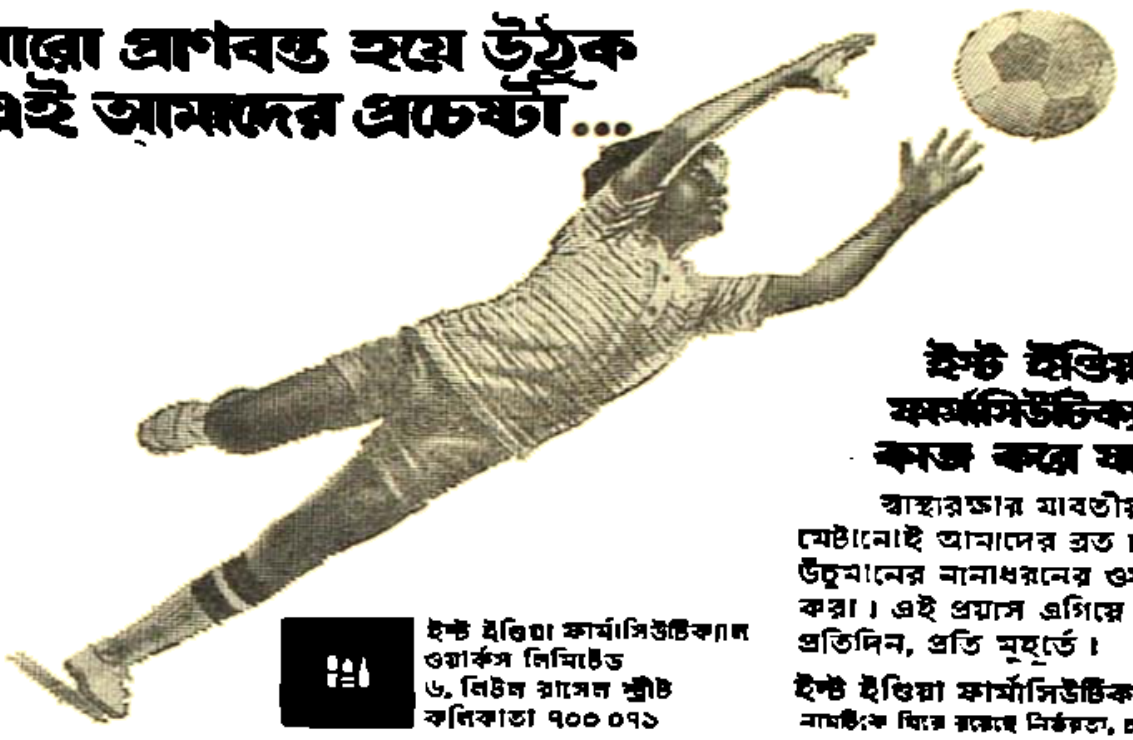

ইষ্ট ইণ্ডিয়া
ফার্মাসিউটিক্যাল
কাজ করে যাচ্ছে

স্বাস্থ্যরক্ষার যাবতীয় চাহিদা মেটানোই আমাদের ব্রত। এরই জন্যে উচুমানের নানাধরনের ওষুধ তৈরি করা। এই প্রয়াস এগিয়ে চলেছে— প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস—
নামটিকে ঘিরে রয়েছে নির্ভরতা, চার দশক পেরিয়ে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফার্মাসিউটিক্যাল
ওয়ার্কস লিমিটেড
৬, নিউন রাসেল স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭১

EIPW/IN/CAS/3180 BEN

হোসিয়ারী শিল্পে
শ্রীবিষ্ণুর
অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :
SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS
CALCUTTA-700005

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,
CALCUTTA-700006

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিটুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট স্প্রার-অফ্-মিক্সচোসে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এস, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

ফোন : ৪৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
19B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. I & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South Asian Peoples Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its Form, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.

Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)

Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733/57
42nd Year, January 1981
VOL. XI

Regn. No. WB/NC-141
PHONE 55-1800

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০১১৩, ৩২১১৪২, ৩৩১৭৩২
Cable: 'Cookumpure', 'Dorcespice'
Telex: 021 2591 A/B 'Cook'
Post Box: Burrabazar 6585 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
19-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006, printed at the New Indian Press, 6, Dull Street, Calcutta-700006
PRICE Rs. 1.50
Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012
মূল্য ১.৫০টাকা

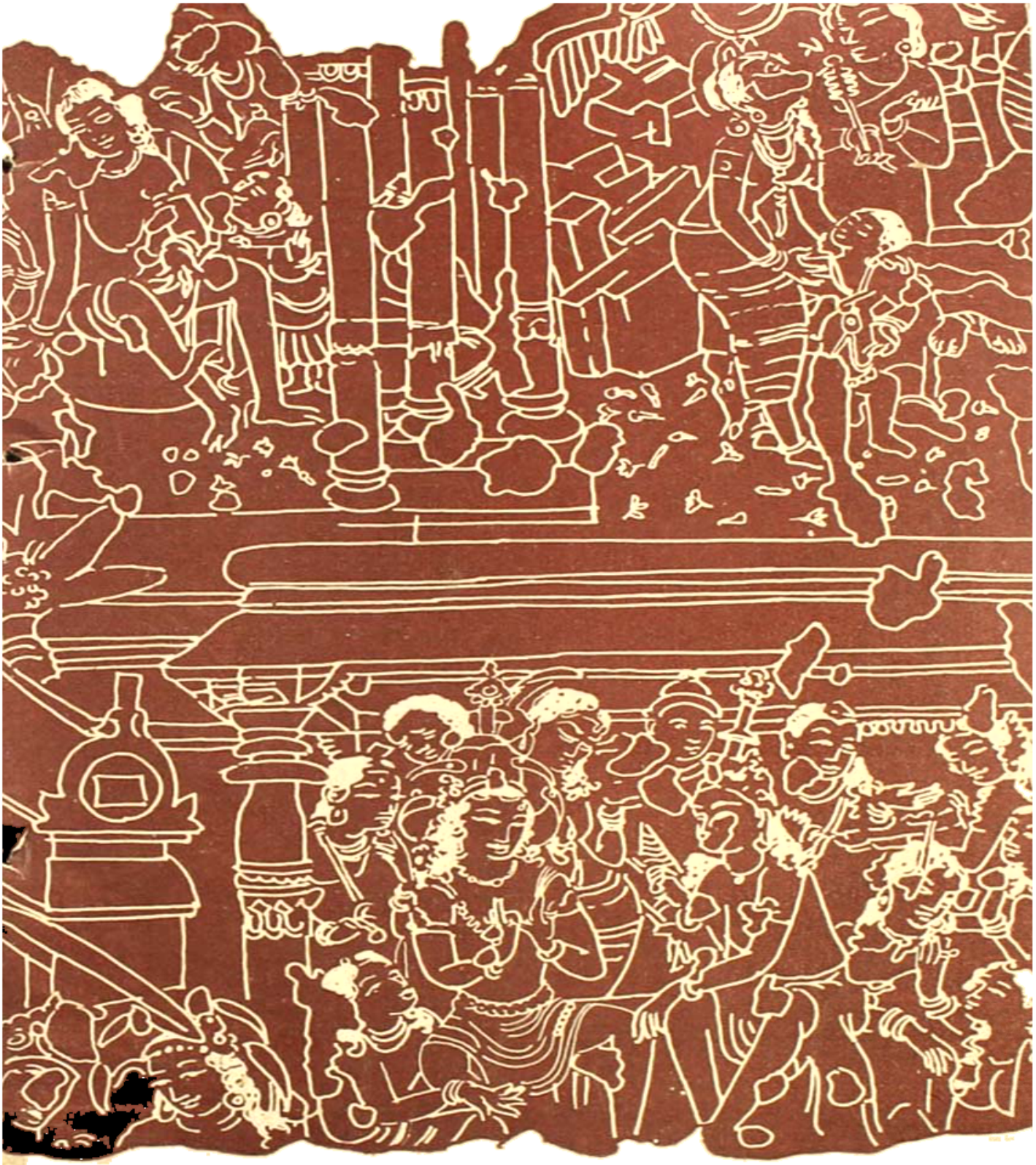

বিশ্ববাণী

স্বামী অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক :
স্বামী সদাত্মানন্দ
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
সহ: সম্পাদক :
শ্রীআশুতোষ ঘোষ

বিংশতিতম বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
মাঘ
১৩৮৭

।। বিশ্ববাণীর নিয়মাবলী ।।

- 'বিশ্ববাণী'-র বর্ষ আরম্ভ হয় প্রতি ফাল্গুন মাসে এবং মাঘ মাসে শেষ হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক ১২·০০ টাকা, ষাণ্মাসিক মূল্য সডাক ৬·০০ টাকা। গ্রাহক/গ্রাহিকা হইবার জন্য মূল্য মনিঅর্ডারযোগে অগ্রিম 'বিশ্ববাণী' অফিসে পাঠাইতে হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যা ১·৫০ টাকা মূল্যে পাওয়া যায়। পত্রিকা হাতে নিলে বার্ষিক ও ষাণ্মাসিক চাঁদা যথাক্রমে ১১·০০ টাকা ও ৬·০০ টাকা মাত্র।
- ফাল্গুন হইতে শ্রাবণ মাস পর্যন্ত বার্ষিক এবং ভাদ্র মাস হইতে মাঘ মাস পর্যন্ত ষাণ্মাসিক গ্রাহক/গ্রাহিকা হওয়া যায়। বার্ষিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদিগকে বৎসরের ১ম অর্থাৎ ফাল্গুন-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয় এবং ষাণ্মাসিক-গ্রাহক/গ্রাহিকাদের ভাদ্র-সংখ্যা হইতে 'বিশ্ববাণী' পাঠানো হয়।

বর্ষ শুরু হওয়ার পূর্বেই বকেয়া চাঁদা ও নূতন বর্ষের চাঁদা জমা দিতে হয়।

- ভারত সরকারের 'ডাক ও তার' বিভাগের নির্দেশনামা অনুসারে প্রতি ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের পর 'বিশ্ববাণী' গ্রাহক-গ্রাহিকাদের ঠিকানায় পাঠানো হয়। যথা সময়ে বিশ্ববাণী না পাইলে পরবর্তী ইংরাজী মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে 'বিশ্ববাণী'-অফিসে পত্র দিতে হয়।
- ঠিকানা অল্প দিনের জন্য পরিবর্তন করিতে হইলে স্থানীয় ডাকঘরে এবং বেশী দিনের জন্য হইলে বিশ্ববাণী অফিসে জানাইতে হয়।
- 'বিশ্ববাণী'-র মূল্য মনিঅর্ডারযোগে পাঠাইলে অথবা যে কোন কারণে পত্র লিখিলে সব গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ অতি অবশ্যই তাঁদের গ্রাহক/গ্রাহিকা নম্বর এবং নিজ নিজ নাম ঠিকানা উল্লেখ করিবেন।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে বৎসরের শেষে অবশ্যই পত্র দ্বারা অফিসে জানাইতে হইবে। বর্ষ শেষ হওয়ার পূর্বে পত্র মারফৎ পরবর্তী বর্ষে বিশ্ববাণী পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ না দিলে বিশ্ববাণীর গ্রাহকতালিকাভুক্ত সকল গ্রাহক/গ্রাহিকাকেই পরবর্তী বৎসরেও নিয়মিত বিশ্ববাণী পাঠানো হইবে এবং যথারীতি চাঁদা ধার্য্য করা হইবে। বৎসরের মধ্যে বিশ্ববাণী বন্ধ করার নির্দেশ দিলে পূর্বে পাঠানো ঐ বর্ষের সংখ্যাগুলির মূল্য পাঠাইতে হইবে।
- বিশ্ববাণীর গ্রাহক/গ্রাহিকাগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, প্রকাশন বিভাগ, হইতে প্রকাশিত সকল পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা ১০৲ (১০%) কমিশন পাইবেন।
- চেক 'Visvavani, Ramakrishna Vedanta Math'—এই নামে হইবে। কলিকাতার বাহিরের Bank এর চেক পাঠাইলে Bank Charges- বাবদ অতিরিক্ত ২·৫০ টাকা পাঠাইতে হইবে।

অফিসের ঠিকানা :—

বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

১৯বি. রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬.

ফোন : ৫৫-১৮০০

অফিস সময় :—

শনিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-০০মিঃ থেকে ১১-৩০মিঃ এবং বিকাল ৩-৩০মিঃ থেকে ৬-৩০মিঃ

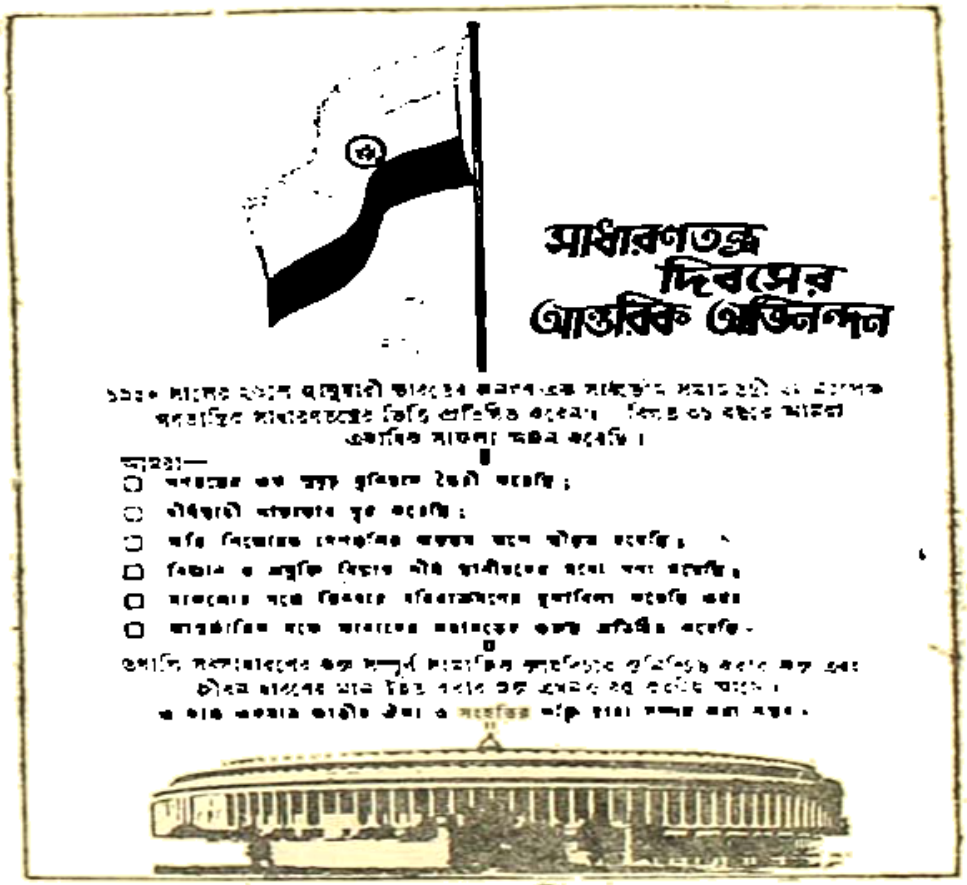

প্রগতি ও নিরাপত্তার জন্য জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করুন
ও ধর্ম নিরপেক্ষতার আদর্শ দৃঢ়মূল করুন

ফোন : ৫৫-৭৩০১

শিল্প-নৈপুণ্যে এবং আধুনিকতায় অতুলনীয়

সেন জুয়েলার্স

৮১, বিধানসরণী কলিকাতা-৭০০ ০০৯,

(হাতীবাগান বাজার)

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সর্বপ্রকার কাগজ, কালি, লেখনসামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা

★

'রঘুনাথ বিল্ডিংস্'

৩২-বি, রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-৭০০০০১ ফোন : ২৬-১০৫৫,৫৬

অন্যান্য শাখা :— বারাণসী, কটক।

॥ ব্রহ্মচারী স্বরূপানন্দ ॥

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী	মূল্য : আট টাকা
ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী	মূল্য : পনের টাকা
ভগিনী নিবেদিতা	মূল্য : চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা

অশোক প্রকাশন ৫৪ এ/৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা ৭০০০০৭

গীতাশাস্ত্রী জগদীশ ঘোষের শ্রীগীতা ২৮·০০
(মূল অবয় অনুবাদে টীকা ভাষ্য-রহস্য ভূমিকাসহ)

শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবতধর্ম ২৪·০০
(শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও লীলার শাস্ত্রীয় আলোচনা)

সংক্ষিপ্ত শ্রীগীতা ১৫·০০

শিক্ষার্থী ধর্মশিক্ষা ৪·০০

সুলেখক শ্রীঅমিলচন্দ্র ঘোষ, এম-এ প্রণীত

ব্যায়ামে বাঙালী	৮·০০
বীরত্বে বাঙালী	৬·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	১০·০০
বাংলার ক্ষতি	৮·০০
বাংলার মনীষী	৪·০০
বাংলার বিদুষী	৬·০০
ব্যবহারিক শব্দকোষ	২০·০০
(প্রয়োগমূলক অভিনব বাংলা অভিধান)	

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী

১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-৭৩

যাবতীয় পেটের পীড়ায়

ডাঃ সেনের

ষ্টমাক্ কিওর

অব্যর্থ ফলপ্রদ

সেন্স্ কেমিক্যাল ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ

২৭১, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৬

ফোন { অফিস— ৫৫-৩৯৬০
ল্যাবরেটরি—৫৬-২৪৭৪

ফোন : ৫৫-৮৫২২

খাঁটি ঔষধ ও দ্রুত কার্য্যের জন্য

শ্যামকানাই ফার্মেসী

কেমিষ্টস্ ও ড্রাগিষ্টস্

৪২, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০০৪

ডঃ এম, সি, পালের রক্ত পরীক্ষাগার

এখানে থুতু, রক্ত, মল, মূত্র, ইত্যাদি অভিজ্ঞ পরীক্ষক দ্বারা পরীক্ষা করান হয়।

১৩১ সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৪

The New Indian Press

QUALITY PRINTERS & DESIGNERS

6, DUFF STREET,

CALCUTTA-700006

মডার্ণ ডেকরেটরস

শুভ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬৫/এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-২৫৪৯ | ৫৫-৬৫৬৫

ESTD. 1930

JESSORE COMB INDUSTRY CO.

MANUFACTURERS OF

"JEET" BRAND POLYTHENE & P.V.C. PIPES,
"SANKHA" BRAND CELLULOID & PLASTIC
COMBS & NOVELTIES.

P.B. BOX NO. 10813, CAL-9

ডি. রতন এণ্ড কোং

ফটোগ্রাফার্স

ফটো

২২৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি ৬

কেশুতে পাতার
রসে ও গন্ধে
কেশুত
কেশতৈল

নিধ্যাস পারফিউম প্রোডাক্টস
(প্রাঃ) লিমিটেড

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত

বিশ্ববাণী

রেজিষ্টার্ড নং ১৩৭৩৩/৫৭, ফোন : ৫৫-১৮০০

মাঘ, ১৩৮৭

সম্পাদক : স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

সহ-সম্পাদক : শ্রীআশুতোষ ঘোষ, এম, এ

॥ উপদেষ্টামণ্ডলী ॥

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার
ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
ডঃ শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
ডঃ শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র
ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ

॥ সহায়কমণ্ডলী ॥

স্বামী বুদ্ধাত্মানন্দ
শ্রীদেবাশীষ হোড়
শ্রীদিবাকর সেনরায়

প্রকাশ স্থান :
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯ বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ও মুদ্রক :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

কর্মাধ্যক্ষ :
স্বামী পরমাত্মানন্দ

সহ-কর্মাধ্যক্ষ :
ব্রহ্মচারী সত্যনারায়ণ
শ্রীরমণীরঞ্জন পোদ্দার

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়

মুদ্রণ :
শ্রীসুবের দত্ত
দি নিউ ইণ্ডিয়ান প্রেস
৬ নং ভাক্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :
নবারুণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১৬৬, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯।

॥ প্রচ্ছদপট পরিচিতি ॥

প্রচ্ছদপটে খ্রীস্টপূর্ব ৩০০-২০০ শতকে রচিত অজন্তাগুহাচিত্রে অঙ্কিত চম্পেয়্যজাতকের কাহিনী অঙ্কন করেছেন বিদগ্ধ শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায়। বিভিন্ন বৌদ্ধজাতকে লিখিত বোধিসত্ত্ব-বুদ্ধেরই বিচিত্র জীবনকাহিনীর একটি চিত্র এঁটি। নীচের চিত্রটিতে সিংহাসনে আসীন নাগরাজ চম্পেয়্য।

॥ সাপ্তাহিক আলোচনা ॥

কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—অভেদানন্দ হলে

• স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ প্রতি রবিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-টীকাসহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আলোচনা করিতেছেন।

• স্বামী পরমাত্মানন্দ মহারাজ প্রতি শনিবার 'মনের বিচিত্র রূপ' আলোচনা করিতেছেন সন্ধ্যা সাত ঘটিকায়।

• প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয় আলোচনা করিতেছেন বিদগ্ধ মনীষীগণ।

• ভাগবতাচার্য প্রফেসর রাস গৌর ঘোষাল, এম্.এস্.সি., এম্, বি. (কলি), ডি. টি.এম্ (লিভার) সোমবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীমদ্ভাগবত" ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• পণ্ডিত শ্রীবিধুভূষণ ন্যায়-তর্ক-বেদান্ততীর্থ, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বুধবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় 'যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ' ব্যাখ্যা করিতেছেন।

• শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি" আলোচনা করিতেছেন।

• প্রতি রবিবার বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় "রামনাম" ও ভজনগান।

Please Contact :—

D. Banerjee & Co.

Govt. and General Order Suppliers.
(ESTD-1956)

For C.I. D/F & S/S Pipes and Specials both ISS and BSS C.I. Plain Ended Fittings, C.I. Detachable Joints for A.C. Pressure Pipes and C.I. D/F Sluice Valve, C.I. Air Valve C.I. NON-Return Valve C.I. Fire Hydrant, C.I. Pressure Release Valve.

Regd. Office :—
T-35, Raja Naba Krishna Street,
Calcutta-700005,
Gram : PLAINED
Phone : 55-6172

Sales Office ;—
131, B.K. Paul Avenue, Calcutta-700005.
Post Box No. 12206, Calcutta-700005.
Phone : 55-7115

বৃহৎ ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ
প্রস্তুতকারক

ভারত মেশিনারী

১০৫, উল্টাডাঙ্গা মেন্ রোড,
কলিকাতা-৭০০০৬৭
ফোন : ৩৫-১৬১৩

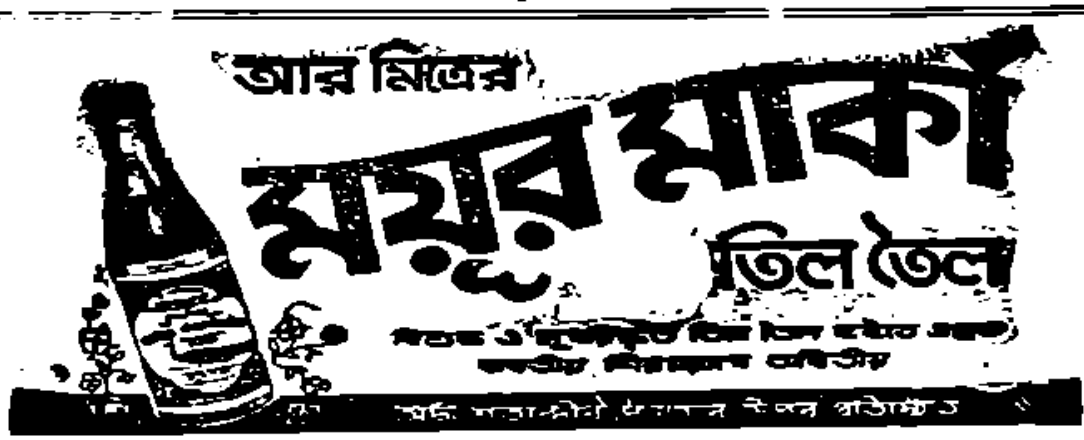

ফোন নং ৪৬-৮৪৯৮

মোটর গাড়ীর যন্ত্রাংশের ঐতিহ্যমণ্ডিত বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী লিমিটেড

★

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র—১৬, জগদীশচন্দ্র মুখার্জী রোড,
কলিকাতা—৭০০০০১
অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা • ধানবাদ • কটক • শিলিগুড়ি • গৌহাটী।

বিশ্ববাণী

মাঘ, ১৩৮৭

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
১।	বাণী ও বিচার	৬১১	
২।	বিবেকানন্দস্তোত্রম্	৬২৭	শ্রীঅমলেশচন্দ্র দেবরায়
৩।	সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	৬২৭	স্বামী প্রভানন্দ
৪।	ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	৬৩৪	শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ
৫।	চিরসৈনিক	৬৩৭	শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিয়া
৬।	তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	৬৩৮	ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী
৭।	জাপানের কাবুকি নাটক	৬৪১	ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য
৮।	কেন হিন্দুরা খ্রীষ্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে—স্বামী অভেদানন্দ	৬৪৩	অনুবাদক : শ্রীকৃপতিমোহন মুখোপাধ্যায়
৯।	ভারতীর্থ	৬৪৬	শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী
১০।	শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা	৬৪৮	শ্রীদিবাকর সেনরায়
১১।	গ্রন্থ-সমালোচনা	৬৫১	
১২।	বর্ষ সূচী	৬৫৪	

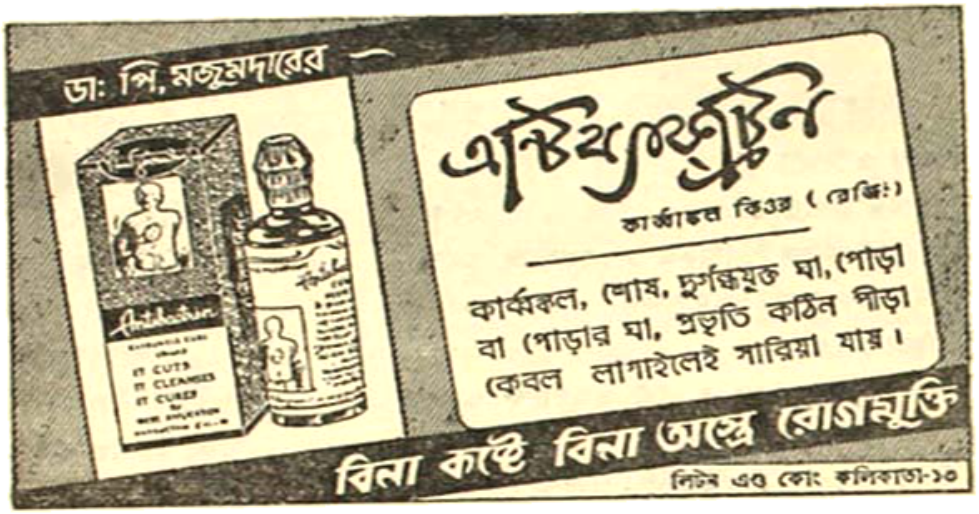

PHONE : 55-4528

If you need long life and trouble free service :—

Please Contact —

ARI & SONS

Manufacturers of :—

ROSE BRAND

STORAGE BATTERIES & BATTERY PLATES

Factory :—14, Ultadanga Road, Calcutta-4

Res :—13, Principal Khudiram Bose Road, Calcutta-6

In all Seasons

SKINOVA

FACE CREAM

RESTORES YOUR NATURAL BEAUTY

ECONOMIC

Manufactured by :

ECONOMIC HOMŒO PHARMA

RUBY PARK, MALTI, 24 PARGANA

Hd. Office :

Mahatma Gandhi Road

Calcutta-9

বিয়াল্লিশ বর্ষ | দ্বাদশ সংখ্যা | মাঘ ১৩৮৭

॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ)

॥ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ ॥

(নবমাংশ)

॥ পাশ্চাত্যদর্শনে শক্তি ও ঈশ্বর ॥

পাশ্চাত্য-দার্শনিকদের ভিতর ঈশ্বরের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। পাশ্চাত্য-দার্শনিকদের মধ্যে ইমানুয়েল কাণ্ট ও এফ, এইচ, ব্যাডলের নাম এ'প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া আছেন ডেকার্টে, স্পিনোজা, ফিক্টে, শেলিঙ, কোলরিজ, সোপেনহাউয়ার এবং আরও অনেকে। ইমানুয়েল কাণ্ট ঈশ্বর স্বীকার করেছেন এবং মাঝে মাঝে ঈশ্বর ও তাঁর বিশ্বোত্তীর্ণ অথচ বিশ্বগত ব্রহ্ম বা এ্যাবসোলিউটকে (Absolute) প্রায় একই আসনে বসাতে চেয়েছেন। তাছাড়া দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সারের মতোই তিনি তাঁর ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে (Thing-in-Itself) অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় (Unknown and Unknowable) বলেছেন, অথচ এই অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় ব্রহ্ম বুদ্ধির গোচর (appreceived by Intellect)। Intellect বা বুদ্ধিকে বলা যেতে পারে শুদ্ধবোধি বা Pure-Intuition, নচেৎ এই বোধি বা intuition আবার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা sense-product হয়ে পড়ে। সেজন্য কেয়ার্ড-প্রমুখ অন্যান্য পাশ্চাত্য দার্শনিকরা ইমানুয়েল কাণ্টের Unknown and Unknowable Thing-in-Itself বা এ্যাবসোলিউটের সমালোচনা করতে ছাড়েন নি—এই ব'লে যে, তাহলে এ্যাবসোলিউটের

চেয়ে আরও একজন মহান্ বোধি বা পরচেতনা আছে—যার সাহায্যে এ্যাবসোলিউটকে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত বলে নির্ধারণ করা যায়, বা জানা যায় প্রভৃতি। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে কাণ্টের চরম ও পরম-সত্তা ব্রহ্মতত্ত্ব তাই কিছুটা দোষদুষ্ট ও দুর্বিজ্ঞেয়।

॥ ব্র্যাডলে ও ঈশ্বর ॥

ইংরাজ-দার্শনিক এফ, এইচ, ব্র্যাডলেও (E. H. Bradley) ঈশ্বর কিংবা সর্বাতীত ব্রহ্মসত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মসত্তাও ভারতীয় অদ্বৈতবেদান্তের এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ দোষশূন্য নয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে ব্র্যাডলে বলেন যে, মানুষের ধর্মগত চেতনার কাছে আত্মচেতন সর্বমঙ্গলময় প্রেমময় যে ঈশ্বর আবির্ভূত হন—দার্শনিক বিচারে তাঁকেও ঠিক পারমার্থিক-সত্তার অধিকারী ব'লে গ্রহণ করা যায় না, কেননা ঈশ্বরের প্রকৃতিতেও আত্ম-বিরোধ (self-contradiction) আছে। সুতরাং দেখা যায়, প্রথমত, ঈশ্বরের আত্মচেতনার মধ্যেই যে একটি স্ববিরোধ-সত্তা অন্তর্নিহিত থাকে—তা প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয়তঃ, ঈশ্বরের নিজের প্রকৃতির মধ্যে জীব ও জগতের সঙ্গে যে কতকগুলি সম্বন্ধ বা সম্পর্ক অনুস্যূত আছে—তাও বোঝা যায়। অবশ্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তারূপেই ঈশ্বর স্বীকৃত। তাছাড়া জীবের নিয়ন্তা ও ভাগ্যবিধাতারূপেও তিনি (ঈশ্বর) উপাস্য ও আরাধনার বিষয়। কিন্তু এ' সকল সম্বন্ধই ঈশ্বরের প্রকৃতির মধ্যে আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির (internal contradictions) কারণ। সুতরাং এই সকল দিক থেকে ঈশ্বর অব্যক্ত-ব্রহ্মের একটি অসম্পূর্ণ ব্যক্তরূপ ও পূর্ণ-অসঙ্গতিসম্পন্ন পরমসত্তার অন্তর্বিরোধদুষ্ট অভিব্যক্তি। কিন্তু তাহলেও ব্র্যাডলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতোই ঈশ্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ বলেছেন। তথাপিও বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর ও ব্রহ্ম এবং ব্র্যাডলের এ্যাবসোলিউট ঠিক এক বস্তু নন।

দার্শনিক ব্র্যাডলে ব্রহ্ম বা এ্যাবসোলিউটকে বলেছেন এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন পূর্ণ ও বিকল্পের অতীতপুরুষ। সমগ্র দৃশ্যমান জগৎ বা বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের (Absolute) মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে অন্তর্বিরোধমুক্ত এক মহাসমন্বয়-সত্তায় বিধৃত। এই এ্যাবসোলিউটই Experience[১] of Spirit বা পুরুষ। বুদ্ধিনির্মিত দৃশ্যমান বস্তুতে বা

১। রিচার্ড ওলহেইম্ (Richard Wollheim *F. H. Bradley* (Penguin Books, 1960)-গ্রন্থে 'Appearance and Reality'-আলোচনায় দার্শনিক ব্রাডলের Absolute or Reality-র স্বরূপের প্রসঙ্গে লিখেছেন : "Reality is one or Monism, Next in importance to it is the doctrine : Reality is experience, or Idealism". এ'প্রসঙ্গে ব্রাডলে নিজে বলেছেন : "When we ask as to the matter which fills up the empty outline, we can reply in one word, that this matter is experience.....Sentient experience, in short, is reality, and what is not this is not real".

এই *Experience*-এর বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরিশেষে রিচার্ড ওলহেইম্ বলেছেন : ".....It is nothing but experience. And so starting from a tautological premiss, Bradley arrives at one of the boldest doctrines embraced by the mind of man" (p. 200).

পদার্থে গঠিত এই ব্রহ্ম, এবং এই সকলের রূপান্তরের ফলে যে অখণ্ড ও অনির্বচনীয় ও বুদ্ধির অগম্য ও পরমচেতনার উৎপত্তিস্থল—তাই ব্রহ্মের বা এ্যাবসোলিউটের পরমসম্পদ। অথবা বলা যায়, ব্রহ্মের মধ্যে জ্ঞান, শক্তি ও আনন্দ সমস্তই বিদ্যমান, অথচ এদের কোনটিও পৃথকভাবে বা সম্মিলিতভাবে ব্রহ্মের মধ্যে থাকে না, বরং ব্রহ্মের মধ্যে এরা রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ ঐ সকল গুণ ভিন্ন হলেও অভিন্নভাবে তারা ব্রহ্মের মধ্যে থাকে। কিংবা বলা যায় যে, সত্য, শিব ও সুন্দর গুণগুলি নিজেদের রূপ অতিক্রম ক'রে ব্রহ্মের অনির্বচনীয় স্বরূপে অন্তর্লীন থাকে। ব্রাডলের ব্রাডলে তাঁর সুবিখ্যাত *Appearance and Reality*-গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

I. 'They are but appearances and one-sided adjectives of the universe, and they are real only when taken up into and *merged* in the totality'. p. 406.

II. 'And, since this appearance is not identical with reality, it cannot wholly be true.....But, when that is reached, the theoretic attitude has been, as such, *swallowed up*. It throughout, on one hand, presupposes a relation, and, on the other hand, it asserts an independence : and, if these jarring aspects are moved or are harmonized, its proper character is gone.....'. p. 409.

III. 'And, as we have perceived, in this unity relations of isolation and hostility are affirmed and absorbed'. p. 442.

IV. 'Perfection and individuality belong only to the whole in which all degrees alike are at once present and absorbed.....The Absolute has no seasons, but all at once bears its leaves, fruit, and blossoms. Like our globe it always, and it never, has summer and winter',—p. 442.

ব্রাডলের ব্রাডলের দার্শনিকমতে ব্রহ্মের যে সমন্বয়ের রূপ আছে সেই রূপে সঙ্গতি ও অসঙ্গতি অর্থাৎ এক ও বহুর সহাবস্থান ভারতীয় দর্শনের—বিশেষ ক'রে অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে বেশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়, কেননা ব্রাডলে অনেকটা দার্শনিক হেগেলের মতোই অন্তর্বিরোধ বা অন্তর্দ্বন্দ্বকে বজায় রেখে মিলন-আকৃতির আকাঙ্ক্ষা করেছেন তাঁর সর্বাতীত অথচ সর্বানুস্যূত ব্রহ্মের মধ্যে। মোটকথা ব্রাডলের সমন্বয়ী-ব্রহ্মবস্তু আত্মসঙ্গতিসম্পন্ন, আবার অন্তর্বিরোধদুষ্ট—যা বিচারীর দৃষ্টিতে অসঙ্গতিপূর্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দৃষ্টিতেও ব্রাডলের এই মতবাদ কিছুটা অসম্পূর্ণ ও দোষদুষ্ট এজন্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর পরমবস্তু ও চরমসত্য ব্রহ্মচৈতন্যকে সর্ববিরোধশূন্য অদ্বৈত ও অখণ্ড বস্তু বা তত্ত্ব বলেছেন।

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার এ'প্রসঙ্গে বলেন যে, ব্রাডলের মতে বোধ (চৈতন্য) বা অনুভূতি যদিও আমাদের সত্যকারের জ্ঞানের দ্বৈতভূমিকে অতিক্রম করে, তাহলেও সেই

জ্ঞানসত্তাকে বিশ্ববিগ্রহরূপে নির্ণয় ও গ্রহণ করা সম্ভব, কেননা তার মধ্যে জ্ঞানপুঞ্জগুলি নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। আচার্য শঙ্করের জ্ঞানসত্তাকে কিন্তু এরূপ কোন সংজ্ঞা দিতে পারা যায় না, কারণ ঐ বোধের, চৈতন্যের বা অনুভূতির কোন নির্দিষ্ট রূপ বা আন্তর-জ্ঞানের প্রকাশ নাই, সে'জন্য তা চিরকালই সকল রকম সম্বন্ধশূন্য ও উপাধিবর্জিত হয়ে থাকে। বরং সেই বোধ বা অনুভূতি আমাদের কাছে প্রতীত বা প্রতিভাত হয় স্বরাটরূপে, আবরণের সকল ভেদের অতীত হয়ে, উপাধিবিহীন হয়ে, আর নিত্যস্বাধীন প্রজ্ঞারূপেও প্রমাণিত হয়। ইউরোপীয় দর্শনের দৃষ্টিতে তত্ত্বের ও তত্ত্বের এরূপ দৃষ্টি বিরল, কারণ ইউরোপীয় দর্শন সত্যের সেই মহিমান্বিত ভাবকে অতিক্রম ক'রে সত্যকে পেতে ও বুঝতে চেয়েছে তার বিশ্বপ্রকাশেরই ভিতর। সেজন্য ভারতবর্ষীয় দর্শনের দৃষ্টি একটু স্বতন্ত্র—বিশেষ ক'রে সাংখ্য, বেদান্ত ও যোগদর্শনে সত্য পরিস্ফুট হয়েছে বা হয় প্রকাশের (সৃষ্টির) স্বরূপকে অতিক্রম ক'রে। সত্যের এই নিরঙ্কুশ-দৃষ্টি সকল প্রকাশের অতীত, এজন্যই একে বলা হয় 'শান্তম্'। মন, বাক্য ও চিন্তার গতি এখানে অচল ও নিস্তব্ধ। পুনরায় সৃষ্টিপ্রকাশের ধারাকে অতিক্রম ক'রে সত্যকারের দর্শন কোনদিনই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দর্শনের ভিত্তিকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে দর্শন সূক্ষ্মজগতের কোন সন্ধান না দিয়ে পারে না। এজন্যই বলতে হয় প্রজ্ঞার জাগ্রত-ভূমির জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। তবে জাগ্রত-ভূমি আমাদের কাছে বেশী পুষ্ট ও সত্য, তার কারণ আমাদের ব্যবহার ও জীবন জাগ্রত-ভূমিকেই অবলম্বন ক'রে সম্পন্ন বা সার্থক হয়।

বোধ, চৈতন্য বা অনুভূতিকে ব্র্যাডলে বলেছেন experience। এই experience বা বোধ সকল পার্থিব-সম্পর্কবর্জিত। এই experience, বোধ বা পরমসংবিদের মধ্যে থাকে সমষ্টির পূর্ণরূপ। এখানেই মানুষের সকল জ্ঞান মিলিত হয় ঐক্যসূত্রে। সেজন্য ব্র্যাডলের যে experience, বোধ বা সংবিদ্—তাকে তত্ত্ব বলেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা তার মধ্যে তার বাস্তব রূপ বেশ পরিস্ফুট। ব্র্যাডলের এই experience বা বোধই পরমপদার্থ এবং এই বোধ নিজের সত্তায় মহিমান্বিত।

কিন্তু ব্র্যাডলের এই মতবাদের সঙ্গে আচার্য শঙ্করের মতের ঠিক মিল নাই। শঙ্করের মতে বোধ বা জ্ঞানানুভূতি একমাত্রই অনুভূতি বা feeling। তাছাড়া সবিশেষতা ও নির্বিশেষতা-রূপ বোধের উপরই আমাদের বুদ্ধির হয় কল্পনা, আর বোধ বা জ্ঞান বোধ বা জ্ঞানরূপেই স্বয়ংপ্রতিষ্ঠিত। তবে এই বোধকে যখন বস্তুরূপে চিন্তা করি, তখন আমরা এই বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও একটি বিশ্ব কল্পনা করি। সেজন্য শুধু বোধের নির্বিষয়তা শঙ্করের প্রতিপাদ্য নয়, কেননা বস্তুদৃষ্টি জ্ঞানদৃষ্টিকে সর্বদাই অতিক্রম করে—যদিও শঙ্কর বহু ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে 'ভূত'-বস্তু বলেছেন। কিন্তু তথাপি বলতে হয় যে, এটি বস্তু সৃষ্টির কোটায় পড়ে না, কারণ অদ্বৈতজ্ঞানে বস্তুদৃষ্টির কথা বা প্রসঙ্গ ইহবাহ্য ও অবান্তর।

কাণ্টের দর্শনেও জ্ঞানের বা বোধের একটা স্বরূপতা আছে, কেননা জ্ঞান আহরণ করলেও বিষয়কে সে আপনার মধ্যে পেয়ে আপনার মতো সংগঠিত ক'রে নেয়। তারপর কাণ্টের দর্শনে বিষয়কে যে অতিক্রম করার চেষ্টা আছে—তার বিশেষভাবে সন্ধান পাওয়া যায় কাণ্টের

নীতিশাস্ত্রে, কেননা কান্ট তাঁর নীতির লক্ষ্য নির্ণয় করেছেন বিষয়সম্পৃক্তিমুক্ত হওয়া। সৃষ্টি কান্টের মতে চেতনার বিষয়াকারে বিবর্ত, আর নীতি হল চৈতন্যের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে মুক্তি। সেজন্য কান্ট দর্শনদৃষ্টির মধ্যে value-র স্থান দিয়েছেন অতি ঊর্ধ্বে, কেননা value-র ভিতর দিয়েই আমরা সেই জগতে উপনীত হই—যার মধ্যে প্রকাশিত হয় চেতনার ইন্দ্রিয়াতীত রূপ ও প্রকাশ।

॥ বের্গসোঁর দর্শনদৃষ্টি ॥

ফরাসী-দার্শনিক বের্গসোঁর দর্শনদৃষ্টিতে আমরা কিছুটা অন্তর্লোককামী নূতন-দৃষ্টির সন্ধান পাই—'the most representative example of new attitude', কিন্তু তাহলেও বের্গসোঁর দর্শনে দুটি ভিন্নমুখী শক্তির (two dissimilar forces) সন্ধান পাই—সে'দুটি শক্তি জড় (matter) ও প্রাণশক্তির (e'lan vital) সমন্বিত রূপ : "On the one side there is a certain spiritual moving force which he (Bergson) calls the *e'lan vital*, which expands its creative energy by traversing the other kind of reality which is nothing else but matter". মোটকথা বের্গসোঁর দর্শনে আমরা পাই মন ও জড়বস্তুর (mind and matter) সঙ্ঘাত আর সমন্বয়রূপ খেলা বা লীলারূপ। "Thus Bergson felt most acutely the need for supplementing the ordinary intellectual method of knowledge by a special method which is not rational and is of the nature of intuition"। অধ্যাপক নলিনীমোহন শাস্ত্রী এ'সম্বন্ধে বলেছেন : "It is needless to say that this *intuition* of Bergson, by which he proposes to develop a sort of sixth sense for establishing direct contact of reality, is very similar to the method of *dhya'na* or contemplation and *sa'dhana'* of the Indian philosophy"। কিন্তু ভারতীয় উপনিষদের ও যোগশাস্ত্রের ধ্যানকর্মের পদ্ধতি বা উপায়মাত্র থাকে পরমজ্ঞানের ক্ষেত্রে। সাধনার ক্ষেত্রেও তাই। সেজন্য বলা যায় যে, বের্গসোঁর অন্তর্দৃষ্টি বা *intuition* এবং ভারতীয় সত্যানুভূতি ঠিক সমপর্যায়ভুক্ত নয়, কেননা বের্গসোঁর intuition বুদ্ধিবৃত্তির অতীত বোধিসত্তা নয়, বরং তা বুদ্ধি ও সাধনারূপ দ্বৈতক্ষেত্রে সীমায়িত, সুতরাং বোধির ক্ষেত্রে তা উন্নীত নয়।[২] উপনিষৎ কিন্তু পরিষ্কারভাবেই বলেছে : 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।

॥ বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিতে ঈশ্বর ॥

দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) সত্যের প্রমাণ হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। স্যর জেমস্ জিন্স তাঁর *Physics and Philosophy* (Cambridge, 1943) গ্রন্থে বলেছেন : "Descartes claimed that her innate ideas, representing

২। *Introduction to Metaphysics*-গ্রন্থে বের্গসোঁ intuition যে চরমজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান নয় সেকথা স্পষ্টভাবেই বলেছেন। কান্টের intuition-ও তাই—ঐন্দ্রিয়িক জগতের বস্তু। কিন্তু supreme intuition ভিন্নকথা। তখন ব্রহ্মজ্ঞান।

knowledge which came from 'the clear vision of the intellect', must necessarily be true. The fact that he could clearly and distinctly conceive something in his mind—as, for instance, the existence of God—was for him a sufficent proof of its truth" (p. 15). বৈজ্ঞানিক জিন্স পুনরায় বলেছেন : "Thus a Perfect Being must either passes every conceivable quality". পরে ডেকার্টের প্রমাণ উদ্ধৃত ক'রে জিন্স পুনরায় বলেছেন : 'But necessary existence is contained in the nature, or in the concept of God. Hence it may, with truth, be said that necessary existence is in God, or that God exists' (p. 94). দার্শনিক লিব্‌নিৎসও ঈশ্বর স্বীকার ক'রে অনুরূপভাবে বলেছেন : "Yet God, the supreme Monad, keeps all the other monads in step on a series of parallel traks". "In the beginning God created mind and matter in such a way that each can follow its own laws...".

বিশ্বখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক হাইজেনবার্গও (Werner Heisenberg) তাঁর *Physics and Beyond* (1971) 'বিজ্ঞান ও বিরত'-আলোচনায় স্পষ্টভাবেই ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বলেছেন: "Einstein's conception is closer to mine. His God is somehow involved in the immutable laws of nature.....I don't believe Einstein is tied to any religious tradition, and *I rather think the idea of a personal God who is entirely foreign to him*" (p. 84).

বিজ্ঞানী-দার্শনিক হোয়াইটহেডও (A. N. Whitehead) তাঁর *Religion in the Making* (*Cambridge*, 1930)-গ্রন্থে The Quest of God, Religion and God প্রভৃতি আলোচনায় ঈশ্বর-সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন : "If the modern world is to find God, it must find him through love and not through fear, with the help of John and not of Paul" (p. 64). তবে Truth and Criticism-আলোচনায় ঈশ্বরসম্পর্কে হোয়াইটহেডের মতবাদ ও সিদ্ধান্ত বেশ স্পষ্ট। তিনি বলেছেন : "He (God) transcend the temporal world, because He is an actual fact in the nature of things. He is not there as derivative from the world. He is the actual fact, from which the other formative elements cannot be torn apart. But equally it stands in his nature that He is the realization of the ideal conceptual harmony by reason of which there is an actual process in ths total universe—an evolving world which is actual because there is order.....Apart from God, there would be no actual world ; and apart from the actual world with its creativity, there would be no rational explanation

of this ideal vision which constitutes God....He is the binding element in the world....Apart from him there could be no world...He is not the world, but the valuation of the world" (pp. 140—143).

গ্রন্থের স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ বর্তমান বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তপ্রসঙ্গে তাই লিখেছেন : "Yet undoubtedly the scientists have in recent years outgrown the materialistic and mechanistic view of the nineteenth century by resolving the units of matter into unseen and almost mysterious unit of energy....The epoch-making revelations of modern science have convinced even some of its distinguished votaries like Sir James Jeans and Sir Arther Eddington about the possibility of a cosmic mind as the efficient and material cause of the universe, and brought them almost in line with the Berkeleyan school of rational philosophy. ....Thus modern science, by its recent disclosures, has helped us, no doubt, to apprehend the non-material nature of the underlying reality, but certainly no one can expect that through its symbol of more than three dimensions or such other mathematical abstractions, it will ever be able to bring the non-material substratum, reality, within the range ef our comprehension" (Cf. *Ramakrishna and Spiritual Renaissance* pp. 126-127). কথা তাই যে, কেবলই বিজ্ঞানের পুঙ্খানুপুঙ্খ-বিশ্লেষণভঙ্গী কিংবা দর্শনশাস্ত্রের বৌদ্ধিক-বিচারশৈলী দেশ-কাল-কারণাতীত ব্রহ্মসত্তার যথার্থনিরূপণে অক্ষম চিরদিনই, একমাত্র মন-বুদ্ধির অতীত বিশুদ্ধ-বোধির অনুভূতিই ব্রহ্মসত্তার নিরূপণে সক্ষম।

॥ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বর ॥

এক ও অখণ্ডের দৃষ্টিসেবী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতে ব্রহ্ম অর্থাৎ সগুণ-ব্রহ্ম ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি (মায়াশক্তি) এক ও অভিন্ন। ঈশ্বরে শক্তিরূপ মায়া থাকে বলতে ঈশ্বর মায়াবিশ্ব অধিকার ক'রে থাকেন বলেই তিনি শক্তিমান ও মায়িন। কারু কারু মতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন তন্ত্রাচারী এবং মাত্র তন্ত্রতত্ত্বের সাধনা করেই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অদ্বৈতবেদান্ত তিনি পড়েন নি, সেজন্য ধর্মতত্ত্বের ও সাধনরহস্যের সকল কথায় ও মতের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি তন্ত্রদৃষ্টিরই পরিপ্রেক্ষিতে। তাছাড়া বেদান্তের কথাও বলেছেন তিনি তন্ত্রদৃষ্টি নিয়ে।

কথা অবশ্য সত্য যে, বেদান্তগ্রন্থ তিনি কোন টোলে বা কলেজে পড়েন নি—যদিও অদ্বৈতবেদান্তের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন তিনি এ'বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া বেদান্ত কেন, বৈশেষিক কিংবা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শাস্ত্রগ্রন্থও তিনি কোন কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও টোলে কোন পণ্ডিতের কাছে নিয়মিতভাবে পড়েন নি। তবে তাঁর সাধন-

জীবনের পর বহু ধর্মসম্প্রদায়ের বহু সাধক ও উপলব্ধিবান সাধু-সন্ন্যাসী—যাঁরা দক্ষিণেশ্বর-কালীমন্দিরে মাঝে মাঝে আসতেন—তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রের, ধর্মের ও জ্ঞানোপলব্ধির বহু বিষয়ই তিনি আলোচনা করতেন বা করেছিলেন।[৩] তাই নিরপেক্ষদৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করলে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ও উপদেশগুলির মর্ম থেকে একথাই বোঝা যায় যে, তাঁর জীবনোপলব্ধি সম্ভবত বিশ্বের বহু উপলব্ধিকে অনায়াসে অতিক্রম করেছিল। তাছাড়া উপনিষদের 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'-বাণী হুবহু উচ্চারণ না করলেও তিনি বহুবারই বহু সমাগতদের বলতেন যে, বহু শাস্ত্র পড়ে বা কেবল মর্জিত বুদ্ধি দিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের যথাযথ-উপলব্ধি লাভ করা যায় না।

প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্বৈতজ্ঞান এবং অদ্বৈতবেদান্তসম্বন্ধে বাণী ও উপদেশ প্রাণবান হয়েছিল তাঁর তন্ত্রসাধনার আলোকে—না সকল সাধনার প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা থেকে? কেননা বেদান্তের আলোচনার মাঝে মাঝে তিনি উদাহরণ দিতেন অনুলোম ও বিলোমের কথা—যা সাধারণত তন্ত্রশাস্ত্রের ও তন্ত্রসাধনারই কথা। কিন্তু আর একটি বিষয় সমালোচকরা লক্ষ্য করেন নি বোধহয় যে, ধর্মের ও ধর্মসাধনার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন সমাধির (সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত) প্রসঙ্গে উত্থান ও ব্যুত্থান বা আরোহণ ও অবরোহণ শব্দগুলিও ব্যবহার করতেন—যেগুলি নিছক যোগের এবং বেদান্তেরই কথা। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেবলই তান্ত্রিক ছিলেন ও তন্ত্রসাধনার আলোকেই নিজের জীবনকে উপলব্ধি দিয়ে প্রদীপ্ত করেছিলেন—একথা ঠিক নয়, কেননা 'যত মত তত পথ'-এর উদার-প্রবক্তা শ্রীরামকৃষ্ণ বিচিত্র ধর্মমতের ও বিচিত্র সাধনারই অনুষ্ঠান করেছিলেন জীবনে—যাদের স্বাক্ষ্য পাওয়া যায় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ', প্রথম ভাগ, অষ্টম অধ্যায়ে 'প্রথম চারি বৎসরের সেবকথা'-আলোচনায়।

পূর্বেও বলেছি এবং এখনও বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব অদ্বৈতবেদান্তসাধনার প্রসঙ্গ বহুবারই করতেন অন্যান্য ধর্ম ও সাধনার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্ত-শিষ্যগণের সঙ্গে—যেমন তন্ত্র, যোগ, ভক্তি ও বৈষ্ণব-সাধনা, সুফী-সাধনা প্রভৃতির আলোচনাপ্রসঙ্গে, তাই কেবলই তন্ত্রসাধনার

৩। 'গুরুভাব ও নানা সম্প্রদায়'-শীর্ষক আলোচনায় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ-রচিত 'শ্রীশ্রীলীলা-প্রসঙ্গ'-গ্রন্থ (১ম ভাগ, পৃঃ ৪৯) দ্রষ্টব্য। গ্রন্থকার শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখেছেন: "বাসমণির বাগানে ডেরা-ডাণ্ডা ফেলে অন্ততঃ দু'-চার দিন থাকা, বিশ্রাম করা, তারা (নানা সাধু-সম্প্রদায়) করতোই করতো। কেউ কেউ আবার কিছুকাল থেকেই যেত।...এক এক সময়ে এক এক রকমের সাধুর ভিড় লেগে যেত (পৃঃ ৩১-৩২)।...তারপর তাদের (সন্ন্যাসী—পরমহংসশ্রেণীর) যাওয়া-আসা কমে গেল। তারা নিয়ে আসতে লাগল যত রামাৎ-বাবাজি—ভাল ভাল ত্যাগী ভক্ত-বৈরাগী বাবাজি। দলে দলে আসতে লাগলো"।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ পুনরায় লিখেছেন: "এইরূপে কত সাধুর কথাই না ঠাকুর আমাদিগের নিকট বলিতেন..." (পৃঃ ৬৭)।..."ঠাকুরের নিকটে একই সম্প্রদায়ের সাধকগণ না আসিয়া যে সকল সম্প্রদায়ের সাধকেরাই দলে দলে আসিয়াছিলেন..." (পৃঃ ৮১)।..."শুনিয়াছি—ষড়্‌দর্শনের সকল-গুলির উপরই সমান অভিজ্ঞতা ও আধিপত্য লাভ করিবার প্রবল বাসনা বরাবর তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) প্রাণে ছিল" (পৃঃ ৮৯)।

আলোচনা করেন নি। তাঁর অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনার প্রসঙ্গে একটি উদাহরণের কথা এখানে উল্লেখ করি। তিনি বলেছেন: "সাধক-অবস্থায় সব মনটা 'নেতি নেতি' ক'রে তাঁর (ঈশ্বরের) দিকে দিতে হয়। সিদ্ধ-অবস্থায় আলাদা কথা—তাঁকে (ঈশ্বরকে) লাভ (উপলব্ধি) করার পর —অনুলোম বিলোম। ঘোল ছেড়ে মাখন পেয়ে তখন বোধহয়—'ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল'। তখন বোধহয়—তিনিই সব হয়েছেন (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম), (তবে) কোনখানে (তাঁর) বেশী প্রকাশ, কোনখানে কম প্রকাশ" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ২য় ভাগ, পৃঃ ১১১-১১২)।

(২) পুনরায় ঐ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "(প্রাণকৃষ্ণের প্রতি)—ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। শক্তি না মানলে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়; আমি, তুমি, ঘর-বাড়ী, পরিবার—মিথ্যা। ঐ আদ্যাশক্তি আছেন ব'লে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাঠামোর খুঁটি না থাকলে কাঠামোই হয় না—সুন্দর দুর্গা-ঠাকুর-প্রতিমা হয় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৪)।

(৩) "মণি (শ্রীম) বলিতেছেন: 'জগৎ কি মিথ্যা?'

"শ্রীরামকৃষ্ণ। মিথ্যা কেন?—ও'সব বিচারের কথা। প্রথম—'নেতি নেতি'-বিচার করবার সময়ে—তিনি জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব নন হয়ে যায়। এ'সব স্বপ্নবৎ হয়ে যায়। তারপর অনুলোম-বিলোম। তখন তিনিই জীব-জগৎ হয়েছেন বোধ হয়"।

"তুমি সিঁড়ি ধরে ধরে ছাদে উঠলে। কিন্তু যতক্ষণ ছাদ বোধ, ততক্ষণ সিঁড়িও আছে। যার উঁচু-বোধ আছে—তার নীচু-বোধও আছে"।

"আবার ছাদে উঠে দেখলো—যে-জিনিসে ছাদ তৈয়ের হয়েছে—ইট, চুণ, সুরকি—সেই জিনিসেই সিঁড়ি তৈয়ের হয়েছে"।

"আর যেমন বেলের কথা বলেছি (বেল বলতে খোলা, বীচি, বিচি। একটাকে বাদ দিলে ওজনে কম পড়ে—এটি অবশ্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা ও সেকথা আলোচনা করেছি)"।

"যার অটল (স্থিরতা) আছে—তার টলও (অস্থিরতাও) আছে"।

"আমি যাবার নয়। আমি ঘট যতক্ষণ রয়েছে, ততক্ষণ জীব-জগৎও রয়েছে। তাঁকে (ঈশ্বরকে) লাভ করলে দেখা যায়—তিনিই (ঈশ্বরই) জীব-জগৎ হয়েছেন। শুধু বিচারে হয় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩৪-৩৫)।

(৪) শ্রীরামকৃষ্ণ: "আমার মা কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মা-ই সব (জীব-জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব) হয়েছেন। দেখিয়ে দিলেন—সব চিন্ময়, প্রতিমা চিন্ময়, বেদী চিন্ময়, কোশা-কুশী চিন্ময়, চৌকাট চিন্ময়, মার্বেলের পাথর—সব চিন্ময়"।

"ঘরের ভিতর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে। সচ্চিদানন্দ-রসে"।

আবার বলেছেন: কালীঘরের সম্মুখে একজন দুষ্ট লোককে দেখলাম, কিন্তু তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জ্বল জ্বল করছে দেখলাম।

"তাইতো বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়েছিলাম। দেখলাম—মা-ই সব হয়েছেন। ...তাঁকে (জগতের মা-কে বা ঈশ্বরকে) লাভ করলে এইগুলি ঠিক দেখা যায়—তিনিই জীব-

জগৎ-চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। বিচার ক'রে একরকম দেখা যায়, আর তিনি যখন দেখিয়ে দেন, তখন আর একরকম দেখা যায়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩৫-৩৬)।

(৫) "আবার আছে—ব্রহ্ম অবাঙমনসগোচর ; জ্ঞানসূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পর, নির্বিকল্পসমাধির পর আবার সেই অনন্ত, বাক্য-মনের অতীত, অরূপ নিরাকারব্রহ্ম" (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বলার উদ্দেশ্য যে, সাকারই ঈশ্বর নিরাকার-ব্রহ্ম হন, সগুণ-ব্রহ্মই নির্গুণ-ব্রহ্ম —আবার নির্গুণ ও নিরাকার-ব্রহ্মই সগুণ ও সাকার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর হন—বাক্য-মনের অতীত, আবার বাক্য-মনের গোচর। আসলে সর্বরূপ সর্বাত্মা আকাশবৎ সর্বব্যাপী ব্রহ্ম সব-কিছুই হন, আবার হন না)।—শ্রীশ্রীকথামৃত ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৬

(৬) "যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তখন তাঁকে সগুণ-ব্রহ্ম, আদ্যাশক্তি বলি। যখন তিনি তিন গুণের অতীত—তাঁকে নির্গুণ-ব্রহ্ম—বাক্য-মনের অতীত বলা যায়,—পরব্রহ্ম" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৩৭)।

(৭) "আর আছে—যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি ; যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম (নির্গুণ-ব্রহ্ম) বলি, পুরুষ বলি, আর যখন এ'সব কাজ করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। **কিন্তু যিনিই ব্রহ্ম (নির্গুণ-ব্রহ্ম), তিনিই শক্তি ; যিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি হ'য়ে রয়েছেন।** জল স্থির থাকলেও জল—আর হেল্‌লে-দুল্‌লেও জল। সাপ এঁকে বেঁকে চললেও সাপ, আবার চুপ ক'রে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকলেও সাপ" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১০৫)।

(৮) "(কেশব সেনের প্রতি)—কিরকম জান ? যেন সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র কূলকিনারা নাই। ভক্তিহীনে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, স্থানে স্থানে জল বরফ-আকারে জমাট বাঁধে, অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে—কখনও সাকার-রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞানসূর্য উঠলে সেই বরফ গলে যায়, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'—এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রূপ-টুপ সব উড়ে যায়। তখন কি তিনি—মুখে বলা যায় না। মন, বুদ্ধি, অহংতত্ত্ব-দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৭০-১৭১)।

"তবে পূর্ণজ্ঞান হ'লে মরা, মারা একবোধ হয়। মলেও কিছু মরে না, মেরে ফেল্লেও কিছু মরে না ('ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। নায়ং হন্তি ন হন্যতে'—গীতা)। যাঁরই লীলা, তাঁরই নিত্য। সেই (একই ব্রহ্ম)—এক রূপে নিত্য, আর এক রূপে লীলা। লীলারূপ ভেঙে গেলে নিত্য আছেই। জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে-দুল্লেও জল। হেলা-দোলা থেমে গেলেও জল" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২১৮)।

শ্রীরামকৃষ্ণ : "(হরিবাবুকে উপদেশ) তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে ?—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' (দ্বৈতবোধ) রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' ('আমি'-বোধ) যখন তিনি (ঈশ্বর) রাখবেন, তখন যা আছে—তাই আছে। মুখে বলা যায় না। যতক্ষণ 'আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে (অর্থাৎ আমিত্ববোধ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই অজ্ঞান, সুতরাং ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা বলে

ভুল হবে, ততক্ষণ সবই সত্য, কোনটাই মিথ্যা নয়)। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ (মধ্যখানের অংশ) পাওয়া যায়, কিন্তু খোল (কলাগাছের পেটো) থাকলেই মাজ (মধ্য-অংশও) আছে। মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ—মাজেরই খোল (কলাগাছের সবটাই তো পেটো, সুতরাং প্রথম, মাজ বা মধ্যাংশ—সবটাই পেটো বা খোলা। নিত্য বলেই লীলা আছে বোঝার, লীলা বলেই নিত্য আছে বোঝায় (কেননা আপেক্ষিকতার রাজ্যই দ্বৈতের রাজ্য, সুতরাং দুই-দুই বা দ্বৈতরাজ্যে নিত্য ও লীলা দুইই আছে এবং দুইই সত্য)"।

"তিনি জীব-জগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন (উপনিষদে আছে : 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ',—জগৎবৈচিত্র্য ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন, আবার সেই সেই সৃষ্টির মধ্যেই প্রবেশ করলেন ও সৃষ্টরূপই তিনি (ঈশ্বর) নিজে ধারণ করলেন)। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে (শক্তিকে) ব্রহ্ম বলি, যখন (শক্তি) সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন—তখন তাঁকে (ঐ এক ব্রহ্মকেই) শক্তি বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। জল স্থির থাকলেও জল, হেলে-দুলেও জল" (শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি একমাত্র জলে, জলের হেলা-দোলা কাজের দিকে ঠিক নয়)"।

॥ 'আমি'-বোধ যায় না ॥

"অজ্ঞানে 'আমি'-বোধ যায় না (একমাত্র ব্রহ্মবোধ হলে আমি-বোধ যায়)। যতক্ষণ 'আমি'-বোধ থাকে, ততক্ষণ জীব-জগৎ মিথ্যা বলবার যো নাই। বেলের খোলটা (খোলাটা) আর বিচিগুলো ফেলে দিলে সমস্ত বেলটার ওজন পাওয়া যায় না (ব্রহ্মবস্তু এক ও অদ্বিতীয়, সুতরাং তাঁর অংশ কল্পনা করা বৃথা, আর যদি অংশ কল্পনা করা হয় অজ্ঞানের জন্য, তাহলে সকল অংশকে নিয়েই পূর্ণতায় বা সমগ্র বস্তুকে গ্রহণ করা উচিত)"।

"যে ইট, চুন, সুরকি থেকে ছাদ (তৈরী হয়), সেই ইট, চুন, সুরকি থেকেই সিঁড়ি (তৈরী হয়) [ছাদ ও সিঁড়ির উপাদান কিন্তু একই—ইট, চুন ও সুরকি]। (তেমনি) ব্রহ্ম, তাঁর সত্তাতেই জীব-জগৎ (অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব-জগতের একমাত্র উপাদান, আধার বা অধিষ্ঠান)"।

"ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা (অর্থাৎ বিজ্ঞানী বা ব্রহ্মবিজ্ঞানী ভক্তজনরা) নিরাকার সাকার দুইই লয়, অরূপ রূপ দুইই গ্রহণ করে। শুক্তিহীমে ঐ জলেরই খানিকটা বরফ হয়ে যায়; আবার জ্ঞানসূর্য উদয় হলে ঐ বরফ গলে যাবার যেমন জল—তেমনি জল" (জ্ঞান অর্থে ব্যষ্টি-ব্রহ্মজ্ঞান বা অহং ব্রহ্মাস্মি-জ্ঞান, আর বিজ্ঞান অর্থে সমষ্টি-ব্রহ্মজ্ঞান বা 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সর্বাত্মকজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অভিমতও তাই)।

"যতক্ষণ মনের (কল্পনার) দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যে পৌঁছানো যায় না (মন জড়, অজ্ঞানের পরিণাম, সুতরাং মনের দ্বারা বিচারের অর্থ অজ্ঞানরূপ দ্বৈতক্ষেত্র থেকে বিচার। অজ্ঞানের ক্ষেত্রে জগতে নিত্যের বা ব্রহ্মের কল্পনা নিরর্থক। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার (ত্যাগ করার) যো নাই—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ— ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার (ত্যাগ করার বা মিথ্যা বলার)

যো নাই। বিচার বন্ধ হ'লে (অর্থাৎ বৈচারিক ক্ষেত্র ও অজ্ঞানের পারে গেলে) তবে ব্রহ্মজ্ঞান। এই মনের দ্বারা আত্মাকে জানা যায় না, **আত্মার দ্বারা** (মনের পারে আত্মার জ্ঞানের দ্বারা) **আত্মাকে জানা যায়**। (শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—বোধে বোধ)। **শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি, শুদ্ধ-আত্মা—একই** (শুদ্ধমন, শুদ্ধবুদ্ধি—চৈতন্য। শুদ্ধ-আত্মা বলতে পরমাত্মা। মন শুদ্ধ হলে চৈতন্য, সুতরাং চৈতন্য ও পরমচৈতন্য সমজাতীয়)"।

"মনের নাশ হলে (মনের নাশ হয় না, মনের চৈতন্যে রূপান্তর হয় মাত্র, সুতরাং (মনের চৈতন্যে রূপান্তর হলে) সঙ্কল্প-বিকল্প-রূপ মনের বৃত্তি চলে গেলে বা মন চৈতন্যে রূপান্তরিত হলে (বৃত্তি তো মন-ছাড়া বা মনের চাঞ্চল্য-ছাড়া অন্য-কিছু নয়)। তখন সমাধি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হয়"।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২১৯-২২০

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, অজ্ঞানেই মতভেদ ও মতবাদ, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে 'সব শিয়ালের এক রা' ('রা' বলতে রব)। তাই একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানের উপলব্ধি হলে তবেই সগুণ ও নির্গুণ, সাকার ও নিরাকার, লীলা ও নিত্য এ'সকলের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, কিন্তু সত্য ও যথার্থ জ্ঞান হলে অখণ্ডজ্ঞানসমুদ্রে মিশে সকল জ্ঞান একাকার হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তারই নিদর্শন দিয়েছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৫ম ভাগের (পৃঃ ৬-৭) প্রকাশকজীতে গ্রন্থের শ্রীম বা মাষ্টার মহাশয় লিখেছেন: "ঠাকুর শ্রীযুক্ত কেশবকে বড় ভালবাসেন।.....১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘোৎসবের পর কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর একদিন (বেলঘরিয়া) বাগানে গিয়া তাঁহার (কেশবচন্দ্রের) সহিত দেখা করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে কমলকুটীরে, ব্রাহ্মসমাজে ইত্যাদি স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে (কেশবচন্দ্রকে) উপদেশ দিয়াছিলেন: "নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ হ'তে পারে; মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন ক'রে ভক্তি লাভ ক'রে সংসারে থাকা যায়; জনকাদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে সংসারে ছিলেন। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে (ঈশ্বরকে) ডাকতে হয়, তবে (তাঁকে) দেখা যেন। তোমরা যা করো—নিরাকার-সাধন—সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে যে, ঈশ্বর সত্য, আর সব অনিত্য। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন-হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। রোশনচৌকিওয়ালারা একজন শুধু পোঁ ধরে বাজায়, অথচ তার বাঁশীর (সানাইয়ের) সাত কোকর (ছিদ্র) আছে, কিন্তু আর একজন তারও সাত কোকর (ছিদ্র) আছে—নানা রাগ-রাগিণী বাজায়। ...ঈশ্বর লাভ না করলে তাঁর আদেশ (চাপরাশ) পাওয়া যায় না। ঈশ্বর লাভ যে হয়েছে তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়, যেমন শুকদেবাদি। চৈতন্যদেব কখনও বালকবৎ, কখনও উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়..." (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৬-৭)।

"১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রোৎসবের সময়ে আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বেলঘরের উদ্যোগনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার ৩১শে ভাদ্র। আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমলকুটীরে উৎসবে যোগদান করিতে লইয়া যান। এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্মভক্তসঙ্গে তাঁহার (শ্রীরামকৃষ্ণের) ফটো লওয়া হয়। ঠাকুর দণ্ডায়মান, সমাধিস্থ, আর ভক্তর

ধরিয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর ৬ই কার্তিক, মহাষ্টমী-নবমীর দিন কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) দর্শন করিলেন" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১)।

॥ ঈশ্বর অর্থে সগুণ-ব্রহ্ম ॥

ঈশ্বর বলতে বোঝায় সগুণ-ব্রহ্ম। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ঈশ্বরই নিজের মায়াকে বশীভূত ক'রে অবতারের রূপ ধ'রে পৃথিবীতে আসেন (অবতীর্ণ হন): " 'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি' প্রকৃতিঃ মায়াখ্যাং বিচিত্রানেক শক্তিমদ্ঘটনঘটনপটীয়সী 'স্বাং' স্বোপাধি-ভূতা'-মধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য 'সম্ভবামি'·· দেহবানিব জাত ইব চ ভবামি" (পূর্বে এর উল্লেখ করেছি)। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঠিক এইভাবে না বলেও মায়ার সাহায্য নিয়ে যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বর দেহ ধারণ ক'রে লীলাভূমিরূপ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন—একথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, তাই তাঁতে মায়া অসম্পৃক্তভাবে থাকে এবং সেই মায়াকে নিয়েই তিনি দেহধারণ করেন। তিনি বলেছেন: "ঈশ্বরে বিদ্যা-অবিদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যামায়া ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়, অবিদ্যামায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত ক'রে লয়ে যায়" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৬৮)।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একথা বলার উদ্দেশ্য যে, মায়া ব্রহ্মবস্তু থেকে ভিন্ন ততদিন—যতদিন না মায়ার প্রকৃত স্বরূপ মানুষ বুঝতে পারে। 'মায়া ব্রহ্ম'—একথা সাধারণভাবে আশ্চর্যরকমের শোনায়, কিন্তু আচার্য শঙ্কর বলেছেন মায়া ব্রহ্মতিরস্করণী-শক্তি—ব্রহ্মের স্বরূপকে বুঝতে দেয় না, মায়ার যথার্থস্বরূপকেও বুঝতে দেয় না। তাই আচার্য শঙ্কর মায়াকে 'মিথ্যাপ্রত্যয়' বা 'ভুলজ্ঞান' বলেছেন, কিন্তু মায়ার সত্যজ্ঞান হলে ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মসম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞানরূপ আবরণ দূর হ'লে ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে। যেমন দড়িতে সাপের জ্ঞান ভুলজ্ঞান, কিন্তু দড়িটাই আসলে সাপ, অর্থাৎ দড়িরূপ আধারে বা অধিষ্ঠানেই ঐ সাপরূপ ভুলজ্ঞান হয়, আবার ভুলজ্ঞানরূপ ভ্রম (অজ্ঞান) দূর হলেই দড়িকে দড়িজ্ঞান হয়। তাহলেই দেখা যায় যে, দড়ির সাপের রূপ বা আকার ধরাই ভুলজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান, আর দড়ির দড়িজ্ঞানই সত্যজ্ঞান। ঠিক তেমনই জীব ও জগৎ স্বরূপে ব্রহ্ম, কিন্তু মানুষ ভ্রমে অর্থাৎ ভুলজ্ঞানে দেখে যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন—একটি জড় বা অচেতন ও অন্যটি চৈতন্য বা চেতন। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যথার্থজ্ঞানের উপলব্ধি হলে তখন ব্রহ্মই সর্বরূপ—জীবরূপ ও জগৎরূপ। এটাই যথার্থ-উপলব্ধি। এই সত্যোপলব্ধিতেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন—'ব্রহ্ম ও মায়া অভেদ'। জীব ও জগৎ মায়ারই কার্য বা পরিণতি। মায়াই (অবিদ্যাই) জীব-জগৎ থেকে ব্রহ্মকে পৃথক ক'রে দেখায়, সুতরাং মায়া বা অবিদ্যারূপ ভ্রম ভুলজ্ঞান বা মিথ্যাপ্রত্যয়। তাই সত্যপ্রত্যয়রূপ সত্যজ্ঞানের প্রকাশে ভুলজ্ঞান অজ্ঞান বাধিত অর্থাৎ দূর হলে তখন একমাত্র সত্যজ্ঞানরূপ ব্রহ্মই থাকেন। এই ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের জ্ঞান একই বস্তু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "আর এক ধাপ উঠলেই ঈশ্বর—ব্রহ্মজ্ঞান"। 'আর এক ধাপ' বলতে মায়ার রাজ্যে আছি, সুতরাং মায়ারাজ্যের পারে উপস্থিত হলেই ঐ এক ও নিরবচ্ছিন্ন অভেদজ্ঞান—ব্রহ্মজ্ঞান। তখন মায়া

আলাদা, জীব-জগৎ আলাদা ও ব্রহ্ম আলাদা—এই জ্ঞান আর থাকে না। সেজন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন: "ঐ অবস্থায় (ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থায়) ঠিক বোধ হচ্ছে ও ঠিক দেখছি—তিনিই সব হয়েছেন। ভাষ্য ও গ্রাহ্য (তখন আর) থাকে না (কেননা আপন-পর বা আমার-তোমার—এই ভেদজ্ঞান তখন থাকে না), সুতরাং কারু উপর রাগ করবার তখন যো থাকে না" (শ্রীশ্রীকথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৬৮)।

॥ পরিশিষ্ট ॥

॥ ব্রহ্ম ও শক্তি-সম্পর্কে আচার্য শ্রীকণ্ঠ ॥

পূর্বেই শ্রীকণ্ঠের দর্শনমত নিয়ে আলোচনা করলেও পুনরায় বলি যে, আচার্য শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্ম ও শক্তি-প্রসঙ্গে বলেছেন: "কিং অধুনা। শ্রুতি-স্মৃতিতীহাস-পুরাণাভিযুক্ত যুক্তিপ্রমাণাৎ সকল-চিন্‌চিন্‌প্রপঞ্চমহাবিভূতিরূপা মহাসংবিদানন্দসত্তা দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্যা স্বাভাবিকী পরমশক্তিঃ পরব্রহ্মণঃ শিবস্য স্বরূপং চ গুণশ্চ ভবতি। তদ্‌ব্যতিরেকেন পরব্রহ্মণঃ সর্বজ্ঞত্ব-সর্বশক্তিত্ব-সর্বকারণত্ব-সর্বনিয়ন্তৃত্ব-সর্বোপাস্যত্ব-সর্বানুগ্রাহকত্ব-সর্বপুরুষার্থহেতুত্বা-দিকং সর্বগতত্বং চ ন সম্ভবতি। কিঞ্চ মহেশ্বর-শিব-মহাদেব-রুদ্রাদিপরমাখ্যানামভিধেয়ত্বং চ ন সম্ভবতি" (১।২।১)।

'শিবার্কমণিদীপিকা'-ভাষ্যে আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত বলেছেন: (১) "সকলপ্রপঞ্চ-পরিণামিনী পরমেশ্বরস্য চিচ্ছক্তিশ্চিদাত্মকমুচ্যত ইত্যর্থঃ"; (২) "চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য জগদ্‌ব্যাপারে ছেদনে কুঠারবৎ কারণভূতৈব কেবলম্। ন তু প্রপঞ্চপ্রকৃতিরিতি কেচিদাহুঃ। তন্নিরাসার্থমাহ পরমপ্রকৃতিস্বমিতি"। মোটকথা আচার্য অপ্পয়দীক্ষিত স্বীকার করেছেন: "স্ফুরন্তী সর্বপ্রকৃতিভূতা সৈব চিচ্ছক্তিঃ সত্তা"—সর্বত্র চিচ্ছক্তিরূপ প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার না করলে ব্রহ্মের সগুণত্ব এবং বিশ্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন করা যায় না। সেজন্য স্বীকার করা সঙ্গত যে, শ্রীকণ্ঠ এবং অপ্পয়দীক্ষিতের মতে: "অতো ব্রহ্মধর্মস্বভাবঃ প্রকৃত্যাত্মা পরমাকাশরূপা পরমশক্তিঃ আনন্দময় ইত্যাচ্যতে" (১।১।১৬)। সেজন্যই শিবস্বরূপ তট্টায়ক-শিবব্রহ্মকে বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণ বলাও সঙ্গত: "নিরস্তসমস্তসংসারকলঙ্কতয়া নিখিলমঙ্গলাধারতয়া শিবত্বং যদকাময়ন্ত তদুক্তস্বভাবতয়া সকলজগজ্জন্মাদিকারণং ভবতি" (১।১।২)। আচার্য শঙ্করও মায়াসম্বলিত ঈশ্বর সগুণ-ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে স্বীকার করেছেন—সেকথা বলেছি। বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ (১।৪।২) প্রকারান্তরে এ'কথাই স্বীকার করেছে: "স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ"। 'দ্বিতীয়ং' বলতে মায়া বা মায়াসম্বলিত ব্রহ্ম এবং এই মায়াসম্বলিত সগুণ-ব্রহ্মই 'তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—বিশ্বসৃষ্টি ক'রে বিশ্বরূপ ধারণ করেন।[৪]

৪। কাশ্মীরীয়-শৈবাগমের অন্তর্গত তট্ট-কল্লট (অনেকের মতে আচার্য বসুগুপ্ত)-রচিত 'স্পন্দকারিকা'-গ্রন্থে 'বিমর্শ' এবং ক্ষেমরাজ-রচিত শিবসূত্রে 'প্রকাশ'—শক্তি-শিব বা শিব-শক্তির কথা-সম্পর্কে বর্ণনা আছে। প্রকাশ বা শিব-মহেশ্বর 'বিমর্শ' বা স্পন্দরূপ জগদ্রূপ ও অবর্ণনীয় আত্মা-শক্তির সাহায্যে বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় কার্য করেন। বিমর্শ বা স্পন্দই প্রকাশরূপ শিব-মহেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যশক্তি। এই শক্তির উচ্ছ্বাসে (চলনে) চিৎ ও অচিৎ—বিষয়ী (subject) ও বিষয় (object)—সকল-কিছুই

কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অদ্বৈতবেদান্ত বিবর্তবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্ত পরিণামবাদ স্বীকার করে, সুতরাং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে পার্থক্য আছে।[৫]

পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, সংক্ষেপশারীরককার আচার্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি অদ্বৈত-বেদান্তসিদ্ধান্ত প্রমাণ করার সময়ে প্রথমে পরিণামবাদ ও পরে বিবর্তবাদ স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, পরিণামবাদ প্রদর্শন না ক'রে বিবর্তবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন; অর্থাৎ সপ্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হ'লে তবেই নিষ্প্রপঞ্চরূপে ব্রহ্মের জ্ঞান হয়। সংক্ষেপশারীরককার "আরম্ভ সংহতি বিকার-বিবর্তবাদানাশ্রিত্য বাদিজনতা খলু বাবদীতি ·· মুনীন্দ্রঃ" (২-৫৭) শ্লোকটির সূচনা করেছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', 'নাত্র কাচন ভিদাস্তি' প্রভৃতি শ্রুতি সৃষ্টিপ্রতিষেধদ্বারা প্রপঞ্চকে বা সৃষ্টিকে নিষেধ ক'রে নিষ্প্রপঞ্চ-ব্রহ্মের নিরূপণ করেছেন এভাবেই অদ্বৈতব্রহ্মবাদীরা। 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-কার আচার্য মণ্ডনও একথা স্বীকার করেছেন 'ব্রহ্মসিদ্ধি'-গ্রন্থের ব্রহ্মকাণ্ডের ২য় শ্লোকে এই ব'লে: 'ভেদপ্রপঞ্চ-বিলয়দ্বারেণ চ নিরূপণম্' (অদ্বৈতম্)।[৬]

শ্রীকণ্ঠভাষ্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ বলেছেন: "শ্রীকণ্ঠভাষ্যের তাৎপর্য আলোচনা করিয়া অপ্পয়দীক্ষিত অন্য গ্রন্থেও অদ্বৈতবাদেই যে প্রকৃতপক্ষে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের পর্যবসান তাহা দেখাইয়াছেন। অপ্পয়দীক্ষিত বলিয়াছেন—যদিও অদ্বৈতেই উপনিষৎসমূহের ও আগমসমূহের পরমতাৎপর্য,···বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ব্রহ্মসূত্রসমূহও এই অদ্বৈতব্রহ্মেরই বিভ্রান্ত হইয়াছে" ('ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়', কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৮, পৃঃ ৮৯-৯০)।

তাছাড়া মহামহোপাধ্যায় মহাশয় ঐ গ্রন্থে (পৃঃ ৯০-৯১) নিজের বক্তব্য ও সিদ্ধান্ত উপস্থাপন ক'রে লিখেছেন: "শ্রীকণ্ঠাচার্য ব্রহ্মসূত্রেরভাষ্যে চিৎশক্তি ও জড়শক্তি ('চিদ্‌চিৎ') এই উভয় শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই বেদান্তপ্রতিপাদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য বিশিষ্টাদ্বৈত-পক্ষই শ্রীকণ্ঠাচার্যের পরমসিদ্ধান্ত বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও বিশেষ বিবেচনা করিয়া

সৃষ্টি হয়, আবার ধ্বংস হয়। আসলে শিবের স্পন্দশক্তিই ('এজতি') বিশ্বরূপ ঐশ্বর্যের কারণ। এটিকে বর্ণনা করলে বলা যায়: "This *spanda-sakti* consists of the compact bliss of I-consciousness which holds in it endless cycles of creation and destruction, which is of the nature of the entire world of the pure (*cit*) and impure (*acit*) subject and object". তাই দেখা যায় যে, কাশ্মীরতন্ত্রে স্পন্দশক্তি ও শ্রীকণ্ঠের শৈবতন্ত্রে পরাশক্তি বিশ্বচৈচিত্র্যের কারণ এবং এই শক্তি দুটি অভিন্নই।

৫। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ তাঁর Vedanta Towards Religion-গ্রন্থে পরমজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও তারপর অদ্বৈতজ্ঞান স্বীকার করেছেন—সোপানবৎ, কেননা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারে অদ্বৈতজ্ঞান হওয়া কঠিন, সেজন্য পরপর সোপানবৎ জ্ঞানের বা অনুভূতির কথা বলেছেন।

৬। Vide ব্রহ্মমীমাংসা (Mysore, 1903), পৃঃ ২৪৯

দেখিলে শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষই আচার্যের (শ্রীকণ্ঠের) পরমসিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। শ্রীকণ্ঠাচার্য "অনিয়মঃ সর্বেষামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্" (ব্রঃ সূঃ ৩।৩।৩২)—এই সূত্রটির প্রথমত বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ব্যাখ্যা করিয়া পরে শুদ্ধাদ্বৈতপক্ষেও ব্যাখ্যা করিয়াছেন" (তাহা দ্রষ্টব্য)। শ্রীকণ্ঠাচার্য ব্রহ্মের উপাসনায় অচিরাদি পথের প্রসঙ্গই শুধু বলেন নি, তিনি পঞ্চাগ্নিবিদ্যা, উপকোশলবিদ্যা প্রভৃতির উল্লেখ ক'রে পরিশেষে বলেছেন, যেহেতু নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসকের গতির কোন অপেক্ষা থাকে না, পরব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান ব'লে উপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তরগতির কোন আবশ্যক নাই—"কেচিদাহুঃ অনিয়মঃ সর্বেষামুপাসকানাম্ অচিরাদি-গতৌ নিয়মাভাবঃ। তথা সতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং অবিরোধ ইতি। তত্রাপি ন দোষঃ, নিরঙ্কুশোপাসকানাং তদপেক্ষাভাবাৎ" (শ্রীকণ্ঠভাষ্য ৩।৩।৩২)।

'তদাপীতেঃ' (৪।২।৮)-অধিকরণের শেষেও আচার্য শ্রীকণ্ঠ পুনরায় ঐ নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসকের উৎক্রান্তি ও দেশান্তরগতি নাই ব'লে স্বীকার করেছেন, ফলে অচিরাদি গতিছাড়া শরীরপাতেই (বিদেহাবস্থায়) মুক্তি হয়—এ'কথা স্বীকার করেছেন: "কেচিন্নিরঙ্কুশোপাসকানামিহ শরীরপাত এব মুক্তিরিতি···" (৪।২।৮-১৩)। তাছাড়া ৪।২।৫ অধিকরণে আচার্য শ্রীকণ্ঠ 'যদা সর্বে প্রমুচ্যন্তে···ব্রহ্ম সমশ্নুতে' (বৃহঃ উঃ ৪।৪।৭) শ্রুতিবাক্যের উদাহরণ দিয়ে স্পষ্টই বলেছেন: "ইতি দেহপাতানন্তরমেবানুভবং শ্রাবয়তে" (vide ব্রহ্মমীমাংসা, Mysore 1903, পৃঃ ৩১৫)। তাছাড়া অপ্পয়দীক্ষিত এ'প্রসঙ্গে 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়'-গ্রন্থে স্পষ্টভাবেই শিবাদ্বৈতমত যে পরিশেষে শুদ্ধাদ্বৈতেই পর্যবসিত হয়—এ'কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "ন চ কেচিদিত্যুপন্যাসাদনভিপ্রেতত্বং শঙ্কনীয়ম্, স্বয়মিদানীং সগুণবিদ্যানিষ্ঠ ইতি দ্যোতনার্থেন এতস্য অন্যথাসিদ্ধত্বাৎ ইত্যাদি" (শিবাদ্বৈতনির্ণয়, ৩৭, পৃঃ ৩ পঙক্তি)। এ'সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় যোগেন্দ্রনাথ তর্কতীর্থ-প্রণীত 'ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৯২)। মোটকথা শ্রীকণ্ঠাচার্যের অভিমতে ব্রহ্মের পরিণামিত্বে শ্রুতি অবান্তর, এবং বিবর্তত্বে চরমতাৎপর্য প্রতিপাদিত বা নির্দিষ্ট হয়েছে। অবশ্য সর্বজ্ঞাত্মমুনি প্রভৃতি কয়েকজন অদ্বৈতবাদীর এটিই সিদ্ধান্ত, তাই সাধারণভাবে আচার্য শ্রীকণ্ঠকে পরিণামবাদীরূপে গ্রহণ করা হলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব'লে স্বীকার করা হয়।

●

॥ বিবেকানন্দস্তোত্রম্ ॥

শ্রীঅনন্তেশচন্দ্র দেবরায়

রবিকরোজ্জ্বলং তপ্তকাঞ্চনবর্ণং সরূপ প্রভাযুতম্।
পদ্মপলাশলোচনযুগলে সদা বিজলী বর্ষিতম্॥
শ্বেত-পঙ্কজ-শুভ্রাস্যানং অদ্বৈতজ্ঞান-প্রভাযুতম্।
সহস্রদলকমলং অমিত বীর্য্যং ভজে বিবেকানন্দম্॥

শিবশক্তিরাধারং ব্রহ্মানন্দস্বরূপং সত্যজ্ঞানানন্দম্।
শ্রীরামকৃষ্ণ-ধর্মপ্রতিষ্ঠায়াং শুভশান্তিকারণম্॥
শিবকল্পরূপং ঋষিশ্রেষ্ঠং নরবর-বপুরাবির্ভূতম্।
শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেক-বাণীরূপং ভজে বিবেকানন্দম্॥

দীর্ণং জীর্ণং ভবদাবাগ্নিক্লিষ্টং তৃষিত ধরণীম্।
পরিত্রাণায় ভূতানাং সাবির্ভূতং রামকৃষ্ণ-মানস-তনয়ম্॥
দেবারাধ্যং ব্রহ্মজ্যোতিবিকাশং জগদ্‌গুরুম্।
সরস্বতীধরপুত্রং কম্বুকণ্ঠং ভজে বিবেকানন্দম্॥

ব্রহ্মানন্দামৃতনিঝরিণীং সুশীতলং বারিম্।
প্রেমবিগলিত হৃদয়ং শান্তং সমাহিতং চিত্তম্॥
"শিব-জ্ঞানে জীব-সেবা" প্রচারেণ চৈতন্যবর্দ্ধনম্।
তং নমামি রামকৃষ্ণ-চিৎ-বিবেকানন্দম্॥

●

॥ সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র ॥

স্বামী প্রভানন্দ

(চার)

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র হরিনামের মদিরায় কতদূর মজেছিলেন তা পরিস্ফুট হবে তাঁর একটি উপাসনার বাণী হতে। কেশবচন্দ্র বলেন: "স্বর্গের ভাটিতে চুইয়ে চুইয়ে কি মদই করেছ। এক ফোঁটা খাব, আর জয় মা বলে নেশায় ভোর হব।···গোরা নাচে আর হাসে, হাসে আর কাঁদে। কি হয়েছে তোর? বলে ভক্তি। মাতাল হয়ে বলে কি না ভক্তি।···মা আদ্যাশক্তি এবার পুরোমাত্রায় মাতাল কর। সব বাড়ীতে মদের ভাটি বসাবে? তবে এবার মজালে। এবার বুঝি পাকাপাকি নেশা হবে? পাঁচ রকম নেশা একেবারে

একটা মাদক দ্রব্য হলে, তার নাম দিলেন নববিধান। একটা নেশায়, একটা মদে যোগীর যোগ, চৈতন্যের ভক্তি, বুদ্ধের নির্বাণ, পাহাড়ে যাওয়া, বৈরাগী হওয়া, গৌরাঙ্গের মত নৃত্য করা, সব একেবারে। এ-যে আসল মাদক বাহাদুর আসছে। এবার কে কত পান করবি করে নে"।[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণের জগন্মাতার সঙ্গে ভাবের ঘোরে কথা বলার ঢঙ, কিছুটা যে বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কেশবচন্দ্রের এ-জাতীয় উপাসনার ভাষা ও ভঙ্গিমার মধ্যে, তা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করবেন।

সংকীর্তন, নববৃন্দাবন নাটক, নবনৃত্য ইত্যাদির মাধ্যমে কেশবচন্দ্র চেয়েছিলেন ব্রাহ্ম আন্দোলনকে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে। কিন্তু এসকল প্রচেষ্টার ছিল কিছু কৃত্রিমতা ও আড়ষ্টতা। সেকারণে নববিধান কিছুটা হিন্দুধর্মঘেঁষা হয়ে উঠলেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় নি। মননশীল লেখক সৈয়দ মুজতবা আলী যথার্থই লিখেছেন: "ব্রাহ্মধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ যতই অধ্যয়ন করি ততই দেখিতে পাই, ব্রাহ্মরা যেন ক্রমে ক্রমেই জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। জনগণকে ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে এক বিরাট গণ-আন্দোলন আরম্ভ করার প্রচেষ্টা যেন তাদের ভিতর ছিল না। এযুগেও তার উদাহরণ পাই নি।"[১৯]

অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর কুশল কীর্তন ও নর্তনের সাহায্যে প্রচলিত সংকীর্তনাদিকে ভাবপুষ্টির দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন, সকল শ্রেণীর মানুষকে আকর্ষণ করেছিলেন। তাছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সাত্ত্বিক ভাবৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান। সংকীর্তনকে ভাবসমৃদ্ধ ও আনন্দঘন করতে তাঁর অবদান ছিল অনন্যসাধারণ। প্রত্যক্ষদর্শী স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন তাঁর স্বোপলব্ধি: "বোধ হইতেছিল যেন তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণকে) অবলম্বন করিয়া এক দিব্যোজ্জ্বল আনন্দধারা চতুর্দিকে প্রসৃত হইয়া যথার্থ ভক্তকে ঈশ্বরদর্শনে, মৃদু বৈরাগ্যবানকে তীব্র বৈরাগ্যলাভে, অলস মনকে আধ্যাত্মিক রাজ্যে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য প্রদান করিতেছিল এবং ঘোর বিষয়ীর মন হইতেও সংসারাসক্তিকে সেইক্ষণের জন্য কোথাও বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার ভাবাবেশ অপরে সংক্রামিত হইয়া তাহাদিগকে ভাববিহ্বল করিয়া ফেলিতেছিল এবং তাঁহার পবিত্রতায় উদ্দীপ্ত হইয়া তাহাদের মন যেন কোন এক উচ্চ আধ্যাত্মিক স্তরে আরোহণ করিয়াছিল।" এই উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চালন ছাড়াও শ্রীরামকৃষ্ণের চেহারায় ও চলনেবলনে ছিল এক সহজ মাধুর্য[২০], যার আকর্ষণে শিক্ষিত-অশিক্ষিত পুরুষ-নারী যুবক-বৃদ্ধ তাঁর সান্নিধ্যলাভে ব্যাকুল হয়ে উঠত।

১৮। প্রিয়নাথ মল্লিক: শ্রীব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, পৃঃ ২১৮

১৯। সৈয়দ মুজতবা আলী: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব, উদ্বোধন, ফাল্গুন, ১৩৯১, পৃঃ ৮৪

২০। অক্ষয়কুমার সেন যথার্থই লিখেছেন:

শ্রীপ্রভুর দীপ্তে অহে দুই মিঠ ধারা।
সুমধুর মধ্য এক দ্বিতীয় মোহান্য। (দুঁহি, ৩৩৬)

ধনী-মানীদের চাইতে সহজ সরল সাধারণ মানুষের সঙ্গলাভ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ও কাম্য। তার দৈনন্দিন জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ব্রাহ্মণ ও পরিচারকগণ সংকীর্তনে মেতেছে একদিন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন: "আমি মনে করেছিলাম তোমাদের সঙ্গে নাচবো। গিয়ে দেখি যে, কোড়ন টোড়ন সব পড়েছে—মেথি পর্যন্ত। আমি কি দিয়ে সম্বরা কোরবো?"[২১] আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেছি বিভিন্ন দেবপ্রাঙ্গণে, ভক্তগৃহে, গ্রামেগঞ্জে, উৎসববাসরে—যে কোন কীর্তনের আসরে যোগদান করেছেন। "সংকীর্তনানন্দে বিভোর হয়ে প্রাণমনোমোহন অপূর্ব নৃত্য করেছেন, কখনও বা প্রেমসুরা পান করে গর্গর মাতোয়ারা, আবার কখনও মহাভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য।" সংকীর্তন ভূমির চতুর্দিকে তিনি ছড়িয়ে দিতেন আনন্দের রাগ, সকল স্তরের মানুষের হৃদয়-অলিন্দে প্রসারিত করে দিতেন আনন্দ-পরাগ।

কেশবচন্দ্রের উদ্ভাবনীশক্তির ফলস্বরূপ "ঊনবিংশ শতাব্দীতে নববিধান ব্রাহ্মদের মধ্যে কীর্তন একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছে।"[২২] কেশবচন্দ্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান নগর-সংকীর্তনের প্রবর্তন। সুলেখক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: "The *Nagar Samkirtan* or procession for street singing, now adopted by all Somajes, nay even by the Native Christians[২৩].....gave rise to not a little sensations in Calcutta". বৈষ্ণব ভাবধারা হতে সঙ্কলন করে কেশবচন্দ্রের প্রতিভা নগরসংকীর্তনকে দিয়েছিল নূতন প্রাণ ও রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণ এধরণের কোন নগরসংকীর্তন করেন নি বা তাতে যোগদান করেন নি, কিন্তু কীর্তনের হুঙ্কারে সকল দেশবাসীকে মাতিয়েছেন, স্বল্পসময়ের জন্য হলেও আনন্দসাগরে ভাসিয়েছেন। কীর্তন-নর্তনের মাধ্যমে দেশবাসীর উপর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

কিন্তু সংকীর্তনের পরিমণ্ডল অপূর্ব শোভা ধারণ করত যখন তাতে একত্রে যোগদান করতেন কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ। দুজনের মিলনে "হৃদয়ে হৃদয়ে গূঢ় যোগ ও সম্মিলন" হত, "ঈশ্বরপ্রসঙ্গের মত্ততা ও ভাবে ঢলাঢলি ও গলাগলি হইত।" ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে "উভয়ের আত্মার আত্মায় গূঢ় যোগ হয়।" কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে বহির্বিশ্বে উপস্থাপিত করেন। এদিকে এই যোগাযোগের ফলে "সরল শিশুর ন্যায় ঈশ্বরকে সুমধুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আব্দার করা এই অবস্থাটি পরমহংস

২১। শশিভূষণ ঘোষ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃ: ৪১৯

২২। ভরাবসু: উনিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে কেশবচন্দ্র, ১৯৮০, পৃ: ১৫৫

২৩। The Statesman, August 2, 1879: ".....in addition to the evening services which are still being held at Dr. Thoburn's Chapel in Dhurrumtollah, certain bands have been formed among the members of several denominations of Christians that start at different points of the town, singing hymns as they pass along the streets, till they reach the Chapel at the hours of the service....."

হইতেই আচার্যদেব বিশেষরূপে প্রাপ্ত হন,"[২৪] "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) শিশু বালকের মত মা আনন্দময়ীর সহিত যেমন কথা কহেন, এবং হরিলীলার তরঙ্গে ভাসিয়া যেমন নৃত্য কীর্তন করেন, শেষ জীবনে কেশব অবিকল তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।"[২৫]

সংকীর্তনে এই দুই পুরুষের সম্মিলিত নর্তন-কীর্তনের কিছু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাই ব্রাহ্ম-সাহিত্য হতে। কেশবজননী সারদাসুন্দরী একটি চিত্তহারী চিত্র তুলে ধরেছেন। কমলকুটীরে মাঘোৎসবের বরণের দিন। সংকীর্তন জমে উঠেছে, "সংকীর্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত-ধরাধরি করিয়া নাচিলেন।" কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাতে পাই, "মাঘোৎসবের সময় তিনি কীর্তনের দিবস প্রায়ই কমলকুটীরে আসিয়া যোগদান করিতেন এবং শ্রীকেশবের হাত ধরিয়া নাচিতেন। একদিন কেশবচন্দ্র নাচিতে নাচিতে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম আমি রাধা', অমনি পরমহংসদেবও বলিলেন যে, 'তুমি শ্যাম, আমি রাধা'।" দুই পুরুষের মিলনে যে আনন্দদ্যুতি উপস্থিত সকলের অন্তরমহলে মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করত সে-বিষয়ে ব্রাহ্মপত্রিকা New Dispensation (৮ই জানুয়ারী, ১৮৮২)-এর মন্তব্য মননযোগ্য। পত্রিকাটি লিখে: "We have invariably found on such occasions an outburst of living devotional enthusiasm—a mighty wave of rapturous excitement—sweeping over the whole audience. The effect is wonderful."

দুই মহাপুরুষের মিলনে সংকীর্তনের পরিবেশ কিরূপ হত আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারব নিম্নলিখিত ঘটনা হতে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের শারদীয়া পূর্ণিমা, কেশবপন্থী ব্রাহ্মগণের শারদোৎসব। ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনাদি সেরে ব্রাহ্মগণ দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করেন। পতাকা ও লতাপাতায় সুসজ্জিত বজরা। সে-সঙ্গে কয়েকটি ডাঙয়ালিয়া ও ডিঙ্গি। প্রায় আশিজন ব্রাহ্মব্রাহ্মিকা দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের বাঁধাঘাটে উপস্থিত হয়েছেন। দলের নেতা স্বয়ং কেশবচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষ হতে হৃদয়ঠাকুর অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানান। তিনি প্রমত্তভাবে গাইতে সুরু করেন, "জাহ্নবীতীরে হরি বলে কে রে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে।" ইত্যাদি। গানের সঙ্গে নৃত্য। কয়েকদল ভক্ত তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। "অতি মনোরম দৃশ্য হইয়াছিল।"

এর পরে সকলে গান ধরেন :

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপ আনন্দঘন
[মন মজিল রে,—রূপ নেহারিয়ে] এরূপ প্রেমিকের প্রাণরমণ।
[ভাই এমত রূপ ত দেখি নাই রে]
কিবা ভক্তসঙ্গে ভক্তবৎসল, দেখে জনম হ'ল সফল, হরিবল।
হরিপ্রেমরসমদিরা পানে, আজ মাতিব নামসংকীর্তনে, বন্ধুগণে।

২৪। শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস (সমসাময়িক দৃষ্টিতে), ১ম সং, পৃঃ ৭৯
২৫। ঐ পৃঃ ১১১

[লোকভয় পরিহরি হে]

লোকে যে যা বলে যাক বলে, আমরা নাচি গাই হরি বলে, বাহু তুলে।
যেন চিরদিন এমনি ভাবে, তব প্রেম সুধার্ণবে, ডুবে থাকি হে দয়াল শ্রীহরি ॥[২৬]

কেশবচন্দ্রের পরিচালনায় সংকীর্তন-দল শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনভূমি পঞ্চবটী প্রদক্ষিণ করে তাঁর বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। খোল করতাল ডেরী সহযোগে সমবেতকণ্ঠে কীর্তন গানে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। একে সংকীর্তন, তদুপরি কেশবচন্দ্রের উপস্থিতি।[২৭] শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে ওঠে ভাবের তুফান। ভক্তগণের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রেমনির্ঝরধারা-শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ রূপ। প্রশস্ত ললাট, ঈষৎ রক্তিম ঠোঁট দুটি, নিরুপম মুখখানি স্নিগ্ধ হাসিতে ঢলঢল, সাত্ত্বিকভাবে পরিপূরিত তাঁর অঙ্গ, এদিকে অন্তরৈশ্বর্যের উচ্ছ্বাস। চতুর্দিকে আনন্দোজ্জ্বলে ঝলমল করে। সমাধি ভঙ্গ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ "পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্বনাশ" বিষয়ে চমৎকার প্রসঙ্গ করেন।

সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে 'পূর্ণচন্দ্রের আলোকে' সংক্ষেপে উপাসনা হয়। কেশবচন্দ্র বলেন: "মা জগজ্জননী, এস কাছে এস, আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার প্রেমনদীতে আমাদিগকে ডুবাইয়া দাও। মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব আর হাসিব কাঁদিব গাইব নাচিব। আর মনে আনন্দ ধরিবে না।" (ধর্মতত্ত্ব, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক) শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে প্রীতিলাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে কেশবচন্দ্র ও অন্যান্য ব্রাহ্মভক্তেরা শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করেন "ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান", "ব্রহ্ম মায়া জীব-জগৎ", "ভগবৎ-ভক্ত-ভগবান" ইত্যাদি। এবার একটি মাতৃভাবের গান হয়। নূতন রচিত গান। গানের ভাবে ও সুর-মাধুর্যে শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্ত আনন্দে বিহ্বল হয়। তিনি মধুর নৃত্য করতে থাকেন। নৃত্যশেষে তিনি তাঁর সুরেলা কণ্ঠে কয়েকটি কীর্তনগান পরিবেশন করেন। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য "মধুর হরিনাম নিস রে জীব যদি সুখে থাকবি আর।" ইত্যাদি। ব্রাহ্মপত্রিকা লেখে: "সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না।" ভাবের ঘোরে শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তর্দশায় প্রবেশ করেন, ক্রমে ভাবের গভীরতায় সমাধিস্থ হন। গানের ভাব ও সুরের বেশ মধুর পরিবেশ রচনা করে।

সংকীর্তনানন্দে প্রমত্ত কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীত-সত্তা ও প্রতিভার অভিপ্রকাশে কিছু বৈশিষ্ট্য ও সৌসাদৃশ্য লক্ষণীয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ষোল-আনা ত্যাগ ও বিবিক্তি, অহং-লেশমাত্র নিয়ে তাঁর লীলাবিলাস। কেশবচন্দ্র আদর্শ ব্রাহ্ম গৃহস্থ, প্রগাঢ় ধর্মপরায়ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন কেশবচন্দ্রকে: "তোমরা রসেবসে বেশ আছ। সারে মাতে।"

২৬। চিরন্তন সঙ্গীতাবলী, ১১৩৪ বাং, পৃঃ ১৬৫

২৭। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় লিখেছেন: কেশবচন্দ্রকে দেখিলে রামকৃষ্ণের ভাবপ্রবণ চিত্ত একেবারে উথলিত হইয়া উঠিত।...তিনি নিকটে আসিয়াই বিহ্বল হইতেন, কথা সমুদায় এলোমেলো, এবং মূর্চ্ছিতাবস্থা উপস্থিত হইত।

অনন্তৈশ্বর্যে ঐশ্বর্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর মধ্যে আন্তর ঐশ্বর্যের মহিমা স্ফুরিত, কেশবচন্দ্রের মধ্যে বাহ্যিক ঐশ্বর্যের বৈভব প্রকটিত। ঈশ্বরপ্রেমিক তাঁরা দু'জনেই নৃত্য-গীত-বাদ্য দিয়ে ভগবানকে বন্দনা করেছেন। রসাস্বাদন করেছেন, অপর সকলকে ভগবদ্ভাবে প্রবুদ্ধ করেছেন। সংকীর্তনের আবেগ ও অনুরাগ স্বাভাবিকভাবে ছন্দায়িত হয়েছে তাঁদের দেহপল্লবে। তাঁদের নৃত্যগীত আধ্যাত্মিক ভাববিমণ্ডিত—রসান্বিত পরিমণ্ডল রচনা করত। সঙ্গীতের ভাবের বিস্তার বিস্ফুরিত হত শ্রীরামকৃষ্ণের তাল লয় সমন্বিত অঙ্গসঞ্চালনের মধ্যে। কখনও কখনও দেখা যায় ভাবে প্রমত্ত শ্রীরামকৃষ্ণের "উদ্দাম" "উদ্ধত" বা "সিংহবিক্রমে" নৃত্য। অপরপক্ষে কেশবচন্দ্রের নৃত্যপ্রয়াস ছিল মাপকোকের দ্বারা নিয়মিত, আভিজাত্যের মাপকাঠিতে নিয়ন্ত্রিত। তাঁর প্রবর্তিত "নবনৃত্যের" মধ্যে ছিল শান্ত সৌষ্ঠবতা, সেখানে ছিল না ভাবের উচ্ছলতা।

কেশবচন্দ্রের গায়ন-গুণ সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য বিশেষ কিছু পাই না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের গীতিকণ্ঠ সম্বন্ধে বিভিন্নজন লিখেছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন "অতুলনীয় কণ্ঠ", "গন্ধর্বনিন্দিত কণ্ঠ", "প্রেমরসাভিষিক্ত কণ্ঠ", "মধুরকণ্ঠ", "বীণানিন্দিত কণ্ঠ" ইত্যাদি। তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায়, সঙ্গীতের রঞ্জনীশক্তিতে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করা বা সঙ্গীতের ভাব শ্রোতাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। কেশবচন্দ্রের তত্টা নয়। ঈশ্বরের লীলাবিলাস তাঁতে বিশেষ প্রকটিত—তাঁর মধ্যে অলৌকিক লৌকিক শক্তির সমাবেশ। তাঁর কণ্ঠসঙ্গীত শুনে মাইকেল মধুসূদন বিহ্বল হয়েছেন, বেদান্তী পদ্মলোচন অশ্রুবিসর্জন করেছেন, পণ্ডিত শশধর 'ডাইলুট' ধরেছেন, বিদ্যাসাগর বিমুগ্ধ হয়েছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র দু'জনেই ধর্মপ্রসঙ্গের ভাবসম্প্রসারণার বাহন বা অনুরঞ্জক হিসাবে ব্যবহার করেছেন কীর্তনগানকে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে কেশবচন্দ্রের বিশেষ জনপ্রিয়তা তাঁর প্রাণমাতানো বাগ্মিতার জন্য, অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ হৃদয়রঞ্জনকারী তাঁর বৈঠকী আলাপ, তদোধিক তাঁর গায়নশক্তি। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে তিনি গানের তত্ত্ব বা তাৎপর্য শ্রোতার মনে গেঁথিয়ে দিতেন। একক কণ্ঠে বা সমবেত সঙ্গীতের মাধ্যমে তিনি যেরূপ ধর্মভাব সঞ্চালন করতেন, ঠিক তেমনভাবে সঙ্গীতকে কেশবচন্দ্র ব্যবহার করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরক্ত গানের তৃপ্তীর হতে পছন্দমত সুরযুক্ত তীর তিনি শ্রোতার হৃদয়ে নিক্ষেপ করতেন। এ বিষয়ে তিনি অনুপম দক্ষ।

কেশবচন্দ্র-পরিচালিত সংকীর্তন-পরিমণ্ডলে বিদ্বান ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ভীড়। অপরপক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুরকণ্ঠে গীত কীর্তনের আবেদন ছিল সার্বজনীন। শ্রোতা ও দর্শকমাত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে লক্ষ্য করেছে, "হরি ভক্তসঙ্গে রসরঙ্গে করিছেন কত খেলা।"

শ্রীরামকৃষ্ণের নর্তন-কীর্তন ছিল সহজ স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর। তিনি নিজে যেরূপ আচরণ করতেন, তাঁর পার্ষদ ও অনুরাগীদেরও বলতেন, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়। নৃত্যপর ভাবে পর্যায়-মাতোয়ারা শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও বা বস্ত্রহীন, কিন্তু তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হত অমানুষী ভাবদ্যোতি। অপরপক্ষে নূপুরপায়ে একতন্ত্রী হাতে সৈরিক উত্তরীয় গলাতে

কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল আভিজাত্যনিয়ন্ত্রিত আড়ষ্টতা। শ্রীরামকৃষ্ণের "দুই বেয়ানের নৃত্য" স্মরণযোগ্য। উপন্যাসধৃত কাহিনীর মত শ্রীরামকৃষ্ণ দুহাত তুলে নৃত্য করতেন এবং কেশবচন্দ্র এক হাতে বগল টিপে আর এক হাত তুলে নাচতেন।

কীর্তন ভাবপ্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সঙ্গীতের মূল ভাবটির দিকে। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষার্থী রামলালকে বলেছিলেন: "যখন যে কোন দেবদেবীর গান গাইবি, আগে চোখের সামনে তাঁকে দাঁড় করাবি, তাঁকে শোনাচ্ছিস মনে করে তন্ময় হয়ে গান গাইবি।"[২৮] জগন্মাতার উপর একান্ত নির্ভরশীল শ্রীরামকৃষ্ণের মন ও মুখ একমুখী, ব্যক্তিগত কোন মতলবে তিনি কিছু করতেন না, সংকীর্তনও গাইতেন না। অপরপক্ষে কেশবচন্দ্র ছিলেন নিরাকার জগন্মাতার চরণবন্দনাশীল। ভগবদপ্রেমিক কেশবচন্দ্র প্রচণ্ড সাহসী হলেও নিজস্ব সম্প্রদায়, প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়সকল ও বৃহত্তর বুদ্ধিজীবিমহলের মতামতের উপর নির্ভর করতেন। কেশবচন্দ্রের কোন আচরণের সমালোচনা হলেই তাঁর পত্রপত্রিকাতে অবিলম্বে কৈফিয়ৎ প্রকাশিত হত। শ্রীরামকৃষ্ণের "পাবলিসিটির" বালাই ছিল না।

কেশবচন্দ্রের পার্ষদদের মধ্যে ছিলেন প্রতিভাধর সঙ্গীত রচয়িতা, সুরদাতা, নিষ্ঠাবান শিল্পীগণ। শ্রীরামকৃষ্ণের পরিকরদের মধ্যেও প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁদের সকলেরই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভগবৎপ্রীতিলাভ। সেকারণে শ্রীরামকৃষ্ণ পরিকরগণের অনেকেরই আধ্যাত্ম-জীবনের ক্রমবিবর্তনশীল রূপ উত্তরোত্তর নূতন মাধুর্যের মহিমায় আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সে-সকল ভাবের বিচ্ছুরণ সাধারণ ভক্তদেহকে বিমুগ্ধ করেছিল।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন তাঁর "পদাবলী কীর্তনের ইতিহাস"-গ্রন্থে (পৃঃ ১১৮): "শ্রীপাদ গোপালভট্ট হরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থে নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বিত রূপ সঙ্গীতকে বৈষ্ণব-সমাজে একান্ত গ্রহণীয় ও আদরনীয় বলে বিধান দিয়েছেন।" ঈশপ্রাণিত শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরপ্রেমিক কেশবচন্দ্রও নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমন্বিত কীর্তনকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। কীর্তনের মাধ্যমে তাঁরা দিব্যভাবমাধুর্য বিতরণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তি পরিপূরিত হয়ে আছে ভগবানের শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও নিরন্তর কীর্তনের দ্বারা।[২৯] কেশবচন্দ্রের ভগবৎ-সাধনাও এ-ভাবের অনুবৃত্তি বৈ ত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুপ্রেরণায় কেশবচন্দ্রের শেষজীবন মাতৃসঙ্গীতে মুখরিত, মাতৃনামসুধায় সুধাপ্লাবিত। দু'জনেই তালে রাগে বৃত্তে রসে ভাবে সংযুক্ত করে ভগবানের যশোগানকে শিক্ষিতজন তথা সহরবাসীদের মধ্যে সঞ্জীবিত করেছিলেন। কেশবচন্দ্র কীর্তনের আবর্তে যুবকদের আকর্ষণ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বসাধারণের জীবনে সংকীর্তনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

●

২৮। কথামৃত-কার শ্রীম: শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি, পৃঃ ৩

২৯। শ্রবণাদর্শনাদ্ধ্যানাদপি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিষ্ঠাত ততো মুদান। শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২৩।৩৯

॥ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ ॥

শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ

(নয়)

আলমোড়ায় এক ভদ্রলোক স্বামীজীকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন—যারা দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার দেখতে বাধ্য হয়—তাদের কর্তব্য কি? স্বামীজী তাকে জবাব দিলেন, "কেন সবলকে ঠেঙাইবে, আবার কি? এই কর্মবাদের মধ্যে তোমার নিজের অংশটা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার, বিদ্রোহ করিবার অধিকার তোমার সবসময়ই আছে।"—ঈশ্বরের এই কর্মবাদের উপর তাঁর নিজের বিশ্বাস জাতির চেতনায় সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। আবার বললেন, "কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হইলেন সগুণ ঈশ্বর। সমষ্টির ইচ্ছাকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। নিয়ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এই; ইহাকেই আমরা কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি।" সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এসব বাণী এসেছে, এসব কর্মের প্রবর্তনা এসেছে যুগের প্রয়োজনেই। কারণ তিনি জানতেন ভারতাত্মার বাণী যতই সুন্দর ও শাশ্বত হোক তাকে ক্রিয়াশীল এবং সর্বব্যাপ্ত ও সর্বজন-কল্যাণমুখী হতে হলে এই জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমির উপরই দাঁড়াতে হবে। তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশেই জানতেন কাত্যায়নী-সভ্যতার স্থির শক্ত ভিত্তিভূমির উপরই মৈত্রেয়ী-সভ্যতার শুভ্র মর্মর-প্রাসাদ গড়ে তোলা সম্ভব। কারণ তিনি বুঝেছিলেন মাটির গভীরে শিকড়ের সুস্থ সন্নিধি ছাড়া বৃক্ষের ঊর্ধ্বায়ত সজ্জল শাখা-প্রশাখায় ফুল-ফোটানো সম্ভব নয়। এই কারণেই কৈবল্যমুক্তিই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর পরম প্রার্থিত জেনেও সমগ্র জাতির জন্য প্রত্যহ-জীবন রচনার দায়দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। জাতিকে আগে জাগতে হবে। বাঁচতে হবে। অন্ধকারের অতল গহ্বর থেকে উঠতে হবে। মাথা তুলে মানুষের মত দাঁড়াতে হবে। তাই সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তিই তার একক অভিষ্ট। প্রথমেই তাই তিনি আত্মবিশ্বাস, সাহস ও বীর্যের সাধনায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করলেন। এবং এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেয়া মানেই জাতির বিলুপ্ত পিতৃপরিচয় উদ্ধার করা—উজ্জ্বল মহান উত্তরাধিকারের নষ্ট কোষ্ঠি উদ্ধার করা। স্বামীজী ভারতবর্ষকে প্রথম তার যথার্থ পিতৃ-পরিচয় উদ্ধার করে এনে দিয়েছিলেন। বার বার স্বামীজী বললেন যে ভারতাত্মার মহত্তম জীবনবাণীকে আবার বিশ্বের কাছে প্রমাণিত করার জন্যই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ভারতবর্ষের সর্বাত্মক বন্ধনমুক্তি। কারণ এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। তাই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য প্রথমেই জাতির কাছে তুলে ধরলেন জাতির হারানো উত্তরাধিকারের অক্ষয় ইতিবৃত্ত। স্বামীজী তাঁর অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রজ্ঞাবলেই "নীতি-শিল্প-কলা-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশভূমি ভারতবর্ষের সামগ্রিক মৃণ্ময় ও চিন্ময় রূপটি একই সঙ্গে একজন গৌরবান্বিত ভারতবাসীর মতই তুলে ধরলেন পাশ্চাত্য জগৎ সমক্ষে।" বললেন, "তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ। সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-

বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরো বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরবস্বরূপ ত্রিকোণমিতি—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয়; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ সংখ্যাদশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (Decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ। দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনো পর্যন্ত অপর যেকোনো জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং সুরের তিনটি গ্রামসহ স্বরলিপি প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইউরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইউরোপীয় ভাষার ভিত্তি। ··সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক আবার যে কোনো ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য।···শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রঙ্ উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়। চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা-তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুত সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে।" শুধু যে ভারতকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহিমা কীর্তন করেছিলেন তাই নয়, তিনি আত্মাবমাননার গ্লানিতে নিমজ্জিত আত্মভ্রষ্ট, পরপদলাঞ্ছিত, পরানুকরণ-সর্বস্ব দেশবাসীর অবসাদমুক্তির প্রয়োজনেও স্বদেশের স্বর্ণ-প্রতিমা স্থাপিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর স্বদেশবাসীর অন্তরে। জাতির হৃদয় থেকে জড়তা, ভীরুতা ও দুর্বলতা দূর করে এভাবেই আত্মশক্তির উদ্বোধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

ভারতের শিল্প-সাহিত্য, দর্শন-বিজ্ঞান, কাব্য-সঙ্গীত, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, নীতি-নিয়ম, ভাবনা-চিন্তা—এককথায় সামগ্রিকভাবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই প্রস্ফুটিত হয়ে আছে ভারতাত্মার সত্যকার যথার্থ স্বরূপ। একদিন ভারতবর্ষ শিল্পে-সাহিত্যে-দর্শনে-বিজ্ঞানে চরমতম উৎকর্ষ লাভে সভ্যতার তুঙ্গশীর্ষ স্পর্শ করেছিল। পরবর্তীকালে শুধুমাত্র হৃদয়বোধের চর্চা করে, কাত্যায়নী সভ্যতাকে অস্বীকার করে হারিয়ে ফেলেছিল তার সামঞ্জস্য এবং তারই ফলশ্রুতিতে আমরা পরিণত হয়েছিলাম আত্মভ্রষ্ট হৃতসর্বস্ব জাতিরূপে। অতীতের সেই উজ্জ্বল ইতিহাসের আবিষ্কার, পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন স্বামীজী উৎসর্গ করেছিলেন তাঁর জীবন-যৌবন-ধর্ম-মান। অতীতের সেই স্বর্ণদীপ্ত গৌরবোজ্জ্বল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর নিজের বুকের মধ্যে যে ভালোবাসা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধা—তাই তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন জাতির হৃদয়ে। কারণ শ্রদ্ধার সঞ্জীবনীই জাতীয় জাগৃতির একক উজ্জ্বল উদ্ধার।

তাঁর (স্বামীজীর) কাছে ভারতবর্ষ একটি ভূখণ্ডমাত্র নয়, একটি প্রাচীন জাতির বাসভূমি বা সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র মাত্র নয়, তাঁর দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি, ধর্মভূমি-দেবভূমি। ভারতবর্ষ একটি মহান আদর্শের প্রতীক। ভারতবর্ষ একটি জীবনদর্শন। ভারতবর্ষ স্বামীজীর

ভালোবাসা।" সমালোচকের এ উক্তি একান্তভাবেই সত্য। দেশের প্রতিটি মানুষের চিত্তে ও চেতনায় এ ভালোবাসাকে অভিসঞ্চারিত করে দেবার জন্য তথানিষ্ঠ ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করে তুলে ধরলেন স্বামীজী সকলের কাছে। যাতে প্রত্যেক ভারতবাসী এই অমল উত্তরাধিকার অর্জনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তিনি লিখলেন, "দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিকতা—যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চির পবিত্র অমর আত্মারূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে—এই দেশ সেই সবকিছুরই পুণ্যভূমি।···আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু আজ অভিজ্ঞতার দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়াইয়া, সংস্কার-মুক্ত দৃষ্টি লইয়া, সর্বোপরি সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসিয়া অন্যান্য দেশের অতিরঞ্জিত চিত্রসমূহের বাস্তবরূপ দেখিয়া সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি, আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনো অবনতি হয় নাই। কত রাজদণ্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দণ্ড একহাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে। উচ্চতম হইতে নিম্নতম শ্রেণী অবধি বিশাল জনসমষ্টি আপন অনিবার্য গতিপথে ছুটিয়া চলিয়াছে; জাতীয় জীবনস্রোত কখনো মৃদু অর্ধচেতনভাবে, কখনো প্রবল জাগ্রতভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত চিত্তে দণ্ডায়মান। সে শোভাযাত্রার কোনো কোনো অংশে আলোকরেখা স্তিমিতপ্রায়। পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশমাতৃকা রাণীর মত পদবিক্ষেপে পশুমানবকে দেবমানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্ত্যের কোনো শক্তির সাধ্য নাই—এ জয়যাত্রার গতি রোধ করে"। এই দুরন্ত আশাবাদী জাতির জন্য রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের মঙ্গল সুসমাচার। এবং শুদ্ধ মানবতার পথে জীবনের উজ্জ্বল আহরণ। এবং এই হল বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে ভারতাত্মার শ্রেষ্ঠতম উপহার। পৃথিবীর প্রাচীন সব সভ্যতার আজ আর চিহ্নমাত্র নেই। কোথায় গেল সেই দুরন্ত প্রতাপ ইজিপ্ট, ব্যাবিলনিয়া, অ্যাসিরিয়া, মায়া, অজেক সভ্যতা? কবে হারিয়ে গেছে তারা কোন্ অন্ধকারের অতলে। গ্রীক বা রোম-সভ্যতার প্রত্নচিহ্নসকল এখন যাদুঘরে। কিন্তু ভারত নিরবচ্ছিন্ন ধারায় এগিয়ে চলেছে অতীতের থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের অভিমুখে। কারণ ভারতবর্ষ সত্যের শুদ্ধ পথের অভিযাত্রী। আজ হয়তো তার প্রাণধারা স্তিমিত, উজ্জ্বল আলোভিসার কিছুটা ম্লান। তবু এ জাতির ভবিষ্যৎ মৃত্যুহীন। কারণ আমাদের একটি ভাবাদর্শ আছে—নিজস্ব মানবিক বৈশিষ্ট্যে আমরা স্থির এবং স্থিতধী। এবং সেই আদর্শ হল সত্যের প্রতিষ্ঠা। আমাদের সাধনা সর্ব মানুষের কল্যাণবোধে সমর্পিত পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। সেই মনুষ্যত্বের সাধনা থেকে চ্যুত হয়েছি বলেই আজ আমাদের সব চাইতে বড় সঙ্কট। আমরা আমাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছি বলেই সবচেয়ে ভয়। ●

॥ চিরসৈনিক ॥

শ্রীশচীন্দ্রনাথ দরিপা

দীপ্ত উড্ডীন ধৃত ধ্বজা কার
সন্ন্যাসী, নাকি সৈনিক এ
কোন রাজা তুমি গৈরিকে—
এলে কোন রাজা তুমি গৈরিকে ॥
উদ্ভবরাজ বিদ্যুৎ তুমি
বজ্রার মেঘ নৈর্ঋতে
পুঞ্জিত তেজ গৈরিকে—
ঘন পুঞ্জিত তেজ গৈরিকে ॥
উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এসো
প্রাণ দিতে দান তৈরি কে—
নির্ঘোষ শুরু গৈরিকে—
তব নির্ঘোষ শুরু গৈরিকে ॥
জীবে প্রেমই ঈশ্বর সেবা
বিশ্বময়ম ওই ধ্বকে
বৈদিক ঋষি গৈরিকে—
নব বৈদিক ঋষি গৈরিকে ॥
বিবেকানন্দ প্রাণ আনন্দ
হানো জড়ত্ব বৈরীকে
সৈনিক চীর গৈরিকে—
চির সৈনিক চীর গৈরিকে ॥

●

॥ তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ ॥

ডক্টর শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্বামী অভেদানন্দ 'Vedanta Towards Religion'-গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বেদান্ত-ধর্মকে একটি বিরাট অট্টালিকার সঙ্গে তুলনা করে তার বিভিন্ন তলার কথা বলেছেন। এখানে যেমন সগুণ, সাকার ব্রহ্মের কথা আছে, তেমনি আছে সাকার, নিরাকার এবং গুণাতিক্রান্ত ব্রহ্মেরও কথা। আবার সম্পূর্ণ নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মের কথাও আছে বেদান্তধর্মে। এই তিনরকমের ধারণা যেন বেদান্তধর্ম-সৌধের তিনটি তলা। যার যেমন খুশী তিনি তেমন তলার আশ্রয় গ্রহণ করে সংসারের ত্রিতাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন।

স্বামীজী আলোচ্য গ্রন্থেরই অষ্টম অধ্যায়ে বেদান্তধর্মের তিনটি দিক (three phases) —দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আমাদের ধারণা, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অন্যান্যদের বিভিন্ন দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই ব্যাপকতর অর্থান্তর্গত করেছেন। তিনি আরও বলেন, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদের মধ্যে যেন একটা ক্রমপরিণতি রয়েছে। একে জানলে যখন সব জানা হয়ে যায় (একস্মিন বিজ্ঞাতে সর্ববিজ্ঞানম্ ভবতি) তখন অদ্বৈতবাদের মধ্যে সবই এক বিশেষ অর্থে সমন্বিত। তাঁর মতে অদ্বৈতবাদ যেন বেদান্তের বিচিত্রবাদের মধ্যে ঐক্যবিধান করেছে। দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত অদ্বৈতেরই প্রকাশ। এখানে ঐক্য বলতে সমুচ্চয় বা সমাহার বুঝলে হবেনা। এখানে সমন্বয় কথার অর্থ বৈচিত্র্যের নিহিতার্থ বিধানকারী। আমাদের ধারণা, স্বামী অভেদানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করেছেন, সেভাবে অদ্বৈতবাদ — গ্রহণ করেই একথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত উপলব্ধি একটি উপমার মাধ্যমে বুঝিয়ে বলেছেন—'প্রথমে 'নেতি' 'নেতি' বিচার করে ছাতে পৌঁছাতে হয়। তারপর সে দেখে, ছাদও যে জিনিসে তৈয়ারী—ইট চুণ শুরকী—সিঁড়িও সেই জিনিসে তৈয়ারী। তখন দেখে ব্রহ্মই জীব জগৎ সমস্ত হয়েছেন।'[১] এই প্রসঙ্গ যেন আরও একটু বিস্তারিত করে তিনি বলেছেন—'যতক্ষণ ঈশ্বরকে না পাওয়া যায়, ততক্ষণই 'নেতি' 'নেতি' করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে যারা পেয়েছে, তারা জানে যে তিনিই সব হয়েছেন। তখন বোধ হয় ঈশ্বর মায়া, জীবজগৎ শুদ্ধ তিনি। যদি একটা বেলের খোসা, শাঁস, বীচি আলাদা করা যায়, আর একজন বলে, বেলটা কত ওজনে ছিল দেখত, তুমি কি খোলা বীচি ফেলে শাঁসটা কেবল ওজন করবে? না; ওজন করতে হ'লে খোসা বীচি সমস্ত ধরতে হবে। ধরলে তবে বলতে পারবে, বেলটা এতো ওজনের ছিল। খোলাটা যেন জগৎ; জীবগুলি যেন বীচি। বিচারের সময় জীব আর জগৎকে অনাত্মা বলেছিলে, অবস্তু বলেছিলে। বিচার করবার সময় শাঁসকেই সার, খোলা আর বীচিকে অসার বলে বোধ হয়। বিচার হয়ে গেলে, সমস্ত জড়িয়ে এক বলে বোধ হয়। আর বোধ হয় যে-সত্তাতে শাঁস সেই সত্তা দিয়েই বেলের খোসা আর বীচি হয়েছে। বেল বুঝতে গেলে সব বুঝিয়ে যাবে। অনুলোম বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যদি ঘোল হয়ে থাকে তবে মাখনও হয়েছে। যদি মাখন হয়ে থাকে, তা হ'লে ঘোলও হয়েছে। আত্মা যদি থাকেন, তো অনাত্মাও আছে'। তিনি আরও স্পষ্ট করে বললেন—'যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা, যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য, যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হ'ন, তিনি জীবজগৎ হয়েছেন। যে জেনেছে সে দেখে যে তিনিই সব হয়েছেন —বাপ, মা, ছেলে, প্রতিবেশী, জীবজন্তু, ভালমন্দ, শুচি অশুচি সমস্ত।'[২]

শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতোপলব্ধিতে উপনিষদের বাণী 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' (এক ও অদ্বিতীয়) এবং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (সব কিছুই ব্রহ্ম) সমন্বিত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, শঙ্করের

১। কথামৃত, ১।৬।৩

২। কথামৃত, ১।৯।২

অদ্বৈতবাদে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বাক্যটি 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বাক্যের আলোতে ব্যাখ্যাত হয়নি[৩], তিনি এই দু'টি বাক্যকে যথার্থ পটভূমিতে স্থাপন করে উপনিষদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—'We find the affirmation of the Absolute. the experience concept of the utter and Ineffable Transcendence; but we find also, not in Contradiction to it but as its corollary. an affirmation of the Cosmic Divinity, an experience—concept of the Cosmic self and the Becoming of Brahman in the universe'[৪] (উপনিষদে 'অথাত্ মনসগোচর' ব্রহ্মের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি আবার তার পরিপূরকরূপে বলা হয়েছে বিশ্বচেতনার কথা যা বিশ্বাত্মা এবং তার জগৎরূপে পরিণত হওয়ার কথা)। শ্রীঅরবিন্দের দাবী তিনি উপনিষদের এই তাৎপর্য অনুধাবন করেই পূর্ণাদ্বৈত (Integral Advaita) প্রচার করেছেন। আমাদের মনে হয়, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর যে উদ্ধৃতি দিয়েছি তাতে স্পষ্ট যে, শ্রীঅরবিন্দের অদ্বৈতানুভূতি বহুপূর্বেই শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ করেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন—'যিনি ঈশ্বর বলে গোচর হ'ন, তিনি জীবজগৎ হয়েছেন।'

ব্রহ্মের সাকার-নিরাকার ভাব সমন্বিত করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—'কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান সূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয়না। তাঁর রূপও দর্শন হয়না। কি তিনি মুখে বলা যায়না।'[৫] বক্তব্যের নিহিতার্থ এই যে, ভক্তের কাছে ঈশ্বর সাকার যেমন বরফ, আর জ্ঞানীর কাছে ঈশ্বর নিরাকার যেমন জল। জলও সত্য, বরফও সত্য। সুতরাং একই ঈশ্বর সাকার রূপেও প্রকাশিত আবার নিরাকার ভাবেও উপলব্ধ। সাকারে-নিরাকারে বিরোধ নেই।

ব্রহ্মের নির্গুণত্ব-সগুণত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'সমুদ্রের জল দূর থেকে দেখলে নীল, কাছে গিয়ে হাতে তুলে খাবো—রং নাই।'[৬] নিহিতার্থ এই যে, একই সমুদ্রের জল যেমন বিভিন্ন অবস্থান অনুসারে দেখলে নীলবর্ণ ও বর্ণহীন দেখা যায়, তেমনি দৃষ্টিভঙ্গী এবং সাধকের অবস্থা অনুসারে ব্রহ্ম নির্গুণ রূপে উপলব্ধ হয়।

আমাদের দেশে সাধনার ক্ষেত্রে অধিকারভেদ স্বীকৃত। কারও রুচি ও প্রকৃতি ভক্তি-বাদের উপযোগী, ব্রহ্ম তাঁর কাছে সাধারণতঃ সগুণ ও সাকার, আবার কেউ বা কর্মযোগের

৩। 'The great Vedantic formula, 'one without a second' has not been read sufficiently in the light of that other formula equally imperative, 'All this is the Brahman'—The Life Divine in one Volume, p. 24.

৪। The Life Divine, p. 567.

৫। কথামৃত, ১।৩।৪

৬। তদেব, ১।২।৪

পক্ষে উপযুক্ত, তাঁর কাছেও ব্রহ্ম সাধারণতঃ সগুণ এবং সাকার, অন্য কারও কাছে জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বক্ষেত্র এবং ব্রহ্ম তাঁর কাছে নির্গুণ ও নিরাকার।

স্বামী অভেদানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে বলেন[1], বেদান্তধর্মে যেমন সগুণ, নির্গুণ, সাকার, নিরাকার সমস্ত উপাসনাই স্বীকৃত, তেমনি আবার জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, রাজযোগও স্বীকৃত। যার যেমন রুচি ও প্রকৃতি সে তেমন পথ অনুসরণ করবে। আমরা পূর্বেই দেখেছি, বিভিন্ন বেদান্তসম্প্রদায় বিভিন্ন যোগের কথা বলেছে। তবে আমাদের মনে হয়, বেদান্তদর্শনের স্মৃতিপ্রস্থান ভগবদ্গীতাতেই চমৎকারভাবে বিভিন্ন যোগসাধনার (জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, রাজযোগ) সমন্বয় প্রদর্শিত হয়েছে এবং স্বামী অভেদানন্দ এই শাস্ত্রটিকেই ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধির আলোতে বিভিন্ন যোগসাধনার লক্ষ্যের দিক থেকে ঐক্য বা অবিরোধ প্রদর্শন করেছেন। অবশ্য বিভিন্ন বেদান্তসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারা ভগবদ্গীতারও ভাষ্য রচনা করেছেন এবং তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী তাতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বেদান্তের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ 'Vedanta Towards Religion'-গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—'Vedanta does not go on speculating and speculating, theorising and theorising, like other philosophies, but it starts by taking the present conditions of our life as they are and then shows the way out of it, by removing their cause. The cause of such a slavery is nothing but our ignorance of the Truth.' (বেদান্ত অন্যান্য দিলসফির মত শুধু বিচার বা ঔপপত্তিক আলোচনা নয়, আমাদের জীবনের বর্তমান অবস্থা যেমন আছে তেমনিভাবে তা নিয়ে আরম্ভ ক'রে বেদান্ত এর কারণ দূর ক'রে এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ নির্দেশ করে। সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞতাই আমাদের বর্তমান অবস্থার কারণ। সত্য সাক্ষাৎকারই এই অবস্থা থেকে মুক্তির উপায়।) বক্তব্যের নিহিতার্থ এই যে, বেদান্ত ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত, বর্তমান জীবন থেকে তার যাত্রা শুরু এবং এই জীবনকে পরিবর্তনের জন্য অজ্ঞান দূর ক'রে সত্যোপলব্ধির দিকে ধাবিত। সুতরাং বেদান্ত যথার্থতঃ ধর্ম এবং ভারতীয় অর্থে 'দর্শন' বা সত্যদর্শন বা সত্যসাক্ষাৎকার।

●

১। Vedanta Towards Religion অষ্টম অধ্যায়।

॥ জাপানের কাবুকি নাটক ॥

ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

(চার)

নানা অন্তর্বিপ্লবের মধ্য দিয়ে একদিকে এডো নগরের প্রতিষ্ঠা আর একদিকে বাণিজ্যনগরী ওসাকার উত্থান এই সময়ের মধ্যে জাপানের সাংস্কৃতিক নগর কায়তোতে কাবুকি নাটকের ক্রমবিকাশেরও প্রথম পর্বের অবসান হয়ে গেল, এবার দ্বিতীয় পর্বের সূচনা।

এডো, কায়তো এবং ওসাকা জাপানের এই তিনটি অঞ্চলে সমাজ-জীবনের তিনটি স্বতন্ত্র আদর্শ গড়ে উঠেছিল। এডোর সমাজ-জীবনে বীরত্ব ও দুঃসাহসিক কার্যাবলী, কায়তোর সমাজ-জীবনে রোমান্টিক বা নরনারীর প্রণয় ও ওসাকার সমাজ-জীবনে বাস্তব জীবনের বিষয় প্রাধান্য লাভ করেছিল। সেই অনুযায়ী জাপানের এই তিনটি অঞ্চলে এই সময় থেকে তিনটি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে কাবুকির কাহিনী ও তাদের অভিনয় নূতন ধারায় অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছিল। এই তিনটি বিভিন্ন অঞ্চলে সেই অনুযায়ী শক্তিশালী অভিনেতা এবং স্ত্রীচরিত্রে পুরুষ অভিনেতারও (এদেরে 'ওয়াগাতা' বলত) আবির্ভাব হয়েছিল। তাদের অভিনয়ের গুণে সে-যুগে কাবুকি জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে উন্নীত হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই ধারায় জাপানের কাবুকি নাটক অগ্রসর হয়ে এল। ইতিমধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পরলোকগমনের পর এই বিষয়ে জনসাধারণের ঔৎসুক্য হ্রাস পেতে লাগল। এডোর একটি নামকরা কাবুকি নাটকের সম্প্রদায় তার ব্যবসায় বন্ধ করে দিল, অন্যান্য সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও উৎসাহ হ্রাস পেয়ে গেল। এই সময় পুতুল-নাটকের খুব সমাদর হয়ে উঠল। কাবুকির আগেই পুতুল-নাটকের উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু কিছুকাল যাবৎ কাবুকির প্রভাব অব্যাহত ছিল বলে তার ভিতর দিয়ে পুতুল-নাটক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি, এবার তার সে সুযোগ এল। ক্রমে এই সময় অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পর থেকে পুতুল-নাটক (বানরাকু) অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

পুতুল-নাটকের জনপ্রিয়তা দেখতে পেয়ে তখন পুতুল-নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে কাবুকি রচিত হতে লাগল। তার ফলে কাবুকিতে পুতুল-নাটকের অনুকরণে বহুল পরিমাণে সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাট্যগুণান্বিত কাহিনী ব্যবহৃত হতে লাগল। তখন কাবুকি পুতুল-নাটক প্রভাবিত হয়ে পড়ল সত্য, কিন্তু তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথ তাতেই প্রশস্ত হলো।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাবুকির জন্য জাপানে প্রথম স্থায়ী মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়, তার আগে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে তাতে অভিনয় হতো। তখন থেকেই দর্শকের মাথার উপর একটা স্থায়ী আচ্ছাদন দেওয়া হয় এবং প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের ঠিক মাঝখান দিয়ে কাঠের পাটাতন দিয়ে একটি যাতায়াতের পথ বা 'করিডর' তৈরী করা হয়, তা মঞ্চের সঙ্গে গিয়ে মিশে যায়, তার ফলে দর্শকের দুইভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চের মুখোমুখী হয়ে বসবার ব্যবস্থা হলো। এই পথটিও মঞ্চের একটি অংশ বলে গণ্য হলো। মঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত এই পথটির নাম 'হানামিচি'। এমন কি, এই সময়ে ঘূর্ণায়মান মঞ্চেরও প্রবর্তন হলো।

কাবুকো এবং ওসাকা অঞ্চলেই সাধারণতঃ পুতুল-নাটকের কাহিনী নিয়ে কাবুকির যখন অভিনয় চলছিল, তখন এডো সহর আরো প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠতে আরম্ভ ক'রে পৃথিবীর বৃহত্তম সহররূপে গড়ে উঠবার উপযোগিতা লাভ করছিল। কাবুকো কাবুকি প্রাচীন পদ্ধতির পুতুল-নাটক হয়ে উঠছিল, তার প্রভাব ওসাকাও অতিক্রম করতে পারে নি, কিন্তু এডো সহরে নূতন নূতন বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল, তার ফলে এডো সহরে কাবুকির যে রূপায়ণ হলো, তা আরো বেশী সম্ভবনাময় হয়ে উঠল। এডো জাপানের নূতন জীবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠবার ফলে তার মধ্যে জীবনের এবং তার সঙ্গে তার শিল্পকর্মের মধ্যেও নূতন উন্নত ভাবনা এবং জটিলতা দেখা দিতে আরম্ভ করছিল। ক্রমে এডো কাবুকি নাটকের মূল কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়াল।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই জাপানের জাতীয় সংস্কৃতি সকল দিক থেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, তখন তার মধ্যে বিস্তার এবং বিকাশেরও প্রেরণা দেখা দেয়। তার কেন্দ্রস্থলই হয়েছিল তখন এডো—কাবুকোতে নয়, কিংবা ওসাকাও নয়। কিন্তু সেই বিস্তার এবং বিকাশ তার জাতীয় জীবনের সংস্কারের মধ্য থেকেই এসেছিল, তার মধ্যে কোনো বৈদেশিক প্রেরণা ছিল না, তার কারণ, তখন পর্যন্ত জাপান কোনো পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে নি। এডোর সামাজিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল দৈহিক শৌর্য বীর্য, সে কথা আগে বলেছি। সেই সূত্রে এখানকার কাবুকি নাটকের নূতন বিস্তার এবং প্রসারের যুগে উত্তেজনাপূর্ণ হত্যা এবং ভৌতিক কাহিনী প্রধান অংশ গ্রহণ করল। গীতিকাব্যসুলভ প্রণয়কাহিনী তার মধ্যে স্থান পেল না, তার যে ধারা কাবুকোতে একদিন বিকাশলাভ করেছিল, তা ক্রমে সেখানেই শুষ্ক হয়ে যেতে লাগল, তার পরিবর্তে এডোতে নূতন নূতন উত্তেজনামূলক, রোমাঞ্চকর, দুঃসাহসিক এবং নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কাহিনী মুখ্য স্থান লাভ করতে লাগল। পুতুল-নাটকের কাহিনীও তার ছায়া মাড়াতে পারল না। এডোর নব-গঠিত শিল্পকেন্দ্রিক নাগরিক সমাজ-জীবনের মধ্যে এইসকল কাহিনী বিশেষ সমাদর লাভ করল। এইসকল ভয়ঙ্কর দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে কাবুকির সঙ্গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রইল। কাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার নিজস্ব এক বলিষ্ঠ আঙ্গিক গড়ে উঠতে লাগল, এমন কি, মৃত্যুর দৃশ্যগুলোকে অভাবনীয় এক শিল্পোত কৌশল মনোরম এবং সহনীয় করে তুলবার প্রয়াস দেখা গেল। বিবাহিত জীবনে আবদ্ধ হবার পথে সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক অন্তরায়ের জন্য যে দুই তরুণ-তরুণী নিরুপায় হয়ে এক সঙ্গে আত্মহত্যা করে মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হচ্ছে, তার দৃশ্যকেও মনোরম এবং উপভোগ্য করে তুলবার দুর্লভ কৃতিত্ব কাবুকির অভিনয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হতে লাগল। বহু বিচিত্র মনোপকরণের সমন্বয়ে কাবুকির মঞ্চ জটিল হয়ে উঠল।

●

॥ কেন হিন্দুরা খ্রীস্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে ॥

স্বামী অভেদানন্দ

অনুবাদক : শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

গির্জার ধর্মে পরের মতবাদটি হচ্ছে মৃতদেহের পুনরুত্থান। অধিকংশ গির্জাই বিশ্বাস করে যে যীশুখ্রীস্ট ছিলেন "মৃতব্যক্তিদের প্রথম ফল" (first fruits of the dead), অদ্যাবধি একমাত্র তিনিই কবর থেকে উঠে এসেছেন। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকেরা এবং শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যে-সব কারণে এ মতবাদ গ্রহণ করেন না, হিন্দুরা ঠিক সে-সব কারণেই মৃতব্যক্তির দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। হিন্দুদের বিশ্বাস আত্মা অমর, তাকে ধ্বংস করা যায়না এবং মৃত্যুকে তারা দেহেরই একটা পরিবর্তন বলে মনে করে। সমগ্র হিন্দু দর্শন ও ধর্ম আত্মার এই অবিনশ্বরতার উপর প্রতিষ্ঠিত : তবুও যাজকদের অনেকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলে বেড়ায়, হিন্দুরা নাকি অমরত্বে বিশ্বাসী নয়। পক্ষান্তরে এ মতবাদটি হিন্দুদের কাছে এতই সুপরিজ্ঞাত ও ব্যাপকভাবে গৃহীত যে এজন্য কোন লোকের তারতে যাওয়ার ও একজনমাত্র মানুষের ঐতিহ্যগত পুনরুত্থানের কথা বলে বিষয়টি প্রমাণের প্রয়োজন নেই। হিন্দুদের কাছে তার চেয়েও অনেক ভাল ভাল যুক্তি আছে। তারা বলে, আত্মার অবিনশ্বরতা প্রমাণের জন্য দু'টি জিনিস প্রয়োজন,—একটি হচ্ছে আত্মার পূর্বজন্ম আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার মরণোত্তর অস্তিত্ব। যদি কোন জিনিসের সৃষ্টি হয়ে থাকে কিংবা কোন জিনিসের আদি থেকে থাকে, তবে সে জিনিসের ধ্বংস বা অন্ত অবশ্যই থাকবে ; এটাই প্রকৃতির নিয়ম। ঈশ্বর যদি কোন কিছু ছাড়াই মানুষের আত্মা সৃষ্টি করে থাকেন, তবে সে আত্মা অমর হ'তে পারে না, তাদের মৃত্যু হবেই। যে আত্মা সৃষ্ট হয়েছে, চিরকাল সে-আত্মার অস্তিত্ব থাকবে—একথা জোর করে বলা অযৌক্তিক। আপনারা যদি অমরত্বকে ধরে থাকতে অভিলাষী তবে আত্মার 'পূর্ব জন্ম' প্রমাণ করুন। গির্জাগুলিতো আত্মার পূর্বজন্মে বিশ্বাসী নয়, অথচ তারা মৃত্যুর পরেও আত্মার চির-স্থায়িত্বের কথা প্রচার করে। হিন্দুরা নির্দ্বিধায় বলে, সেটি অসম্ভব। আর সর্বোপরি, আমরা প্রকৃতির নিয়মের কথাও জানি। হিন্দুদের লেখা পুস্তকগুলিতে দেখা যায়, মানুষের আত্মাকে সেখানে জন্মমৃত্যুরহিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। "ঘাতক যদি মনে করে যে সে হত্যা করেছে কিংবা হত ব্যক্তি যদি মনে করে যে সে নিহত হয়েছে, তারা কেউ সুস্পষ্ট জানে না যে আত্মা কাউকে হত্যাও করে না কিংবা নিজেও হত হয় না।" —ইমার্সন লিখিত এবং আমেরিকার বিশেষ জনপ্রিয় এই সুন্দর স্তবকটির ভাব কঠ-উপনিষদ ও ভগবদ্গীতায় রয়েছে। যেহেতু গির্জার ধর্ম মানুষের আত্মার আদি আছে অন্ত নেই বলে প্রচার করে, সেজন্যই হিন্দুরা তা' মেনে নিতে পারে না।

গির্জার পরবর্তী ধর্মমতটি হচ্ছে পূর্বনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল ও করুণার মতবাদ। এর ফলে ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্ব-দোষ-দুষ্ট ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা করে তোলা হয়েছে। অপরপক্ষে

হিন্দুরা আরও বেশী যুক্তিসঙ্গত এবং অধিকতর বৈজ্ঞানিক মতবাদ—আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এই মতবাদের সাহায্যে জন্ম-মৃত্যুর সমস্যা খুব ভালভাবে সমাধান করা যায়, আর তা'তে ঈশ্বরকে পক্ষপাতিত্ব-দোষ-দুষ্ট ও অন্যায়ের প্রশ্রয়দাতা করে তোলা হয় না।

গির্জার ধর্মমত শিক্ষা দেয় ভগবান্ দুষ্টকে শাস্তি দেন এবং ধার্মিককে পুরস্কৃত করেন। অপরপক্ষে হিন্দুর দর্শন শিক্ষা দেয় কর্মসূত্র, অর্থাৎ কার্য-কারণের সূত্র। হিন্দুর দর্শন বলে, ভগবান শাস্তিও দেন না আবার পুরস্কৃতও করেন না; আমরা নিজেরাই বরং নিজ নিজ কর্মদ্বারা নিজেদেরকে শাস্তি ও পুরস্কার দিয়ে থাকি। শাস্তি এবং পুরস্কার আমাদের নিজেদের ক্রিয়াই প্রতিক্রিয়া। অন্য একটি কারণেও হিন্দুরা গির্জার ধর্মমতকে গ্রহণ করতে পারে না। কারণটি হচ্ছে, এ ধর্মের উচ্চতম আদর্শ হ'ল স্বর্গে গমন এবং অনন্ত জীবনভরে সুখ ভোগ করা। আর হিন্দুদের মতে ধর্মের উচ্চতম আদর্শ—শাশ্বত সুখ ভোগ নয়, সে আদর্শ হচ্ছে ঈশ্বর-চেতনালাভ এবং এ জীবনে অজ্ঞানতা ও স্বার্থপরতার বন্ধন-মুক্তি। এ অবস্থায় অবশ্যই নির্বাণ হবে; এ অবস্থায় আমরা অবশ্যই যাবতীয় ত্রুটিমুক্তি হ'ব। তারপর যা' হবার তা'ই হবে।

হিন্দুরা যদিও গির্জার ধর্মমত ও মতবাদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবু তারা যীশুখ্রীস্টকে ঈশ্বরের পুত্র কিংবা পৃথিবীতে নরদেহধারী ঈশ্বরের অবতার বলে বিশ্বাস করতে ইতস্ততঃ করে না। খ্রীস্টানদের চাইতে হিন্দুদের ঈশ্বরাবতার সম্পর্কে ধারণা আরও অধিক যুক্তিপূর্ণ এবং আরও গভীর অর্থবোধক। যাঁরা 'ভগবদ্গীতা' গ্রন্থখানি পড়েছেন, তাঁরা বুঝতে পারবেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলতে হিন্দুরা কি বোঝে। যীশুখ্রীস্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা,—হিন্দুদের তা' আলোচ্য নয়। "খ্রীস্ট" শব্দটি দ্বারা তা'রা বোঝে ঈশ্বর-চেতনার সেই চরম অবস্থা যেখানে লুপ্ত হয়ে যায় সমস্ত দ্বৈতভাব, চিরতরে দূর হয় সমস্ত বিচ্ছেদের ভাব, আর যেখানে শাশ্বত আত্মার ঈশ্বরীয় ভাবের দুর্বার অগ্রগতিতে আমাদের মানবীয় চেতনার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে, সমস্ত বাধাবিঘ্ন ভেঙ্গে ফেলে আত্মিক স্তরে আমাদেরকে স্বর্গের পিতার সঙ্গে চিরন্তন একত্ব অনুভব করিয়ে থাকে। যিনিই সে অবস্থায় পৌঁছিয়ে থাকেন, তিনি কৃষ্ণই হোন্, বুদ্ধই হোন্ বা নাজারেথের যীশুই হোন্,—তিনিই একজন খ্রীস্ট হ'য়ে যান। বিশেষ কোন নামে হিন্দুদের কাছে কিছু যায়-আসে না। তাঁরা সকলেই মহান্, সকলেই দেবতা, সকলেই মর্ত্যলোকে ঈশ্বরের অবতার। আমাকে এমন কাউকে দেখান যিনি সে অবস্থায় পৌঁছেছেন, আমি এই মর্ত্যলোকে তাঁকে জীবন্ত ঈশ্বরের মতো পূজা করবো। খ্রীস্টানরা মনে করতে পারেন, সমস্ত অবতারদের মধ্যে যীশুই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ; বৌদ্ধরা ভাবতে পারেন, বুদ্ধই ছিলেন সকলের বড়; আর কৃষ্ণ অথবা রামের একজন অনুগামী তাঁর ইষ্ট সম্পর্কে একই কথা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা যখন এ সকল দেব-মানবের জীবন পর্যালোচনা করি, আমরা দেখি, এঁরা প্রত্যেকে একে অন্যের মতোই মহৎ ছিলেন। একজন হয়তো ঈশ্বরের একটা দিককে প্রকাশ করেছেন, অন্যজন ঈশ্বরের অন্য একটা দিক উপস্থাপন করেছেন। নাজারেথের যীশু যখন সর্বত্যাগীর জীবনযাপন করতেন এবং আত্মিক একত্বের আদর্শকেই সকল ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে প্রচার করতেন, তখন তিনি দেখিয়েছেন যে

খ্রীস্টত্বের সেই অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেছেন কিন্তু সাধারণ মানুষ যীশুখ্রীস্টের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে বাদানুবাদ করছে। বিভিন্ন অবতারের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে জনসাধারণ ঝগড়া-মারামারি করে, প্রত্যেক অবতারের অনুগামীরা অন্যকে নিজেদের ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে চেষ্টা করে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা তাদের সকলকে কৃপা করেন এবং কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, জাতিবিদ্বেষ, ধর্মোন্মত্ততা ও ধর্মীয় কারণে নির্যাতন থেকে তাদেরকে মুক্তি পেতে সাহায্য করেন। খ্রীস্টের ধর্ম ছিল প্রেমের ধর্ম, আত্মত্যাগ ও আত্ম-সংযমের ধর্ম; এ ধর্ম ছিল ঈশ্বর-চেতনার ধর্ম। হিন্দুদের মধ্যেও এগুলি মহত্তম আদর্শ হওয়ায় তারা খ্রীস্টকে ,এবং তাঁর প্রকৃত ধর্মকে মেনে নেয়;—অবশ্য সে ধর্ম তাদের আদর্শের সঙ্গে যতটুকু মেলে ততটুকুই তারা মানে। কিন্তু যখন তারা দেখে যে গির্জার ধর্মমত আত্মত্যাগের আদর্শ প্রচার করে না, এ ধর্মের প্রবক্তারা সকলের প্রতি সপ্রেম ব্যবহার করে না, তারা আত্মসংযমের পরিচয়ও দেয় না;—যখন তারা দেখে খ্রীস্টান সরকারগুলি আফিমের ব্যবসা, মদের ব্যবসা দ্বারা পাপকেই প্রশ্রয় দেয় এবং লাভের খাতিরে তারা সরল নিরীহ ও পানাহারে সংযত মানুষগুলির মধ্যে মাদক দ্রব্য প্রবর্তন করে, তখন তা'রা এ সকল জিনিসের প্রশ্রয় দেয় যে ধর্ম, সে ধর্মকে বর্জন করে। তা'রা যীশুখ্রীস্টকে ঈশ্বরপুত্র বলে বিশ্বাস করে এবং জানে যে তিনি এ সকল শিক্ষা দেন নি।

প্রকৃত ধর্মের কর্তব্য হচ্ছে মানুষের মনকে প্রসারিত করা, আধ্যাত্মিক নয়ন উন্মীলন করা, স্বর্গের পরম পিতার সঙ্গে একত্ব অনুভূতির পথে মানুষকে পরিচালিত করা এবং বিভিন্ন ধর্মমত ও ধর্মনীতির মধ্যে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদ ঘেচে দেওয়া। যতদিন পর্যন্ত না আমরা আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন হই, আমরা ঝগড়া-মারামারি করি; কিন্তু যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমাদের মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান, জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে আমরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান;—যখন আমরা সমস্ত ধর্মমত, সমস্ত বিশ্বাস, মতবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারব;—তখন, একমাত্র তখনই আমরা খ্রীস্টের যথার্থ অনুগামী হ'তে পারব;—তখন, একমাত্র তখনই যীশুর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরা বলতে পারব, "আমি আর আমার পিতা এক।" হিন্দুরা যীশুর বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব বিষয়টি একপাশে সরিয়ে রাখে; কিন্তু প্রতিটি পৃথক আত্মার যে খ্রীস্ট-নীতি বিরাজ করে, হিন্দুরা তা' মানে। তাদের বিশ্বাস প্রতিটি আত্মাই হচ্ছে সুপ্ত খ্রীস্ট। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরের বাণী প্রতি আত্মার এই সত্যই ব্যক্ত করে; কিন্তু আমরা আমাদের অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার জন্য তা' শুনতে পাইনে। কৃষ্ণ বলেন,—

"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

যীশু বলেন, "তোমরা সবাই, যারা ক্লান্ত ও গুরুভারে ভারাক্রান্ত, আমার কাছে এসো; আমি তোমাদেরকে অবশ্যই শান্তি দেব।" আসুন, আমরা সে বাণী শ্রবণের চেষ্টা করি, কারণ এ বাণী এক ও অভিন্ন; আসুন, আমরা এ বাণী অনুধাবন করি; নাজারেথের যীশুর জীবনে যাটি খ্রীস্টত্বের যে তাৎপর্য প্রদর্শিত হয়েছিল,—আসুন, আমরা তা' উপলব্ধি করি;

যেভাবে তিনি জীবনযাপন করে গেছেন, আসুন, আমরা সেভাবে জীবনযাপন করি আর এ পৃথিবীতে জীবন্ত খ্রীস্ট হয়ে উঠি। শুধুমাত্র তত্ত্বের দিক থেকে খ্রীস্টকে স্বীকার করে হিন্দুরা পরিতৃপ্ত নয়; যীশু যেভাবে জীবনযাপন করে গিয়েছেন, তারা কিন্তু সেভাবেই জীবনযাপন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে সর্বত্যাগের জীবন, আত্মসংযমের জীবন, সর্বপ্রেমিকের জীবনযাপন করতে। আর এ ভাবেই হিন্দুরা খ্রীস্ট-কৃষ্ণ, খ্রীস্ট-বুদ্ধ ও খ্রীস্ট-যীশু প্রচারিত সেই শাশ্বত ধর্মের নির্দেশ পালনের চেষ্টা করে। (সমাপ্ত)

●

॥ ভারতীর্থ ॥

শ্রীসত্যেশ্বর অধিকারী

হরিদ্বার, হরদ্বার ও গঙ্গাদ্বার। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী—ত্রিবেণী সঙ্গমের ন্যায় হরিদ্বার তীর্থে ত্রিধারাসঙ্গম। হরিদ্বার—বদ্রীনাথ, হরি, নারায়ণের সমীপে উপনীত হওয়ার দরজা। হরদ্বার—কেদারনাথ, শিবের নিকট গমনের দরজা। এবং গঙ্গাদ্বার—বৈকুণ্ঠ হইতে মর্ত্যভূমিতে গঙ্গার অবতরণের দরজা। হরিদ্বার তীর্থে গঙ্গা মর্ত্যভূমিকে স্পর্শ করিয়াছে। প্রথমোক্ত দরজা দুইটি উত্তরণ ও শেষোক্তটি অবতরণের সূচকস্বরূপ।

সর্বত্র পাবনী গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্লভা।
গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগেচ গঙ্গাসাগর সঙ্গমে ॥—মহাভারত।

গঙ্গা সর্বত্র পাবনী। কিন্তু গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার), প্রয়াগ (ত্রিবেণী) ও গঙ্গাসাগর গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থল), তিনটি স্থান দুর্লভ।

বেদ, তন্ত্র ও পুরাণ। বেদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মদর্শন, তন্ত্রে সচ্চিদানন্দ শিবদর্শন ও পুরাণে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ দর্শন-এর পথের নির্দেশ। পক্ষান্তরে বেদের প্রাধান্য জ্ঞান, তন্ত্রের প্রাধান্য যোগ ও পুরাণের প্রাধান্য ভক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণই বিশিষ্ট ভক্তিশাস্ত্র। সনাতন ধর্মের তিনটি প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরলাভের নানান সাধনা। তন্মধ্যে তিনটি সাধন শ্রেষ্ঠ—জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি।

"সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হেতু ত্রিবিধ সাধন।
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিনের পৃথক লক্ষণ ॥
তিন সাধনে ভগবান তিন স্বরূপে ভাসে।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্বে প্রকাশে ॥"

শ্রীচৈঃ চঃ, মধ্যলীলা, চত্বারিংশ পরি.

জ্ঞানীর উপাস্ত ব্রহ্ম, পাথেয় জ্ঞান। যোগীর উপাস্ত পরমাত্মা, পাথেয় যোগ। ভক্তের উপাস্ত ভগবান, পাথেয় ভক্তি।

ভারতীয় হিন্দুরা উপরোক্ত তিনটি সাধনপথের কোন না কোন একটি অবলম্বন করিয়া পরমকে প্রাপ্ত হন ও মানবজীবন সার্থক করেন। জ্ঞানের প্রভাবে সাধক উত্তরণ করিয়া ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেন। হরিদ্বার তীর্থ বদ্রীনাথ, পরব্রহ্মের দ্বারসূচক। যোগের প্রভাবে সাধক উত্তরণ করিয়া পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। হরিদ্বার তীর্থ—কেদারনাথ, পরমাত্মার দ্বারসূচক। আবার ভক্তির প্রভাবে অবনত হইয়া সাধক ভগবানের সাধনা করেন, তার নাম তপস্যা। ভগবানও ভক্তকে পাওয়ার জন্ত সাধনা করেন, তার নাম করুণা। ভগবান করুণাবশে অবতরণ করেন। বৈকুণ্ঠ হইতে নারায়ণের পাদপদ্মের করুণাবশে বিগলিত ধারাই গঙ্গা। কর্মের পরিপূর্ণতা জ্ঞানে, জ্ঞানের পরিপক্কতাহেতু ভগবানে ভক্তি জন্মে। ভক্তিধারাই নিম্নমুখী। সেই গঙ্গার দ্বারও হরিদ্বার তীর্থ। বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধনের প্রাধান্ত থাকিলেও একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত গীতাশাস্ত্র জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি সকল সাধনের সমন্বয় সাধন করিয়া সার্বভৌম ধর্মমত প্রচার করিয়াছে।

বিশ্বধর্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতা।
কে শিখালো জগতেরে ?—ভারতের গীতা॥

সেরূপ হরিদ্বার তীর্থক্ষেত্র জ্ঞানী, যোগী ও ভক্তের মিলনস্থলস্বরূপ। সুতরাং হরিদ্বার তীর্থ সার্বজনীন তীর্থ। ইহাই হরিদ্বার তীর্থের মহিমা।

হরিদ্বার কোন ধাম বা পীঠস্থান-প্রসিদ্ধ নহে, অথচ সকল শ্রেণীর মানুষের নিকট অতীব আকর্ষণীয়। ইহার কারণ ত্রিদ্বারসঙ্গম। বিশেষতঃ গঙ্গাদ্বার, ভক্তিদ্বার। কলিযুগে ভক্তিসাধনই শ্রেষ্ঠসাধন। আবার পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থানের পথের দ্বার, স্বর্গদ্বারস্বরূপ। পক্ষান্তরে হরিদ্বারকে 'দ্বারতীর্থ' বলিয়া অভিহিত করিলে এই স্থানের মাহাত্ম্য অধিকতরভাবে বর্দ্ধিত হইবে, মনে করি।

●

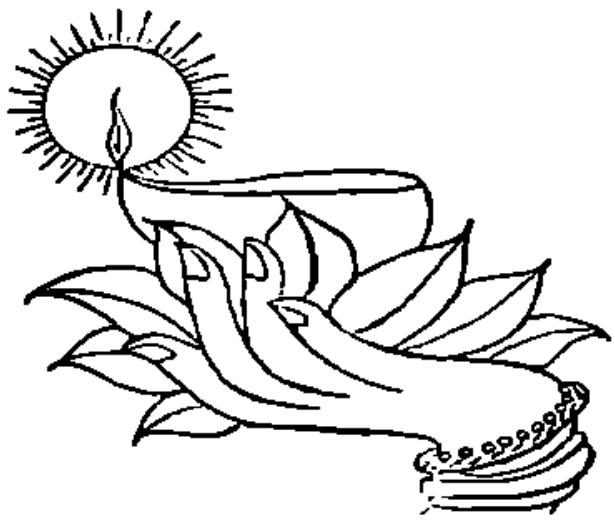

॥ শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসমালোচনা ॥

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম : সিরামিক্‌স্ প্রসঙ্গে

(ছয়)

সিরামিক্‌স্‌এর আঁদরা তৈরীর প্রয়োজনে ওই আঁদরার বর্ণিত আকারের যে-রেখাচিত্র কাগজে আঁকা হয়—সে-চিত্রকে ইংরেজীতে বলা হয় Model drawing। মডেল ড্রইংএর বাংলা নামকরণ করা যেতে পারে আঁদরা-চিত্র। চিত্রকরেরা তাঁদের ষ্টুডিয়োতে পুরুষ অথবা নারীকে মডেল করে ওই মডেলের যে-রেখাচিত্র এঁকে থাকেন—তা-ও মডেল-ড্রইং নামে পরিচিত। চিত্রকরদের আঁকা এ-ধরণের চিত্রাঙ্কনে সাধারণতঃ কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় না। সহজাত প্রতিভা এবং সুদীর্ঘ অনুশীলনের ফলশ্রুতি চিত্রকরদের অঙ্কিত এসব রেখাচিত্রের নিদর্শন পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পকলাসংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই নিদর্শনগুলো শিল্পকলার অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রাচীনকাল থেকে সিরামিকএর গাত্র, থালা, টালি ইত্যাদির ওপরও বিভিন্ন দেশের চিত্রকরেরা মনুষ্যদেহ, অন্যান্য প্রাণী অথবা ফল, ফুল, গাছ, লতাপাতার রেখাচিত্র এঁকেছেন। ওইসব চিত্রিত সিরামিক্‌স্‌এর গঠনে যেমন কারিগরী কুশলতার চমকপ্রদ দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনই চিত্রিত অংশে প্রকটিত হয়েছে চিত্রকরদের অতুলনীয় কলানৈপুণ্য। চিত্রিত সিরামিক্‌স্‌এর ওই নমুনাগুলো তাই কেবলমাত্র চিত্রকলার অনন্য নিদর্শনরূপেই নয়, ত্রিমাত্রিক গঠনের সৌকর্যে উদ্ভাবনী প্রতিভার দক্ষ পরিস্ফুটনে একাধারে ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার এক স্বতন্ত্র শিল্পমহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। গ্রীস, মেসোপটেমিয়া, ইতালী, জাপান, চীন প্রভৃতি দেশের ঐতিহ্যবাহী চিত্রিত সিরামিক্‌স্‌এর কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আঁদরা-চিত্রকে কিন্তু উন্নিষিত কলানিদর্শনের পর্যায়ে ফেলা চলে না। একমাত্র ব্যবহারিক প্রয়োজনে—অর্থাৎ আকাঙ্খিত গড়ন এবং মাপের সিরামিক্‌স্‌এর আঁদরা তৈরী করাই

আঁদরা-চিত্র এঁকে নিতে হয়। আঁদরা-চিত্র হলো বস্তুতঃ যেকোনো একটি সিরামিকনির্মাণের জন্যে তৈরী করা নকশা : যে-নকশা প্রতিটি পরিকল্পিত বস্তুর নির্মাণের কাজেই অপরিহার্য। সিরামিক্স্‌এর আঁদরা-চিত্র অথবা নকশাকে বর্ধিতচিত্রও বলা হয়। রসোপযুক্ত তাপাঙ্কে মাটির সংকোচন অনুযায়ী আঁদরা-চিত্র আকাঙ্খিত সিরামিকটির গড়ন ও মাপের চাইতে বর্ধিত আকারে এঁকে নিতে হয়। মাটির সংকোচন নির্ধারণের যে-পদ্ধতির কথা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে—সেই পদ্ধতিতে মাটির সংকোচন নির্ধারণ করে নিয়ে ওই সংকোচনের মাপ অনুযায়ী বর্ধিত আকারে আঁদরাটির রেখাচিত্র যথাযথভাবে কাগজে আঁকা দরকার। সুতরাং কয়েকটি যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া খালি হাতে আঁদরা-চিত্র আঁকা সম্ভব নয়। কোনো ব্যবহারিক রেখাচিত্র অথবা নকশা কাগজে আঁকতে হলে যেসব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয়, বর্ধিত চিত্র আঁকতে গেলেও ওই যন্ত্রপাতিগুলোই লাগে। এই যন্ত্রপাতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সেন্টিমিটার ও মিলিমিটার মাপাঙ্কিত একটি চ্যাপ্টা মাপদণ্ড, একজোড়া ত্রিকোণ অঙ্কনযন্ত্র—যার একটি ৪৫° কোণযুক্ত এবং অপরটি ৬০° ও ৩০° কোণযুক্ত, T আকারের একটি বড়ো মাপকাঠি, একটি বৃত্তাঙ্কনের যন্ত্র, একটি বিভাজনযন্ত্র ও একটি ব্যাস মাপবার যন্ত্র। এছাড়া দরকার একটি বড়ো মাপের ড্রইং বোর্ড, পুরু কাগজ, পেন্‌সিল এবং ইরেজার। ড্রইং বোর্ডএ কাগজ আটকাবার জন্যে লাগবে চার পাঁচটি বোর্ড পিন্ অথবা ক্লিপ্।

যেকোনো বস্তুর ব্যবহারিক অঙ্কনে জ্যামিতিক অঙ্কনের নিয়মাবলীর প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জ্যামিতিক অঙ্কনের নিয়মাবলীর মধ্যে প্রধান যে-দুটো ভাগ রয়েছে, তার একটি হলো দ্বিমাত্রিক অঙ্কন এবং অপরটি হলো ত্রিমাত্রিক অঙ্কন। জ্যামিতিক দ্বিমাত্রা, অর্থাৎ দুটো মাত্রা বলতে বোঝায় কোনো বস্তুর দুটো মাত্রা—দৈর্ঘ ও প্রস্থ এবং জ্যামিতিক ত্রিমাত্রা বলতে বোঝায় কোনো বস্তুর তিনটি মাত্রা, অর্থাৎ দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ। সিরামিক্স্‌এর আঁদরাও হয় ত্রিমাত্রিক। তাই কাগজে আঁদরা-চিত্র অঙ্কনে তিনটি মাত্রা—অর্থাৎ দৈর্ঘ, প্রস্থ ও বেধ দেখাতে হয়। সেক্ষেত্রে আঁদরা-চিত্র অঙ্কনে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক অঙ্কনের নিয়মাবলীর প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

একটি ঘনক অঙ্কনের উদাহরণের মধ্য দিয়ে ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক অঙ্কনের নিয়ম দেখাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। সমকোণে মাঝামাঝি ভাঁজকরা একখণ্ড পুরু কাগজ দেয়ালের সঙ্গে লাগানো একটি টেবিলের ওপর এভাবে রাখতে হবে যাতে ওই কাগজের একটি তল থাকে টেবিলের ওপর এবং অপর তলটি লেগে থাকে দেয়ালের সঙ্গে। টেবিলের ওপর পাতা কাগজের তলটিকে বলা যেতে পারে আনুভূমিক তল এবং দেয়ালের সঙ্গে লেগে থাকা কাগজের তলটিকে বলা যেতে পারে উল্লম্ব তল। ঘন আকারের একটি কাঠ অথবা পিচবোর্ডএর বাক্স কাগজের আনুভূমিক তলটির ওপর এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ওই বাক্সের কোনো একটি তল কাগজের উল্লম্ব তলের সঙ্গে লেগে থাকে। এবারে একটি পেন্‌সিল্‌এর সাহায্যে কাগজে উল্লম্ব তলে লাগানো বাক্সটির অংশের চারদিকে এবং কাগজের আনুভূমিক তলে বসানো বাক্সটির অংশের চারদিকে রেখা টেনে দিতে হবে। বাক্সটি সরিয়ে ভাঁজ করা কাগজের খণ্ডটিকে সমান

করে পুরো কাগজটি টেবিলের ওপর আনুভূমিকভাবে রাখলে নীচের চিত্রটির মতো বাক্সটির একটি রেখাচিত্র পাওয়া যাবে :

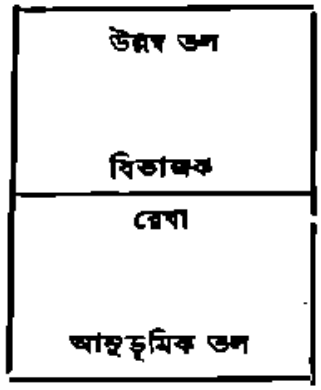

বাক্সটি টেবিলে অথবা কোনো সমান জায়গায় বসানো থাকলে যতোটা জায়গা অধিকার করে থাকবে—তার পরিমাপ পাওয়া যাবে কাগজের আনুভূমিক তলে অঙ্কিত রেখাচিত্রে। আনুভূমিক তলের সঙ্গে বাক্সটি কোন্ অবস্থানে আছে তার পরিচয় এবং সেইসঙ্গে বাক্সটির লম্বভাবে অবস্থানের ফলে অধিকৃত জায়গার পরিমাপ পাওয়া যাবে কাগজের উন্নয় তলে অঙ্কিত রেখাচিত্রে। যে কোনো আকারবিশিষ্ট বস্তুর নকশা অথবা ব্যবহারিক চিত্র এই নিয়ম অনুসরণ করে কাগজে আঁকা যেতে পারে। জ্যামিতিক জ্যামিতিক অঙ্কনের এই নিয়মকে বলা হয় প্রক্ষেপণ (Profection)। আই. এইচ্. মরিস্ এবং উইলিয়াম জেসি'র লেখা Geometrical Drawing for Art. Students বইটিতে প্রক্ষেপণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবহারিক রেখাচিত্র অঙ্কনের সহায়ক যেসব যন্ত্রপাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে—সেসব যন্ত্রপাতির ব্যবহারপদ্ধতিও ওই বইটিতে পাওয়া যাবে।

যথাযথ মাপে আঁকরা-চিত্র অঙ্কনের জন্যে যন্ত্রপাতির সাহায্য দরকার হলেও একজন সিরামিকশিল্পীকে খোলা হাতে রেখাচিত্র অঙ্কনের (freehand drawing) অভ্যাস অবশ্যই রাখতে হবে। এটা মনে রাখা দরকার যে, যন্ত্রপাতি মানুষেরই সৃষ্টি। কাজ করবার সুবিধের জন্যেই কেবলমাত্র যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা সঙ্গত। রেখাচিত্র অঙ্কনে গোড়া থেকেই যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে গেলে পরবর্তীকালে খোলা হাতে রেখাচিত্র আঁকতে দ্বিধা ও সংশয়ের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং খোলা হাতে অর্থাৎ যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়া শুধু পেন্সিল্ অথবা কলমে কাগজের ওপর রেখাচিত্র আঁকার নিয়মিত অভ্যাস রাখা একান্ত দরকার। কোনো সিরামিকএর নতুন গড়নকে রূপ দিতে হলে প্রাথমিকভাবে কাগজে ওই সিরামিকটির বেশ কিছু সংখ্যক খসড়া রেখাচিত্র এঁকে নিতে হয়। একটি সিরামিকএর গড়ন সম্বন্ধে যে-ছবিগুলো মনে ভেসে ওঠে—সে-ছবিগুলোর খসড়াচিত্র সঙ্গে সঙ্গে কাগজে এঁকে না রাখলে পরবর্তীকালে সেগুলো বিস্মৃতির আড়ালে হারিয়ে যায়। এভাবে হয়তো সিরামিকএর কোনো একটি ভালো গড়ন (form) চিরদিনের জন্যে মন থেকে হারিয়ে যেতে পারে। সিরামিকএর খসড়াচিত্র (sketch) আঁকবার জন্যে সাদা কাগজের একটি সাধারণ বাঁধানো খাতা হলেই চলবে।

বিভিন্ন সময়ে আঁকা খসড়াচিত্রগুলো শুধু খাতায় একই সঙ্গে থাকে এবং প্রয়োজনে একটি চিত্রের সঙ্গে অপরটির তুলনা করে দেখা যেতে পারে। নির্বাচিত কোনো একটি খসড়াচিত্র থেকে পরে প্রয়োজনমতো নকশা অথবা আঁদরা-চিত্র কাগজে এঁকে নেওয়া চলে। সিরামিকএর গড়নের মৌলিক খসড়াচিত্র অথবা নকশা আঁকতে হলে বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী সিরামিকএর সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। দেশবিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক সিরামিকএর সচিত্র বই বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়। বইএর ওই চিত্রগুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে সিরামিকএর মৌলিক খসড়াচিত্র রচনার প্রেরণা পাওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনবোধে ওইসব চিত্র থেকে কোনোটি বেছে নিয়ে অনুশীলনের জন্যে কাগজে নকল করাও চলতে পারে। মিউজিয়ামে গেলেও প্রাচীন সিরামিক্স্এর বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

শ্রীদিবাকর সেনরায়

●

॥ গ্রন্থ-সমালোচনা ॥

১। **স্বমিতি** (প্রথম খণ্ড): শ্যামাসঙ্গীত—শ্রীপরেশচন্দ্র পাল। পরিবেশক—মেসার্স এস. চন্দ্র এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩ এবং প্রাপ্তিস্থান—হিরণবালা প্রকাশনী, ৬এ, ঈশ্বরমিত্র লেন, কলিকাতা-৬, মূল্য ৭ টাকা।

শ্রীপরেশচন্দ্র পাল মহাশয় ২৫টি শ্যামাসঙ্গীত প্রকাশ করেছেন কতকগুলি গানের নয়েন চট্টোপাধ্যায়-কৃত সুর ও স্বরলিপিসহ। অবশ্য এ'সকল গানের গীতিকার শ্রীপরেশ পাল মহাশয়। গীতিকার পরেশ পাল মহাশয় রচনা করেছেন গানগুলি সহজ-সরল কথা ও প্রাণস্পর্শী সুরের স্পর্শ দিয়ে এবং স্বরলিপিগুলি সকল সুরের বা রাগের গঠন বা মূর্তিগুলিকে প্রকাশ করেছে সাবলীলভাবে।

বাঙলাদেশে রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকগণের রচিত গান শুধু বাঙলাদেশেরই নয়, ভারতের ও ভারতের বাইরের শিল্পী ও শ্রোতাদের অন্তরকে উজ্জীবিত করে। বর্তমান 'স্বমিতি' সঙ্গীতগ্রন্থের গানগুলির রচনা রসসম্পূর্ণ ও প্রাণস্পর্শী। আমরা সুধী ও শিল্পী-সমাজে এই সঙ্গীতগ্রন্থের প্রচার ও সমাদর কামনা করি।

২। **আমি যদি জবা হতাম**: সুরকার—শ্রীস্নেহু মুখোপাধ্যায় এবং গীতিকার—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য। এবং গানগুলির স্বরলিপি করেছেন শ্রীমতী গায়ত্রী মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—(১) দে বুক ষ্টোর, কলিকাতা-৭৩ এবং (২) নাথ ব্রাদার্স, কলিকাতা-৭৩। তাছাড়া গ্রন্থটি অন্যান্য পুস্তকালয়েও পাওয়া যায়। প্রথম-প্রকাশ, অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সাল। মূল্য ছয় টাকা।

গ্রন্থটিতে শুভেচ্ছা-বাণী দিয়েছেন প্রখ্যাত নাটকার ও সুবক্তা শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় ভক্তিনিবেদিত মন দিয়ে গ্রন্থের গানগুলি রচনা করেছেন, সুতরাং গানের কথা বা সাহিত্য ও রচনা প্রাণস্পর্শী, সুললিত হয়েছে। আকার-মাত্রিক-স্বরলিপি গানগুলির অন্তরাকৃতিকে স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছে।

গ্রন্থটিতে ৩৬টি গানের সমাবেশ আছে বিভিন্ন রাগ ও তালের স্পর্শকে নিয়ে। গানগুলির রচনা ভাবের উদ্বোধন সহজেই করে অন্তরের সহজ-সরল বেদনা নিয়ে। গানগুলির

মধ্যে একটি গানের নিদর্শন এখানে দেই—যা রসিক ও প্রেমিক শিল্পী ও শ্রোতা উভয়ের অন্তরেই সৃষ্টি করবে বেদনাতুর ভাবরাশি। গানটি হ'ল—

তত্ত্বকথা জানিনে মা,
তত্ত্ব জেনে কি লাভ হবে ?
তত্ত্ব খেটে আপন ক'রে
পেয়েছে কে তোমায় কবে ?
বুঝিনে মা কোন্‌টা ইড়া,
পিঙ্গলা সেই কত পীড়া,
কেমন ক'রে সুষুম্নাতে
আসা-যাওয়া করবে তবে ?
মূলাধার গো কোথায় মা সে ?
স্বাধিষ্ঠান বা কোথায় আছে ?
মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ সহস্রার বা সে ?
জানিনে মা স্বস্তিবাচন,
কাকে বলে ঘটস্থাপন।
কৃতশুদ্ধি ন্যাসাদি বা
ধ্যান তর্পণ জপ সবে ?

গীতি-রচয়িতা সাধনার মর্মকথাকে অন্তরের বেদনাপূর্ণ আকুতি দিয়ে সবার কাছেই প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ করেছেন যে, শুধুই কথায় ও তত্ত্বের বাইরের প্রকাশই সব-কিছু নয়, অন্তরে সত্যকারের অনুভূতি ও আনন্দের উপলব্ধিই মানুষের জীবনকে সকল-কিছু-মর্মকথা জানিয়ে দেয় এবং তাতে করে মানুষের জীবন হয় সার্থক।

গানের রচয়িতা শ্রীআশুতোষ বাবুর গীতি-রচনার উদ্দেশ্য অবশ্যই সিদ্ধ ও সার্থক হবে—যদি গানের শিল্পী ও শ্রোতাগণ অন্তরের আবেদন ও শ্রদ্ধা দিয়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপিতে প্রকাশ করা সুরের বা রাগ-রাগিণীদের সত্যকারের রূপের প্রলেপ দিয়ে সবকিছু গ্রহণ করেন। আমরা গীতিগ্রন্থটির বহুলপ্রচার কামনা করি।

৩। **সুবন্ধসঙ্গীত**—সঙ্গীত-বিশারদ শ্রীঅমীন হালদার রচিত। পরিবেশক—মেসার্স এস. চক্র এণ্ড কোং, কলিকাতা-৭, মূল্য—দশ টাকা।

গ্রন্থটিতে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিদগ্ধ-সঙ্গীতজ্ঞানী 'রবিশঙ্কর'। তাছাড়া স্বীকৃতি জানিয়েছেন সঙ্গীতজ্ঞানী গোকুল নাগ, M. L. Koser ও সঙ্গীতজ্ঞানী চিন্ময় লাহিড়ী।

'সুবন্ধসঙ্গীত'-গ্রন্থটিতে আলোচিত হয়েছে সঙ্গীতের সংজ্ঞা ও তার পার্থক্য, সঙ্গীতের শ্রেণীবিভাগ, গীতের প্রকার, শ্রুতি ও স্বর-বিভাজন, রত্নাকরের দশ বিধি, স্বরলিপিপদ্ধতি (আকারমাত্রিক, হিন্দুস্থানী ও কর্ণাটকী), সঙ্গীতপদ্ধতির তুলনা, ঠাট্ ও তার লক্ষণ, বিভাগ এবং বেঙ্কটমুখীর ৭২ ঠাট্ অনুযায়ী ৪৮৪টি দক্ষিণী রাগ এবং রাগের লক্ষণ, রাগার্দ্ধ, সময়চক্র প্রভৃতি। তাছাড়া গ্রন্থটিতে আছে রাগের বর্গীকরণ ও রাগ-পরিচিতি, বিভিন্ন ঘরাণা, রাগের জাতি ও তিন বর্গ, তাল-পরিচয় এবং পরিশেষে কয়েকজন সঙ্গীতশিল্পীর জীবনী ও অবদান।

১৩৯ পৃষ্ঠাযুক্ত ডবলক্রাউন-আকারের গ্রন্থটি স্বল্পসীমাসম্পন্ন হলেও তথ্যসমৃদ্ধ। এ'ধরনের সঙ্গীত-গ্রন্থেরও প্রয়োজনীয়তা আছে, কেননা ব্যবহারিক সঙ্গীতে অধিকার থাকলেও থিওরী বা শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের জ্ঞান থাকা সঙ্গীতশিল্পীমাত্রের প্রয়োজন।

—সঙ্গীতপ্রেমিক

৪। **মন ও মানুষ** (স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব, বাণী ও চিন্তাধারা) : রচয়িতা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও প্রকাশক রামকৃষ্ণ বেদান্ত-মঠের প্রকাশনা-বিভাগ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ; মূল্য : ২৯ টাকা।

গ্রন্থটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হল দ্বিতীয় বর্ধিত-সংস্করণ-রূপে। তবে বলে রাখা ভাল যে, দ্বিতীয় সংস্করণ হলেও প্রথম-সংস্করণের এটি হুবহু-প্রতিলিপি নয়। ১৫টি পরিচ্ছেদে ও ২টি পরিশিষ্টসহ একেবারে নূতন পরিকল্পনাসম্বলিত তথ্যসমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। গ্রন্থটির ২০ পৃষ্ঠাব্যাপী ঐতিহাসিক-তথ্যসমৃদ্ধ "ভূমিকা"-র-উল্লিখিত হয়েছে স্বামী অভেদানন্দের আমেরিকা থেকে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর, লাডাক ও তিব্বত-ভ্রমণে বহির্গত হন এবং লাডাকের হেমিস-গুম্ফায় রক্ষিত যীশুখৃষ্টের অজ্ঞাত ও অপ্রাকৃত জীবনঘটনার ইতিবৃত্তান্ত। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রথমে তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে'-গ্রন্থে এই তথ্য প্রকাশ করেন। তাঁর পূর্বে রাশিয়ান-পর্যটক নোটোভিচ ঐ তথ্য প্রকাশ করেন। বর্তমান 'মন ও মানুষ'-গ্রন্থের ১ম ভাগের ভূমিকায় পুনরায় আরও নূতনভাবে এবং *The Adept of Galilee*-গ্রন্থে যে সকল তথ্য লেখা আছে, সেই সকলের প্রমাণসহ তথ্য প্রকাশ করা হ'ল। সঙ্গে হেমিস-গুম্ফার ছবি ও শিল্পী মিওটো-অঙ্কিত যীশুখৃষ্টের একটি চিত্রও দেওয়া হ'ল।

বর্তমান নূতন ও বর্ধিত সংস্করণের বৈশিষ্ট হ'ল : এতে প্রাগের বিদগ্ধ চিত্রকর ফ্রাঁ। ডোরাক্ (Frant Dvorak)-অঙ্কিত (১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর তৈলচিত্রের প্রতিলিপি, (২) শিশুযীশুর চিত্রসহ ফ্রাঁ। ডোরাকের চিত্র, ফ্রাঁ। ডোরাকের ষ্টুডিওর ২টি ছবি, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নূতন একটি ধ্যানমূর্তি, স্বামী অভেদানন্দের একটি সল্-পেন্টিঙের প্রতিলিপি এবং তাছাড়া স্বামী অভেদানন্দ মহারাজকে লিখিত ফ্রাঁ। ডোরাকের তিনটি পত্রের প্রতিলিপি, হেলেনা ডোরাকের ছবি ও তাঁর লিখিত একটি পত্রের প্রতিলিপি এই সর্বপ্রথম গ্রন্থে প্রকাশিত হ'ল। আর প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙ রামকৃষ্ণ বেদান্ত-আশ্রমে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের সঙ্গে বিদগ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যর সি. ভি. রমণের বিচিত্র কথোপকথন, উভয়ের মিলনের একটি ছবি এবং আমেরিকায় থাকতে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক টমাস এ. এডিসনের এবং এডিসন-কর্তৃক স্বামী অভেদানন্দকে উপহারপ্রদত্ত গ্রামোফোন-যন্ত্রের একটি চিত্র এবং সেই সকল ব্যতীত আরও বহু চিত্র এই নূতন সংস্করণে প্রকাশিত হ'ল।

বর্তমান নূতন ও সুসংস্কৃত 'মন ও মানুষ'-গ্রন্থটি স্বামী অভেদানন্দের ঐতিহাসিক তথ্যবহুল জীবনের কথা-কাহিনীর উপর একটি নূতন আলোক দিতে সমর্থ হবে। এই সুসমৃদ্ধ নূতন তথ্যবহুল গ্রন্থটির মূল্য রাখা হয়েছে মাত্র পঁচিশ টাকা।　　—শ্রীদেবাশীষ হোড়

॥ বর্ষসূচী ॥

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অবক্ষয় ও পুনরুজ্জীবন	শ্রীরণজিৎ কান্তি সরকার	১১
অমৃত কণা	শ্রীঅজিতকান্তি সরকার	৪৩২
আলমোড়া ভ্রমণ	শ্রীসুকুমার সন্তাল	১৬২
আগমনী	শ্রীসারদানাথ স্মৃতি-তন্ত্র-জ্যোতির্ভূষণ	৩৭৩
আশ্বিনের গান	শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত	৪০১
আদিকার বাল্মীকি	ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য	৪১৭
এলো দোল (গান)	শ্রীঅজিতকান্তি সরকার	২৪
কল্পতরু উৎসবের তাৎপর্য্য	স্বামী প্রভানন্দ	৩২, ৭১
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও চৈতন্য চরিতামৃত	শ্রীআশুতোষ ঘোষ	৫১
কেশব কাশী যেতেছিলো	স্বামী প্রভানন্দ	১১৭, ২২৬, ২৮৪
কালিদাস সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—বলাকা ও চাতক প্রসঙ্গ	—অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য	২০৬, ৩৬৩
কালিদাস সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—অশ্ব ও ব্যাঘ্র	—অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য	৫১৩
কেন হিন্দুরা খ্রীষ্টকে মানলেও গির্জার ধর্ম বর্জন করে	—স্বামী অভেদানন্দ অনুবাদ—শ্রীভূপতিমোহন মুখোপাধ্যায়	৫১০, ৫৫৬, ৫৯৮, ৬৪৩
গ্রীসের শিল্পকলায় মদ্যস্মৃতি-চিত্রিত সিরামিক পাত্র	শ্রীদিবাকর সেনরায়	৫১
গ্রন্থ সমালোচনা		২৬৮, ৪৮১, ৬০৮, ৬৫১
চিরসৈনিক	শ্রীনচীন্দ্রনাথ হরিপা	৬৩৭
জাপানের কাবুকি নাটক	ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	৫০০, ৫৫৩, ৬০২, ৬৪১
জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের বিদ্যাগুরু	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়	১২৬
জীবনীতে উপেক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের কুলগুরু	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়	২৩২
জীবনীতে উপেক্ষিত ধাত্রীমাতা	শ্রীদুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়	২৮৯
জীবের বদ্ধাবস্থা ও মুক্তাবস্থা	শ্রীআশুতোষ ঘোষ	৪৬৭
তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও স্বামী অভেদানন্দ	ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী	৩৪৪, ৫০২, ৫৩৯, ৫৮৯, ৬৩৭
দুর্গার নানা নামে পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম	শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৩৬
দক্ষিণের দাক্ষিণ্য	সত্যেশ্বর অধিকারী	৪৪৪
দুর্গা বন্দনা	অধ্যাপক শ্রীবিশ্বভূষণ ভট্টাচার্য	৪৫০
দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলার [illegible]	[illegible]	৫৫১
[illegible]	[illegible]	[illegible]

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শঙ্করীয় দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা	—স্বামী অভেদানন্দ	
	অনুবাদক—শ্রীভূতিমোহন মুখোপাধ্যায়	১৪২, ১৮৮, ২৪১, ২৯৮
শচিশে বৈশাখ	—শ্রীবিনয়ভূষণ দাসগুপ্ত	১১৬
পরলোক-বিশ্বাসী নীলগিরির টোডা	—শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	২১৩, ২৬৩, ৩২০, ৩৬৫
প্রকৃতি, মানুষ ও অতিমানুষ	—শ্রীরণজিৎকুমার সেন	৪১৭
প্রতিবাদ		৪৮৫
বাণী ও বিচার		৩, ৬১, ১১৭, ১৬১, ২১২, ২৭১, ৩১৯, ৩৭১, ৪৮৭, ৫১৯, ৫৬৭, ৬১১
বিবেকানন্দ-মননালোকে সমাজবিকাশের ধারা	—স্বামী সোমেশ্বরানন্দ	
		৯, ৯০, ১৩৩, ১৭২, ২৪৪, ৩১০, ৪৯৭, ৫৩৬, ৫৮২
বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' উপন্যাস কি তত্ত্বমূলক	—ডঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য	
		১২, ১০৪, ১৪৯, ২০৪, ২৫৭, ৩১৭, ৩৬০
বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দ মঠ ও ইতিহাসের যোগসূত্র	—শ্রীরতন দাসগুপ্ত	৪৫
বিষ্ণুপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতে রামকাহিনী	—অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	৪০৬
বিবেকানন্দ স্তোত্রম্	—শ্রীঅমলেশচন্দ্র দেবরায়	৬২৭
বর্ষসূচী		৬৫৫
ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ	—শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ	
		১৩৫, ১৯১, ২৪৭, ৩১২, ৩৫০, ৪০৭, ৪৪২, ৪৯৪, ১৩৪
ভগবান বুদ্ধ	—ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ	১৮৬
ভাবনা	—শ্রীমতী হাসিরাশি দেবী	৪৬০
মীরার কৃষ্ণভাবনা	—ডঃ শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৫, ১৬, ২৫৩
মনের উৎস ও তার বিকাশ	—স্বামী পরমাত্মানন্দ	৬৯
মা অপর্ণার পদার্পণে	—শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ	৪২৩
মহাকাশ অভিযান	—শ্রীমতী চামেলী বসু	৪৭১
মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের স্মৃতি	—শ্রীসুকুমার সান্যাল	৫৬৫
মাতৃ সংগীত	—স্বামী চণ্ডিকানন্দ	৫৮৪
রামমোহন ও বাংলার নব্য সংস্কৃতি	—রণজিৎকুমার সেন	৩০০
রামকৃষ্ণ স্মৃতির একটি ক্ষুদ্র কমল	—স্বামী প্রভানন্দ	৩১৫
রজনীকান্ত রচিত দু'একটি শাক্তগীতি প্রসঙ্গে	—অধ্যাপক ডঃ রামজীবন আচার্য	৪৩৩
রক্ষিনী দেবী প্রসঙ্গে	—শ্রীত্রিপুরা বসু	৪৩১
শ্রীরামকৃষ্ণ গীতি	—শ্রীমতী অনুরাধা বিশ্বাস	৩৭
শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ	—শ্রীমতী শুক্লা ঘোষ	
		৬২, ৯৪, ১৪০, ১৮৩, ২৩০, ২৯১, ৩৪৩, ৬০১

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীরামকৃষ্ণলীলাঙ্গনে ভাষাপদ ভারবাগীশ	—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৮৪
শ্রীমদ্‌ভেদানন্দাষ্টকম্	—ডাঃ শ্যামল সেন	৯৫
ভাষা সঙ্গীত	—শ্রীসুরেশ চৌধুরী	১১১, ৪৭০
শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্প সমালোচনা	—শ্রীদিবাকর সেনরায়	১১১, ১১৪, ২১৫, ২৬৫, ৩২৩, ৩৬১, ৫১৫, ৫৬৩, ৬০৫, ৬৪৮
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাঙ্গনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১২৯, ১৭৯, ২৩৭, ২৯৩
শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্মরণিকা	—শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ	২৫৪
শ্রীমদ্‌ভেদানন্দ স্তুতি	—স্বামী জীবানন্দ	৩২৭
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ	—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	৪২৪
শ্রীশ্রীসারদাদেবী স্তবামৃতম্	—স্বামী জীবানন্দ	৪৭৮
সঙ্গীতে সাহিত্য, অলঙ্কার ও রস	—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ	২৫, ১০১, ১৪৫, ৩০৫, ৩৫৭
সঙ্ঘবার্তা		১১৫, ১৬৬, ৩২৬, ৫১৮
স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অপ্রকাশিত পত্র		৩৭২
সেই চরণের পরশ যে চাই	—শ্রীশান্তশীল দাস	৩৯৪
সুরথ ও সমাধি	—ডঃ শ্রীপ্রণবরঞ্জন ঘোষ	৪৫১
সংকীর্তনানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশবচন্দ্র	—স্বামী প্রভানন্দ	৪১৪, ৫০১, ৫৮১, ৬২৭
সারদা স্তোত্র	—শ্রীশচীন্দ্রনাথ ধরিপা	৫৩৫
সারদা প্রণাম	—শ্রীশচীন্দ্রনাথ ধরিপা	৫৩৬
হিমালয়ের পথে পথে—কেদারনাথ	—শ্রীবিশ্বজিৎ দাস	৩৮
হে রুদ্র বৈশাখ	—শ্রীঅজিতকান্তি সরকার	১৪১
হিমালয়ের পথে পথে—বদ্রীনাথ	—শ্রীবিশ্বজিৎ দাস	২৯০
হিমালয়ের পথে পথে—গোমুখী, গোমুখ	—শ্রীবিশ্বজিৎ দাস	৪১৫
হ্যালাতের ভেলকুই অত্যাচার	—শ্রীদিবাকর সেনরায়	৫১৯
হিমালয়ের পথে পথে—উত্তর কাশী	—শ্রীবিশ্বজিৎ দাস	৫৭৯

গ্রন্থকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-লিখিত ইংরাজী ও বাংলা বহু গ্রন্থের মধ্যে—

১ ॥ বাণী ও বিচার ॥

(শ্রীম-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ)

গ্রন্থের তিনটি ভাগ প্রকাশিত হয়েছে, চতুর্থ ভাগ প্রকাশোন্মুখ। সমগ্র গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য : শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের সর্বসমন্বয়ী বাণী ও আদর্শ থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনতত্ত্ব, মানুষের আদর্শ, লক্ষ্য ও জীবনচিন্তা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণীতে ও আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে—তাদের যথাযথ শাস্ত্রসঙ্গত ও অনুভূতিদৃষ্টিসম্পন্ন বিশদ আলোচনা। অবতার-পুরুষ ও মহামানবদের আলোচনার ও কল্যাণদৃষ্টির মূললক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানবসমাজের ও মানবজীবনের যথার্থকল্যাণসাধন করা এবং ঐ কল্যাণসাধনার পদ্ধতি, রীতি ও উপায় সত্যকারভাবে প্রকাশ পায় তাঁদের ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনতত্ত্বের যথাযথ চিন্তায় ও অনুশীলনে। গ্রন্থকার সুনিপুণভাবে ও সতর্কদৃষ্টি রেখে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র বিষয়ে কথা বা বাণী ও উপদেশের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন—যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবনচিন্তায় ও জীবনের ব্যবহারে প্রযুক্ত হয় সেদিকেই লক্ষ্য রেখে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রত্যক্ষ-উপলব্ধিময় জীবনের ইঙ্গিতে ও প্রেরণায় গ্রন্থকারের সমগ্র আলোচনা প্রদীপ্ত ও ভাবগম্ভীর।

এ'পর্যন্ত ঐ গ্রন্থের যে কয়টি ভাগ প্রকাশিত হয়েছে সে'সকলে আলোচিত হয়েছে—

(১) প্রথম ভাগ—শ্রীশ্রীকথামৃত, ১ম ভাগ, পৃঃ ৬১—৮৯ মূল্য : ২০৲

(২) দ্বিতীয় ভাগ— „ ১ম ভাগ, পৃঃ ১০১—৩১৬ এবং দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৩ মূল্য : ২০৲

(৩) তৃতীয় ভাগ— „ দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৫—১২০ মূল্য : ২০৲

(৪) চতুর্থ ভাগ— „ দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১২৪—

(৫) পঞ্চম ভাগে বিশেষভাবে থাকবে 'শক্তি ও শক্তিমান অভেদ'—শ্রীশ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগের শেষের দিকে আলোচিত আরও তথ্য।

বিশাল গ্রন্থটি নয়টি-দশটি ভাগে প্রকাশিত হবে। গ্রন্থটি বিভিন্ন চিত্রসম্বলিত ও পরিশিষ্টসমন্বিত।

●

॥ মন ও মানুষ ॥

(প্রথম ভাগ)

স্বামী অভেদানন্দের ব্যক্তিত্ব বাণী ও চিন্তাধারা বহু চিত্র-সম্বলিত

গ্রন্থের প্রথম ভাগ বহু অপ্রকাশিত ঘটনা ও চিত্র-সহ প্রকাশিত হ'ল।

মূল্য : ২৫৲ টাকা মাত্র

মানসিক প্রশান্তি এবং বেঁচে থাকার নতুন প্রেরণা লাভ করুন।

যদি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া, তাদের বিয়ে ইত্যাদির ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন নিশ্চিত ও স্বনির্ভর একটা আয়ের ব্যবস্থা করা যায়, তবে আপনিও অবশ্যই মনের শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারবেন।

একমাত্র নিরাপত্তাবোধ থেকেই তো মানসিক প্রশান্তি আসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে নিয়মিত অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ সবই পেতে পারবেন।

দি পিয়ারলেস জেনারেল ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ

স্থাপিত—১৯৩২

রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ

'পিয়ারলেস ভবন'

৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা-৬৯

মোট সম্পদ—১০০ কোটি টাকার উর্দ্ধে

যারা পঙ্গু ও অসমর্থ, তাদের জন্যেও

১৯৮১কে করে তুলুন একটি আনন্দময় নববর্ষ

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮১ সালটি অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য আন্তর্জাতিক বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ভারত সরকার সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্যগুলি সর্বান্তকরণে সমর্থন করে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন—

মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার
গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া
শাস্ত্রী ভবন
নিউ দিল্লী-১১০০০১

davp 60/388

প্রদেয় কর
চটপট জমা দিলে

★ অর্থদণ্ড বা শাস্তির ভয় থাকে না
★ উদ্বেগ আর আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকতে হয় না
★ দায়িত্বশীল নাগরিকের পরিচয় দেওয়া হয়
★ দেশ গঠনের কাজে সম্পদ সংগ্রহে সাহায্য করা যায়

কর দেবার শেষ তারিখ একটা আছে সত্যি, কিন্তু

শেষ তারিখের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন কি ?
দীর্ঘ সূত্রিতা থেকে প্রায়ই গাফিলাতি ঘটে।
ঠিক মতো কর দিন
দেশের শক্তি বাড়তে দিন

ডিরেকটর অফ ইনসপেকশন
(রিসার্চ, স্ট্যাটিসটিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশন)
ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট
নিউ দিল্লী-১১০০০১

dsvp 80/404

Phone : 24-2207/08

With Best Compliments from :

ARIM METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED.

23, CONVENT ROAD,

CALCUTTA-70014

Telex : 021-2610 ARIM IN. **Cable : CASTINGS**

হোসিয়ারী শিল্পে

শ্রীবিষ্ণুর

অনবদ্য অবদান

শঙ্খ ও রত্নদীপ মার্কা গেঞ্জী ও জাঙ্গিয়া

It gives you what it promises...
Comforts, durability and brings out best in you.

Makers :

SHREE BISHNU HOSIERY MILLS,
1, HEMKAR BYE LANE, Post Box No. 12224
CALCUTTA-700005.

শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

'...বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরের বাঁধনে'

ডানলপ ইণ্ডিয়া
দেশের শিল্পোন্নতির ক্ষেত্রে এগিয়ে যাবার ঠিক সুরটি বাজিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।
পরিবহন, কৃষি, শিল্প,
প্রতিরক্ষা ও রপ্তানির ক্ষেত্রে
ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে
ডানলপ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ডানলপ ইণ্ডিয়া
প্রগতির পথিক

DPRC-80 BEN

হোমিওপ্যাথিক

॥ ঔষধ ॥

আমাদের ঔষধ অভিজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রস্তুত হয়।

বায়োকেমিক টিচুরেশন ও ট্যাবলেট আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুগার-অফ্-মিল্কযোগে প্রস্তুত করিয়া থাকি।

॥ পুস্তক ॥

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক চিকিৎসা

চতুর্বিংশ সংস্করণ—বিশেষভাবে সংশোধিত একমাত্র বঙ্গভাষায় অন্যূন তিন লক্ষ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মূল্য ২৫ টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (সটীক)—অন্বয়ার্থ, বাংলা ব্যাখ্যা ও টিপ্পনী সম্বলিত। মূল্য ১৫ টাকা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (মূল)—মূল্য ৩·০০ টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতা—মূল্য ৩·০০ টাকা।

এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

হোমিওপ্যাথিক, কেমিষ্ট, ফার্মাসিউটস্ এণ্ড পাবলিশার্স

Wire : Similicure ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলি-৭০০০০১ Ring : 22-2563

১৯৩৩ সালে চিকাগো বিশ্বধর্ম্মসভায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবক্তা ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এম. এ, পি. এইচ. ডি., ডি. লিট., মহোদয়ের যুগান্তকারী ধর্ম্মীয় অবদান—

১। গীতাধ্যান (১ম—৬ষ্ঠ) ২১·০০
২। গৌরীকথা (১ম—৩য়) ১ম খণ্ড ৪·০০ ২য় খণ্ড ৪·০০ ৩য়-৫·০০
৩। চণ্ডীচিন্তা ৪·০০
৪। উদ্ধব-সন্দেশ ৫·০০
৫। শ্রীমদ্ভাগবতম ১০ম স্কন্ধ (২য়-৫ম) ৫২·৫০
৬। মহানামব্রতের পাঁচটি ভাষণ ৫·০০
৭। উপনিষদ্-ভাবনা (২য়) ৬·৫০

প্রাপ্তিস্থান :—

১। মহাউদ্ধারণ গ্রন্থালয়
৫১, মাণিকতলা মেন রোড, কলি-৫
২। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
৩। শ্রীশ্রীহরিসভা মন্দির
পো: নবদ্বীপ, নদীয়া

RAMAKRISHNA VEDANTA MATH
Publication Department (Phone : 55-1800)
198, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006

WORKS OF SWAMI ABHEDANANDA

	Rs.		Rs.
A study of Heliocentric Science	12·00	Reincarnation	8·00
An Introduction to the Philosophy of Panchadasi	2·00	Religion of the Twentieth Century	2·00
Attitude of Vedanta Towards Religion	6·50	Religion, Revelation and God	12·00
Bhagavad Gita, the Divine Message (Vols. 1 & II) Each Set		Self Knowledge	12·00
Christian Science and Vedanta		Science of Psychic Phenomena	8·00
Doctrine of Karma	9·00	Spiritual Unfoldment	6·00
Divine Heritage of Man	10.00	Swami Vivekananda and His Works	2·00
Epistles	12·00	The Bases of Indian Culture	75·00
Great Saviours of the World	15·00	The Complete Works of Swami Abhedananda in 10 Volumes and its Guide Book	300·00
How To Be A Yogi		The Sayings of Sri Ramakrishna	6·00
Human Affection and Divine Love	4.00	The Steps Towards Perfection	2·00
Ideal of Education	3·00	The Vedanta Philosophy	
India and Her People	12·00	Thoughts on Sankhya, Buddhism and Vedanta	
Life Beyond Death	16·00	True Psychology	16·00
Memoirs of Ramakrishna	12·00	Universal Religion and Vedanta	12·00
My Life Story	12·00	Yoga Psychology	16·00
Mystery of Death	18·00	Yoga : Theory & Practice	10·00
Path of Relization	10.00	Why a Hindu Accepts Christ and Rejects Churchianity	1·25
Philosophy and Religion			

WORKS ON SWAMI ABHEDANANDA

Spiritual Teachings of Swami Abhedananda	3.00	Swami Abhedananda in America	6.50
		Swami Abhedananda in India (In 1906)	12·00
Swami Abhedananda : A Spiritual Biography	16.00	Swami Abhedananda-The Patriot Saint	2·00

WORKS OF SWAMI PRAJNANANANDA

A Historical Study of Indian Music		Sangitasara-Samgraha	7.50
A History of Indian Music	15.00	Schools of Indian Philosophical Thought	45·00
Christ the Saviour	2.00	The Philosophical Ideas of Swami Abhedananda	30.00
Historical Development of Indian Music	65.00	Thoughts on Yoga, Upanishad and Gita	12·00
Music of the Nations	45.00	Music of the South Asian Peoples. Vol. 1	125.00
Philosophy of Progress and Perfection			
Music : Its Form, Function and Value	55.00		

The Forthcomming Outstanding Books on Music by Swami Prajnanananda

Indian Music in Relation to Art and Culture.
Constructive History of Indian Music. Vol. I (Primitive and Prehistoric Period.)
Constructive History of Indian Music. Vol. II (Music as found in the Vedic Literature)

Established by
Swami Abhedananda
VISVAVANI

R. N. 13733 57
42nd Year. February 1981
VOL. XII

Regn. No. WB/
PHONE 55

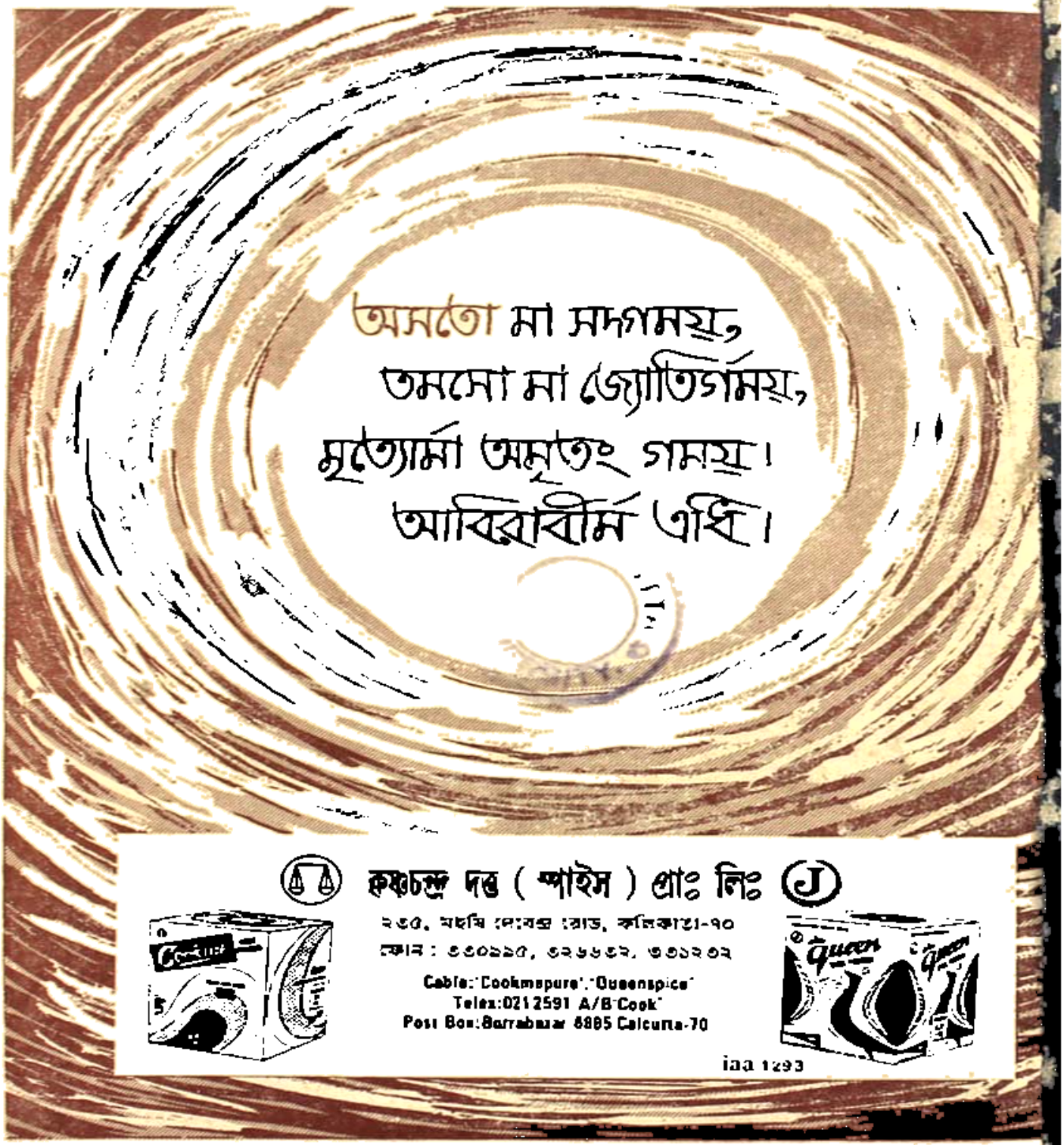

কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত (স্পাইস) প্রাঃ লিঃ
২৩৫, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০
ফোন : ৩৩০৯১৩, ৩২৬৬৩২, ৩৩১২৩২
Cable:"Cookmspure","Queenspice"
Telex:0212591 A/B"Cook"
Post Box:Burrabazar 6885 Calcutta-70
iaa 1293

Published and Printed by Swami Paramatmananda for Ramakrishna Vedanta Math
9-B, Raja Rajkrishna Street, Calcutta-700 006. printed at the New Indian Press, 6.Duff Street, Calcutta
RICE Re. 1.50 Cover Printed by THE ARTISAN CALCUTTA-700 012 মূল্য